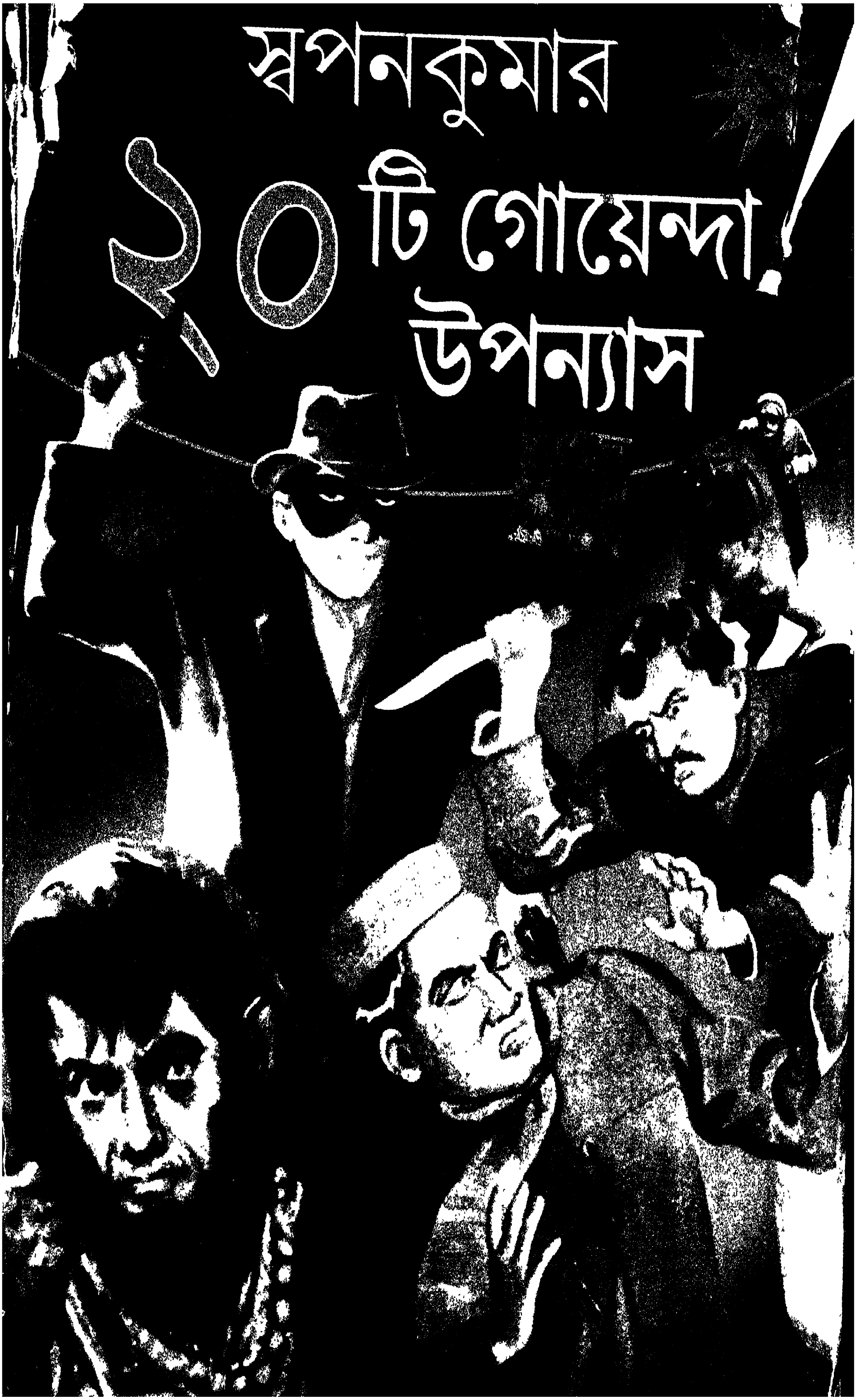

স্বপনকুমার
২০টি গোয়েন্দা
উপন্যাস

স্বপনকুমার
২০টি গোয়েন্দা উপন্যাস



দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড

Swapankumar
20 GOENDA UPANYAS
(A Collection of 20 Detective Novels)

CODE NO. 93 S 29
ISBN : 978-93-5060-004-7
Price : Rs. 250.00

Dev Sahitya Kutir Pvt. Ltd.
21, Jhamapukur Lane, Kolkata-700 009
Tel : 2350-4294/4295/7887

দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ২১, ঝামাপুকুর লেন,
কলকাতা-৭০০ ০০৯ থেকে শ্রীঅরুণ চন্দ্র মজুমদার কর্তৃক
প্রকাশিত এবং বি. সি. মজুমদার কর্তৃক বি. পি. এম'স
প্রিন্টিং প্রেস, রঘুনাথপুর, দেশবন্ধুনগর, উত্তর ২৪
পরগনা থেকে মুদ্রিত। বর্ণ সংস্থাপন ঃ
প্রদ্যুৎ সাহা, ৭, কামারডাঙ্গা রোড,
কলকাতা-৭০০ ০৪৬

প্রচ্ছদ ঃ অমিত চক্রবর্তী

দাম ঃ ২৫০.০০ টাকা


উপহার

প্রকাশকের নিবেদন

আজকের কিশোরদের কাছে সত্যজিৎ রায়ে ফেলুদা বা প্রদোষচন্দ্র মিত্র সবচেয়ে জনপ্রিয় গোয়েন্দা হলেও, কিছুদিন আগে পর্যন্ত কিন্তু তাদের আচ্ছন্ন করে রেখেছিল অন্য দুই গেয়েন্দা, কিরীটী রায় এবং দীপক চ্যাটার্জী। কিরীটী রায়ে স্রষ্টা ছিলেন নীহাররঞ্জন গুপ্ত ও দীপক চ্যাটার্জীর স্রষ্টা শ্রীস্বপনকুমার। কিরীটী রায়ের সহকারী সুব্রত আর দীপক চ্যাটার্জীর সহকারী রতনলালও বিখ্যাত ছিল এই দুই গোয়েন্দার মতোই।

আসলে বাংলা গোয়েন্দা কাহিনি ঠিকঠাক শুরু হয়েছিল হেমেন্দ্রকুমার রায়ের হাতে। তার আগেও যে এই ধরনের গল্প ছিল না এমন নয়, প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের 'দারোগার দপ্তর' নামে বেশ কিছু বই প্রকাশিত হয়েছে, পাঁচকড়ি দে বেশ কিছুটা খ্যাতি পেয়েছিলেন তাঁর 'হত্যাকারী কে', 'নীলবসনা সুন্দরী' প্রভৃতি গ্রন্থের জন্য। বিদেশি গোয়েন্দা রবার্ট ব্লেককে নিয়ে অনেকগুলি বই লিখেছিলেন দীনেন্দ্র-কুমার রায়। তাঁর চেয়েও বেশি বই লিখেছেন শশধর দত্ত দস্যু মোহনকে নিয়ে, মোট ২০৩ খানা বই—শুরু হয়েছে মোহনকে দিয়ে, শেষ হয়েছে মোহনের ছেলে স্বপনকে দিয়ে। কিন্তু কিশোরদের জন্য সত্যিকারের মজাদার গোয়েন্দা কাহিনি প্রথম নিয়ে এলেন হেমেন্দ্রকুমার রায়। হেমেন্দ্রকুমারের কিশোর গোয়েন্দা ছিল জয়ন্ত, সহকারী ছিল দুজন, মাণিক ও কুমার, আর ছিলেন দারোগা সুন্দরবাবু—মোটাসোটা মানুষটি 'হুম' শব্দ করে ঢুকতেন, এসেই খাবার অর্ডার দিতেন, আর অপরাধীকে ধরার আঁটসাঁট পরিকল্পনা করা হলে একটা কিছু গণ্ডগোল পাকিয়ে সেটা ভেস্তে দিতেন।

হেমেন্দ্রকুমারের পরেই যে দুজনকে আমরা গোয়েন্দা গল্পের জাদুকর মনে করি, তাঁরা হলেন ব্যোমকেশ-অজিতের স্রষ্টা শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কিরীটী-সুব্রতর স্রষ্টা নীহাররঞ্জন গুপ্ত—শরদিন্দুকে আমরা ধরে নিয়েছি বয়স্ক পাঠকের লেখক এবং নীহাররঞ্জনকে ধরে নিয়েছি কিশোর পাঠকদের লেখক। কিন্তু এঁদের মাঝখানে পড়ে যে লেখক আজ প্রায় হারিয়ে যেতে বসেছেন তিনি হলেন শ্রীস্বপনকুমার। অনেকের স্মৃতিতে আজ তিনি ম্লান হয়ে এলেও, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই যে একদিন তিনি জনপ্রিয়তার শিখরে ছিলেন। শরদিন্দু এবং নীহাররঞ্জনের মতো দুই শক্তিশালী লেখকের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে গোয়েন্দা কাহিনি লিখে তিনি যেভাবে পাঠকমন জয় করেছিলেন তা রীতিমতো প্রশংসার ব্যাপার।

শ্রীস্বপনকুমারের সঙ্গে অন্য দুজন খ্যাতিমান লেখকের মূল পার্থক্য এইখানে যে, শ্রীস্বপনকুমার এঁদের মতো দীর্ঘ উপন্যাস রচনা করেননি। তাঁর উপন্যাসগুলি প্রায় সবই ক্ষুদ্র আয়তনের—সেগুলি একেবারে কোনো গা-ছমছম ঘটনা দিয়ে শুরু হয়, গেয়েন্দার অনুসন্ধানের সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও সাসপেন্স ও হৃদস্পন্দন বাড়তে থাকে এবং এই কৌতূহল অল্প সময়ের মধ্যেই প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে দিয়ে কৌতূহলের তিনি অবসান ঘটান। গল্পের আয়তন সম্পর্কে আর-একটা মজার ব্যাপার হল এই যে, এক-একটা সিরিজ তিনি শেষ করেন ঠিক একই রকম আয়তনের মধ্যে, যেমন বিশ্বচক্র সিরিজ শেষ হয় ঠিক চৌষট্টি পাতায়, বাজপাখি সিরিজ শেষ হয় আটচল্লিশ পাতায়—এর কমও নয়, বেশিও নয়।

মাপা আয়তনের লেখা, কিন্তু একটা সময় শ্রীস্বপনকুমারের এই বইগুলি কিশোরদের কাছে অর্থাৎ

আকর্ষণের বস্তু ছিল সেটা যাঁরা সেই সময়ের কিশোর পাঠক ছিলেন, তাঁরা বুঝবেন। এর প্রাথমিক কারণ এই হতে পারে যে, খুব তাড়াতাড়ি পড়ে এসব বই শেষ করে দেওয়া যায়, কারণ স্কুলের ছেলেদের এ বই পড়তে হবে তো লুকিয়ে-চুকিয়ে, খুব বেশিক্ষণ সময় দেওয়াও যায় না এর জন্য। কিন্তু আসল কারণ নিশ্চয়ই এই যে, তাঁর বই কেবল ধরার অপেক্ষা, তারপর রুদ্ধশ্বাসে কখন যে পাতার পর পাতা উল্টে বই শেষ করে ফেলেছি তা যেন খেয়ালই থাকত না।

শ্রীস্বপনকুমারের লেখায় যে কী আকর্ষণ ছিল, কী জাদুকরী নেশায় ক্ষুদে পড়ুয়াদের তা টেনে রেখে দিত প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত, সেটা বোঝাবার জন্যই এখানে আমরা তাঁর কুড়িটি ছোট উপন্যাস একত্র করে প্রথম রচনাসম্ভার প্রকাশ করলাম। উপন্যাসগুলি আমরাই প্রকাশ করেছিলাম এবং সিরিজের নাম দেওয়া হয়েছিল বিশ্বচক্র সিরিজ। এই সিরিজে প্রকাশিত হয়েছিল মোট একশোটি বই, প্রত্যেকটি বইয়ের টাইটল-পেজে লেখা থাকত 'কলেজ স্টুডেন্টদের জন্য'। বই প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই তা প্রায় নিঃশেষিত হয়ে যেত এবং ক্ষুদে পড়ুয়াদের হাতে হাতে ঘুরত সেই বই। গোয়েন্দা কিরীটী রায় এবং ব্যোমকেশ বক্সীকে নিয়ে আলোচনা অনেক হয়েছে, কিন্তু সত্যকে অস্বীকার না করলে বলতেই হবে, শ্রীস্বপনকুমারের গোয়েন্দা দীপক চ্যাটার্জীও জনপ্রিয়তায় এদের চাইতে কোনো অংশে কম ছিল না।

আমরা লেখক শ্রীস্বপনকুমারের সঙ্গে এ যুগের কিশোর পাঠকদের পরিচয় করিয়ে দেবার জন্যই মাত্র কুড়িটি উপন্যাস নিয়ে এই গ্রন্থ প্রকাশ করলাম। আশা করছি সেই সময়ের মতো এই সময়েও তিনি পাঠকদের মন জয় করতে পারবেন। আমাদের এই প্রত্যাশা সফল হলে ভবিষ্যতে গোয়েন্দা কাহিনির এই শক্তিশালী লেখকের আরো অনেক গল্প আমরা পাঠকদের উপহার দেব।

সূচীপত্র

অদৃশ্য সঙ্কেত

—এক—

আঃ—আ—আ...

নৈশ প্রহরের মনোরম মায়াময় পরিবেশকে একমুহূর্তের মধ্যেই যেন গভীর অশান্তির মধ্যে ডুবিয়ে দিয়ে ফুটে উঠল একটা কাতর আর্ত চীৎকার।

মুমূর্ষু নারীকণ্ঠের অন্তিম করুণতায় যেন আচ্ছন্ন হয়ে গেল বিয়েবাড়ির আনন্দকোলাহলময় আলোকোজ্জ্বল সুন্দর পরিবেশ।

অনন্ত নীল আকাশের অগণন তারারাও বুঝি বারেকের জন্যে কেঁপে কেঁপে উঠল এই আকুল শব্দের তীক্ষ্ণতায়।

প্রেতলোকের বিষণ্ণ দীর্ঘশ্বাস যেন নেমে এলো অকলঙ্ক স্বর্গীয় নির্মলতার মাঝে।

কিন্তু কার এ কণ্ঠ?

কোথায় এর উৎস?

বিবাহ উপলক্ষে রায়সাহেব ঈশান মিত্রের বাড়িতে উপস্থিত সমবেত অতিথিবর্গ ব্যস্ততার সঙ্গে অপরিসীম চাঞ্চল্য নিয়ে ছুটে গেল দোতলায় কোণের একখানা ঘরের দিকে।

কিন্তু একি?

তাদের পদক্ষেপের অনেক আগেই একটি নিরপরাধা নারীর শেষ নিশ্বাস বাতাসের বুকে বিলীন হয়ে গেছে।

কিন্তু কে এর জন্যে অপরাধী?

কার চক্রান্তের বিষবাষ্পে আজ একটি কোমল কুসুমের পাপড়ি ভূলুণ্ঠিত হয়ে ধূলিমলিন ধরণীর ধূসরতায় নিজেকে নিঃশেষে সঁপে দিয়েছে?

কে দেবে এর উত্তর?

সকলের মুখে মুখে শুধুমাত্র একটি কথাই ভেসে ভেসে বেড়াতে লাগল—মনোরমা দেবী মৃত্যুবরণ করেছেন। কিন্তু এ কি মৃত্যু, না হত্যা?

এই একটিমাত্র প্রশ্নই বার বার আলোড়ন তুলতে থাকে ডিটেকটিভ দীপক চ্যাটার্জীর মনে। নিশ্চয়ই এর মধ্যে জড়িত আছে গভীর রহস্য। আর রহস্যের যবনিকা সরিয়ে, হত্যাকারীর কূটচক্র ভেদ করে তাকেই খুঁজে বের করতে হবে—প্রকৃত অপরাধী কে?

এইজন্যেই বোধ হয় ভগবান ঠিক এই সময়েই তাকে এখানে উপস্থিত করেছিলেন।

চিন্তার অতলে তলিয়ে যায় দীপকের মন।

*　　　*　　　*　　　*

রায়সাহেব ঈশান মিত্রের বাড়িতে রহস্যানুসন্ধী দীপক চ্যাটার্জীর যাতায়াত আজ নতুন নয়। ঈশান মিত্রের প্রথমা স্ত্রী বিনতা দেবী দীপককে বেশ একটু স্নেহ করতেন। সে আজ পাঁচ বছর আগেকার কথা।

দীপক তখন আজকের রহস্যভেদী দীপক চ্যাটার্জী নয়। সে তখন ঈশান মিত্রের প্রথম পক্ষের ছেলেকে প্রাইভেট পড়াত। বি. এ. পরীক্ষা দিয়ে হাতে ছিল তার অখণ্ড অবকাশ। আর বাড়িতে বসে আড্ডা মেরে সময় নষ্ট করতে আর যেই ভালবাসুক, দীপক চ্যাটার্জীর মত ছেলেরা সে দলের নয়।

তারপর এই দীর্ঘ পাঁচ বছরে পৃথিবীর বুকের ওপর দিয়ে ঘটে গেছে অনেক পরিবর্তন।

দীপক চ্যাটার্জীর পিতা ইহলোকের মায়া কাটিয়েছেন। দীপক এখন পিতার অগাধ সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী। তা ছাড়া সে বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্। তাই তার মত ছেলেদের একটা-না-একটা খেয়াল এসে জুটবেই। দীপকের কিন্তু রহস্যভেদটা খেয়াল না হয়ে একেবারে নেশায় এসে দাঁড়িয়েছিল। ইতিমধ্যে সে ক্রিমিনোলজিতে এম. এ.টাও দিয়ে ফেলেছিল। তাই এ বিষয়টা তার একটা বিশেষ 'ফ্যান্সী' হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

ওদিকে ঈশান মিত্রের প্রথমা স্ত্রী বিনতা দেবীও একটিমাত্র ছেলে শঙ্করকে রেখে হঠাৎ হার্টফেল করে মারা যান। এ খবরটা অবশ্য দীপক তখন জানতে পারেনি। জানতে পারল বিনতা দেবী মারা যাবার দেড় বছর পরে ঈশান মিত্র যখন দ্বিতীয়বার বিবাহের ব্যবস্থা করে দীপককেও তাতে নিমন্ত্রণ করলেন।

দীর্ঘদিন পরে দীপক আবার ওই বাড়িখানার দিকে পা বাড়াল।

কিন্তু বাড়িখানায় পা দিয়েই দীপক কেমন যেন অবাক হলো।

সেদিন বৌভাত। উচ্ছ্বাস আর কলরবে সারা বাড়ি গম্ গম্ করছিল। কিন্তু কোথাও এতটুকু মাত্র আনন্দের রেশ চোখে পড়ল না দীপকের। এ যেন একটা উৎসবের গতানুগতিক নিয়মরক্ষা।

প্রথম পক্ষের ছেলে শঙ্করের বয়স বছর দশেকের বেশি নয়। কিন্তু সে যেন অতিমাত্রায় গম্ভীর। কেমন যেন বীতস্পৃহ ভাব তার, উদাসীন নির্লিপ্ততা। ঈশান মিত্রের বাড়ির অধিকাংশ আত্মীয়স্বজনের মনের মধ্যেও কেমন যেন একটা অস্বস্তির ভাব মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। তাদের প্রত্যেককে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে দীপকের এ কথাটাই মনে হলো যে, তারা কেউ ঈশানবাবুর এই দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহকে সন্তুষ্টচিত্তে নিতে পারেনি।

বাইরে রাত নেমেছে।

রাতের কালো ডানায় তারাদের ঝিলিমিলি।

ঝিরিঝিরি বইছে ফাল্গুনী হাওয়া।

দীপক একা দোতলার ব্যাল্‌কনিতে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরাল।

ভেতরের হলঘরে অতিথিদের কলগুঞ্জন।

কয়েকজন অতিথি ঈশান মিত্রের নববিবাহিতা স্ত্রীকে গান গাইবার জন্যে অনুরোধ করছেন শোনা গেল।

মায়া দেবী কয়েকবার আপত্তি করল। অবশেষে অতিথিদের অনুরোধ এড়াতে না পেরে বাধ্য হয়েই গান ধরল ঃ—

আমি চঞ্চল হে
আমি সুদূরের পিয়াসী
দিন চলে যায়, আসি আনমনে,
তারি পথ চেয়ে থাকি বাতায়নে,
ওগো মনে-প্রাণে আমি তোমারি
পরশ পাবার প্রয়াসী।
আমি সুদূরের পিয়াসী।

চমৎকার কণ্ঠ মায়া দেবীর।

দীপক সংগীতজ্ঞ নয়। তবে গানের সুরের অপূর্ব মুর্ছনা তাকে বিহ্বল করে তুলল। দীপক সিগারেটে আর একটা সুদীর্ঘ টান দিয়ে ভাবতে লাগল—সত্যি, ঈশান মিত্রের স্ত্রীভাগ্য ভাল, সন্দেহ নেই। মায়া দেবী অনুপম রূপলাবণ্যের অধিকারিণী। তা ছাড়া এমন সুন্দর কণ্ঠস্বর যে কোনও সাধারণ মানুষের ঈর্ষার বস্তু। তা ছাড়া মায়া দেবী যে একজন বিদুষী মহিলা এ কথাও শুনেছে দীপক।

কিন্তু মায়া দেবী রায়সাহেব ঈশান মিত্রকে বিবাহ করল কেন? ঈশান মিত্র মায়া দেবীর চেয়ে

বয়সে অন্তত পনর-কুড়ি বছরের বড়। মায়া দেবীর বয়স কুড়ির কাছাকাছি বলে মনে হয়। কিন্তু ঈশান মিত্রের বয়স প্রায় চল্লিশ। তা ছাড়া ঈশান মিত্রের প্রথম পক্ষের যে একটি ছেলে আছে এ কথাও মায়া দেবীর অবশ্যই অজানা ছিল না। এ কি তবে শুধু অর্থের প্রলোভন? হয়ত তাই।

একি, দীপকদা যে? এখানে?

পরিচিত কণ্ঠস্বর।

দীপক পেছন ফিরে চাইল। ঈশান মিত্রের ভাইপো অশোক মিত্র তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। অশোকের বয়স পঁচিশের কাছাকাছি। দোহারা চেহারা। অল্পবয়সে পিতৃহীন হবার পর সে আর তার বড় ভাই অমল দুজনেই কাকার কাছে মানুষ। সবসময় হাসিখুসি ভাব অশোকের। বেশভূষায় বেশ একটু বাবুগিরির ছাপ। তবে অন্য কোনও বদ্‌খেয়াল তার নেই।

তুমি ত জান অশোক কলরবকে আমি পছন্দ করি না। দীপক হেসে বলল—তবে তুমিও এভাবে উৎসব-আনন্দকে এড়িয়ে চলছ কেন?

ভাল লাগছে না। নির্লিপ্ত স্বর অশোকের।

বুঝেছি। 'বোরিং' লাগছে, তাই না?

সত্যি দীপকদা। কাকাবাবুর এ বয়সে আর বিয়ে না করলেই ভাল হতো।

কেন?

এখন হচ্ছে দাদার অথবা বিনয়দার ঠিক বিয়ে করবার বয়স। কাকা যদি এ বয়সে বিয়ে করে এভাবে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেন, তবে শঙ্করটা ধীরে ধীরে উচ্ছন্নে যাবে।

বিনয়দার পরিচয় এখানে সংক্ষেপে দেওয়া উচিত। বিনয় হচ্ছে রায়সাহেব ঈশান মিত্রের নিজের ভাগনে। অশোকের চেয়ে সে বছর তিনেকের বড়। বিনয় একটু খামখেয়ালী ধরনের। বি. এ. পর্যন্ত পড়ে সে পরীক্ষা দেয়নি। কেউ প্রশ্ন করলে বলে, শুধু শুধু ডিগ্রীগুলো কুড়িয়ে কি লাভ? ওগুলো শুধু কাঁধে বোঝার মতো চেপে বসে মানুষের উন্নতির পথে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। তবে পড়াশুনার দিকে তার ঝোঁক প্রচুর। আর আছে তার পিয়ানো বাজানোর শখ। কিছুদিন ওস্তাদের কাছে পিয়ানো শিখেছিল, এখন নিজেই বাজায়। পিয়ানোতে তার হাতও খুব মিঠে।

বিনয়ের কথা ওঠাতে দীপক বলল—সত্যি, বিনয়ের বিয়ের কথাই আমি ভাবছিলাম। হঠাৎ যে ঈশানবাবু আবার বিয়ে করবেন এটা আমি ভাবতেই পারিনি। তবে শঙ্করকে মানুষ করে তুলতে গেলেও ত একজন নারীর প্রয়োজন, অশোক।

অশোক বাধা দিয়ে দৃঢ়কণ্ঠে বলল—তোমার কথা বাদ দাও দীপকদা। ওরকম সুন্দরী, বিদুষী গায়িকার দ্বারা ছেলে মানুষ হয় না। বিনতা কাকীমার কথা কি তুমি এর মধ্যে ভুলে গেলে? যেন পবিত্র মাতৃমূর্তি! আর এ যেন কেমন! এঁকে কাকীমা বলে ডাকতে ইচ্ছে করে না।

সেটা ঠিক সেজন্যে নয়, অশোক। দীপক বলল--এর কারণ অন্য। মায়া দেবী প্রায় তোমার সমবয়সী। বরং তুমিই বোধ হয় তাঁর চেয়ে দু-এক বছরের বড় হবে। সেজন্যই ওঁকে তুমি ঠিক গুরুজন বলে ভাবতে পারছ না। তবে ধীরে ধীরে ওটা সয়ে যাবে।

দীপকের কথায় অশোক যেন সন্তুষ্ট হলো না। বলল—আচ্ছা চলি দীপকদা। দেখি, ওদিকে খাবার যোগাড় কতটা হলো। শঙ্করটাও নিচের ঘরে মন খারাপ করে বসে আছে, তার দিকেও একটু দেখতে হবে।

আর কথা না বাড়িয়ে ধীরে ধীরে অশোক হলঘরের দিকে চলে যায়।

অশোক চলে যেতে দীপক কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। সত্যি কথা বলতে গেলে ঈশান মিত্রের এই দ্বিতীয়বার বিয়ে সারা পরিবারের বুকেই একটা অশান্তির ছায়া বয়ে নিয়ে এসেছে। কিন্তু কেন? হয়ত এরা প্রত্যেকেই আশা করেছিল ঈশান মিত্র মৃত্যুর পূর্বে উইল করে শঙ্করের সাথে এদের প্রত্যেককেও তাঁর অগাধ সম্পত্তির কিছু কিছু অংশ দান করতে পারেন। কিন্তু ঈশান মিত্রের এই দ্বিতীয়বার বিবাহ তাদের সে আশাকে সম্পূর্ণ নির্মূল করেছে।

তা ছাড়া ঈশান মিত্রের দ্বিতীয়া স্ত্রী মায়া দেবী অপূর্ব সুন্দরী। যে কোনও পুরুষকে সম্পূর্ণ বশীভূত করবার ক্ষমতা তাঁর আছে। তাই দ্বিতীয়া স্ত্রীর প্রতি তাঁর আকর্ষণ প্রথমা স্ত্রীর চেয়েও অনেক বেশি হবে বলেই তাদের ধারণা। এক্ষেত্রে মায়া দেবীর কোনও সন্তান হলে সেই যে সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে তাও কারও অজানা নয়। শঙ্কর হয়ত পাবে সামান্য একটা অংশ, আর তারা ত এক কপর্দকও নয়।

দীপক দীর্ঘশ্বাস ফেলল। সত্যি, বিষয়-সম্পত্তি আর টাকাই মানুষের সত্যিকারের প্রবৃত্তির অনেক উপরে আজ স্থান পেয়েছে। কিন্তু কেন? মানুষের জন্যেই টাকা। টাকার জন্যে ত আর মানুষ নয়!

পার্কের দিক থেকে এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া বয়ে গেল। আকাশে মেঘের ফাঁকে ফাঁকে চাঁদের লুকোচুরি খেলা চলেছে। ডেকে উঠল কোন্ একটা রাতজাগা পাখী।

হঠাৎ দীপকের চমক ভাঙল।

হলঘরে অতিথিদের কলগুঞ্জন থেমে গেছে। সবাই বোধ হয় ডাইনিং রুমে। সে যে কি করে এতক্ষণ এভাবে তন্ময় হয়ে ছিল তা নিজেই ভেবে পেল না।

হলঘরে প্রবেশ করতেই তার হঠাৎ দেখা হয় মনোরমার সঙ্গে। মনোরমার সঙ্গে আগে দীপকের সামান্য পরিচয় ছিল। মনোরমা ঈশান মিত্রের প্রথম পক্ষের স্ত্রী বিনতা দেবীর বোন। বিনতা দেবীর কঠিন অসুখের সংবাদ পেয়ে দু'বছর আগে সে পিতৃগৃহ থেকে এখানে এসেছিল। তারপর দিদির আকস্মিক মৃত্যু ঘটে যাওয়ায় সে এই পরিবারেই থাকতে বাধ্য হয়। সে অল্পবয়সেই বিধবা হয়েছিল। তাই পিতৃগৃহেও খুব ভাল ব্যবহার পেত না। বরং ঈশান মিত্রের জীর্ণ সংসার-তরীর হালটা বেশ দৃঢ়মুষ্টিতে ধরেছিল বলে, এ সংসারে তার যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। মনোরমা নিঃসন্তান। তাই শঙ্করকে সে খুবই স্নেহ করত। মনোরমার স্নেহযত্নে শঙ্কর কোন দিনই মায়ের অভাব বুঝতে পারেনি এতটুকুও।

মনোরমার এ সংসারে দীর্ঘদিন থাকার আরও একটা কারণ ছিল। এটা অবশ্য দীপক কাণাঘুষায় শুনেছে—খুব বেশি বিশ্বাস করেনি। ঈশান মিত্রের বড় ভাইপো, অশোকের দাদা অমল নাকি বালবিধবা মনোরমার প্রতি কিছুটা আসক্ত হয়েছিল। এমন কি, বিধবাবিবাহটা সামাজিক অনুশাসনের দিক থেকে উচিত কিনা এ নিয়ে সে এককালে যথেষ্ট গবেষণা করেছে। কিন্তু তারপর যে কি কারণে দুজনের বিবাহটা ঘটে ওঠেনি তা দীপকের অজ্ঞাত।

মনোরমা দীপককে দেখে কেমন যেন থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। দীপকের এই ধরনের আকস্মিক আবির্ভাব যেন সে ঠিক আশা করেনি।

দীপক বলল—মনোরমা দেবী যে!

মনোরমা আল্‌তো হাসিতে মুখখানা ভরিয়ে তুলে বলল—হ্যাঁ, নিচের ডাইনিং রুমে অতিথিরা সব ভিড় করেছেন, তাই দোতলায় উঠে এলাম। তারপর আপনি যে এখানে? খেতে যাননি কেন?

দীপক হেসে বলল—আমি ত আপনাদের ঘরের লোক। একসময় খেতে গেলেই হলো।

মনোরমা হেসে বলল—কিন্তু তিন বছরের মধ্যে ত এ বাড়িতে পা দেবার সময় পাননি। আমরা বেঁচে আছি কিনা, সেদিকেও নজর দেবার অবকাশ হয়নি আপনার। আপনি অদ্ভুত লোক কিন্তু।

দীপক বলল—সত্যি, বাবা মারা যাবার পর আমি কেমন যেন অন্য মানুষ হয়ে গেছি! কলরব আর হৈ চৈ ত ভাল লাগেই না, বরং কেমন যেন একটা নিরালার দিকেই ঝুঁকে পড়ছে আমার মন। আর ঠিক সেই জন্যেই অতিথিদের সঙ্গে ডাইনিং রুমে না গিয়ে পাশের ব্যাল্‌কনিতে একা দাঁড়িয়েছিলাম।

মনোরমা বলল—বুঝেছি দীপকবাবু, আপনি আজকাল 'পোয়েট্' হয়ে উঠছেন।

দীপক বলল—ঠিক উল্‌টো মনোরমা দেবী। আমি হয়ে উঠছি কেমন যেন পেসিমিস্ট। আনন্দ-কোলাহল—বিশেষ করে এ ধরণের সামাজিক ফাংশানকে উপলক্ষ করে যে উচ্ছ্বাস, এ সবের দিকে আর ঝুঁকতে চায় না আমার মন।

মনোরমা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গিয়ে বলল—এটাকে কি আপনি একটা ফাংশান বলে মনে করেন দীপকবাবু?

দীপক মনোরমাকে বাজিয়ে দেখবার ইচ্ছা নিয়ে বলল—নয় কেন শুনি?

মনোরমা বলল—এটা হচ্ছে কোনও একজন খামখেয়ালী প্রৌঢ়ের বিলাস চরিতার্থ করবার ইচ্ছা।

এতটা বাড়াবাড়ি দীপকের ভাল লাগছিল না। সে বলল—এটা কিন্তু আপনি ঠিক 'ব্যালেন্সড' মন থেকে বলছেন না মনোরমা দেবী।

তা ছাড়া আর কি বলব দীপকবাবু?

দেখুন, বিবাহ করবার পক্ষে ঈশানবাবুর বয়সটা একটু বেশি হয়েছে স্বীকার করি, কিন্তু সেটা এমন কিছু নয়। তিনি ত আর ঠিক ষাট বছরের বুড়ো হননি এখনও। তা ছাড়া বুড়োবয়সের একটা অবলম্বন হিসেবেও বিয়ে করা তাঁর অনুচিত নয়।

যাক্, এ সম্বন্ধে বেশি কথা আমি বলতে চাই না দীপকবাবু। আশা করি এখন এ আলোচনা বন্ধ রাখাই বাঞ্ছনীয়।

বেশ। এ আলোচনা আপনার অপ্রিয় হলে, ও সম্বন্ধে আর কিছু বলব না আমি।

আপনি আমার সঙ্গে আসুন দীপকবাবু। আমি আপনার খাবার ব্যবস্থা করে দিয়ে শঙ্করের ঘরে যাব। ও আবার আমার পাশে না শুলে ঘুমোতে চায় না। উঃ, এ রকম একটা ছেলের মুখের দিকে চেয়েও যে মানুষ নতুন বিয়ে করা থেকে বিরত থাকল না, তাকে কি আপনি সত্যিকারের উদারমনা পুরুষের দলে ফেলবেন?

দীপক আর কথা না বাড়িয়ে নিচে নেমে গেল।

—দুই—

নিচে নেমে এসে দীপক সবে খেতে বসেছিল। অন্য অতিথিরা খাওয়া-দাওয়া শেষ করে বসেছিল গিয়ে বাইরের ঘরে। যাদের শীগ্‌গির বাড়ি ফেরা প্রয়োজন তারা চলে যায় বাড়ি। অন্য সকলে তাস ইত্যাদি খেলা নিয়ে মেতে উঠেছিল।

ঠিক এমনি সময় দোতলার ঘরে শোনা গেল এই আর্ত চীৎকার।

সকলেই ছুটে গেল দোতলার ঘরের দিকে।

ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে সকলে দেখতে পেল মনোরমা দেবী মেঝের ওপর লুটিয়ে পড়েছে। দেহ নিস্পন্দ। কোথাও প্রাণের চিহ্নমাত্রও অবশিষ্ট আছে বলে বোঝা গেল না। হাতে ছিল একখানা বই। বোধ হয় সে কিছুক্ষণ আগেও বইখানা পড়ছিল। সেটা একপাশে খোলা অবস্থায় পড়ে রয়েছে।

দীপক ঘরের মধ্যে প্রবেশ করেই বলে উঠল—দেখুন, আপনারা কোনও জিনিসপত্রে হাত দেবেন না। কারণ পুলিশ এসে এগুলো দিয়ে তদন্ত করবে এবং প্রত্যেকটি জিনিস বেশ ভাল করেই দেখা হবে।

পুলিশ? উপস্থিত অতিথিদের মুখে একসঙ্গে প্রশ্ন ফুটে উঠল।

হ্যাঁ, দীপক বলল, প্রথমে একজন ডাক্তারকে ডাকা প্রয়োজন। আর পুলিশেও ফোন করা উচিত। আচ্ছা, সে সব ব্যবস্থা আমিই করছি। এটা একটা খুনের কেস বলেই মনে হচ্ছে।

খুন? মানে মার্ডার! আশ্চর্য! সকলের মুখ দিয়ে যেন একটি কথাই ধ্বনিত হলো।

হ্যাঁ, আমার তাই মনে হচ্ছে।

কিন্তু...

সেই কিন্তুর নিরসনের জন্যেই পুলিশে ফোন করতে বাধ্য হলাম।

ওঃ...

সকলেই ঘর থেকে একে একে বেরিয়ে গেল।

আপনারা প্রত্যেকেই নিচের ঘরে বসুন। কেউ চলে যাবার চেষ্টা করবেন না।

দীপকের স্বরটা কঠোর বলে মনে হলো।

সোজা নিচে নেমে এলো দীপক, টেলিফোনের সাম্‌নে গিয়ে রিসিভার তুলে নিল—হ্যালো পুট্ মি টু বি বি...

হ্যালো, কে?

আমি চ্যাটার্জী কথা বলছি।

ও, দীপক...

ঠিকই অনুমান করেছেন ডাঃ লাহিড়ী।

তারপর হঠাৎ কি ব্যাপার বলো ত!

আপনি জানেন ডাঃ লাহিড়ী যে কিছুদিন হলো আমি ডিটেকশনকে আমার জীবনের অন্যতম একটি প্রফেশন হিসেবে গ্রহণ করেছি।

হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়ছে বটে।

সম্প্রতি রায়সাহেব ঈশান মিত্রের বাড়িতে তাঁর বিয়ের নিমন্ত্রণ খেতে এসেছি। কিন্তু 'ঢেঁকি স্বর্গে গিয়ে ধান ভানে', জানেন ত? এখানে এসেও দেখছি সেই ব্যাপার! এখন কেসটা পরীক্ষা করবার জন্যে আপনি যদি দয়া করে...

নিশ্চয়ই! আমি সবসময়েই তোমাকে সাহায্য করবার জন্যে প্রস্তুত...

ধন্যবাদ।

এখুনি আসছি।

ফোন ছেড়ে দিয়েই দীপক স্থানীয় থানার সঙ্গে সংযোগ চাইল।

ফোন তুললেন স্থানীয় থানার দারোগা ভজহরিবাবু।

হ্যালো, কে?

আমি দীপক চ্যাটার্জী কথা বলছি রায়সাহেব ঈশান মিত্রের বাড়ি থেকে। আপনি?

আমি ভজহরি সামন্ত ..

ওহো ভজহরিবাবু, আপনি!

হ্যাঁ। তারপর ব্যাপার কি মিঃ চ্যাটার্জী?

রায়সাহেব ঈশান মিত্রের বিয়েতে আমি এখানে নিমন্ত্রিত হয়েছিলাম। কিন্তু এদিকে একটা মারাত্মক ব্যাপার সংঘটিত হয়েছে।

কি ধরণের?

বোধ হয় এটা একটা কেস অব্ মার্ডার।

ও, আচ্ছা আমি যতো শীঘ্র পারি আসতে চেষ্টা করছি। আপনি ওখানেই থাকবেন ত?

হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই।

ধন্যবাদ। আশা করি আপনার কাছ থেকে উপযুক্ত সাহায্য আমি পাব।

ফোন ছেড়ে দিয়ে দীপক ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে একটু পরেই শুনতে পেল ডাঃ লাহিড়ীর মোটরকার বাইরে পার্ক করছে।

দীপক ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা করে ভেতরে নিয়ে এলো।

সর্বপ্রথমে মৃতদেহ কে দেখতে পায় দীপক?

সেটা ঠিক জানি না। আচ্ছা দেখছি...

একতলার যে ঘরে সকলে বসেছিল সেখানে প্রবেশ করে দীপক প্রশ্ন করল—আচ্ছা, আপনাদের মধ্যে কে সর্বপ্রথম মৃতের ঘরে প্রবেশ করেছিলেন?

উত্তর দিল রায়সাহেব ঈশান মিত্রের ভাইপো অমল।

বলল—আমিই সর্বপ্রথম ওঁর চীৎকার শুনে ওঁর ঘরে প্রবেশ করেছিলাম।

আপনাকে ডাক্তারবাবু কয়েকটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে চান।

বেশ, বলুন।

ডাঃ লাহিড়ী অমলের দিকে চেয়ে প্রশ্ন কবলেন—আপনি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে প্রথমে কি দেখতে পেলেন?

অমল বলল—মনে হলো মৃত্যুর আগে উনি কিছু বলতে চেয়েছিলেন। ঠোঁটদুটো বারকয়েক কেঁপে কেঁপে উঠেছিল শুধু।

তাবপব?

তারপরেই উনি ঢলে পড়েন। আর কোন স্পন্দনই পাওয়া যায়নি।

বেশ, ওতেই চলবে।

ডাক্তার লাহিড়ী যে ঘরে মৃতদেহ ছিল সেই ঘরখানাব দিকে পা বাড়ালেন।

দীপকও তাঁর অনুগমন কববার আগে অমলেব দিকে ফিবে প্রশ্ন কবল—কোনও লোক বাড়ি থেকে বের হয়নি ত?

না। আমি, অশোক, বিনয়, শঙ্কর, কাকা, নতুন কাকীমা, নতুন কাকীমার ভাই অবনীবাবু, ঝি, চাকর ইত্যাদি আর অতিথিবা সকলে নিচেব ঘবে আছেন।

খুনেব সময় যাঁরা যাঁরা বাড়িতে উপস্থিত ছিলেন পুলিশ তাঁদেব সকলের সঙ্গেই হয়ত দেখা কবতে চাইবে। কাজেই. .

বুঝেছি।

আব একটা কথা অমলবাবু।

কি কথা বলুন।

যদি এই ব্যাপাবেব তদন্ত কবতে কবতে কোনও বিশ্রী অথবা স্ক্যাণ্ডেলাস ব্যাপাব বেব হয়ে পড়ে, অথবা পবিবাবেবই কোনও লোক এই খুনেব সঙ্গে যুক্ত বলে প্রমাণিত হয়, তবে তাকে আইনের হাত থেকে বাঁচাতে পাবব না।

পাশে দাঁড়িয়েছিল অমলেব ভাই অশোক, সে বাধা দিয়ে বলল—তাতে আপত্তি নেই দীপকদা। দীর্ঘ দু'বছর যিনি এই সংসাবেব হাল দৃঢ়মুষ্টিতে ধবেছিলেন, যাঁব নিপুণ যত্নে আমরা কোনও কষ্ট, কোনও অভাব বুঝতে পাবিনি, তাঁকে যে এভাবে হত্যা কবতে পাবে তাব উপযুক্ত শাস্তি পাওয়াই উচিত।

দীপক কোনও কথা না বলে চলল উপরেব ঘরেব উদ্দেশ্যে।

—তিন—

ডাঃ লাহিড়ী বেশ কিছুটা চিন্তা না কবে কখনও নিজেব মতামত প্রকাশ কবতে চান না।

দীপক চুপ করে দাঁড়িয়েছিল তাঁর পাশে। সমস্ত দেহটা বেশ ভাল কবে পবীক্ষা করে দেখে তিনি বললেন—তোমার কল্পনাটা মিথ্যা নয় দীপক।

অর্থাৎ?

সাধারণ লোকে এটাকে হার্টফেল বলে ভুল করতে পাবে, কিন্তু ব্যাপাবটা তা নয়।

আসল রহস্যটা তবে কি?

এই যে পিঠের দিকে তিনটে সরু সরু ছুঁচ ফোটার চিহ্ন দেখতে পাচ্ছো?

হ্যাঁ!

এই দেখ এই ক্ষতের মুখে তিনটি রক্তের বিন্দু জমাট বেঁধে আছে।

এটাই কি হত্যাকাণ্ডের আসল রহস্য?

আপাতত মনে হচ্ছে তাই। বোধ হয় সরু ছুঁচের মতো যন্ত্রের আগায় তীব্র অর্গ্যানিক বিষ মাখিয়ে

ওঁর শরীরে তা ফুটিয়ে দেওয়া হয় আর তাতেই ওঁর মৃত্যু ঘটেছে। অবশ্য আমি এখনও নিঃসন্দেহ নই। তাই লাস মর্গে পাঠান উচিত। আশা করি পুলিশ এসেই সে ব্যবস্থা করবে।

হ্যাঁ, পুলিশেও সংবাদ দিয়েছি আমি। স্থানীয় থানার দারোগা ভজহরিবাবু আমার বন্ধু। তিনি এক্ষুণি এসে পড়বেন।

ঘরের কোনও জিনিসপত্রে হাত না দিয়ে ওঁরা দুজনে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।

ঈশান মিত্রের বাড়িতে পা দিয়েই যে জিনিসটা ভজহরিবাবুকে অবাক্ করল তা হচ্ছে বাড়িখানার থম্‌থমে গাম্ভীর্য। সামান্য কিছু আগে যে এখানে একটা আনন্দকোলাহলময় ঘটনা ঘটেছিল তার সামান্য রেশও এখন আর কোথাও পাওয়া যায় না।

ড্রইংরুমে পা দেবার আগেই তাঁর দেখা হলো দীপকের সাথে।

এই যে মিঃ চ্যাটার্জী, তারপর খবর কি বলুন!

ওপরের ঘরে ঘটনাটা ঘটেছে। চলুন ওদিকে যাওয়া যাক। হ্যাঁ, ইনি হচ্ছেন ডাঃ লাহিড়ী। এঁর অভিমত হচ্ছে যে মনোরমা দেবীর দেহে অর্গ্যানিক বিষ ফুটিয়ে দিয়ে ওঁকে হত্যা করা হয়েছে। আর মৃত্যুটাও একটা নিকষকালো রহস্য-যবনিকার আড়ালে এমন ভাবে ঘটে গেছে যে আমরা বিন্দুবিসর্গও টের পাইনি।

ভজহরিবাবু বললেন—আচ্ছা, এ ব্যাপারের কিনারা করবার জন্যে আপনার সাহায্য কি আমি পেতে পারি দীপকবাবু?

দীপক বলল—না, আমি আমার নিজের ধারায় তদন্ত করে যাব ভজহরিবাবু। তবে শেষ মুহূর্তে আপনার সাহায্য আমার অবশ্যই প্রয়োজন হবে। যাক, চলুন আমরা আগে যে স্থানে হত্যাকাণ্ডটা অনুষ্ঠিত হয়েছে সেই অকুস্থলটা দেখে আসি। তারপর এই ঘরে বসে প্রত্যেককে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে প্রশ্ন করতে হবে। সকলকে এক জায়গায় নিয়ে এলোমেলো প্রশ্ন করলে চলবে না ভজহরিবাবু।

ভজহরিবাবু বললেন—হ্যাঁ, তা ত বটেই। বেশ চলুন, যে ঘরে হত্যাকাণ্ডটা সংঘটিত হয়েছে সেখানে যাই।

যে ঘরে মনোরমার মৃতদেহটা রাখা ছিল সেটা আকারে খুব বড় নয়। একটা চাদর দিয়ে মনোরমার সারাদেহ আবৃত ছিল। দীপক এক মিনিট ভেবে প্রশ্ন করল—আচ্ছা, উনি চীৎকার করে ওঠবার পর আশা করি ঘরের কোনও জিনিসই সরানো হয়নি?

দীপকের সঙ্গে বিনয় এবং অমলও এসেছিল ঘরের মধ্যে। অমল বলল—না দীপকবাবু। চীৎকার শুনে আমিই সর্বপ্রথম ঘরের মধ্যে প্রবেশ করেছিলাম। কিন্তু আমি কোনও জিনিসই নাড়াচাড়া করিনি। আমার পর যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা কেউ কোনও জিনিস নাড়াচাড়া করেননি।

দীপক ভাল করে ঘরের চারদিকে চেয়ে দেখল। জিনিসপত্র কোনও কিছুই অগোছালো অবস্থায় নেই। মনোরমা দেবী মৃত্যুর পূর্বে অথবা আহত হবার পূর্বে খুনীর সঙ্গে ধস্তাধস্তি করেছিলেন এমন কোনও প্রমাণ পাওয়া গেল না। মনোরমা দেবী যে বইখানা পড়ছিলেন সেটা ছিল টেবিলের ওপর উল্‌টানো অবস্থায়।

ঘরের সমস্ত স্থান তন্ন তন্ন করে খুঁজেও কোন সূত্র মিলল না। দীপক ভজহরিবাবুর দিকে চেয়ে বলল—নিশ্চয়ই ওঁর কোন অতিপরিচিত ব্যক্তি ওঁকে আকস্মিকভাবে আক্রমণ করেছিল।

সেকি?

হ্যাঁ. উনি আকস্মিকভাবে আক্রান্ত হয়ে এমন হতভম্ব হয়ে যান যে, আত্মরক্ষা করবার কোনও চেষ্টাই করেননি। তার কারণ এই যে, যে লোক ওঁকে খুন করেছে সে যে খুন করতে পারে এ ধারণাই মনোরমা দেবীর কল্পনায় স্থান পায়নি।

ভজহরিবাবু কোনও উত্তর দিলেন না।

দীপক এবার ঘরের মেঝের দিকে দৃষ্টি দিল। সমস্ত মেঝেটা তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখল সে। কোথাও কোনও জিনিসের অস্তিত্ব চোখে পড়ল না তার। হঠাৎ ঘরের এককোণে ঠিক ইন্‌জেকসনের ভাঙ্গা এম্পুলের মত কি একটা জিনিস দেখতে পেয়ে সেটা তুলে নিয়ে পকেটে রাখল দীপক।

ভজহরিবাবু বললেন—ওটা কি দীপকবাবু?

দীপক বলল—এখনও ঠিক জানতে পারিনি। জানতে পারলে পরে আপনাকে অবশ্যই জানাব।

দীপক হঠাৎ অমলের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল—আচ্ছা, এ বাড়িতে সায়েন্স স্টুডেণ্ট অর্থাৎ বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশুনো করে এমন কে আছে?

অমল বলল—একমাত্র বিনয়দা বিজ্ঞান নিয়ে কিছু কিছু পড়াশুনো করেন। নিচের তলায় লাইব্রেরী ঘরে আগে বৈজ্ঞানিক বিষয়ের কোনও বই ছিল না। বিনয়দাই প্রথম পদার্থ ও রসায়নবিদ্যার অনেকগুলি বই কিনে এনে লাইব্রেরীতে রেখেছেন।

দীপক কোনও উত্তর দিল না। শুধু বলল—লাসটা এক্ষুণি মর্গে পাঠাবার ব্যবস্থা করুন ভজহরিবাবু।

ভজহরিবাবু বললেন—আচ্ছা। চলুন যাওয়া যাক এখান থেকে। পরে সব ব্যবস্থা করছি।

দীপক বলল—না, আঘাতের স্থানটা একবার দেখতে হবে। নিশ্চয়ই অত্যন্ত শক্তিশালী কোনও বিষের সাহায্যে ওঁর মৃত্যু ঘটানো হয়েছে বলে মনে হচ্ছে।

ভজহরিবাবু বলেন—সে কথা স্বীকার করতে আমি বাধ্য। আহত হবার পর মিনিট দুয়েকের মধ্যেই ওঁর মৃত্যু ঘটেছে।

দীপক হেসে বলল—তাহলে বুঝতে পারছেন ভজহরিবাবু, যে আততায়ীর টক্সিকোলজি অর্থাৎ বিষসংক্রান্ত রসায়ন সম্বন্ধে কতো নিখুঁত জ্ঞান রয়েছে!

সে ত বটেই। কিন্তু ওর থেকে আপনি কি ডিডাক্‌শন করছেন?

দীপক হেসে বলল—কিছুই না। চলুন আমরা পাশের ঘরে যাই। সকলের আগে অমলবাবুই আমাদের সঙ্গে আসুন। গোটাকয়েক কথা আপনাকে প্রথমে জিজ্ঞাসা করব কারণ আপনিই প্রথম মৃতদেহ দেখতে পান।

—চার—

দীপক আর ভজহরিবাবু পাশাপাশি বসে অমলকে প্রথমে প্রশ্ন করতে সুরু করলেন। ভজহরিবাবু গোটাকতক সাধারণ প্রশ্ন করবার পর দীপক অমলের দিকে চেয়ে হঠাৎ প্রশ্ন করল—আচ্ছা, আপনি কি বলতে পারেন কাল যখন শব্দ শুনে আপনি ছুটে যান তখন বিনয়বাবু কোথায় ছিলেন?

অমল একটু ভেবে বলল—বিনয়দা তখন বোধ হয় নিচের হলঘরে ছিলেন। তবে সেটা আমি আন্দাজে বলছি। আমি কুড়ি মিনিট আগে ওঁকে অবশ্য হলঘরে দেখেছিলাম। তবে সেই সময় উনি কোথায় ছিলেন তা আমি ঠিক করে বলতে পারি না।

দীপক বলল—আচ্ছা, আর একটা প্রশ্ন করছি, যদিও সেটা একটু অন্য ধরণের হবে। আপনার কাকার এই দ্বিতীয়বার বিয়েতে কি মনোরমা দেবী খুব অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন?

তা কিছুটা হয়েছিলেন বৈকি!

কারণ?

শঙ্করকে তিনি নিজের ছেলের মতোই ভালবাসতেন। তার কথা চিন্তা করে আর বিনতা কাকীমার কথা ভেবেই তিনি দুঃখ পেয়েছিলেন সবচেয়ে বেশি।

বুঝেছি। আচ্ছা কিছুদিন আগে আপনি মনোরমা দেবীর প্রতি কিছুটা আসক্ত হন বলে শুনেছি। সে কথাটা কতদূর সত্যি? অবশ্য এই 'পার্সোন্যাল' কথাটা আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে আমি বাধ্য হচ্ছি বিশেষ একটা কারণেই।

খানিকটা সত্যি। এমন কি, একসময় আমি ওঁকে বিয়ে করব বলেও মনে মনে স্থির করেছিলাম।

এটাও শুনেছি। কিন্তু বিয়ে করেননি কেন?

কাকা বলেন যে, আমি যদি বিধবা-বিবাহকে সামাজিক দিক থেকে নিজের জীবনে বরণ করে নিই, তবে আমি তাঁর কাছ থেকে জীবনে আর কোন সাহায্যই পাব না।

ও, ঈশানবাবুর কথা শুনেই আপনি তবে ও কাজ থেকে বিরত থাকেন। তাই না?

হ্যাঁ।

আপনাদের মধ্যে মনোমালিন্য কিছু ঘটেনি?

আমাদের মধ্যে মানে?

মানে আপনার আর মনোরমা দেবীর মধ্যে।

মনোমালিন্য ঠিক নয়, একটু মতান্তর ঘটেছিল সেই সময়। মনোরমাও আমার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল সে সময়। সে আমাকে বলে যে আমরা যেন এ বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র যাই এবং তাকে বিয়ে করি। কিন্তু আমি ঠিক তাতে মত দিই না। সে তখন আমাকে ভীরু বলে উপহাসও করেছিল।

সে কতদিন আগেকার কথা?

তা বছর দেড়েক ত বটেই। কিংবা তার কিছু কম হতে পারে।

আচ্ছা, বিনয়বাবুকে আপনার কি রকম মনে হয়?

আপনার এ প্রশ্নের অর্থ?

অর্থ হচ্ছে এই যে তাঁর স্বভাবচরিত্র কি ধরণের ছিল বলে আপনার জানা আছে।

স্বভাবচরিত্র ভাল ছিল সবদিক থেকেই। মোটামুটি তিনি পড়াশুনো নিয়েই সারাদিন কাটাতেন। পড়াশুনোর প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল অসীম।

ও ছাড়া আর কোনও কিছু জানেন না আপনি?

না, তেমন কিছু ত...

আপনি কিছু কিছু কথা লুকোচ্ছেন অমলবাবু। এভাবে কিছু কথা যদি আপনি না বলেন অথবা আমাদের ভুল দিকে পরিচালিত করেন তাহলে আসল হত্যাকারীকে খুঁজে বের করতে আমাদের প্রচুর বেগ পেতে হবে।

জানি দীপকবাবু। আর জানি বলেই বলছি, এ ব্যাপারের সঙ্গে এ হত্যাকাণ্ডের কোনও যোগাযোগ নেই।

দীপক হেসে বলল—বেশ। আপনি না বললেও কথাটা আমি অবশ্যই বিনয়বাবুর কাছ থেকে বের করে নিতে পারব। যাক সে কথা। আপনি এক্ষুণি বিনয়বাবুকে পাঠিয়ে দিন। আমি তাঁকেও কতকগুলি প্রশ্ন করতে চাই।

অমল দুজনের মুখের দিকে একবার চেয়ে ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

বিনয়ের দিকে চেয়ে দীপক সর্বপ্রথমেই যে প্রশ্নটি করে বসল তার জন্যে দারোগা ভজহারবাবু প্রস্তুত ছিলেন না।

দীপক অকস্মাৎ যেন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছে এই ধরণের ভাব মুখে ফুটিয়ে তুলে বলল—ছি ছি, আপনি যে সম্প্রতি এ ধরণের বন্ধুদের সঙ্গে মিশে এভাবে অধঃপাতে যেতে পারেন তা আমি আশা করিনি বিনয়বাবু। আমি আপনাকে শিক্ষিত ও উদারমনা বলে জানতাম। আর শিক্ষার প্রতি আপনার অসীম আগ্রহ দেখে আমি খুব আনন্দিত হয়েছিলাম। কিন্তু অমলবাবুর মুখে যা শুনলাম...

বিনয়ের মুখ যেন পাংশুবর্ণ ধারণ করল। সে অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল—দেখুন দীপকবাবু, মানুষমাত্রেরই মনে তার সাধারণ প্রবৃত্তিগুলো থাকবেই। উপযুক্ত বয়সেও যখন আমার বিয়ে দেবেন না বলে মামা স্থির করলেন, তখন মাঝে মাঝে সামান্য একটু স্ফূর্তির জন্যে বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে মেলামেশাটাকে আপনি খারাপ নজরে দেখতে পারেন না।

দীপক বলল—না, মদ্যপানাসক্ত ও চরিত্রহীন লোকদের আমি ঘৃণা করি বিনয়বাবু। আমার মনে হয় মানুষ ইচ্ছা করলেই নিজের মনোমত নিজেকে পরিচালিত করতে পারে। এই যে অত্যন্ত অল্পদিন হলো কুসংসর্গে পড়ে আপনি বিপথগামী হতে চলেছেন, এতে আপনার সমস্ত সদ্‌গুণের মূলে কালিমা লেপিত হচ্ছে না কি?

বিনয় কোনও উত্তর না দিয়ে মুখ নিচু করল।

দীপক প্রশ্ন করল—আচ্ছা, ঈশানবাবু যে দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন, তাতে কি আপনি তাঁর প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করেছিলেন?

বিনয় বলল—শুধু আমি নয়, অশোক, অমল, মৃতা মনোরমা,—সকলেই এই ব্যাপারটাতে কম-বেশি অসন্তুষ্ট হয়েছিল।

আচ্ছা, আপনি বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করছেন কতদিন?

গবেষণা বললে ভুল হবে—শুধু স্টাডি। তা প্রায় বছর তিন-চারের কম নয়।

আপনি ইউনিভার্সিটি জীবনে ছিলেন আর্টস্ স্টুডেন্ট, কিন্তু এভাবে প্রাইভেটলি সায়েন্স মানে বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশুনো করছিলেন কেন?

এটাকে আমার 'হবি' মানে খেয়াল বলতে পারেন।

মনোরমা দেবীকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করা হয়েছে তা আপনি জানেন?

ডাক্তার ত তাই বললেন।

যদি বলি সেই বিষটার প্রয়োগ ব্যাপারে আপনার হাত ছিল? মানে এ বাড়িতে ত আর কেউ বৈজ্ঞানিক ব্যাপারে ততটা ওয়াকিবহাল নয়।

কিন্তু আমার কি স্বার্থ ছিল যে মনোরমাকে আমি বিষপ্রয়োগ করতে যাব? বিনা কারণে এতবড়ো একটা ক্রাইম্ কোনও সুস্থমস্তিষ্ক মানুষই করতে পারে না দীপকবাবু। আর আমার মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্বন্ধে আশা করি আপনার সন্দেহের অবকাশ নেই।

ও কথা বাদ দিন বিনয়বাবু। বাড়ির কারোও সঙ্গে কি সম্প্রতি মনোরমা দেবীর কোনও মনোমালিন্য হয়েছিল বলে স্মরণ হয় আপনার?

একটু চিন্তা করে বিনয় বলল—না, সে রকম কারও কথাই ত স্মরণ হয় না। তবে একটা কথা শুধু যেন একটু মনে পড়ছে। নতুন মামীমা ত কাল মাত্র এ বাড়িতে এসেছেন। আর আজ হচ্ছিল বৌভাতের উৎসব। কিন্তু আজ সকালে যেন কি একটা ব্যাপার নিয়ে নতুন মামীমার সঙ্গে ওঁর সামান্য একটু তর্কবিতর্ক হয়েছিল। অবশ্য ব্যাপারটা তত সাংঘাতিক কিছু নয়। কি ব্যাপার উপলক্ষ করে এই গোলযোগটা ঘটে তাও আমি জানতে পারিনি।

আর কেউ কি এ সম্বন্ধে বলতে পারে?

এ কথাও মামীমা ছাড়া আর কেউ বলতে পারে না।

আচ্ছা, যখন হত্যাকাণ্ডটা সংঘটিত হয়, তখন মায়া দেবী কোথায় ছিলেন তা কি জানেন আপনি?

উনি যে ঘরে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে তার পাশের ঘরে সেলাই, মানে এম্‌ব্রয়ডারী নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন।

চীৎকার শুনে তিনি ছুটে যাননি?

হ্যাঁ, অমলের পরেই তিনি ছুটে এসেছিলেন।

আচ্ছা, অমলবাবুকে আপনার কি রকম মনে হয়?

কেন? মোটামুটি ভালই লাগে ওকে।

সে কথা নয়। তাঁর সঙ্গে কিছুদিন আগে মনোরমা দেবীর যে বিয়ের কথা হচ্ছিল সেই ব্যাপারের কথা বলছি।

সেটা এমন কিছু নয়! মামার অমত ছিল বলে বিয়েটা ঘটে ওঠেনি, এই আমি জানি।

মায়া দেবীর ভাই অবনীবাবু তখন কোথায় ছিলেন?

তিনি বললেন যে তিনি নিচের লাইব্রেরী ঘরে ছিলেন। তাঁর আসতে তাই একটু দেরী হয়েছিল।

আচ্ছা আপনাকে আর কোনও প্রশ্ন করতে চাই না বিনয়বাবু। যদি কোনও প্রয়োজন থাকে পরে জিজ্ঞাসা করব। এখন শুধু মায়া দেবী আর অবনীবাবুকে গোটাকয়েক প্রশ্ন করেই আমার কাজ শেষ আজকের মত। প্রথমে আপনি মায়া দেবীকে পাঠিয়ে দিন, গোটাকয়েক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করব তাঁকে।

বিনয় ঘাড় নেড়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

দীপক ওর গমনপথের দিকে চেয়ে আপন মনেই বলে—এদের মধ্যে কে যে সত্যিকারের হত্যাকারী তা খুঁজে বের করা সত্যিই দুরূহ।

ভজহরিবাবু দীপকের কথা শুনে মৃদু হেসে ওঠেন।

—পাঁচ—

মায়া দেবী যে সুন্দরী এ কথাটা দীপক তাকে দেখেই বুঝতে পেরেছিল। তবে ঠিক সাম্‌নাসাম্‌নি তার সঙ্গে কথা বলবার সৌভাগ্য দীপকের হয়নি। এখন তাকে দেখে দীপকের এই কথাই মনে হলো যে সাধারণ কথায় সুন্দরী বললে মায়া দেবীর প্রতি অবিচার করা হয়। মায়া দেবী অপরূপ রূপলাবণ্যবতী।

মায়া দেবী ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে ধীরে ধীরে নমস্কার করে আসন গ্রহণ করল। তার চেহারা দেখে মনে হয় যে কিছুক্ষণ আগেও সে কেঁদেছে। চোখ দুটো ঈষৎ ফোলা।

দীপক মায়া দেবীর দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল—মনোরমা দেবীর সঙ্গে আপনার কি পরিচয় হয়েছিল?

মায়া দেবী গম্ভীরভাবে বলল—যে রকম সাধারণ ভাবে হয়ে থাকে ঠিক সেই রকমই।

মনোরমা দেবীকে আপনার কি রকম মনে হয়?

বাইরে থেকে তাঁকে যত সহজ ও সাধারণ বলে মনে হয়, আসলে তিনি তত সহজ ও সাধারণ ছিলেন না।

এ কথার অর্থ?

এর বেশি আমি বলতে পারব না দীপকবাবু।

আচ্ছা থাক। আপনার মনে অযথা কষ্ট দিতে চাই না আমি। শুধু একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই।

কি কথা বলুন।

আজ সকালে মনোরমা দেবীর সঙ্গে আপনার একটু মনান্তর ঘটেছিল বলে শুনলাম। সেটা ঠিক কি ব্যাপার নিয়ে তা জানতে পারি কি?

মায়া দেবী কোনও উত্তর দিল না।

দীপক বলল—এ কথাটার উপরে আমি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করছি মায়া দেবী।

মায়া দেবী হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়াল। একটু থেমে হঠাৎ সজোরে বলে উঠল—আমিই মনোরমা দেবীকে হত্যা করেছি দীপকবাবু। আপনি আমাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে চলুন।

আপনি?

দীপক আর ভজহরিবাবু একসঙ্গে বলে ওঠে।

হ্যাঁ। আমি—আমিই তাকে হত্যা করেছি। আমি নিজমুখে এ কথা স্বীকার করছি।

ঘরের মধ্যে বজ্রপাত হলেও বোধ হয় তারা অতটা চম্‌কে উঠত কি না সন্দেহ।

কিন্তু আপনার এতে ত কোনও স্বার্থ নেই মায়া দেবী। দীপক একটু ভেবে কথাটা বলে উঠল।—তা ছাড়া সবে এখানে পা দিয়ে আপনি এমন একটা কাজ কখনও করতে পারেন না।

এর বেশি আর কিছু বলতে চাই না আমি। কিছু না...

কথাটা বলে এক ঝলক হলকা হাওয়ার মত ঘর থেকে বেরিয়ে যায় মায়া দেবী। বিপুল উত্তেজনায় তার সারা দেহটা তখন যেন ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছিল।

দীপক আর ভজহরিবাবু অবাক হয়ে পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে থাকে। দীপক শুধু বলে—আশ্চর্য!

জীবনে নানা ধরণের অদ্ভুত ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়েছে দীপককে, কিন্তু এ ধরণের ঘটনা বোধ হয় এই প্রথম। এই আকস্মিক ঘটনাবলীর সম্মুখীন হয়ে সে প্রথমটা থতমত খেয়ে গিয়েছিল, কিন্তু একটু থেমে আপন মনে কি সব কথা চিন্তা করে দীপক ভজহরিবাবুর দিকে চেয়ে বলল—উনি যে মিথ্যা কথা বললেন, এ সম্বন্ধে আমি স্থির নিশ্চয় ভজহরিবাবু।

কেন?

অন্য কাউকে খুনের দায় থেকে বাঁচাবার উদ্দেশ্যে।

কিন্তু আসল খুনী কে?

তা এখনও বুঝতে পারিনি। তবে অল্পদিনের মধ্যেই যে পারব সে আশা রাখি।

কিন্তু আপনি কি করে বুঝলেন যে মায়া দেবী নির্দোষ?

বিনয়বাবুর কথা থেকে।

সেকি?

হ্যাঁ, বিনয়বাবু বলেছেন যে যখন হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়, তখন মায়া দেবী পাশের ঘরে সেলাই নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। তা ছাড়া সবে এখানে পা দিয়েই এমন কিছু ঘটতে পারে না, যা থেকে—

তা বটে।

তা ছাড়া আরও একটা কথা আছে।

কি ব্যাপার?

এত দ্রুত পরিকল্পনা করে, বিষ জোগাড় করে, সেই বিষ মনোরমা দেবীর দেহে সঞ্চারিত করবার মত যন্ত্রের ব্যবস্থা করে, ঠিক সময়ে ওঁকে হত্যা করে, তারপর সেলাই নিয়ে বসতে গেলে যে পরিমাণ শক্তিশালী নার্ভ-এর প্রয়োজন তা ছিল না মায়া দেবীর। আর, কোনও নারীর দ্বারা এটা সংঘটিত হয়েছে বলে আমার ধারণা হয় না।

তবে উনি এভাবে স্বীকারোক্তি করলেন কেন?

বললাম ত কোনও একজনকে খুনের দায় থেকে বাঁচাবার জন্যে।

কিন্তু বিনয় বা অমল বা ওঁর ভাই অবনীবাবু যেই খুনী হোক না কেন, তাকে বাঁচাবার জন্যে উনি এভাবে নিজেকে জড়িয়ে ফেলবেন, এটাই বা আপনি এত দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করছেন কেন?

ঘটনাপরম্পরা আমাকে এ কথা বিশ্বাস করতেই বাধ্য করছে ভজহরিবাবু। কিন্তু অমল বা বিনয়ের জন্যে মায়া দেবী এভাবে স্বার্থত্যাগ করবেন বলে মনে হয় না। ওঁরা দুজনেই ঈশানবাবুর এই দ্বিতীয়বার বিবাহকে সুনজরে দেখেননি। সুতরাং এবার অবনীবাবুর উপরে সন্দেহটা গিয়ে পড়া স্বাভাবিক।

কিন্তু অবনীবাবু হঠাৎ মনোরমা দেবীকে হত্যা করতে যাবেন কেন? সে রকম কোনও স্বার্থ ত ওঁর ছিল না। আর সুস্পষ্ট কোনও 'মোটিভ' ছাড়া কেউই খুন করে না।

এ কথা আমি জানি।

তবে?

সেটাই আমাদের বের করতে হবে। অবনীবাবুকে এখুনি এখানে ডেকে [illegible] কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই তাঁকে।

বেশ। আমি কিন্তু স্যার এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না, অবনীবাবু [illegible]

অবনীবাবু সম্বন্ধে সংক্ষেপে একটা কথাই বলা যায় যে, তিনি [illegible] সাধারণভাবে কোনও প্রশ্ন করেই তাঁর কাছ থেকে মামুলী উত্তর ছাড়া [illegible] গেল না।

অবশেষে কিছুক্ষণ চিন্তা করে দীপক বলল—আপনার বোন মায়া দেবী নিজেকে খুনী বলে স্বীকার করেছেন।

সেকি?—আকস্মিক এই কথাটা শুনে অবনীবাবু অদ্ভুতভাবে চম্‌কে উঠলেন। দীপক এই সুযোগেরই প্রতীক্ষা করছিল। সে এবার বলল—কিন্তু তিনি খুনী বলে আমাদের মনে হয় না আদৌ। আমরা মনে করি যে খুন করেছে তাকে রক্ষা করবার জন্যেই উনি এই মিথ্যা কথাটা বলেছেন। অর্থাৎ উনি চান না যে খুনী ধরা পড়ুক এবং তার ফাঁসি হোক।

কিন্তু খুনী কে?

যাকে বাঁচাবার জন্যে মায়া দেবী নিজেকে বিপন্ন করতে পারেন এমন একজন নিশ্চয়ই।

আমি ত কিছুই বুঝতে পারছি না দীপকবাবু।

খুনের সময় আপনি কোথায় ছিলেন?

সে সময় আমি কোথায় ছিলাম ঠিক মনে নেই।

মিথ্যা কথা।

বিশ্বাস করুন দীপকবাবু। বোধ হয় মায়াকে কি একটা কথা বলবার জন্যে আমি দোতলায় তাকে খুঁজতে যাই।

এটাও অবিশ্বাসযোগ্য কথা হলো। দেখুন অবনীবাবু, আপনি সত্যি কথা না বললেও, আমরা তা বের করতে সক্ষম হবই। অনর্থক খানিকটা দেরী করিয়ে আমাদের তদন্তের পথে বাধার সৃষ্টি করে কোনও লাভ নেই আপনার।

বিশ্বাস করুন, আমি খুনের ব্যাপারে যা বলেছি তার চেয়ে একবর্ণও বেশি জানি না।

বেশ, আপনি যখন বলবেন না আর কিছু তখন কি করব! এর ফলে আপনি নিজের বিপদকেই বাড়িয়ে তুলছেন। চলি আজকের মত। আশা করি আপনি নিজে চিন্তা করে পরে সব কথা আমাদের খুলে বলবেন।

দীপক আর কোনও কথা না বলে উঠে দাঁড়ায় বাড়ির দিকে রওনা হবার উদ্দেশ্য নিয়ে।

—ছয়—

সেদিন বাড়ি ফিরেই দীপক সর্বপ্রথমে তার ল্যাবরেটারীতে গিয়ে উপস্থিত হলো। জরুরী প্রয়োজন হতে পারে ভেবে দীপক বাড়ির কোণে ছোট একটা ঘরে তার নিজের ব্যবহারের জন্যে একটা ল্যাবরেটারী করেছিল। তাতে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সব থাকত। দীপক তক্ষুণি সেই সব যন্ত্রপাতি নিয়ে বসে গেল কাজ করতে। আধঘণ্টা পরে সে যখন ল্যাবরেটারী থেকে বের হলো, তখন তার মুখে ফুটে উঠেছে সফলতার হাসি। যে অ্যাম্পুলের মত জিনিসটা সে কুড়িয়ে পেয়েছিল তাতে শুধু খানিকটা 'ডিস্‌টিল্‌ড্ ওয়াটার' ছিল। কোনও বিষের নামগন্ধও নেই ওতে। ওটা ওখানে রাখা ছিল শুধু পুলিশকে ভ্রান্তপথে চালনা করবার উদ্দেশ্যেই। আসল বিষ পূর্ব থেকেই ব্যবস্থা করে অন্যত্র রাখা ছিল।

এবার দীপকের তদন্তের পথ অনেকটা সহজ হয়ে এলো। এটা অবশ্যই সাময়িক উত্তেজনার বশে খুন নয়। অনেক আগেই এই হত্যার জন্যে প্ল্যান করা হয়েছিল। তারপর সুযোগমত কাজটি সংঘটিত করা হয়েছে।

কিন্তু কে এই হত্যাকারী?

বিভিন্ন চিন্তা এসে পর পর দীপককে বিভ্রান্ত করে তুলতে লাগল। সাম্‌নে বিরাট অন্ধকার। তার মধ্যে সামান্য একটিমাত্র আলোকের রেখা শুধু দেখা যাচ্ছে। কিন্তু তাও অস্পষ্ট, ক্ষীণ।

ক্রিং ক্রিং ক্রিং...

টেলিফোনের সরব আর্তনাদ দীপকের চিন্তায় বাধার সৃষ্টি করল।

হ্যালো, কে?

আমি, ভজহরিবাবু কথা বলছি। আপনিই ত মিঃ চ্যাটার্জী?

হ্যাঁ। কিন্তু হঠাৎ আবার এ ধরণের আহ্বান কেন? নতুন কোনও খবর-টবর নাকি?

ঠিক ধরেছেন ত!

বোধ হয় পুলিশ মর্গের রিপোর্ট?

আরে আশ্চর্য ত! আপনিই যদি সব বলে ফেলবেন তবে আমি আর বলব কি?

এটা এমন কিছু কঠিন নয় ভজহরিবাবু। এখন আপনার কাছে নতুন খবর আসবার একমাত্র পথ খোলা আছে পুলিশ মর্গ। এ ছাড়া আর কোনও পথই ত খোলা নেই আপনার সামনে।

ঠিক তাই। মর্গের রিপোর্টে অদ্ভুত একটা জিনিস জানতে পারলাম আমরা। মনোরমা দেবীর মৃত্যুর কারণ ওই ক্ষতস্থানের মুখে কোনও বিষ প্রয়োগের ফলে নয়।

সেকি? এতটা আমি অবশ্যই আশা করতে পারিনি। তাহলে ওঁর মৃত্যুর কারণটা কি?

ওঁর খাবারের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সেই বিষেই ওঁর মৃত্যু হয়েছে। ওঁর পেটে সেই বিষ পাওয়া গেছে।

মৃত্যুর পূর্বে উনি যে চীৎকার করে উঠেছিলেন।

সেটা অবশ্যই সম্ভব। মৃত্যুর পূর্বে বোধ হয় আততায়ী তাঁর পিঠে সূচ বিঁধিয়ে দিয়ে এবং একটা কাঁচের অ্যাম্পুল ঘরের কোণে ফেলে পুলিশকে বিভ্রান্ত করতে চেয়েছিল। আর তাতে বিনয়বাবুর উপরেই সন্দেহটা গিয়ে পড়ে বেশি—কারণ উনি ছিলেন বাড়ির মধ্যে একমাত্র বিজ্ঞান-জানা লোক।

কিন্তু এতটা প্ল্যান করে যে খুন করতে পারে তার বুদ্ধির তীক্ষ্ণতার কথা ভেবে আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি।

হ্যাঁ, আরও একটা খবর মর্গে পোস্ট মর্টেমের ফলে আবিষ্কৃত হয়েছে? সেটা হচ্ছে এই যে, মৃত্যুর সময় উনি গর্ভবতী ছিলেন।

সেকি?

হ্যাঁ, 'ক্যারিং ফর্ ফাইভ্ মান্থ্স্'। ওঁর তখন পাঁচ মাস চলছিল।

কিন্তু এটা ত অবৈধ।

তা ত বটেই। আর সেজন্যেই অমলবাবুর উপরে সন্দেহটা গিয়ে পড়ছে এবার। ওঁর কাকা বলেছিলেন যে মনোরমা দেবীকে উনি যদি বিয়ে করেন, তাহলে কাকার সম্পত্তি থেকে উনি সম্পূর্ণ বঞ্চিত হবেন।

সে কথা ত জানি।

আমার মনে হয় তার পূর্বেই বোধ হয় মনোরমা দেবী গর্ভবতী হয়ে পড়েন। উনি ইতিপূর্বে বোধ হয় তা জানতে পারেননি। পরে জানতে পেরে উনি মনোরমা দেবীকে হত্যা করে নিষ্কণ্টক হতে চাইলেন।

নট্ আন্‌লাইক্‌লি! অসম্ভব কিছু নয়।

এদিকে ব্যাপারটা বের হয়ে যেতে পারে ভেবে উনি সূচের আগায় বিষ ইত্যাদির অবতারণা করে এবং ঘরের কোণে অ্যাম্পুল ফেলে রেখে পুলিশকে বিভ্রান্ত করবার চেষ্টা করলেন। এর ফলে সন্দেহটা গিয়ে পড়বে বিনয়বাবুর ওপর।

কিন্তু আমি ভাবছি আর একটা কথা, ভজহরিবাবু।

কি কথা বলুন।

মায়া দেবী হঠাৎ নিজেকে খুনী বলে স্বীকার করলেন কেন?

সেটাই ত প্রশ্ন। অমলবাবুর প্রতি হঠাৎ ওঁর এতটা আকর্ষণের কারণ কি হতে পারে?

সেটা এখনও বুঝতে পারিনি।

আমার মনে হচ্ছে কোথাও বোধ হয় বিরাট একটা গলদ রয়ে গেছে। কিন্তু কোথায় যে গলদটা তা আমরা ঠিক ধরতে পারছি না!

হয়ত সেটা সম্ভব। কিন্তু এমনও ত হতে পারে যে অমলবাবুকে মায়া দেবী খুব স্নেহ করেন এবং...

খুব বেশি সম্ভব নয়। আমি ত যতটা দেখেছি, তাতে মনে হয়েছে অমলবাবু মায়া দেবীকে খুব সুনজরে দেখেন না। ঈশানবাবুর এই দ্বিতীয়বার বিয়ে তিনি সুনজরে দেখেননি। আর তাঁর মনোভাবটা এখনও পূর্ণমাত্রায় রয়েছে।

আর একটা জিনিসও অবশ্য সম্ভব।

কি ব্যাপার?

মায়া দেবী হয়ত কোনও কারণে ধারণা করেছিলেন যে তাঁর ভাই অবনীবাবুই খুনী। তাই ভাইকে বাঁচাবার জন্যে...

কিন্তু মায়া দেবী কি মনোরমা দেবীর ওই গর্ভের কথা জানতেন বলে মনে হয় আপনার?

হতে পারে।

তবে তিনি অবনীবাবুকে খুনী বলে ভাববেন কেন? অবনীবাবু ত এ বাড়িতে পা দিয়েছেন বড় জোর দু'মাস। বিয়ের আগে তিনি কখনও এ বাড়িতে যাননি। কিন্তু মনোরমা দেবী পাঁচ মাস পূর্বে অন্তঃসত্ত্বা হয়েছেন।

আমার মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে দীপকবাবু। আই অ্যাম্ অ্যাট্ এ লস্। কিছুই ঠিকমত বুঝতে পারছি না।

তবে এক কাজ করুন না কেন। চলুন দুজনেই ঈশান মিত্রের বাড়িতে গিয়ে ওঁদের জিজ্ঞাসা করি। ওঁরা কেউ এ বিষয়ে কিছু জানতেন কিনা। আমার মনে হয়, সূত্র যখন একটা পাওয়া গেছে, তখন শেষ ধাপে আমরা অবশ্যই পৌছতে পারব।

বেশ। আমি আপনার জন্যে অপেক্ষা করছি। আপনি এখানে এলে দুজনে একসঙ্গে বের হবো রায়সাহেব ঈশান মিত্রের বাড়ির দিকে।

দীপক রিসিভারটা নামিয়ে রেখে দেয়।

রিসিভারটা রেখে বাইরের ড্রইংরুমে নেমে আসে দীপক।

সেদিনের ডাকে আগত চিঠিগুলো সেখানে টেবিলের ওপর পড়ে ছিল।

চাকর ভজুয়াকে এক কাপ চা আনতে বলে দীপক চিঠিগুলোর ওপর মনঃসংযোগ করল।

দু'তিনটে চিঠি পড়ে, একটা নীল খামের ভারী চিঠির ওপর দীপকের মনোযোগ আকৃষ্ট হলো।

টেবিলের ওপর থেকে চিঠিটা তুলে নিয়ে মুখটা ছিঁড়ে ফেলে দীপক দেখল চিঠিটা ইংরাজীতে লেখা। টাইপ করা। তার মর্মার্থ এইরূপ ঃ—

প্রিয় দীপকবাবু,

আশা করি আপনার নিজের স্বার্থেই আপনি রায়সাহেব ঈশান মিত্রের বাড়ির ঘটনা থেকে দূরে সরে দাঁড়াবেন। আপনার বুদ্ধি আছে স্বীকার করি, কিন্তু অতিবুদ্ধি ভাল নয়। তা ছাড়া পাবিবারিক ব্যাপারে মাথা ঘামিয়ে নিজের জীবন বিপন্ন করে লাভ কি?

আপনি যদি এই কেস থেকে সরে দাঁড়ান তবে যথাসময়েই পাঁচশোটি টাকা ডাক মারফৎ আপনার হাতে গিয়ে পৌছবে।

অন্যথায় আপনার জীবন বিপন্ন হতে পারে বলে আমার ধারণা।

প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানবেন।

ইতি

আপনার কোনও শুভার্থী।

চিঠিখানা পড়ে দীপক বিড়বিড় করে বলে—তা হলে অবশ্যই আমাকে এ ব্যাপারে আত্মনিয়োগ করতে হবে।

তখুনি সে মোটরে চড়ে বেরিয়ে পড়ে রায়সাহেব ঈশান মিত্রের বাড়ির উদ্দেশ্যে।

—সাত—

অমল আর বিনয় বাইরের হলঘরে বসে নিজেদের মধ্যে কি যেন আলোচনা করছিল, এমন সময় দীপক গিয়ে সেখানে উপস্থিত হলো। ভজহরিবাবুও এসেছিলেন তার সঙ্গে।

দীপক অমলের দিকে চেয়ে বলল—অমলবাবু, আপনার সঙ্গে গোটাকয়েক প্রাইভেট কথা আছে। কোথায় গেলে কথাগুলো বলবার সুবিধে হবে?

অমল বলল—ওপাশের ঘরে চলুন।

বেশ। ভজহরিবাবু, আপনি এদিকে বিনয়বাবুর সঙ্গে কথাবার্তা বলুন।

ভজহরিবাবুর কিন্তু একা থাকতে ভাল লাগছিল না। তিনি বললেন—আমিও আপনার সঙ্গে গেলে অসুবিধে হবে কি?

দীপক বলল—নিশ্চয়ই। বিনয়বাবুর সঙ্গে আপনার কি যেন গোটাকয়েক কথা আছে বলছিলেন। সেটা এখনই সেরে ফেলুন না।

দীপকের ইঙ্গিত জেনে ভজহরিবাবু বললেন—হ্যাঁ, বিনয়বাবুর সঙ্গে কথাগুলো সেরে ফেলি। আপনি ততক্ষণে ওঁকে যে সব প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবেন বললেন সেগুলো শেষ করুন।

দীপক উঠে পাশের ঘরে চলে গেল অমলকে সঙ্গে নিয়ে। অমল বলল—আপনি যে আবার হঠাৎ ফিরে এলেন মিঃ চ্যাটার্জী?

দীপক বলল—একটা নতুন জিনিস হঠাৎ আবিষ্কার করে ফেললাম কিনা, তাই...

অমল বলল—কি আবার আবিষ্কার করলেন আপনি?

মনোরমা দেবীর মৃত্যুর কারণ তাঁর পিঠে যে আঘাত দেখা গেছে সেটা নয়। খাবারের সঙ্গে ইতিপূর্বে বিষ মিশিয়ে তাঁর মৃত্যুকে আসন্ন করে তোলা হয়েছিল।

আপনি কি করে জানলেন তা?

পোস্ট মর্টেম রিপোর্ট থেকে।

আশ্চর্য ত!

আশ্চর্য ত বটেই। আরও গোটাকয়েক আশ্চর্য খবর দিতে চাই আপনাকে অমলবাবু।

বলুন।

প্রথম কথা, আপনার কাকীমা মায়া দেবী নিজমুখে স্বীকার করেছেন যে তিনিই নাকি মনোরমা দেবীকে খুন করেছেন।

সেকি?

হ্যাঁ। এর মধ্যে এতটুকু অতিরঞ্জিত কিছু নেই।

কিন্তু কেন তিনি এভাবে খুন করতে যাবেন? কি তাঁর স্বার্থ?

সে কথার উত্তর তিনি দেননি।

আমি এটা বিশ্বাস করি না।

বিশ্বাস না করবার কারণ? ওঁর খাবারের সঙ্গে উনি ত অত্যন্ত সহজে বিষ প্রয়োগ করতে পারতেন।

কিন্তু ওঁরই বা কি স্বার্থ?

অনেক কিছু হতে পারে। অতটা গভীর ভাবে চিন্তা করবার অবকাশ আমি পাইনি। কিছুদিন পূর্বে কি একটা বিষয় নিয়ে মনোরমা দেবীর সঙ্গে মায়া দেবীর মনোমালিন্য হয়েছিল না? হয়ত সেটাই শেষ পর্যন্ত রেষারেষিতে পরিণত হয় এবং ক্রুদ্ধ হয়েই তিনি এভাবে মনোরমা দেবীকে হত্যা করেন!

কিন্তু এত সহজে হত্যা করা কি সম্ভব?

অন্য কারণও থাকতে পারে।

যথা?

পোস্ট মর্টেমের ফলে জানা গেছে যে মৃত্যুর সময়ে মনোরমা দেবী অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন।

আশ্চর্য!—কথাটা অমল এমনভাবে বলল যে আকাশ থেকে বজ্রপাত হলেও সে বোধহয় এতটা চমকে উঠত না।

আপনি ত কিছুদিন পূর্বে মনোরমা দেবীকে বিয়ে করবেন বলে স্থির করেছিলেন। তাই নয় কি?

হ্যাঁ। কিন্তু...

তারপরে হঠাৎ বিয়ে করলেন না কেন?

সে অনেক কথা দীপকবাবু। সে সব কথা আমাদের আলোচনার বাইরে থাকা উচিত।

কিন্তু আমাদের প্রয়োজনের গণ্ডীর মধ্যে সেটা এখন এসে পড়েছে অমলবাবু।

সংক্ষেপে বলতে গেলে কাকার ঘোরতর আপত্তিই এর প্রধান কারণ। বিধবা-বিবাহে সমর্থন জানালে পরিবারের ঐতিহ্য বিনষ্ট হবে এই ধারণাই ছিল তাঁর মনে। তাই তিনি আপত্তি জানিয়ে বলেন যে আমি যদি তাঁর কথা না মানি এবং জোর করে বিয়ে করতে চাই, তা হলে আমি তাঁর কাছ থেকে আর কোন সাহায্যই জীবনে পাব না।

সেটা কতদিন আগে?

প্রায় এক বছর।

তারপর কি মনোরমা দেবীর প্রতি আকর্ষণ আপনার কমে এসেছিল অমলবাবু?

না।

তা হলে কাকার কথাটাই শেষ পর্যন্ত মেনে নিলেন কেন?

সত্যি কথা বলতে গেলে, নিজের পায়ে দাঁড়াবার মত অর্থ উপার্জন করবার চেষ্টায় ছিলাম আমি। মনোরমা আমাকে পূর্বে কয়েকবার বলেছিল যে আমি যেন তাকে নিয়ে এ বাড়ি ছেড়ে অনেক দূরে চলে যাই। কিন্তু আমি তার সে কথা মেনে নিতে পারিনি। আমি বলেছিলাম যে, সাময়িক উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে এভাবে পালিয়ে না গিয়ে, কিছুদিন পরে উপযুক্ত অর্থ উপার্জন করবার ব্যবস্থা করে তারপরে আমরা অন্যত্র চলে যাব।

কিন্তু এখন যদি প্রমাণিত হয় যে মনোরমা দেবী যে অন্তঃসত্ত্বা হয়েছিলেন এবং অবশেষে যেভাবে প্রাণ হারিয়েছেন, তার জন্যে দায়ী হচ্ছেন আপনি?

অমল কোন উত্তর দিল না।

দীপক বলে চলল—এ কথা ত আপনি স্বীকার করতে বাধ্য যে আপনি তাঁর প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। সাক্ষ্যপ্রমাণেও সেই কথাই স্বীকৃত হবে। আপনি ছাড়া অন্য কেউ তাঁর প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন এমন প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না। তারপর দেখুন, তিনি যে অবস্থায় পড়ে যেভাবে মৃত্যুবরণ করলেন, এতে আপনার উপরেই সন্দেহটা এসে পড়ে না কি?

এর উত্তরে আমার কিছু বলবার নেই দীপকবাবু।

কিছু না?

না।

তা হলে আপনি স্বীকার করছেন যে আপনিই মনোরমা দেবীর হত্যার মূলে আছেন—অর্থাৎ আপনিই তাঁকে হত্যা করেছেন? মনোরমা দেবীকে বিয়ে করবার ইচ্ছা আপনার আদৌ ছিল না। তিনি হঠাৎ যখন অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়লেন, তখন আপনি নিজের বিপদ বুঝতে পারেন। আপনি দেখলেন যে তাঁকে হত্যা করা ছাড়া আর কোনও উপায় আপনার নেই। কি বলেন অমলবাবু?

হ্যাঁ, আমিই মনোরমাকে হত্যা করেছি দীপকবাবু—আমিই তাকে হত্যা করেছি।

কথাটা শেষ করে উত্তেজিতভাবে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে থাকে অমল। তার সারা

ভঙ্গির মধ্যে যেন বিশ্বের ব্যর্থতা পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে। চোখ দুটো তার অশ্রুভরে টলমল করতে থাকে।

অমলের দিকে চেয়ে দীপকের ঠোঁটে ফুটে ওঠে অদ্ভুত একটা রহস্যের হাসি।

বিনয়ের সঙ্গে কথা হচ্ছিল ভজহরিবাবুর।

ভজহরিবাবু কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে কি যেন সব চিন্তা করছিলেন। হঠাৎ বিনয়ই তাঁকে প্রথমে প্রশ্ন করে বসল—আপনি এই খুনের তদন্ত-ব্যাপারে কতদূর অগ্রসর হলেন ভজহরিবাবু?

ভজহরিবাবু মৃদু হেসে বললেন—বেশি দূর নয়।

সেকি?

হ্যাঁ, খুনী কে তা এখনও আমরা স্থির করতে পারিনি।

তবে তদন্তের ফল হলো কি?

খানিকটা এগিয়েছি মাত্র।

কিসের উপর নির্ভর করে?

সন্দেহ এবং প্রমাণের উপর নির্ভর করে। দুটোই আমাদের তদন্ত-ব্যাপারে কিছু কিছু সাহায্য করেছে।

ধন্যবাদ। কিন্তু সন্দেহটা ঠিক কার ওপর—

মাপ করবেন। সেটা বলতে আমার বাধা আছে।

বেশ।

তবে এটা নিশ্চয়ই জানেন যে, পুলিশ মর্গের রিপোর্টে যে যে তথ্য প্রকাশ পেয়েছে তাতে কেসটা বেশ জটিল হয়ে উঠেছে!

তাই নাকি! কি কি তথ্য আবার প্রকাশ পেলো?

ও, সেগুলো জানেন না বুঝি?

না, জানবার সৌভাগ্য হয়নি এখনও।

বেশ, তা হলে শুনুন। প্রথম তথ্য এই যে, আমরা জানতে পেরেছি পিঠের ওই ছোট ক্ষতস্থানে বিষপ্রয়োগে মনোরমা দেবীর মৃত্যু হয়নি।

তবে?

ওটা একটা ভাঁওতা মাত্র!

সেকি?

হ্যাঁ, তাঁর পেটে যে বিষ পাওয়া গিয়েছে তাতে বোঝা যায় যে খাবারের মাধ্যমেই বিষ প্রয়োগ করা হয়েছিল।

আশ্চর্য!

হ্যাঁ। আরও একটা সংবাদ শোনবার জন্যে প্রস্তুত থাকুন বিনয়বাবু। মনোরমা দেবী মৃত্যুর সময়ে অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন।

সো স্ট্রেঞ্জ!

হ্যাঁ, এমনি আরো কতো আশ্চর্যজনক ব্যাপারই না পৃথিবীতে ঘটে থাকে! আমরা তার কতটুকু খবর রাখি বলুন!

তা ত বটেই।

তবে যতদূর আমরা জানতে পারি তাতেই আমরা সেটাকে আশ্চর্যজনক বলে ভূষিত করি। যাক্, এবার খুনী যে কে সে সম্বন্ধে আপনি নিশ্চয়ই একটু সাহায্য আমাকে করতে পারবেন।

কিন্তু, এ দুটো তথ্য জানা সত্ত্বেও যদি বলি খুনী যে কে তা এখনও আমাদের ধারণার বাইরে রয়েছে।

তা হয় না বিনয়বাবু, তা হলে আমি বলব, ওর দ্বারা আপনি সত্যের অপলাপ করছেন।

হয়ত তাই। কিন্তু এর বেশি আপাতত আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়।

বেশ, বলতে আপনাকে হবে না। আপনি এটা বলবেন কি কে মনোরমা দেবীর সঙ্গে বিগত কয়েক বছরে সবচেয়ে বেশি ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করেছিল?

সেটা ঠিক...

না না, এভাবে আসল সত্যকে চাপা দেবার চেষ্টা অত্যন্ত অন্যায় বিনয়বাবু।

কেন?

আপনি জানেন কিছুদিন আগে পর্যন্ত অমলবাবুর সঙ্গে মনোরমা দেবীর যে যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা ছিল সেটা আমাদের অজানা নেই।

সে রকম ঘনিষ্ঠতা এক পরিবারের যে কোনও একজনের সঙ্গে অপরজনের থাকতে পারে।

তা অবশ্য সত্যি। কিন্তু এক্ষেত্রে মনোরমা দেবীর সঙ্গে অমলবাবুর বিয়ের কথা পর্যন্ত হয়েছিল সে খবর আমরা রাখি।

ও, দীপকবাবুর মুখে শুনেছেন বুঝি?

যেখান থেকেই শুনি, ব্যাপারটা গিয়ে শেষ পর্যন্ত সেই একই জায়গায় দাঁড়ায়।

ছোট্ট একটা কথার উপরে নির্ভর করে আপনারা এমন তুচ্ছ জিনিসের ভিত্তিতে একটা বিরাট সিদ্ধান্ত গঠন করতে চান যে তা শুনলে যে কোন সুস্থ লোকের হাসি পাওয়া সম্ভব।

কিন্তু ছোট ছোট সিদ্ধান্ত ধরে অগ্রসর না হলে ত অন্ধের মত ঘুরে বেড়াতে হয়!

ভুল ভজহরিবাবু, একদম ভুল। সত্য কথা বলতে গেলে বলতে হয় যে, আপনাদের এই লাইন অব প্রোগ্রেস্ অর্থাৎ অগ্রগতির পথটাই হচ্ছে ইতস্তত টুকরো ঘটনার পেছনে অন্ধের মত ছুটে চলা, এই আর কি!

এ কথা বলছেন কেন?

বলছি এই জন্যে যে, কে খুনী তা আমরা জানি।

অর্থাৎ?

আমি জানি যে খুনী কে। খুনী স্বয়ং ঠিক আপনার সাম্‌নে বসে। আমিই মনোরমা দেবীকে খুন করেছি। সুতরাং আপনার এই সমস্ত লাইন অব প্রোগ্রেস্‌টাই মিথ্যা পথ ধরে হচ্ছে নাকি?

কিন্তু এভাবে আপনি নিজেকে খুনী বলে স্বীকার করলেও বা লাভটা এমন বেশি কি হলো! আমরা ত যে তিমিরে, সেই তিমিরেই রয়ে গেলাম। উপযুক্ত প্রমাণ না পেলে আমরা স্বীকার করতে বাধ্য নই যে আপনি খুনী। এমন কি আপনি নিজমুখে তা স্বীকার করলেও নয়।

সে আপনি যে পদ্ধতি অনুযায়ী তদন্ত করুন না কেন শেষ পর্যন্ত আমি প্রমাণ করবই যে আমি প্রকৃত খুনী। সুতরাং অনর্থক আর মিথ্যার পেছনে অন্ধের মত ঘুরে বেড়িয়ে লাভ কি হবে আপনার...

কথা শেষ না করেই হঠাৎ কথার মধ্যে অহেতুক ছেদ টেনে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায় বিনয়।

ভজহরিবাবু অবাক হয়ে শুধু ভাবতে থাকেন এই অদ্ভুত তদন্তের শেষ হবে কোথায়!

—আট—

ঈশানবাবুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে ভজহরিবাবু লক্ষ্য করলেন যে দীপকের মুখ অহেতুক গম্ভীর।

তার থম্‌থমে মুখের দিকে চেয়ে ভজহরিবাবু কোনও প্রশ্ন করতে ইচ্ছা করলেন না। সে যেন চিন্তিত মনে কি এক গভীর ভাবনার অতলে ডুব মেরেছে।

একসময় ভজহরিবাবু হঠাৎ বলে ফেললেন—বিনয়বাবু নিজেকে খুনী বলে স্বীকারোক্তি করেছেন দীপকবাবু।

দীপক তাঁর কথা শুনে বলল—এতে লাভটা আর কি হলো বলুন ত? এদিকে অমল আমার কাছে একটু আগেই বলল যে সেই হচ্ছে আসল খুনী।

ভজহরিবাবু হেসে বললেন—এ রকম ঝামেলায় ত মশাই এর আগে জীবনে কখনও পড়তে হয়নি।

দীপক হেসে বলল—যাক্, এবার নতুন একটা অভিজ্ঞতা লাভ হলো ত! হাজার হোক্, তারও একটা মূল্য অবশ্যই আছে।

ভজহরিবাবু বললেন—কিন্তু এদিকে তদন্তের কি যে ছাই মাথামুণ্ডু হচ্ছে কিছুই বুঝছি না!

দীপক রসিকতার সুরে বলল—দাঁড়ান, আগে বাড়ির বাকি ক'জন লোকও এই সঙ্গে নিজেদের খুনী বলে স্বীকার করুক, তারপর যা হয় চেষ্টা করা যাবে।

ভজহরিবাবু বললেন—হ্যাঁ, মায়া দেবী, বিনয়বাবু আর অমলবাবু ত হলো, এবার বাকি সকলেও অম্‌নি করবে না কি?

দীপক বলল—আশ্চর্য নয়!

কিন্তু কি ওদের স্বার্থ?

স্বার্থ কিছু নয়, শুধু পরার্থ।

সেকি?

হ্যাঁ, একজন অপরকে বাঁচাবার জন্যে নিজের ঘাড়ে দোষটা গ্রহণ করছে, আর একজন আবার তাকে বাঁচাবার জন্যে চেষ্টা করছে। এমনি সব কাণ্ডকারখানা চলছে আর কি!

সে ত মশাই বড় গোলমেলে ব্যাপার!

এক্ষেত্রেও তেমনি গোলমেলে বলেই আপনার মনে হচ্ছে নাকি?

কতকটা ত বটেই।

তা হলে শেষ পর্যন্ত কি দেখা যাবে অপরাধী কেউই নয়?

না, অতটা আশা আমি অবশ্য করি না। খুনী যে কেউ একজন নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু আমরা তার কাছে গিয়ে ঠিকমত পৌঁছুতে পারিনি। তবে শীঘ্রই যে পারব সে আশা রাখি।

এদের তিনজনের মধ্যেই কি কেউ খুনী?

সেটাও অসম্ভব নয় ভজহরিবাবু।

তা হলে শেষ নির্ভর করছে আমাদের নিজেদের তদন্তের উপরেই। ওঁদের স্বীকারোক্তিগুলো কোনও কাজেই আসছে না।

সে ত বুঝতেই পারছেন।

তা হলে ত এখনও কিছুদিন দেরী হওয়া সম্ভব।

খুব বেশি নয়। কেননা কাছাকাছি আমরা এসে গেছি।

সেকি?

আপনি এখনও কিছুই আন্দাজ করতে পারেননি নাকি?

আমি ভাবছিলাম বোধ হয় মায়া দেবীর ভাই ওই অবনীবাবুই এই ব্যাপারে লিপ্ত।

না মশাই, আপনি এতগুলো লোক ফেলে রেখে শেষ পর্যন্ত কিনা ওই অবনীবাবুর পেছনেই ধাওয়া করলেন!

কিন্তু ওই তিনজন, যাঁরা স্বীকারোক্তি করেছেন, তাঁদের কাউকে কিন্তু অপরাধী বলে মনে হয় না আমার। কি করি, অগত্যা অবনীবাবুর নাম করেছিলাম, এই আর কি!

ও, আপনি তা হলে পারমিউটেশন কম্বিনেশন করছেন বোধ হয়? না, আপনার দ্বারা এভাবে রহস্যের কিনারা কোনও দিনই হবে বলে মনে হচ্ছে না আমার। আচ্ছা চলি ভজহরিবাবু।

থানার কাছে এসে দীপক গাড়ি থেকে নেমে পড়ে। ড্রাইভার গাড়ি চালিয়ে দিলে দীপক পেছনের দিকে ফিরে তাকিয়ে মৃদু হেসে আপন মনে বলে—ও, এখনও আপনি বহুদূরে পড়ে আছেন!

ধীরে ধীরে সে আপন মনে পথ দিয়ে এগিয়ে চলে।

—নয়—

আপনি তা হলে আমাকে এ কথাই বিশ্বাস করতে বলেন যে মনোরমা দেবীর হত্যাসংক্রান্ত ব্যাপারের কোনও কিছুই আপনার জানা নেই?—দীপক প্রশ্ন করে রায়সাহেব ঈশান মিত্রের দিকে চেয়ে।

ঠিক ওই কথাই বলতে চাই আমি।

ঈশান মিত্রের কথাগুলো কেমন যেন অপ্রতিভ বলে মনে হয়।

ঘরের মধ্যে মুখোমুখি এরা দুজন। ঈশান মিত্রের নিজের শয়নকক্ষ সেটা।

হাল্‌কা হাওয়ায় দরজার পরদাটা কাঁপছিল। বাইরের কোলাহল থেকে দূরে এ ধরণের একান্ত সান্নিধ্যে বসে দীপক যে তাঁকে এভাবে প্রশ্ন করতে পারে এ ধারণা বোধ হয় ঈশান মিত্রের ছিল না। তাই তিনি এভাবে অপ্রতিভ হয়ে পড়েছিলেন।

একটু হেসে দীপক আবার বলে চলে—এ কথাটা আমি জানি ঈশানবাবু, যে কেউ যা কিছুই বলুক না কেন, আপনি শেষ বয়সে আবার বিয়ে করেছেন অন্য কোনও কারণেই নয়, একরকম বলতে গেলে বাধ্য হয়েই।

সেকি?

ঈশান মিত্র যেন চম্‌কে উঠলেন।

হ্যাঁ ঈশানবাবু। ভয় নেই, আমি কথাটা অন্য কারও কাছে প্রচার করব না যে বিয়ের আগেই আপনার সঙ্গে মায়া দেবীর পরিচয় ছিল।

কিন্তু তুমি কি করে তা জানলে দীপক?

ডিটেকটিভদের অনেক কিছুরই খোঁজ রাখতে হয় ঈশানবাবু। থাক সে কথা, আপনি মায়া দেবীকে কেন বিয়ে করেছিলেন তা জেনে এ খুনের ব্যাপারে আমার কোনও সুবিধে হবে না, কিন্তু আপনার স্ত্রীভাগ্য যে ভাল সেটা আমিও স্বীকার করছি।

তোমার এ কথার কোনও মানেই হয় না। ঈশান মিত্র এবার যেন মরিয়া হয়ে ওঠেন।

অনর্থক উত্তেজিত হবেন না, ঈশানবাবু। আমার প্রশ্ন এই যে, অমলবাবুর সঙ্গে মনোরমা দেবীর ঘনিষ্ঠতা কতদূর ছিল?

এ প্রশ্নের কোনও প্রয়োজন আছে বলে ত মনে হচ্ছে না আমার।

আছে ঈশানবাবু, নিশ্চয়ই আছে। পুলিশের রিপোর্টে প্রকাশ পেয়েছে যে মনোরমা দেবী মৃত্যুর পূর্বে অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন।

সেকি?—ঈশানবাবুর মুখ যেন পাংশুবর্ণ ধারণ করে।—শেষ পর্যন্ত অমল তা হলে এভাবে...

যাক্, সে সম্বন্ধে পরে ভেবে দেখব আমরা। আপনি কি দয়া করে মনোরমা দেবীর একখানা ভাল ফটো দিতে পারেন আমাকে? একটু প্রয়োজন আছে।

ও হ্যাঁ, এখুনি এনে দিচ্ছি।

ঈশানবাবু ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যান।

দীপক এতক্ষণ যেন এই সুযোগই খুঁজছিল। দ্রুত এগিয়ে গিয়ে একটা সবখোল চাবি বের করে ড্রয়ারগুলো খুলে কি যেন খুঁজতে লাগল। কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজি করে একটা ড্রয়ারে সে দেখতে পেল ঈশান মিত্র বিশ্রী কতকগুলি অশ্লীল ছবি জমিয়ে রেখেছেন। এ ধরণের একজন প্রৌঢ়ের এই বিকৃত রুচির পরিচয় পেয়ে দীপকের মনটা ঘৃণায় রি-রি করে উঠল।

ড্রয়ারগুলো বন্ধ করে দীপক কি যেন ভাবছিল, এমন সময় প্রবেশ করলেন ঈশান মিত্র।

এই নাও মনোরমার ফটো।

দীপক ফটোটা হাতে নিয়ে বলল—আচ্ছা চলি ঈশানবাবু, অনর্থক আপনাকে কিছুটা বিরক্ত করে গেলাম।

না না, সে কি! তুমি বাবা যেদিন ইচ্ছে হবে এখানে আসবে। মনোরমার হত্যাকারীকে খুঁজে শীঘ্র বের কর এই আমি চাই।

হ্যাঁ, সে ত প্রায় একরকম হয়েই গেছে ঈশানবাবু। আমি দারোগা ভজহরিবাবুকে নিয়ে আসব কাল সন্ধ্যার সময়। আপনাদের বাড়ির সকলকেই সেদিন হলঘরে গিয়ে উপস্থিত হতে হবে। সকলের সাম্‌নে সেদিন হত্যাকারীকে ধরিয়ে দেব।

তোমার কার্যপদ্ধতি দেখে সত্যিই আমি আনন্দিত হলাম দীপক, আশা করি তুমি অবশ্যই সফল হবে।

দীপক মৃদু হেসে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়।

ঈশানবাবু তার গমনপথের দিকে চেয়ে থাকেন একদৃষ্টে।

বাড়িতে ফিরে এসে দীপক সবে একটু বিশ্রাম নিচ্ছে এমন সময় ফোনটা বেজে উঠল সশব্দে।

হ্যালো, কে? দীপক রিসিভারটা তুলে ধরে প্রশ্ন করল।

চিনতে পারবেন না। কণ্ঠস্বরটা কেমন যেন বিকৃত বলে মনে হলো।

কি চাই?

এক্ষুণি ঈশান মিত্রের বাড়ির তদন্ত থেকে সরে দাঁড়াবেন কিনা জানতে চাই।

আপনি কে সেটা শুনে না হয়...

আমি আপনার শুভেচ্ছার্থী বন্ধু। এখনও সময় আছে, এবং সময় থাকতে সরে দাঁড়ালে উপযুক্ত পারিশ্রমিক...

সেই অঙ্কটা কত?

দু'হাজার।

ধন্যবাদ।

তা হলে কি ব্যবস্থা করলেন?

চিন্তা করে দেখছি।

এই আমার শেষ সাবধানবাণী দীপক চ্যাটার্জী। মনে থাকে যেন...দীপক কোনও উত্তর না দিয়ে রিসিভারটা নামিয়ে রাখে।

—দশ—

ভজহরিবাবু দীপকের কথা শুনে এমন চম্‌কে উঠবেন এ কথা দীপক আগে বুঝতে পারেনি মোটেই।

আপনি তা হলে বলছেন যে খুনী কে তা আপনি ঠিক বুঝতে পেরেছেন দীপকবাবু? ভজহরিবাবু প্রশ্ন করেন।

মৃদু হেসে দীপক বলে—অবশ্যই। আর আজ সন্ধ্যায় আপনি যদি দয়া করে আমার সঙ্গে চলেন আপনাকে হাতে হাতে ধরিয়ে দেব।

অসম্ভব।

পৃথিবীর অনেক কিছুকেই বাইরে থেকে অসম্ভব বলে মনে হয় ভজহরিবাবু।

তা হলে কি আপনি বলতে চান যে আপনি ভোজবিদ্যা জানেন?

অর্থাৎ?

আমি মশাই এতদিনেও খুনী ত দূরের কথা কারও টিকির সন্ধান পেলাম না, আর আপনি বলেন কিনা একেবারে খুনীর সন্ধান বের করে বসে আছেন।

আমি সত্যি কথাই বলছি কিনা আমার সঙ্গে গেলেই টের পাবেন। যাক্, এখন বাজে সাড়ে পাঁচটা। চলুন আমরা রওনা দিই। হ্যাঁ, আপনি আপনার রিভলভারটা সঙ্গে নিতে ভুলবেন না ভজহরিবাবু। আজ কিন্তু যে কোনও বিপর্যয় ঘটতে পারে।

সেকি?

বুঝতেই পারছেন। এখন পর্যন্ত খুনী বেশ নিশ্চিন্ত আছে। শেষ মুহূর্তে যদি বুঝতে পারে যে আমরা তাকে ঠিক চিনতে পেরেছি তা হলে সেই চরম মুহূর্তে সে সব কিছুই করে বসতে পারে।

তা ত বটেই।

তা হলে ভেবে দেখুন অস্ত্র নিয়ে তৈরী থাকার প্রয়োজনীয়তা কত বেশি। যাক্, মিনিট পনর সময় দিলাম আপনাকে। এর মধ্যে আপনার অস্ত্রটা নিয়ে তৈরী হয়ে এখানে আসুন। আর দুজন আর্মড্ পুলিশেরও ব্যবস্থা করুন। ছদ্মবেশে তাদের বাড়ির সাম্‌নে রাখতে হবে।

এটারও প্রয়োজনীয়তা আমি অনুভব করছি দীপকবাবু।

হ্যাঁ, সবদিক থেকে তৈরী হয়ে নিন। ঠিক সাড়ে ছ'টায় আমাদের সেখানে পৌছুতে হবে। আমি ততক্ষণ ঈশানবাবুকে বাড়িতে একটা ফোন করে দিই।

কথা শেষ করেই দীপক টেলিফোনের রিসিভারটা তুলে নিল।

ভজহরিবাবু বেরিয়ে গেলেন চরম মুহূর্তের জন্য প্রস্তুত হবার উদ্দেশ্যে।

এক ঘণ্টা পর।

রায়সাহেব ঈশান মিত্রের বাড়িতে পৌছে দীপক দেখতে পেল যে বাড়ির সকলে হলঘরে এসে একত্র বসে আছে। স্বয়ং রায়সাহেব ঈশান মিত্র থেকে সুরু করে ছোট ছেলে শঙ্কর পর্যন্ত কেউ বাদ যায়নি।

চাকর, দ্বারোয়ান, মালী ইত্যাদি সকলে ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে। তাদের আহ্বান করলেই যে কোন মুহূর্তে তারা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করতে প্রস্তুত।

দীপক ভজহরিবাবুর দিকে চেয়ে বলল—আপনি একটু বসুন ভজহরিবাবু। আমি জরুরী কাজে একটু বাইরে যাচ্ছি। দু'মিনিটের মধ্যেই ফিরে আসব।

দীপক বেরিয়ে গেলে ভজহরিবাবু উঠে দাঁড়িয়ে সকলের দিকে তাকিয়ে জোরে জোরে বললেন, দেখুন, এটা আপনারা বুঝতেই পারছেন যে আপনাদের মধ্যে মাত্র একজন খুনী। কিন্তু পর পর তিনজন পৃথক্ পৃথক্ ভাবে স্বীকারোক্তি করেছেন যে তিনি খুন করেছেন। এর ফলে ব্যাপারটার মধ্যে যে জটিলতা সৃষ্টি হয়েছিল তা কাটিয়ে ওঠা সহজ ছিল না। কিন্তু গোয়েন্দা দীপকবাবুর আপ্রাণ চেষ্টায় শেষ পর্যন্ত আমরা কৃতকার্য হতে সক্ষম হয়েছি।

ঘরের মধ্যে নিঃসীম চুপচাপ।

প্রত্যেকেই পরস্পরের মুখের দিকে চাইছে। তাদের সেই অবর্ণনীয় উৎকণ্ঠা ভাষায় প্রকাশ করা সত্যিই কষ্টকর।

ভজহরিবাবু একটু থেমে আবার বলে চললেন—হ্যাঁ, মাত্র একটি অদৃশ্য সঙ্কেতের উপর নির্ভর করে দীপকবাবু শেষ সিদ্ধান্তে পৌছুতে সক্ষম হয়েছেন। মাত্র একটি সঙ্কেত। আপনারা কেউ এবং আমি পর্যন্ত সেটা অনুমান করতে পারিনি।

কিন্তু কি সেই অদৃশ্য সঙ্কেত?—সজোরে বলে উঠল ঈশানবাবুর বড় ভাইপো অমল।

সেই সঙ্কেতটি হচ্ছে মনোরমা দেবীর নামে কোনও একটি ব্যাঙ্কে পঞ্চাশ হাজার টাকা জমা পড়েছিল। তারপর মনোরমা দেবীর আকস্মিক মৃত্যুর পর যে টাকাটা জমা দেয় সেই সেটা উইথড্র করে।

সেকি?

কে সেই লোক?

একি ব্যাপার?

টাকা জমা কেন?

একসঙ্গে এতগুলো প্রশ্ন পর পর বেরিয়ে এলো সকলের মুখ থেকে।

প্রত্যেকের ভঙ্গির মধ্যেই ফুটে উঠেছে অদ্ভুত উৎকণ্ঠা আর প্রবল উত্তেজনার ছাপ।

ভজহরিবাবু বললেন—টাকা জমা দেওয়ার এই অদৃশ্য সঙ্কেতের উপরে নির্ভর করে দীপকবাবু এগোতে সক্ষম হলেও আমরা এক পাও এগোতে পারিনি। তাই তিনি এসেই সব কিছু ব্যাখ্যা করবেন।

কথা শেষ করে ভজহরিবাবু বসে পড়লেন তাঁর চেয়ারে। এভাবে মাঝপথে কথা শেষ করায় সকলের উত্তেজনা আরও বৃদ্ধি পেয়ে যে অবস্থায় গিয়ে দাঁড়াল তা বর্ণনাতীত।

সকলের দৃষ্টি দ্বারের দিকে।

দীপক চ্যাটার্জী কোথায়?

—এগারো—

সহস্র রজনীর মোহনিদ্রা হতে জেগে-ওঠা রূপকথার রাজকন্যার চোখে-মুখে যে অদ্ভুত বিহ্বলতা ফুটে উঠেছিল, ঠিক তেমনি ভাব ফুটে উঠল সকলের চোখে-মুখে দীপক চ্যাটার্জীর নাটকীয় আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই।

ঘরে পা দিয়েই দীপক শুরু করল—আপনারা প্রত্যেকেই যে কি পরিমাণ উত্তেজিত ও উৎকণ্ঠিত তা আমি জানি। ধৈর্যের শেষ সীমায় এসে পৌঁছেছেন আপনারা। কিন্তু আপনাদের ধৈর্যের উপরে আরও কিছু আঘাত আমি করব। কারণ প্রথম থেকেই সব কিছু বলতে হবে আমাকে।

হ্যাঁ, শুনুন আপনারা। আপনারা তিনজনে পর পর স্বীকারোক্তি করেছেন নিজেদের খুনী বলে। কিন্তু আমি প্রত্যেককেই পরীক্ষা করে দেখেছি। কিভাবে তা একে একে খুলে বলছি।

প্রথমে ধরা যাক্ মায়া দেবীর কথা। তিনি স্বীকার করেছেন আসল খুনীকে বাঁচাবার উদ্দেশ্যেই। তিনি দোষটা নিজের কাঁধে নিয়েছেন বটে, কিন্তু যে উদ্দেশ্যে এই খুন, সেদিক থেকে বিচার করলে তিনি যে নির্দোষ তা সহজে বলা চলে।

দ্বিতীয় জন হচ্ছেন বিনয়বাবু। প্রথমটা তাঁর উপরে সন্দেহ হতে পারে বটে, কিন্তু একটু ভাবলেই বোঝা যায় মনোরমা দেবীর সঙ্গে তাঁর এমন কিছু নিবিড়তা ছিল না। তাই ওদিক থেকে তিনি নির্দোষ। তিনি অমলবাবুকে বাঁচাবার জন্যেই এভাবে খুনের বোঝা কাঁধে নিয়েছেন। কিন্তু বিনয়বাবু, দুঃখের সঙ্গে আপনাকে জানাচ্ছি যে আপনার এই অনুমান ভুল। অমলবাবুও আসল খুনী নন, সবদিক থেকে যদিও সন্দেহটা তাঁর উপরে গিয়েই পড়ে। এ কথা বলতে বাধ্য হচ্ছি যে প্রথমে আমিও অমলবাবুকেই দোষী সাব্যস্ত করেছিলাম। কারণ আমি ভেবেছিলাম যে মনোরমা দেবীর অবৈধ সন্তানের পিতা হচ্ছেন আপনি। কিন্তু সেই সন্দেহ থেকে আপনি মুক্তি পেলেন, যখন ওই ব্যাঙ্কে পঞ্চাশ হাজার টাকা জমা দেবার সঙ্কেতকে অনুসরণ করলাম আমি। মায়া দেবীর ভাই অবনীবাবুও নির্দোষ, কারণ তাঁর এতে কোনও স্বার্থ নেই।

এবার আসা যাক আসল খুনীর ব্যাপারে। আসল খুনী সবদিক থেকেই সবার ধারণার বাইরে ছিল। সেই ছিল মনোরমা দেবীর অবৈধ সন্তানের পিতা। মনোরমা দেবী তাকে ভয় দেখান যে পঞ্চাশ হাজার টাকা তাঁর নামে জমা না দিলে তিনি তাঁর মুখোশ খুলে ধরবেন। মনোরমা দেবীর ইচ্ছা ছিল এই টাকাটা নিয়ে তিনি কাশীর পথে পা বাড়াবেন। আত্মীয়দের সংস্রব থেকে দূরে তাঁর শেষ জীবন কাটাবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু খুনী দেখল কাশীতে গিয়েও যদি মনোরমা দেবী তাকে নিস্তার না দেন। তা ছাড়া এভাবে ব্ল্যাকমেল করার সুবিধা অনেক। দূর দেশে গেলে, অর্থাৎ খুনীর হাতের বাইরে গেলে প্রায়ই এইভাবে ভয় দেখিয়ে টাকা নেওয়া যাবে। খুনী তাই দেখল যে আসলে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়েও সে একেবারে নিস্তার পাচ্ছে না। বরং হাতের বাইরে গেলে আরও অসুবিধা বাড়বে। তাই সে প্রথমে মনোরমা দেবীর নামে পঞ্চাশ হাজার টাকা জমা দিল বটে, কিন্তু সুযোগমত তার কাশী যাত্রার আগে নিপুণ কৌশলে খাদ্যের সাথে বিষ মিশিয়ে তাকে হত্যা করল। যাতে সন্দেহটা অন্যের উপরে পড়ে এই উদ্দেশ্যে সে তার পিঠে ক্ষত সৃষ্টি করল আর ভাঙ্গা অ্যাম্পুল ফেলে রাখল।

স্টপ্ ইট্! স্টপ্ ইট্! বন্ধ কর! চীৎকার করে কথাগুলো বলে উঠে উত্তেজিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন রায়সাহেব ঈশান মিত্র। হাতে তাঁর একখানা দামী অটোমেটিক রিভলভার চক্‌চক্ করছে দেখা গেল। দীপকের দিকে লাফ দিয়ে পড়লেন তিনি।

দীপক এর জন্যে প্রস্তুত ছিল। সে মেঝের ওপর শুয়ে পড়ল।

গুড়ুম! তীব্র শব্দ আর প্রচুর ধোঁয়া।

গুলিটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে গিয়ে দালানে বিদ্ধ হলো। ভজহরিবাবু এতক্ষণ সুযোগ খুঁজছিলেন। তিনি রায়সাহেব ঈশান মিত্রের হাতটা চেপে ধরে রিভলভারটা কেড়ে নিলেন।

তারপরেই তীব্র একটা ঘুসি এসে আচম্‌কা পড়ল ভজহরিবাবুর নাকে।

তিনি ছিট্‌কে পড়তেই ঈশানবাবু একলাফে ঘর থেকে বেরিয়ে ছুটলেন দোতলার দিকে।

দীপক আর ভজহরিবাবু ছুটলেন পেছনে পেছনে। কিন্তু তাঁকে ধরবার আগেই তিনি দোতলা পেরিয়ে গিয়ে উঠলেন তিনতলার ছাদে। সেখান থেকে প্রশস্ত রাজপথের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন তিনি।

দীপক আর ভজহরিবাবু উপর থেকে নেমে রাস্তায় এসে দেখতে পেলেন রায়সাহেব ঈশান মিত্রের মাথার খুলির একটা অংশ ভেঙ্গে গেছে। বাঁ পা, ডান হাতের অবস্থাও প্রায় তাই। তক্ষুণি তাঁকে হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা করা হলো।

ঘণ্টা চার-পাঁচ পরেই রায়সাহেব ঈশান মিত্রের মৃত্যু হলো। তাঁর পরিবারের সকলে দীপক আর ভজহরিবাবুকে অনুরোধ করলেন পারিবারিক এই ব্যাপারগুলো সাধারণের কাছে প্রকাশ না করতে।

দীপক আর ভজহরিবাবু অনুরোধ রক্ষা করলেন।

পরদিন প্রত্যেকটি সংবাদপত্রে শোক-সংবাদের স্থানে তাই ছাপা হলো ঃ

রায়সাহেব ঈশান মিত্রের শোচনীয় অপমৃত্যু!

তিনতলার ছাদ হইতে অকস্মাৎ পা পিছলাইয়া রাস্তায় পড়িয়া রায়সাহেব ঈশান মিত্র মারাত্মকভাবে আহত হন। পরে হাসপাতালে চার-পাঁচ ঘণ্টা পরেই তাঁহার মৃত্যু হয়। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সান্ত্বনা জানাইতেছি।

এই ঘটনার পর দীপক ঈশানবাবুদের বাড়ি যে দু'একবার না গেছে তা নয়, কিন্তু এই ব্যাপারগুলি নিয়ে কোনও আলোচনাই করেনি সে।

শুধু ইন্‌স্পেক্টর ভজহরিবাবু মাঝে মাঝে দীপককে বলেন—সত্যি, আপনার তদন্তের ধারাগুলো আমার আজও অদ্ভুত লাগে মিঃ চ্যাটার্জী।

দীপক তার উত্তরে শুধু রহস্যময় হাসি হাসে।

শেষ

দুরাত্মার ছল

এক

—হালসিবাগানের যদুপতি পোদ্দার—

যদুপতি পোদ্দার লোকটা চিরদিনই একটু খিট্‌খিটে ও খামখেয়ালী-প্রকৃতির। যে কোন লোকের মুখের উপরে অনায়াসে সে যে কোন কথা অম্লানবদনে বলে দিতে পারে। তা ছাড়া তার মনের কোনও স্থিরতা নেই। কখন যে সে কি উদ্দেশ্যে কি কাজ করে বসে, তা বোধ হয় সে নিজেও ভাল করে জানে না।

সেদিন বিকেলের দিকে দেখা গেল যদুপতি পোদ্দার আপন মনে, বাগবাজার পেরিয়ে যে গঙ্গার ঘাটটা, সেখানে পায়চারী করছে। কোন উদ্দেশ্য নিয়ে সে যে এখানে বেড়াতে এসেছে তা নয়। আনমনাভাবে পায়চারী করতে করতে সে এদিকে এসে পড়েছে।

সন্ধ্যা ছ'টা।

অস্তোন্মুখ সূর্যের রাঙা আভা পশ্চিম আকাশটাকে রাঙিয়ে দিচ্ছে। ঝিরঝিরে হাওয়া বইছে। সময়টা যে গ্রীষ্মকাল তা সহজেই বোঝা যায়। বৈকালিক হাওয়ার লোভে দলে দলে লোক গঙ্গার পাড়ে এসে ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছে।

ঘাটে অনেক স্নানার্থী। গ্রীষ্মকাল ছাড়া সন্ধ্যায় কেউ গঙ্গায় বড় একটা স্নান করে না। একটা বটগাছের নিচে একজন সাধু বসে ভাগবত পাঠ করছেন—তাঁর সামনে অনেক শ্রোতার ভিড়। সকলেই বোধ হয় রাতারাতি সংসার-সমুদ্র পাড়ি দিয়ে স্বর্গে পৌঁছুতে চায়, শুধুমাত্র সাধুর মুখে খানিকটা ভাগবত-পাঠ শুনে। ওদের কাণ্ডকারখানা দেখে যদুপতির হাসি পাচ্ছিল। তবুও সে একটু মজা পাবার জন্যেই বোধ হয় সেখানটায় গিয়ে দাঁড়াল।

কিন্তু বেশিক্ষণ তার ভাগবত-পাঠ শুনতে ভাল লাগল না। কিছুটা এগিয়ে বাঁ দিকে একটা জেটির মত ঢালু প্ল্যাটফর্ম গঙ্গার বুকের উপর নেমে গেছে। যদুপতি এগিয়ে গিয়ে সেখানে বসে পড়ল।

সময় এগিয়ে চলে।

মিনিট—সেকেণ্ড—ঘণ্টা।

যদুপতির নজর পড়ল গঙ্গার ওপারের সারি সারি আলোকমালার দিকে।

সত্যিই অপূর্ব সৌন্দর্য, সন্দেহ নেই।

হাল্‌কা হাওয়ায় ভেসে আসছে নাম-না-জানা কোন্ এক ফুলের গন্ধ।

যদুপতি তন্ময় হয়ে গেল প্রকৃতির এই সুন্দর পরিবেশের মধ্যে।

কতক্ষণ কেটে গেছে সেদিকে হুঁশ ছিল না যদুপতির। হঠাৎ খেয়াল হতেই ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখে রাত প্রায় সাড়ে সাতটা।

যদুপতি উঠবে কিনা ভাবছে, এমন সময় পাশে দু'জন লোক কি যেন বলাবলি করছে শোনা গেল।

যদুপতির চমক ভাঙল। ওদেব কথা কেমন যেন কৌতূহলোদ্দীপক।

একজন বলল—তা হলে চলি আমি। দেখি বুড়োটা শেষ পর্যন্ত কেনই বা আমাকে ডেকে পাঠাল।

দ্বিতীয় জন বলল—কিন্তু কথা থাকল এই, বড় একটা ভেলভেটের বাক্স সে যদি তোমার হাতে দেয়, তবে তা তুমি আমাকে অবশ্যই দেবে। এর জন্যে দশ হাজার টাকা পাবে তুমি অপরেশ।

—কিন্তু তোমার ওতে কি লাভ?

—লাভ যে কি, তা বললে তুমি বুঝবে না।

—কিন্তু অণিমা যদি প্রশ্ন করে?

—বলবে তুমি কোনও বাক্স পাওনি।

—কিন্তু সে কি বিশ্বাস করবে?

—বিশ্বাস না করলেই বা ক্ষতি কি তোমার?

—এটা বাজে কথা বলছ তুমি। অণিমাকে আমি সত্যিই ভালবাসি। আর অণিমার বাবা ওই বুড়ো বিশ্বাস করে যদি আমাকে বাক্সটা দেয়, তোমাকে দশ হাজার টাকায় তা বিক্রী করতে সত্যি আমার আপত্তি নেই। কিন্তু অণিমা প্রশ্ন আমি বিপদে পড়ব

—বিপদ কিসের? তুমি বলবে তুমি জান না। আব অণিমা ত থাকে সুদূর পাটনাতে। সে কি এখানে জানতে আসছে সত্যিই বুড়ো তোমাকে বাক্সটা দিয়েছে কিনা!

—তা বটে।

—আর তা ছাড়া অণিমা যখন তোমাকে ভালবাসে তখন নিশ্চয়ই তোমাকে বিশ্বাস করে।

—সেটুকু নিশ্চয়ই করে।

—তবে আর ভয় কি! মিথ্যা দুর্ভাবনা করো না। এখন উঠে পড় দেখি। ঠিক এক ঘণ্টার মধ্যে কাজ সেরে তুমি আমার খিদিরপুরের বাড়িতে দেখা করবে।

—বেশ।

—তবে চল।

—কিন্তু একটা কথা। তুমি এত বড়লোক হয়েও, হঠাৎ সামান্য একটা বাক্সের প্রতি এত প্রলুব্ধ হলে কেন?

—টাকার মূল্যে বাক্সটাব বিচার করছি না আমি অপরেশ। টাকার চেয়েও ওটা অনেক বড়। বিরাট একটা স্মৃতি ওর সঙ্গে জড়িত।

—সেটা জানতে বড্ড কৌতূহল হচ্ছে আমার।

—সে সম্বন্ধে কৌতূহল নিষ্প্রয়োজন। আমি জানি তুমি এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে পার। কিন্তু অনাবশ্যক কৌতূহল মানুষের বিপদ ঘটায়।

—কিন্তু...

—তুমি কি তা হলে বাক্সটা আমার কাছে বিক্রী করতে সম্মত নও?

—সে কথা কে বলল?

—মনে রেখো আমার কাছ থেকে সংবাদ পেয়েই তুমি প্রথম অণিমার সঙ্গে পরিচিত হও। সেই পরিচয়টাই এখন তোমাদের প্রণয়ে পর্যবসিত হতে চলেছে।

—সে কথা ত আমি অস্বীকার করি না বনওয়ারীলাল।

—তবে তুমি তোমার নিজের কাজের উদ্দেশ্যে যাত্রা কর অপরেশ।

—বেশ।

—আমি তোমার সফলতা কামনা করি।

কথা শেষ হল। দু'জনে উঠে হেঁটে দু'দিকে চলল—একজন উত্তরে, অন্যজন দক্ষিণ দিকে।

যদুপতির কৌতূহল হল। এ ধরণের কৌতূহল তার নতুন নয়। তা ছাড়া তার মত খামখেয়ালী লোক যে এম্নি অদ্ভুত সব কথা শুনে তার পেছনে পেছনে কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে চলবে তাতে আর আশ্চর্যের কি আছে! অপরেশ নামে যে লোকটি কোনও এক বৃদ্ধ লোকের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে বলে শুনল, যদুপতি কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে তাকে অনুসরণ করে চলল।

রাস্তা পার হয়ে অপরেশ এসে একটা ট্যাক্সিতে চড়ে বসল।

যদুপতি ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ডে আর একটা ট্যাক্সিতে চেপে বসে বলল—ওই গাড়িটাকে অনুসরণ করে পেছনে পেছনে চল।

দুটি গাড়িই এগিয়ে চলল দ্রুতগতিতে।

দু'জনের মধ্যেই নিরাপদ দূরত্ব।

মহানগরী কলকাতার প্রশস্ত রাজপথের উপর দিয়ে গাড়ি দুটি চলল কোন্ অনির্দেশের দিকে সে সম্বন্ধে সামান্য খবরও জানল না পৃথিবীর অন্য কোনও প্রাণী।

* * *

অজস্র গলিঘুঁজির গোলকধাঁধায় বিভ্রান্ত হতে হতে যখন একটি ক্ষুদ্র গলির প্রান্তে একটি বাড়ির সামনে অপরেশের মোটরটা এসে দাঁড়াল তখন রাত প্রায় ন'টার কাছাকাছি।

নিচের তলার একখানা ঘরে আলো জ্বলছে। সেই ঘরটি ছাড়া সারা বাড়িটি গভীর, নিশ্ছিদ্র আঁধারের যবনিকার আড়ালে আচ্ছন্ন।

অপরেশ বুঝতে পারল ভদ্রলোক বোধ হয় তার জন্যেই অপেক্ষা করছেন। অপরেশ নিঃশব্দে মোটর থেকে নেমে ট্যাক্সি-ড্রাইভারকে ভাড়াটা মিটিয়ে দিয়ে বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করল। তারপরে কড়াটা ধরে সজোরে নাড়া দিল।

—কে?—বিরাট আকৃতির একটি নেপালী চাকর ছুটে এল।

—আমি ভূদেববাবুর সঙ্গে দেখা করতে চাই।

—আপনার নাম?

—অপরেশ হালদার।

—ও। আচ্ছা, একটু দাঁড়ান। বাবুকে জিজ্ঞাসা করে আসি।

একটু পরেই সে ফিরে এসে বলল—আসুন আমার সঙ্গে।

—ভূদেববাবু কোথায়?

—ওই ঘরে।

—বেশ, চল।

চাকরটার দিকে চেয়ে অপরেশের মনটা কেমন যেন বিরক্ত হয়ে উঠল। কোনও ভদ্রলোকের বাড়িতে যে এ ধরণের গুণ্ডার মত আকৃতির চাকর থাকতে পারে এ ধারণা ছিল না তার।

যা হোক, চাকরটার অনুসরণ করে সে গিয়ে উপস্থিত হল ভূদেববাবুর ঘরে।

একটা বেতের চেয়ারে দেহটা এলিয়ে দিয়ে বিশ্রাম করছিলেন তিনি। অপরেশকে প্রবেশ করতে দেখে চাকরটার দিকে চেয়ে বললেন—তুই যা এবার এখান থেকে।

চাকরটা অপরেশের দিকে একবার জ্বলন্ত দৃষ্টি হেনে প্রস্থান করল ঘর থেকে।

ভূদেববাবু প্রশ্ন করলেন—পাটনা থেকেই সোজা আসছ ত?

—হ্যাঁ।

—খবর কি ওদিকের?

—অণিমা ভালই আছে।

—হ্যাঁ, সে খবর জানি। কিন্তু তুমিই যে আসল লোক তা কি করে বুঝতে পারব?

অপরেশ বিচিত্র ভঙ্গিতে তার হাত দুটো বুকের সামনে একত্র করে ধরতেই ভূদেববাবু বললেন—ঠিক আছে। এবার কাজের কথায় আসা যাক্। তুমি সোজা হাওড়া স্টেশন থেকে এখানেই আসছ ত?

—হ্যাঁ। অপরেশ নির্বিকারভাবে এই মিথ্যা কথাটা বলল। বনওয়ারীলালের সঙ্গে যে তার কিছু আগেই দেখা হয়েছিল এবং তার সাথে এত কিছু কথ,বার্তা হয়ে গেছে ঘুণাক্ষরেও সে প্রকাশ করল না তা।

কিন্তু ঘরের বাইরে একটা জানালার খড়খড়ির আড়ালে দাঁড়িয়ে-থাকা যদুপতি পোদ্দার কথাটা শুনে অবাক হল। সে বেশ স্পষ্টই বুঝতে পারল যে অপরেশ লোকটা একদম ডাহা মিথ্যাবাদী।

ওদিকে ভূদেববাবু অপরেশকে প্রশ্ন করলেন—কেউ তোমাকে অনুসরণ করেনি ত?

—বোধ হয় না।

—কি করে বুঝলে?

—আমার ত তাই মনে হয়।

—ভুল, সম্পূর্ণ ভুল। দিবারাত্র ওরা আমাকে চোখে চোখে রেখেছে। কিন্তু সেই জিনিসটার কোনও সন্ধান পায়নি। তোমাকে তাই আসতে লিখেছিলাম। অণিমার কাছ থেকে যা শুনেছি তাতে তোমাকে অবশ্যই বিশ্বাস করা যেতে পারে। কিন্তু তোমার আরও সাবধান হয়ে আসা উচিত ছিল।

—ভয় কাকে বলে তা আমি জানি না।

—তোমার সাহসের পরিচয় পেয়ে আনন্দিত হলাম। আর তা ছাড়া দিন কয়েক বাদে তুমিই হবে আমার সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী। অণিমাই আমার একমাত্র মেয়ে। যাক্, এবার কাজের কথাগুলো বলে ফেলি।

কথা শেষ করে ভূদেববাবু একটু থামলেন। তারপরে সোজা উঠে গিয়ে দাঁড়ালেন ঘরের কোণের বড় টেবিলটার সামনে। সেখানে গিয়ে তিনি চারদিকে বেশ ভাল করে একবার তাকিয়ে নিঃসন্দেহ হলেন যে, অন্য কেউ তাঁর কার্য লক্ষ্য করছে না।

তারপর তিনি টেবিলের এক অংশে মৃদু. চাপ দিলেন।

খট্!

টেবিলের একটা অংশ সরে গেল। সেই ফাঁকের মধ্য দিয়ে তিনি হাত ঢুকিয়ে দিলেন।

একটু পরেই দেখা গেল তাঁর হাতে একটি সুন্দর বড় বাক্স। সেই বাক্সটি আগাগোড়া চমৎকার মখমল দিয়ে মোড়া।

বাক্সটি হাতে নিয়ে ভূদেববাবু এসে দাঁড়ালেন ঠিক ঘরের কেন্দ্রস্থলে। তারপর অপরেশের দিকে চেয়ে বললেন—এটা নিয়ে তুমি এখান থেকে বহুদূরে চলে যাবে। সোজা বোম্বে। সেখানে যে কোন ভাল ব্যাঙ্কের সেফ্ ডিপজিট ভল্টে এটি জমা রাখবে। বুঝেছ? আমি চাই আমার বহুকষ্টে উপার্জিত এই রত্নসম্ভার কোনও শত্রুর হাতে না পড়ে। আশা করি এটুকু কাজ তুমি নিশ্চয়ই পারবে!

—আমি আপ্রাণ চেষ্টা করব।

—হ্যাঁ, মনে রেখ এর মধ্যে যা আছে তার দাম দশ লক্ষ টাকার কম নয়। এটি তোমাদের অধিকারে থাকলে তুমি আর অণিমা-মা সারা জীবন পায়ের উপরে পা তুলে বসে খেতে পারবে।

—দশ লক্ষ! বিস্ময়োক্তি ফুটে উঠল অপরেশের মুখে।

—হ্যাঁ, তার এক পয়সা কম নয়।

অপরেশের মনে পড়ল তার সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করে বনওয়ারীলাল এই বাক্সটা দশ হাজার টাকা দিয়ে কিনতে চেয়েছিল। এতক্ষণে অপরেশ বুঝতে পারল কেন বনওয়ারীলালের মত কৃপণ লোকও এই বাক্সটির জন্যে এত টাকা খরচ করতে এককথায় রাজী হয়েছিল।

অপরেশ প্রশ্ন করল—কিন্তু এর চাবিটা কোথায় তা ত বললেন না আপনি।

—সেটি অণিমা জানে। সে আর আমি ছাড়া পৃথিবীর কোন তৃতীয় ব্যক্তির ক্ষমতা নেই, সে চাবি খুঁজে বের করে। আর চাবি ছাড়া এই বাক্সটি ভেঙে এর ভেতরের জিনিসপত্র সহজে বের করা কারও দ্বারা সম্ভব নয়। এটি এমন শক্ত ইস্পাত দিয়ে তৈরী। আর এটিকে গলিয়ে ফেলতে গেলে ভেতরের জিনিসগুলিও নষ্ট হবে।

—তা ত বটেই।

অপরেশ মনস্থির করে ফেলল। বনওয়ারীলালকে এমন মূল্যবান জিনিস সে কিছুতেই দেবে না। অত বোকা ছেলে সে নয়। এটি নিয়ে সে সত্যই বোম্বাই যাত্রা করবে।

অপরেশ বলল—আপনি এটা আমাকে দিন। আমি এক্ষুণি রওনা হতে চাই।

—হ্যাঁ, খুব সাবধান...

গুড়ম! গুড়ুম!

ভূদেববাবুর কথা শেষ হবার আগেই কোত্থেকে ভেসে এল পর পর দু'বার রিভলভারের গর্জন। ভূদেববাবু আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়লেন।

জানালার খড়খড়িটা তোলা। তার ফাঁক দিয়েই বাইরে থেকে অদৃশ্য আততায়ী গুলিবর্ষণ করে চলেছিল। অপরেশ মেঝের উপরে শুয়ে পড়ল উপুড় হয়ে।

উলটোদিকের জানালার সামনে দাঁড়িয়ে কৌতূহলী যদুপতি পোদ্দার প্রথমে গুলিবর্ষণ দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল। এবার সে দেখতে পেল একজন লোক আপাদমস্তক কালো কাপড়ে আবৃত অবস্থায় জানালা থেকে লাফ দিয়ে বাগানের মধ্যে পড়ল, তারপর দ্রুত বাগানটা পার হয়ে ছুটে গিয়ে রাস্তার উপরে পড়ল।

যদুপতি স্থির করল এবার সে আততায়ীকে অনুসরণ করবে। দেখা যাক্ এ অদ্ভুত ঘটনাপ্রবাহের শেষ কোথায়!

দুই

—ঘটনাপ্রবাহ—

অপরেশ মেঝের উপরে শুয়ে পড়বার পর আর কোনও গুলিই তার দিকে ছুটে এল না।

অপরেশ কি করবে ভাবছে এমন সময় ছুটতে ছুটতে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল ভূদেববাবুর চাকর বাহাদুর।

—কি হয়েছে বাবু? বাহাদুর প্রশ্ন করে।

—ওধার থেকে কে যেন গুলি করেছে ভূদেববাবুকে লক্ষ্য করে।

—কে গুলি করল?

—তা ত জানি না। তবে গুলিটা এসেছে ওই জানালার ওধার থেকেই। বাইরে নিশ্চয়ই কাউকে দেখা যাবে।

—বাবু কি খুব জখম হয়েছেন?

—হ্যাঁ।

—জখমটা কি খুব বেশি?

—তাই ত মনে হচ্ছে। ভূদেববাবু অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন। গুলিটা লেগেছে ঠিক তাঁর বুকে।

—চলুন বাইরে গিয়ে দেখা যাক, শয়তানটাকে ধরা যায় কিনা!

—বেশ, চল।

দু'জনে বাইরে বেরিয়ে এল। এধারের জানালাটার পাশেই একটা বাগান। বাগানের নরম মাটির উপরে জুতোর ছাপ দেখা গেল। কিন্তু আততায়ীব কোনও সন্ধানই মিলল না।

—লোকটা পালাল কেমন করে? অপরেশ প্রশ্ন করল।

—সত্যি! তাজ্জব কি বাত্! কথাগুলো বলে বাহাদুর চারদিকে চাইল তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে।

কিন্তু কোনও লোকের চিহ্নমাত্রও পাওয়া গেল না। বাক্সটা এতক্ষণ অপরেশের হাতে ছিল। সে বলল—এই বাক্সটা নেবার জন্যে গুলি করেছে ভূদেববাবুকে। যাক্, চল ওদিকে ভূদেববাবুর অবস্থা কি রকম দেখি।

ঘরের মধ্যে ফিরে এল ওরা।

ভূদেববাবুর জ্ঞান যেন খানিকটা ফিবে আসছিল। তিনি ধীরে ধীরে চোখ মেলে চাইলেন। তাঁর সারা মুখে আসন্ন মৃত্যুর মলিন ছায়া। ধীরে ধীরে তাঁর মুখে কথা ফুটল। তিনি অপরেশকে লক্ষ্য করে অস্ফুটস্বরে বললেন—আমার অন্তিম সময় আসন্ন। তুমি আর এক মুহূর্তও এখানে দাঁড়িও না। যাও। এক্ষুণি পালাও। না হলে ওদের হাত থেকে এটা বাঁচাতে পারবে না।

অপরেশ বলল—কিন্তু আপনার জীবনের চেয়ে এটার দাম নিশ্চয়ই বেশি নয়!

ভূদেববাবু ক্ষীণকণ্ঠে উত্তর দিলেন—না, তুমি এখানে থেকেও আমাকে বাঁচাতে পারবে না। কিন্তু আমার আজীবনের সঞ্চয় এই...

কথা শেষ হল না।

ভূদেববাবু আবার জ্ঞান হারালেন।

অপরেশ কিছুক্ষণ কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে রইল। তারপর সে মনে মনে স্থির করে ফেলল, কিছুতেই সে এ বাক্সটা বনওয়ারীলালের কাছে সামান্য দশ হাজার টাকায় বিক্রী করতে যাবে না। ওই লোকটার প্রেরিত কোনও গুপ্তশত্রুই হয়ত ভূদেববাবুকে খুন করেছে।

অপরেশ বাড়ি থেকে বের হল বাহাদুরকে সঙ্গে করে। থানায় একটা ফোন করে দিল সর্বপ্রথমে। সামনের দোকানটাতে টেলিফোন কানেক্‌শন ছিল। তারপর সে একটা ট্যাক্সিতে চড়ে বলল—হাওড়া স্টেশন। হাতের বাক্সটা সে বেশ ভাল করে আর একবার দেখে নিল।

কিন্তু সে বুঝতে পারল না যে তার সঙ্গে কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে আর একটা গাড়ি তাকে অনুসরণ করছে। সে গাড়ির আরোহী হচ্ছে সেই কালো পোষাক পরা আততায়ী—যে কিছুক্ষণ আগে ভূদেববাবুকে খুন করেছে।

তারও পেছনে আর একটা গাড়িতে চড়ে চলেছিল যদুপতি পোদ্দার। সে অবাক হয়ে তখন শুধু ভাবছিল, সামান্য একটি কৌতূহল তাকে কি অজস্র মারাত্মক ঘটনাচক্রের মধ্যে নিক্ষেপ করছে।

নিয়তির অলঙ্ঘ্য বিধানে এমনি করে তিনটি প্রাণী একই ঘটনাচক্রের সূত্র ধরে ছুটে চলল।

আরও কতজন এমনি করে এই আবর্তের মধ্যে এসে একে একে জড়িয়ে পড়বে তা কে জানে!

তিন

—আপ বোম্বে মেল—

হাওড়া স্টেশন।

অসংখ্য লোক গিজ্ গিজ্ করছে এখানে।

কুলী, খাবারওয়ালা, পানওয়ালা, বইয়ের স্টল, যাত্রী—এমনি কত।

একটি লোককে ঈষৎ ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়ে যদুপতি পোদ্দার এর মধ্য দিয়ে দ্রুত এগিয়ে চলেছে।

একটি খাবারের দোকানের সামনে গিয়ে সে দাঁড়াল। এই খাবারের দোকানের মালিক তার বন্ধু। যদুপতিকে সামনে দেখতে পেয়ে সে অভ্যর্থনা করল সমাদরে।

—কি হে, খবর কি ভাই?

—ভাল।

—এখানে কেন?

—জানই ত, আমি খেয়ালের বশে এমনি ঘুরে বেড়াই।

—বাইরে কোথাও বেড়াতে যাচ্ছ নাকি?

—অবশ্যই।

—কিন্তু মালপত্র ত দেখছি না কিছু।

—মালপত্রের প্রয়োজন নেই।

—তবে কাছেই কোথাও বুঝি?

—হ্যাঁ।

—চল্লে কতদূরে?

—বোম্বাই পর্যন্ত।

—বোম্বে? সে কি! এই সামান্য বেশভূষায় একেবারে বোম্বাই!

—হ্যাঁ। জরুরী প্রয়োজন।

—কি ব্যাপার বলো না!

—কৌতূহল সংবরণ কর বন্ধু। পরেই জানাব। যাক, দুশো টাকা আমার এক্ষুণি চাই। একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি তোমাকে। কাল বাড়িতে গিয়ে চাইলেই পাবে টাকাটা।

—না, তোমাকে আর অবিশ্বাস কি! দেখি ক্যাশে কত আছে। দুশো টাকায় না হলে কিছু বেশিই বরং নাও।

—প্রয়োজন নেই। আমার সঙ্গেই প্রায় একশো টাকা আছে। আর দুশো টাকা পেলেই চলবে।

—বেশ।

বাক্স খুলে সে তক্ষুণি দুশো টাকা দিয়ে দিল যদুপতিকে। টাকাটা ভাল করে রেখে যদুপতি বলল—যাক্, এখন বল ত কাছাকাছি টেলিফোন কোথায় মিলবে।

—বুকিং অফিসে।

—হ্যাঁ, বুকিং অফিসে গেলেই পাওয়া যাবে বটে। কিন্তু...

—ব্যাপার কি বল না!

—কোনও ভাল ডিটেকটিভের সঙ্গে তোমার পরিচয় আছে কি?

—কেন, প্রাইভেট ডিটেকটিভ ফাল্গুনীকে ত তুমি চেন...

—ও, হ্যাঁ মনে পড়েছে বটে। চল বুকিং অফিসের দিকে যাওয়া যাক্।

দু'জনে বুকিং অফিসে গিয়ে উপস্থিত হল। সেখানে গিয়ে ফোন গাইডে প্রাইভেট ডিটেকটিভ ফাল্গুনী বসুর নামটা দেখে নিয়ে রিসিভার তুলল।

—হ্যালো, সাউথ থ্রি টু ফোর ওয়ান...

—ইয়েস্ প্লীজ্।

—কে আপনি?

—আমি প্রাইভেট ডিটেকটিভ ফাল্গুনী বসু কথা বলছি।

—হ্যাঁ, আমি আপনাকেই চাই। জরুরী প্রয়োজন। আমাকে বোধ হয় আপনার মনে আছে? আমি যদুপতি পোদ্দার কথা বলছি।

—ও, হালসিবাগানের...

—হ্যাঁ।

—কি ব্যাপার বলুন ত!

—ভূদেববাবু নামে জনৈক লোকের হত্যাব্যাপারে পুলিশ নিশ্চয়ই তদন্ত সুরু করবে। কিন্তু আমি আসল অপরাধীকে 'ফলো' করে চলেছি বোম্বে মেলে চেপে। অপরেশ নামে একজন লোককে ভূদেববাবু তাঁর আজীবন-সঞ্চিত দশ লক্ষ টাকা মূল্যের 'জুয়েল'-বোঝাই একটি বাক্স দান করেছেন। কিন্তু সেই বাক্সটা একজন আততায়ী নেবার চেষ্টা করছিল। ঠিক সেই উদ্দেশ্যেই আততায়ী বোধহয় অপরেশকে অনুসরণ করছে বলে মনে হচ্ছে আমার। সে যাই হোক, আপনি দয়া করে এই হত্যাকাণ্ডের তদন্তব্যাপারে পুলিশকে সাহায্য করবেন এবং পুলিশকে এই কথাগুলো জানাবেন।

—ধন্যবাদ।

—আপনার ফি-টা কি এক্ষুণি দেবার জন্যে বাড়িতে ফোন করব?

—প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন হলে আমি আততায়ীর অনুসন্ধানের জন্যে বোম্বে পর্যন্ত ধাওয়া করব। কাজ শেষ না করে আমি প্রায়ই টাকা নিই না।

—ধন্যবাদ।

—ধন্যবাদের প্রয়োজন নেই। এটা আমার কর্তব্য। যাক্, গোটা কয়েক কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করবার বাকি আছে।

—বলুন।

—ভূদেববাবুকে আপনি চেনেন?

—না।

—অপরেশবাবুকে?

—না।

—আততায়ীকে আপনি চিনতে পেরেছেন?

—সে কালো পোষাকে সারা দেহ আবৃত করে রেখেছিল।

—আপনি কি করে ঘটনাচক্রে জড়িয়ে পড়লেন?

—একটা কৌতূহল আমাকে টেনে নিয়ে যায়। অপরেশবাবুর কাছ থেকে বনওয়ারীলাল

নামে কে একজন দশ হাজার টাকায় বাক্সটা কিনতে চেয়েছিল। আমি গঙ্গার ঘাটে ওদের কথাবার্তা শুনে কৌতূহলী হয়ে অনুসরণ করি অপরেশবাবুকে। অবশেষে ভূদেববাবুর বাড়ি গিয়ে দেখি আততায়ী জানালার বাইরে থেকে ভূদেববাবুকে গুলি করে।

—বুঝেছি। আচ্ছা, বোম্বে মেল ছাড়তে আর কত দেরী আছে?

—সাত মিনিট।

—ধন্যবাদ। আমার আর কিছুই জানবার প্রয়োজন নেই আপাতত। আমি আপনার কথা অনুসারেই কেসটা গ্রহণ করলাম।

* * *

হাওড়া প্ল্যাটফর্ম থেকে ছাড়ছে আপ বোম্বে মেল।

অপরেশের সেকেণ্ড ক্লাশের টিকিট। যদুপতি দূর থেকে লক্ষ্য করল মাত্র দু'জন যুবক হচ্ছে সেকেণ্ড ক্লাশের যাত্রী। অপরেশের সহযাত্রী অন্য যুবকটির বয়সও প্রায় তার সমান।

কিন্তু সেই কালো পোষাক পরা যে লোকটি তাকে অনুসরণ করে হাওড়া পর্যন্ত এসেছে তাকে আর দেখতে পাওয়া গেল না।

যদুপতি প্ল্যাটফর্মে ইতস্তত পায়চারী করতে লাগল। কিন্তু সেই লোকটিকে আর দেখা গেল না। কোথায় যে সে অদৃশ্য হল কে জানে!

ট্রেন ছাড়তে আর অল্পই দেরী আছে। বড় জোর মিনিটখানেক।

যদুপতির টিকিট নিচু ক্লাশের। সে কোন্ কামরায় উঠবে ভাবছে, এমন সময় দেখতে পেল, যে সেকেণ্ড ক্লাশ কামরায় অপরেশ উঠেছে তার ঠিক পাশের ইণ্টার ক্লাশ কামরায় একজন লোক ছুটতে ছুটতে এসে উঠল।

তার পরনের পোষাকের দিকে চেয়ে যদুপতিব কেমন যেন সন্দেহ হল।

ওর পরনের কালো প্যাণ্ট আর কালো কোট। অবশ্য সাধারণ পোষাক। কিন্তু ওই পোষাকের উপরে যদি মুখের উপর একটা কালো কাপড় বা ঐ জাতীয় কিছু ঢাকা দেওয়া যায়, তবেই অত্যন্ত সহজে আঁধারের আড়ালে গা-ঢাকা দিয়ে চলা সম্ভব। তাছাড়া লোকটা বার বার যে ভাবে পাশের কামবার দিকে তাকাচ্ছিল তাতে যদুপতির সন্দেহ দৃঢ় হল। সে স্থির করল, এই কামরাতেই উঠবে। দেখা যাক্ সে কতদূর সফল হয়।

কামরার মধ্যে লোকসংখ্যা বিশেষ নেই। মাত্র সাত-আট জন লোক এই কামরায় চেপে চলেছে। অবশ্য ইণ্টার ক্লাশ কামরায় রাতের বেলা এর চেয়ে খুব বেশি লোক বোম্বে মেলে চড়ে না।

যদুপতি একটা স্থান নির্দিষ্ট করে বসে পড়ল। চারিদিকে অজস্র ঘটনার জটিলতা। সে কোনও নির্দিষ্ট পথ খুঁজে পাচ্ছে না, যে পথ ধরে এগোনো যায়। এখন পরবর্তী ঘটনার উপরেই নির্ভর করছে তার চলার গতি।

—কতদূর যাবেন আপনি? কালো পোষাক পরা লোকটি ঠিক তার পাশে বসে পড়ে তার দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল।

যদুপতি মনে মনে চিন্তিত হল। লোকটা শেষ পর্যন্ত তাকে সন্দেহ করেনি ত! কিন্তু তা হলেও এখন আর কোনও পথ নেই। তার চিন্তার ভাব অবশ্য মুখে ফুটল না। সাধারণভাবেই সে উত্তর দিল—ভায়া নাগপুর, বোম্বে যাব।

—ও, সো লঙ্ জার্ণি!

—তা সত্যি।

—কিন্তু সঙ্গে ত তেমন মালপত্র দেখছি না আপনার!

—আমি বোম্বেতেই থাকি কিনা, তাই মালপত্র সব সেখানেই আছে। এখানে এসেছিলা বাড়িতে দেখা করতে। তাই জিনিসপত্র বিশেষ সঙ্গে আনিনি।

—ও। কি কাজ করেন আপনি ওখানে?

—আন্ধেরীতে একটা ফিল্ম স্টুডিওতে কাজ করি। কিন্তু আমার সম্বন্ধে এত কথ জিজ্ঞাসা করছেন কেন তা ত বুঝতে পারলাম না।

—আমিও বোম্বেতেই যাব কিনা তাই।

—আপনি কি বাঙালী?

—না, আমার বাড়ি বিহারের সম্বলপুরে। তবে দীর্ঘদিন বাংলায় আছি বলে বাংলাতে ভালভাবেই কথাবার্তা বলতে পারি। আমি বোম্বেতে এর আগে গেছি মাত্র একবার, তাই সেখানকার পথঘাট ভাল চিনি না। তাই আপনার সঙ্গে কথা বলছিলাম।

—বুঝেছি। আপনি ওখানে কি কোনও হোটেলে উঠবেন নাকি?

—না, দাদারে আমার এক আত্মীয় আছেন। আমি সেখানেই উঠব।

—দাদারের কোন্ জায়গায়?

—পার্শী কলোনীর কাছে।

—ও। বোম্বের পথঘাট ভাল চেনেন না যখন, তখন আমি আপনাকে কিছু কিছু সাহায্য করতে পারি।

—ধন্যবাদ।

কথা শেষ হতে হতেই রাত গভীর হয়ে এল।

ট্রেন ছুটে চলেছে মাঠ-প্রান্তর পেরিয়ে তীব্রবেগে। এমন এক স্থানে এসে পৌছেছে যে ভেতর থেকে বাইরের দিকে চাইলে চোখে পড়ে না। শুধু অন্ধকার। গভীব রাতের নিকষকালো আঁধারের যবনিকা শুধু।

ধীরে ধীরে যদুপতি ঘুমের কোলে ঢলে পড়ে কোন্ একসময়।

কিন্তু তার সহযাত্রীর চোখে তখন ঘুমের লেশমাত্রও ছিল কিনা সন্দেহ।

চার

—নৈশ যবনিকার আড়ালে—

তীরবেগে এগিয়ে চলেছে ট্রেন।

সামনের তীব্র সার্চলাইটের আলোটা ভয়াবহ। কোনও একটা শার্দূলের চোখের মত রহস্যময়। কোন্ এক অজানা বিভীষিকার যবনিকা তুলে ধরেছে যেন!

প্রত্যেক কামরাতেই আরোহীরা সুপ্ত। রাত্রির এই মধ্যপ্রহরে তারা সকলেই নিদ্রার কোলে নিজেদের নিঃশেষে সঁপে দিয়েছে।

হঠাৎ একটা জায়গায় এসে ট্রেন আচমকা একটা ঝাঁকি মেরে দাঁড়িয়ে পড়ল স্তব্ধ বিস্ময়ে।

কিন্তু ট্রেনখানা হঠাৎ এই জায়গাতে এভাবে দাঁড়িয়ে পড়ল কেন তা বুঝতে পারল না কেউ।

আরোহীদের সকলেরই গভীর নিদ্রা টুটে গেল। এভাবে আচমকা ট্রেনখানা থেমে যাওয়াতে বিস্মিত হল সকলেই।

প্রত্যেকেই উঠে বসে ভাবতে লাগল, নিশ্চয়ই কোনও একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে।

আঃ...আ আ আ আঃ...

সুদূরাগত কোন্ একটা শব্দ।

ট্রেনের গার্ড এবং ড্রাইভার ছুটে এল একখানা সেকেণ্ড ক্লাশ কামরাকে লক্ষ্য করে। এই কামরা থেকেই চেন টানা হয়েছে।

ঠিক সেই কামরাতেই শুয়েছিল অপরেশ। হঠাৎ গাড়ির প্রচণ্ড ঝাঁকানিতে ঘুম ভেঙ্গে গেল তার।

ধড়মড় করে উঠে দেখে একজন লোক তার সহযাত্রীর বুকের উপর একটা রিভলভার চেপে ধরে প্রশ্ন করছে—এখনও বলুন বাক্সটা কোথায়, না হলে এখুনি আপনার অন্তিম সময় ঘনিয়ে আসবে।

অপরেশ বুঝতে পারল, তার ও তার সহযাত্রীর বয়স ও চেহারা প্রায় একধরণের হওয়াতে ভুল করে লোকটা তার সহযাত্রীকে আক্রমণ করেছে।

অপরেশের সহযাত্রী উত্তর দিল—কি সব অদ্ভুত কথা বলছেন আপনি? কোন্ বাক্সের কথাই বা বলছেন তা বুঝতে পারলাম না।

—আশা করি বার বার আপনার এ ধরণের উত্তর শোনবার জন্যেই আমি এত রাতে এত বড় বিপদ মাথায় নিয়ে এই ট্রেনের কামরায় আপনার সন্ধানে আসিনি।

—সে কথা ত আপনার চেয়ে আমিই বুঝতে পারছি বেশি। কিন্তু না জানলে কি করে...

—চুপ করুন। আমার শেষ কথা, আপনি বাক্সের কথা আমাকে বলবেন কি না?

—এক কথা বার বার বলাটা পছন্দ করি না আমি। আপনার যা ইচ্ছা করতে পারেন এবার।

—বেশ, অপ্রিয় কাজ করতে হচ্ছে বলে...

—দরজা খুলুন! কি হয়েছে এই কামরায়?

কথা শেষ হবার আগেই বাইরে থেকে কয়েকটি কণ্ঠ একত্রে ধ্বনিত হয়ে উঠল।

কথার উত্তর না পেয়ে দমাদম দরজার ওপরে লাথি চালাতে লাগল গার্ড, ড্রাইভার ও তাদের সঙ্গীরা।

অপরেশ এতক্ষণ এই সুযোগেরই অপেক্ষা করছিল। আততায়ী তার উলটোদিকের বার্থের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। সে চট করে উঠে দাঁড়িয়ে দরজাটা খুলে দিল।

আগন্তুক ততক্ষণে গাড়ি থেকে নেমে পড়েছে উল্টোদিকের জানালা গলিয়ে।

গাড়ির মধ্যে ততক্ষণে হুলুস্থুল সুরু হয়ে গেছে। কিন্তু অন্য কেউ আততায়ীকে অনুসরণ করতে সক্ষম না হলেও একজনের চোখে সে ধুলো দিতে পারেনি। সেই লোকটি হচ্ছে যদুপতি পোদ্দার।

যদুপতির ঘুম ভাঙতেই সে দেখতে পেল তার পাশে শায়িত বোম্বেযাত্রী সেই লোকটি নেই। কি আশ্চর্য, সে হঠাৎ এত অল্প সময়ের মধ্যে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল!

যদুপতি কিছুক্ষণ চিন্তা করল। তবে কি এই লোকটিই সেই আততায়ী? তার ধারণা কি তবে সত্য?

যদুপতি উঠে জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখতে পেল পাশের সেকেণ্ড ক্লাশ কম্পার্টমেণ্ট থেকে একজন লোক লাফিয়ে পড়ছে। সারা দেহ তার কালো একটা পোষাকে আবৃত। হাতে রিভলভার।

গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়ে সে দ্রুত ওপাশের দুটো কম্পার্টমেণ্ট পার হয়ে কোণের গাড়িতে গিয়ে উঠল।

যদুপতি তার গাড়ি থেকে নেমে সেই গাড়িটার দিকে এগিয়ে গেল।

লোকটি তখন মুখের আবরণ খুলে ফেলে সাধারণ যাত্রীদের পাশে বসে একটা সিগারেট ধরিয়ে পরম আনন্দে ধূমপান করছে।

যদুপতি কোনও কথা বলল না। নিঃশব্দে অনুসরণ করাই এক্ষেত্রে সুবিধাজনক উপায়। যদুপতি স্থির করল, সে যে সবকিছু জানতে পেরেছে তা যাতে অন্য কেউ বুঝতে না পারে সেদিকে তার তীক্ষ্ণদৃষ্টি অবশ্যই রাখতে হবে।

পাঁচ

—তদন্তের সূত্র—

ক্রিং ক্রিং ক্রিং...

—হ্যালো, কে?

—আমি বড়তলা থানার ও. সি. কথা বলছি।

—ও, নমস্কার।

—কি খবর?

—আমি আপনাকে ডেকেছিলাম কয়েকটা কথা বলবার জন্যে। কিন্তু আপনি তখন থানায় ছিলেন না বলে পরে ফোন করতে বলেছিলাম।

—কি ব্যাপার ফাল্গুনীবাবু?

—আপনার এলাকায় সম্প্রতি একটা খুন হয়েছে?

—হ্যাঁ।

—কে বলুন ত!

—ভূদেববাবু বলে একজন লোক।

—নিহত হবার কারণ?

—অজানা কোনও একজন আততায়ীর গুলিতে নিহত হয়েছেন তিনি।

—কোনও সূত্র পেয়েছেন কি?

—না।

—আপনার কি ধারণা?

—আমার ধারণা ঠিক কোনও একটা নির্দিষ্ট রূপ পায়নি। তবে তাঁর চাকর বাহাদুরের মুখে যা জানতে পারলাম, তাতে মনে হয়, কোনও একটা মূল্যবান বাক্সের লোভেই তাঁকে খুন করা হয়েছে। সেই বাক্সটি তিনি যাকে দিতে চেয়েছিলেন, সে বাক্সটি নিয়ে চলে গেছে বোম্বাইয়ের দিকে।

—হ্যাঁ, এতদূর পর্যন্ত আমি জানি। কিন্তু কে এই হত্যাকারী?

—তা এখনও জানি না।

—কিন্তু সেটুকু জানতেই ত চাই আমি। যাক্, আমি কতকগুলি সূত্র দিতে পারি আপনাকে। আশা করি..

—অবশ্যই মিঃ বোস। আপনার সাহায্য পেলে আমি আনন্দিত মনে তা গ্রহণ করব।

—ধন্যবাদ।

—কিন্তু আপনি কখন আসছেন?

—আমি আধঘণ্টার মধ্যেই থানায় আসছি। সেখান থেকে দু'জনে অকুস্থলের দিকে যাব।

—বেশ।

—আর ভূদেববাবুর চাকর বাহাদুর কোথায় আছে?

—আমরা তাকে সন্দেহ করে থানায় আটকে রেখেছি।

—না না, যতদূর জানি ও বেচারী নির্দোষ। তবে কয়েকটি কথা ওর কাছ থেকে জানবার আছে। তাই আমি থানায় না যাওয়া পর্যন্ত ওকে ছাড়বেন না যেন।

—আপনার কথা অনুযায়ীই কাজ হবে।

ফোনটা রেখে দিয়ে ফাল্গুনী দ্রুত নেমে এসে মোটরে চড়ে বসল।

* * *

ভূদেববাবুর চাকর বাহাদুর আর বড়তলা থানার ও. সি. মিঃ তালুকদারকে সঙ্গে নিয়ে ফাল্গুনী এল ভূদেববাবুর বাড়িতে।

যে ঘরখানায় তিনি নিহত হয়েছিলেন তার নির্দিষ্ট স্থানটিতে গিয়ে ফাল্গুনী মনোযোগের সঙ্গে চারিদিক নিরীক্ষণ করতে লাগল। কিন্তু আশেপাশে এমন কিছু দেখতে পাওয়া গেল না যা থেকে কোনও সূত্র পাওয়া যেতে পারে।

ফাল্গুনী বাহাদুরের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল—তুমি কোন্ দরজাটা দিয়ে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করেছিলে?

বাহাদুর বলল—হুজুর, গুলির শব্দ শুনতে পেয়ে আমি ছুটে ঘরের মধ্যে ঢুকি ওধারের দরজা দিয়ে। এসেই দেখি অন্য যে বাবুটি এসেছিলেন তাঁর হাতে একটা বাক্স। কর্তাবাবুর বুকে গুলি লেগেছিল। তিনি শুধু সেই বাবুটিকে লক্ষ্য করে বললেন—অপরেশ, তুমি এক্ষুণি চলে যাও। না হলে তোমার কাছ থেকে ওরা বাক্সটা কেড়ে নেবে। তারপরই বাবু জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। আমরা ওধারের জানালার দিকে যাই বাইরের দিক দিয়ে।

—কেন?

—সেই বাবু বলেছিলেন, ওধার দিয়েই নাকি গুলি ছুটে এসেছিল।

—হুঁ। কিন্তু তোমরা ওপাশে গিয়ে কোনও লোককে দেখতে পেয়েছিলে কি?

—না।

—তবে কি করে বুঝলে যে আততায়ী ওধারেই কোথাও ছিল?

—বাগানের নরম মাটিতে আমরা একজোড়া জুতোর ছাপ দেখতে পেয়েছিলাম।

—আচ্ছা, তারপর ওধারের বাগানে নিশ্চয়ই কেউ চলাচল করেনি?

—না।

ফাল্গুনী এবার মিঃ তালুকদারের দিকে চেয়ে বলল—চলুন স্যার, ওধারে গিয়ে দেখা যাক্ আততায়ীর পায়ের ছাপ এখনও ঠিকমত পাওয়া যায় কিনা। অন্য কোন প্রমাণও পাওয়া যেতে পারে।

—বেশ, চলুন।

বেশ ভাল করে বাগানের মাটি পর্যবেক্ষণ করে দেখা হল। একজোড়া পায়ের ছাপ বাগানের কিনারায় এসে শেষ হয়েছে। সেখান থেকে সুরু হয়েছে আর একজোড়া পায়ের ছাপ। যেন অন্য একজন লোক দূর থেকে এই আততায়ীকে অনুসরণ করেছিল।

ফাল্গুনী বলল—এটা কি ব্যাপার তা ত বুঝতে পারছি না মিঃ তালুকদার!

—না।

—অন্য একজন লোক দেখছি আততায়ীকে অনুসরণ

—কিন্তু কে সেই লোক?

—এই ভদ্রলোকই বোধ হয় যদুপতি পোদ্দার। ইনি কৌতূহলের বশেই এই চক্রান্তজালে আবদ্ধ হয়ে পড়েন। হাওড়া স্টেশন থেকে সেই আততায়ীকে অনুসরণ করে ইনি বোম্বাইয়ের দিকে গেছেন। স্টেশন থেকেই সেই ভদ্রলোক ফোন করে আমাকে এই কাজে নিযুক্ত করেছিলেন।

—আশ্চর্য লোক ত!

—হ্যাঁ, এই ধরণের একটু খামখেয়ালী এবং কৌতূহলী লোক বড় একটা দেখা যায় না। নিজের জীবন বিপদাপন্ন করেও ইনি এই জটিল সমস্যার পেছনে নিজেকে নিয়োজিত করেছেন।

—তা ত দেখতেই পাচ্ছি। তা হলে খুনী কি সেই অপরেশবাবুকে অনুসরণ করে বোম্বাইয়ের দিকে গেছে নাকি?

—আমার তাই ধারণা।

—কিন্তু এ ধরণের খুনের পেছনে কি স্বার্থ জড়িত ছিল?

—সেটা কি বুঝতে পারেননি?

—না।

—আমার মনে হয় এর কারণ নিহিত আছে সেই বাক্সটার মধ্যে।

—কোন্ বাক্স?

—যে বাক্সটি বৃদ্ধ ভূদেববাবু অপরেশবাবুকে দান করেছিলেন, এবং যে সেই বাক্সটি নিয়ে যাচ্ছে বলেই বিপদের খাঁড়া সব সময়ই তার উপরে উদ্যত রয়েছে।

—আশ্চর্য ত!

—আশ্চর্য কিছুই নয়। ভূদেববাবুর এই বাক্সটির পেছনে হয়ত দীর্ঘদিন আততায়ীর নজর ছিল। কিন্তু এর আগে সে বোধ হয় কোনও সুযোগ পায়নি। ভূদেববাবু বোধ হয় নিজের বিপদের কথা জানতেন। তাই সুযোগ পেয়ে তিনি চুপিচুপি সেটি অপরেশকে দিচ্ছিলেন যাতে সে ওটি বেশ ভালভাবে রক্ষা করে।

—কিন্তু কেন? অপরেশবাবুর সঙ্গে ভূদেববাবুর কি সম্পর্ক?

—সেটা এখনও বুঝতে পারছি না। যাক্, চলুন এবার জানালার চারদিকটা বেশ ভাল করে দেখা যাক্। জানালার খড়খড়ি তুলে এই আততায়ীকে গুলি করতে হয়েছিল। তাই এখানে তার হাতের ছাপ অবশ্যই পাওয়া যাবে।

—তা বটে।

—ওধারে বেশ ভাল করে নিরীক্ষণ করা উচিত।

জানালার চারপাশটা বেশ ভাল করে দেখে ফাল্গুনী তার ওপরে একটা চূর্ণ পদার্থ ছড়িয়ে দিল। জানালার শার্সির ওপর ফুটে উঠল অস্পষ্ট একটা ছাপ।

ফাল্গুনী বলল—মিঃ তালুকদার, এইবার ছাপটির ফটো তুলে নেবার ব্যবস্থা করুন। আমার মনে হয় কোনও পুরোনো অপরাধীর হাতের ছাপের সঙ্গে এটা মিলতে পারে। তাই ছাপটা তুলে রেকর্ডিং ডিপার্টমেন্টে পাঠিয়ে দিন মিলিয়ে দেখবার জন্যে। তাহলে আমাদের কাজ অনেকটা সহজসাধ্য হয়ে আসবে।

—তা ত বটেই।—মিঃ তালুকদার তক্ষুণি থানায় ফোন করে দিলেন, যাতে সেখান থেকে উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হয়। তারপর ফাল্গুনীর দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলেন—আপনার কি ধারণা আততায়ী বোম্বের দিকে গেছে?

ফাল্গুনী হেসে বলল—হ্যাঁ, ও ব্যাপারটার তদন্ত বেঙ্গল পুলিশের এলাকার মধ্যে শেষ হবে না। আমি শুধু হাতের ছাপ ইত্যাদি থেকে আততায়ীর পরিচয়টা জানতে চাচ্ছি। তারপর আপনাদের ইন্ট্রোডাক্সন্ নিয়ে আমাকে অবশ্যই বোম্বে যেতে হবে। কিন্তু এই হাতের ছাপ ছাড়া আর একটা বিষয়ও আমার জানবার ছিল। আশা করি ভালভাবে জেনে সেটাও আমাকে জানাবেন।

—কি ব্যাপার বলুন।

—ভূদেববাবুর প্রথম জীবনের যতটা ইতিহাস জানা যায় সেটা আমাকে জানাবেন। আর ওঁব সম্পত্তির বর্তমান উত্তরাধিকারী কে কে সেটাও জানা দরকার।

—বেশ, সবদিক দিয়েই আপনাকে সাহায্য করব মিঃ বোস। আমরা আপনার সফলতা কামনা করি।

ছয়

—বিক্রম সিং থাপা—

দু'দিন পরের কথা।

বেলা সাড়ে আটটা।

ফাল্গুনী বসু তার নিজস্ব কক্ষে বসে কি যেন একটা জটিল বিষয় নিয়ে চিন্তা করছিল এমন সময় বেজে উঠল টেলিফোনটা।

ফাল্গুনী গিয়ে রিসিভারটা তুলে নিল।

—হ্যালো, কে?

—মিঃ তালুকদার কথা বলছি।

—ধন্যবাদ! কি খবর মিঃ তালুকদার?

—অনেকগুলি জরুরী খবর আছে ফাল্গুনীবাবু!

—বলুন।

—প্রথম খবর হচ্ছে, হাতের ছাপের মালিকের সন্ধান পাওয়া গেছে।

—তাই নাকি? কে সেই লোক?

—বহুদিন আগে সে একটা জটিল কেসের আসামী ছিল। লোকটা বোধ হয় পাঞ্জাবী। তবে দীর্ঘদিন বাংলাদেশে থাকার জন্যে সে বেশ ভাল বাংলা বলতে পারত। ওর নাম বিক্রম সিং থাপা। কিছুদিন আগে খবর পাওয়া যায়, সে একটা বিরাট ক্রিমিন্যাল দলের প্রধান নায়ক।

—সেকি?

—হ্যাঁ। ওদের দলের নাম দিয়েছিল ওরা 'ক্রাইম্ ক্লাব'। ওই আড্ডা থেকে নানা ধরণের মারাত্মক আইন-অমান্যকারী কাজকর্ম করা হত বলে খবর পাওয়া গেল।

—এ খবরটা বোধ হয় বহুদিন আগে শুনেছিলাম!

—হ্যাঁ, প্রায় পাঁচ-ছ' বছর ধরে ওদের দলটা চলছে।

—কিন্তু আজ পর্যন্ত ধরা পড়েনি কেউ?

—না।

—সেকি?

—ওদের সিক্রেসিটা খুব বেশি। এই গোপনীয়তা ভেদ করে ওদের গ্রেপ্তার করতে পুলিশ সফল হয়নি।

—বুঝেছি।

—আর একটা দরকারী খবর আছে।

—কি ব্যাপার মিঃ তালুকদার?

—বছর ছয়েক আগে এই বিক্রম সিং থাপার সঙ্গে ভূদেববাবুর যে গোপন সংস্পর্শ ছিল সে প্রমাণ পাওয়া গেছে।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ, এরা দু'জনে তখন একই দলে কাজ করত।

—সো ইন্টারেস্টিং!

—কিন্তু ভূদেববাবু দলের সঙ্গে জড়িত থাকলেও তাঁর বিরুদ্ধে কোনও প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়নি কোনওদিন।

—আশ্চর্য।

—আমার মনে হয় এরা দু'জনেই তখন দলের লীডার ছিল। এই বিক্রম সিং থাপা থাকত সামনে আর ভূদেববাবু কাজ করতেন পেছনে। কিন্তু সেবার ধরা পড়ে যায় বিক্রম সিং। আমার মনে হয় বাক্সে যে সব দামী জিনিস ভূদেববাবুর কাছে ছিল তার আসল মালিক হওয়া উচিত এদের দু'জনের।

কিন্তু প্রমাণাভাবে সেবার ভূদেববাবু ধরা পড়েননি আর বিক্রম সিংয়ের তিন বছর জেল হয়েছিল। কিন্তু তিন মাস পরেই ও জেল থেকে পালায়। তারপর থেকে এতদিন পর্যন্ত সে ভূদেববাবুর পেছনে পেছনে ছিল শুধু এই বাক্সটা নেবার জন্যে। কিন্তু কোনওদিনই ভূদেববাবুর কাছ থেকে সে এটা নিতে পারেনি, কারণ তিনি ওটা অত্যন্ত সাবধানে রক্ষা করতেন।

—অনেকগুলো জিনিস পরিষ্কার হয়ে গেল আমার কাছে। আর একটা কথা।

—কি কথা বলুন।

—ভূদেববাবু কি সেবার ধরা পড়ার পরেই দল ছেড়ে দেন?

—হ্যাঁ।

—তবে বিক্রম সিং সম্বন্ধে কোনও কথা ত তিনি কখনও থানায় রিপোর্ট করেননি?

—না। ওদের মধ্যে এদিক থেকে একটা আশ্চর্য মিল ছিল। কারণ ওরা জানত থানায় গিয়ে সব কথা প্রকাশ করে বললে শাস্তি পেতে হবে দু'জনকেই।

—বুঝেছি। আপনার খবরগুলো আমার সত্যিই খুব কাজ লাগবে মিঃ তালুকদার।

—ধন্যবাদ।

—কিন্তু আরও যে দু'একটা কথা আমার জানবার ছিল, সে সম্বন্ধে ত কিছু জানালেন না!

—ও, আপনি বোধ হয় অপরেশবাবু নামে যে লোকটি বাক্সটি নিয়ে গেছেন তাঁর সম্বন্ধে প্রশ্ন করছেন?

—হ্যাঁ।

—এ সম্বন্ধে যতদূর জেনেছি সেটাই আপনাকে জানাচ্ছি। আমি খবর পেয়েছি যে অপরেশবাবু নামে যে লোকটি ভূদেববাবুর বাক্সটি নিয়ে বোম্বের দিকে গেছেন, তাঁর সঙ্গে ভূদেববাবুর কন্যা অণিমার বিবাহ স্থির হয়েছিল।

—অণিমা?

—হ্যাঁ, ভূদেববাবুর সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হচ্ছেন তাঁর একমাত্র মেয়ে অণিমা দেবী। তিনি ছিলেন পাটনাতে। পাটনাতেই তাঁর সঙ্গে বোধ হয় অপরেশবাবুর পরিচয় হয়। অপরেশবাবুর সঙ্গে অণিমা দেবীর পরিচয় নিবিড়তর হয় এবং ওঁদের বিবাহ স্থির হয় বলেই বোধ হয় ভূদেববাবু এই বাক্সটা অপরেশবাবুর হাত দিয়ে বোম্বেতে পাঠান। তাঁর ইচ্ছা ছিল সেটি বোম্বের কোনও এক ব্যাঙ্কের সেফ্ ডিপজিট ভল্টে জমা রাখা হবে।

—কিন্তু বিক্রম সিং সম্বন্ধে কি তিনি একেবারেই ওয়াকিবহাল ছিলেন না?

—অবশ্যই তিনি জানতেন। আর সেই জন্যেই অত্যন্ত গোপনে তিনি ওটি বোম্বেতে চালান দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তার আগেই বিক্রম সিং সব কিছু টের পেয়ে যায়। যে সময় তিনি বাক্সটা অপরেশবাবুকে দেন, সেই সময়েই সে বাইরে থেকে ভূদেববাবুকে গুলি করে। কিন্তু বাক্সটা নিতে সে সক্ষম হয়নি বলেই বোধ হয় বোম্বে পর্যন্ত তাঁকে অনুসরণ করে চলেছে।

—কিন্তু অণিমা দেবী পাটনায় আছেন কিনা সে খবর জানেন কি?

—হ্যাঁ, যতদূর খবর নিয়ে জানলাম, তিনি চার-পাঁচ দিন আগেই অপরেশবাবুকে কলকাতায় পাঠিয়ে নিজে বোম্বের দিকে গেছেন।

আর কোনও কথা না বলে ফাল্গুনী টেলিফোনের রিসিভারটা নামিয়ে রেখে ভবিষ্যতের কার্যপদ্ধতি সম্বন্ধে চিন্তা করতে লাগল।

সাত

—গুজরাটী হোটেল—

সন্ধ্যা হয়ে গেছে অনেকক্ষণ।

রাত সাড়ে আটটার কম নয়। আঁধারের আড়ালে পৃথিবী মুখ লুকিয়েছে।

বোম্বের দাদার অঞ্চলের ক্ষুদ্র একটি রাস্তা থেকে যে অপরিসর পথটি উত্তরদিকে বেরিয়ে গেছে তারই মধ্যে অবস্থিত এই গুজরাটী হোটেলটি।

হোটেলটাতে সাধারণ কুলী, মজুর ও নীচুশ্রেণী লোকেরা পানাহার করে থাকে। রাত একটু গভীর হলেই হোটেলের কক্ষগুলিতে বয়ে যেতে থাকে স্ফূর্তির স্রোত।

হোটেলের মালিক পট্টনলাল নামে এক ব্যক্তি। দোহারা চেহারা তার। স্ফীত বুক। কানের পাশে ডানদিকে বিরাট একটা ক্ষতচিহ্ন। বহুদিন পূর্বে কোনও একসময় সে যে কি ধরণের দুর্দান্ত ছিল ক্ষতচিহ্নটা তারই সাক্ষ্য বহন করে চলেছে।

হোটেলে লোকজনের সংখ্যা আজ খুব বেশি নয়। মাসের শেষদিকে যখন সাধারণ লোকের হাতে পয়সাকড়ির অভাব থাকে তখন ভিড়টা একটু কমই হয়ে থাকে। তবে মাসের প্রথম সপ্তাহে ভিড়টা হয় বেশি। তার কারণও অবশ্য আছে। মাসের গোড়ার দিকে মাইনে পায় বলে শ্রমিক ও মধ্যবিত্তদের হাতে পয়সা থাকে বেশি।

এই হোটেল থেকে কিছুদূরে একটি বাড়ির কোণে দেখা গেল অদ্ভুত পোষাক পরা একজন লোককে। কালো স্যুট পরনে। মাথায় ফেল্ট হ্যাট। মুখটা কালো আবরণে ঢাকা। রাতের আঁধারে একটি ছায়ামূর্তি যেন। নিঃশব্দে সে দাঁড়িয়ে কারও জন্যে অপেক্ষা করছিল। কিন্তু কে যে তার লক্ষ্য তা তার হাবভাব দেখে বোঝা যায় না মোটেই। এইভাবে বহুক্ষণ কেটে গেল।

একসময় দূরে দেখা গেল বেঁটে মত একটি লোক ধীরপায়ে হোটেলের দিকে এগিয়ে আসছে।

লোকটিকে দেখেই ছায়ামূর্তির মনে যেন আনন্দের সঞ্চার হল। সে অপেক্ষা করতে লাগল চারদিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিক্ষেপ করে।

আগন্তুক বেঁটে লোকটি ধীরে ধীরে হোটেলে প্রবেশ করল। হোটেলের সাধাবণ খদ্দেররা একটা বড় হলঘরে বসে পানাহারে মত্ত ছিল। তার ঠিক পাশের ছোট একটা ঘরে যে জুয়াখেলার বন্দোবস্ত আছে সেখানেও ব্যস্ত ছিল অনেকে। সেখান থেকে ভেসে আসছিল ঘন ঘন চীৎকার আর হট্টগোলের রেশ।

আগন্তুক বেঁটে লোকটি ধীরে ধীরে হোটেলের মধ্যে প্রবেশ করে সামনেই একজন লোককে দেখতে পেয়ে প্রশ্ন করল—আমি মালিক শ্রীপট্টনলালের সঙ্গে দেখা করতে চাই।

—ও, তিনি ভেতরে আছেন।

—ডেকে দাও তাঁকে।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, এখুনি ডেকে দিচ্ছি।

লোকটির হাতে একটা দশটাকার নোট গুঁজে দিতেই সে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে শিস দিতে দিতে ভিতরের দিকে প্রস্থান করল।

একটু পরেই মালিক শ্রীপট্টনলাল খোঁড়াতে খোঁড়াতে হোটেলের মধ্যে প্রবেশ করল।

—কি খবর স্যার?

—চিনতে পার?

—আজ্ঞে আপনি হুঁজুর। হেঁ হেঁ। চিনব না মানে...আপনার মত মহাজন ব্যক্তি...

—মনে আছে তাহলে?

—বনওয়ারীলালজীকে চেনে না দাদারে এমন লোক ক'জন আছে আমার জানা নেই।

—তা ভাল। কিন্তু একটা জরুরী খবরের দরকার ছিল যে পট্টনলাল।

—কি খবর বলুন।

—এ অঞ্চলের সবকিছু খবরাখবর তোমার জানা আছে ত?

—হুঁজুরের দয়ায়, এ এলাকায় যা কিছু ঘটনা ঘটুক না কেন সব আমার এই নখদর্পণে।

—ভাল ভাল। তোমার নখদর্পণের জোর যে কত তা এখুনি প্রমাণ হয়ে যাবে।

—কিভাবে হুঁজুর?

—একটা কথার উত্তর দাও দেখি।

—কি, খবরটবর কিছু নাকি?

—হ্যাঁ হে, দু'পয়সা বকশিস মিলবে।

—বেশ, জিজ্ঞেস করুন। হুঁজুরদের দয়াতেই ত খেয়ে-পরে বেঁচে আছি।

—শোন। আমার এক দুষ্ট বন্ধু আমাকে ঠকিয়ে গা-ঢাকা দিয়েছে। তার খোঁজ চাই।

—তার নামটা বাৎলে দিন হুঁজুর।

—হুঁ, লোকটা বাঙালী কুত্তা। অপরেশ তার নাম। দশ লাখ টাকার মাল নিয়ে বাংলা মুলুক ছেড়ে পাড়ি দিয়েছে বোম্বাইতে।

—ওহো, তাহলে হুঁজুরের সঙ্গে শত্রুতা হল কি করে?

—বাজে বকো না।

—না না, ঘাট মানছি। কিন্তু ব্যাপার কি?

—পাঁচশো মিলবে। শুধু লোকটার খবর চাই। আমার কাছে দশ হাজার টাকায় বিক্রী করবার জন্যে রাজি হয়ে জিনিসগুলো নিয়ে সে এখন দিব্যি গা-ঢাকা দিয়েছে।

—এখন উপায়?

—ওর খোঁজটা পেলেই একেবারে টুঁটি টিপে ধরব।

—কিন্তু হুঁজুর এত বড় একটা কাণ্ড চট্ করে করে ফেলতে গেলে আবার পুলিশ-টুলিশ...

—সে ভাবনা তোমার নয় পট্টনলাল।

—বেশ। তাহলে হুঁজুর আমার এখানেই থাকুন। একটা ঘর দিচ্ছি। খান দান, বিশ্রাম করুন। তারপর খবরটা জেনে নিয়ে আপনাকে বলে দিচ্ছি।

—তোমার হোটেলেই থাকব পট্টনলাল। কোনও চিন্তা নেই তোমার। কিন্তু খবরটা আগে।

—রুপেয়া?

—এই নাও অগ্রিম তিনশো।

—বাঃ বাঃ, তোফা। এবার তাহলে শুনুন হুঁজুর। তিনি অর্থাৎ অপরেশ নামের একজন বাঙালী লোক আর একটি মেয়ে এই হোটেলেরই দোতলায় তের নম্বর ঘরে আজ এসে উঠেছেন।

—বল কি?

—হ্যাঁ হুঁজুর।

—কিন্তু মেয়ে?

—হ্যাঁ হুঁজুর। যুবতী নারী।

—তার নাম-টাম কিছু জান কি...

—হ্যাঁ হুঁজুর, হোটেলের খাতায় লেখা আছে অণিমা দেবী না কি যেন।

—অণিমা? অণিমা এখানে?

—হ্যাঁ।

—কিন্তু অণিমা এখানে কেন? পাটনা থেকে তাহলে এর মধ্যেই এসে পড়েছে দেখতে পাচ্ছি! কিন্তু কি তার এই হঠাৎ আগমনের উদ্দেশ্য?

—জানি না হুঁজুর। তবে খবরটুকু পাকা।

—ধন্যবাদ। তোমার হোটেলেই থাকব আমি। এই নাও অগ্রিম টাকা দুশো। আজ থেকে একটা সিট্ রিজার্ভ করলাম আমি।

হো হো করে হাসতে হাসতে পট্টনলাল খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এগিয়ে চলল হোটেলে সিটের ব্যবস্থা করতে।

আট

—চোরের ওপর—

মিনিট দশেক পর।

পট্টনলালের হোটেলে ঠিক অপরেশের পাশের ঘরটি নির্দিষ্ট হল বনওয়ারীলালের জন্যে। কাজ শেষ করে পট্টনলাল নিচে নেমে এল। খুসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল তার মুখ। সত্যিই আজ তার জীবনের একটা শুভদিন সন্দেহ নেই। পর পর এতগুলো টাকা তার ভাগ্যে এসে জুটেছে। নিজের ঘরটিতে বসে চিন্তায় বিভোর হয়ে পড়ল পট্টনলাল।

খট্ খট্ খট্...

পর পর তিনবার দরজার কড়াটা ধরে কে যেন সজোরে ঝাঁকুনি দিল বলে মনে হল তার।

—কে?

—আমি।

গলাটা যেন পরিচিত।

পট্টনলাল দরজা খুলল।

আগন্তুকের হাতে একটা নিকষকালো রিভলভার। তার কালো চক্‌চকে নলটা যেন পট্টনলালের দিকে চেয়ে বিষাক্ত হাসি হাসছে। এভাবে প্রকাশ্যে তার হোটেলে তার বুকের ওপর রিভলভার তুলে ধরবার সাহস জোগাল কার?

—কে আপনি? তেজের সঙ্গে কথাটা বললেও পট্টনলালের গলার স্বরটা কেঁপে উঠল যেন।

আগন্তুক ঈষৎ হেসে মুখের ওপরকার কালো কাপড়ের আবরণটা সরিয়ে ফেলল।

—চিনতে পার পট্টনলাল?

—আপনি, আপনি এখানে? মানে হুঁজুর ক্রাইম্ ক্লাব...

—থাক্, ওরকম উল্টোপাল্টা কথা বলে কোনও লাভ নেই পট্টন। আমি স্বীকার করছি আমিই ক্রাইম্ ক্লাবের জেনারেল সেক্রেটারী বিক্রম সিং থাপা। দেড় ঘণ্টার ওপর আমি তোমার হোটেলের বাইরে ওই ব্লাইণ্ড লেনের মোড়ের ছোট বাড়িটার আড়ালে দাঁড়িয়েছিলাম। ঠিক যে জন্যে অপেক্ষা করছিলাম আমি, সে কাজ সফল হয়েছে আমার।

—হুঁজুরের কথাটা ঠিক বুঝতে পারছি না আমি। মানে আপনি সফল হলেন যে কাজে সেটা যে কি তা আমি জানব কেমন করে!

—জানবার প্রয়োজন নেই। যে লোকটার জন্যে পরম সমাদরে সিটের ব্যবস্থা করলে সে আছে কোন্ ঘরে?

—তের নম্বর ঘরের পাশে হুঁজুর—মানে চৌদ্দ নম্বর...

—কোথায়?

—দোতলায়।

—তের নম্বর ঘরে কে আছে?

—কে নয় হুঁজুর, বলুন কারা।

—তার মানে?

—একজন বাঙালী আর একটা মেয়ে...

—কিন্তু তুমি এভাবে টাকার লোভে এই শয়তান লোকটাকে—মানে এই বনওয়ারীলালকে হোটেলে আশ্রয় দিলে কেন?

—মানে হুঁজুর বুঝতেই ত পারছেন, আমরা গরীব মানুষ। টাকাপয়সা দিলে সবাইকেই জায়গা দিতে বাধ্য হই। কিন্তু কিছু যেন মনে করবেন না হুঁজুর, লোকটাকে আপনার শত্রু জানলে কি আর...

—শত্রু? না না, শত্রু সে মোটেই নয়। ভালই হয়েছে পট্টনলাল, আমি চোরের ওপর আর একহাত খেলা দেখাব বলে মনস্থ করেছি। এখন কতদূর সফলতা অর্জন করতে পারব সেটাই হচ্ছে দুশ্চিন্তা। তোমাদের মত বেইমান লোকেরা যখন এখানে অবস্থান করছে তখন প্রত্যক্ষভাবে সফল হওয়ার আশা একটা দুরাশা মাত্র। কিন্তু মনে রেখ পট্টনলাল, এতটুকু বেইমানী প্রকাশ হয়ে পড়লে তোমাকে রক্ষা করে এমন লোক পৃথিবীতে নেই।

পট্টনলালের মুখের চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে এসেছিল। সে অনেক কষ্টে ঠোঁটে হাসি ফুটিয়ে বলল—মানে আপনি বিনা কারণে মিথ্যা এভাবে রাগ করলে কি করে চলে হুঁজুর...মানে ক্রাইম্...

—থাম! তোমার বক্তৃতার প্রবাহ বন্ধ না হলে তোমার মুখ জোর করে বন্ধ করতে বাধ্য হব আমি। শয়তানীরও একটা সীমা আছে পটুনলাল। যাক্, আমি চললাম দোতলায়। দেখি ওধারে তোমার দোস্ত বনওয়ারী এতক্ষণে কতদূর কি করল।

—কোনও দিনই সে আমার দোস্ত নয়, হুঁজুর।

—সে কথা আর মুখ ফুটে না বললেও চলবে। পৃথিবীতে ওর মত শয়তান লোক ক'টি আছে আমার জানা নেই। যেদিন সে বুড়োর টাকার সন্ধান পেয়েছে সেদিন থেকে ও তার পেছনে যেন ছিনে জোঁকের মত লেগে ছিল। অবশেষে অপরেশটাকে দশ হাজার টাকার লোভ দেখিয়ে কাজ বাগাবার চেষ্টায় ছিল শয়তান। শেষে কিনা বোম্বে পর্যন্ত ধাওয়া করেছে। আমি ওর খোঁজ পেয়েই তক্কে তক্কে ছিলাম। এবার দেখি ওরই একদিন কি আমারই একদিন।

রিভলভারটা পকেটে ফেলে সিংহবিক্রমে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায় বিক্রম সিং।

ওধারে তখন হোটেলের ঠিক সামনে একটা পাবলিক টেলিফোন থেকে যদুপতি পোদ্দারকে ফোন করতে দেখা গেল। স্থানীয় পুলিশ স্টেশনের নম্বর চেয়ে নিয়ে সে বলছিল—হ্যালো, ডেঞ্জারাস অ্যাক্সিডেন্ট হতে চলেছে। সিরিয়াস্ থিংস্ উইল্ টেক্ প্লেস্। মারাত্মক ব্যাপার ঘটতে পারে। বিক্রম সিং থাপা—ক্রাইম্ ক্লাবের দলপতি—একজন বাঙালীকে হত্যা করবার জন্যে তার পিছু নিয়েছে। দাদারের গুজরাটী হোটেলে হানা দিয়েছে সে...হ্যালো, যদুপতি পোদ্দার স্পীকিং...হ্যালো...

নয়

—মুখোমুখি—

এধারে সেই হোটেলের তের নম্বর ঘরে ঠিক সময় যে দৃশ্যের অভিনয় চলছিল তা যেমন মারাত্মক তেমনি অভূতপূর্ব।

একটা খাটে হেলান দিয়ে শুয়ে ছিল অণিমা। অপরেশ দাঁড়িয়ে ছিল ঠিক তার পাশটিতে।

অণিমা বলল—তুমি কালকের মধ্যেই ওটা ব্যাঙ্কে রাখবার ব্যবস্থা করে ফেল।

অপরেশ বলল—সে ত বটেই, আর একমুহূর্তও যে ওটা এখানে রাখা নিরাপদ নয় তা জানি। কিন্তু আজ রবিবার, ব্যাঙ্ক বন্ধ। কালও অর্ধেক দিন বন্ধ গেছে। আগামীকালের আগে সম্ভব হচ্ছে না কোনও মতেই।

অণিমা প্রশ্ন করল—তুমি কি ঠিক জান যে কেউ তোমাকে অনুসরণ করেছে?

অপরেশ বলল—হ্যাঁ, সে সম্বন্ধে সন্দেহের কোনও অবকাশই আমার নেই।

—কি করে এ ধারণা হল তোমার?

—ব্যাপারটা আরও খুলে না বললে কি তোমার বুঝতে এতই অসুবিধা হচ্ছে?

—না, তবে...

—বেশ, ভাল করেই বুঝিয়ে দিচ্ছি তোমায়। আমি ট্রেনের যে কামরাতে করে চলেছিলাম, ঠিক সেই কামরাতেই অপর যে একজন যাত্রী ছিল তার বয়স ও চেহারা ছিল প্রায় আমার মতই। যে লোকটা আমাকে অনুসরণ করেছিল, সে ট্রেনের কামরায় উঠে ভুল করে তাকেই আক্রমণ করে বসে। তাধ এই ভুলের জন্যেই সে যাত্রা বাক্সটা রক্ষা পেয়ে যায়। ওধারে গার্ড ও ট্রেনের অন্যান্য সকলে এসে পড়ার জন্যে সে দ্রুত পলায়ন করে আত্মরক্ষা করতে বাধ্য হয়।

—কিন্তু তার পরেও সে যে বোম্বে পর্যন্ত অনুসরণ করবে তার নিশ্চয়তা কি?

—যে লোক ভূদেববাবুকে হত্যা করতে পারে নির্বিবাদে, যে গোপনে মাঝরাতে ট্রেনের কামরায় হানা দিয়ে বাক্সটা ছিনিয়ে নেবার জন্যে চেষ্টা করতে পারে, তার অসাধ্য কাজ কিছুই নেই। সে জানে ওটার মূল্য কত। তাই একবার ব্যর্থ হলেও পরবর্তীবারে সফল হবার আশা নিয়ে নিশ্চয়ই অনুসরণ করেছে আমাকে।

—বুঝেছি। কিন্তু এখন পর্যন্ত তাকে দেখলাম না কেন? কিংবা সে যে অনুসরণ করেছে তার প্রমাণও ত পাচ্ছি না।

—হয়ত ও সুযোগ খুঁজছে।

—তা অবশ্য...

কথা শেষ হল না।

খট্ খট্ খট্...

কড়াটা নড়ে উঠল সজোরে।

—কে? প্রশ্ন করে অপরেশ।

—একটু জরুরী প্রয়োজনে দেখা করতে চাই। দরজাটা খুলুন দয়া করে।

অপরেশ খানিকটা চিন্তা করেই দরজাটা খুলে ফেলল। কিন্তু খুলে ফেলতেই যাকে সে সামনে দেখতে পেল তাকে এভাবে এখানে দেখবার জন্যে সে যেন প্রস্তুত ছিল না।

—তুমি? ভূত দেখার মতই চমকে উঠল অপরেশ।

—হ্যাঁ আমি। আমি বনওয়ারীলাল।

—কিন্তু কি প্রয়োজনে তোমার এখানে আগমন তা কি জানতে পারি আমি?

—সেটা অবশ্যই তোমার অজানা নয় অপরেশ।

—অজানা না থাকলেও খুব বেশি জানি বলেও মনে হচ্ছে না যেন।

—বেশ, সোজা কথাতেই আসা যাক্, কি বলো বন্ধু। আমি চাই সেই বাক্সটা যেটা তুমি আমার কাছে দশ হাজার টাকায় বিক্রী করবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে।

—প্রতিশ্রুতি দিইনি। দেব কিনা চিন্তা করবার অবকাশ নিয়েছিলাম মাত্র। কিন্তু এখন ভেবে দেখছি ওটা দেওয়া সম্ভব হবে না আমার পক্ষে।

—কেন?

—আমি মনস্থির করেই কথা বলছি।

—কিন্তু তুমি ওটা আমার কাছে দেবে এই শর্তেই ওটার সম্বন্ধে সবকিছু খোঁজখবর দিয়েছিলাম।

—কথা বাড়িয়ে লাভ নেই বন্ধু। এখন ওটা আমার সম্পত্তি। আমি না দেওয়া পর্যন্ত তোমার ওটা পাবার নিশ্চয়ই কোনও অধিকার নেই। কাজেই তুমি নিশ্চিন্তে পথ দেখতে পার।

—কিন্তু...

—তোমার ধূর্ততার সীমারেখা আমার জ্ঞানের মধ্যে এসে গেছে। কাজেই ওসব বাজে কথায় ভুলিয়ে দেবার চেষ্টা করো না।

—ওটা দেবে না তাহলে?

—না।

—এই তোমার শেষ কথা?

—হ্যাঁ, দিস্ ইজ মাই ফাইন্যাল ওয়ার্ড।

কথার সঙ্গে সঙ্গেই বনওয়ারীলাল যেন স্প্রিংয়ের মত লাফিয়ে উঠল মেঝের ওপর

হাত দেড়েক। আর সঙ্গে সঙ্গে তার জোড়া পায়ের যে লাথিটা গিয়ে অপরেশের পেটের ওপর পড়ল সেটা সহ্য করা যে কোনও সাধারণ মানুষের সাধ্যাতীত।

অপরেশ মেঝের এককোণে গিয়ে ছিট্‌কে পড়তেই বনওয়ারী জামার ভিতর থেকে একখানা ধারাল ছোরা বের করে এগিয়ে গেল তার দিকে।

চোখের সামনে এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখতে পেয়ে আতঙ্কে শিউরে উঠল অণিমা। তার কণ্ঠ ভেদ করে একটা আর্ত চীৎকার বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল।

ওধারে বনওয়ারীলাল ধারাল ছোরাটা হাতে এগিয়ে এসে অপরেশের বুকের ওপরে বসে পড়ল। তারপর অপরেশের বুকে ছোরাটা বসিয়ে দেবার জন্যে সে যেই হাতটা তুলেছে এমন সময় প্রচণ্ড একটা শব্দ শুনতে পেয়ে চমকে উঠল অণিমা। কোথা থেকে আচমকা একটা পিস্তলের গুলি এসে লাগল বনওয়ারীলালের হাতে। হাত থেকে ছোরাটা ছিটকে পড়ল তার। হাতটা চেপে ধরে ছুটতে ছুটতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সে। অপরেশের জ্ঞান তখনও সম্পূর্ণ ফিরে আসেনি।

অণিমা দ্রুত ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে গেল। তার চোখের সামনে ভেসে উঠল একটা অদ্ভুত মূর্তি দ্রুত করিডর পার হয়ে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে যাচ্ছে।

হোটেলের ঠিক সামনেই তখন একটা পুলিশ ভ্যান এসে থামল।

দশ

—অনুসন্ধান—

তদন্তের সূত্রগুলি একত্র করে প্রথমেই যে ধারণাটা ফাল্গুনীর মাথায় এসে বাসা বাঁধল তা হচ্ছে, এ-রহস্যের কেন্দ্রস্থল হচ্ছে বোম্বে শহর। তাই খুনীকে গ্রেপ্তার করতে হলে অথবা সফলতার পথে অগ্রসর হতে হলে তাকে অবশ্যই বোম্বের পথে পাড়ি দিতে হবে।

কিন্তু ওধারে ঘটনার গতি এতদিনে কতদূর এগিয়ে চলেছে তা কে জানে! চিন্তিত হয়ে পড়ল ফাল্গুনী। তাকে এগিয়ে যেতে হবে অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে। যদুপতি পোদ্দার নামে যে লোকটা তাকে ফোন করে খবরগুলো জানিয়েছিল তাকে পেলে সেখানে তার সুবিধা হবে। কিন্তু তা না হলে বিচিত্র এক জটিল পরিস্থিতির সামনে গিয়ে পড়বে সে। তখন তার কোনও উপায়ই থাকবে না ব্যাপারটির মীমাংসা করবার। কিন্তু অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হবার মত কোনও উপায়ই নেই তার সামনে। তবে?

হ্যাঁ, ফাল্গুনীর মনে পড়ল। তার সামনে একটা উপায় এখনও খোলা আছে, আর তা হচ্ছে প্লেনে চড়ে বোম্বের পথে পাড়ি দেওয়া। মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সে বোম্বে গিয়ে পৌঁছতে পারে বটে, কিন্তু সেখানে প্রত্যেকটি থানায় খবর নিয়ে কতদূরই বা এগোনো যাবে? তবুও যতটা হয় করতে তাকে হবেই। ফাল্গুনী তার চাকরটাকে ডেকে হুকুম দিল—এক্ষুণি বিছানাপত্র যা আছে সব গুছিয়ে ফেল একটা হোল্ডঅল্ আর সুটকেসে। আর কিছুর প্রয়োজন নেই। আমাকে আজই বোম্বে যেতে হবে।

– বোম্বে?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, সেখানে আজ বিকেলের মধ্যেই পৌঁছতে হবে আমাকে! আজ রাতে সেখানে কোন্ দৃশ্যের অভিনয় হবে তা ভেবে আমি ভয়ে আঁৎকে উঠছি।

—কিন্তু এখন বেলা ন'টা। সন্ধ্যার মধ্যে কি করে বোম্বে পৌঁছবেন হুজুর?

—সে ভাবনা তোর নয়। আমাকে প্লেনে যেতে হবে। এক্ষুণি ব্যাঙ্কে যাচ্ছি টাকা তুলতে। সেখান থেকে সোজা দমদম এরোড্রোমে যাব। সেখানকার মিঃ মরিস্ আমার বন্ধু। যা করে

হোক ব্যবস্থা হবেই। তুই সোজা জিনিসপত্র নিয়ে দমদম চলে যাবি ট্যাক্সি করে, আমার জন্যে অপেক্ষা করবি সেখানে।

—আচ্ছা হুজুর।

কথা না বাড়িয়ে ফাল্গুনী সোজা ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

* * *

আলোকোজ্জ্বল বোম্বে শহর।

যেন সাজানো একটি ছোট্ট কবিতা। অপূর্ব সৌন্দর্যে মণ্ডিত।

কিন্তু এর প্রতিটি গগনচুম্বী প্রাসাদের মনোহারিত্বের পেছনে কোন্ গোপন অন্ধকোণে যে একটা বিষাক্ত বাষ্পের কুণ্ডলী উদ্বেল হয়ে উঠেছে তা ছিল ডিটেকটিভ ফাল্গুনী বসুর ধারণার বাইরে।

মাত্র আধঘণ্টা আগে সে এখানে এসে পৌঁছেছে। সান্তাক্রুজ এরোড্রোম থেকে ফাল্গুনী স্থির করল যে দাদারে তার এক বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে উঠবে। ম্যালাডেও অবশ্য তার এক দূরসম্পর্কীয় আত্মীয় থাকেন, কিন্তু দীর্ঘদিন তাঁর কোনও খোঁজখবর ফাল্গুনীর জানা ছিল না। তিনি সেখানে আছেন কিনা কে জানে!

একখানা বেবী ট্যাক্সিতে চেপে বসে ফাল্গুনী বলল—চালাও দাদার...

ঘণ্টাখানেকের কিছু বেশি সময় লাগল দাদারে পৌঁছতে। সমস্ত জিনিসপত্র বন্ধুর বাড়িতে রেখে স্বল্পকথায় সবকিছু আলাপ-আলোচনা শেষ করে ফাল্গুনী আবার গাড়িতে উঠে বলল—থানার দিকে চালাও। তার ইচ্ছা ছিল নিজের পরিচয় দিয়ে সে স্থানীয় থানার সাহায্য চাইবে। তারপর প্রত্যেক থানায় খোঁজ নিয়ে জানবে, যদুপতি পোদ্দার বা অপরেশের কোনও খোঁজ পাওয়া যায় কিনা।

থানার অফিসার তার সঙ্গে পরিচিত হয়ে আনন্দিত হলেন। তাঁর নাম মিঃ দীনদয়াল সিং। জাতিতে পাঞ্জাবী। কাজে অফুরন্ত উৎসাহ। ফাল্গুনীর কাছ থেকে সমস্ত শুনে তিনি বললেন—হ্যাঁ, মাত্র আধঘণ্টা আগে যদুপতি পোদ্দার নামে একজন লোক আমাকে ফোন করেছিল বটে, কিন্তু আমি তার সেই ফোনটাকে অতটা গ্রাহ্য করিনি। তবে একবার পেট্রোলে সেদিকে যাব এটা অবশ্য স্থির করে ফেলেছি।

তাঁর কথা শুনে ফাল্গুনী যেন চমকে উঠল—বলেন কি স্যার! এর পেছনে একটা সাংঘাতিক ষড়যন্ত্র লুকিয়ে আছে। চলুন এক্ষুণি আমরা সেদিকে যাই। এতক্ষণ যে কি ব্যাপার ঘটে গেছে তা জানা নেই আমার। সত্যি ব্যাপারটা বহুদূর গড়িয়েছে।

—কি ব্যাপার স্যার?

ফাল্গুনী তখন ধীরে ধীরে সমস্ত ঘটনা খুলে বলল তাঁর কাছে। শুনে তিনি বললেন—সো স্ট্রেঞ্জ! তিনি তক্ষুণি চারজন আর্মড পুলিশ নিয়ে লরীতে চেপে বসলেন।

এগারো

—ত্রিমূর্তি—

থানায় টেলিফোন করেও যদুপতি নিশ্চিন্ত হতে পারে না।

ঘটনার আকস্মিক পরিবর্তন ও দ্রুতগতি বিস্মিত করেছে তাকে। কে যে কোন্ দলে আর কে কি উদ্দেশ্য নিয়ে এগোচ্ছে সেই জটিল জাল ভেদ করাই যেন সবচেয়ে অসম্ভব বলে মনে হচ্ছিল তার।

হোটেলের উপরে দৃষ্টি রাখবে বলেই স্থির করল সে।

কিন্তু হোটেলে বিক্রম সিং-এর দেখা আর পাওয়া গেল না। অপরেশ আর অণিমার সঙ্গে দেখা করলে কেমন হয়!

ওদের ঘরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল যদুপতি। বাধা দিল একজন ওয়েটার।

—কাকে চান?

—অপরেশবাবুকে।

—কি প্রয়োজন?

—জরুরী।

—আগে তাঁকে খবর দিয়ে আসি।

—আমার প্রয়োজন অত্যন্ত জরুরী! অতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারব না।—ওয়েটারের বাধা প্রায় অগ্রাহ্য করেই সে দোতলার দিকে পা বাড়াল।

কিন্তু বাইরে থেকে শোনা গেল প্রচণ্ড ধস্তাধস্তির শব্দ।

জানালা দিয়ে উঁকি মারতেই যে দৃশ্য তার চোখে পড়ল তা সত্যিই ভয়াবহ।

কলকাতায় যে লোকটা দশ হাজার টাকা দিয়ে অপরেশের কাছ থেকে বাক্সটা কিনতে চেয়েছিল সেই লোকটা একটা ধারাল ছোরা বের করে অপরেশের বুকের ওপর বসে তাকে খুন করতে উদ্যত।

আতঙ্কে শিউরে উঠে অণিমা ঘরের এককোণে দাঁড়িয়ে। অন্য কোনও উপায় না পেয়ে যদুপতি শেষ সম্বল রিভলভারটা তুলে আততায়ী বনওয়ারীর হাত লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ল।

এ ঘটনাটার বর্ণনা আগেই দেওয়া হয়েছে। বনওয়ারী তক্ষুণি একলাফে অপরেশকে ছেড়ে দিয়ে দরজা খুলে সিঁড়ির দিকে দৌড় দিল।

আর তার ঠিক একটু পরেই তাকে অনুসরণ করল অণিমা।

যদুপতি হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। শুধুমাত্র বিক্রম সিং থাপার অস্তিত্বই সে জানত, কিন্তু কলকাতার বনওয়ারীও যে ওর পেছনে ছুটে এসেছে তা তার ধারণার সম্পূর্ণ বাইরে ছিল। আর সকলের পেছনে এসেছে সে। এখন এই ত্রিমূর্তির সংগ্রামে কে জয়ী হবে তা ভগবান জানেন!

কিন্তু ফাল্গুনী বসুকে সে যে এই কাজে নিয়োগ করল, সে কি ঘটনার গুরুত্ব এতটুকুও উপলব্ধি করেনি?

আর করলেও সে এখন পর্যন্ত এখানে এসে উপস্থিত হল না কেন? তার পক্ষে বেশিক্ষণ এভাবে এদের বাধা দেওয়া হয়ত সম্ভব হবে না।

বাইরে গাড়ির শব্দ শোনা গেল।

ভারী বুটের শব্দ এগিয়ে এল হোটেলের দিকে। বোধ হয় পুলিশ এসেছে। তার ফোন পেয়েই বোধ হয় পুলিশ এসে হোটেলে হানা দিয়েছে। যদুপতি একটু নিশ্চিন্ত হল। যাক্ এবার আর ভয়ের কিছু নেই।

কিন্তু ওকি?

রাস্তার পাইপ বেয়ে একজন লোক জানালার উপরে এসে উঠেছিল। দোতলার জানালায় কোনও গরাদ নেই। লোকটা লাফিয়ে ঘরের মধ্যে গিয়ে পড়ল।

আপাদমস্তক ওয়াটারপ্রুফে আবৃত।

এ নিশ্চয়ই সেই বিক্রম সিং থাপা—ক্রাইম্ ক্লাবের সভাপতি।

কিন্তু ও একা কেন? সঙ্গে আর কাউকেই দেখা যাচ্ছে না। বোধ হয় একাই সমস্ত জিনিসটা আত্মসাৎ করতে চায়।

সে ঘরের মধ্যে লাফিয়ে পড়তেই থমকে পিছনের দিকে চাইল অপরেশ। কিন্তু তার কিছু করবার ছিল না। বিক্রম সিংয়ের হাতের চকচকে কালো অটোমেটিকটা তার মুখ বন্ধ করে রাখল।

—বাক্সটা কই?

বিক্রম সিংয়ের কণ্ঠ সিংহের গর্জনের মতই।

—জানি না।

অপরেশ যেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

—প্রয়োজন নেই। আমি আগেই জানি কোথায় আছে।

বিক্রম সিং নির্ভীক পদক্ষেপে টেবিলের দিকে এগিয়ে যায়। তারপর ড্রয়ারটাতে টান দেয় সজোরে।

আনন্দে তার চোখ দুটো চক্‌চক্ করে ওঠে।

টেবিলের ড্রয়ারে সেই দামী বাক্সটা।

নিমেষের মধ্যে সেটা হাতে তুলে নেয় সে। তারপর জানালাটার দিকে এগিয়ে যায়।

বোধ হয় পাইপ বেয়ে নিচে নেমে যাবার সংকল্প করেছে সে।

কিন্তু—

অকস্মাৎ অপরেশ ক্ষিপ্ত বাঘের মত হিংস্রভঙ্গিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে বিক্রম সিং থাপার ওপর। রিভলভারের গুলিতে তার মৃত্যু হবে জেনেও সে নির্ভয়ে তার ওপরে লাফিয়ে পড়তে এতটুকু দ্বিধা করে না।

এতবড় একটা মূল্যবান বস্তু তার হাতছাড়া হয়ে যাবে এই চিন্তাই যেন তার পক্ষে অসহ্য বলে মনে হয়।

মারামারি, ধস্তাধস্তি, হুল্লোড়...

অপরেশের দেহের শক্তি অনেক কম হলেও, প্রাণপণে সে বিক্রম সিংয়ের হাতটা বেঁকিয়ে ধরে, যাতে রিভলভারের গুলি এসে তার গায়ে না লাগে।

কিন্তু বেশিক্ষণ সে দীর্ঘদেহ, পেশীবহুল, বলবান বিক্রম সিংয়ের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারে না।

এক ধাক্কায় তাকে ছিটকে ফেলে বিক্রম সিং পিস্তলের বাঁট দিয়ে সজোরে একটা আঘাত হানে তার মাথায়।

অপরেশের কপাল ফেটে ঝর ঝর করে রক্ত ঝরতে থাকে। মুহূর্তের মধ্যে জ্ঞান হারিয়ে মেঝের ওপর লুটিয়ে পড়ে সে।

বিক্রম সিং ছুটে যায় জানালার কাছে। তারপর পাইপ বেয়ে দ্রুত নিচে নামতে থাকে।

যদুপতি ভাবে একে গুলি করবে কিনা।

কিন্তু প্রয়োজন নেই।

সিঁড়িতে শোনা যাচ্ছে ভারী বুটের শব্দ। নিশ্চয়ই পুলিশবাহিনী এই ঘরের দিকেই এগিয়ে আসছে।

ওধারে বিক্রম সিং থাপা পাইপ বেয়ে নিচে প্রায় নেমে গেছে। এই যে সে মাটিতে পা দিল।

পুলিশবাহিনী এসে পৌঁছবার আগেই যদি ও পলায়ন করে, তার আগে ওকে অবশ্যই বাধা দিতে হবে।

পাইপ বেয়ে দ্রুত নামতে থাকে যদুপতি। এ কাজে সে যে বিশেষ অভিজ্ঞ নয় তা

তার কাজ দেখেই বোঝা যায়। কিন্তু উত্তেজনা তার অনভিজ্ঞতার বাধা দূর করে।

নিঃশব্দে নিচে নামতে থাকে যদুপতি।

কিন্তু বিক্রম সিং বাধা দেয় না তাকে। এখন বাধা দেওয়া সম্ভবও নয় তার পক্ষে।

সারা হোটেল পুলিশে ঘিরে ফেলেছে। যে কোনও মুহূর্তে তারা তাকে ধরে ফেলতে পারে।

তক্ষুণি মোটরে উঠে পলায়ন করতে হবে তাকে। হোটেল থেকে গজ বিশেক দূরে মোটর অপেক্ষা করছিল। বিক্রম সিংয়ের মোটর। বিক্রম সিং ছুটে গেল মোটরটার দিকে।

হতভম্ব যদুপতি কি করবে ভাবছে এমন সময় মোটরটাতে স্টার্ট দেবার জন্যে হাতলটা ঘোরাল বিক্রম সিং।

ইঞ্জিনের ঘস্ ঘস্ শব্দ।

ওধারে শোনা গেল পুলিশবাহিনীর পায়ের শব্দ। তারা যেন এই দিকেই ছুটে আসছে।

বারো

—পরিশেষ—

সারা জীবনে অনেক অদ্ভুত ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়েছে অণিমাকে, কিন্তু এ ধরণের ব্যাপার বোধ হয় তার জীবনে এই প্রথম।

সম্মুখের কালো পোষাকধারী মূর্তিটা অন্তর্হিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই সে জোরে চলতে চলতে নেমে এল একতলায়। সামনেই তার দেখা হল হোটেলের মালিক পট্টনলালের সঙ্গে। কিন্তু সেই কালো পোষাকধারী লোকটি গেল কোথায়! বিস্ময়ে অণিমার যেন বাক্‌রোধ হয়ে এল। সে একবার ভাবল সেই কালো মূর্তিটিই পট্টনলাল নয় ত? কিন্তু না। পট্টনলাল ত তার ঘর থেকে সোজা দরজা খুলে বেরিয়ে এল। তবে?

অণিমা প্রশ্ন করল—আচ্ছা, আপনি কি কালো পোষাক পরা কোনও লোককে এখান দিয়ে যেতে দেখেছেন?

পট্টনলাল বলল—না না, সে কি কথা! আমি উপরে একটা গুলির আওয়াজ শুনতে পেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছি মাত্র। কিন্তু কালো মূর্তি আবার...

—সত্যি কথা বলুন! ধমক দেয় অণিমা।

—মিথ্যা কথা বলে আমার লাভ কি মিস্...

—তবে?

—সেই প্রশ্ন ত আমিই আপনাকে করছি।

—উপরে আমাদের ঘরে একজন লোক এসে আচমকা অপরেশবাবুকে আক্রমণ করে। তারপর...

কথা শেষ হল না। সেখানে আবির্ভাব ঘটল একদল পুলিশের সঙ্গে ডিটেক্‌টিভ ফাল্গুনী বসুর। সে প্রথমেই পট্টনলালের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল—আপনিই কি এ হোটেলের ম্যানেজার?

—হ্যাঁ।

—কিছুক্ষণ আগে এখানে কি কি ঘটনা ঘটে গেছে তা জানতে চাই আমি।

পট্টনলাল চাইল অণিমার মুখের দিকে। অণিমা সংক্ষেপে সব ঘটনা বলতেই ফাল্গুনী বলল—ওপরে আপনাদের ঘরে চলুন। আমি সবকিছু দেখতে চাই।

—বেশ, চলুন। আমার আপত্তি নেই।

কিন্তু সেখানে আর এক বিস্ময় অপেক্ষা করছিল সকলের জন্যে। উপরের ঘরে এসে তারা দেখতে পেল ঘরের মধ্যে অপরেশ আহত হয়ে পড়ে রয়েছে। তার কপালে গভীর ক্ষত। সংজ্ঞা তার কিছুক্ষণ আগে লোপ পেয়েছে।

অনিমা দ্রুত এগিয়ে টেবিলের ড্রয়ারটা টেনে দেখল সেটা শূন্য। বাক্সটা যেন কোনও ভৌতিক উপায়ে অদৃশ্য হয়েছে।

কিন্তু ফাল্গুনীর দৃষ্টি ছিল অন্যত্র। সে বেশ ভাল করে দেখল জানালার উপরে পায়ের ছাপ। আততায়ী নিশ্চয়ই পাইপ বেয়ে নিচে নেমে গেছে।—

ওধারের রাস্তায় দেখা গেল একটা গাড়ি স্টার্ট নিচ্ছে। ফাল্গুনী ইন্সপেক্টর দীনদয়াল সিংয়ের দিকে চেয়ে বলল—আমার সঙ্গে এক্ষুণি আসুন স্যার। বিক্রম সিং থাপা পালাচ্ছে। ওকে ধরতে হবে। আর এক মুহূর্তও বিলম্ব নয়।

* * *

ঠিক নিচেই দাঁড়িয়েছিল যদুপতি। তাকে দেখেই ফাল্গুনী হর্ষধ্বনি করে উঠে বলল—ঠিক সময়ে আপনি না এসে পৌঁছলে আততায়ীকে ধরা যেত না। সব কৃতিত্ব আপনার। এক্ষুণি গাড়িতে উঠে আসুন।

বোম্বের পথ দিয়ে ছুটে চলল দুটি গাড়ি। একটাতে বসে বিক্রম সিং স্বয়ং আর পেছনেরটা পুলিশ ভ্যান। দুটি গাড়িই ছুটে চলেছে তীব্র বেগের শেষ সীমারেখা অতিক্রম করে।

—জোরে...জোরে...আরও জোরে—ফাল্গুনী চীৎকার করছে।

—গুড়ুম! গুড়ুম! গুম্! পুলিশ লরী থেকে বৃষ্টির মত অবিরল ধারায় গুলি বর্ষিত হচ্ছে।

ব্যবধান কমে এসেছে। আর মাত্র কয়েক হাত।

বিক্রম সিং গুলি ছুঁড়ল।

একসঙ্গে এক পশলা গুলি ছুটে গেল পুলিশ ভ্যান থেকে।

ঘস্—স্—স্!

বিক্রম সিংয়ের গাড়ির টায়ারে গিয়ে গুলি লেগেছে। পুলিশবাহিনী ঠিক বাঘের মত লাফিয়ে গিয়ে পড়ল, তার গাড়িখানাকে ঘিরে ফেলল তৎক্ষণাৎ।

ফাল্গুনী হেঁকে বলল—ভূদেববাবুর হত্যাকারীকে গ্রেপ্তার করুন ইন্সপেক্টর দীনদয়াল।

—হ্যাণ্ডস আপ!

বিনা বাধায় বিক্রম সিং ধরা দিতে বাধ্য হল পুলিশের হাতে।

ফাল্গুনী বলল—এ কেসে কিন্তু কৃতিত্বের সবটুকু যদুপতিবাবুর।

যদুপতি পোদ্দার বলল—না না, শুধু একটা অভিজ্ঞতা। তাছাড়া এতবড় একটা অপরাধী...

বন্দী বিক্রম সিং দাঁতে দাঁত চেপে বলল—স্কাউড্রেল! আই উইল্ টিচ ইউ এ লেস্ন্। উপযুক্ত শিক্ষা তুমি একদিন অবশ্যই পাবে।

ফাল্গুনী তার ভগ্নীর দিকে চেয়ে সশব্দে হেসে উঠল।

—শেষ—

ভ্রান্ত পথের শেষে

—এস্ এস্ মালাবার—

ঝক্ ঝক্...ঝক্ ঝক্...

ফেনা ভেঙে, তরঙ্গ তুলে, রাত্রির নিকষকালো আঁধার-ভরা বুককে সার্চলাইটের তীব্র আলোকরেখার আঘাতে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দিয়ে এগিয়ে চলেছে এস্ এস্ মালাবার। এই বিরাট যাত্রীবাহী জাহাজখানি বোম্বে থেকে এসে পৌঁছেছিল কল্‌কাতায়। তারপর রেঙ্গুন হয়ে সিঙ্গাপুরে গিয়ে হবে এর যাত্রাপথের শেষ।

জাহাজের অধিকাংশই ডেকের আরোহী। ডেকের আরোহীদের সংখ্যা সর্বসমেত প্রায় সাড়ে চারশো। কিন্তু প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীর সংখ্যা অত্যন্ত কম। মাত্র তিনজন প্রথম ও চারজন দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রী।

দ্বিতীয় শ্রেণীর চারজনের মধ্যে দুজন যাত্রীকে দেখা গেল ডেকে দাঁড়িয়ে সাম্‌নের নীল সাগরের দিকে পরিপূর্ণ চোখ মেলে চেয়ে থাকতে।

এই দুজন আসলে আমাদের পরিচিত ডিটেকটিভ্ দীপক চাটার্জী আর তার সহকর্মী ও বন্ধু রতনলাল।

ওদের দুজনকে হঠাৎ এই জাহাজে উপস্থিত দেখে আপনারা বিস্মিত হতে পারেন। কিন্তু বিস্ময়ের কিছু নেই। জরুরী কারণে বাধ্য হয়েই এদেব দুজনকে এই জাহাজে করে সিঙ্গাপুর অবধি যেতে হচ্ছে। ভারত গভর্ণমেণ্টের প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকা মূল্যের স্বর্ণ এই জাহাজের একটি সেফ্ ভল্টে করে সিঙ্গাপুর নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। খবরটা অবশ্য সাধারণের কাছে অজ্ঞাত। কিন্তু গভর্ণমেণ্টের কাছে পুলিশের ইন্‌টেলিজেন্স ব্র্যাঞ্চ থেকে খবর এসেছিল যে দুজন বিখ্যাত দস্যু এই খবরটা পেয়ে এই জাহাজে চড়ে সিঙ্গাপুরের দিকে যাত্রা করবে এই স্বর্ণ লুণ্ঠন করবার উদ্দেশ্য নিয়ে। সেইজন্যেই স্পেশাল দুজন মিলিটারী সার্জেণ্ট যদিও সেফ্ ভল্টের সামনে দিবারাত্র পাহারায় নিযুক্ত ছিল, তবুও গভর্ণমেণ্ট থেকে বিশেষ অনুরোধ করে প্রখ্যাত ডিটেক্‌টিভ দীপক চ্যাটার্জী ও রতনলালকে পাঠান হয়েছে এই স্বর্ণের উপর বিশেষ নজর রাখার জন্যে।

রাত ন'টা বাজল।

আকাশে শুক্লানবমীর চাঁদ।

তার ছড়িয়ে-পড়া আলো সাগরের নীল ঢেউগুলোর মাথায় মাথায় ছড়িয়ে পড়ে সাগরের বুককে অপূর্ব সৌন্দর্যে মণ্ডিত করেছে।

মৃদু জোলো হাওয়ায় দূর হয়ে যায় শরীরের সমস্ত ক্লান্তি।

অনুকূল পরিবেশের জন্যে এই ভ্রমণটা রতনলালের খুবই ভাল লাগছিল। সে মুগ্ধদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ সুবিশাল জলরাশির দিকে তাকিয়ে থেকে একবার বলে উঠল—বাঃ, সিম্পলি চারমিং। কয়েক ঘণ্টা আগে ছিলাম কল্‌কাতার জনকোলাহলময় পরিবেশে, আর এখন নিঃসীম নীল সাগরের অগণিত ঢেউ গুণতে গুণতে চলেছি কোন্ অনির্দেশের পথে।

দীপক হেসে বলল—সাগরের সংস্পর্শে এসে তুই যে কবি হয়ে উঠলি দেখতে পাচ্ছি।

কিন্তু আমরা কবি নই, আমাদের কি কাজ সেটা যেন সব সময় মনে থাকে।

রতন বলল—তাই বলে শুধুমাত্র কাজ...

ক্রিং ক্রিং ক্রিং...

রতনের কথা শেষ হবার আগেই দূরে খাবার ঘণ্টা বেজে ওঠার শব্দ শোনা গেল।

দীপক বলল—আর কবিত্ব করে কাজ নেই। ওদিকে খাবার ঘণ্টা বাজল শুনতে পাচ্ছিস্ ত? চল্ খাওয়া যাক্ গে।

রতন বলল—চল্। এত শীঘ্র সময়টা যে কিভাবে কেটে গেল তা বুঝতে পারছি না।

রতনের কথা শেষ হতে না হতেই দীপক দূরে ডাইনিং রুমের দিকে গমনরত একজন লোকের দিকে রতনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল—এই যে ভদ্রলোকটি যাচ্ছেন ওঁকে চিনতে পারিস্?

রতন বলল—পরিচয় এখনও হয়নি। তবে শুনেছি রেঙ্গুনের একজন বিরাট ধনী লোক। ফার্স্ট ক্লাশের যাত্রী।

—কার কাছে শুনলি?

—জাহাজের ক্যাপ্টেনের সঙ্গেও ওঁর আলাপ আছে কিনা, তাই—

—বাঃ, ভেরী গুড্! এর মধ্যেই সব খবর নিতে সুরু করেছিস দেখছি। শুধু কাব্য নিয়েই মেতে নেই!

রতন হেসে বলল—তোর কাছে আমি বুঝি চিরদিন এম্‌নি অকর্মাই থাকব?

দীপক বলল—না, তবে খবরের সবটা এখনও জানতে পারিস্‌নি কিনা তাই বলছি।

রতন বলল—সে কি?

দীপক বলল—শুধু বড়লোক শুনে লাভ কি? কি কাজ করেন, নাম কি, আসল নিবাস কোথায়—এ সব খবর প্রত্যেক যাত্রীর সম্বন্ধেই নিতে হবে।

রতন বলল—অতটা অবশ্য...

দীপক হেসে বলল—তবে শোন। আমি ওঁর সম্বন্ধে অনেকটা খবর বলে দিতে পারি। উনি বর্মার একজন বিখ্যাত ব্যবসায়ী। তবে ব্যবসা যে কি তা জানে না কেউ। নাম শোনা গেল—অনঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার। মানে দক্ষিণ-ভারতের লোক—বর্মায় শুধু ব্যবসা করেন এই মাত্র। কিন্তু এর আগে ওঁকে যেন কোথায় দেখেছি। কোথায় সেটাই এখনো মনে করতে পারছি না। কি ঝামেলা বল্ তো!

কথা শেষ না হতেই একটা খালাসীশ্রেণীর লোককে দেখা গেল হঠাৎ একটা থামের আড়াল থেকে বের হয়ে একপাশে সরে যেতে!

দীপক চুপ করে গেল।

রতনও অবাক হয়ে গিয়েছিল খানিকটা। লোকটা চলে গেলে বলল—কি ব্যাপার বল্ তো! লোকটা কি আমাদের কথা শুনছিল নাকি?

দীপক গম্ভীরভাবে শুধু বলল—বোঝা যাচ্ছে না। তবে শিকারী কুকুরের মত চোখ সব সময় খোলা রাখতে হবে—বুঝলি?

নিঃশব্দে তারা দুজনে ডাইনিং রুমে গিয়ে উপস্থিত হলো।

অনঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার নামে ভদ্রলোকটি দীপকের আগেই এসে খেতে বসেছিল। দীপকরা

গিয়ে বসল তারই ঠিক পাশে। খেতে খেতে একসময় হঠাৎ সে দীপকের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল—সেদিন ক্যাপ্টেন মূলার সাহেব আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন বটে, কিন্তু বেশিক্ষণ কথাবার্তা হলো না।

দীপক হেসে বলল—হ্যাঁ, সেদিন একটু ব্যস্ত ছিলাম।

অনঙ্গস্বামী বলল—ও, আপনিও তবে আমার মতই ব্যবসায়ী?

—কি করে বুঝলেন?

—ব্যবসার ইংরাজী নাম হলো 'বিজিনেস্'—মানে যাতে ব্যস্ত থাকতে হয়, তাই না?

দুজনেই হো হো করে হেসে উঠল।

অনঙ্গস্বামী বলল—যাচ্ছেন কতদূর?

—আপাতত রেঙ্গুন। তবে প্রয়োজন হলে সিঙ্গাপুর অবধি যেতে পারি, কারণ সেটা নির্ভর করছে কাজের ব্যবস্থার উপর। আপনি তো বোধ হয় রেঙ্গুনেই নামবেন?

—হ্যাঁ।

—আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি আপনাকে?

—নিশ্চয়ই। কি কথা বলুন।

—আপনাকে যেন আগে কোথায় দেখেছি বলে মনে হচ্ছে বটে, কিন্তু ঠিক মনে করতে পারছি না।

অনঙ্গস্বামী হেসে বলল—অনেককে না দেখলেও হঠাৎ দেখলে মনে হয় যেন অনেকদিনের চেনা। ওটা কিছু নয়...

দীপক অন্যমনস্কভাবে বলল—কিন্তু অতটা ভুল অবশ্য....

মাঝপথেই কথা বন্ধ করে দীপক উঠে পড়ল। তার খাওয়াও শেষ হয়ে গিয়েছিল ততক্ষণে।

দুই

—মাঝরাতের আঁধারে—

রাত তখন দুটো।

সারা জাহাজ ঘুমিয়ে পড়েছে নিথর নিদ্রার কোলে।

সন্ধ্যার মুখোমুখি যে একখণ্ড গাঢ় কালো মেঘ জমে উঠেছিল দক্ষিণ দিগন্তে, ধীরে ধীরে তা আচ্ছন্ন করেছে সারা আকাশটাকে নিবিড় কালিমায়।

ঘন ঘন বিদ্যুতের ঝলকানি।

শোঁ শোঁ শব্দে চলেছে দামাল হাওয়ার উদ্ধত দুরন্তপনা।

খট্ খট্ খট্...

মিলিটারী বুটের শব্দ।

জাহাজের ওপর ঠিক স্ট্রং রুম ভল্টের সামনে পায়চারী করছে দুজন নির্ভীক সার্জেণ্ট। জীবনে বহুবার তারা দুরন্ত বিপদের মুখে নিজেদের দুঃসাহসিকতার প্রমাণ করে গভর্ণমেণ্ট থেকে আজ এত বড় একটা দায়িত্বপূর্ণ কাজে নিযুক্ত হবার গৌরব অর্জন করেছে।

খট্ খট্ খট্...

চলেছে অবিশ্রান্ত পায়চারী। অনন্তকাল ধরে যেন চলতে থাকবে তাদের এই দুঃসাহসিক, দৃঢ় কর্তব্যনিষ্ঠা।

মহাকালের রোজনামচায় দুজন চিরন্তন নায়ক যেন।

জাহাজ কাঁপছে বাতাসের দোলায়।

শন্ শন্...শন্ শন্...শোঁ-ও-ও-ও...

অবিশ্রান্ত চলেছে দুরন্ত বাতাসের মাতামাতি।

নিজের কক্ষে বসে একমনে কাজ করে চলেছেন ক্যাপ্টেন মূলার। স্ট্রং রুমের দরজায় যে দুইজন প্রহরী আছে তাদের ওপরে তাঁর অগাধ বিশ্বাস।

কিন্তু মাঝরাতের অখণ্ড আঁধারে গা-ঢাকা দিয়ে যে দুজন লোক মার্জারের মত লঘুপায়ে ধীরে ধীরে এসে দু'দিক থেকে প্রহরী দুজনের দু'পাশে চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল সেদিকে খেয়াল ছিল না কারো।

কে জানে, কি এদের দুজনের সত্যিকারের পরিচয়?

প্রহরী দুজন নিজেদের মনে পায়চারী করে চলেছে। যান্ত্রিক পদক্ষেপ। একটানা কাজ চলেছে তাদের!

কিন্তু...

তাদের এই কাজ করবার অবকাশ আর বেশিক্ষণ মিলল না। পেছন দিক থেকে আকস্মিকভাবে দুজনে কাদের দ্বারা যেন আক্রান্ত হলো ঠিক একই সময়ে।

তাদের সে আকস্মিক আক্রমণ ক্ষুধার্ত বাঘের চেয়েও অনেক বেশি হিংস্র জিঘাংসায় পূর্ণ।

আঃ...

কাতর শব্দ। করুণ গোঙানী।

ধীরে আবার তা ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে যায়।

তারপর চারদিকে আবার বিরাজ করতে থাকে অখণ্ড নীরবতা।

বাইরের জোলো বাতাসের একঘেয়ে করুণ দীর্ঘশ্বাসের আড়ালে সে শব্দ সম্পূর্ণ মিলিয়ে যায়।

ঝপ্ ঝপ্...

দুটি শব্দ শুধু।

জাহাজের রেলিং টপকে ওপারের নিঃসীম নীল সাগরের বুকে আশ্রয় গ্রহণ করে দুটি নির্ভীক সৈনিকের প্রাণহীন দেহ। পৃথিবীর বুকে তাদের এই আত্মদানের সাক্ষী রইলো না কেউ।

আততায়ী দুজন প্রহরী দুজনের পোষাক আর রাইফেল্ দুটো আগেই ছিনিয়ে নিয়েছিল।

এবার তারা দুজনে সজ্জিত হয় নবসাজে। হিংস্র মুখের ওপর যেন চাপা পড়ে দুটি নিরীহ লোকের মুখোস।

আবার চলে পায়চারী—খট্ খট্ খট্।

জাহাজের বুকের ওপর শুধু পড়ে রইলো দু'ফোঁটা টকটকে তাজা রক্ত এই হিংস্র ঘটনার করুণ সাক্ষ্য বহন করবার জন্যে।

ঠিক এমনি সময়ে একটা বেতারবার্তা পেলেন জাহাজের ক্যাপ্টেন মিঃ মূলার।

বার্তা আসছে কলকাতা পুলিশ বিভাগ থেকে। পুলিশের বিশেষ বিভাগ জানতে পেরেছে যে দুজন দুর্ধর্ষ দস্যু এস্ এস্ মালাবারের বুকে আত্মগোপন করে চলেছে গভর্ণমেণ্টের পাঁচ লক্ষ টাকা দামের সোনা অপহরণ করাবর জন্যে। ভ্রূকুটিকুটিল হয়ে পড়ে ক্যাপ্টেন মূলারের মুখ।

তাঁর মনে শুধু একমাত্র প্রশ্ন—কে এই দুজন দুরন্ত দস্যু? সত্যিই যদি তারা এই জাহাজে থাকে, তবে তাদের ছদ্মবেশ ধারণের কৌশল অপূর্ব, সন্দেহ নেই।

বেতারবার্তা ভেসে এলো ঃ এই দুজন দস্যুর একজন হচ্ছে বিখ্যাত বার্মিজ দস্যু লিউসিন আর অন্যজন হচ্ছে তারই সহকারী সিন্‌ফো।

আশ্চর্য! নিজের মনেই ভাবতে থাকেন মিঃ মূলার। ধীরে ধীরে কপালের ঘাম মুছে ফেলেন তিনি।

তিন

—রতনলালের বিস্ময়—

বেশ একটু অন্ধকার থাকতেই ঘুম ভেঙে যায় রতনলালের।

খুব ভোরে ওঠা তার বহুদিনের অভ্যাস। ঘুম থেকে উঠে হাত-মুখ ধুয়ে রতন বেরিয়ে পড়ে ডেকের উদ্দেশ্যে! ডেকের ওপর বেড়িয়ে একটু সামুদ্রিক বাতাস উপভোগ করেই সে প্রাতর্ভ্রমণের কাজ শেষ করবে স্থির করেছিল!

আগের রাতে বৃষ্টি হয়ে গেছে কয়েক পশলা। শীত-শীত বোধ হচ্ছিল রতনের। বেরোবার সময় সে কোটটা গায়ে চাপিয়ে নিলো।

দ্বিতীয় শ্রেণীর কেবিন ছেড়ে হাল্‌কা পায়ে সে ডেকের দিকে এগিয়ে চলল।

মাঝপথে স্ট্রং রুমের সামনে পায়চারী করছিল প্রহরী দুজন। রতনকে দেখে একজন হঠাৎ ভক্তিভাবে স্যালুট্ করে সোজা হয়ে দাঁড়াল।

তাকে কেন প্রহরীটি এভাবে স্যালুট্ করল তা রতন কিছুতেই বুঝতে পারল না। সে কেমন করে জানবে তার পরিচয়।

—তুমি আমাকে স্যালুট্ করলে কেন? রতন প্রশ্ন করল সেই প্রহরীটির দিকে চেয়ে।

প্রহরীটি ভাঙা হিন্দীতে যা বলল তার অর্থ হচ্ছে এই যে, সে দেখেছে ক্যাপ্টেন সাহেব পর্যন্ত হুজুরকে সমীহ করে। তার থেকেই সে বুঝেছে যে হুজুর একজন বড় আদমী। তাই সে স্যালুট্ করল।

প্রহরীর বুদ্ধি দেখে রতন অবাক্ হলো।

কিন্তু প্রহরীটির কণ্ঠস্বর একটু ভারী লাগছে কেন? রতন প্রশ্ন করল—তোমার গলার স্বরটা একটু ভারী বলে আমার মনে হচ্ছে কেন?

প্রহরী বলল—ক'দিন একটানা খাটুনীর ফলে তার শরীরটা একটু খারাপ হয়েছে। কাল থেকে সর্দি লেগেছে। সেজন্যেই গলাটা একটু ভারী—

রতন নিশ্চিন্ত মনে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল।

কিন্তু অদ্ভুত এক বিস্ময় অপেক্ষা করছিল রতনের জন্যে। বাঁ দিকের কোণটা যেখানে ঘুরতে হয় সেখানে জাহাজের ডেকের ওপর ফোঁটা ফোঁটা কালো রক্ত শুকিয়ে আছে।

রতন এগিয়ে গেল রেলিংয়ের ধারে। লোহার রেলিংয়ের ওপরেও এক ফোঁটা রক্তের দাগ।

তবে কি কাউকে আঘাত করে সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হয়েছে? কিন্তু কে এই ভয়ানক কাজ করতে পারে?

রতনের মাথার চুলগুলো পর্যন্ত উত্তেজনায় যেন খাড়া হয়ে উঠল। দ্রুত পদে সে ফিরে চলল কেবিনের দিকে।

হঠাৎ থেমে দাঁড়িয়ে প্রহরীদের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল সে—আচ্ছা ওখানে যে রক্ত জমে আছে দেখলাম তা এলো কোত্থেকে বলতে পার?

প্রহরী লম্বা স্যালুট্ ঠুকে বলল—আজ্ঞে না হুজুর।

—কাল রাতে কোনও শব্দ শুনেছিলে তোমরা?

—আজ্ঞে কোনও শব্দই ত আমরা শুনিনি।

রতন কথা না বাড়িয়ে ফিরে চলল কেবিনের দিকে। দীপককে জাগিয়ে এক্ষুণি কথাটা জানাতে হবে তাকে।

কিন্তু আরও একটা বড় বিস্ময় অপেক্ষা করছিল রতনলালের জন্যে।

কেবিনে প্রবেশ করবার ঠিক আগেই তার দেখা হলো ক্যাপ্টেন মূলারের সঙ্গে। হন্ হন্ করে তিনি কেবিনের দিকে এগিয়ে আসছিলেন।

—কি ব্যাপার মিঃ মূলার? এত ভোরে যে ঘুম থেকে উঠেই হন্ হন্ করে আমাদের কেবিনের দিকে?

—হ্যাঁ, জরুরী ব্যাপার। মিঃ চ্যাটার্জী কি ঘুম থেকে উঠেছেন নাকি?

—না।

—কিন্তু এদিকে সাংঘাতিক ব্যাপার ঘটে গেছে। কাল রাতে মেসেজ্ এসেছে দুর্দান্ত বার্মিজ দস্যু লিউসিন আর তার সহকারী নাকি ছদ্মবেশে এই জাহাজের বুকে আশ্রয় নিয়েছে।

—সে কি?

—হ্যাঁ, কাল রাত প্রায় আড়াইটের সময় খবরটা পেলাম। কিন্তু কে এই ছদ্মবেশী লিউসিন?

—আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারব না বটে, কিন্তু নতুন একটা ঘটনার কথা জানাতে পারব আপনাকে।

—কি ব্যাপার রতনবাবু?

—ডেকের ওপর দেখলাম কয়েক ফোঁটা রক্তের দাগ। রেলিংয়ের ওপরেও দেখলাম তেমনি শুকনো রক্ত। নিশ্চয়ই কাল রাতে কাউকে আহত অবস্থায় সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হয়েছে বলে মনে হয় আমার।

—কি আশ্চর্য! আমার জীবনে কখনও কোনও জাহাজের বুকে এ ধরণের ঘটনা ঘটতে শুনিনি। বিনা কারণে কোন্ হতভাগ্যকে সমুদ্রের মধ্যে নিক্ষেপ করল?

—খবর নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে মিঃ মূলার। কিন্তু সেটা সুসংবাদ নয়—দুঃসংবাদ।

চার

—ঘটনাচক্র—

দীপকের কথায় বাধা সৃষ্টি করে মিঃ মূলার বললেন—না মিঃ চ্যাটার্জী, আপনার এ কথা আমি বিশ্বাস করতে পারছি না।

দীপক বলল—আমার কথার ওপর আপনার এই ধরণের অবিশ্বাস জন্মাবার হেতু?

—আমি এই ঘটনার পর তন্ন তন্ন করে জাহাজ অনুসন্ধান করেছি। কিন্তু তবুও এমন কাউকেই দেখতে পাইনি যাকে সন্দেহ করা চলে।

—আপনি কি করে বলবেন যে, মেসেজ্‌টি মিথ্যা?

—সেটাই ঠিক বুঝতে পারছি না।

—লিউসিনকে আপনি তাহলে আজও চিনতে পারেননি মিঃ মূলার।

—লোকটা নিশ্চয়ই মায়াবী নয়।

—মায়াবী নয়, তবে যাদুকর।

—কিন্তু যাদুবিদ্যার প্রভাবে আর যাই হোক, সবার চোখের সাম্‌নে অদৃশ্য হয়ে থাকা যায় না।

—সে ত অদৃশ্য হয়ে নেই।

—সেকি!

—আমি ঠিকই বলছি।

—তবে সে কোথায়?

—সে আমাদের মধ্যেই ছদ্মবেশে অবস্থান করছে। কিন্তু আমরা তাকে সঠিক ধরতে পারছি না।

—কিন্তু কি করে আপনি এতটা নিঃসন্দেহ হলেন?

—কারণ আমি জানি সে কোথায় আছে?

—তাই নাকি?

—অবশ্যই।

—তবে এতক্ষণ তাকে ধরেননি কেন?

—কারণ প্রমাণ পাইনি। তাছাড়া প্রথমটা তাকে সঠিক চিনতেও পারিনি।

—বেশ এবার বলুন সে কে?

—একটা প্রশ্নের উত্তর দিন আগে! আপনি কি সকালে মিঃ আয়েঙ্গারের ঘরে গিয়েছিলেন?

—না, তাঁর ঘরে যাবার প্রয়োজন নেই। তাঁর মত বিখ্যাত লোকের কাছে...

—বিখ্যাত তিনি বটে, তবে আসল মিঃ আয়েঙ্গার আর এই ভদ্রলোক এক লোক নয়।

—বিশ্বাস করি না। এতবড়ো একটা—

—হাঁ, মিস্টার মূলার, আমার কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি। বেশ, আমার সঙ্গে আপনি মিঃ আয়েঙ্গারের কক্ষে আসুন।

—কিন্তু মিথ্যা ওঁকে বিরক্ত করা—বেশ, আপনি যখন বলছেন তখন চলুন যাওয়া যাক্‌।

কেবিনের সামনে পৌঁছে দীপকরা দেখল কেবিন ভেতর থেকে তালাবন্ধ। দীপক কড়াটা ধরে নাড়ল। কিন্তু কোনও শব্দই ভেসে এলো না।

বাধ্য হয়ে দীপক ও মিঃ মূলার পাশের জানলায় গিয়ে দেখতে পেলেন জানালাটাও ভেতর থেকে বন্ধ। অনেক কষ্টে তখন দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে পড়লেন মিঃ মূলার।

কিন্তু ঘরের মধ্যে বিরাট এক বিস্ময় অপেক্ষা করছিল তাঁদের জন্যে। কেবিনের মধ্যে পা দিয়েই তাঁরা দেখতে পেলেন সেখানে কোনও জনমানবের চিহ্ন পর্যন্ত নেই। অনঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার যেন হঠাৎ তাঁর সমস্ত জিনিসপত্র পর্যন্ত নিয়ে বাতাসে মিলিয়ে গেছেন।

প্রচণ্ড বিস্ময়ে কিছুক্ষণ কারও মুখে কথা পর্যন্ত ফুটল না।

বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কাটা সাম্‌লে নিয়ে মিঃ মূলার বললেন—এতক্ষণে বুঝতে পারছি কাল রাতে কাকে জাহাজের রেলিং গলিয়ে সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হয়েছে।

দীপক প্রশ্ন করল—কিন্তু ওতে আততায়ীর লাভ কি, মিঃ মূলার?

—সেটা অনুমান করা আর এমন শক্ত কি! উনি একজন এতবড় ব্যবসায়ী লোক। নিশ্চয়ই ওঁর কাছে প্রচুর অর্থাদি ছিল। ওই দস্যুরা কোনওভাবে খবর পেয়ে তাঁর যথাসর্বস্ব লুণ্ঠন করে তাঁকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করেছে।

—তাহলে দস্যুরা যে এ জাহাজেই আছে তা স্বীকার করছেন ত? হাসিমুখে প্রশ্ন করে দীপক।

—সেটা ত মেসেজ্ পেয়েই বুঝতে পারছি। শুধু বুঝতে পারছি না তারা কোথায় আত্মগোপন করে আছে। এ জাহাজে এমন কোনও গুপ্তস্থানই নেই যা আমার অজ্ঞাত।

—কিন্তু একথাও আপনি নিশ্চয়ই অস্বীকার করতে পারেন না মিঃ মূলার যে দস্যু লিউসিন এই জাহাজেই আছে।

—তা আমি অস্বীকার করি না মিঃ চ্যাটার্জী, কিন্তু কে যে সেই ছদ্মবেশী দস্যু...

মিঃ মূলারের কথায় বাধা দিয়ে দীপক বলল—সেটাই আপনাকে আরও ভাল ভাবে অনুসন্ধান করতে হবে মিঃ মূলার। আর তার ওপরেই নির্ভর করছে জাহাজের নিরাপত্তা। ভুলে যাবেন না পাঁচ লক্ষ টাকার সোনার সম্পূর্ণ দায়িত্বও এখন এর ওপর।

হেসে মিঃ মূলার বললেন—অত সহজে ভয় পাবেন না মিঃ চ্যাটার্জী। যে ভল্টে সেই সোনা রাখা হয়েছে তার দরজা এমন শক্ত ইস্পাতের তৈরী যে একটি হাতী দিয়ে টানা হলেও তা ভাঙবে না। আর তার চাবিটাও এমন গুপ্ত জায়গায় রেখেছি যে আমি ছাড়া অন্য কারও সাধ্য নেই যে সেটি খুঁজে বের করে।

—কিন্তু আপনার জীবনও ত বিপন্ন হতে পারে মিঃ মূলার!

—ইংরেজরা ভয় কাকে বলে তা কোন দিনই জানে না মিঃ চ্যাটার্জী।

—তবুও যতটা সম্ভব সাবধান থাকা উচিত। কথায় বলে, সাবধানের মার নেই।

মিঃ মূলার একটু ভেবে বললেন—আচ্ছা, ভল্টের সামনে গভর্ণমেণ্টের যে দুজন লোক পাহারা দিচ্ছে এদের ছাড়া আরও দুজন অতিরিক্ত লোক রাখলে কেমন হয়?

দীপক বলল—তাতে ওরা দুজন রাগ করতে পারে। ওরা হয়ত মনে করবে যে ওদের ওপরে সন্দেহ করেই আমরা দুজন নতুন লোককে নিযুক্ত করলাম। তার চেয়ে এক কাজ করলে ভাল হয়।

—কি কাজ বলুন।

—ওদের বলা হোক্ যে ওদের দুজনকেই দিনরাত ওখানে পাহারা দিতে হচ্ছে। তার চেয়ে যদি আপনার দুজন লোক ওদের সঙ্গে দেওয়া হয় তা হলে ওদের কাজের চাপ অনেক কমে যাবে। একজন শুধু দিনের বেলা পাহারা দিতে পারবে—অন্যজন রাতের বেলা। প্রত্যেকের সঙ্গে আপনার লোক একজন করে থাকবে সব সময়।

—হ্যাঁ, এ যুক্তিটা অবশ্য সত্যিই ভাল। যদিও আমি ততটা ভয় পাইনি, তবুও যতটা সম্ভব সাবধানতা এখন থেকেই আমাদের অবলম্বন করা উচিত।

মিঃ মুলার উপযুক্ত ব্যবস্থা করবার জন্যে দ্রুতপদে প্রস্থান করলেন।

পাঁচ

—দস্যু লিউসিনের চিঠি—

সেদিন বিকেল।

দীপক ধীরে ধীরে স্ট্রং রুমের সাম্‌নে গিয়ে উপস্থিত হলো। চারদিকে বেশ ভাল করে পর্যবেক্ষণ করবার উদ্দেশ্য নিয়ে।

কিন্তু সেখানে গিয়ে একটা জিনিস দেখে সে একটু অবাক হলো। সে দেখল ৲ রুমের সাম্‌নে তিনজন লোক পাহারায় নিযুক্ত।

ক্যাপ্টেনের নিযুক্ত যে লোকটি সে দীপককে সেলাম করল। অন্য দুজন চুপচাপ পূর্ববৎ পাহারা দিয়ে চলল নিশ্চল প্রহরীর মত। দীপক বুঝতে পারল যে ওরা দুজনে সবসময় একত্র পাহারা দিতে কৃতসংকল্প। একজনের পরিবর্তে ওরা কেউই স্থানত্যাগ করতে রাজী নয়।

ক্যাপ্টেনের লোকটির দিকে চেয়ে দীপক প্রশ্ন করল—তুমি কখন থেকে এখানে পাহারা দিচ্ছ?

লোকটি বলল—বেলা দশটা থেকে। সন্ধ্যার পর আমার বদলে অন্য একজন লোককে এখানে রাখা হবে।

দীপক এগিয়ে যাচ্ছিল। লোকটি তার দিকে চেয়ে ফিস্‌ফিস্ করে বলল—আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে হুজুর।

দীপক বলল—কি কথা বলতে পার।

লোকটি দীপককে সঙ্গে নিয়ে একপাশে সরে গেল। তারপর ফিস্‌ফিস্ করে বলল—এই প্রহরী দুজনের গতিবিধিটা আমার ভাল লাগছে না হুজুর।

অবাক হয়ে দীপক বলল—কেন?

লোকটি বলল—ক্যাপ্টেন বলা সত্ত্বেও ওরা কেউই বিশ্রাম নিতে রাজী হলো না। বলল, আমরা দুজনে দিবারাত্র পাহারা দিতেই থাকব।

দীপক বলল—সে হয় ত নিরাপত্তার জন্যেই—

—না না, তাছাড়া আরও ব্যাপার কিছু আছে হুজুর। ওরা নিজেদের মধ্যে অবোধ্য ভাষায় কি সব কথা বলাবলি করে।

—তুমি কিছু বুঝতে পারনি?

—না হুজুর। তাছাড়া আমরা পাহারা দেব একথা শুনে ওরা যেন অসন্তুষ্ট হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। ওরা বারবার কারণে-অকারণে আমাকে বিশ্রী সব ধমক দিচ্ছে।

—আচ্ছা, সে যাতে না করে তার ব্যবস্থা আমি করব। কিন্তু এদের কিছু বলো না তুমি। ওরা গভর্ণমেণ্ট থেকে নিযুক্ত করা সার্জেণ্ট। গভর্ণমেণ্ট যোগ্যতার পরীক্ষা না করে ওদের নিযুক্ত করেনি।

—তা ত বটেই স্যার।

—যাও, বেশ মনোযোগ দিয়ে পাহারা দাও। আমি বরং ক্যাপ্টেনের সঙ্গে এবিষয়ে আলোচনা করব।

কিন্তু ক্যাপ্টেনের সঙ্গে আলোচনা করবার জন্যে দীপককে বেশি বেগ পেতে হলো না।

সন্ধ্যার পরেই ক্যাপ্টেন মূলার নিজে এসে দীপকের কেবিনের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে কড়াটা নাড়লেন।

দীপক তাড়াতাড়ি দরজাটা খুলেই সামনে মিঃ মূলারকে দেখে জিজ্ঞাসা করল—এত রাতে হঠাৎ যে এভাবে হন্তদন্ত হয়ে হাজির হলেন?

মিঃ মূলার গম্ভীর মুখে বললেন—হ্যাঁ, দীপকবাবু। বড্ড জরুরী কথা আছে আপনার সঙ্গে। দরজাটা বন্ধ করুন।

দীপক দরজাটা বন্ধ করে দিলে মিঃ মূলার ধীরে ধীরে তাঁর পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে দীপকের সাম্‌নে ধরে বললেন—মনোযোগ দিয়ে চিঠিটা পড়লেই সব বুঝতে পারবেন।

দীপক ধীরে ধীরে কাগজটা খুলে দেখল সেটা একখানা চিঠি।

দীপক মিঃ মূলারের দিকে তাকিয়ে বলল—এটা কখন পেলেন আপনি?

মিঃ মূলার বললেন—আমি মিনিট কুড়ি আগে কাজ শেষ করে আমার ঘরে গিয়ে দেখি যে টেবিলের ওপর এটি পেপারওয়েট্ চাপা দেওয়া আছে। আমি এটা চিঠি বলে বুঝতে পারিনি। খুলে দেখি যে এটি আসলে আমাকে ভয় দেখিয়ে লেখা একটি পত্র ছাড়া আর কিছুই নয়।

দীপক নিবিষ্টভাবে চিঠিতে মনঃসংযোগ করল।

ছোট্ট চিঠি ঃ

প্রিয় ক্যাপ্টেন মূলার,

আমি জানি, এই জাহাজের সেফ্ ভল্টের চাবিটি আপনার কাছে আছে। ওই পাঁচ লক্ষ টাকা আমার চাই। চিঠি পাবার ঠিক দশ ঘণ্টার মধ্যে যদি আপনি চাবিটা আমার হাতে সমর্পণ না করেন, তবে আপনার পরিণামের কথা চিন্তা করতেও ভয়ে শিউরে উঠছি আমি।

আপনি বিশেষ করেই জানেন, আমার কথার সঙ্গে কাজের বিশেষ তফাৎ থাকে না। আমি যে আপনাদের সকলের দৃষ্টি উপেক্ষা করেও এই জাহাজে অবস্থান করছি তা থেকেই বুঝতে পারছেন যে আমার ক্ষমতা আপনাদের চেয়ে কত বেশি। আপনার সঙ্গে কোনও

শত্রুতা নেই আমার। আপনি যদি কাউকে এই চিঠির কথা না জানিয়ে স্বেচ্ছায় ওই চাবিটি টেবিলের ওপর রেখে দেন তবে আপনার কোনও ভয় নেই। অন্যথায় যে করেই হোক্ চাবিটা আমি হস্তগত করতে বাধ্য হব।

আপনার জীবনের যদি কোনও মূল্য থাকে তবে আশা করি চিঠিটার কথা গোপন রাখবেন।

ইতি
আপনার বন্ধু
লিউসিন।

চিঠি শেষ করে দীপক মিঃ মূলারের দিকে চেয়ে বলল—আমি যে চিঠির কথা গোপন না রেখে আমাকে জানালেন?

মিঃ মূলার গর্বের হাসি হেসে বললেন—আপনাকে ত আগেই বলেছি মিঃ চ্যাটার্জী যে ভয় কাকে বলে তা আমরা জানি না। যাক্ সে কথা, এখন পরবর্তী কার্যপদ্ধতি স্থির করবার জন্যেই আমি আপনার সঙ্গে পরামর্শ করতে এসেছি।

দীপক বলল—এতে আপনার বিপদ কিন্তু অনেকগুণে বেড়ে গেল মিঃ মূলার। যাক্ সেকথা, সেফ্ ভল্টের চাবি কোথায় আছে নিশ্চয়ই একমাত্র আপনি ছাড়া আর কেউ জানে না?

মিঃ মূলার বললেন—না। আর ঠিক সেইজন্যেই ওরা চাবিটা পাবার জন্যে এত বেশি উতলা হয়ে উঠেছে।

দীপক বলল—আপনি কি সারা জাহাজ খুব ভাল ভাবেই সার্চ করেছিলেন?

মিঃ মূলার বললেন—হ্যাঁ, কিন্তু আশ্চর্যের কথা প্রত্যেকটা যাত্রী সম্বন্ধে খুঁটিনাটি খোঁজ নিয়েই কাউকেই সন্দেহ করবার কোনও কারণ খুঁজে পাইনি। তাছাড়া জাহাজের সমস্ত গুপ্তস্থানগুলিও ভালভাবে খোঁজ করে দেখেছি।

—কিন্তু এভাবে অনিশ্চিত বিপদ মাথার ওপরে নিয়ে চলাও ত বিপজ্জনক।

—তা ত বটেই।

—যা হোক আমাদের একমাত্র কাজ হচ্ছে জাহাজ যতক্ষণ রেঙ্গুন না পৌছয় ততক্ষণ খুব হুঁশিয়ার থাকা। তারপরে রেঙ্গুন থেকে আরও কয়েকজন ভাল বিশেষ প্রহরীর ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

—কিন্তু জাহাজ রেঙ্গুনে পৌছতে ত এখনো প্রায় দেড় দিন লাগবে।

—তার আগেই যদি আপনি বিপদের আশঙ্কা করেন, তবে একজন দেহরক্ষীর ব্যবস্থা করুন। এখন থেকে আপনার নিরাপত্তার ওপরে অনেক কিছু নির্ভর করে!

মিঃ মূলার বললেন—যাক্, আপনিও একটু ভালভাবে চারদিকে নজর রেখে কাজ করুন। আমি বরং ইঞ্জিন-রুমে গিয়ে জাহাজের গতিটা আরও কিছু বাড়িয়ে দিতে বলি।

মিঃ মূলার চিন্তিতমুখে প্রস্থান করলেন।

ছয়

—ছদ্মবেশী—

মিঃ মূলার চলে যাওয়ার পরই দীপক রতনের দিকে চেয়ে বলল—তোর ওপর এবার একটা গুরুতর কাজের দায়িত্ব নির্ভর করবে। আশা করি সাফল্যের সঙ্গেই সম্পন্ন করতে পারবি।

রতন বলল—কি কাজ বল্। আমি আশা করি আমার কাজে কোনও শৈথিল্যই প্রকাশ পাবে না।

দীপক হেসে বলল—সর্বপ্রথমে তুই একজন খালাসীর ছদ্মবেশে নিজেকে সজ্জিত করে ফেল্।

রতন প্রশ্ন করল—তারপর?

—তারপর মিঃ মূলারের কক্ষের কাছাকাছি কোথাও দাঁড়িয়ে তুই গোপনে ওঁর ওপরে নজর রাখবি। আমি আশঙ্কা করছি তিনি হয়তো কোনও বিপদে পড়তে পারেন।

—কিন্তু দশ ঘণ্টার সময় তাঁকে ত দিয়েছে দস্যু লিউসিন।

দীপক হেসে বলল—কিন্তু মিঃ মূলার যে চিঠির কথা আমাদের কাছে জানিয়েছেন এবং তিনি চাবিটা কোনক্রমেই সমর্পণ করবেন না বলে স্থির করেছেন এটা নিশ্চয়ই তাদের জানতে বাকি নেই।

—কিন্তু এটা তুই-ই বা কি করে জানলি?

—ঠিক জানি না, কতকটা আন্দাজ বলতে পারিস্। যাক্, তুই ওদিকে দেখ্, আমাকে আবার এদিকে আজ রাতের মত সেফ্ ভল্টের ওপর নজর রাখতে হবে। ওদিকেও যাতে ঠিকমতন পাহারা দেওয়া চলে সেদিকে কড়া নজর রাখতে হবে।

ছদ্মবেশধারণরত রতনের দিকে চেয়ে দীপক ধীরে ধীরে কক্ষ ত্যাগ করে চলে যায়।

রাত তখন দুটো।

জাহাজের কোন্ একটা ঘড়ি থেকে দুটো বাজার শব্দ ঢং ঢং করে সারা সাগরের বুককে ক্ষণিকের জন্য অদ্ভুত একটা শব্দে ভরিয়ে তোলে।

রতনলাল তখনও নীরবে আপন কাজে রত। খালাসীর ছদ্মবেশ ধাবণ করে সে অদূরস্থ ক্যাপ্টেন মূলাবের কক্ষটির ওপর নজর রেখেছে।

খট্ খট্ খট্...

ধীরে ধীরে পা ফেলে সাহেবী পোযাকে ভূষিত এক ব্যক্তি রতনের দিকে এগিয়ে আসে।

রতন ভাল করে তার দিকে তাকায়। কিন্তু আধো-অন্ধকারে এই অপরিচিত ব্যক্তি যে কে তা ঠিকমত ঠাহর করতে পারে না।

—এত বাতে এখানে কেন খালাসী? ওদিকে গিয়ে কাজকর্মে মনোযোগ দেবার চেষ্টা কর। এখুনি ঝড় উঠবে বোধ হয়।

রতন ভাবে—সত্যিই ত, এমন অসময়ে এখানে দাঁড়িয়ে থাকা সাধারণ যাত্রীর চোখে বিসদৃশ লাগতে পারে বৈকি! আনমনে সে বলে—হ্যাঁ হুজুর, আমি ওধারেই যাব।

রতন দু-এক পা এগোতেই লোকটি পিছন থেকে তাকে ডাকে—শোন খালাসী, সন্ধ্যার পর থেকেই আজ ক্যাপ্টেন সাহেবকে একটু যেন ব্যস্ত দেখতে পাচ্ছি। কেন বলতে পার?

রতন বলল—তা আমি কি করে বলব হুজুর। ওসব খবর-টবর আমি রাখি না।

—তা বটে। তবে আমি শুনলাম কোন্ এক ডাকাত নাকি ক্যাপ্টেন সাহেবকে ভয় দেখিয়েছে।

উপেক্ষার ভাব দেখিয়ে রতন বলে—না হুজুর, অত সহজে ভয় পাবার লোক আমাদের ক্যাপ্টেন নয়!

—তাই নাকি? তবে তিনি যে অত বেশি সাহসী লোক তা জানলে কবে থেকে?

—তা আমাদের বহুদিন জানা। এর আগেও অনেক ব্যাপারে দেখেছি ত।

লোকটি বলল—দেখেছ? আচ্ছা এই জিনিসটা কি দেখ ত! ওধারে যাবার সময় কুড়িয়ে পেলাম।

রতন দেখল লোকটি একটি রুমাল বের করে তাকে দেখাচ্ছে। রতন কি যেন বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু লোকটি তার আগেই রুমালটা অকস্মাৎ তার দিকে এগিয়ে দিল। তারপর রতন কিছু বলবার আগেই সেটা চেপে ধরল রতনের নাকে।

রতন প্রাণপণে বাধা দেবার চেষ্টা করল, কিন্তু লোকটির বজ্রমুষ্টি একটুও শিথিল হলো না।

ধীরে ধীরে হাতদুটি আল্‌গা হয়ে এলো। সুন্দর একটা মিষ্টি গন্ধ ক্রমেই তার মস্তিষ্ককে আচ্ছন্ন করে ফেলতে লাগল। ধীরে ধীরে জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল রতন সেই ডেকের ওপর।

লোকটির মুখে ফুটে উঠল শুধু একটা অবজ্ঞার হাসি।

দীপক চ্যাটার্জী ওধারে স্ট্রং রুমের সামনে গিয়ে হাজির হয়ে দেখতে পেল ক্যাপ্টেনের নিযুক্ত একজন লোক এবং সার্জেণ্টদের একজন মাত্র পাহারায় নিযুক্ত আছে।

দীপককে দেখেই ক্যাপ্টেনের লোকটি তাকে লম্বা সেলাম করে সোজা হয়ে দাঁড়াল।

দীপক জিজ্ঞাসা করল—ওদের দুজনের মধ্যে মাত্র একজনকে দেখছি কেন?

ক্যাপ্টেনের লোকটি কিছু বলবার আগে সার্জেণ্টটি এগিয়ে এসে দীপকের দিকে চেয়ে হিন্দুস্থানী ভাষায় বলল—আমার সঙ্গীটি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছে হুজুর।

দীপক বলল—তাহলে ত তোমার খাটুনী আরও বেড়ে গেল!

—হ্যাঁ। কিন্তু তাতে ক্ষতি নেই। এমনি করেই চালিয়ে যেতে পারব। আর ক্যাপ্টেনের লোক ত রয়েছে দুজন। ওদের এক একজন এক একবার করে পাহারা দিচ্ছে আমার সঙ্গে।

—খুব হুঁশিয়ারসে খাড়া রহো। রেঙ্গুনে পৌঁছে বরং লোকের ব্যবস্থা করা যাবে।

—তার দরকার হবে না হুজুর।

—তোমার সঙ্গীর অসুখ কি খুব কঠিন?

—হ্যাঁ হুজুর। কাজ করতে একেবারেই পারল না।

—তবে লোক না হলে চলবে কেমন করে?

—কাল-পরশুর মধ্যেই ও বোধ হয় সেরে উঠবে।

লোকটির কথাবার্তায় দীপক একটু অবাক হলো। যার কঠিন অসুখ সে কাল-পরশুর মধ্যে সেরে উঠবে কি করে?

যা হোক, কথা না বাড়িয়ে দীপক এগিয়ে চলল ডেকের দিকে।

হঠাৎ একজন লোক এসে দীপকের পাশে দাঁড়িয়ে উচ্চৈঃস্বরে বলল—কয়েকটা কথা ছিল স্যার।

দীপক চেয়ে দেখল, ক্যাপ্টেনের যে দুজন লোককে পাহারার জন্য রাখা হয়েছে, এ তাদের দ্বিতীয়জন। প্রথমজনকে সে একটু আগেই পাহারায় ব্যস্ত অবস্থায় দেখে এসেছে।

দীপক বলল—কী কথা বলতে চাও বল।

লোকটি বলল—আপনাদের সার্জেণ্টদের হাবভাব আমাদের ভাল লাগছিল না হুজুর। আপনি কিছু বলতে নিষেধ করেছেন বলে কিছু বলিনি। কিন্তু দিনরাত কি ফুসফাস করছিল আর যেন কতো সব ষড়যন্ত্র আঁটছিল। আমরা কোনও কিছু বলতে গেলেই অহেতুক যা তা গালাগালি করছিল আমাদের।

—সে সব ত আগেই শুনেছি।

—তারপর আজ বিকেলে—ঠিক সন্ধ্যার মুখোমুখি ওদের একজনের হঠাৎ অসুখ করে বসল। অসুখবিসুখ কিছু দেখতে পেলাম না। সে শুধু শুয়ে পড়ে এমন ভাব দেখাল যেন তার শরীরে অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে।

—তারপর?

—তারপর সে যে চলে গেল, তখন পর্যন্ত তার আর কোনও পাত্তাই পেলাম না। কখন আবার হয়ত ইচ্ছেমত দু-একদিন পরে এসে বলবে—অসুখ সেরে গেছে।

—যাক্‌গে, তোমরা যেমন আছ পাহারা দিয়ে যাও। আমি ওবিষয়ে ক্যাপ্টেনকে বলব। তোমরা মিথ্যে কোনও গোলমাল করো না যেন।

লোকটি সেলাম করে চলে গেল।

তারপর রাতের অবশিষ্ট সময় দীপক স্ট্রং রুমের আশেপাশে পাহারা দিয়ে কাটাল বটে, কিন্তু অস্বাভাবিক কিছুই দেখতে পেল না।

ভোরবেলা সে ধীরে ধীরে তার নির্দিষ্ট কেবিনের দিকে যখন ফিরে চলল, তখন সারা রাত্তির জাগরণের ফলে তার সমস্ত শরীর যেন অবসন্ন হয়ে পড়েছিল।

সাত

—অসুস্থ মিঃ মূলার—

সেদিন রাতে রতন যখন কেবিনের সামনে অজ্ঞান হয়ে পড়ল, তখন জাহাজের ক্যাপ্টেন মূলার নিজের কেবিনে গভীর নিদ্রার কোলে ঢলে পড়েছিলেন।

কেবিনের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল।

মাথার দিকের জানালাটা ছিল খোলা। একটি মূর্তিকে দেখা গেল ধীরে ধীরে জানালার বাইরে এসে দাঁড়াতে। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে সে কি যেন ভেবে নিল। তারপর একটা রুমাল

কি-একটা তরল পদার্থে ভিজিয়ে নিয়ে জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে ক্যাপ্টেনের মাথার কাছাকাছি নাড়তে লাগল।

মিনিট খানেক ওরকম করবার পর ক্যাপ্টেন আরও গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন।

লোকটি তখন লঘুপদে এগিয়ে গেল কেবিনের দিকে। একটা ধারালো ছুরি দরজার ফাঁক দিয়ে ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়ে হুকটা খুলে ফেলবার চেষ্টা করতে লাগল।

খুট্!

কিছুক্ষণ চেষ্টার পরই হুকটা খুলে গেল।

দরজা খুলে লোকটি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল। তারপর চারদিকে একবার চকিত দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে দরজাটি ধীরে ধীরে ভেতর থেকে বন্ধ করে দিল।

ঘরের মধ্যে জ্বলছিল মৃদু একটা নীল আলো। তার নীলাভ আভা যেন ঘরের মধ্যে এক রহস্যালোকের সৃষ্টি করেছিল।

লোকটি ধীরে ধীরে সুইচ্ বোর্ডের দিকে অগ্রসর হলো।

দপ করে কক্ষের আলোটি নিভে গেল অকস্মাৎ।

লোকটি পায়ে পায়ে এগোল গভীর নিদ্রার ঘোরে আচ্ছন্ন ক্যাপ্টেন মূলারের দিকে। তার মুখে ফুটে উঠল বিচিত্র রহস্যময় এক হাসি। পৃথিবীর কোনও জীবন্ত লোক সেই হাসিটি দেখতে পেলে হয়ত ভয়ে শিউরে উঠত। বিশ্বের হিংসা যেন পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছিল তার দুটি চোখের দৃষ্টিতে।

পরদিন সকাল। বেলা সাতটা।

প্রভাতের প্রথম সোনালী রোদ ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়তে সুরু করেছে নীল সাগরের বুকে।

সূর্যকিরণের ছোঁয়ায় রতনের ঘুম ভেঙে গেল। সে ধীরে ধীরে উঠে বসতে চেষ্টা করল।

জাহাজের ডেকের ওপর তখন আরও কয়েকজন যাত্রী রতনকে এভাবে পড়ে থাকতে দেখে সেখানে এসে ভিড় করেছিল। রতনকে উঠে বসতে দেখে তারা আশ্বস্ত হলো।

তারা ভাবল বোধ হয় গত রাত্রে লোকটি অত্যধিক নেশা করে এভাবে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল।

ধীরে ধীবে চোখ মেলে রতন দেখতে পেল জাহাজের ডেকের ওপর সে শুয়ে আছে।

গত রাতের কথা তার একে একে মনে পড়ল। সেই অপরিচিত লোকটি যে তার সঙ্গে আলোচনা করছিল...তারপর তার নাকে রুমাল চেপে ধরা...মিষ্টি গন্ধ...

রতন বুঝতে পারল লোকটি নিশ্চয়ই সেই দস্যুদলের একজন হবে। কিন্তু কি বোকা সে। তাকে চোখের সামনে দেখতে পেয়েও সে সন্দেহ পর্যন্ত করতে পারেনি।

একটা অবসাদ রতনের দেহ আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। ধীরে ধীরে উঠে বসে সে নিজের কেবিনের দিকে পা বাড়াল।

কেবিনে পৌঁছে সে দেখতে পেল দীপক সারারাত্রির পরিশ্রমের পর গভীর নিদ্রায়

রতন তাকে বিরক্ত করল না।

সর্বপ্রথমে বাথরুমে প্রবেশ করে সে স্নান শেষ করল। স্নানের পরে বেশ একটু সুস্থ বোধ করল সে। তার পর বেশভূষা শেষ করে কেবিনের ভৃত্যকে চা এবং খাবার আনতে বলল।

দুটি সিদ্ধ ডিম, টোস্ট আর চা খেয়ে তার ক্ষুধার নিবৃত্তি হলো। দেহের শক্তিও যেন ফিরে পেল অনেকটা। এতক্ষণে দীপকের ঘুমও ভেঙে গিয়েছিল। চোখ মেলেই সে রতনকে সামনে দেখতে পেয়ে প্রশ্ন করল—কিরে, রাত কি রকম কাটল?

রতন বলল—খুব ভাল। নতুন একটা অভিজ্ঞতা লাভ হলো।

—কি রকম?

—কাল একেবারে খোদ লিউসিনের সঙ্গে দেখা হয়েছিল।

—সে কিরে?

—হ্যাঁ, কিন্তু প্রথমে চিনতে পারিনি।

—তারপর?

—তারপর আমার অন্যমনস্কতার সুযোগ নিয়ে কথায় কথায় আমার নাকে হঠাৎ রুমাল চেপে ধরে আমাকে অজ্ঞান করে ফেলেছিল।

—তুই বাধা দিলি না?

—চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু সফল হইনি। তারপরে আর জ্ঞান ছিল না। ঘুম ভাঙল আজ সকালে।

—বাঃ, একেবারে ছোট ছেলের মত তোকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে কাজ হাসিল করল?

—অনেকটা তাই। তবে ভবিষ্যতে আর ভুল হবে না।

—ক্যাপ্টেনের খবর নিয়েছিলি?

—না, আজ সকালে আর সময় পেলাম না।

—চল্, ব্রেকফাস্ট শেষ করে আমিও ক্যাপ্টেনের সঙ্গে দেখা করব। তাঁকে সব কথা খুলে বলতে হবে ত। আর একথাও বলতে হবে যে যার অস্তিত্বের কথা চিন্তা করে এবং চিঠি দেখতে পেয়েই তিনি ভয়ে অস্থির ছিলেন, সেই দস্যু লিউসিন স্বয়ং এসে দেখা দিয়েছিল।

দুজনেই একসঙ্গে হো হো করে হেসে উঠল।

ব্রেকফাস্ট শেষ করে দীপক ও রতনলাল একত্রে গিয়ে উপস্থিত হলো ক্যাপ্টেন মূলারের কক্ষের সামনে।

কিন্তু সেখানে গিয়ে তারা অবাক হয়ে দেখতে পেল, একজন নতুন লোক ঘরের সাম্‌নে পাহারা দিচ্ছে।

দীপক ভাবল যে ক্যাপ্টেন মূলারকে সাবধানে থাকার জন্য যে একজন বডিগার্ড নিযুক্ত করার কথা হয়েছিল, এই বোধ হয় সেই লোক।

ঘরের দরজা ভেজানো ছিল। দীপক লোকটির দিকে চেয়ে বলল—আমি ক্যাপ্টেন মূলারের সঙ্গে একটু দেখা করতে চাই।

লোকটি বলল—ক্যাপ্টেন মূলার অসুস্থ। তিনি আজ কারও সঙ্গেই দেখা করতে পারবেন না।

দীপক বলল—কিন্তু আমার জরুরী দরকার ছিল। তুমি তাঁকে গিয়ে বল, মিঃ চ্যাটার্জী দেখা করতে চান।

লোকটি ভিতরে গিয়ে একটু পরেই ফিরে এসে বলল—শরীর সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত কারও সঙ্গেই তাঁর সাক্ষাৎ করা সম্ভব নয়।

দীপক ও রতন হতাশ হয়ে ফিরে চলল নিজেদের কেবিনের দিকে।

আট

—রেঙ্গুন বন্দরে—

দীপকের সঙ্গে কেবিনে ফিরে এসে রতন বলল—উঃ, জীবনে অনেক জটিল কেসের মুখোমুখি আমরা গিয়ে পড়েছি বটে, কিন্তু এ ধরণের গোলকধাঁধার মধ্যে পড়তে হয়নি কখনও।

দীপক অন্যমনস্কভাবে কি যেন চিন্তা করছিল। আনমনে বলল—কেন?

রতন বলল—সাধারণ কোনও চোর ডাকাত খুনে হলে পারা যায়—কিন্তু এ যে দেখছি সারা জাহাজ জুড়েই সুরু হয়ে গেছে রহস্যের খেলা! সবই যেন কেমন হেঁয়ালী বলে মনে হচ্ছে। উঃ, এই ধরণের সব ঘটনা ঘটবে আগে জানলে কি আর প্রাণ হাতে করে এ ভাবে রওনা হই?

দীপক বলল—ধাঁধার কি দেখতে পেলি আমি ত বুঝছি না!

—ধাঁধা নয়? প্রথমেই আলাপ হলো অনঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার নামে ভদ্রলোকের সঙ্গে। তিনি নিখোঁজ। তারপর ডেকে রক্তের দাগ। গভর্ণমেণ্ট প্রহরীদের উল্‌টো-পাল্‌টা কথাবার্তা ও ব্যবহার। ভয় দেখানো চিঠি। আবার চিঠি পেয়েই ক্যাপ্টেন হয়ে পড়লেন অসুস্থ। এমন কি তিনি আমাদের সঙ্গে পর্যন্ত দেখা করলেন না।

—তা তিনি ইচ্ছে করলে না করতেও পারেন। ভুলে যেও না রতন, জাহাজের বুকে ক্যাপ্টেন যা করবেন সেটাই সবচেয়ে বড়ো। ওঁর উপরে কথা বলবার মতো এখানে কেউ নেই। দরকার হলে উনি তোমাকে আর আমাকে বন্দী করেও রাখতে পারেন। অবশ্য ডাঙ্গায় পৌঁছিয়েই ওঁকে কৈফিয়ৎ দিতে হবে। কিন্তু সে পরের কথা। যতক্ষণ জাহাজে আছ, ততক্ষণ ক্যাপ্টেন যা বলবেন সেইটাই আইন বলে গণ্য হবে।

—তা অবশ্য সত্য। কিন্তু অসুস্থ থেকে দেখা না করার জন্য অবশ্য কোনও কৈফিয়ৎই দিতে হবে না ওঁকে।

—সে ত বটেই।

—সে কথা বলছি না আমি। আমার প্রশ্ন এই—মিঃ মূলারের ব্যবহারে হঠাৎ এ ধরণের পরিবর্তনের কারণ কি সেটাই আমার কাছে আশ্চর্যজনক বলে মনে হচ্ছে।

—মনে হলেও তোমাকে চুপ করে থাকতে হবে। তবে আমি অবশ্য ওর মধ্যে ততটা আশ্চর্যের কিছুই দেখছি না। হয়তো উনি সত্যিই অত্যন্ত বেশি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। আর অসুস্থ অবস্থায় কোনও মানুষের মনের অবস্থাই সাধারণ থাকতে পারে না।

রতন কোনও উত্তর না দিয়ে আপন মনে ঘরের মধ্যে পায়চারী করতে লাগল। তবে তার ভাব দেখে মনে হলো যে সে এই ঘটনাগুলিতে অত্যন্ত বিহ্বল হয়ে পড়েছে।

সেদিন দিনের বেলায় জাহাজের কেউই ক্যাপ্টেন মুলারের দেখা পেল না।

জাহাজশুদ্ধ সমস্ত কর্মচারী ক্যাপ্টেন মূলারের এই আকস্মিক অসুস্থতার খবর পেয়ে বেশ একটু বিচলিত হয়ে পড়ল। তিনি সারাদিনের মধ্যে কারও সঙ্গেই দেখা করলেন না। শুধু ইঞ্জিনরুমে একবার বলে পাঠালেন যে জাহাজের গতি যেভাবে চলছে সেইভাবেই চলতে থাকবে।

খবর পেয়ে সকলে আগের মতই কাজ করে চলল। তবে সমস্ত জাহাজেই যে একটা উৎকণ্ঠার ছায়া ছড়িয়ে পড়েছে তা বুঝতে কারও দেরী হলো না।

তবে আশার কথা এই যে সন্ধ্যার পরেই জাহাজ রেঙ্গুন বন্দরে গিয়ে ভিড়বে। সেখানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা যাবে—এমন কি প্রয়োজন হলে নতুন লোকের ব্যবস্থাও করা যেতে পারে। অবশ্য যদি ক্যাপ্টেন মূলার নিজের অসুস্থতার জন্য অবসর গ্রহণ করতে চান।

জাহাজের যাত্রী ও কর্মচারীদের এই সব জল্পনা-কল্পনার মধ্যে জাহাজ ঠিকমতই এগিয়ে চলল।

আর দীপক চ্যাটার্জী ও রতন শুধু একবার স্ট্রং রুম এবং একবার ক্যাপ্টেনের ঘরের সামনে ঘোরাফেরা করেই তাদের কর্তব্য পালন করে চলল।

সন্ধ্যার ঠিক পরেই জাহাজ এসে রেঙ্গুন বন্দরে ভিড়ল।

আলোকোজ্জ্বল রেঙ্গুন নগরীর দৃশ্যাবলী যেন জাহাজের আরোহীদের মনে বহন করে নিয়ে এলো আশা এবং আনন্দের বাণী।

জাহাজের সমস্ত আরোহী বিগত কয়েকদিন ধরে অবিশ্রান্ত জলের মধ্যে বাস করে কেমন যেন হাঁপিয়ে উঠেছিল। এবার তারা যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল।

পরদিন বেলা আটটার আগে জাহাজ ছাড়বে না। আরোহীদের অনেকে তাই বোটে চড়ে রেঙ্গুন শহরটা দেখে আসবে বলে স্থির করলো।

একদল ডক পুলিশ জাহাজে উঠে এলো প্রত্যেকের পাসপোর্ট ও অন্যান্য সব কিছু পরীক্ষা করে তাদের নামবার অনুমতি দেবার জন্যে।

দীপক এবং রতন এগিয়ে গিয়ে ডক পুলিশের কাছে নিজেদের পরিচয় দিয়ে বলল—জাহাজ থেকে যে সব যাত্রীরা নামবে আমরাও তাদের একবার পরীক্ষা করে দেখব বলে স্থির করেছি।

ডক পুলিশ কর্মচারী হাসিমুখে তাকে সম্মতি দিল।

যাত্রীরা একে একে প্রায় দেড়শোজন নেমে গেল রেঙ্গুন শহর দেখবার জন্যে। সকলে নেমে গেলে দীপক কিছুক্ষণ চিন্তা করে নিম্নস্বরে রতনকে বলল—এদের মধ্যে কাউকেই সন্দেহজনক বলে কিন্তু মনে হলো না।

রতন বলল—না। তবে জাহাজে যারা আছে তাদের মধ্যেই বা দস্যু লিউসিন কে তা আমার মাথায় এখনো ঢুকলো না।

দীপক কোনও উত্তর দিল না।

ডক পুলিশেরা যাত্রীদের ছেড়ে দিয়ে জাহাজের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীর দিকে চেয়ে বলল—ক্যাপ্টেন মূলারের সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই।

কর্মচারীটি বলল—তিনি আজ সকাল থেকে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, কারও সঙ্গেই দেখা করতে পারবেন না।

ডক পুলিশেরা আর কোনও কথা না বলে তার দিকে চেয়ে বলল—আপনি ওঁকে বলবেন যে যদি কোনও ব্যাপারে পুলিশের সাহায্য প্রয়োজন হয় তবে যেন এখানকার ডক পুলিশের কর্তা স্যাম্পসন সাহেবকে জানানো হয়।

কর্মচারীটি তাদের কথায় সম্মতি জানালে তারা নেমে গেল একে একে।

দীপকের দিকে চেয়ে রতন প্রশ্ন করল—এরা ত নেমে গেল, এবার নিশ্চয় আর কোনও যাত্রীকেই নামতে দেওয়া হবে না?

রতনের কথার উত্তরে দীপক জানাল—না, আজ রাতের মত আর কেউই জাহাজ থেকে নামতে পারবে না।

—আমরাও তাহলে কাল সকালের আগে রেঙ্গুন শহরে যেতে পারব না।

—এবারকার মতো রেঙ্গুন শহর দেখবার আশা স্থগিত রাখো বন্ধু। দীপক হেসে উত্তর দিল।

—কিন্তু জাহাজের সেফ্ ভল্টের খোল ত কেউ পরীক্ষা করে দেখল না!

—যতক্ষণ ক্যাপ্টেন না জানাচ্ছে যে সোনার কোনও ক্ষতি হয়েছে বা ক্ষতি হবার আশঙ্কা আছে, ততক্ষণ কেউ সেটা পরীক্ষা করে দেখবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করবে না। তবে সিঙ্গাপুরে পৌঁছে অবশ্যই সেটা পরীক্ষা করে দেখা হবে। আর যদি সোনার কোনও ক্ষতি হয় তবে তার জবাবদিহিও ক্যাপ্টেনকে করতে হবে সিঙ্গাপুরে।

জাহাজ থেকে যাত্রীদের নামাওঠা বন্ধ হবার পরে দু-একজন কুলী শুধু কতকগুলি মালপত্র নিচে নামাচ্ছিল। তাদের দিকেও একবার সন্দিগ্ধ চোখে তাকিয়ে দীপক দেখল, কেউ ছদ্মবেশী দস্যুদের লোক কিনা।

সর্বদিক থেকে নিঃসন্দেহ হয়ে দীপক রতনকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে চলল ডাইনিং রুমের দিকে।

একটু পরেই বেজে উঠল খাবার ঘণ্টা।

নয়

—ক্যাপ্টেনের গতিবিধি—

জাহাজ রেঙ্গুন বন্দর ছাড়ল।

বেলা তখন সাড়ে আটটার কিছু বেশি।

দলে দলে যাত্রীরা রেলিংয়ের ধারে দাঁড়িয়ে বিলীয়মান বেলাভূমির দিকে চেয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

আবার সুরু হলো তাদের ভ

অবশ্য যে সব যাত্রীদের লক্ষ্য ছিল রেঙ্গুন বন্দর তারা আর জাহাজে ফিরে এলো না।

জাহাজ রেঙ্গুন বন্দর ত্যাগ করে নীল জল কেটে এগিয়ে চলল সাবলীল ছন্দে।

দিগন্তবিস্তৃত জলরাশির দিকে চেয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে রতন বলল—এই জলরাশির মধ্যে ঘটেছে অনঙ্গস্বামী আয়েঙ্গারের সমাধি—যিনি একদিন রেঙ্গুনে এসে পৌঁছবেন আশা নিয়ে যাত্রা করেছিলেন।

দীপক হেসে বলল—অত বেশি ভাবালুতা ভাল নয়!

—কেন?

—ভাবালুতা মানুষকে ভুল পথে নিয়ে যায়।

—যথা?

—অনঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার মারা যাননি।

—সেকি? অবাক হয়ে রতন প্রশ্ন করে।

—হ্যাঁ, তোর অজ্ঞাতে ডক পুলিশের কাছ থেকে খবর নিয়ে জানতে পেরেছি যে অনঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার নামে বিখ্যাত ব্যবসায়ী গত ছ'মাসের মধ্যে রেঙ্গুন ছেড়ে বের হননি।

—তবে যে লোকটি মারা গেল সে কে?

—এই জাল অনঙ্গস্বামীটি কে তা এখনও জানতে পারিনি। আর তিনি এভাবে অদৃশ্যই বা হলেন কেন?

—হয়তো জাল লোককেই আসল লোক মনে করে দস্যুরা হত্যা করে সমুদ্রে ফেলে দিয়েছে।

—রক্তের দাগ সেকথাই বলে বটে, তবে এ সম্বন্ধে সবকিছু না জানা পর্যন্ত একটি কথাও প্রকাশ করা অনুচিত।

দীপক ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল ক্যাপ্টেনের ঘরের দিকে, ক্যাপ্টেন এতক্ষণে কতটা সুস্থ হয়েছেন তা জানবার জন্যে।

কিন্তু ক্যাপ্টেনের ঘরের সাম্‌নে প্রহরারত লোকটি বলল—ক্যাপ্টেনের শারীরিক অবস্থা একটু উন্নত হলেও এখনও বাইরের লোকের সঙ্গে দেখা করবার মত অবস্থা তাঁর আসেনি।

কিছুটা চিন্তা করে দীপক অগত্যা ফিরে চলল স্ট্রং রুমের দিকে—যেখানে ক্যাপ্টেনের একজন লোক ও একজন প্রহরী তখনও পাহারা দিচ্ছিল।

পুলিশ প্রহরীর মন আজ একটু ভাল বলে মনে হলো। দীপককে দেখে সে এগিয়ে এসে সেলাম ঠুকে দাঁড়াল।

দীপক প্রশ্ন করল—তোমার একা থাকতে কষ্ট হচ্ছে না ত?

লোকটি বলল—না হুজুর, মিলিটারীতে কাজ করবার সময় দশ দিন দশ রাত পর্যন্ত বহুবার একভাবে পাহারা দিতে হয়েছে।

—তোমার সঙ্গীর শরীরের অবস্থা কেমন?

—আগের চেয়ে একটু ভাল।

—কবে থেকে কাজে লাগতে পারবে বলে মনে হয়?

—তার ঠিক নেই। তবে দু-একদিনের মধ্যেই কাজে লাগবে। ওর শরীর ভাল হলে আমি একটু বিশ্রাম নেব হুজুর।

দীপক বলল—আচ্ছা, তুমি বেশ ভাল করে এখনকার মত পাহারার কাজ চালাও।

—আচ্ছা হুজুর। লোকটি সেলাম ঠুকে চলে গেল।

দীপক এবার ক্যাপ্টেনের লোকটিকে একপাশে ডেকে জিজ্ঞাসা করল—কি খবর? এখন নিশ্চয়ই আর কোনও অসুবিধে হচ্ছে না?

লোকটি বলল—না হুজুর। কাল ক্যাপ্টেন এসে লোকটাকে একটু ধমকে দিয়েছিলেন। তারপর থেকে ও চুপচাপ মুখ বুজে পাহারা দিচ্ছে।

—ক্যাপ্টেন? দীপক অবাক হয়ে প্রশ্ন করে।

—হ্যাঁ, হুজুর। কাল রাত দশটার সময় তিনি এধারে এসেছিলেন।

—কিন্তু তিনি ত অসুস্থ।

—হ্যাঁ, আমি তাঁকে সে প্রশ্ন করায় তিনি ধমকে বললেন যে, সে খোঁজে আমার দরকার কি? তারপর জানালেন যে তাঁর শরীরেব এখন যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে এবং এর পর তিনি নিয়মিতভাবে জাহাজের কাজ দেখাশুনা করবেন।

—তারপর? দীপক আগ্রহপূর্ণভাবে প্রশ্ন করে।

—তারপর তিনি বললেন যে রেঙ্গুনে এসে জাহাজ যখন নোঙ্গব করেছে, তখন আর একবার সেফ্‌টি ভল্টটি পরিদর্শন করবেন তিনি। এই বলে তিনি চাবি দিয়ে সেফ্‌টি ভল্টের তালা খুলে ভিতরে যান এবং দরজা বন্ধ করেন। তারপর ভিতরে গিয়ে তিনি কি করেন তা অবশ্য আমরা জানি না। অবশেষে বের হলেন প্রায় আধঘণ্টা পর। বেরিয়েই গম্ভীরমুখে তিনি চলে গেলেন।

—তারপর আর তিনি এধারে আসেননি?

—না হুজুর।

দীপক লোকটির সঙ্গে আর কোনও কথা না বলে গম্ভীরভাবে রতনকে সঙ্গে নিয়ে নিজের কেবিনের দিকে চলল।

রতন প্রশ্ন করল—ক্যাপ্টেনের সঙ্গে আর একবার দেখা করবার চেষ্টা করবি না?

গম্ভীরভাবে দীপক উত্তর দিল—না, কোন লাভই হবে না তাতে।

—কেন?

—ক্যাপ্টেন মূলার আমাদের সঙ্গে অবশ্যই দেখা করবেন না।

—কিন্তু তাঁর এই ধরণের অন্যায়ের সমর্থন করা কোনক্রমেই উচিত নয়।

—কিন্তু ক্যাপ্টেনের উপর আমাদের কোনও হাত নেই একথা ভুলে যেও না বন্ধু।

—হাত নেই বলেই কি চুপচাপ থাকব?

—বেশি উত্তেজনা প্রকাশ করলে বিপদের সম্মুখীন হতে হবে।

—তাহলে এভাবে আমাদের পাহারা দেবার অর্থ কি?

—সেটা সিঙ্গাপুরে পৌঁছে রিপোর্ট করলে ক্যাপ্টেনকে তার জন্য জবাবদিহি করতে হবে। কিন্তু তার আগে তাঁর যা ইচ্ছা তিনি করতে পারেন।

কোনও কথা না বলে চিন্তিত মনে রতন পায়চারী করতে লাগল।

দশ

—দীপক ও রতন বন্দী—

বেলা এগারোটা বাজল।

ডাইনিং রুমের বেল প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের সচকিত করে তুলল। তারা সকলেই একে একে এগিয়ে গেল ডাইনিং রুমের দিকে।

রতনের দিকে চেয়ে দীপক চ্যাটার্জী বলল—তুইও ডাইনিং রুমের দিকে যা। আমার একটু জরুরী কাজ আছে। সেটা শেষ করে তারপর যাব।

রতন একটু চিন্তা করে বলল—কী জরুরী কাজটা একবার শুনি! এভাবে তুই নিজে কাজ করবি আর আমি শুধু চেয়ে চেয়ে দেখব, এটা বিশ্রী লাগছে আমার।

দীপক হেসে বলল—সব সময় কৌতূহল ভাল নয়। যথাসময়ে যা কিছু জানাবার ঠিকই জানাব।

—কিন্তু একা বিপদের মধ্যে জড়ানো...

—সেটাতে চিন্তার কারণ নেই কিছু। বিপদ ঘটলে আমাদের দুজনের একসঙ্গেই ঘটবে। কিন্তু এখন তোর ডাইনিং রুমে যাওয়া অবশ্যই উচিত।

—বেশ।

কোনও আপত্তি না করে রতন অনিচ্ছাসত্ত্বেও ডাইনিং রুমের দিকে চলল।

রতন চলে গেলে দীপক একাই এগিয়ে চলল ওয়্যারলেস অপারেটরের ঘরটির দিকে।

জাহাজের এককোণে দোতলার উপরে ওয়্যারলেস অপারেটরের ঘর।

ঘরখানি ভেতর থেকে বন্ধ ছিল। দীপক বাইরে থেকে তিনবার টোকা দিল—টক্ টক্ টক্...

দরজা খুলল।

দ্বারপথে দাঁড়িয়ে অপারেটর মিঃ সেনগুপ্ত। দীপককে দেখে তিনি সাদরে আহ্বান জানালেন—আসুন মিঃ চ্যাটার্জী। তারপর হঠাৎ আমার ঘরে আপনার শুভ পদার্পণ? কি ব্যাপার বলুন ত।

দীপক হেসে বলল—ব্যাপার একটু আছে স্যার। কিন্তু সেটা অত্যন্ত গোপনে রাখতে হবে।

—কি ব্যাপার?

—আপনি সিঙ্গাপুরে পার্সোন্যাল রিসকে একট মেসেজ্ পাঠাতে পারবেন?

—কিন্তু ক্যাপ্টেনের অনুমতি ছাড়া...

—উপায় নেই মিঃ সেনগুপ্ত। ক্যাপ্টেন কিছুতেই এ ব্যাপারে অনুমতি দেবেন না।

—কেন?

—কারণ মেসেজ্টা তাঁরই বিরুদ্ধে।

—সে কি মিঃ চ্যাটার্জী?

—হ্যাঁ। আপনাকে সিঙ্গাপুরে মেসেজ্ প্রেরণ করতে হবে যে ক্যাপ্টেন মূলার কাল রাত্রে গভর্ণমেণ্টের সেফ্টি ভল্ট খুলে ভেতরে ছিলেন আধঘণ্টার ওপর। অথচ নিজে অসুস্থ বলে কারও সঙ্গেই দেখা করছেন না তিনি। তাঁর এই আচরণ সন্দেহজনক।

—বুঝলাম মিঃ চ্যাটার্জী। কিন্তু আমাকে এর জন্যে কৈফিয়ৎ দিতে হতে পারে। আর ক্যাপ্টেন জানতে পারলে আমাকে পদচ্যুত করবেন।

—সেজন্যেই ত এটা করতে হবে অত্যন্ত গোপনে, আর আপনার নিজস্ব দায়িত্বে।

—বেশ, আপনার কথায় রাজি হলাম মিঃ চ্যাটার্জী। কারণ অন্যায়কে আমি কোনওদিনই প্রশ্রয় দিই না।

—কিন্তু ধরা পড়লে আপনার শাস্তি হতে পারে এটা জেনেই ও কাজে হাত দেবেন মিঃ সেনগুপ্ত।

—বেশ, আমি প্রস্তুত।

মিঃ সেনগুপ্ত মেসেজ্ পাঠাতে সুরু করলেন। দীপক দাঁড়িয়ে রইলো চুপচাপ। এতবড়ো একটা ঘটনায় সে যে যথেষ্ট বিহ্বল হয়ে পড়েছে এটা তার দিকে চাইলেই বোঝা যায়।

খট্ খট্ খট্...

দরজায় কড়া নড়ে উঠল।

—কে? দরজা খুললেন মিঃ সেনগুপ্ত। অবাক বিস্ময়ে তিনি লক্ষ্য করলেন ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে স্বয়ং ক্যাপ্টেন মূলার। হাতে তাঁর উদ্যত একটি রিভলবার।

মিঃ মূলার সক্রোধে বললেন—আপনাকে আমি সাস্‌পেণ্ড করলাম মিঃ সেনগুপ্ত। ওয়্যারলেস রুমের দরজা এখন থেকে বন্ধ থাকবে। তারপর তিনি সঙ্গী দুজন লোকের দিকে চেয়ে বললেন—ওকে বন্দী কর।

দুজন রাইফেলধারী প্রহরী এসে দীপককে বন্দী করে নিয়ে চলল। জাহাজেব নিচের একখানা ঘরে দীপককে পুরে বাইরে থেকে তালাবদ্ধ করে দেওয়া হলো।

দীপক সবিস্ময়ে লক্ষ্য করল রতনকে তার আগেই বন্দী করে সেখানে রাখা হয়েছে।

ক্যাপ্টেন মূলার একজন প্রহরীর দিকে চেয়ে বললেন—তুমি এখানে পাহারা দাও। দেখো যেন ওরা দুজন পালাতে না পারে। তোমাকে মোটা বকশিস দেবার ব্যবস্থা করব।

প্রহরীটি লম্বা সেলাম ঠুকতেই মিঃ মূলার অন্য সঙ্গীটিকে নিয়ে অদৃশ্য হলেন।

এগারো

—অপারেটর মিঃ সেনগুপ্ত—

দীপক ও রতনকে বন্দী করে ক্যাপ্টেন মূলার দ্রুতপদে চললেন ইঞ্জিনঘরের দিকে। সেখানে তখন জাহাজের দুজন কর্মচারী এবং আরও কয়েকজন লোক কাজ করছিল। ক্যাপ্টেন মূলারকে দেখে সকলেই উঠে দাঁড়াল সসম্ভ্রমে।

ক্যাপ্টেন মূলার একজন কর্মচারীর দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলেন—জাহাজ এখন কত স্পীডে চলছে?

ইঞ্জিনরুমের প্রধান কর্মচারী মিঃ রক্ষিত বললেন—ঘণ্টায় বাইশ মাইল স্যার।

—এত কম?

—এ জাহাজের পক্ষে ওটাই যে খুব বেশি স্পীড্ তা ত আপনি জানেন স্যার।

—না, এতে চলবে না। ঘণ্টায় অন্ততঃ চল্লিশ মাইল স্পীডে চালান। ক্যাপ্টেন মূলারের স্বরে দৃঢ়তা।

—কিন্তু এতে জাহাজের মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে স্যর। এমন স্পীড্ এ জাহাজ কোনও মতেই সহ্য করতে পারবে না। এতগুলি যাত্রীর জীবন বিপন্ন হবে। মিঃ রক্ষিতের স্বরে ভয়ার্ত ভাব ফুটে উঠল।

—এস্ এস্ মালাবারের দায়িত্ব এখন আমার হাতে মিঃ রক্ষিত। এত বছর ধরে আমি এর ক্যাপ্টেন্সি করছি...আমি জানি কতটা স্পীড্ এ সহ্য করতে পারে। আমার আদেশ না মানলে অন্য লোককে আমি আপনার স্থানে কাজ করাতে বাধ্য হব।

গম্ভীর মুখে মিঃ রক্ষিত বললেন—আপনার আদেশই প্রতিপালিত হবে স্যর।

ক্যাপ্টেন মূলার আর কোনও কথা না বলে হন্ হন্ করে নিজের ঘরের দিকে চল্‌লেন।

জাহাজের স্পীড্ বাড়িয়ে দিলেন মিঃ রক্ষিত। আকস্মিক বেগের প্রাবল্যে সারা জাহাজটা যেন থরথর করে একবার কেঁপে কেঁপে উঠল।

সমস্ত জাহাজের কর্মচারী আর যাত্রীদের মধ্যে পড়ে গেল উদ্বেগ আর চাঞ্চল্যের সাড়া। এস্ এস্ মালাবার এত বেশি বেগ কোনও মতেই সহ্য করতে পারবে না।

মিঃ রক্ষিতের এ্যাসিস্ট্যান্ট তাঁর দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলেন—ক্যাপ্টেন মূলারের কি হঠাৎ মাথা খারাপ হয়ে গেছে স্যর?

—কেন বলো তো?

—তিনি হঠাৎ যেন অসুখ থেকে উঠে অন্য মানুষ হয়ে গেছেন। তাঁর মেজাজ গেছে বদলে। সেই সুন্দর নম্র মানুষ যে কি করে এত পরিবর্তিত হতে পারেন বুঝতে পারছি না।

জাহাজের অন্য কয়েকজন কর্মচারীও মিঃ রক্ষিতকে ঘিরে ধরেছিল। তাদের একজন বললে—এ ধরণের অন্যায়কে আমরা কিছুতেই সহ্য করতে পারি না স্যর। আপনি জাহাজের গতি কমিয়ে দিন। ক্যাপ্টেনের মাথা খারাপ হবার জন্যে এতগুলো লোককে মিথ্যা মরতে হবে কেন?

এমন সময় ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলেন অপারেটর মিঃ সেনগুপ্ত। তাঁর দিকে চেয়ে মিঃ রক্ষিত প্রশ্ন করলেন—আপনি এখানে কেন?

—আমাকে সাস্‌পেণ্ড করেছেন মিঃ মূলার। আর বিখ্যাত ডিটেকটিভ দীপক চ্যাটার্জী ও রতনলালকে তিনি বন্দী করেছেন।

কর্মচারীদের মধ্যে গুঞ্জনের সাড়া পড়ে গেল। এ সম্পূর্ণ অসম্ভব। প্রয়োজন হলে আমরা বিদ্রোহ করে ক্যাপ্টেনকে বন্দী করব। কিন্তু....

মিঃ সেনগুপ্ত বললেন—বেশ, আপনারা আমাকে অপারেটিং রুমের চাবি খুলে দিন, আমি এক্ষুণি সব কথা সিঙ্গাপুরে জানিয়ে দিচ্ছি।

কিন্তু ক্যাপ্টেনের বিরুদ্ধে এভাবে প্রকাশ্য বিদ্রোহ করা কি উচিত হবে? মিঃ রক্ষিত চিন্তান্বিত স্বরে বললেন—নিশ্চয়ই উনি কৈফিয়ৎ দিতে পারবেন। তা নইলে....

—না মিঃ রক্ষিত। মিঃ সেনগুপ্ত বললেন—ওঁর মাথা যে এখন সুস্থ নয় তা বেশ বুঝতে পারছি। চলুন আমরা জাহাজের গতি কমিয়ে এক্ষুণি অপারেটিং রুমে যাই এবং সব কথা হেড্ অফিসে জানাই।

তক্ষুণি জাহাজের গতি কমিয়ে দেওয়া হলে যাত্রীরা যেন একটি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল। তারপর সকলে মিলে চলল অপারেটিং রুমের দিকে। প্রয়োজন হলে তালাটি ভেঙে ফেলে অপারেটিং রুম খুলে সব কথা হেড্ অফিসে জানাতে হবে।

মিঃ রক্ষিত ও মিঃ সেনগুপ্ত এগিয়ে চললেন সবার আগে—তার পেছনে জাহাজের অন্যান্য কর্মচারীরা।

একজন শুধুমাত্র রইলো ইঞ্জিনরুমের চার্জে।

বারো

—দীপকের কারসাজি—

ধীরে ধীরে সময় কেটে চলেছে—সেকেণ্ড...মিনিট...ঘণ্টা...

অস্থিরভাবে ঘরের মধ্যে পায়চারী করছে রতনলাল। এইভাবে যে ক্যাপ্টেন মলারের আদেশে তাদের বন্দী হতে হবে এ কথা সে বোধ হয় কল্পনাতেও স্থান দেয়নি।

দীপক কিন্তু অদ্ভুতভাবে শান্ত। তার ভাবভঙ্গি দেখে বোঝা যায় যে সে এর জন্যেই পূর্বেই প্রস্তুত ছিল।

বিকাল হয়ে এলো। হাতঘড়ির দিকে চেয়ে দীপক দেখল বেলা চারটে।

দারুণ ক্ষুধায় পেটটা চোঁ চোঁ করছিল। রতনের দিকে চেয়ে সে বলল—কেন তোকে তখন ডাইনিং রুমে পাঠিয়েছিলাম এখন বুঝতে পারছিস ত? তুই দিব্যি খেয়ে এলি আর আমার পেট ক্ষিদেয় জ্বলছে।

—কিন্তু আপাততঃ আমারও যে এক কাপ চায়ের প্রয়োজন বন্ধু। রতন বলল।

—সে চিন্তা করে লাভ নেই ভাই। পেটের ক্ষুধাটা পেটেই চেপে রাখতে হবে।

—কিন্তু কোনও উপায়ই কি নেই?

—হ্যাঁ, একটা উপায় হয়তো আছে। সেটাই এখন চেষ্টা করে দেখব।

দীপক জানালার কাছে এগিয়ে গিয়ে খট্ খট্ করে টোকা দিতে থাকে। জানালার নিচের ছোট্ট একটা অংশ খুলে যায়। ফাঁক দিয়ে মুখ বের করে প্রহরীটি বলে—কি চাই?

দীপক একটা পাঁচ টাকার নোট ছিদ্র দিয়ে বের করে দিয়ে বলে—কিছু খাবার বন্ধু।

নোটটি নিয়ে লোকটি চলে যায়। একটু পরে সে গোটা দুই মামলেট, একখানা রুটি আর দু'কাপ চা জানালা খুলে ভেতরে দেয়।

রতনের দিকে চেয়ে দীপক বলে—আপাততঃ এতেই তৃপ্ত থাকতে হবে বন্ধু। নাও চা-টা খেয়ে নাও। এভাবে উৎকোচ দিয়ে যতটুকু পাওয়া যায়।

ধীরে ধীরে খাবারের দিকে মনঃসংযোগ করে ওরা।

খাওয়া শেষ হয়ে গেলে দীপক আবার খট্ খট্ করে টোকা মারতে থাকে। জানালাটা খুলে যায়। দীপক প্লেটগুলো বের করে দেয়। তারপর দশ টাকার একখানা নোট জানালাপথে গলিয়ে দিয়ে বলে—রাতের খাবাব চাই কিন্তু। রাত ঠিক নটার সময়।

প্রহরী হাসিমুখে ঘাড় নেড়ে জানালাটা বন্ধ করে দেয়।

* * * *

ক্যাপ্টেন মূলার জোরে জোরে পা ফেলে এগিয়ে এসে জাহাজের কর্মচারীদের দিকে চেয়ে বলেন—আপনারা আমার কথামত কাজ করবেন কিনা, আমি শেষবারের মত তা জানতে চাই।

মিঃ রক্ষিত বলেন—জাহাজের গতি যদি এইভাবে বজায় থাকে তাহলে কাজ চলবে। তা না হলে আমরা নিজেদের হাতে জাহাজের দায়িত্ব গ্রহণ করব। আপনার পাগলামীকে এভাবে প্রশ্রয় দেওয়া যেতে পারে না।

—কি করতে চান আপনারা?

—জাহাজের গতি বাড়াতে বলা হলে আমরা আপনাকে বন্দী করতে বাধ্য হব। তারপর অপারেটিং রুমের তালা ভেঙে আমরা মেসেজ্ পাঠাব।

—আর যদি জাহাজ এই গতিতেই চলে?

—তা হলে আমরাও পূর্ববৎ কাজ করব।

—বেশ, তাহলে এভাবেই চলুক। কিন্তু পরে আপনাদের এর জন্য কৈফিয়ৎ দিতে হবে।

গজ্ গজ্ করতে করতে প্রস্থান করেন ক্যাপ্টেন মূলার। জাহাজের কর্মচারীরা যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে।

অভিশপ্ত জাহাজের বুকেও রাত নামে। ধীরে ধীরে সারা পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করে ফেলে রাতের নিবিড় কালো আঁধার।

রাত নটা।

ঠক্ ঠক্ ঠক্...

দীপকের দরজার ওপর টোকা পড়তে থাকে।

—কে? দীপক প্রশ্ন করে।

—খাবার এনেছি স্যর। বাইরের তালা খুলে দিয়েছি। দরজার খিল খুলুন।

দরজা খুলে দিতেই রিভলবার উঁচিয়ে ধরে থালা হাতে প্রহরীটি প্রবেশ করে। তারপর খাবার রেখে প্রস্থান করে। দরজা আবার পূর্বের মত বন্ধ হয়ে যায়।

খাওয়া শেষ করে রতন টোকা দেয়—খাওয়া হয়ে গেছে, থালা নিয়ে যাও।

রিভলবার উঁচিয়ে ধরে লোকটি প্রবেশ করে।

কিন্তু ঘরের কোণে ক্ষিপ্ত ব্যাঘ্রের ভঙ্গিতে ওৎ পেতে বসেছিল দীপক।

লোকটি প্রবেশ করতেই তীব্রবেগে তার দেহের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে রিভলবারটি কেড়ে নেয়। তারপর লোকটিকে বন্দী করে তার পোষাকে নিজেকে সজ্জিত করে নিতে বেশিক্ষণ লাগে না। দুজনে বেরিয়ে এসে দরজায় তালা দিয়ে দেয়।

প্রহরীর পরিবর্তে এবার পায়চারী করতে থাকে ছদ্মবেশী দীপক চ্যাটার্জী।

রাত বারোটা।

ক্যাপ্টেন মূলার আসেন জাহাজ পরিদর্শন করতে। প্রহরীর দিকে চেয়ে প্রশ্ন করেন—বন্দীরা কি করছে এখন?

দীপক কণ্ঠ পরিবর্তন করে বলে—ঘুমোচ্ছে হুজুর।

ক্যাপ্টেন মুলারের ঠোঁটে ফুটে ওঠে বিজয়ীর হাসি। বলেন—ঘুমোক। ভালভাবে পাহারা দাও তুমি। প্রচুর বকশিস দেবার ব্যবস্থা করব।

দীপক সেলাম ঠুকে বলে—জী হুজুর!

ক্যাপ্টেন মুলার দ্রুতপদে প্রস্থান করেন।

তেরো

—পরিশেষ—

জাহাজ এসে নোঙ্গর করে সিঙ্গাপুরে।

গভর্ণমেণ্টের লোক, পুলিশ, মিলিটারীতে জাহাজ যেন ভর্তি হয়ে যায়। পুলিশের চীফ্ অফিসার ক্যাপ্টেন মুলারের সঙ্গে সেক্‌হ্যাণ্ড করে বলেন—আশা করি কোনও অসুবিধা হয়নি।

—না। ক্যাপ্টেন মুলার হেসে উত্তর দেন।

—চলুন সেফ্ ভল্টের সোনাগুলি একবার পরীক্ষা করা যাক্।

—আপনারা যান। আমি একটু পরে আসছি। ক্যাপ্টেন মুলার উত্তর দিলেন।

পুলিশের চীফ্ তাঁর দলের লোকদের নিয়ে এগোতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় হঠাৎ কেবিনের প্রহরীটি বলে উঠল—দাঁড়ান স্যার, একটা কথা আছে।

সকলে বিস্ময়ে হতবাক।

প্রহরী হঠাৎ রিভলবারটি ক্যাপ্টেন মুলারের বুকের ওপর উঁচিয়ে ধরে বলে উঠল—এঁকে গ্রেপ্তার করুন স্যার—ইনিই হচ্ছেন ছদ্মবেশী দস্যু লিউসিন।

—সে কি? তাঁদের চোখে-মুখে ফুটে ওঠে বিস্ময়।

—বিশ্বাসঘাতক! চীৎকার করে ওঠেন ক্যাপ্টেন মুলার।

প্রহরী মাথার পরচুলা খুলে ফেলে দেয়। দেখা যায় সেই-ই ডিটেকটিভ দীপক চ্যাটার্জী স্বয়ং।

ছদ্মবেশী ক্যাপ্টেন মুলার এর জন্যে প্রস্তুত ছিল না। সে অবাক বিস্ময়ে চেয়ে দেখে। তারপর হঠাৎ গোল একটা বস্তু ছুঁড়ে দেয় মেঝের ওপর।

—স্মোক্ বম্ব! চীৎকার করে ওঠে দীপক! ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে যায় সারা কক্ষ।

ধোঁয়ার আবরণ সরে গেলে দেখা যায় ছদ্মবেশী ক্যাপ্টেন মুলার ওরফে দস্যু লিউসিন অদৃশ্য হয়ে গেছে।

তক্ষুণি পুলিশের চীফ্ ও দলবল নিয়ে দীপক ছোটে ক্যাপ্টেনের ঘরের দিকে। সেখানে পাওয়া যায় কয়েকটি ব্যাগের মধ্যে সমস্ত সোনা বোঝাই করা। তারপর নিচের একটি গুপ্ত কক্ষে পাওয়া গেল বন্দী অবস্থায় আসল ক্যাপ্টেন মুলারকে। তাঁকে বন্দী করেই দস্যু লিউসিন ক্যাপ্টেন মুলারের ছদ্মবেশ ধরেছিল।

ধীরে ধীরে সব ঘটনা প্রকাশ পায়।

দস্যু লিউসিন ও তার সহকারী সিন্‌ফো প্রথমে ছিল দুজন খালাসীর ছদ্মবেশে। তারপর

তারা গভর্ণমেণ্ট সার্জেণ্টদের হত্যা করে নিজেরাই সেই স্থান অধিকার করে। অবশেষে লিউসিন স্বয়ং ক্যাপ্টেনকে সরিয়ে তার স্থান দখল করেছিল।

ছদ্মবেশী সিন্‌ফোকে গ্রেপ্তার করা হলো। কিন্তু দস্যু লিউসিনকে ধরা গেল না।

মিঃ মূলার শুধু বললেন—আমার দুঃখ হচ্ছে বেচারী গভর্ণমেণ্ট সার্জেণ্ট দুজনের জন্যে! নীল সাগরের অতল গহ্বরেই এদের সমাধি রচিত হলো!

পুলিশ চীফ্ বললেন—মিঃ চ্যাটার্জী না থাকলে সোনাগুলিও লিউসিনের হস্তগত হতো। তাঁর তীক্ষ্ণবুদ্ধির জন্যেই এযাত্রা রক্ষা পেল।

মিঃ মূলার বললেন—অযথা ধন্যবাদ দিয়ে এঁকে আমি ছোট করতে চাই না। উনি যা করেছেন তা তুলনাহীন।

রতন শুধু বলল—এ ক'দিন যা খাওয়ার কষ্ট গেছে—উঃ...

তার এ ধরণের কথায় সকলেই হো হো করে হেসে ওঠে।*

-শেষ-

---

* গল্পাংশে বিদেশী ছায়া আছে।

চলন্ত ছায়া

এক

—মৃতদেহ উধাও—

কোল্‌কাতা পুলিশ মর্গ। বিকেল পাঁচটা।

টেবিলের ওপর সন্দেহজনকভাবে মৃত একটা লাস পড়ে ছিল। ডিসেকশন্ টেবিল। সাম্‌নেই দাঁড়িয়ে ছুরি চালাচ্ছিলেন ডাঃ বিরূপাক্ষ মিত্র।

তাঁর ভাবভঙ্গিটা মনোযোগের গভীরতায় স্তব্ধ, শান্ত, স্থির...

পেটের ভেতর থেকে কতকগুলো নাড়িভুঁড়ি, লিভার, স্পীন্ ইত্যাদি বের করে একটা ট্রের ওপর রাখলেন তিনি। এগুলো বিশেষভাবে পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

হঠাৎ পাশের ঘরে টেলিফোনটা বেজে উঠল।

ছুটে গেলেন ডাঃ মিত্র।

—হ্যালো, কে?

—আমি আপনার কাছে অপরিচিত। বিশেষ কোনও একটা কারণে ফোন করছি।

—কি ব্যাপার তাই বলুন না!

—ব্যাপারটা বিশেষ কিছু নয়। আপনি যে পাশের ঘরে এসে ফোন ধরবেন এটা আমার কাছে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছিল।

—কেন?

—সেটাই বলছি। দেখুন আমার পরিচয়টা আমি বলবো না। আপাততঃ আমাকে অপরিচিত একজন বলেই ধরে নিন। আমি চাই আপনার ডিসেকশন্ টেবিলের ওপরে শায়িত মৃতদেহটাকে।

—সে কি? কেন?

—আমার জরুরী প্রয়োজন।

—না, তা হতে পারে না।

—তার মানে?

—মৃতদেহটা একজন অপরিচিতকে দেওয়া আইনের পক্ষ থেকে—

—বুঝেছি। কিন্তু একটা বিশেষ মঙ্গলপূর্ণ কাজের জন্যেই আমার ওটাতে প্রয়োজন। তাই আপনার মত না থাকলেও আমাব ওটা নিতে হবেই। আর সে ব্যবস্থাও আমি করেছি।

—তার মানে?

—মানে খুব সোজা। আপনার অজ্ঞাতে ওটি আমাকে নিতে হবে। আর সে ব্যবস্থাও করেছি। আমি জানতাম আপনি ওটি দিতে চাইবেন না। তাই ও ঘর থেকে আপনাকে সরিয়ে আমি ওটি গ্রহণ করলাম।

—সে কি?

—হ্যাঁ, আপনি ঘরে গিয়ে দেখবেন মৃতদেহটি টেবিলের ওপর নেই।

—বাজে কথা। বেশ আমি দেখছি।

রিসিভারটা টেবিলের ওপর রেখে ডাঃ মিত্র ছুটে এলেন ডিসেকশন্ রুমের দিকে।

কিন্তু সেখানে বিরাট এক বিস্ময় অপেক্ষা করছিল তাঁর জন্যে।

টেবিলের ওপর থেকে মৃতদেহটা এবং তার খণ্ডবিখণ্ড সমস্ত অংশগুলি সম্পূর্ণ উধাও হয়েছে।

শুধু কয়েক ফোঁটা রক্ত এখানে-ওখানে ইতস্ততঃ পড়ে থেকে লাস চুরির সাক্ষ্য বহন করেছে যেন।

বিস্ময়ের ধাক্কা সাম্‌লে নেবার পরই একটা অব্যক্ত রাগ এসে বাসা বাঁধে ডাঃ মিত্রের মনে।

কে এই অপরিচিত? আর কি অদ্ভুত তার দুঃসাহস! তাঁকে ফোনের কাছে টেনে নিয়ে গিয়ে সেই ফাঁকে টেবিলের ওপর থেকে মৃতদেহটা উধাও করে নিয়ে গেছে।

কিন্তু কি প্রয়োজন?

চিন্তার পর চিন্তা এসে আচ্ছন্ন করে তাঁকে। টেবিলের ওপরে কলিং বেলটার ওপর কখন যে সজোরে আঘাত করেন সে খেয়ালও থাকে না তাঁর।

টিং টিং টিং...

ছুটে আসে বেয়ারা।

—সেলাম সাব্!

—তুমি কোথায় ছিলে এতক্ষণ?

—বাইরেই হুজুর।

—সে কি? তবে টেবিলের ওপর থেকে মৃতদেহটা নিয়ে গেল কে?

—আপনিই ত ওটা নিয়ে যাবার জন্যে হুকুম দিয়েছিলেন সাব!

—আমি?

—হ্যাঁ, দুজন লোক ঘরে ঢুকে ধরাধরি করে ওটা নিয়ে গেল। আমি মনে করলাম নিশ্চয়ই আপনি হুকুম দিয়েছেন।

রাগে ডাঃ মিত্রের ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত যেন জ্বালা করে উঠল। তাঁর চোখের সাম্‌নে দিয়ে মৃতদেহ উধাও করে নিয়ে যায় এত বড় দুঃসাহস!

বাইরে বেরিয়ে এলেন ডাঃ মিত্র। হাঁকলেন—রামদীন চোবে!

—জী হজৌর!

—দুজন লোক একটা জিনিস ধরাধরি করে নিয়ে গেছে দেখেছ?

—হ্যাঁ স্যার। মোটর গাড়িতে করে একটা জিনিস ধরাধরি করে নিয়ে গেল ওরা। একটু আগেই গেট দিয়ে গাড়িটা চলে গেল।

—তুমি বাধা দিলে না কেন?

—আজ্ঞে হুজুর, ওরা ত বললে আপনিই ওটা নিয়ে যেতে হুকুম দিয়েছেন।

—আশ্চর্য! অল্ ফুল্‌স্! যত সব বোকাদের নিয়ে পড়া গেছে দেখতে পাচ্ছি।

বার দুয়েক অস্থিরভাবে পায়চারী করলেন তিনি। দুশ্চিন্তায় তাঁর মুখের সব রেখাগুলো কঠিন হয়ে উঠল। এভাবে মৃতদেহটা এখান থেকে নিয়ে গিয়ে ওদের লাভ কি?

খানিকটা চিন্তা করে তিনি এগিয়ে গেলেন। টেলিফোনের রিসিভারটা তুলে নিয়ে বলতে সুরু করলেন—হ্যালো, পুট্ মি টু পুলিশ হেড্‌কোয়ার্টার্স...লালাবাজার।

দুই

—ব্লাড্ ব্যাঙ্ক—

মেডিক্যাল কলেজ। রাত ন'টা।

এমার্জেন্সী রুমের পাশের বড় ঘরখানা হচ্ছে 'কার্ডিওলজী' বা হৃদযন্ত্র-সম্বন্ধীয় রোগের জন্য। তারই একটা অংশে ব্লাড্ ব্যাঙ্ক। এখানে যে রক্ত জমা দেওয়া থাকে তা প্রয়োজনের সময় মুমূর্ষু রোগীদের দেহে ইনজেক্শন দেওয়া হয়।

বাইরে একখানি গাড়ি এসে থামল।

বর্ষাকাল। ঝম্ ঝম্ শব্দে চলেছে অবিশ্রান্ত বর্ষণ। শোঁ-শোঁ শব্দে বাদ্‌লা হাওয়া বইছে। মাঝে মাঝে বিদ্যুতের চকিত চমক।

রেন্‌কোট গায়ে চড়িয়ে গাড়ি থেকে নামল দুজন লোক। তারপর মেডিক্যাল কলেজ ব্লাড্ ব্যাঙ্কে প্রবেশ করল।

সেখানে দুজন স্টুডেন্ট ডিউটি দিচ্ছিল। আগন্তুকদের দেখে একজন প্রশ্ন করল—কাকে চান?

—ডাঃ মুখার্জীকে..

—ও, তিনি ত এমার্জেন্সী রুমে।

—দয়া করে যদি একটু ডেকে দেন ত উপকৃত হই!

—কি প্রয়োজন বলুন।

—একটা এমার্জেন্সী রোগীকে সঙ্গে করে এনেছি। তার অবস্থা খুব খারাপ। আপনি বলবেন ডাঃ মজুমদার সঙ্গে এসেছেন...

—ও, আপনিই ডাঃ মজুমদার? নমস্কার।

—নমস্কার।

—আপনি একটু বসুন, এক্ষুণি ডেকে দিচ্ছি ডাঃ মুখার্জীকে।

একজন স্টুডেন্ট ঘর থেকে বেরিয়ে যায় এমার্জেন্সী রুমের দিকে। বের হবার আগে রেন্‌কোটটা গায়ে চড়িয়ে নেয়।

সে বের হয়ে যাবার পরও আগন্তুক দুজন দাঁড়িয়ে ছিল। তা দেখে অন্য স্টুডেন্টটি বলল—আপনারা বসুন না।

—হ্যাঁ বসছি।

আগন্তুকের মুখে রহস্যময় হাসি ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল।

তৎক্ষণাৎ তার সঙ্গী একটা কি রাসায়নিক তরল পদার্থ স্টুডেন্টের দিকে ছিটিয়ে দিল।

অদ্ভুত একটা গন্ধ। মিষ্টি বটে—কিন্তু ফুল বা আতরের গন্ধের মতো নয়। কেমন একটা আমেজ যেন এই গন্ধের সঙ্গে জড়িত।

ঘুম...

নেমে আসে আবেশময় নিদ্রা; ক্লান্ত অবসাদ।

ধীরে ধীরে স্টুডেন্টটি ঢলে পড়ে গাঢ় নিদ্রার কোলে।

আগন্তুক দুজনের মুখে ফুটে ওঠে বিচিত্র হাসি।

বিজয়ীর আনন্দ সেই হাসির সঙ্গে মেশানো। সফলতার ইঙ্গিত ফুটে ওঠে তাতে। দ্রুতপদে তারা ব্লাড্ ব্যাঙ্কের দিকে এগিয়ে যায়।

পনর মিনিট পর।

অন্য স্টুডেণ্টটি ফিরে আসে। সঙ্গে তার ডাঃ মুখার্জীও এসেছেন।

কিন্তু কোথায় সেই আগন্তুকদ্বয়? ঘরের মধ্য থেকে তারা হঠাৎ গেল কোথায়? আর এভাবে অদৃশ্য হবার অর্থই বা কি তা কেউ বুঝে উঠতে পারে না।

ওপাশের স্টুডেণ্টটি ঘুমোচ্ছে কেন?

—মলয়, ও মলয়! অন্য স্টুডেণ্টটি তার ঘুম ভাঙাবার জন্যে চেষ্টা করে।

কিন্তু সেই গাঢ় ঘুম ভাঙানো তার সাধ্যের বাইরে।

তারপরেই দুজনের চোখ পড়ে ব্লাড্ ব্যাঙ্কের দিকে। দ্রুত তারা ব্লাড্ ব্যাঙ্কের দিকে এগিয়ে যায়। কি অদ্ভুত রোমাঞ্চকর ঘটনা সেখানে অপেক্ষা করছিল তাদের জন্যে।

ব্লাড্ ব্যাঙ্ক থেকে চারশো সি. সি. রক্ত উধাও।

জীবনে যে তারা এরূপ অদ্ভুত ঘটনার সম্মুখীন হতে পারে সে ধারণাই তাঁদের ছিল না।

ডাঃ মুখার্জী ছুটে যান টেলিফোনের কাছে। রিসিভারটা তুলে নিয়ে স্থানীয় থানার নম্বরটা বলেন...

—হ্যালো, কে?

—আমি ডাঃ মুখার্জী বলছি। মেডিক্যাল কলেজ থেকে।

—কি ব্যাপার ডাঃ মুখার্জী? আমি পুলিশ ইন্স্পেক্টর তরফদার কথা বলছি।

—আশ্চর্য ঘটনা মিঃ তরফদার। আপনি এক্ষুণি চলে আসুন। আমাদের ব্লাড্ ব্যাঙ্ক থেকে চারশো সি. সি. রক্ত কে যেন চুরি করে নিয়ে গেছে।

—রক্ত চুরি?

—হ্যাঁ।

—হাউ স্ট্রেঞ্জ! কি আশ্চর্য ব্যাপার ডাঃ মুখার্জী।

—হ্যাঁ, মেডিক্যাল কলেজের ইতিহাসে কখনও এমন ঘটনা ঘটেছে বলে জানা নেই আমার।

—সত্যিই অদ্ভুত ঘটনা। আমি এক্ষুণি আসছি ডাঃ মুখার্জী।

মিঃ তরফদার এসে সব কিছু তন্ন তন্ন করে খোঁজ করলেন। নতুন কোনও সূত্র পাওয়া গেল না। শুধু পাওয়া গেল ব্লাড্ ব্যাঙ্কের পাশেই একখানা চিঠি।

তাতে লেখা ঃ

জরুরী প্রয়োজনে চারশো সি. সি. রক্ত নিয়ে যেতে বাধ্য হলাম ডাঃ মুখার্জী। সমাজের মঙ্গলের কাজেই এটা ব্যবহৃত হবে বলে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। কোনও খারাপ উদ্দেশ্য আমাদের নেই। নমস্কার জানবেন।

ইতি—

চলন্ত ছায়া।

চিঠিখানার দিকে তাকিয়ে ডাঃ মুখার্জী, মিঃ তরফদার ও মেডিক্যাল ছাত্রটির মুখে ফুটে উঠল বিস্ময়ের চিহ্ন।

তিন

—চলন্ত ছায়ার নতুন কীর্তি—

বালিগঞ্জ লেক...

পরদিন রাত আটটা।

দুটি তরুণ-তরুণীকে দেখা গেল লেকের কিনারায় বসে থাকতে। তরুণের বয়স পঁচিশের কাছাকাছি বলে মনে হয়। তরুণী তার চেয়ে দ-এক বছরের ছোট হবে।

লেকের এই অংশটা স্বভাবতই নির্জন।

তার ওপর কৃষ্ণপক্ষ। চাঁদ ওঠেনি এখনও। চারদিকে তাই কেমন একটা অন্ধকারাচ্ছন্ন ভাব।

মেয়েটির বেশভূষা দেখে সহজেই বোঝা যায় সে ধনি কন্যা। চেহারার আভিজাত্যই শুধ নয়, বেশভূষার পরিপাট্য ও বহুমূল্য শাড়ি-গহনা ইত্যাদিও এই ধারণাকে দৃঢ় করে।

ছেলেটির বেশভূষা সাধারণ—তবে রুচিসঙ্গত।

আপন মনেই দুজনে যেভাবে কথাবার্তা নিয়ে ব্যস্ত ছিল, তাতে বোঝা যায় না, বাইরের পৃথিবী সম্বন্ধে তাদের এতটুকুও হুঁস আছে কিনা।

মেয়েটি বলছিল—আপনার কথাটা আমি বেশ ভালভাবেই বুঝতে পারছি অনুপদা, কিন্তু পরিপূর্ণভাবে সমর্থন করতে পারছি না।

অনুপ প্রশ্ন করে—কেন?

—বাবার অগাধ অর্থ যখন আছে, তখন অর্থের প্রতি আর মোহ থাকা তাঁর কোন মতেই উচিত নয়—একথা মানেন ত?

—তা অবশ্য স্বীকার না করে উপায় নেই।

—আমিই তাঁর একমাত্র সন্তান। এক্ষেত্রে তাঁর কি উচিত নয় যে আমার জীবনকে সবদিক থেকে সার্থক করে তোলা?

—আমি তা অস্বীকার করি না।

—তবে? আমি যাকে চাই—মানে পরিপূর্ণভাবে চাই আমার জীবনের সাথী হিসেবে, তাঁরও তাই মেনে নেওয়া উচিত। নয় কি? অন্তত তা নিলে আমি সুখী হবো। কিন্তু তা না করে যদি আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে একজন ধনবানের সঙ্গে জোর করে আমার বিয়ে দেন, সেটা কি আমার প্রতি অবিচার নয়? অর্থের প্রয়োজন ত নেই ওঁর। যা আছে তাই ভোগ করবার লোক নেই। সেক্ষেত্রে অর্থের চেয়েও মেয়ের সুখটাই কি বড় হলো না?

—সেদিক থেকে বিচার করলে তুমি সত্য কথাই বলেছ বীণা!

—কিন্তু তবু কেন আপনি বাবার কথা মেনে চলতে উপদেশ দিচ্ছেন আমাকে?

—হাজার হলেও তিনি তোমার গুরুজন। তাই তাঁকে অমান্য করবার উপদেশ তোমায় দিতে পারি না আমি।

—কিন্তু গুরুজনের অন্যায় অবিচার যদি আমার বিবেকের অনুশাসনের বিরুদ্ধে যায়, তবুও?

—তা ছাড়া আরও একটা কথা।

—কি কথা বলুন।

—তোমার বাবা কোনও অর্থবান্ লোকের হাতে যে তোমাকে দিতে চাচ্ছেন, তা তোমাকে সুখী করবার জন্যেই...

—কিন্তু তাঁর যা আছে তা যে কোনও দম্পতিকে সুখী করবার পক্ষে যথেষ্ট। আর অর্থের প্রতি মোহ থাকা তাঁর উচিত নয়।

—হয়তো ওঁর মত এই যে, তুমি এতে সুখী হবে না।

—তাহলে মেয়েকে উচ্চশিক্ষিত করে, সবদিক দিয়ে তার বিচারবুদ্ধিকে প্রশ্রয় না দিয়ে ছেলেবেলায় একরাশ টাকার সঙ্গেই তার বিয়ে দিলে ভাল হতো না কি? তা যখন হয়নি, আর আমি যখন স্বেচ্ছায় আপনার মতো মধ্যবিত্ত ঘরের একজনকেই নিজের জীবনের সঙ্গীরূপে বেছে নিতে চাই, তাঁর কি উচিত তাতে বাধা দেওয়া?

—আপাততঃ এর উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয় বীণা।

—ঠিক মনোযোগ দিয়ে চিন্তা করলে কেউই আমার চিন্তাধারার মধ্যে কোনও ত্রুটি দেখাতে পারবে না অনুপদা।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল অনুপ।

ভাবছিল সে বিভোর হয়ে। বিচিত্র পৃথিবী। বিচিত্র এর যতো মানুষ আর তাদের জীবনের সুখদুঃখের খেলা। হাসি-কান্না। অথচ কতো নশ্বর সবকিছু। তবু তারা চায় সুখী হতে।

মনে-প্রাণে সে যা চায়, বীণাও ঠিক তাই কামনা করে।

চিন্তা তাদের দুজনের অভিন্ন! তাই দুজনে এত কাছে। সুদূর পৃথিবীর সবকিছু থেকে দূরে তারা। সবকিছু থেকে পৃথক।

—বড্ড অসময়ে আপনারা এখানে এসে বসেছেন। দিস্ ইজ অফুলি ব্যাড্!

পাশ থেকে কে যেন কথা বলল। চিন্তাসূত্র কেটে গেল অনুপের।

তাকাল বীণাও।

একজন দীর্ঘদেহী প্রৌঢ় ভদ্রলোক তাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। চারপাশে আর কোনও লোকজনের চিহ্নমাত্রও নেই।

রাত বোধ হয় নটা বাজল। রাতের স্তব্ধ প্রহর কাঁপছে নিঃসীম নীরবতায়। ঝিরি ঝিরি হাওয়া বইছে শুধু। নারকেলকুঞ্জের ক্ষীণ আর্তনাদ। জলের মৃদু কম্পন।

—এতটা যে রাত হয়েছে, সেদিকে আমাদের একেবারেই খেয়াল ছিল না। অনুপ বলল—চলো ওঠা যাক্ বীণা।

—দ্যাটস্ রাইট! ভদ্রলোক বিচিত্র ভঙ্গিতে হেসে উঠে বললেন।

অদ্ভুত লোক!

অনুপ তার আপাদমস্তক চেয়ে দেখল। উস্কোখুস্কো চুল। ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি। লম্বা গোঁফ। পরণের সুটটা কালো। চোখদুটো একটু বেশী পরিমাণে চক্‌চকে। তবে এই প্রকার গায়ে-পড়ে আলাপ করবার ধরণটা অনুপের একেবারেই ভাল লাগল না।

—আমাদের সাবধান করে দেবার কোনও প্রয়োজন ছিল না। আমরা নিজেরাই ঠিক সময়মত উঠে যেতাম। একটু কঠোর স্বরে অনুপ বলে।

—দ্যাটস্ রাইট! নিশ্চয়ই। মৃদু হেসে লোকটি বলে চলেন—উঠতেন নিশ্চয়ই! কিন্তু যেরকম খারাপ দিনকাল পড়েছে, একটু সাবধান করে দেওয়া উচিত সকলকেই। কি বলেন?

—ধন্যবাদ।

অনুপ কথা শেষ করে বীণার দিকে চেয়ে বলে—চলো বীণা, আমরা গাড়িতে গিয়ে উঠি।

দুজনেই একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকা মোটর গাড়িটার দিকে এগিয়ে যায়।

গাড়ির দরজা খুলে দুজনে উঠতে যাবে এমন সময় অনুপ লক্ষ্য করে ভদ্রলোকটি তাদের সঙ্গে গাড়ি পর্যন্ত এসেছেন। তাঁর উদ্দেশ্য যে ঠিক কি তা অনুপ একেবারেই বুঝতে পারে না।

—আপনি যে এখানে এভাবে—

কথাটা শেষ হয় না অনুপের।

একঝলক বিচিত্র গন্ধ...

মিষ্টি। ঠাণ্ডা। আবেশময়।

দুজনেই জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ে গাড়িটার সামনে।

বৃদ্ধের মুখে ফুটে ওঠে অদ্ভুত রহস্যময় এক হাসি।

বহুক্ষণ পরে অনুপের জ্ঞান ফিরে আসে।

ঠাণ্ডা হাওয়ায় গায়ে যেন কাঁপন ধরিয়ে দেয়।

এক যুগ পরে যেন ঘুম ভাঙছে তার। ভাল করে চারদিকে তাকায়। পুরোনো ঘটনাগুলো মনে আনতে চেষ্টা করে।

একে একে সব কিছু মনে পড়ে তার। ধড়মড় করে উঠে বসে অনুপ। চারদিকে ভাল করে তাকায় বীণার খোঁজে।

কিন্তু কোথায় বীণা?

চারদিকে তন্ন তন্ন করে খুঁজতে থাকে অনুপ। কিন্তু বীণার কোনও সন্ধানই পাওয়া যায় না।

একটু দূরে শুধু দেখা যায় নরম মাটির ওপরে একটি মোটরের চাকার দাগ।

এঁকেবেঁকে চাকার দাগ দূরে চলে গেছে। এ কি তবে সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোকের কীর্তি? কিন্তু তার সঙ্গে মোটর ছিল এমন প্রমাণ ত পাওয়া যায়নি। আর তিনি এমন কাজই বা করতে যাবেন কেন?

কিন্তু কে তবে সেই বৃদ্ধ?

একটু ভেবে অনুপ যেই দু'পা এগিয়েছে এমন সময় মাটির ওপরে একটি ভাঁজ করা সাদা কাগজ তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অনুপ কাগজটা তুলে নিয়ে মেলে ধরে চোখের সামনে।

ছোট ছোট হরফে তাতে লেখা :

বিশেষ প্রয়োজনে মেয়েটিকে নিয়ে গেলাম, ভয় নেই, ওর কোনও ক্ষতি করব না। যথাসময়েই ওকে ফিরে পাবে।

ওর বাবা হয়ত সন্দেহ করবেন যে তুমিই বোধহয় মেয়েটিকে কোথাও লুকিয়ে রেখেছ। তাই চিঠিটা রেখে গেলাম। পুলিশকে এটি দেখিয়ে সব কথা খুলে বলো।

ইতি—

চলন্ত ছায়া

এক নিশ্বাসে চিঠিটা পড়ে শেষ করে অনুপের মাথার মধ্যে সব কিছু কেমন যেন গুলিয়ে যায়।

কে এই চলন্ত ছায়া?

ওই বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি না কি? কিন্তু তাই বা কি করে সম্ভব?

যা হোক পুলিশে এক্ষুণি জানাতে হবে। অনুপম মোটর গাড়িতে উঠে স্টার্ট দেয় একঝলক ধোঁয়া ছেড়ে গাড়িটা এগিয়ে চলে স্থানীয় থানার দিকে।

চার
—আবার চিঠি—

ঘুম থেকে উঠে এক কাপ কফি খাওয়া প্রাইভেট ডিটেকটিভ দীপক চ্যাটার্জীর বহুদিনের অভ্যাস।

দীপকের সহকারী ও বন্ধু রতনলাল তাকে এর আগে বহুবার বলেছে—দেখ, খালি পেটে কফি পান শরীরের পক্ষে হানিকর। কিন্তু সে কথায় কান দেয়নি দীপক। সকালের কফিটা না খেলে শরীরটা যেন আদৌ চাঙা হয় না। কাজেও মন বসে না এতটুকু।

টেবিলের ওপরে সেদিনের ডাকেই আসা গোটা চারেক চিঠি। সেগুলো একে একে খুলে পড়তে থাকে দীপক।

পুরোনো দুজন মক্কেলের প্রীতি-সম্ভাষণ। এক দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়ের চিঠি। সেটা পড়ে অন্য চিঠিটা হাতে নেয় দীপক।

খামের চিঠি। খামটা ছিঁড়ে ফেলতেই দেখা যায় ছোট্ট এক টুকরো কাগজ। কাগজটা ছোট হলেও বেশ ভারী। দামী প্যাড বলেই মনে হয়।

চিঠিতে মনঃসংযোগ করে দীপক।

প্রিয় দীপক চ্যাটার্জী,

আপনি আমাকে চেনেন না বটে, তবে আমি আপনাকে বেশ ভাল করেই চিনি। অবশ্য মৌখিক আলাপ নেই, তবে আপনার নাম শুনেছি বহুবার।

শুনেছি আপনি ভারতখ্যাত গোয়েন্দা। কোনও জটিল কেসের মীমাংসা করতে আপনার দেরী লাগে না।

আপনি অবশ্য আমার নাম পত্রপ্রাপ্তি পর্যন্ত না শুনলেও দু-এক দিনের মধ্যেই বেশ ভাল করে শুনবেন। এমন কি আমাকে হাতে পাবার জন্যে হয়ত আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে আপনাকে। কেননা আপনি ছাড়া পুলিশ বিভাগে আমাকে খুঁজে বের করবার মতো ধীশক্তিসম্পন্ন লোক আর কেউ নেই।

এবার আপনাকে একটা অনুরোধ মিঃ চ্যাটার্জী। আমি পর পর যে সব কাজ করেছি বা করব তা আমার জন্যে নয়—সমাজের মঙ্গলের জন্যেই, সেটা হয়তো আইনের দিক থেকে অবৈধ, কিন্তু এ উপায় অবলম্বন না করে অন্য কোন পথ ছিল না আমার। যার কাছে আমি আমার মনের কথা খুলে বলেছি সেই আমাকে করেছে অবহেলা, ঘৃণা, হতাদর। তাই বাধ্য হলাম নিজের পথ নিজে বেছে নিতে।

তবে এ কাজে সফল হলে হয়তো একদিন জগৎ জুড়ে হবে আমার সম্মান। কাগজে কাগজে ছবি ছাপা হবে। গভর্ণমেণ্ট সব কেসগুলো উইথড্র করে আমাকে মোটা পুরস্কার দেবার জন্যে লালায়িত হয়ে উঠবে।

সে যাক। আমার কথা হচ্ছে দয়া করে আমার কেস্ নিয়ে বেশি মাথা ঘামাবেন

না। আপনি বুদ্ধিমান হতে পারেন কিন্তু শক্তিমান নন। আমি বুদ্ধিমান অথচ শক্তিমান।

তাই আমার চলার পথে যদি আপনি বাধা হয়ে ওঠেন তবে আমার শক্তির সাহায্যে আপনাকে পথ থেকে সরিয়ে দিতে বাধ্য হবো।

ভারত একজন বুদ্ধিমান ডিটেকটিভকে হারাবে।

এর বেশি লেখার কোনও প্রয়োজন নেই। আপনার মতো বুদ্ধিমান লোক এটুকু থেকেই সব কিছু বুঝতে পারবেন, আশা করি।

সশ্রদ্ধ প্রীতি জানবেন।

ইতি—

চলন্ত ছায়া।

চিঠি থেকে মুখ তুলে দীপক দেখে সামনেই দাঁড়িয়ে আছে রতনলাল।

—অত মনোযোগ দিয়ে কি পড়ছিস্‌রে? রতনের স্বরে আগ্রহ।

—এই চিঠিটা।

দীপক চিঠিটা এগিয়ে দেয় রতনের হাতে!

রতন মনোযোগ দিয়ে বারদুয়েক চিঠিটার আগাগোড়া পড়ে বলে—আগাগোড়া কেমন যেন হেঁয়ালীর মতো লাগছে। কিন্তু সবকিছু মিলিয়ে যা বুঝছি তা হচ্ছে তোর পক্ষে চিঠিটা শুভ নয়।

—কেন? দীপকের প্রশ্ন।

—চিঠি পেয়ে এই 'চলন্ত ছায়া'কে আবিষ্কার করবার আগ্রহ তোর যে আরও অনেকগুণ বেড়ে যাবে সে সম্বন্ধে আমি স্থিরনিশ্চয়। ভদ্রলোকের চিঠিতে সুফল ত হবেই না বরং কুফল হবে অনেক বেশি।

দীপক কোনও উত্তর দেয় না।

রতন অস্ফুট স্বরে শুধু বলে—কে এই চলন্ত ছায়া?

পাঁচ

—তদন্ত পথে—

কে এই চলন্ত ছায়া?

সংবাদপত্রে বের হয়েছিল ঃ

দু'দিনের মধ্যে যে সমস্ত পুলিশবাহিনী আর জনসাধারণের উপস্থিতি অগ্রাহ্য করে সারা কলকাতা সহরের বুকে আইন অমান্য করে সদম্ভ পদক্ষেপে ঘুরে বেড়াচ্ছে?

আমরা জানি পুলিশবাহিনীর ক্ষমতা পরিমিত। কিন্তু পুলিশের ডি. ডি. বা সি. আই. ডি. বিভাগ যদি অপরাধীকে অনুসরণ করে তাকে ঠিক সময়ে গ্রেপ্তার করতে না পারে তবে জনসাধারণের প্রাণ ও সম্পত্তির কোনও মূল্যই থাকে না। সারা সহরে অরাজকতা আর দস্যুদের রাজত্ব সুরু হয়।

হয়ত দু-একটি কাজ করার পর আততায়ীকে ধরা সব সময় সম্ভব হয় না। কিন্তু যে চলন্ত ছায়া তিন দিনের মধ্যে তিন জায়গায় হানা দিয়ে সাফল্যের সঙ্গে বে-আইনীভাবে নিজ উদ্দেশ্য সাধন করেছে, সে ভবিষ্যতে যে আরও কি করবে তা জানি না। মহানগরীর ইতিহাসে এর আগে কখনও এরকম ঘটনা পর পর ঘটেছে বলে জানা নেই আমাদের।

অন্য দুটি ক্ষেত্রে অবশ্য জনসাধারণের কোনও ক্ষতি হয়নি। কিন্তু সন্ধ্যার পর বালিগঞ্জের লেকের সামনে থেকে যেভাবে একটি তরুণী রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়েছে সে সম্বন্ধে পুলিশবিভাগ তরুণীটির পিতামাতাকে কি সান্ত্বনা দেবেন? আর আমাদের রিপোর্টারের মাধ্যমে অবগত হলাম যে এই তরুণী হচ্ছে ধনী পিতামাতার একমাত্র সন্তান। তাঁদের এই দুঃখে সান্ত্বনা দেবার ভাষা জানা নেই আমাদের।

খবরের কাগজ থেকে মুখ তুলল ডিটেকটিভ দীপক চ্যাটার্জী। রতনের দিকে চেয়ে বলল—এতক্ষণে তাহলে কালকের চিঠির একটা মোটামুটি কারণ বোঝা গেল।

রতন বলল—যাই বল্ মস্ত বড়ো একজন কীর্তিমান লোক কিন্তু এই চলন্ত ছায়া। দু'দিনের মধ্যে তিন তিন জায়গায় হানা!

দীপক হাসল। কোনও উত্তর দিল না।

রতন প্রশ্ন করে—হাসলি যে?

দীপক উত্তর দেয়—মস্ত বড়ো একজন শিক্ষিত ও বৈজ্ঞানিক হয়েও যে কেন এই লোকটা অপরাধীদের গতানুগতিক মনোবৃত্তি থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে পারল না তাই ভাবছি।

—তার মানে?

—এই দেখ না, এরও সেই নিজের নামটা জাহির করে বাহাদুরী দেখাবার প্রবৃত্তিটা কেমন প্রবল!

—কিন্তু কেন এমন হয়?

—তাই ত ভাবছি। ও জানে যে ওর চিঠি পেলে আমার মনে কৌতূহল জাগবে। আমি ওঁকে খুঁজে বের করবার চেষ্টা করব। তবুও আমার মনে এই প্রবৃত্তিটা জাগিয়ে তোলার ইচ্ছা ওর আছে। তা ছাড়া প্রত্যেক জায়গায় একটা করে চিঠি রেখে যাওয়া, এও যে সনাতন ক্রিমিন্যালদের মতো নিজেকে জাহির করবার প্রবৃত্তি।

—তা ত বুঝলাম! কিন্তু এখন কি করবি ঠিক করলি?

—পুলিশের কাছ থেকে আহ্বান না পেলে আমি এ ব্যাপারে মাথা ঘামাতে একেবারেই রাজী নই—তা চলন্ত ছায়া যতই চিঠি লিখে আমাকে উত্তেজিত করুক না কেন।

—চলন্ত ছায়া তোকে উত্তেজিত করেছে এ কথা ভাবছিস কেন?

—ভাবার মতো কারণ কি নেই! এই চিঠির মধ্যেই প্রকাশ পাচ্ছে যে চলন্ত ছায়া মনেপ্রাণে চায় যে আমি তার পেছনে হানা দেই। আমার মতো একজন বিখ্যাত, মেধাবী গোয়েন্দা ওর বিষয় নিয়ে মাথা ঘামাবে এটা ও চায়। আর আমাকে ব্যর্থ করেই ও চায় তৃপ্তি। ঠিক সেইজন্যেই চিঠি লিখে আমাকে ভয় দেখানো যে আমার পেছনে এলে মৃত্যু অবধারিত। তার মানেই হচ্ছে, দীপক চ্যাটার্জী, তুমি মৃত্যুকে তুচ্ছ করে আমার পেছনে এস দেখি!

কথা শেষ হলো না।

জানালার ধারে খস্ খস্ শব্দ।

খট্। একটা সুতীক্ষ্ণ ছোরা জানালা দিয়ে ছুটে এসে টেবিলের ওপর বিদ্ধ হলো।

—কে? দীপক ছুটে যায় জানালার দিকে।

বাগান পেরিয়ে একটা মূর্তি গিয়ে বাইরে অপেক্ষমান একটা মোটরে উঠল। মোটরটা এগিয়ে চলল এক ঝলক ধোঁয়া ছেড়ে।

দীপক হেসে বলল—দেখছিস ত, আমার পেছনে কেমন সুতীব্র দৃষ্টি! যাক্, দেখি ছোরাটা কি বহন করে নিয়ে এলো।

ছোরার আগায় একটা কাগজ বেঁধা। চারভাঁজ করা। সেটা খুলে দীপক দেখল তাতে লেখা ঃ

যতই চেষ্টা করো না কেন, দূরে থাকতে তুমি পারবে না। আমার পেছনে আসবার জন্যে তুমি যে আহ্বান পাবেই, তা আমি বুঝতে পারছি। নিয়তি তোমাকে আমার পেছনে টেনে আনতে বাধ্য করবে। কিন্তু সাবধান! শেষবারের মতো তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি।

ইতি—

চলন্ত ছায়া।

দীপক বলল—আমি যে ওর পেছনে অনুসরণ করবার জন্যে আহ্বান পাব তা ও আন্দাজ করে নিয়েছে। কিন্তু সেটা কি সত্যি?

ক্রিং ক্রিং ক্রিং...

টেলিফোন বেজে উঠল।

—কে? দীপক ফোন তুলল।

—ডেপুটি কমিশনার, ডি. ডি. নর্থ...

—ওঃ, মিঃ মরিসন? তারপর খবর কি স্যার?

—খবরের কাগজ দেখেছেন ত মিঃ চ্যাটার্জী?

—হ্যাঁ, চলন্ত ছায়ার খবরটা মনোযোগের সঙ্গেই লক্ষ্য করেছি।

—এখন উপায়? পুলিশের সুনাম ত কলঙ্কিত হতে দেরী নেই। খবরের কাগজওয়ালাদের জ্বালায়...

—যাক্, এখন কি ভাবে স্টেপ্ নেবেন বলে স্থির করেছেন?

—তাই ত ভাবছিলাম। এমন সময় মনে পড়ল আপনার কথা। আপনি এ কেসের ভার নিন মিঃ চ্যাটার্জী। আমি সর্বতোভাবে আপনাকে সাহায্য করব।

—কিন্তু একটা কথা মিঃ মরিসন।

—কি কথা বলুন।

—ব্যাপারটা একটু গোপন রাখতে হবে। আমি যে কেস্ হাতে নিয়েছি তা কাউকে জানাবেন না।

—বেশ।

—আজ বিকেলে লালবাজারে গিয়ে কেসের ফাইলগুলো সব নিয়ে আসব। কেমন?

—ধন্যবাদ।

টেলিফোন ছেড়ে দিয়ে রতনের দিকে চেয়ে দীপক বলল—না, কিছুতেই দেখছি এড়াতে পারা গেল না।

—কি ব্যাপার?

—মিঃ মরিসনের আদেশ। অগত্যা চলন্ত ছায়ার কেস্টা হাতে নিতে হবে।

আবার টেলিফোনটা বেজে উঠল সশব্দে..

—হ্যালো, কে?

—আমি চলন্ত ছায়া কথা বলছি।

—আপনি?

—হ্যাঁ, আমার পরিচয় তো আগেই পেয়েছেন। যাক্, কেস্‌টা শেষ পর্যন্ত হাতে এসে পৌঁছুলো ত? যতই গোপন রাখুন, আমার নজর থেকে কিছুতেই তা বাইরে যাবে না...

—কিন্তু, কিভাবে আপনি জানতে পারলেন যে আমি কেস্‌টা টেক্ আপ্ করেছি?

—অত্যন্ত সহজে দীপকবাবু। ক্রশ-কানেক্‌শনে আপনাদের প্রত্যেকটি কথা আমার কানে এসে পড়েছে। যাক্, কি স্থির করলেন? আমার কথাটা রাখবেন না?

—না না, কিছুতেই না। আইনের বিরুদ্ধতা যারা করে তাদের বিরুদ্ধে আমার অভিযান চলতে থাকবে চিরদিন। তার জন্যে মৃত্যুবরণ করতেও আমার এতটুকু দুঃখ নেই।

উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করে দীপক সশব্দে রিসিভারটা নামিয়ে রাখে।

ছয়
—অভিনেত্রী নিরুপমা—

প্রথম যৌবনে নারীর সম্মান সর্বত্র। বিশেষ করে সে নারী যদি হয় রূপবতী। কিন্তু বিধাতার অভিশাপে যৌবন ক্ষণস্থায়ী। তার ওপর নারীর যৌবনের ও লাবণ্যের স্থায়িত্ব পুরুষের চেয়েও অনেক কম।

তাই যৌবন ও রূপকে সম্বল করে যে নারীরা একদিন পায় মান, মর্যাদা, অর্থ ও সুনাম, যৌবনের তিরোভাবের সঙ্গে সঙ্গে তারা ধীরে ধীরে পেতে থাকে অপমান, দারিদ্র্য, হতাদর,—এমনি আরও কতো কি!

কথাটা বিশেষভাবেই প্রযোজ্য হয়েছিল অভিনেত্রী নিরুপমা দেবীর জীবনে।

দরিদ্রের সন্তান নিরুপমা। অল্পবয়সেই পিতৃমাতৃহীনা। তারপর বৃদ্ধ এক স্বামীর সঙ্গে মামা তার বিয়ে দিল। বিয়ের তিন মাস পরেই স্বামীর মৃত্যু। নিরুপমা দেবীর স্থান স্বামীর গৃহে রইল না আর। পিতৃগৃহের পথও বন্ধ।

ওর এক বান্ধবী সিনেমায় অভিনয় করত। তার সঙ্গে একদিন দেখা করে সব কথা খুলে বলল নিরুপমা। দারিদ্র্যের গ্লানি—ভাগ্যের পরিহাস—জীবনের জুয়াখেলা।

ওর বান্ধবী বলল—তোর এত রূপ, ফুটন্ত যৌবন,—ভাবনা কি!

—সে কি রে? নিরুপমার প্রশ্ন।

—হ্যাঁ, তুই ফিল্মে নামবি। অগাধ টাকা—অফুরন্ত সুখ—অনিন্দ্য শান্তি,—যা ইচ্ছা তাই পাবি।

তৃষ্ণার্ত পথিকের কাছে বারিবিন্দুর প্রলোভন।

ফিল্মে নামল নিরুপমা। প্রথম বইতেই নায়িকার ভূমিকায়।

অভিনয় সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান তার ছিল না। তাই প্রথম বইতে তার অভিনয় একেবারে নিষ্প্রভ হয়েছিল বলেই মনে পড়ে।

কিন্তু দর্শকেরা অভিনয় চায় না, চায় নবোদ্ভিন্না তরুণীর রূপ ও যৌবন দর্শন করে হৃদয়কে তৃপ্ত করতে।

তাই সেদিনের কথাটা নিরুপমা দেবীর আজও মনে পড়ে। তার প্রথম ছবি যেদিন

হলে 'রিলিজ' করল, সেদিন সে একটি বক্সে বসে দেখছিল নিজের অভিনয়।

যে দৃশ্যেই তার আগমন হচ্ছে, অমনি শোনা যাচ্ছে মৃদু গুঞ্জন, কলরব, হাততালি,—আরো কতো কি!

আনন্দিত হয়েছিল নিরুপমা।

অভিনয়ের দীপ্তি দেখে নয়, দর্শকমনে তার রূপ ও যৌবন যে রেখাপাত করতে সক্ষম হয়েছে এই সফলতার আনন্দই আচ্ছন্ন করেছিল তার মনকে।

তারপর বছরের পর বছর তার জীবনের ওপর দিয়ে কেটে গেছে যেন ছায়াছবির দ্রুতগতি নিয়ে। সর্বত্র তার আদর—তার অভ্যর্থনা—অভিনন্দন! টাকা নিয়ে প্রযোজকদের সাধাসাধি। সে সব দিনের স্বপ্ন আজও মনে কি গভীর রেখায়ই না আঁকা আছে!

এমনি কেটেছে ঠিক বারোটি বছর।

তারপর?

তারপর একদিন সে দেখতে পায় ধীরে ধীরে তার কন্ট্রাক্টের সংখ্যা নামতে নামতে এমন অবস্থায় এসে পৌঁছেচে যে মাত্র একজন প্রযোজক ছাড়া আর কেউই তাকে সুযোগ দিচ্ছে না। আর সেও একটা মায়ের না কাকীমার ভূমিকা!

ওদিকে নায়িকার ভূমিকাগুলো সব দখল করেছে অন্য কয়েকজন নবাগতা সুন্দরী রূপসী।

নিরুপমা সেদিন আবার আয়নায় নিজের চেহারার দিকে স্পষ্ট করে চোখ মেলে চাইবার অবকাশ পেল। চোখের কোণে, গালের খাঁজে, কপালের রেখায় প্রকৃতির অব্যাহত অভিযানের সুস্পষ্ট ছাপ। অনুপম লাবণ্য সে হারিয়েছে,—হারিয়েছে দীপ্তিময়ী যৌবনবতীর সুঠাম নিটলত্ব। তার স্থান আজ কোথায়? কে আর তাকে সুযোগ দেবে?

রাতে ভাল ঘুম হয় না নিরুপমার। দিন কাটে চিন্তায়। কিন্তু এমনি করে ক'দিনই বা চলবে? এমন কিছু অভিনয়-প্রতিভা তার নেই যে উঁচু ধরণের ভূমিকায় সে সুযোগ পাবে। তার বাকী জীবনটুকু ওই বন্ধুর উচ্ছৃঙ্খলতা নিয়ে কাটাতে হবে। সামঞ্জস্যহীন, লক্ষ্যহীন একটানা দ্রাঘিমা! মুখর আনন্দ-কোলাহল তার জীবন থেকে নির্বাসিত।

ব্যাঙ্কে যে পরিমাণ অর্থ সঞ্চিত আছে তার আয়ুই বা আর কতদিন! বড়ো জোর বছর আট-দশ। তারপর? তারপর তাকে অর্থের তাগিদে ঘুরে বেড়াতে হবে পথে-বিপথে। দেখা দেবে শুধু নিঃসীম ব্যর্থতা। এ ছাড়া অন্য কোনও আশার আলোই আর দেখতে পায় না সে।

এমনি চিন্তায় দিন কাটছিল নিরুপমার।

কিন্তু হঠাৎ যেন একদিন মুখ তুলে চাইলেন ভগবান।

সে যাকে খুঁজছিল মনেপ্রাণে পেলো ঠিক তারই সন্ধান।

দিবারাত্র এই কথাই সে ভাবছিল যে, আধুনিক বিজ্ঞানে কি এমন কোনও বিধানই নেই যার সাহায্যে মানুষের যৌবনকে করা যায় দীর্ঘস্থায়ী? সৌন্দর্যকে করা যায় মানুষের ইচ্ছার অধীন? 'অনন্তযৌবনা উর্বশী' কি শুধু কাব্যেই সম্ভব? আসলে কি তা সম্পূর্ণ অবাস্তব? অসম্ভব?

ঠিক এই চিন্তার মুখেই একদিন খবরের কাগজের একটা ছোট বিজ্ঞাপনের ওপর চোখ পড়ল নিরুপমার।

'স্বেচ্ছায় যদি কোনও পুরুষ ও নারী নিজের যৌবনকে দীর্ঘস্থায়ী করতে চান আমার সাহায্য নিতে পারেন। সম্পূর্ণ বিনা খরচে অপারেশন করা হবে। সাফল্য প্রমাণে চার্জ নেওয়া

হয়। বেশি বয়স্ক পুরুষ বা নারীর অটুট যৌবন ফিরিয়ে দেওয়া হয়। লিখুন ঃ পোস্ট বক্স নং ...বিশ্ববাণী পত্রিকা।'

সোজা হয়ে উঠে বসে নিরুপমা।

হ্যাঁ, এতদিনে সে পেয়েছে ঠিক তার মনের মত একজন বৈজ্ঞানিকের সন্ধান। আর মিথ্যা ধাপ্পা নেই ওর মধ্যে। আগে অপারেশন করা হবে। তারপর সাফল্যলাভ করতে পারলে দেওয়া হবে অপারেশন চার্জ।

খুশীর আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে নিরুপমার মুখখানা।

দামী প্যাডটা টেনে নিয়ে লিখতে বসে সে।

পরদিন সন্ধ্যা।

একখানা ক্যাডিলাক্ গাড়ি এসে দাঁড়ায় নিরুপমার বাড়ীর সামনে। কলিং বেলটা বেজে ওঠে। দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে আসে নিরুপমা।

—কে?

—আমরা বিশ্ববাণী পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের উত্তরে আপনার চিঠি পেয়েছি। আপনিই কি নিরুপমা দেবী?

—হ্যাঁ।

—উঠে আসুন গাড়িতে। আগামী কালই অপারেশন করা হবে, অবশ্য যদি আপনার স্বাস্থ্য ঠিক অপারেশনের অনুকূল হয়।

—আর তা না হলে?

—আমাদের বিশেষভাবে তৈরী হাসপাতালে দিন দশেক আপনাকে ডাক্তারবাবুর চিকিৎসাধীনে থাকতে হবে। শরীর একটু সুস্থ হলেই অপারেশনের ব্যবস্থা করা হবে।

কিন্তু...

নিরুপমাকে একটু যেন চিন্তিত মনে হয়।

—কোনও দুশ্চিন্তা নেই আপনার। আমাদের তত্ত্বাবধানে নিশ্চিন্তে থাকতে পারবেন। তারপর আপনার ওপর অপারেশন সফল হলে আপনি পত্রিকাতে লিখিত বিবৃতি দেবেন।

—কিন্তু বিনা স্বার্থে আপনারাই বা কেন এভাবে কাজ করছেন?

—স্বার্থ নিশ্চয়ই আছে। আমরা আপনার এবং এই ধরণের আর একজনের ওপর এই পরীক্ষা করব। পরীক্ষায় সফল হলে পত্রিকা মাধ্যমেই হবে তার প্রচার। সেক্ষেত্রে ডাক্তারবাবুর নাম বিশ্ববিখ্যাত হয়ে পড়বে অত্যন্ত অল্প দিনে। এত বড়ো একটি 'সায়েন্টিফিক অ্যাচিভ্‌মেণ্ট' আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে সম্ভব হয়নি।

—তা ত বটেই। কিন্তু আপনাদের ডাক্তারবাবু কোথায়?

—তিনি বিশেষভাবে তৈরী লেবরেটরী ছাড়া বাইরে বের হন না।

—বেশ চলুন। অন্তত তাঁর সঙ্গে একবার দেখা হবে।

লোকটি নিরুপমাকে গাড়িতে উঠতে বলে নিজেও গাড়িতে উঠে স্টার্ট দিল। কিন্তু গাড়ি চলতে আরম্ভ করতেই সে একটি কাগজ সেখানে রেখে গেল। তাতে লেখা ছিল ঃ

ভয় নেই, নিরুপমা দেবী নিখোঁজ হয়নি। আমাদের তত্ত্বাবধানেই থাকবেন। তাঁর দেহের ওপর একধরণের অপারেশন করতে তিনি সম্মতি দিয়েছেন, তাই তাঁকে নিয়ে যাওয়া হলো। আশা করি পুলিশবিভাগ এ বিষয় নিয়ে মাথা ঘামাবে না। আর যদি নিরুপমা দেবীকে

খুঁজে বের করতে চেষ্টা করাও হয় পৃথিবীর কোনও শক্তি যে তাতে সফল হবে না এ সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিত।

অপারেশন ঠিকমতো শেষ হলে তিনি আবার ফিরে আসবেন। আর ব্যর্থ হলে তিনি মৃত্যুবরণ করবেন।

ইতি—

চলন্ত ছায়া।

দু'দিন বাদে সংবাদপত্রে নিরুপমা দেবীর আকস্মিক নিরুদ্দেশের কথা বেশ বড়ো বড়ো অক্ষরে ছাপা হলো, আর সেই সঙ্গে চলন্ত ছায়ার চিঠিটাও।

দীপক কিন্তু সেটি পড়ে গুম্ হয়ে কিছুক্ষণ কি যেন ভাবল। তারপর রতনলালকে উদ্দেশ করে বলল—আচ্ছা, বৈজ্ঞানিক অপারেশনে একজন অভিনেত্রী কি করে স্বেচ্ছায় সম্মত হতে পারেন?

রতন কোনও উত্তর দিতে পারল না।

দীপক একটু ভেবে বলল—জিনিসটা যদিও একটা ধাঁধার মতো লাগছে তবু একটু আলোকরেখা পাচ্ছি বলে মনে হচ্ছে যেন।

—নতুন কি সূত্র আবার পেলি ওর মধ্যে?

দীপক বলল—অপরাধী চলন্ত ছায়া একজন বৈজ্ঞানিক। আর তার যে সব লোকজন চারদিকে নজর রেখে কাজ করছে তার অনেক ওপরে এই আসল লোক। কিন্তু কি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের জন্যে যে সে বাধ্য হয়ে এই ধরণের আইন-অমান্যকর কার্যকলাপে হাত দিয়েছে তাই শুধু বুঝতে পারছি না। আমি ভাবছি এ বিষয় সম্বন্ধে জানবার জন্যে আমি আমার এক বন্ধু ও ভাল সার্জন ডাঃ প্রেমনাথ শর্মার শরণাপন্ন হব। কয়েকটি বড়ো বড়ো অপারেশনে তিনি বেশ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন এবং সম্প্রতি কয়েকটি জটিল বিষয় নিয়ে গবেষণা করছেন। দেখা যাক্, নতুন কোনও তথ্য আবিষ্কৃত হয় কিনা।

সাত

—মৃত্যুদূত—

সারা মুখে বসন্তের দাগ, উস্কোখুস্কো চুল, একটা পা খোঁড়া, সারা দেহ ধুলো আর ময়লা মাখা যে ভিখিরীটা লালবাজার পুলিশ স্টেশনের সাম্‌নের ফুটপাথে বসে ভিক্ষে করছিল তাকে দেখে মনে দয়া না জেগে, জাগে ঘৃণা আর বিতৃষ্ণায় পূর্ণ একটা মনোভাব।

কিন্তু লালাবাজার থানায় প্রবেশ করবার মুখে আপনমনেই দীপক একটা ডবল পয়সা ছুঁড়ে দিল তার দিকে।

লোকটি বিড় বিড় করে কি যে বলল বোঝা গেল না। দীপক সেদিকে মনোযোগ না দিয়ে ডেপুটি পুলিশ কমিশনার মিঃ মরিসনের চেম্বারের উদ্দেশে পা বাড়াল।

ডেপুটি কমিশনার মিঃ মরিসন দীপককে দেখে যেন হাতে চাঁদ পেলেন। হাসিমুখে তাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে বললেন—আসুন মিঃ চ্যাটার্জী। আপনার দেখা পেয়ে আনন্দিত হলাম। ওধারে নতুন খবরগুলো শুনেছেন ত?

—হ্যাঁ, ওই নিরুপমা দেবীর অদৃশ্য হওয়া আর চলন্ত ছায়ার চিঠির কথা ত?

মিঃ মরিসন বললেন—এখন কি ভাবে এগুনো যায়, বলুন মিঃ চ্যাটার্জী।

—খানিকটা আশার আলো আমি দেখতে পেয়েছি মিঃ মরিসন।

—কি রকম?

—দেখুন, মৃতদেহ চুরি, রক্ত চুরি, নিরুপমা দেবীর স্বেচ্ছায় অন্তর্হিত হওয়া আর একটি তরুণীর নিখোঁজ হওয়া ছাড়া আর কোনও ঘটনা ঘটেনি। কোনও টাকাকড়ি বা সম্পত্তি বা ঐ ধরণের জিনিসের প্রতি কোনও লোভ নেই এদের।

—তা ত দেখতেই পাচ্ছি।

—তারপর আমাকে সব সময় এই খুনের তদন্ত থেকে দূরে রাখবার চেষ্টা। তার মধ্যেও আছে অন্য একটা ইঙ্গিত। সবকিছু মিলিয়ে এই দাঁড়াচ্ছে যে কোনও একটা বৈজ্ঞানিক বিষয়ের পরীক্ষা বা ঐ ধরণের কিছু একটা ঘটতে চলেছে। আর সেই কাজের জন্যেই চলন্ত ছায়া ছদ্মনাম নিয়ে কোনও লোক এগুলো করাচ্ছে। এই সব কাজগুলোই একজনের নয়, এর পেছনে হয়তো আছে সেই একটি মস্তিষ্ক।

—কিন্তু আপনি কি করে এতটা আন্দাজ করতে পারছেন মিঃ চ্যাটার্জী?

—এটা বালুর ওপর প্রাসাদ গড়া বলতে পারেন। সবই বলছি অনুমানের ওপর নির্ভর করে। তবে এটা ঠিক যে আমার অনুমানের খানিকটা অন্তত সত্যি।

—তা বটে। হাসতে হাসতে মিঃ মরিসন বলেন—কিন্তু এর পর কোন্ পথ ধরে এগোবার চেষ্টা করবেন আপনি?

—আমার একজন সার্জন বন্ধুর সাহায্য নিচ্ছি আমি। তাঁর কাছ থেকে প্রথমে জানতে হবে কি ধরণের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার জন্যে এগুলো প্রয়োজন হতে পারে এবং তাতে নিরুপমা দেবী স্বেচ্ছায় মত দিতে পারেন?

—স্বেচ্ছায়—এটাই বা ধরে নিচ্ছেন কেন?

—চলন্ত ছায়া আইন না মানতে পারে, কিন্তু আজ পর্যন্ত মিথ্যা কিছু বলেনি। স্বেচ্ছায় না হলে নিশ্চয় সে লিখে রেখে যেত যে জোর করে নিরুপমা দেবীকে নিয়ে গেলাম। এটাও একটা পয়েন্ট, যা আমি ধরে নিচ্ছি।

মিঃ মরিসন কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তার আগেই টেলিফোনটা অকস্মাৎ বেজে উঠল সশব্দে।

—হ্যালো, কে?

—আমি দীপক চ্যাটার্জীকে চাই।

দীপকের দিকে চেয়ে মিঃ মরিসন বলেন—আপনার ফোন মিঃ চ্যাটার্জী।

দীপক বলল—কিন্তু আমি যে এখানে আছি, তা যে লোকটি ফোন করছে সে জানল কেমন করে? যাক্, দেখি কি ব্যাপার।

রিসিভারটা তুলে নিয়ে দীপক বলল—হ্যাঁ, চ্যাটার্জী স্পিকিং। কে আপনি?

ওধার থেকে উত্তর ভেসে এলো—আমি চলন্ত ছায়া। পাব্লিক টেলিফোন থেকে কথা বলছি। শুনুন মিঃ চ্যাটার্জী, আপনি আমার কথা না শুনে যে কেস্টা হাতে নিয়েছেন তাতে আপনার সাহসের পরিচয় পেলাম। সাহসী লোকদের আমি সত্যি ভালবাসি মিঃ চ্যাটার্জী। যাক্, আরও একটা সুযোগ দিচ্ছি আপনাকে। এখনো বলুন আপনি এ কেস্ থেকে সরে দাঁড়াবেন কিনা! মিথ্যা কেন বুনো হাঁসের পেছনে তাড়া করে প্রাণটা হারাবেন! তার চেয়ে এ কেস্ ছেড়ে দিলে উপযুক্ত পারিশ্রমিক আপনার হাতে গিয়ে পৌঁছবে।

—অত সহজে আমার মত পাল্টে যায় না। দীপকের স্বরে দৃঢ়তা।

—দেখুন, আপনার পেছনে দিবারাত্র আমার লোক নিযুক্ত আছে। এমন কি মিঃ মরিসনের সঙ্গে আপনি যা যা কথা বললেন তাও আমার লোকেরা জানতে পেরেছে। আপনি যে উপায়ে এগোতে চান তাও জানি আমি। অতএব বুঝতেই পারছেন যে আপনার প্রাণটা নিঃশেষে হরণ করতে কতটুকু সময় লাগে আমার!

—কিন্তু তবুও আমি মত পাল্টাতে রাজী নই। দীপকের স্বর শান্ত।

—বেশ, তাহলে বলে রাখছি আপনাকে। আপনি লালবাজার থানা থেকে বেরিয়ে বাড়ি আসবার পথে সর্বপ্রকারে নিজেকে সাবধানে রাখবার চেষ্টা করবেন। মিঃ মরিসনের সাহায্যও নিতে পারেন। ওইটুকু সময়ের মধ্যে দীপক চ্যাটার্জীর নাম পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে বিলুপ্ত হবে।

—ধন্যবাদ।

দীপক রিসিভারটা নামিয়ে রেখে মিঃ মরিসনের দিকে চেয়ে বলে—বন্ধু আমাকে শেষবারের মতো সাবধান করলেন। আমি তা গ্রাহ্য না করাতে উনি জানালেন যে আজকের মধ্যেই আমি পৃথিবী থেকে বিদায় নেবো।

—এখন কি করবেন মিঃ চ্যাটার্জী? মিঃ মরিসনের স্বরে উদ্বেগ।

—কাউয়ার্ডস্ ডাই মেনি টাইম্স্ বিফোর দেয়ার ডেথ্। কাপুরুষেরা মৃত্যুর পূর্বেই বহুবার মরে থাকে মিঃ মরিসন। কিন্তু আমি মরব মাত্র একবার।

কথা শেষ করে দীপক উচ্চস্বরে হেসে ওঠে।

লালবাজার থেকে বেরিয়ে গাড়িতে উঠে বসল দীপক।

ছোট্ট মরিস গাড়িটা।

দীপকের হাতে যেন নবজীবন পেয়েছে। তীব্রবেগে এগিয়ে চলল মহানগরীর পিচ্ঢালা, চক্চকে, মসৃণ পথ ধরে।

ডালহৌসী পেরিয়ে এস্প্লানেডের মোড...দক্ষিণ দিকে ছুটে চলল গাড়িখানা...

সন্ধ্যা গাঢ় হয়েছে।

পথের মোড়ে মোড়ে আলোর ছড়াছড়ি।

মসৃণ, ঝকঝকে চৌরঙ্গী রোড। দীপক গাড়ির গতিবেগ বাড়িয়ে দেয়। ভবানীপুরে তার বাড়ির দিকে গাড়িখানা এগিয়ে চলে।

উঃ! কি একটা যেন ফুটছে দীপকের পিঠে।

স্টিয়ারিংটা চেপে ধরে পেছনের দিকে তাকায় দীপক।

পেছনে দাঁড়িয়ে লালবাজারের গেটের সেই ভিখিরীটা। কিন্তু এ কি! তার বেশভূষার হঠাৎ পরিবর্তন ঘটল কি করে?

লোকটার ডান হাতে চক্চকে একটা রিভলবার। তার দিকে যেন বিদ্রূপের দৃষ্টিতে তাকিয়ে মৃদু হাসছে! বাঁ হাতে সূচের মতো একটা কি যেন!

—গাড়ি থামাও! লোকটির কণ্ঠে তীক্ষ্ণ আদেশ।

কিন্তু কথা শেষ করতে হলো না। বিষের ক্রিয়ায় দীপকের শরীরটা কেমন যেন ঝিম্ঝিম্ করতে সুরু করেছে ইতিমধ্যেই। মাথাটা ঘুরছে। লোকটি তাহলে তার শরীরে কোনও বিষাক্ত দ্রব্য প্রবেশ করিয়েছে।

দীপকের মাথার মধ্যে সবকিছু কেমন যেন গোলমাল হয়ে যায়।
জ্ঞান হারিয়ে গাড়ির মধ্যেই লুটিয়ে পড়ে দীপক।

মিনিট কুড়ি পরে আর একটা ফোন পেলেন মিঃ মরিসনঃ
দীপক চ্যাটার্জী বড়ো বাড়াবাড়ি সুরু করেছিল। তাই তাকে নিয়ে গেলাম আট্‌কে রাখবার জন্যে। আমার কাজ অব্যাহত গতিতেই চলবে। আপনাকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি, মিঃ মরিসন।

মিঃ মরিসন কিছু বলার আগেই টেলিফোন কানেক্‌শন কেটে দেওয়া হলো।

মিঃ মরিসনের সারা চোখে-মুখে ফুটে উঠল একটা হতাশার গ্লানি। ব্যর্থতার কালিমা। রিসিভারটা নামিয়ে রেখে উঠে দাঁড়ালেন তিনি।

আট
—শত্রু-কবলে—

এক যুগ পরে ঘুম থেকে জেগে-ওঠা আরব্য রজনীর দৈত্যের মনোভাব যেন জেগে উঠল দীপক চ্যাটার্জীর মনে। জ্ঞান ফিরে পাবার সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে বেশ ভাল করে তাকিয়ে দেখল সে। কোথা দিয়ে যে কি ঘটে গেছে তা ভাল করে স্মরণ করতেই বহুক্ষণ কেটে গেল তার।

দরজা-জানালা বন্ধ একখানি ঘর। ভ্যাপ্‌সা গন্ধ। অসহ্য গরম। এ যেন তার জীবন্ত-সমাধি ঘটেছে। পৃথিবীর সাড়াশব্দ এখান থেকে অনেক দূরে কোনও জনমানবের বিন্দুমাত্র অস্তিত্বের চিহ্ন নেই কোথাও।

শুধু কোথা থেকে যেন ভেসে আসছে একটানা একটা শব্দ—ঝক্ ঝক্ ঝক্...

কোনও একটা কারখানা বা যন্ত্র চলবার সময় যে ধরণের শব্দ হয় অনেকটা তেমনি এই শব্দ।

ক্ষিদেয় পেট চোঁ চোঁ করতে থাকে দীপকের। শরীরটা কেমন যেন দুর্বল মনে হয়। কিন্তু এই দুর্বৃত্তদের হাত থেকে মুক্তি পাবার কোনও উপায় খোলা নেই তার সামনে।

ওপরের দিকে ছোট্ট একটা ঘুলঘুলি দিয়ে আসছে আলোর ছিটেফোঁটা। বাতাস আসার পথও বোধ হয় ঐটাই। এ ছাড়া আর কোনও সংযোগই নেই বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে। কিন্তু ওই ছোট্ট ঘুলঘুলিটাকে বাড়াতে গেলে অন্তত কোনও একটা অস্ত্র প্রয়োজন। অথচ তার কাছে উপস্থিত কোনও অস্ত্রই নেই। আপাতত তাই পেটের ক্ষিদে পেটেই চেপে রেখে অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করেই সময় কাটানো ছাড়া অন্য কোনও গতি নেই তার।

বাইরে পায়ের শব্দ শোনা গেল। তারপর দরজা খোলার শব্দ। ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল চারজন লোক। একজনের হাতে একটা রিভলবার। অন্য তিনজনের হাতে বড়ো বড়ো ধারালো ছোরা!

—আপাতত কি কোথাও যেতে হবে নাকি? হালকা সুরে দীপক প্রশ্ন করে।

—হ্যাঁ, মনিব ডেকে পাঠিয়েছে তোমাকে।

—কিন্তু পেট যে এধারে চোঁ চোঁ করছে ক্ষিদেয়।

—সে কথা মনিবকেই বলগে। এখন ভাল ছেলের মতো উঠে দাঁড়াও দেখি।

দীপক দেখল আপত্তি করে লাভ হবে না। সে ছোরাধারী তিনজনকে সাম্‌নে রেখে রিভলবারধারীর পাশে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর বলল—চল।

চারজনে ঘর থেকে বের হলো।

ঘর পেরিয়ে একটা বারান্দা। তারপর করিডোর। অবশেষে ওপরে ওঠবার সিঁড়ি।

সিঁড়ির মুখে এসে দীপক এক অদ্ভুত কাণ্ড করে বসল। লোক চারজনের কেউই এর জন্যে প্রস্তুত ছিল না।

অন্যমনস্ক রিভলবারধারীর হাতটা আচম্‌কা মুচকে দিয়ে এক টানে তার হাত থেকে রিভলবারটা টেনে নিল। লোকটি আদৌ প্রস্তুত ছিল না এর জন্যে। রিভলবারটা তৎক্ষণাৎ দীপকের হাতে এসে গেল।

ছোরাধারী তিনজন শব্দ শুনে পেছন দিকে ফিরে তাকিয়েছিল, কিন্তু ততক্ষণে রিভলবারটা দীপকের হাতে এসে গেছে। সে ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলল—যদি কেউ বিন্দুমাত্রও বাধা দেবার চেষ্টা করো, সঙ্গে সঙ্গে গুলি ছুঁড়তে বাধ্য হবো।

কিছুক্ষণের অখণ্ড নীরবতা।

আচম্‌কা একজন ছোরাধারী হাতটা তুলল দীপককে লক্ষ্য করে।

একপাশে সরে গিয়ে দীপক পিস্তল ছুঁড়ল। তারপরে প্রচণ্ড এক লাফ মেরে সিঁড়ি থেকে নিচে লাফিয়ে পড়ল সে।

ওধারে হৈচৈ শোনা যাচ্ছে। অজস্র কলরব। সমস্ত দৈত্যপুরীর ঘুম ভাঙছে যেন।

দীপক ছুটে চলেছে প্রাণপণে। বাগানের পাশে একখানা মোটর দাঁড়িয়ে। বোধহয় এদের দলেরই মোটর। মোটরে উঠে বসে প্রচণ্ড বেগে মোটর চালিয়ে দেয় সে।

ওধার থেকে গুলি ছুটে আসছে।

দুপ্‌দাপ্‌ শব্দ করে এগিয়ে আসছে অনেকগুলি লোক। দীপকের মোটর সবকিছু উপেক্ষা করে গেট দিয়ে বের হয়ে তীব্রবেগে এগিয়ে চলে।

বাড়িখানা হচ্ছে ব্যারাকপুরের কাছাকাছি কোনও একটি জায়গায়। আশেপাশে কোনও বাড়ি নেই। নিকটবর্তী থানা সেখান থেকে অনেক দূরে।

দীপক গাড়ি চালিয়ে মাইলখানেক গিয়ে একজন লোকের কাছ থেকে থানার অবস্থানটা জেনে নেয়। তারপরে গাড়ি চালিয়ে সোজা থানায় এসে ওঠে।

থানা অফিসার মিঃ হরিরাম গোয়েঙ্কা দীপকের অপরিচিত। দীপক তাকে নিজের পরিচয়টা দিয়ে বলে—এক্ষুণি আমার সঙ্গে গিয়ে ওই এলাকার বাড়িটা সার্চ করতে হবে।

মিঃ গোয়েঙ্কা বললেন—কিন্তু আমি একবার লালবাজারে ফোন করে ব্যাপারটা ভাল করে জেনে নিতে চাই।

দীপক বলল—সমস্ত দায়িত্বটা আমিই নিচ্ছি মিঃ গোয়েঙ্কা। আর এক মুহূর্তও দেরী করবেন না। ওদের পালাবার সুযোগ দেওয়া উচিত নয়।

মিঃ গোয়েঙ্কা কিন্তু দীপকের কথা অগ্রাহ্য করে লালবাজারে ফোন করলেন মিঃ মরিসনের কাছে।

অবশেষে সবদিক দিয়ে প্রস্তুত হয়ে সশস্ত্র পুলিশবাহিনী নিয়ে তাঁরা যখন বের হলেন তখন ঘণ্টা দেড়েক কেটে গেছে।

নির্দিষ্ট এলাকায় বাড়িটা খুঁজে পেতে দেরী হলো না। কিন্তু তন্ন তন্ন করে খোঁজ

করেও কাউকেই পাওয়া গেল না। সারা বাড়িটা খাঁ খাঁ করে এদের সকলের পলায়নের বার্তা ঘোষণা করছে।

সমস্ত বাড়ি খোঁজ করা শেষ হলে দীপক অবশেষে গিয়ে উপস্থিত হলো তিনতলার একটা চিলেকুঠরীতে।

সেখানে কতকগুলো ভাঙা কাঁচের যন্ত্রপাতি পড়েছিল, আর ভাঁজ-করা একটা চিঠি ঃ

দীপক চ্যাটার্জী,

তোমার সাহসের ও বুদ্ধির তারিফ করি বটে, কিন্তু তবুও জানিয়ে যাচ্ছি আমার 'এক্সপেরিমেণ্ট'গুলো সফল না হওয়া পর্যন্ত আমাকে ধরার সাধ্য পৃথিবীতে কারও নেই। তোমাকে এ যাত্রা প্রাণে মারব না বলে স্থির করেছিলাম, কিন্তু আর নয়। তোমার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।

ইতি—

চলন্ত ছায়া।

নয়

—ডাঃ প্রেমনাথ—

সন্ধ্যার আব্‌ছা ছায়া সবে পৃথিবীর বুকে নামতে সুরু করেছে। আঁধার এখনও ততটা গাঢ় হয়নি।

দীপকের মোটরখানা ছুটে চলেছে বালিগঞ্জের দিকে। ওল্ড বালিগঞ্জের প্রান্তে অবস্থিত ডাঃ প্রেমনাথ শর্মার বাড়িখানা।

গাড়িতে দীপক একা।

কোমরের বেল্টে কেবল নিত্যসঙ্গী রিভলবারটা আঁটা আছে। আজ পর্যন্ত এই একটিমাত্র জিনিসই দীপকের জীবনরক্ষার দায়িত্ব বহুবার নির্ভুল ভাবে পালন করেছে।

হাল্‌কা হাওয়ায় উড়ছে দীপকের শ্যাম্পু করা চুলগুলো। একটু যেন শীত-শীত করছে। দীপক কোটটা ভাল করে গায়ে এঁটে নেয়।

গাড়ির গতি বেড়ে যায়। দ্রুত পেছনে পড়ে থাকা পথের মোড়ের সব ল্যাম্পপোস্টগুলো। ওই দেখা যাচ্ছে ডাঃ প্রেমনাথ শর্মার বাড়িখানা। ঠিক এই সময়েই বাড়িতে পাওয়া যায় তাঁকে। অন্য সময় হাসপাতাল আর কাজকর্ম নিয়ে বিশেষভাবে ব্যস্ত থাকেন তিনি।

বাইরে গাড়িটা দাঁড় করিয়ে এগিয়ে যায় দীপক। সাম্‌নের লনটা পার হয়ে দরজার ওপরে কলিং বেলটায় মৃদু চাপ দেয়।

ক্রিং ক্রিং ক্রিং...দরজা খুলে যায়।

—কে? মুখ বের করে অপূর্ব সুন্দরী একটি মেয়ে। বয়স তার যেন আঠার বছরের কিনারায় এসে থমকে দাঁড়িয়েছে। অপূর্ব দেহসৌষ্ঠব,—অনুপম লাবণ্য।

—আমি ডাঃ প্রেমনাথ শর্মার সঙ্গে দেখা করতে চাই, বিশেষ কয়েকটি কথা নিয়ে আলোচনা করবার জন্যে।

—ও। মেয়েটা হাসে। এক ঝলক সৌন্দর্য যেন ছিটকে পড়ে সারা পরিবেশটায়।

—কিন্তু বাবা ত এখন বাড়ি নেই।

—সে কি, কোথায় তিনি?

—একটা স্পেশাল অপারেশন কেসে তাঁকে কল্ দিয়ে নিয়ে গেছে। আপনি কোত্থেকে আসছেন?

—আমার নাম দীপক চ্যাটার্জী। কয়েকটি বিষয়ে ওঁর সঙ্গে আলোচনা করবার দরকার ছিল আমার। রেঙ্গুনে ওঁর সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ।

মেয়েটি হাসে। বলে—আপনার কথা আমি বাবার কাছে অনেকবার শুনেছি। ভেতরে এসে বসুন। অল্পক্ষণের মধ্যেই উনি এসে পড়বেন বোধ হয়।

ড্রইংরুমের নরম একটা কোচে গা এলিয়ে দেয় দীপক। তারপর মেয়েটির দিকে চেয়ে প্রশ্ন করে—তুমিই তাহলে ওঁর একমাত্র মেয়ে...

—হ্যাঁ, কাবেরী আমার নাম।

—বাঃ, চমৎকার নামটি ত তোমার। দীপকের স্বরটা হাল্কা।

—আপনি একটু বসুন, আমি আপনার জন্যে চা আনতে বলে আসি।

ভেতরে চলে যায় কাবেরী। ঠিক যেন এক ঝলক হাল্কা হাওয়া।

ফিরে আসে মিনিট দশেকের মধ্যেই। তারপর বলে—বহুবার বাবার মুখে শুনেছি আপনার কথা। আপনার মতো বড়ো ডিটেকটিভ হিন্দুস্থানে আর নেই। আচ্ছা, শোনাবেন আপনার জীবনের দু'একটা গল্প?

দীপক হাসে। বলে—গল্প নয়, কাহিনী। বাস্তব ঘটনা।

—জানি। মেয়েটির বুদ্ধিদীপ্ত চোখে জিজ্ঞাসার ছায়া। নিষ্কলঙ্ক মুখে কৌতূহলের চিহ্ন।—বাস্তব ঘটনা শুনে যে আনন্দ আছে, কাল্পনিক গল্প পড়ে তার শতাংশের একাংশও পাওয়া যায় না।

একটা সিগারেটে অগ্নিসঞ্চার করে দীপক।

নীলাভ ধোঁয়ার কুণ্ডলীর দিকে চেয়ে ধীরে ধীরে সুরু করে বহু পুরানো দিনের কোন্ এক অর্ধবিস্মৃত ঘটনার রোমন্থন।

সময় এগিয়ে চলে। হুঁশ থাকে না দীপকের। সারা পৃথিবী যেন তার চোখের সামনে থেকে লুপ্ত হয়ে গেছে। শুধু ওরা দুজন—দীপক আর কাবেরী। কাবেরীর বনহরিণীর মতো চঞ্চল চোখের একাগ্র দৃষ্টি দীপকের মুখের দিকে নিবদ্ধ। দীপক তন্ময়। মুখে তার অতীত গৌরবের উজ্জ্বল ছায়া।

বাইরে মোটরের শব্দ।

—বাবা বোধহয় এলেন দীপকবাবু। মেয়েটি একলাফে উঠে দরজার দিকে এগিয়ে যায়।

ডাঃ প্রেমনাথ শর্মা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করেন।

দোহারা লম্বা ডাঃ প্রেমনাথের চেহারা। মাথায় কাঁচাপাকা চুল। গায়ের রঙ টকটকে ফর্সা। অত্যন্ত সহজেই অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান্ বলে ভুল করা চলতে পারে। পরণে দামী স্যুট্। মুখে হাভানা চুরুট। পায়ে ক্রেপ্‌সোল সু।

—গুড্ ইভ্‌নিং, দীপকবাবু!

—গুড্ ইভনিং, ডাঃ শর্মা! তারপর, কোথায় গিয়েছিলেন হঠাৎ?

মাথার ক্যাপটা একটা হ্যাঙারে ঝুলিয়ে রাখতে রাখতে ডাঃ শর্মা বলেন—একটা অপারেশন কেস্ ছিল। জরুরী কল্। তাই একটু দেরী হলো ফিরতে। কোনও অসুবিধে হয়নি ত আপনার?

—না না, হেসে দীপক বলে—আপনার মেয়ে যথেষ্ট হস্‌পিটেবল্। কোনও অসুবিধেই হয়নি আমার।

—দীপকবাবু সুন্দর সুন্দর গল্প বলছিলেন বাবা। আল্‌তো হাসিতে ঠোঁটটা ভরিয়ে তুলে কাবেরী বলে।

—ভাল লেগেছে তোর? কাবেরীর মাথায় হাত বুলিয়ে ডাঃ শর্মা হাসেন স্নেহের হাসি।

—হ্যাঁ, খু—ব...

তারপর একটু থেমে বলে—তোমরা বসো বাবা, আমি দেখি ভজুয়াটা আবার চা আনতে এত দেরী করছে কেন—তুমি কফি খাবে, না, চা?

—চা-ই আনতে বল।

কাবেরী ভেতরের দিকে অদৃশ্য হয়।

—তারপর হঠাৎ অধীনের বাড়িতে আপনার পদধূলি! পথ ভুলে নাকি?

—না, কয়েকটা কাজে...

—বুঝেছি। উঃ, বহুবার নিমন্ত্রণ করেও আপনার দেখা পাওয়া যায়নি। কাজের তাগিদ ছাড়া যে আপনার আগমন অসম্ভব তা আগেই বুঝেছিলাম।

হো হো করে হেসে ওঠেন ডাঃ শর্মা।

দীপকও যোগ দেয় সে হাসিতে।

চা এবং খাবার শেষ করে ডাঃ শর্মা একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে নতুন একটা চুরুট ধরান।

তারপর বলেন—এবার বলুন আপনার কাহিনী মিঃ চ্যাটার্জী।

দীপক বলে—কাহিনী নয়, শুধু দু'একটা প্রশ্ন।

ডাঃ শর্মা বলেন—এ ধরণের প্রশ্ন এত লোক থাকতে আমার কাছে কেন মিঃ চ্যাটার্জী?

দীপক হেসে বলে—সার্জারীতে আপনার মতো জ্ঞান সারা ভারতে ক'জনের আছে তা আমার জানা নেই ডাঃ শর্মা। আর সার্জারীর রিসেন্ট অ্যাডভান্সমেন্ট নিয়ে এত মাথা ঘামায় না অন্য কেউ।

ডাঃ শর্মা হেসে বলেন—নিজের প্রশংসা শুনে লাভ নেই মিঃ চ্যাটার্জী। এবার বলুন কি বিষয়ে আপনি জানতে চান। আমার সাধ্যমত সাহায্য করব আপনাকে।

দীপক বলল—সার্জারী দিয়ে অসাধ্য সাধন করা যায় শুনেছি। মানে মুখের চেহারার পরিবর্তন, বয়সকে বহুদিনের মতো পিছিয়ে দেওয়া, অতিরিক্ত মেদ কমিয়ে দেওয়া ইত্যাদি। এগুলো আমাদের দেশে ঠিক কতদূর পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছে বলে জানা আছে আপনার? কিংবা কতদূর অগ্রসর হতে পারে?

চুরুটে টান দিয়ে ডাঃ শর্মা বললেন—আমার স্ত্রী মারা যাওয়ার পর পৃথিবীতে মাত্র দুটি জিনিসকে আমি ভালবাসি মিঃ চ্যাটার্জী। প্রথম—আমার মেয়ে আর দ্বিতীয়—সার্জারী। কিন্তু তবুও প্ল্যাস্টিক সার্জারী যে ঠিক কতদূর সফল হয়েছে তা পরিপূর্ণভাবে জানা নেই আমার। এ সম্বন্ধে বিদেশে এখনও রিসার্চ চলছে। যাঁরা সবজান্তার মতো বলেন সার্জারী দিয়ে দিনকে রাত করা যায় তাঁরাও বিরাট ভুল করেন।

যাক্ শুনুন।

রহস্যমাখা পরিবেশে একঝলক রহস্য এসে যেন ডাঃ শর্মার মুখের ওপর তার পরশ বুলিয়ে দিয়ে গেছে। সবটুকু কথাই কেমন যেন মিস্ট্রিতে পরিপূর্ণ। দীপক মন দিয়ে শোনে ডাঃ শর্মার প্রতিটি কথা।

—এ দেশে প্ল্যাস্টিক সার্জারী নিয়ে এখনও রিসার্চ করবার মত সার্জনের জন্ম হয়নি। আর বয়স কমিয়ে দেওয়ার কথা যে বললেন—মানে আইরনিজেশন আর ক্যালসিফিকেশনের প্রশ্ন যেখানে নিহিত সেখানে আমাদের দেশ এখনও বহু-বহু পেছনে পড়ে আছে।

—কিন্তু বিদেশেই বা বিজ্ঞানীরা কতদূর সফল হয়েছেন ডাঃ শর্মা?

—হ্যাঁ, পরীক্ষা বিদেশে চলছে। বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন আমাদের বার্ধক্যের মূলে হচ্ছে সূর্য থেকে যে একধরণের অজস্র কণা বিচ্ছুরিত হয়ে পৃথিবীর ওপর বর্ষিত হয়, তারই ফল। আর 'ক্যালসিয়াম মেটাবলিজ্‌ম'ও এর জন্যে অনেকটা দায়ী। এগুলোকে নিয়ন্ত্রিত করে বিশেষ ধরণের অপারেশনের সাহায্যে মানুষের দেহে যৌবন দীর্ঘস্থায়ী করা যায় বা তার বয়সকে কমিয়ে দেওয়া যায় এটা বিশ্বাস করি আমি। কিন্তু ও নিয়ে রিসার্চ করবার মতো ক্ষমতা আছে কার? সার্জারী এখনও অনেক—অনেক পেছনে মিঃ চ্যাটার্জী।

ডাঃ প্রেমনাথ আরও কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন।

কিন্তু বাধা পড়ল তাঁর কথায়। জানালার খড়খড়িটা নড়ে উঠল যেন।

একটা ঢিলের সঙ্গে একটা জড়ানো কাগজ এসে পড়ল ঘরের ঠিক কেন্দ্রস্থলে।

কোমর থেকে রিভলবারটা খুলে নিয়ে দীপক জানালার দিকে এগিয়ে গেল।

কিন্তু লোকটা একলাফে জানালা থেকে নীচে পড়েই তীব্রবেগে দৌড় দিতে সুরু করেছে। কিছুটা এগিয়ে গিয়েই সে একটা মোটরে চড়ে বসল।

মোটরটাও তাকে বুকে নিয়ে এগিয়ে চলল প্রচণ্ড গতিতে।

দশ

—অনুসরণ—

কাগজের মোড়কটা তুলে নিয়ে পড়ে দেখল দীপক। তাতে লেখা আছে ঃ

ডাঃ প্রেমনাথ শর্মা,

সাবধান!

আর একটি কথা বললেই মৃত্যু অবধারিত জেনো।

ইতি—

চলন্ত ছায়া।

কাগজটা মুড়ে পকেটে রেখে দীপক বলল—চলি, ডাঃ শর্মা। অনর্থক আপনার বিপদ্‌কে বাড়িয়ে তুলে লাভ নেই। প্রয়োজন হলে আবার দেখা করব।

নমস্কার জানিয়ে বাইরে এসে গাড়তে উঠে বসে দীপক। তারপর যে গতিতে তার গাড়ি ছুটে চলে তা সাধারণ লোকের কাছে ভয়াবহ।

মিটারের কাঁটা উঠতে থাকে।

চল্লিশ, পঞ্চাশ, ষাট, সত্তর, আশী...

যে কোনও মুহূর্তে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

দূরে দেখা যায় সেই গাড়িখানার পেছনের লাল আলোটা জ্বলছে। ওই গাড়িতে করেই চলন্ত ছায়ার দলের সেই লোকটি অদৃশ্য হয়েছিল।

ভাল করে স্টিয়ারিংটা চেপে ধরে দীপক। ওই গাড়িটাকে কিছুতেই দৃষ্টির আড়াল করা চলবে না।

দুটি গাড়িই ছুটে চলে মহানগরীর পথ ধরে বেশ কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে।

রাসবিহারী এভিনিউ...রসা রোড্...আশুতোষ মুখার্জী রোড্...চৌরঙ্গী...

চৌরঙ্গী পেরিয়ে এস্প্লানেডের মোড় থেকে বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীট ধরে এগিয়ে চলে সাম্নের গাড়িখানা।

দীপক বেশ কিছুটা দূরত্ব রেখে অনুসরণ করতে থাকে। সাম্নের গাড়ির কেউ যেন বিন্দুমাত্রও সন্দেহ করতে না পারে।

বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীট পার হয়ে মিশন রো এক্সটেনশন। ডাইনে ঘুরেই একটা ছোট কাফের সাম্নে আগের গাড়িটা দাঁড়িয়ে পড়ে।

অনেকটা দূরেই থেমে পড়ে দীপকের গাড়ি। বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীটের বাঁ দিকের ফুটপাথে দাঁড়ায় দীপকের গাড়ি।

তারপর গাড়ির মধ্যে বসেই দীপক বেশভূষা পরিবর্তন করতে থাকে। অদ্ভুত ক্ষিপ্রগতিতে মেক্ আপ নেয় সে। গাড়ির গদির নীচে ছোট বাক্সের মধ্যে যে সরঞ্জামটুকু ছিল মাত্র তারই সাহায্যে বেশভূষা ও চেহারার মধ্যে যে এত বেশি পরিবর্তন আনতে পারা যায়, তা বাইরের কোনও লোক না দেখলে বিশ্বাস করে উঠতে পারত না।

বেশভূষার পরিবর্তন শেষ করে দীপক যখন গাড়ি থেকে নামল তখন তাকে দেখলে একজন অত্যন্ত সাধারণ উত্তরদেশীয় মুসলমান ছাড়া আর কিছু মনে হওয়া সম্ভব ছিল না।

বেণ্টিঙ্ক হাউসের একতলায় একটা পাব্লিক ফোন।

হ্যাণ্ডেল ঘুরিয়ে দিয়ে একটা দুআনি তার মধ্যে ফেলে দেয় দীপক। তারপর রিসিভারটা তুলে নিয়ে বলে—হ্যালো, পুট মি টু সাউথ...

—কে? ওধার থেকে ভেসে আসে রতনের কণ্ঠ।

—রতন?

—হ্যাঁ।

—তুই এক্ষুণি লালবাজারে গিয়ে মিঃ মরিসনকে ফোর্স নিয়ে তৈরী থাকতে বল্।

—কেন রে? চলন্ত ছায়ার কোনও সন্ধান পেলি নাকি?

—না, সন্ধান ঠিক নয়, একটা নিশানা পেয়েছি শুধু। আশা রাখি অনুসরণ করে হয়তো কোনও সুফল পেতে পারি। যদি কোনও কিছু পাই তবে সঙ্গে সঙ্গে লালবাজারে গিয়ে আর্মড় ফোর্স নিয়ে বেরিয়ে পড়তে হবে।

—বেশ, বেশ, আশা করি তুই সফলতা লাভ কর...

—হ্যাঁ, দেখি কতদূর কি হয়। তবে প্রতি পদে ভয়ে ভয়ে এগোতে হচ্ছে আমাকে।

—আমিও আসব নাকি?

—না, প্রয়োজন নেই, তোকে যা করতে বললাম তাই কর। সেখানে গিয়ে যেন দেরী করতে না হয়।

—বেশ, আমি এক্ষুণি বেরিয়ে পড়ছি।

ফোন ছেড়ে দিয়ে কাফেটার সাম্নে গিয়ে দীপক দেখে গাড়িটা তখনও সেখানে দাঁড়িয়ে আছে।

বেশভূষার ওপর আর একবার হাত বুলিয়ে নিয়ে দীপক এগিয়ে যায় কাফেটার দিকে। ধীরে ধীরে ঢুকে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ে।

ছোট্ট কাফেটি।

লোকজন খুব বেশি নেই। এক কোণে একটি অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান্ দম্পতি। ওপাশে একজন সাধারণ বাঙালী ভদ্রলোক। তাঁর ঠিক পাশের টেবিলে দুজন লোক স্যুট পরে সিগারেট টানছে আর কফি খাচ্ছে।

এই দুজনের দিকে দীপকের মনোযোগ আকৃষ্ট হলো বেশী।

কিন্তু মনোযোগ দেওয়া সত্ত্বেও তাদের একটি কথাও বুঝতে পারল না সে।

শুধু ভেসে আসছে দু-একটা শব্দ। তা থেকে দীপক আন্দাজ করল যে এরাই সেই লোক যাদের একজন ডাঃ প্রেমনাথের বাড়িতে তাকে লক্ষ্য করে ঢিল ছুঁড়েছিল।

সময় কেটে যায়। সেকেণ্ড...মিনিট...ঘণ্টা...

ঠিক এক ঘণ্টা পরে হোটেলের বয়ের হাতে দামটা চুকিয়ে দিয়ে বের হয়ে যায় ওরা দুজন।

কিন্তু পকেট থেকে নোটটা বের করবার সময় একটুকরো কাগজ মাটিতে পড়ে যায় একজনের পকেট থেকে। সেদিকে মোটেই খেয়াল থাকে না তার।

বেরিয়ে গিয়ে দুজনে মোটরে চড়ে বসে।

গাড়ি স্টার্ট দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায় অল্পক্ষণের মধ্যেই। কিন্তু আর ওদের অনুসরণ না করে দীপক পাশের টেবিলটাতে গিয়ে বসে। তারপর বয়ের অন্যমনস্কতার সুযোগ নিয়ে কাগজটা হাতে তুলে নেয়।

ছোট্ট একটা চিরকুট। তাতে শুধু একটা ঠিকানা লেখা আছে লাল পেন্সিল দিয়ে। কাগজটাতে লেখা ঃ

৩নং কুঠি ঃ ১১৭ নং রসা রোড সাউথ, টালিগঞ্জ।

কাগজের টুকরোটা পকেটে রেখে আর এক কাপ চায়ের অর্ডার দেয় দীপক।

তারপর কাপটি নিঃশেষ করে দামটা চুকিয়ে গাড়িতে এসে উঠতে আর পনর মিনিটের বেশি সময় লাগে না।

গাড়ি এগিয়ে চলে লালবাজার পুলিশ স্টেশনের দিকে।

এগারো

—ইলেক্‌ট্রোথেরাপী—

লালবাজারে এসেই সোজা ডেপুটি কমিশনার মিঃ মরিসনের কক্ষে গিয়ে উপস্থিত হয় দীপক।

মিঃ মরিসন উৎকণ্ঠিত মুখে দীপকের জন্যেই প্রতীক্ষা করছিলেন যেন। পাশে বসে রতনলাল।

—নমস্কার মিঃ চ্যাটার্জী। তারপর ওদিকের কতদূর?

—কিছুটা পাওয়া গেছে। শুধু একটা ঠিকানা। কিন্তু জানি না এ থেকে কতটা অগ্রসর হতে পারব!

—দেখা যাক! ইট্ ইজ্ এ মিয়ার্ চান্স। কিন্তু ঠিকানাটা কিভাবে পেলেন মিঃ চ্যাটার্জী?

দীপক তখন সমস্ত ঘটনা খুলে বলল।

মিঃ মরিসন বললেন—আশা করা যায় এটাতে সফল হবো। আজকের রাতটা আমাদের জীবনের একটা মস্ত বড়ো স্পোর্টস, কি বলেন মিঃ চ্যাটার্জী! জানি না এতে সফল হবো কি না।

দীপক হেসে উঠে বলল—রতনের কাছে খবর পেয়ে রেডি ছিলেন ত?

—হ্যাঁ।

—আমি অবশ্য ঠিকানাটা আশা করিনি। ভেবেছিলাম অনুসরণ করে কোনও একটা সূত্র পাব। কিন্তু একেবারে একটা স্পষ্ট ঠিকানা এসে গেল আমাদের হাতের মধ্যে। ইট্ ইজ্ মিয়ার্ লাক্।

দুখানা পুলিশের গাড়ি ছুটে চলল দক্ষিণের দিকে।

একখানা লরী আর একখানা জীপ্।

প্রচণ্ড গতিতে এগিয়ে চলল গাড়ি দুটি, যেন প্রতিটি মুহূর্ত তাদের কাছে মূল্যবান।

রিস্টওয়াচের দিকে তাকিয়ে দীপক দেখল রাত সাড়ে নটা। দশটার মধ্যে তাদের অবশ্যই পৌছতে হবে। যত দেরী হবে সফল হবার আশা তত কম।

গাড়ির স্পীডোমিটারে কাঁটা ওঠে।

আর বেড়ে চলে গাড়ির মধ্যের প্রতিটি প্রাণীর উত্তেজনা।

অবশেষে রসা রোড সাউথে এসে গাড়ি থামে। ঠিকানাটা খুঁজে বের করতে বিশেষ বেগ পেতে হয় না।

কিন্তু এ কি!

নিঃসীম আঁধারে সমাচ্ছন্ন বাড়িটা। এর প্রতিটি অন্ধ কোণে যে কোনও চক্রান্তের বিষাক্ত বাষ্প উদ্বেল হয়ে উঠতে পারে তা বাইরে থেকে ধারণা করাও যায় না।

—আমরা কি ভুল ঠিকানায় এলাম নাকি মিঃ চ্যাটার্জী? মিঃ মরিসনের স্বরে কেমন যেন উদ্বেগ।

—হতে পারে। তবু আমাদের পরীক্ষা করে দেখতে হবে। যাক্, আমরা দুজন প্রথমে ভেতরে যাই। প্রয়োজন হলে হুইশ্‌ল দেবার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশবাহিনী বাড়ি আক্রমণ করবে।

—হ্যাঁ, এ যুক্তিটা ভাল। মিঃ মরিসন বললেন—কিন্তু সবকটা দরজা-জানালাই যে বন্ধ!

—তার জন্যে ভাবনা কি! ওধারের জলের পাইপটা রয়েছে। ওটা বেয়ে নিঃশব্দে উঠে যেতে খুব বেশি অসুবিধা হবে না আমাদের।

মিঃ মরিসনের মৃদু আপত্তি শোনা গেল। দীপক বলল—বেশ, তবে আমি একাই যাচ্ছি।

মিঃ মরিসন বললেন—না, চলুন দুজনেই যাই।

জলের পাইপ বেয়ে দুজনে উঠতে থাকে।

দোতলায় একটা রেলিং-এর কাছে তারা এসে পৌছতেই দোতলার জানালাটা খুলে যায়।

সেখানে দাঁড়িয়ে দীর্ঘদেহ একজন লোক। সারা দেহ তার কালো পোষাকে আবৃত।

মিঃ মরিসন তাকে লক্ষ্য করে রিভলবার তুলতে চেষ্টা করেন।

বাধা দেয় দীপক। দীপক কালো পোষাকধারীর সাম্‌নে গিয়ে দাঁড়ায়।

—গুড্ ইভ্‌নিং মিঃ মরিসন। নমস্কার মিঃ চ্যাটার্জী, আসুন। আপনাদের পদধূলি যে এখানে...

মুখোসধারী অভ্যর্থনা জানায়।

—কিন্তু আমি এ বাড়ির প্রত্যেককে গ্রেপ্তার করব। মিঃ মরিসনের কণ্ঠে তীব্রভাবে ধ্বনিত হয়।

—প্রয়োজন হবে না তার। এ বাড়ির লোক বলতে আপাতত আমি একা। আর পাশের ল্যাবরেটরীতে আর দুজন। তাদের দেখবেন ত আসুন আমার সঙ্গে। ভয় নেই, বাধা দেবো না।

অবাক হন মিঃ মরিসন। দীপকও স্তম্ভিত।

লোকটি বলে—আমি জানি পুলিশবাহিনী বাইরে অপেক্ষা করছে। জানি আপনাদের ইঙ্গিতে সারা বাড়িটা মুহূর্তে বিধ্বস্ত হয়ে যেতে পারে। কিন্তু তার কোন প্রয়োজনই ছিল না।

মিঃ মরিসন ও দীপক অভিভূতের মতো লোকটিকে অনুসরণ করে। দোতলা থেকে একতলায় নেমে আসে ওরা।

একতলার প্রান্তে বড় একটি ঘর। নীল একটি মৃদু আলো ঘরটিকে আলোকিত করে রেখেছে। ঘরের মধ্যে শুধু অজস্র যন্ত্রপাতি। প্রচুর, অজস্র নানাধরণের সব যন্ত্র।

—এগুলো কি তা কি জানেন আপনারা?

মুখোসধারী প্রশ্ন করে।

—না। ওদের কণ্ঠে কৌতূহল।

—আজ পর্যন্ত যা কিছু অপরাধ আমি করেছি, যে বিরাট দলকে সুসংবদ্ধ করে তাদের সাহায্যে কাজ চালিয়েছি, শুধু এই একটি ল্যাবরেটরীর জন্যেই।

কিন্তু তবু আমাকে স্থির থাকতে দেননি আপনারা। ব্যারাকপুর থেকে পালিয়ে টালিগঞ্জে এসে উঠতে হয়েছে আমাকে।

—কিন্তু কেন আপনি এত সব অপরাধ করেছেন? দীপকের কণ্ঠে যেন অভিযোগ ফুটে ওঠে।

—কারণ অবশ্যই ছিল। বিরাট একটা সম্ভাবনার ইঙ্গিত নিয়ে আমি যে সব কাজ সুরু করেছিলাম তাতে সাহায্য করবার মতো ছিল না কেউ। কোনও জীবন্ত মানুষ তার দেহ থেকে স্বেচ্ছায় কতকগুলি অর্গ্যান কেটে দিতে রাজি হতো না। ইচ্ছামতো প্রচুর রক্ত আমি যোগাড় করতে পারতাম না। প্রয়োজন অনুযায়ী টাট্‌কা মৃতদেহই বা কে জোগাবে আমাকে?

—কিন্তু কি আপনার রিসার্চের বিষয়বস্তু?

—সার্জারীর সঙ্গে ইলেকট্রোথেরাপী'র মিলনে যে ধরণের কাজ সুরু করেছিলাম আমি, তা আমাদের দেশে এই প্রথম। আমি চেয়েছিলাম বার্ধক্যকে জয় করতে। প্রকৃতির অমোঘ বিধানকে উল্টে দিতে। আমার অপারেশন আর ইলেকট্রোথেরাপী হয়তো তা পারত..কিন্তু...

—যাদের আপনি অপহরণ করেছেন তারা কোথায়? মিঃ মরিসনের কণ্ঠে প্রশ্ন ফুটে ওঠে।

—তাঁদের দেখবেন আপনারা? তাঁরা আছেন ওপাশের ঘরে।

একটা বোতাম টিপে দিতেই দালানের একটা অংশ ধীরে ধীরে সরে যায়। তার ওপাশে দুটো টেবিলের ওপরে শুয়ে আছে দুটি নারীমূর্তি।

—ওঁরা কে?

—ওঁদের একজন হচ্ছেন অপহৃতা বীণা দেবী আর অন্যজন হচ্ছেন নিরুপমা দেবী, যাঁর ওপর আমি অপারেশন চালাচ্ছিলাম।

—কিন্তু বীণা দেবীকে আপনার কি প্রয়োজন ছিল?

—ওঁর শরীরের কয়েকটা অর্গ্যান নিরুপমা দেবীর দেহে বসানো হয়েছে। এতে অবশ্য বীণা দেবীর কোনও ক্ষতিই হয়নি। শীঘ্রই উনি সুস্থ হয়ে উঠবেন বলে আশা রাখি।

—আপনার অপারেশন তাহলে শেষ হয়েছে? মিঃ মরিসন প্রশ্ন করেন।

—হ্যাঁ, শেষ হয়েছে। আর সামান্য একটা ভুলের জন্যে আমার ভাগ্যে নেমে এসেছে নিদারুণ ব্যর্থতার কালিমা। অপারেশন সাক্সেসফুল হলে নিরুপমা দেবী ফিরে পেতেন দীর্ঘস্থায়ী যৌবন কিন্তু সে সৌভাগ্য হলো না আমার। সামান্য একটা শিরা কেটে যাবার ফলে প্রচুর রক্তক্ষরণে মৃত্যু হয়েছে ওঁর। আমার মতো একজন অপদার্থ সার্জনের এ ধরণের পরীক্ষায় হাত না দিলেই হয়তো...

কথা শেষ হয় না।

মুখোসধারী জামার মধ্য থেকে বের করে লম্বা একটি সিরিঞ্জ।

মৃদু নীল আলোয় চক্চক্ করে ওঠে তার ভেতরের তরল পদার্থটা।

দীপক ছুটে যায় সিরিঞ্জটা কেড়ে নেবার জন্যে।

কিন্তু তার আগেই নিজের বাহুতে সিরিঞ্জটা ফুটিয়ে দেয় লোকটি।

তারপর বসে পড়ে পাশের চেয়ারে।

—আপনাদের আর কষ্ট করতে হলো না দীপকবাবু। নিজের ভুলের প্রায়শ্চিত্ত নিজেই করলাম আমি। গুড্ বাই টু ইউ বোথ্!

একপাশে ঢলে পড়ে মুখোসধারীর দেহ।

মিঃ মরিসন তাঁর হুইশ্লে সজোরে ফুঁ দিলেন।

তীব্র কোলাহল।

পুলিসবাহিনী দলে দলে বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করতে থাকে।

মিঃ মরিসন লোকটির দিকে এগিয়ে যান। সঙ্গে দীপক।

রতনলাল ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে।

তার সঙ্গে চার-পাঁচজন পুলিশ অফিসার।

কে এই মুখোসধারী?

কে চলন্ত ছায়ার দলপতি?

সকলের মুখে কৌতূহলের চিহ্ন।

মিঃ মরিসন মুখোসটা সরিয়ে দেন মুখ থেকে।

চেয়ারে কাৎ হয়ে পড়ে আছে ডাঃ প্রেমনাথ শর্মার দেহটা।

মুখখানা বিষের ক্রিয়ায় সম্পূর্ণ নীল। চোখদুটো মুদ্রিত। মৃত্যুর আর দেরী নেই।

—ডাঃ শর্মা!

সকলের মুখে মিলিত প্রশ্ন।

—আমি আগেই আন্দাজ করেছিলাম। কিন্তু ঠিক যে এতটা তা জানতাম না।

দীপকের স্বরটা ভেজা।

রতনলাল বিমূঢ়।

মিঃ মরিসন নিশ্চুপ।

বাইরে রাতের কালো ছায়া ততক্ষণে প্রগাঢ় হয়ে এসেছে।

—শেষ—

হিংসার অন্ধকার

এক

—গঙ্গাগর্ভে মৃতদেহ—

সংবাদটা সারা কোল্‌কাতা শহরকে তোলপাড় করে তুলেছে।

সকলের মুখে মুখে ফিরছে শুধু একটিমাত্র খবর। রাজনৈতিক বিভেদ, ফুটবল [illegible] লীগের জোর খবর আর সিনেমার আধুনিকতম টুকিটাকি খুচরো সব নিউজ তলিয়ে [illegible] একটিমাত্র খবরের কাছে।

সেদিন শহরের সব কটি খবরের কাগজে বড় বড় শিরোনামা নিয়ে বের হয়েছিল :

দস্যুসর্দার ছত্রপতির অবাধ অভিযান!

কোল্‌কাতার বিশিষ্ট ধনী নিহত

গঙ্গাগর্ভে মৃতদেহ প্রাপ্তির সংবাদ!

গত তিনমাস যাবৎ কোল্‌কাতা শহর এবং সারা পশ্চিমবঙ্গে দস্যুসর্দার ছত্রপতির [illegible] ভয়াল হত্যাতাণ্ডব শুরু হয়েছে তার কিছু কিছু খবব পাঠক-সাধারণ নিশ্চয়ই অবগত আছেন।

ইতিপূর্বে বিগত মে মাসে প্রথম একটি হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয় শ্রীরামপুরে। মৃত ব্যক্তির চোখের মধ্যে একটি পিন্ প্রোথিত ছিল এবং তাতে বড় বড় অক্ষরে লেখা ছিল 'ছত্রপতি' কথাটি। পরে অবশ্য খবর নিয়ে জানা গেল যে ঐ লোকটি উক্ত দস্যুরই দলের লোক। কোনও কারণে দলের কর্তা ছত্রপতির সঙ্গে তাব বিবাদ ঘটে। তারপরেই পাওয়া গেল তার মৃতদেহ।

এই ঘটনার পরে কোল্‌কাতা শহবে আরও দুটি ব্যক্তি নিহত হয় এবং দুটি ক্ষেত্রেই অনুরূপ প্রমাণ থেকে বুঝতে পারা গেল যে সেগুলি দস্যুসর্দার ছত্রপতির কীর্তি।

কিন্তু এই ছত্রপতি কে বা কারা তা আজ পর্যন্ত পুলিসবাহিনী অজস্র পরিশ্রম করেও বের করতে পারল না। এব পর দিন-পনের-কুড়ি আর কোনও ঘটনা ঘটেনি সত্যি, কিন্তু কোল্‌কাতার বিশিষ্ট ধনী জয়নারায়ণ আগরওয়ালার মৃতদেহ গত পরশু বিকেলে গঙ্গাবক্ষে ভাসমান অবস্থায় আবিষ্কৃত হয়েছে।

এবারেও মৃত জয়নারায়ণ আগরওয়ালার চোখে একটি পিন্ ফুটানো ছিল এবং তাতে লেখা ছিল ছত্রপতির নাম।

নানা অনুসন্ধান করে কোল্‌কাতার পুলিসবিভাগ জানতে পেরেছে যে উক্ত মৃত ভদ্রলোকের সঙ্গে দস্যুসর্দার ছত্রপতির নানা গোপন সম্বন্ধ ছিল। কিন্তু এর বেশী এক-পাও অগ্রসর হতে সক্ষম হয়নি কোল্‌কাতাব পুলিস-বিভাগ। দস্যু ছত্রপতি যে কে বা তার দলে কতজন লোক কাজ করে সে সব খবর এখনও অজ্ঞাত রয়ে গেছে।

কিন্তু যদি দস্যু ছত্রপতিকে সত্যিই গ্রেপ্তার করা সম্ভব না হয় এবং যদি সত্যিই দিনের পর দিন তার অত্যাচারের মাত্রা এভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে তবে মহানগরীর সমস্ত লোকের আতঙ্কিত হবার মধ্যে বিস্ময়ের কিছু নেই।

সত্যিই খবরটি আশাতীত চাঞ্চল্য এনেছিল মহানগরীর বুকে। সবার মুখে মুখে ফিরছে দস্যু ছত্রপতির কথা।

কে এই ছত্রপতি?

কি তার পরিচয়?

কেন সে একের পর এক এভাবে নরহত্যা করে মহানগরীর বুকে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে?

লোকের প্রশ্নের বিরাম নেই আর। ধীরে ধীরে ছত্রপতি সম্বন্ধে অদ্ভুত সব গুজব রটতে থাকে। মানুষের মন না-জানা কোনও জিনিস সম্বন্ধে সব সময়েই কল্পনায় নানা অদ্ভুত ধারণা করে বসে।

এক্ষেত্রেও ঘটল ঠিক তাই। দস্যু ছত্রপতি যে অলৌকিক গুণসম্পন্ন—এ কথাই লোকের মুখে মুখে ফিরতে লাগল।

সে নাকি ইচ্ছামত হাওয়ায় ভর দিয়ে বেড়াতে পারে।

তার গতায়াত সর্বত্র।

লোকের মন থেকেও সে নাকি খবর সংগ্রহ করতে পারে। আর সেই অনুসারেই সে কাজ করে থাকে। তার বিপক্ষে যে যায় তাকেই সে হত্যা করে।

কেউ কেউ আবার বলতে লাগল, দস্যু ছত্রপতি সুন্দর ও সুপুরুষ। তার মত রূপবান পুরুষ বড় একটা দেখা যায় না।

অনেকের আবার ধারণা দস্যু ছত্রপতি নাকি নারী। কোথা দিয়ে যে তার আনাগোনা তা কেউ জানে না। শুধু বুঝতে পারা যায় যে কি কি কাজ সে করেছে।

শুধু লোকজনের মুখেই নয়, কোল্‌কাতার সংবাদপত্রগুলিও নানা ধরনের গুজবের ওপর ভিত্তি করে অদ্ভুত সব কথা লিখতে লাগল এই দস্যু ছত্রপতি সম্বন্ধে।

দিনের পর দিন এভাবে বিরক্ত হয়ে ডেপুটি পুলিস কমিশনার মিঃ মরিসন তিনজন ইন্‌ফর্মারকে নিযুক্ত করলেন দস্যু ছত্রপতির খবর বের করবার জন্যে।

দিনের পর দিন কাটতে লাগল। উৎকণ্ঠা আর উত্তেজনার মধ্য দিয়ে মিঃ মরিসনের সময় কাটছিল।

পাঁচ দিন পর হঠাৎ একদিন সকালবেলা একটা বড় পার্শেল এসে হাজির হলো মিঃ মরিসনের নামে।

ওপরে বড় বড় অক্ষরে লেখা ছিল—'গ্লাস্ উইথ্ কেয়ার'।

খুব যত্নের সঙ্গে পার্শেলটি খুলতে আদেশ দিলেন মিঃ মরিসন। সেটি খুললে দেখা গেল তার মধ্যে একজন নিযুক্ত-ইন্‌ফর্মারের কাটা মুণ্ড। স্থানে স্থানে রক্ত শুকিয়ে জমাট বেঁধে আছে। আর তার চোখের উপর পিন্ দিয়ে আটকানো একখানা চিঠি।

চিঠিখানা খুললেন মিঃ মরিসন।

তাতে লেখা :

প্রিয় মিঃ মরিসন,

আশা করি ভবিষ্যতে দস্যু ছত্রপতির বিরুদ্ধে আরও যোগ্য ও কার্যক্ষম লোক নিযুক্ত করবার চেষ্টা করবেন।

আর বেশ ভাল করে মনে রাখবেন দস্যু ছত্রপতির বিরুদ্ধে কাজ করবার একমাত্র শাস্তি হচ্ছে মৃত্যু। ইতি—

ছত্রপতি।

চিঠিখানা পড়ে শেষ করলেন মিঃ মরিসন।

তারপর টেলিফোনটা তুলে নিয়ে প্রেসিডেন্সী জেলের নম্বর চাইলেন কি যেন একটা উদ্দেশ্য নিয়ে।

তাঁর থমথমে মুখের দিকে চেয়ে বোঝা গেল না কি তাঁর উদ্দেশ্য।

সারা পুলিস অফিসে মুহূর্তে রটে গেল কথাটা। সর্বত্র বিস্ময়ের গুঞ্জন।

লালাবাজার থানার ইতিহাসে কখনও এ ধরনের মারাত্মক ঘটনা ঘটেছে বলে শোনা যায়নি।

দুই

—চক্রান্তজালে দীপক চ্যাটার্জী—

বেলা দশটা।

বিখ্যাত প্রাইভেট ডিটেকটিভ দীপক চ্যাটার্জী তার ঘরে বসে কতকগুলি পুরোনো কেসের ডায়েরী বেশ মনোযোগের সঙ্গে পড়ছিল।

বাইরে মোটরগাড়ি থামার শব্দ পাওয়া গেল। একটু পরেই ভারী বুটের শব্দ। ঘরে প্রবেশ করলেন ডেপুটি কমিশনার মিঃ মরিসন।

—সুপ্রভাত মিঃ চ্যাটার্জী!

—সুপ্রভাত মিঃ মরিসন! কি সৌভাগ্য আমার যে আজ এত সকালেই আমার বাড়িতে আপনার পায়ের ধুলো পড়ল!

—বিনয়টা ভাল মিঃ চ্যাটার্জী কিন্তু এটা যেন অতিবিনয়ের লক্ষণ বলে মনে হচ্ছে। জানেন ত একটা প্রবাদ আছে..

কথাটা বলে হো হো করে হেসে উঠলেন মিঃ মরিসন। দীপকও যোগ দিল সেই হাসিতে।

হাস্যকৌতুকের পর্বটা শেষ হলে মিঃ মরিসন বললেন—অত্যন্ত জরুরী প্রয়োজনেই আপনার এখানে আমাকে আসতে হয়েছে দীপকবাবু।

দীপক বলল—কতকটা আগেই আন্দাজ করতে পেরেছিলাম। যাক্ কথাটা এবার খুলে বলবেন আশা করি...

—নিশ্চয়ই মিঃ চ্যাটার্জী। সম্প্রতি কোল্‌কাতা শহরের বুকে দস্যু ছত্রপতির অবাধ অত্যাচারের খবর নিশ্চয়ই সংবাদপত্র পাঠে অবগত হয়েছেন কিন্তু দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টাতেও দস্যু ছত্রপতিকে গ্রেপ্তার করা ত দূরের কথা, সে যে কে তা জানতে পর্যন্ত সক্ষম হয়নি পুলিসবিভাগ। এর ফলে আমাদের দুর্নাম প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি ত পেয়েছেই, ভবিষ্যতেও যে এরূপ ঘটনা ঘটা বন্ধ হবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই।

একটু থেমে মিঃ মরিসন আবার শুরু করলেন—দস্যু ছত্রপতির বিরুদ্ধে সম্প্রতি কয়েকজন ইন্‌ফর্মারকে নিযুক্ত করেছিলাম, কিন্তু সংবাদের জন্যে যখন আমি ব্যাকুল আগ্রহে প্রতীক্ষা করছিলাম, তখন সংবাদের পরিবর্তে একদিন এলো একটা কাটা মানুষের মুণ্ডু। আর সেই মুণ্ডুটিও একজন ইন্‌ফর্মারের! তার সঙ্গে পেলাম দস্যু ছত্রপতির লেখা একটা চিঠি।

—দস্যু ছত্রপতিকে খুঁজে বের করবার জন্যেই কি আপনি আমাকে নিযুক্ত করতে চান নাকি? দীপক প্রশ্ন করে।

—না, ঠিক এভাবে নয় মিঃ চ্যাটার্জী। আপনি জানেন যে দস্যু ছত্রপতিকে খুঁজে বের করবার চেষ্টা আর মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা একই কথা। আমি চাই না সে বিপদের মধ্যে আপনাকে ঠেলে দিতে। তার চেয়ে অনেক বুদ্ধি করে চমৎকার একটি প্ল্যান করেছি আমি। ঠিক সেইমত কাজ করতে হবে আপনাকে। আশা করি এতে আপনার অমত হবে না।

দীপক বলল—বেশ, আপনার প্ল্যানটা আগে শোনা যাক।

মিঃ মরিসন শুরু করলেন—প্রেসিডেন্সী জেলে দস্যু ছত্রপতির একজন লোক আটক আছে। সে যে আসলে ছত্রপতির দলের লোক তা আমাদের জানা ছিল না। একটা ব্যাঙ্কের সিন্দুক খুলে টাকা চুরি করবার সময় ধরা পড়ে লোকটা। কিন্তু সম্প্রতি একটা ঘটনা থেকে জানতে পারলাম যে ও দস্যু ছত্রপতির দলের। ঘটনাটা ঘটেছেও চমৎকার। লোকটার নাম শশধর। সম্প্রতি ওকে মুক্ত করে দেবার জন্যে দস্যু ছত্রপতির তরফ থেকে অজ্ঞাত একজন লোক একটি সেনট্রিকে প্রচুর টাকা ঘুষ দেয়। শশধরকে নাকি ছত্রপতির একান্ত প্রয়োজন।

কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় এই সেনট্রিটি খুব সাধু প্রকৃতির লোক। সে সংবাদটা কর্তৃপক্ষের কাছে জানায় এবং খবরটা গোপনে লালবাজারে জানানো হয়েছে। এখন কথা হচ্ছে এই যে আমি শশধর লোকটাকে দেখেছি। ওর চেহারা হুবহু আপনার মত। তবে ও আপনার মত অতটা বলবান্ নয়। তাতে কিন্তু যায় আসে না। আপনি সামান্য মেক্-আপ নিলেই আপনার সাথে শশধরের কোনও প্রভেদই সাধারণের চোখে ধরা পড়বে না। এই ছদ্মবেশে আপনি প্রেসিডেন্সী জেলে শশধরের সেলে আটক থাকবেন আর তাকে আলিপুর জেলে ট্রান্সফার করা হবে। ইতিমধ্যে আমরা নির্দিষ্ট দিনে এমন ব্যবস্থা করব যে আপনি ওই সেনট্রির সাহায্যে পালিয়ে যাবেন। ছত্রপতির দলের সকলে আপনাকে শশধর বলে মনে করবে। ফলে ওদের সঙ্গে মিশে ধীরে ধীরে আসল কাজের দিকে অগ্রসর হবেন।

দীপক হেসে বলল—প্ল্যানটির আমি সত্যিই প্রশংসা করছি মিঃ মরিসন। কিন্তু এটা সম্পূর্ণ নির্ভর করছে আপনাদের যোগ্যতার ওপর।

—কেন?

—খবরটা যদি সম্পূর্ণ গোপন রাখতে পারেন এবং আমাকে ঠিক বন্দীর মতই রাখবার ব্যবস্থা হয় তবে এ থেকে সার্থকতা আসতে পারে। অবশ্য আমাকেও নিপুণভাবে অভিনয় করতে হবে। কিন্তু তা না হলে, অর্থাৎ ব্যর্থ হলে আমার জীবন সংকটাপন্ন হয়ে পড়বে।

—যথাসম্ভব খবরের গোপনীয়তা পালন করা হবে এবং নির্দিষ্ট সেনট্রি ছাড়া আর কেউ যাতে ব্যাপারটা জানতে পর্যন্ত না পারে সেই চেষ্টাই করতে হবে আমাদের।

—তা হলে সত্যিই এটি একটি কার্যকরী প্ল্যান, মিঃ মরিসন।

—আপনি তা হলে প্রস্তুত?

—অবশ্যই। বিপদকে যে আমি কতটা ভালবাসি তা আপনিই সবচেয়ে বেশী জানেন মিঃ মরিসন।

—উইশ ইউ সাক্সেস্! আপনি তা হলে সবদিক থেকে প্রস্তুত থাকবেন মিঃ চ্যাটার্জী। আজই রাত্রে...

—ধন্যবাদ! দীপক কথাটা শেষ করে মিঃ মরিসনকে বিদায়-সম্ভাষণ জানায়।

সেদিনই গভীর রাত। প্রেসিডেন্সী জেলের একটি সেলের সামনে দেখা গেল কয়েদীর পোশাক পরিধান করে দীপক চ্যাটার্জী আর তার সঙ্গে মিঃ মরিসন এসে দাঁড়ালেন।

রাত তখন বারোটা।

জেলের অন্য কোনও প্রাণীই টের পেলো না বিষয়টা।

কেবল যে সেনট্রি পাহারা দিচ্ছিল, সে তাদের দুজনকে দেখে মিলিটারী ভঙ্গিতে স্যালুট করল।

মিঃ মরিসন বললেন—দরজাটা খোল সেনট্রি।

দরজা খোলা হলো।

শশধরকে তোলা হলো একটি ঢাকা পুলিশ ভ্যানে।

দীপক শশধরের কক্ষে প্রবেশ করতেই দরজা বন্ধ হয়ে গেল। শুভরাত্রি জানিয়ে মিঃ মরিসন বিদায় নিলেন।

পুলিস ভ্যান দূরে অদৃশ্য হয়ে গেল। দীপক ঘরের কোণের বিছানাটায় গা এলিয়ে দিয়ে ভাবতে লাগল, এর পর ঘটনার গতি কোন্ দিকে যাবে।

তিন

—মিস্ অনুশ্রী সেন—

দিনের পর রাত...রাতের পর দিন কেটে যায়।

অফুরন্ত ক্লান্তি আর অবসাদ দীপকের মনে। জেলখানার কারও কাছেই সে নিজের পরিচয় দেয়নি। সাধারণ বন্দীদের মতই তাকে অজস্র পরিশ্রম করতে হচ্ছিল।

তার ওপর আবার জেলখানার কুখাদ্য ভক্ষণ করা তার পক্ষে প্রায় অসহ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে দিনের পর দিন তার শরীর যেন একটু দুর্বল মনে হচ্ছিল।

আকুলভাবে সে প্রতীক্ষা করছিল মুক্তির দিনটির জন্যে।

এমনিভাবেই ন'দিন কেটে গেল।

অবশেষে এলো তার পলায়নের শুভ দিন।

সেদিন সকালেই তাকে কাজের জন্য বাইরে নিয়ে যাওয়া হলো অন্যান্য বন্দীদের সাথে।

খাওয়াদাওয়ার পর কাজের পালা। জেলের এককোণে দাঁড়িয়ে সে কাজ করছিল। তার পাশে ছিল সেই সেনট্রিটি। অন্যান্য বন্দী ও সেনট্রিরা অনেক দূরে।

এভাবে ঘণ্টা দেড়েক কাটল। প্রচণ্ড রোদে দীপকের গা বেয়ে টসটস করে ঘাম ঝরতে লাগল। আকুলভাবে সে এই বিলম্বিত মুহূর্তগুলো শেষ হবার জন্যে প্রতীক্ষা করছিল।

বোঁ-ও-ও-ও..

একটা এরোপ্লেন উড়তে দেখা গেল জেলখানার ঠিক ওপরের আকাশে। সেনট্রি বলল—এইবার হাত তুলুন স্যর...

দীপক মাথার ওপর হাত তুলল।

বুম্ বুম্ বুম্...

পর পর অনেকগুলি স্মোক্ বম্ব ছিটকে এসে পড়ল প্লেনখানা থেকে। ধোঁয়ায় চারদিক অন্ধকার। দৃষ্টিশক্তি ব্যাহত হয়ে যায় ওই প্রচণ্ড ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মধ্যে।

সেনট্রিটি বলল—আমার চোয়ালে একটা ঘুষি মেরে ফেলে রেখে এই ধার দিয়ে সোজা পালিয়ে যান—বাইরে মোটর অপেক্ষা করছে।

বেশী কথা বলতে হলো না।

দুম্ করে একটা প্রচণ্ড ঘুষি গিয়ে পড়ল সেনট্রিটির চোয়ালে।

দম্ দেওয়া লাটিমের মত ঘুরপাক খেয়ে সে সেইখানেই লুটিয়ে পড়ল।

দীপক আর কোনও দিকে ফিরে তাকাবার অবকাশ পেল না। সোজা পালাতে হবে তাকে। নিশ্চিন্তমনে ছুটতে ছুটতে সে জেলের ধারের পাঁচিলটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

সেখানে একটা দড়ির মই ঝোলানো আছে দেখা গেল। দীপক মই বেয়ে পাঁচিলের মাথার উপরে উঠে একলাফে পথে গিয়ে পড়ল।

সামনে অপেক্ষা করছিল একখানি মোটর গাড়ি।

দীপক ছুটে মোটরটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

—আসুন শশধরবাবু! একটি তরুণীর কণ্ঠে ধ্বনিত হলো কথা কয়টি।

দীপক কোনও কথা না বলে গাড়িতে গিয়ে বসল। গাড়ি তখন তীব্রবেগে ছুটতে শুরু করেছে।

পেছনে শোনা গেল জেলখানার পাগলা-ঘণ্টি বাজতে শুরু করেছে—ঢং ঢং ঢং...

দীপক তরুণীটির দিকে চেয়ে বলে উঠল—আমার পোশাক সঙ্গে এনেছেন ত?

তরুণীটি বলল—হ্যাঁ, এই পুঁটলিটার মধ্যে আছে। শীগ্‌গির ছেড়ে ফেলুন।

দীপক জেলখানার জামাটা খুলে একটা ভাল শার্ট গায়ে দিল। তারপর পাজামাটার ওপরেই একটা স্যুট চড়িয়ে যখন বেশভূষা শেষ করল তখন তাকে ভদ্রগোছের একজন অফিসের বড়সাহেব ছাড়া আর কিছু মনে করা সম্ভব নয়।

গাড়ি তখন সজোরে এগিয়ে চলেছে পিচ-ঢালা মসৃণ পথ ধরে।

মেয়েটির দিকে চেয়ে দীপক প্রশ্ন করল—আমরা এখন কোন্ দিকে চলেছি?

মেয়েটি হেসে বলল—দক্ষিণেশ্বরে আমাদের যে আড্ডা আছে আপনাকে এখন সেখানেই নিয়ে যাবার হুকুম আছে শশধরবাবু।

দীপক মেয়েটির দিকে ভাল করে চেয়ে দেখবার অবকাশ পেলো এবার।

মেয়েটি স্বাস্থ্যবতী ও সুন্দরী। চোখ দুটো টানা-টানা। চেহারার মধ্যে বেশ একটা আকর্ষণ আছে। বয়স চব্বিশের কাছাকাছি। মাথায় সিঁদুরের রেখা দেখা যায় না। দীপক বুঝতে পারল মেয়েটি কুমারী।

—আপনি কতদিন এ দলে আছেন তা ত কিছু বললেন না মিস্...

—অনুশ্রী সেন আমার নাম। হাসিমুখে মেয়েটি নিজের পরিচয় দিল। তারপর বলল—আপনি আমাকে না চিনলেও আমি কিন্তু আপনার খ্যাতির কথা অনেক শুনেছি শশধরবাবু।

—তাই নাকি? উৎসাহহীন কণ্ঠে দীপক বলে—তবে আমার সে ইতিহাসও অবশ্য অকলঙ্কিত নয়।

—কিন্তু আপনার সে কলঙ্কই হয়তো আপনার গৌরব শশধরবাবু।

—না, দীপক হেসে বলে—অর্থ উপার্জন আর বেঁচে থাকবার তাগিদে সারা জীবন ধরে অজস্র অন্যায় করে গেলেও তার মধ্যে আমি খুব বেশী গৌরবের কিছু খুঁজে পাই না অনুশ্রী দেবী।

দীপকের স্বরটা গম্ভীর।

অনুশ্রী বলে—এ আলোচনা আপাতত বন্ধ থাক শশধরবাবু। আপনি জানেন আমাদের দলপতি ছত্রপতি এ রকম আলোচনা পছন্দ করবেন না।

—কে ছত্রপতি? দীপক হালকাভাবেই যেন প্রশ্নটা করে বসে।

—সর্বনাশ! মেয়েটি চোখ দুটো বড় বড় করে বলে—আর কখনো ভুল করেও এ ধরনের প্রশ্ন করে বসবেন না। দস্যু ছত্রপতি সম্বন্ধে দলের যে যে লোকের অনাবশ্যক কৌতূহল প্রকাশ পেয়েছিল তাদের সকলকেই মৃত্যুর খাতায় নাম লেখাতে হয়েছে।

—কিন্তু কি তাদের অপরাধ অনুশ্রী দেবী?

—তাঁর অপরাধ বিচার করবার ভার আমাদের নেই। আমরা শুধু তাঁর আদেশ পালন করে যাব।

—কিন্তু তা ঠিকমত না করলেও বা তিনি তা জানতে পারবেন কোন্ পথে?

—তা জানি না। তবে এটুকু জানি যে তিনি সর্বজ্ঞ। সব কিছুই তিনি দেখতে পান, শুনতে পান, জানতে পারেন। হয়তো আপনিই ছত্রপতি। কিংবা হয়তো আমি অথবা গাড়ির ড্রাইভার ঐ রণধীর। সব জায়গায় সব সময় যা কিছু ঘটে সবই থাকে তাঁর নখের ডগায়।

—বুঝলাম। আর ভুল করেও অনাবশ্যক কৌতূহল প্রকাশ করব না অনুশ্রী দেবী! যাক্, এখন দক্ষিণেশ্বরের আড্ডার খবর কিছু বলুন।

অনুশ্রী বলতে শুরু করল—আপনার বন্ধু বিকাশ এখন ওখানেই আছে। বিকাশ, আমি আর ওই রণধীর—মাত্র তিনজন আমরা একত্রে কাজ করছি। আর আছে জয়রাজ আর তার দলবল। জয়রাজ লোকটি যে কিরূপ উগ্রপ্রকৃতির তা ত আপনি আগেই জানতেন।

দীপক বলল—হ্যাঁ, কিছু কিছু মনে আছে বৈকি।

অনুশ্রী বলল—ঐ জয়রাজ সব কাজেই এমন একটা গোলমাল করে বসে যে মাঝে মাঝে বড়ই অসুবিধা হয়। আর ওর দলে চার-পাঁচজন লোক আছে। তাদের সামলানোও ত সহজ কথা নয়। অথচ জয়রাজ প্রতিটি বিষয়েই আমাদের মতের বিপক্ষে যায়। লোকটা যেমন একগুঁয়ে তেমনি রগচটা। কি করে যে কর্তা এখনও ওকে দলে রেখেছেন সেটাই আশ্চর্য!

দীপক প্রশ্ন করল—বিকাশ এখন কেমন আছে? আর তার শরীর...

অনুশ্রী বলল—হ্যাঁ, বিকাশবাবুর সঙ্গে ত আপনার দীর্ঘ তিন বছর দেখাসাক্ষাৎ হয়নি। তিনি আগের চেয়ে সুস্থই আছেন।

দীপক হেসে বলল—যাক্, বহুদিন পরে আবার তার সঙ্গে দেখা হবে বলে আশা করছি।

কথা শেষ হলো না।

রণধীর মোটরের ব্রেক কষল। বলল—দূরে কতকগুলো পুলিস সব গাড়ি আটকে সার্চ করছে। কি করা যাবে...

দীপক ভাল করে দূরের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করল। তারপর সামনে গিয়ে রণধীরকে একপাশে সরিয়ে দিয়ে তার জায়গায় নিজে গিয়ে বসে গাড়ি ড্রাইভ্ করতে লাগল।

জোরে গাড়ি চালিয়ে আসতেই পুলিসবাহিনী হাত তুলে বাধা দিল তাদের।

ব্রেক কষে গাড়ি থামিয়ে দীপক প্রশ্ন করল—ব্যাপার কি স্যার? গাড়িগুলোকে এভাবে দাঁড় করাচ্ছেন কেন?

পুলিস অফিসার বলল—এত জোরে গাড়ি চালিয়ে আসছেন কেন বলবেন কি?

দীপক হাসিমুখে বলল—যা দিনকাল পড়েছে স্যার...এখন গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পারলে বাঁচি!...

—কেন? কি আবার হলো আপনার?

দীপক বলল—এই বনহুগলীর মোড়টা ক্রশ করবার সময় দেখি একটা মোটর সাইকেল

প্রচণ্ড বেগে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল। যে বেগে তারা ছুটে গেল তাতে বুঝতে হবে হয় তারা উন্মাদ না হয় ক্রিমিনাল।

—সে কি? কতক্ষণ স্যর? পুলিস অফিসারের কণ্ঠে আগ্রহ ফুটে উঠল।

—এই কিছুক্ষণ আগে। মিনিট তিন-চার হলো। মোটর সাইকেলের আরোহী ছিল দুজন। তার মধ্যে একজনের চুল যেমন ছোট ছোট করে ছাঁটা তাতে তাকে জেলফেরত আসামী বলে মনে করা উচিত।

—যদি কিছু মনে না করেন একটা অনুরোধ করব আপনাকে।—অফিসারের কণ্ঠে বিনয় ঝরে পড়ল।

—কি অনুরোধ বলুন। সাধ্য থাকলে তা পালন করতে অবশ্যই চেষ্টা করব।

—আপনাদের এই গাড়িতে উঠিয়ে নিয়ে আমাদের ঠিক দক্ষিণেশ্বরে নামিয়ে দেবেন। আমরা থাকব মাত্র দুজন। আর বাকি দল ওই মোড় হয়ে ঘুরে দক্ষিণেশ্বরের দিকে যাবে। যেদিকেই লোকগুলি যাক না কেন আশা করা যায় তাদের অবশ্যই ধরা যাবে।

—বেশ, দীপক বলল—উঠে আসুন গাড়িতে। আপনাদের সাহায্য করা আমার অবশ্য কর্তব্য।

দীপক গাড়িতে স্টার্ট দিল।

চার

—অভিযানের সংকেত—

দক্ষিণেশ্বরের মোড়ে পুলিস অফিসার দুজনকে নামিয়ে দিতেই তারা সহাস্যমুখে প্রীতি-শুভেচ্ছা জানিয়ে বিদায় নিল।

গাড়ির গতি অনেকটা বাড়িয়ে দিয়ে দীপক প্রশ্ন করল—কোন্ ধারে?

অনুশ্রী বলল—বাঁয়ে, শশধরবাবু।

গাড়ি এখন উল্কার বেগে ছুটে চলেছে। দীপকের হাতে পড়ে সে যেন নতুন প্রাণ ফিরে পেয়েছে বলে মনে হয়।

—এত জোরে চালালে যে কোনও মুহূর্তে বিপদ ঘটতে পারে শশধরবাবু। অনুশ্রীর কণ্ঠে উৎকণ্ঠা।

দীপক নিশ্চিন্তমনে গাড়ি চালায়। মিনিট কয়েকের মধ্যে গাড়ি এসে দাঁড়ায় আড্ডার ঠিক সামনে।

অনুশ্রী বলে—সত্যি আপনি চমৎকার ড্রাইভ করেন কিন্তু...

দীপক কথা না বাড়িয়ে বলে—ভেতরে চলুন।

রণধীর সেলাম ঠুকে চলে গেলে দীপক অনুশ্রীর সঙ্গে বাড়িখানার দোতলায় একটি ঘরে গিয়ে বসে।

অনুশ্রী তাকে বিশ্রাম করতে বলে বাইরে বেরিয়ে এসে সামনে দাঁড়িয়ে থাকা একটি হাবাগোবা ধরনের চাকরের দিকে চেয়ে বলে—জল্‌দি বাবুকা খানা আউর এক পেয়ালা কফি লে আও।

চাকরটি দ্রুত অদৃশ্য হয়ে গেলে অনুশ্রী ঘরে ফিরে এসে বলে—আপনি একটু হাত-মুখ ধুয়ে তৈরি হয়ে নিন শশধরবাবু। এক্ষুণি খাবার আসবে।

একটু পরেই খাবার এলো। খাবারের প্লেট শেষ করে কফির পেয়ালায় চুমুক দিয়ে দীপক বলল—সত্যি আপনাদের ব্যবস্থা একেবারে নিখুঁত অনুশ্রী দেবী।

অনুশ্রী হেসে বলে—আমার কর্তব্য ত আমি শেষ করলাম। এবার আপনার ওপর যে কর্তব্যের বোঝা এসে পড়বে তা শেষ করবার দায়িত্ব আপনার।

দীপক প্রশ্ন করতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল একজন দীর্ঘ রোগা চেহারার লোক। ঘরের মধ্যে এসেই দীপকের সঙ্গে করমর্দন করে বলে উঠল,—উঃ, তোমার দেখা যে কোনও দিন পাব তা আমি ধারণা করে উঠতে পারিনি শশধর। নেহাত কর্তার কৃপায়—

দীপক বলে উঠল—তা ছাড়া ভাগ্যও খানিকটা বটে...

লোকটি হেসে উঠে বলল—আমাদের কর্তা ইচ্ছা করলে ভাগ্য তৈরি করতে পারেন, কি বল শশধর?

দীপক মনে মনে চিন্তা করছিল গভীর তন্ময়তার সঙ্গে।

লোকটি শশধরের পরিচিত বন্ধু বলে মনে হচ্ছে। তবে অনেকদিন তাকে দেখেনি তাই ঠিক চিনতে পারেনি। এ তবে কে? এ নিশ্চয়ই সেই বিকাশ—যার সঙ্গে শশধরের তিন বৎসর দেখা হয়নি বলে সে অনুশ্রীর মুখে শুনেছে।

দীপক বলল—কর্তাও ত তোমার আমার মত লোকদের নিয়েই কাজ করে আজ এত বড় হয়েছেন, কি বলো ভাই বিকাশ!

লোকটি হেসে দীপকের পিঠে চাপড়ে মেরে বলল—তা সত্যি, কিন্তু কাজ না করেও ত আমাদের উপায় নেই।

—সে কথা অবশ্যই সত্যি। দীপক বলল।

লোকটি দীপকের গায়ে হাত রেখে বলল—যাই বলো ভাই, জেলখানায় বসে খেয়ে খেয়ে এ ক'বছরে তুমি যথেষ্ট মোটা হয়ে উঠেছ...বোধহয় কাজের ক্ষমতা কমে গেছে তোমার...

—কি বলছেন আপনি বিকাশবাবু! বাধা দিয়ে অনুশ্রী বলল—পথে আসতে উনি পুলিসদের যা একহাত ভেলকি খেলা দেখালেন...

—তাই নাকি, তাই নাকি হে শশধর...বলতে বলতে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল দীর্ঘদেহী, সুপুরুষ, বলিষ্ঠ একজন লোক। তারপর একবার ভ্রূকুটি করে বলল—ওসব মেয়েভুলানো বিদ্যেয় ত ভাই কাজ চলবে না ওস্তাদ, এবার যে আসল কাজের পালা শুরু হবে! এবার বোঝা যাবে তোমার ক্ষ্যামতার দৌড়...

লোকটির কণ্ঠে শ্লেষ। যেন শশধরকে সে নেহাত গ্রাহ্যের মধ্যেই আনতে চায় না।

—আপনার এ ধরনের ব্যবহার আপাতত সংযত রাখা উচিত জয়রাজবাবু, তা ছাড়া এটুকু দেখেই আমি বুঝেছি, আর কিছু হোক না হোক, শশধরবাবু আপনাকে মোটর চালাতে শেখাতে পারেন—অনুশ্রী বলে।

—খুব জমে গেছ দেখছি যে সুন্দরী! বলি, ওহে শশধর, আজ যে কাজের ভার দেওয়া হবে তা যদি পালন করতে না পার ত এই ভোজালিখানা দেখছ ত...বলে উঠল জয়রাজ।

দীপক বিকাশের দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলল—এই অভদ্র লোকটাকে যেতে বলে দাও ত ভাই বিকাশ। যা কিছু কাজের কথা তোমাদের কাছ থেকেই শুনতে চাই।

কুশ্রী হাসিতে স্থানটাকে বিষাক্ত করে দিয়ে জয়রাজ বলে ওঠে—বেশ, এখন যাচ্ছি ওস্তাদ। পরীক্ষা হবে রাতে। তখন যদি বলো যে সিন্দুক খুলতে পারছ না বা পাঁচিল টপকাতে পারছ না ত তোমার টুঁটির ওপরে ভোজালিখানা—

জোরে জোরে পা ফেলে জয়রাজ বেরিয়ে যায়।

—ওর কথা শুনে রাগ করবেন না শশধরবাবু। অনুশ্রী বলে—আজ আপনার ওপর যে কাজের ভার দেওয়া হয়েছে তা দয়া করে করুন। কারণ আজ রাতে যার সিন্দুক থেকে এই তিন লক্ষ টাকার রত্নসম্ভার চুরি করা হবে সে আমার বাবারও শত্রু। এই রাজেন্দ্রপ্রসাদ সিং আর তার অন্য অংশীদার বিনায়ক এই দুজনে মিলে আমার বাবাকে একেবারে পথের ভিখারীতে পরিণত করেছিল। বাবা এইজন্যে শেষজীবনে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হন। আর তার প্রতিশোধ নেবার জন্যে আমি ভদ্রঘরের মেয়ে হয়েও দস্যু ছত্রপতির দলে যোগ দিয়েছি।

বিকাশ বলল—অবশ্য অনুশ্রীর বাবাকে এভাবে প্রতারিত করবার ব্যাপারে রাজেন্দ্রপ্রসাদ সিং-এর খুব বেশী হাত ছিল না। কিন্তু তার জন্য পার্টনার ঐ বিনায়কই যত নষ্টের মূল। যাক্, এখন এই বিনায়ক আর রাজেন্দ্রপ্রসাদ মিলে বর্তমানে গোপনে তিন লক্ষ টাকা দামের জহরত অত্যন্ত অল্প দামে কিনে এনে রাজেন্দ্রপ্রসাদের বাড়িতে রেখেছে। এটা অত্যন্ত গোপনীয় খবর। এই জহরত ইন্‌সিওর করা হয়নি—কারণ ইন্‌সিওর করলেই সাধারণ লোকে ব্যাপারটা জেনে ফেলবে আর এত প্রচুর জহরত বিক্রী হবার জন্যে এদেশে এসেছে এ খবর প্রচারিত হয়ে পড়লেই জহরতের বাজার হুহু করে নেমে যেতে থাকবে।

—তা ত বটেই। দীপক সায় দেয়।—তা হলে ওরা ত খুব সাবধানী লোক বলেই মনে হচ্ছে। বেশ গভীর জলের মাছ।

হো হো করে হেসে উঠে বিকাশ বলে—তা ত বটেই। এখন আসল কথা শোন। কর্তার কাছ থেকে আদেশ এসেছে এই জহরত গোপনে লুঠ করতে হবে। সব কিছুই তৈরি। তোমার প্রয়োজনই এখন সর্বাধিক। বাড়ির চাকরকে টাকা দিয়ে বশীভূত করা হয়েছে। সে একটা জানালা খোলা রাখবে। পাঁচিল টপকে পাইপ বেয়ে সেই জানালার কাছে গিয়ে হাজির হতে হবে তোমাকে। তারপর বড় দরজা খুলে দিলে আমরা সকলে ঘরে ঢুকব।

দীপক বলল—এ আর কঠিন কাজ কি!

বিকাশ বলল—কঠিন নয় তোমার কাছে। যাক্, এর পর ঐ সিন্দুকের তালাটা তোমাকে খুলতে হবে। তালা খোলার জন্যে তুমি যে একধরনের কেমিক্যাল জিনিস তৈরি করতে জানতে তা দিয়েই কাজ সারলে ভাল হয়। কর্তারও তাই আদেশ। বড় তালা আর গা-তালা খুলে সিন্দুকের ভেতর থেকে জহরতগুলো নিয়ে বেরিয়ে আসবো আমরা।

দীপক কলল—বেশ, এবার একটু বিশ্রাম করতে দাও আমাকে। আর বিকেলের খাবারটা একজন চাকরের হাতে পাঠিয়ে দিও।

বিকাশ বেরিয়ে গেল। অনুশ্রী বেরিয়ে যাবার আগে দীপকের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল—পারবেন ত শশধরবাবু?

দীপক বলল—কেন, বিশ্বাসের অভাব ঘটছে নাকি?

অনুশ্রী বলল—না, ওই তিন লাখ টাকার মধ্যে অর্ধেক হবে শয়তান বিনায়কের। যে বিনায়ক আমার বাবাকে...উঃ...

দীপক বলল—তোমার প্রতিহিংসা নেওয়াটা কি অন্য কোনও উপায়েই সম্ভবপর ছিল না অনুশ্রী?

—এ কথা কেন বলছেন?

দীপক বলল—যতদূর জানি, রাজেন্দ্রপ্রসাদের এতে বিশেষ দোষ নেই। তারপর তিনি লোকও ততটা খারাপ নন। কিন্তু এক্ষেত্রে শাস্তিটা গিয়ে পড়বে দুজনের ওপরেই কিনা!

অনুশ্রী হেসে বলল—'অসৎসঙ্গে সর্বনাশ' জানেন ত? বিনায়কের সঙ্গদোষেই আজ ওঁকেও দুঃখ ভোগ করতে হবে।

—তা বটে। দীপক হাই তুলতে তুলতে বলল—এবার একটু ঘুম...কি বলো?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, আর একটি কথাও নয়।

দ্রুত পদক্ষেপে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায় অনুশ্রী।

পাঁচ

—মিঃ মরিসনের তৎপরতা—

অজস্র ভাবনার জট দীপকের মাথার মধ্যে।

এ ক'টা দিন যে স্বপ্ন—যেন একটা মিথ্যা কোনও মুহূর্তস্থায়ী মরীচিকা—নশ্বর বিভ্রান্তি। এর এক বর্ণও সত্য নয়। কোনও দিন এমন কিছু ঘটতে পারে না।

না-ভাবার মধ্যেও বৈচিত্র্যের কিছু নেই।

তার সুদীর্ঘ জীবনের অজস্র অভিজ্ঞতাগুলোর মধ্যে কখনও এরকম একটা কিছু যে ঘটতে পারে কল্পনা করেনি সে।

বিখ্যাত ডিটেকটিভ দীপক আজ একটা দস্যুদলের পক্ষে কাজ করছে। সন্ধ্যার পরই তাকে বের হতে হবে কোনও এক ধনীর সর্বস্ব অপহরণ করবার উদ্দেশ্য নিয়ে। এ থেকে বিরত হবার কোনও উপায় জানা নেই তার। এ তাকে করতেই হবে।

তা ছাড়া শুধু ধনী বললেই শেষ হলো না।

রায় সাহেব রাজেন্দ্রপ্রসাদ সিং একজন অমায়িক, পরোপকারী ভদ্রলোক। দীপকের সঙ্গে তাঁর যথেষ্ট পরিচয় আছে। তা ছাড়া তিনি ছিলেন দীপকের মৃত পিতার বন্ধু।

রাজেন্দ্রপ্রসাদ সিংয়ের মেয়ে শিপ্রাকেও দীপক চেনে। নিষ্পাপ কুসুমের কলির মত সুন্দর মেয়েটি। রায় সাহেবের একমাত্র সন্তান—ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী।

আর সে কিনা চলেছে আজ তাদেরই সর্বনাশ করতে!

কিন্তু উপায় নেই একে অস্বীকার করার।

এ তাকে করতেই হবে। দীর্ঘদিন বিনায়কের মত ধূর্ত শয়তানের সংস্পর্শে থাকবার জন্যে রায় সাহেবের ভাগ্যে যে পাপ সঞ্চিত হয়েছে এ তারই প্রায়শ্চিত্ত। এর দুঃখ ও কষ্ট রায় সাহেবকেও সমভাবেই বহন করতে হবে।

কিন্তু ছত্রপতির কেন রায় সাহেবের ওপর এ আক্রোশ?

আর এ গোপন খবরটিই বা সে জানল কোন্ পথে?

একের পর এক ভাবনাগুলো দীপকের মাথার মধ্যে ঘুরপাক খেতে থাকে।

এত করেও এতক্ষণ পর্যন্ত আসল কাজের ব্যাপারে একপাও এগোতে পারেনি সে।

কে ছত্রপতি? কি তার পরিচয়? কেন তার আদেশ এরা এমন নিঃসংকোচে পালন করে?

সে কি কোনও দিনই এ রহস্য ভেদ করতে পারবে না? সবার চোখের আড়ালে বসে যে শয়তান তার জয়যাত্রার পথে নিঃশঙ্কচিত্তে এগিয়ে চলছে, কি উপায়ে যায় তাকে প্রবলভাবে বাধা দেওয়া? তার ওপর অজ্ঞাতে সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়া?

কিন্তু কে সেই লোক?

বিকাশ...জয়রাজ..রণধীর...অনুশ্রী...হাবাগোবা চাকরটা—সকলের চেহারাই একবার করে তার মনের মধ্যে ভেসে ওঠে।

ওদের মধ্যেই কেউই নয় ত?

কিন্তু সে যেই হোক না কেন, বিরাট কতকগুলো দলকে যে এমনিভাবে একত্র সুসংবদ্ধ করে চালনা করছে তার বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

ধীরে ধীরে কখন যে তন্দ্রার জড়িমা এসে দীপকের চিন্তাসূত্রকে ছিন্ন করে তাকে নিঃশেষে গ্রাস করে ফেলে তা সে জানতেও পারে না।

গাঢ় ঘুম।

ঘুমের ফাঁকেই কয়েক ঘণ্টা কেটে গিয়ে নেমে আসে রাত্রির আঁধার।

দীপকের ঘুম ভাঙে অনুশ্রীর ডাকে।

—খাবারগুলো যে পড়ে নষ্ট হল শশধরবাবু! উঃ, কী ভয়ানক ঘুম বটে আপনার!

দীপক চোখ মেলে তাকায়।

—সত্যি, খুব বেশী ঘুম পেয়েছিল—তা ছাড়া খানিকটা ঘুমিয়ে না নিলে শরীর আব মনটাও তাজা হয় না।

—এখন কিছু খাবেন নাকি?

—না, শুধু এক কাপ কফি। বরং রাস্তায় কোনও একটা রেস্টুরেন্ট থেকে কিছু খেয়ে নিলেই হবে।

কফি খেয়ে বাইরে বেরিয়ে এসে দীপক দেখে বিকাশ আর জয়রাজ প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তাকে অনুগমন করবার জন্যে!

—গাড়ি তৈরি। জয়রাজ কর্কশ স্বরে বলে।

—চলো। দীপক ছোট্ট উত্তর দেয়।

—কিন্তু তোমার তালা খোলবার সেইসব কেমিক্যালগুলো...

—তৈরি আছে আমার কাছে। নিজের চরকায় তেল দিতে শেখো জয়রাজ।

বিশ্রী একটা মুখভঙ্গী করে জয়রাজ এগিয়ে চলে গাড়ির দিকে। দীপক গিয়ে বসে ড্রাইভারের আসনে।

গাড়ি ছুটে চলে।

চল্লিশ...পঞ্চাশ...ষাট...স্পীডোমিটারে কাঁটাটা দোল খায়...

—আস্তে চালাও না হে! জয়রাজ বলে।

—মৃত্যুকে এত ভয়! দীপক রসিকতার সুরে উত্তর দেয়। গাড়ি সমান বেগেই এগিয়ে চলে!

ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড দিয়ে গাড়ি এগিয়ে চলেছে কোল্‌কাতার দিকে।

শ্যামবাজারের মোড়ে এসে দীপক বলে—কটা বাজে হে স্যাঙাৎ?

জয়রাজ বলে—সাড়ে সাতটা।

—মাত্র! দীপক হেসে বলে—বড্ড খিদে পেয়েছে বাপু। কিছু খেয়ে নিলে হতো। ভবানীপুরে পৌঁছতে হবে ত সেই সাড়ে ন'টা নাগাদ।

বিকাশ বলে—বেশ, চলো কাফে ডি মণিকোতে।

জয়রাজ খাবার ব্যাপারে আপত্তি করে না। গাড়ি গিয়ে দাঁড়ায় কর্নওয়'লিশ স্ট্রীটের ওপর বিরাট কাফে ডি মণিকোর সামনে।

হোটেলের ম্যানেজার দীপকের পূর্বপরিচিত। দীপককে দেখে, সে ছুটে এসে প্রশ্ন করে—কি চাই স্যর?

দীপক হেসে বলে—কি স্যাঙাৎ, তিন বছর আগেকার কথা দেখছি এখনও মনে আছে তোমার! দাও দেখি ভাল মোগলাই পরোটা গোটা তিনেক আর ভালো মাংসের কারী তিন ডিস্।

ম্যানেজার বুঝতে পারে কোনও কারণে দীপক নিজের পরিচয় গোপন করতে চায়। তাই কোনও কথা না বলে সে ভেতরে অদৃশ্য হয়।

একটু পরে সে ফিরে এলে দীপক বলে—বলি ভালমত ভাজতে বলেছ ত, না খানিকটা অখাদ্য এনে হাজির করবে?

ম্যানেজার বলে—হ্যাঁ ভালই বলেছি স্যর...

বাধা দিয়ে দীপক বলে—চলো দেখি কি কাণ্ড করছো। তোমরা হয়ত কবেকার বাসী মাংস চালিয়ে দেবে।

ম্যানেজার কিছু বলবার আগেই দীপক তার হাত ধরে হিড়হিড় করে টানতে টানতে ভেতরে নিয়ে যায়।

ঘরের ভেতরে গিয়ে ম্যানেজারের বিবর্ণ মুখের দিকে তাকিয়ে দীপক বলে—ভয় পাবেন না যেন। ওরা দস্যুদলের লোক। আমি পরিচয় গোপন করতে বাধ্য হয়েছি সেইজন্যেই। এক্ষুণি পেছনের দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে যাবো। ওরা যেন এদিকে আসতে না পারে।

ওধারে জয়রাজ আর বিকাশ হাসিমুখে বলাবলি করছিল—শশধর লোকটাকে খুব জব্দ করেছে যা হোক। দেখা যাক, কেমন করে বাসী মাংস ও চালায়। আমাদের কাছে চালাকি চলবে না বাছাধনের।

দীপক পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে সোজা চলে গেল ওধারের একটা প্রাইভেট টেলিফোনের সামনে। দু' আনা পয়সা ফেলে দিয়ে লালবাজার থানার সংযোগ চাইল।

—কাকে চান?

—আমি দীপক চ্যাটার্জী কথা বলছি। মিঃ মরিসনকে এক্ষুণি চাই।

—একটু ধরুন, ডেকে দিচ্ছি এক্ষুণি।

মিঃ মরিসন একটু পরেই এসে সাড়া দেন।

—কি খবর মিঃ চ্যাটার্জী? মিঃ মরিসন প্রশ্ন করেন।

—জরুরী ব্যাপার স্যর। আজই ঘণ্টাখানেক পরে রায় সাহেব রাজেন্দ্রপ্রসাদ সিংয়ের তিন লক্ষ টাকা মূল্যের জহরত লুঠ করা হবে।

—সে কি?

—হ্যাঁ! আর তালা খোলবার উপযুক্ত একটি কেমিক্যাল সলিউসন ঘরের মেঝের ওপর রেখে দেবার ব্যবস্থা করবেন। বাকী ব্যবস্থাটুকু আশা করি...

—বুঝেছি। আর বলতে হবে না মিঃ চ্যাটার্জী। মিঃ মরিসন সংযোগ কেটে দেন।

দীপক চলে আসে সোজা খাবার ঘরে। সেখানে উৎকণ্ঠিতমুখে বিকাশ জিজ্ঞাসা করে—কি রকম রান্না হলো হে শশধর?

দীপক বলে—ব্যাটাদের একটুও ভেজাল চালাতে দিইনি।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ, একেবারে টাটকা মাংস। দেখ না, এই এলো বলে।

একটু পরেই মাংস আর পরোটা এসে হাজির হলো। দীপক দিলদরিয়া ভাবে বলল—আরও দু-একখানা পরোটা নিয়ে এসো না হে বাপু!

জয়রাজ বলল—দামটা তুমি দেবে নাকি হে শশধর?

দীপক হেসে বলে—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।

বিকাশ বলে—তা তোমার দিলটা চিরদিনই এমনই খোলসা, কি বল হে শশধর?

দীপক বলে—এই সামান্য টাকার ব্যাপারে আর তোমাদের সঙ্গে তর্ক করে লাভ কি বল!

ওধারে লালবাজার থেকে মিঃ মরিসনের গাড়ি এসে সোজা থামে রায় সাহেব রাজেন্দ্রপ্রসাদ সিংয়ের বাড়ির সামনে।

কলিং বেল টিপতেই চাকর ছুটে এসে বলে—কাকে চান স্যর?

—এক্ষুণি রায় সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে চাই। বলগে ডেপুটি কমিশনার মিঃ মরিসন এসেছেন।

একটু পরেই রায় সাহেব ছুটে আসেন।

—কি ব্যাপার স্যর?

—ভেতরে চলুন, জরুরী পরামর্শ আছে।

রায় সাহেব অবাক হয়ে ডেপুটি কমিশনার মিঃ মরিসনের অনুগমন করেন।

ভেতরের ঘরে দুজনের মধ্যে কি একটা গোপন পরামর্শ চলতে থাকে।

ছয়

—শশধরের কৃতিত্ব—

খাওয়াদাওয়া শেষ করে খানিকটা গড়ের মাঠের হাওয়া খেয়ে গাড়ি যখন রায় সাহেব রাজেন্দ্রপ্রসাদ সিংয়ের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল তখন রাত ঠিক সাড়ে নটা।

বাড়ি থেকে বেশ একটু দূরে গাড়ি দাঁড় করানো হলো।

দূর থেকে রায় সাহেবের বাড়ির দোতলার ঘরের একটা জানালার দিকে চেয়ে দীপক দেখল সেটা ঠিকই খোলা আছে।

বিকাশ বলল—যাও শশধর, প্রথমে তোমার পালা।

দীপকের মনে চিন্তা। মিঃ মরিসন তার কথামত কাজ করতে সমর্থ হয়েছেন ত! দেখা যাক্...

দীপক পাঁচিলের ওপর উঠে হাত বাড়িয়েই জলের পাইপটা ধরে ফেলল। তারপর পাইপ বেয়ে এত দ্রুত সে জানালার কাছে গিয়ে উপস্থিত হলো যে তার পটুতা দেখে জয়রাজ অবাক হয়ে বলল—আশ্চর্য ক্ষমতা বটে লোকটার!

বিকাশ বলল—চল এবার আমরা ওধার দিয়ে যাই।

ওপাশের দরজা দিয়ে দুজনে ভেতরে প্রবেশ করল।

দীপক তখন মেঝের ওপর মরিসনের রাখা কেমিক্যালের শিশিটা তুলে নিয়ে সিন্দুকের সামনে বসে গভীর মনোযোগ দিয়ে সেটি নিরীক্ষণ করছিল।

ঘরের মধ্যে ঢুকে জয়রাজ পেনসিল টর্চটা জ্বালল। সরু একটি আলোর রেখা গিয়ে পড়ল সিন্দুকটার ওপর।

দীপক তালার ওপর কেমিক্যালটি ঢেলে দিল। মিনিট দুয়েকের মধ্যেই বিরাট তালাটি খুলে গেল। তারপর গা-তালাটা খুলে ভেতরে হাত গলিয়ে দিল।

বিরাট দুটি থলি।

দীপক থলি দুটি টেনে বের করে জয়রাজের সামনে তুলে ধরল।

জয়রাজ বলল— মুখটা খোল।

থলির ভেতরে দামী সব হীর-জহরতের ভিড়। জয়রাজের ঠোঁটে ফুটে উঠল সাফল্যের রেখা। কর্তার তরফ থেকে মোটা বকশিস সুনিশ্চিত। সকলে তক্ষুণি বেরিয়ে গিয়ে গাড়িতে উঠে বসল।

শশধরের কৃতিত্বে বিকাশের সারা মন আনন্দে ভরে উঠল। আর জয়রাজ বিরস মুখে চুপ করে বসে রইল গাড়ির এককোণে।

দস্যুদল বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলে রায় সাহেব রাজেন্দ্রপ্রসাদ সিংয়ের দিকে চেয়ে মিঃ মরিসন বললেন—এবার আমি তাহলে যেতে পারি, কি বলেন রায় সাহেব?

রাজেন্দ্রপ্রসাদ বললেন— আপনার উপকার আমি জীবনে ভুলব না মিঃ মরিসন। কিন্তু এদের গ্রেপ্তার না করে এভাবে ছেড়ে দিলেন কেন?

—এখন এদের ধরলে এদের দলপতি অর্থাৎ ছত্রপতিকে কোনওদিনই গ্রেপ্তার করতে পারব না।

—তা বটে। কিন্তু কে এই ছত্রপতি?

—ছত্রপতি কে তা জানবার জন্যেই আমাদের দলের একজন বিখ্যাত ডিটেকটিভকে ওদের দলে ঢোকানো হয়েছে।

—ও, সেইজন্যেই বুঝি ঐ কেমিক্যালটা ওখানে রেখেছিলেন?

—হ্যাঁ, সেটাও তারই নির্দেশ। কিন্তু এত হীরে-জহরত এভাবে বিনা ইন্‌সিওরে আপনি রেখেছিলেন কেন রায় সাহেব?

—ইন্‌সিওর কোম্পানি থেকে ব্যাপারটা প্রকাশ হয়ে পড়লে বাজারদর কমে যেতে পারে, তাই...

—এটা কি আপনারই চিন্তা অনুসারে কাজ হয়েছিল?

—না, আমার পার্টনার বিনায়কের এই ধারণা, তাই...

—বুঝেছি। আচ্ছা, আজকের মত চলি।

এমন সময় ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল রায় সাহেবের মেয়ে শিপ্রা। তাঁদের দিকে চেয়ে বলল—সব চুরি হয়ে গেছে বাবা। দেখলাম সিন্দুকটা খোলা রয়েছে...

রায় সাহেব বললেন—না মা। চোর এসেছিল কিন্তু...যাক্, সে খবর পরে শুনবে। এখন শুতে যাও।

শিপ্রা মিঃ মরিসনের দিকে একবার তাকিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়।

সাত

—সংঘর্ষ—

দক্ষিণেশ্বরের আড্ডায় গাড়ি এসে পৌঁছয় রাত সাড়ে দশটার সময়।

গাড়ি থেকে নেমে কোনও দিকে তাকায় না দীপক। গম্ভীরমুখে উঠে সোজা চলে যায় নিজের ঘরের দিকে।

বিছানায় শুয়ে টেবিলের ওপর রাখা খবরের কাগজের ওপর চোখ বুলাতে থাকে সে।

একের পর এক চিন্তা এসে আবার আচ্ছন্ন করে তাকে। কালকের খবরের কাগজে নিশ্চয়ই আজকের খবরটা উঠবে। আর আজ নৈশ অভিযানের নেতা ছিল সে স্বয়ং।

মৃদু পদশব্দ।

অনুশ্রী প্রবেশ করে বলল—কাজ ঠিকমত হয়েছে ত?

—হুঁ।

—তালা ঠিক খুলল?

—আমার কাজে কোনও গাফিলতি হবে না কোনও দিন।

—তা জানি। ওরা কোথায়?

—একসঙ্গেই এসেছে। বোধ হয় ওপাশের ঘরে।

কথা শেষ হতেই ঘরে প্রবেশ করল জয়রাজ আর বিকাশ।

দুজনেরই ভাব দেখলে বোঝা যায় তারা যথেষ্ট উত্তেজিত।

জয়রাজ একটা চামড়ার কেস টেবিলের ওপর খুলে বাখে। তার মধ্যে ঝলমল করছিল হীরে-জহরতগুলো।

—কি ব্যাপার? দীপক অবাক বিস্ময়ে প্রশ্ন করে।

—জহরতগুলো সব জাল। জয়রাজ তীব্রকণ্ঠে বলে ওঠে।

—তার মানে? দীপক বলল।

—মানে অত্যন্ত প্রাঞ্জল। নিশ্চয়ই আগে থাকতেই খবর পেয়ে রায় সাহেব ওগুলি সরিয়ে কতকগুলো জাল জহরত...

—ভালভাবে কথা বলতে শেখো জয়রাজ! দীপক বাধা দেয়।

—তার মানে?

—মানে এই যে, আমরা মাত্র এই ক'জন। এ ছাড়া বাইরের আর কেউই ব্যাপারটা জানে না এক কর্তা ছাড়া।

—কর্তা ত আর খবরটা রায় সাহেবকে জানাতে যাবে না! তা হলে নিশ্চয়ই আমাদের কারও কাছ থেকেই খবরটা ফাঁস হয়েছে।

জয়রাজের এ কথায় বাধা দিয়ে বিকাশ বলল—কিন্তু ধূর্ত রায় সাহেবই যে আগে থাকতে সাবধান হয়ে আসল জহরতের বদলে নকল জহরত রাখেনি তার প্রমাণ কি?

দীপক বলল—কতক্ষণ আগে তোমরা জানলে যে এগুলো জাল?

জয়রাজ বলল—এইমাত্র। আমার দলে জহরত সম্বন্ধে জ্ঞান আছে এমন একজন লোক আছে। সেই বলল।

—তার কথায় নিঃসন্দেহ হলে কি করে?

—তাকে আমি যথেষ্ট বিশ্বাস করি। অন্তত তোমাদের চেয়ে অনেক বেশী।

দীপক কি যেন বলতে যাচ্ছিল। বাধা দিয়ে জয়রাজ বলল—যাক, আমি আমার দল নিয়ে চললাম। বুড়ো রায় সাহেব আমাদের ফাঁকি দিয়েছে সত্যি, কিন্তু আজই রাতে আর একবার যদি তার বাড়ির ভিতর হানা দেওয়া হয়, তবে সে জব্দ হতে বাধ্য...

দীপাকের দিকে হিংস্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করে জয়রাজ দ্রুত ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়।

সে বেরিয়ে গেল অনুশ্রী বলে—লোকটা চিরদিনই ওমনি বগচটা থাকল। এর আর পরিবর্তন হলো না দেখছি।

দীপক বলল—রাগের কারণও অবশ্য আছে। আমরা যে এভাবে ফাঁকি পড়ব তা ত ধারণা করতে পারা যায়নি। এতটা খাটুনি ব্যর্থ হলে রাগ হওয়া সম্ভব।

দীপকের কথার কেউ উত্তর দিল না।

বাইরে মোটরের শব্দ শোনা গেল। বিকাশ বলল—জয়রাজ বোধ হয় তার দলবল নিয়ে বেরিয়ে গেল বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু কর্তাকে না জানিয়ে এভাবে কাজ করা উচিত নয়। যদি জহরত না পাওয়া যায় তবে ওকে জবাবদিহি করতে হবে।

অনুশ্রী জানালার কাছে দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে দৃষ্টি মেলে ধরল।

ঘণ্টা দেড়েক পর।

দীপকের তন্দ্রা কেটে গেল।

বাইরে মোটরগাড়ি দাঁড়ানোর শব্দ। দীপক উঠে জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়াল। ঘরের মধ্যে কেউ নেই।

একটু পরে হনহন করে বাড়িতে প্রবেশ করল জয়রাজ। তার দলের দুজন লোক একটা নারীদেহ বহন করে ভেতরে প্রবেশ করল বলে মনে হলো দীপকের।

দীপক নীচে নেমে এলো।

সামনের বড়ো ঘরে উজ্জ্বল আলো জ্বলছে। সেখানে বিকাশ, অনুশ্রী আর রণধীর দাঁড়িয়ে।

জয়রাজ আর তার দলবল প্রবেশ করল। তাদের সঙ্গে বন্দিনী রায় সাহেব রাজেন্দ্রপ্রসাদের মেয়ে শিপ্রা।

—একি? একে আবার আনলেন কেন? অনুশ্রী প্রশ্ন করে।

জয়রাজ তার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে একজন অনুচরের দিকে চেয়ে বলে—একে কোণের ঘরে আটকে রেখে দাও।

তারপর সকলের দিকে চেয়ে বলে—ওকে আমি এনেছি, ওর সব দায়িত্বও আমার। অনাবশ্যক কোনও প্রশ্ন শুনতে ইচ্ছা করি না আমি।

—কিন্তু কর্তার কোনও আদেশ না পেয়ে তুমি ওঁকে আটক করে আনতেও পার না জয়রাজ। দীপক বাধা দেয়।

দুজন লোক ততক্ষণ শিপ্রাকে নিয়ে চলে গেছে। জয়রাজ গম্ভীরভাবে একটা চেয়ারে

বসে একটা সিগারেটে অগ্নিসঞ্চার করে মাথা দোল দোলাতে বলে—হুঁ, কর্তার আদেশ মানবার জন্যে সবাইকেই যে খুব তৎপর দেখছি।

দীপক বলল—আপাতত সেটাই আমাদের দায়িত্ব।

—কে কর্তা? কোথায় কর্তা? যাকে দেখব না, শুনব না, তার আদেশ মেনে চলা আমার ধাতে সয় না। এবার এমন একটা চাল দিলাম যে রায় সাহেব রাজেন্দ্রপ্রসাদ সব হীরে-জহরতগুলো দিতে পথ পাবেন না।

—কথাটা যেন চিরদিন মনে থাকে। অনুশ্রী বলে—পরে আবার প্রাণের ভয়ে বলো না যেন ছত্রপতি আমার মা-বাপ!

—অত প্রাণের ভয় জয়রাজের নেই। নেহাত দরকার ছিল কিছু টাকার তাই ছত্রপতির দলে এসে অগ্রিম মোটা টাকা পেয়ে গেছি। ভয় কাকে বলে তা আর যেই জানুক, জয়রাজের জন্যে ভয় নয়।

দীপক বলল—অত মেজাজ দেখালেই বীরত্ব হয় না হে, বুঝলে!

—কী, বীরত্ব তোমার কাছ থেকে শিখতে হবে নাকি? কোমরের ভোজালিখানায় হাত দিয়ে সে বলে ওঠে।

মুখের হাসি ঠিক রেখে শান্ত কণ্ঠে দীপক বলে—ভোজালি কেন হে, আস্ত রিভলবার হাতে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেও একই উত্তর দিতাম। জহরত খুঁজে না পেয়ে নিরপরাধ একটি মেয়েকে এনে আটকে রাখা বীরত্ব নয়, বুঝলে! বীরত্ব কাকে বলে তা তোমায় এখনও কর্তার কাছে শিখতে হবে।

—মুখ সামলে কথা বলাটা তোমার অভ্যাসের বাইরে দেখতে পাচ্ছি যে! জয়রাজ হুংকার দেয়।

—তোমার ভয়ে অন্তত নয়।

—কি?

চোখের নিমেষে ধারালো ভোজালিটা জয়রাজ দীপককে লক্ষ্য করে নিক্ষেপ করে।

দীপক এর জন্যে প্রস্তুতই ছিল।

সাঁ করে একপাশে সরে গিয়ে দাঁড়াল সে। ভোজালিটা গিয়ে দেয়ালে বিদ্ধ হলো।

জয়রাজ আবার সেটা তুলে নেবার জন্যে অগ্রসর না হয়ে এগিয়ে এসে দীপকের চোয়াল লক্ষ্য করে প্রচণ্ড একটা ঘুষি মারল।

দীপক মাথাটা নীচু করে ঘুষিটা এড়িয়ে গেল। তারপর জয়রাজের হাতখানা ধরে তাকে এমনভাবে ঘুরিয়ে ফেলল যে সে মেঝের এককোণে গিয়ে সজোরে ছিটকে পড়ল।

অনুশ্রী আর বিকাশ দুজনেই খুব খুশী হয়ে দীপকের দিকে তাকিয়ে ছিল।

জয়রাজ বুঝল দীপকের সঙ্গে লড়াই করা তার একার পক্ষে সম্ভব নয়।

দীপকেব দেহে যেমন প্রচণ্ড শক্তি, প্যাঁচের নিপুণ কৌশলগুলোও তেমনি তার জানা আছে।

সে উঠে গায়ের ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। একবার শুধু দীপকের দিকে চেয়ে বিড়বিড় করে বলে—এর উপযুক্ত শিক্ষা শীগ্‌গিরই পাবে। বলেই হনহন করে বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে।

দীপক তার দিকে তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে তাকিয়ে বিকাশের দিকে চেয়ে বলল—ও গেল কোথায় আবার?

বিকাশ বলল—বোধ হয় আড্ডা ছেড়ে চলে যাবে ও।

অনুশ্রী বলল—ওকে চটিয়ে ভাল করলেন না শশধরবাবু। ওর অসাধ্য কাজ পৃথিবীতে নেই।

—আমারও সাধ্য আছে ওকে বাধা দেবার।

একটু পরেই শোনা গেল মোটরের স্টার্ট নেবার শব্দ।

রণধীর ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে বলল—বাবু চলা গিয়া।

দীপক বলল—ওরা সকলেই চলে গেল নাকি?

—হ্যাঁ, জী!

বিকাশ বলল—এবার আমাদের মধ্যেই একজনকে সর্দার ঠিক করে নেওয়া যাক্। নইলে কাজ করার অসুবিধে হতে পারে।

—তা ত বটেই। অনুশ্রী বলে—একজনের মত অনুযায়ী কাজ করাই উচিত নয় কি?

বিকাশ বলে—তুমিই তা হলে আমাদের সর্দার হও শশধর। তুমি ছাড়া যোগ্য লোক আর কে আছে!

দীপক বলল—বেশ, এতে আপত্তি নেই আমার। কিন্তু ওদের দলের ক'জন লোক চলে গেল?

বিকাশ বলল—ওদের দলে লোক ছিল সাতজন।

—হুঁ। অন্যমনস্কভাবে দীপক বলল—আমাদের এখন খানিকটা অসুবিধেয় পড়তে হবে বই কি! কিন্তু কর্তা কি ওর এই অন্যায় কাজের প্রতিবিধান করবেন না?

- হয়ত করবেন। অনুশ্রী বলল—কিন্তু আপাততঃ কি করা যায় আমাদের?

দীপক বলল—প্রথমে দেখে আসি মেয়েটা কেমন আছে, তারপর ব্যবস্থা ঠিক করা যাবে।

কিন্তু কোণের ঘরখানার সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই অবাক হয়ে গেল ওরা ক'জন।

শিপ্রা ঘরে নেই! দরজা খোলা।

শিপ্রাকে তা হলে জয়রাভ সঙ্গে করেই নিয়ে গেছে।

বিকাশ উত্তেজিতভাবে কি যেন বলতে যাচ্ছিল। দীপক তাকে বাধা দিয়ে বলল—যা কিছু ব্যবস্থা তা আমি অবশ্যই করব, বিকাশ। অযথা উত্তেজিত হওয়ার মধ্যে গৌরবের কিছু নেই।

বিকাশ চেয়ে দেখল চিন্তার রেখা ফুটে উঠেছে দীপকের মুখে।

আট

—বিনায়ক শর্মা—

বেলা দশটা।

ঘন ঘন টেলিফোনের আর্তনাদ বিচলিত করে তুলল মিঃ রবিসনকে। রিসিভার তুলেই শুনতে পেলেন রায় সাহেব রাজেন্দ্রপ্রসাদ সিং জরুরী কারণে তাঁকে ডাকছেন।

তক্ষুণি গাড়ি নিয়ে তিনি উপস্থিত হলেন রায় সাহেবের বাড়িতে।

রায় সাহেব সামনেই অপেক্ষা করছিলেন। সারা মুখে তাঁর উদ্বেগের চিহ্ন। বেশভূষা বিস্রস্ত। মাথার চুল অবিন্যস্ত।

মিঃ মরিসনকে দেখেই রায় সাহেব ছুটে গিয়ে তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন—কাল রাতে ওদের গ্রেপ্তার করলে আর আমার এ অবস্থা হতো না মিঃ মরিসন।

—কি ব্যাপার রায় সাহেব?

—দস্যুরা কাল রাতে আবার আমার বাড়িতে হানা দিয়ে শিপ্রা-মাকে জোর করে ধরে নিয়ে গেছে। তারপর আজ সকালে ড্রইংরুমে এই চিঠিটা পড়ে থাকতে দেখি।

—কি লেখা আছে ওতে?

—পড়ে দেখুন।

মিঃ মরিসন পড়তে লাগলেন। ছোট্ট চিঠি ঃ

প্রিয় রায় সাহেব,

আমাদের যে অত সহজে ফাঁকি দেওয়া যায় না তার প্রমাণ আপনি পেলেন। আমরা জানি কিভাবে 'শঠে শাঠ্যং' পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয়। আপনার মেয়ে আমাদের হাতে বন্দিনী। ভয় নেই, আমরা তাঁর কোনই অনিষ্ট করব না। তিন লক্ষ টাকা মূল্যের যে জহরত আপনার কাছে আছে তা আমাদের হাতে অর্পণ করলেই তিনি মুক্তি পাবেন।

আমরা চাই যে তিন দিনের মধ্যে উপরোক্ত জহরত আমাদের হাতে এসে পৌঁছবে। আপনি যদি এই জহরত দিতে ইচ্ছুক হন, তবে আপনার শোবার ঘরের ড্রয়ারে ঐগুলো রেখে দিলেই যথাসময়ে তা আমাদের হস্তগত হবে।

আশা করি পুলিসে খবর দেবেন না। আর দিলেও তাদের ক্ষমতা নেই আমাদের হাত থেকে আপনার মেয়েকে উদ্ধার করে। বরং তাতে ফল হয়ত খারাপ হবে।

ইতি—

দস্যু জয়রাজ।

চিঠিখানা শেষ করে মিঃ মরিসন বললেন— কি করবেন ঠিক করেছেন আপনি?

রায় সাহেব বললেন—সেই ত দুশ্চিন্তার কথা। এই তিন লাখ টাকা দামের জহরত ত আমার একার সম্পত্তি নয়।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ, এর অর্ধেকের অংশীদার হচ্ছেন আমার পার্টনার বিনায়ক শর্মা। আমি যদি সমস্ত জহরত দস্যুদের হাতে প্রদান করি, তবে দেড় লক্ষ টাকা আমাকে তাঁর হাতে তুলে দিতে হবে।

—বুঝেছি। কিন্তু এখন শীগ্‌গির এই সমস্ত জহরত বিক্রি করে ফেলাও ঠিক হবে না।

—তা বুঝছি। কিন্তু আমার পার্টনার সব শুনলে নিশ্চয়ই এই জহরত বিক্রি করে ফেলবার জন্যে চাপ দেবেন।

—আপনি তাঁকে বোঝাবেন যে বাজারদর যাচাই না করে আর এই সমস্ত জহরত বিক্রি করা চলে না।

—তা ত বটেই। কিন্তু আপনি ঠিক কত দিনের মধ্যে আমার মেয়ে শিপ্রাকে মুক্ত করতে পারেন?

—আমার দলের একজন ডিটেকটিভ দস্যু ছত্রপতির দলে আছে। আর এই দস্যু জয়রাজও মনে হয় ছত্রপতির দলেরই একজন। আমার যথেষ্ট বিশ্বাস আছে যে দিন দুয়েকের মধ্যেই....

আপনার কথার ওপর আমার যথেষ্ট আস্থা আছে মিঃ মরিসন। আমি সানন্দে ঘোষণা করছি আমার মেয়েকে উদ্ধার করার সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে দশ হাজার টাকা রিওয়ার্ড দেব।

—রিওয়ার্ডটা আমাকে না দিয়ে ডিটেকটিভ দীপক চ্যাটার্জীকে দেবেন।

—বিখ্যাত ডিটেকটিভ দীপক চ্যাটার্জী?

—হ্যাঁ, তিনিই যথাসময়ে সংবাদ দিয়ে আপনার জহরত রক্ষা করেছিলেন। আমার মনে হয় আপনার মেয়েকেও রক্ষা করতে সক্ষম হবেন তিনি।

—ভগবানকে ধন্যবাদ। তিনি যখন এ ব্যাপারে হাত দিয়েছেন তখন আর কিছুতেই ভয় করি না আমি।

—কিন্তু একটা কথা রায় সাহেব।

—কি কথা বলুন।

—এ সব কথা পৃথিবীর কোনও দ্বিতীয় প্রাণী যেন জানতে না পারে।

—অবশ্যই নয়।

—এমন কি আপনার পার্টনার পর্যন্ত নয়।

—বুঝেছি।

—আচ্ছা এখন চলি রায় সাহেব, দেখি কতদূর সফলতা অর্জন করতে পারি। এই বলে মিঃ মরিসন তাঁর গাড়িতে উঠে বসেন।

সেদিন বিকেলে রায় সাহেবের পার্টনার বিনায়ক শর্মা এসে উপস্থিত হলেন তাঁর বাড়িতে। বেঁটেখাটো ভদ্রলোক। চোখের চাউনিতে বেশ খানিকটা স্বভাব-সুলভ ধূর্ততার চিহ্ন। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি।

—কাল নাকি আপনার বাড়িতে একদল দস্যুর আক্রমণ ঘটেছিল শুনতে পেলাম রায় সাহেব.. বিনা ভূমিকাতেই তিনি আরম্ভ করলেন।

—হ্যাঁ।

—তাদের লক্ষ্য ছিল কোথায়?

—জহরতগুলো লুণ্ঠন করাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। কিন্তু আমি আগেই সাবধান হয়ে সিন্দুকটাতে কতকগুলো নকল জহরত রেখে আসল জহরত অন্যত্র সরিয়ে রেখেছিলাম, তাই তারা সফল হয়নি।

—বাঁচা গেল। অন্য কোনও দুর্ঘটনা ঘটেনি ত?

—তারা শিপ্রা-মাকে জোর করে ধরে নিয়ে গেছে।

—অ্যাঁ! ভ্রূকুঞ্চিত করে বিনায়ক শর্মা বললেন—উদ্দেশ্য?

—এখনও ঠিক জানতে পারিনি।

—শয়তানদের ধরে ডালকুত্তা দিয়ে খাওয়ানো উচিত।

—কিন্তু ধরবেন কেমন করে?

—সে যাক্, এখন ওগুলো তাড়াতাড়ি বিক্রি করা উচিত, কি বলেন?

—তা বটে। উপযুক্ত খদ্দেরের চেষ্টাতেই ত আছি।

—হ্যাঁ, যত তাড়াতাড়ি হয়। কিন্তু আমি ভাবছি রায় সাহেব যে এই জহরতের গোপন খবরটা ফাঁস হলো কেমন করে।

—তা ত আমিও বুঝতে পারছি না।

—যে খবর বাজারে জানাজানি হয়নি, সামান্য একটা দস্যুদল যদি তা আগে থাকতে জেনে ফেলে তবে ত বড়ো বিপদের কথা।

—কিন্তু আমরা দুজন ছাড়া আর কেউই তো খবরটা জানত না।

—আপনি আবার যে মনখোলা লোক! কাকে হয়ত গল্পে গল্পে...

—না, একমাত্র শিপ্রা-মা ছাড়া...

—তবেই হয়েছে! মেয়েদের পেটে কি কথা থাকে নাকি! যাক্, আর যেন ওরকম ভুল করে বসবেন না। আর যত শীগ্‌গির পারেন ওগুলোর ব্যবস্থা করবেন।

বিনায়ক শর্মা চোখের চশমাটা ঠিক করতে করতে উঠে দাঁড়ান।

নয়

—ছত্রপতির চিঠি—

সেদিন ব্রেকফাস্ট টেবিলে তুমুল উত্তেজনা দেখা গেল।

দীপকের হাতে একখানা চিঠি। সেদিনের ডাকে এসেছে। স্পষ্ট অক্ষরে লেখা। সেটা দীপক সকলের চোখের সামনে তুলে ধরল।

তাতে লেখা ঃ

প্রিয় শশধর,

তোমার কাজে আমি সেদিন সন্তুষ্ট হয়েছিলাম। কিন্তু বিশ্বাসঘাতক জয়রাজের জন্যেই তুমি সফল হওনি বলে আমার ধারণা।

যাক্, তাকে শাস্তি দেবার ভার আমি স্বহস্তে গ্রহণ করব। আমার আদেশ না নিয়ে ইচ্ছামত কাজ করার শাস্তি ভোগ করবে সে।

এবার তোমার ওপর যে কাজের ভার দেবো তা যেমন কঠিন তেমনি গুরুত্বপূর্ণ। জয়রাজ বৌবাজারের ..নং বাড়িতে সশস্ত্র অবস্থায় অবস্থান করছে এবং শিপ্রাও ওখানেই বন্দিনী। তোমরা শিপ্রাকে সেখান থেকে ছিনিয়ে আনবে তোমাদের আড্ডায়।

আশা করি তোমরা ক'জনে মিলে ও কাজটা সম্পন্ন করতে পারবে। এর জন্যে তোমরা তিনজন প্রত্যেকে এক হাজার টাকা করে পুরস্কার পাবে। আর তোমাদের দলের অন্যান্যদেরও কিছু কিছু পুরস্কারের ব্যবস্থা করব। প্রীতি ও শুভেচ্ছা জেনো। ইতি—

ছত্রপতি।

চিঠিখানা পড়ে দীপকের দিকে চেয়ে অনুশ্রী বলল—এবার ত স্বীকার করবেন শশধরবাবু, যে আমাদের প্রভু সর্বজ্ঞ।

দীপক হাসিমুখে বলল—তা ত বটেই।

কিন্তু তার মনে তখন অন্য চিন্তা...

সে ভাবছিল, দস্যু ছত্রপতি তা হলে মোটেই সর্বজ্ঞ নয়। দীপক যে খবরটা জানিয়েছে এটা সে বুঝতে পারেনি। তার ধারণা, ওর মূলে রয়েছে জয়রাজ। অবশ্য জয়রাজের পরবর্তী কর্মধারা তারই সূচনা করে।

কিন্তু...

দস্যু ছত্রপতি তবে কে?

ড্রাইভার রণধীর কিংবা বিকাশ নয়ত? না, স্বয়ং রায় সাহেব রাজেন্দ্রপ্রসাদ? না, না, তা মোটেই নয়। ও সব কি আবোল-তাবোল ভাবছে সে।

দীপক বলল—তা হলে আজই সন্ধ্যায় আমি যাচ্ছি সেখানে শিপ্রাকে উদ্ধার করতে।

বিকাশ অবাক হয়ে প্রশ্ন করে—তুমি একা?

দীপক হেসে বলে—হ্যাঁ। তোমরা ইচ্ছে করলে দূরে দাঁড়িয়ে দেখতে পার।

অনুশ্রী বলল—কিন্তু দলের দু'একজন...

দীপক বলল—বেশী লোকে কাজের সুবিধে হয় না, বরং তার উল্টো...

বিকাশ বলে—ভাল করে ভেবে দেখ শশধর।

—খুব স্থির মস্তিষ্কেই আমি কথাটা বলছি।

—বেশ, তোমাকেই যখন দলপতি বলে স্থির করেছি তখন তোমার আদেশ মেনে চলব আমরা। তোমার সঙ্গে গিয়ে দূরে থেকে দেখব আমরা। যদি কোনও বিপদ ঘটে, তখন বরং...

—সাহায্যের চেষ্টা করবে? দরকার হবে না তা। যাক্, গোটাকয়েক জিনিসপত্র প্রয়োজন হতে পারে। সেগুলোর ব্যবস্থা করে আসি। ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যেই আমি ফিরব। খাবার তৈরি রেখো অনুশ্রী।

দীপক দ্রুতপদে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

কতকগুলি আঁকাবাঁকা পথে গাড়িখানাকে ঘুরিয়ে নিয়ে দীপক নিশ্চিন্ত হয় যে কোনও গাড়ি তাকে অনুসরণ করছে না।

তারপর সে সোজা গিয়ে উপস্থিত হয় লালবাজারে।

মিঃ মরিসনের চেম্বার।

—গুড় মর্নিং মিঃ চ্যাটার্জী। কাজের কতদূর?

—এগুচ্ছে...

—কিন্তু এদিকে সব হইচই শুরু হয়ে গেছে যে!

—বুঝেছি। শিপ্রার ব্যাপারে ত?

—হ্যাঁ, কি করা যায় বলুন ত?

—সেই ব্যাপারেই ত আপনার কাছে এসেছি। আজ রাতেই তাকে উদ্ধার করা হবে।

—কি উপায়ে?

দীপক তখন সমস্ত ঘটনা মিঃ মরিসনকে খুলে বলে। অবশেষে বলে—আমি যখন শিপ্রাকে নিয়ে সার্কুলার রোড দিয়ে পালিয়ে আসতে থাকব ঠিক সেই সময় আপনাদের পুলিস-বোঝাই লরী সেখানে অপেক্ষা করবে। একটা মৃদু অ্যাক্সিডেণ্ট ঘটবে সেখানে।

—তারপর?

—তারপর আমি—মানে পলাতক দস্যু শশধর গাড়ি থেকে লাফিয়ে পলায়ন করবে আর আপনারা মেয়েটিকে হাসপাতালে দেবার জন্যে আপনাদের লরীতে তুলে নেবেন। দোষটা আমারও হবে না, আপনাদেরও উদ্ধারকার্য সাধিত হবে।

—কিন্তু আপনি কি একা পারবেন ওই বিরাট দস্যুব্যূহ থেকে মেয়েটিকে উদ্ধার করতে?

—সে ভার সম্পূর্ণ আমার।

—বেশ, আমাদের কাজটুকু সুচারুভাবেই পালনের চেষ্টা হবে মিঃ চ্যাটার্জী।

—ধন্যবাদ!

—কিন্তু ছত্রপতির ব্যাপারে কতদূর এগোলেন?

—সেটা এখনও ঠিক বলতে পারি না। তবে পারব সত্বর...আচ্ছা চলি আজকের মত।

লালবাজার থেকে বেরিয়ে দীপক সোজা এসে উপস্থিত হয় তার বাড়িতে।

বাইরের ঘরেই বসে ছিল তার সহকর্মী ও বন্ধু রতনলাল।

—কিরে, এতদিন পরে কি অশরীরী অবস্থায় নাকি?

ঠাট্টা করে রতন।

—না, কাজের জন্যেই, এবং জ্যান্ত শরীরে।

—কিন্তু তোর ছত্রপতির কত দূর?

—তাকে দিন চারেকের ভেতরেই...

—বেশ, বেশ। এখন কি খবর বল্।

—সময় অল্প। তুই আজ রাত সাড়ে আটটায় ...নং বউবাজার স্ট্রীটের বাড়ির সামনে অপেক্ষা করবি। আমি দোতলার ঘরে যখন থাকব তখন কয়েকটা কাজ তোকে করতে হবে।

—কি কাজ?

—বলছি সব। ওপাশের ঘরে চল্। গোটা চারেক স্মোক্ বম্ব রেডি আছে ত?

—নিশ্চয়ই।

—তবে আর ভাবনা নেই...শোন।

দশ

—স্মোক্ বম্বের কীর্তি—

ঢং ঢং করে আটটা বাজল।

মৌন, স্তব্ধ রাত। নির্জন।

আরও নির্জন বউবাজারের এই অঞ্চলটা।

একখানা গাড়ি এসে থামল বউবাজারের ..নং বাড়িখানার সামনে। গাড়ি থেকে নামল দীপক একা।

দ্রুত পদবিক্ষেপে বাড়িখানার সামনে গিয়ে কড়াটা ধরে সজোরে নাড়া দিল দীপক।

—কে?

দরজায় দাঁড়িয়ে একজন পেশীবহুল দীর্ঘাকার লোক।

—আমি জয়রাজের সঙ্গে দেখা করতে চাই।

—আপনার নাম?

—আমাকে সকলে শশধর বলেই জানে।

—আচ্ছা, একটু দাঁড়ান। আমি জিজ্ঞেস করে আসি।

লোকটি ভিতরে গিয়ে একটু পরে ফিরে এসে বলল—আপনার ভেতরে যেতে অবশ্য ওঁর আপত্তি নেই। কিন্তু তার আগে আপনার সারা শরীর খুব ভাল করে সার্চ করে নিতে হবে।

—তাই নাকি? বেশ, দেখে নাও। কোনও মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রই সঙ্গে আনিনি আমি।

লোকটি দীপকের পকেটগুলি বেশ ভাল করে সার্চ করে দেখে তাকে সঙ্গে করে দোতলার কোণের একটি ঘরের দিকে নিয়ে গেল।

সিঁড়ি দিয়ে ওঠবার সময় দীপক লক্ষ্য করল একতলার একটি ঘর বাইরে থেকে তালাবন্ধ। দীপক বুঝতে পারল, এই ঘরটিতেই নিশ্চয়ই শিপ্রাকে বন্দী করে রাখা হয়েছে।

দোতলায় উঠে কোণের ঘরটির কড়া ধরে নাড়তেই দরজা খুলে গেল।

ঘরের ঠিক মাঝখানে একটি চেয়ারে বসে রয়েছে জয়রাজ। কোমরে তার একটি রিভলবার। টেবিলের ওপর খাপের মধ্যে একটি সুদীর্ঘ ছোরা।

—কি খবর সাঙাৎ? জয়রাজ প্রশ্ন করে।

—তোমার সঙ্গে দেখা করতে এলাম...তোমার কথা ভুলতে পারছিলাম না কিনা তাই...

—ও, বেশ বেশ। তা, উদ্দেশ্যটা কি?

—শিপ্রাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাব বলে মনে করেছি।

—তা, এটা কি আবদার নাকি হে?

—কেন, আমার ক্ষমতার কথা কি তোমার একেবারেই অজ্ঞাত নাকি?

—তাই বলে আমার ঘরে এসে আমাকে শাসানো! বাঃ, বেড়ে দেখছি যে হে সাঙাৎ।

—মুখের কথাকে কাজে পরিণত করতে জানি আমি।

—কি করে করবে তাই দেখাও না...

কথা শেষ হলো না।

অকস্মাৎ শোনা গেল প্রচণ্ড একটা শব্দ...

সারা ঘরখানা যেন থরথর করে কেঁপে উঠল সেই প্রচণ্ড শব্দের তীব্রতায়।

জানালা দিয়ে দুটি সাদা বল এসে পড়েছিল ঘরখানার মধ্যে। সারা ঘরখানা ধোঁয়ার কুণ্ডলীতে আচ্ছন্ন হয়ে গেল। দীপক বুঝল এটি রতনলালের কাজ।

দীপক যেন ঠিক এই মুহূর্তটির জন্যেই প্রতীক্ষা করছিল। একলাফে ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে পড়ল সে।

হতভম্ব জয়রাজ তাকে বাধা দেবার অবকাশমাত্র পেলো না।

ধোঁয়ার কুণ্ডলী সারা বাড়িটাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। দীপক চিৎকার করে উঠল—আগুন! আগুন!

আট-দশজন দস্যু ছুটে গেল দোতলার ঘরখানার দিকে। দীপক সেই অবসরে একতলার সেই বন্ধ ঘরখানার সামনে এসে দাঁড়াল। তারপর দোতলা লক্ষ্য করে পর পর দুটি স্মোক্ বম্ব নিক্ষেপ করল।

দস্যুদের সব ক'জন যখন দোতলার ঘটনা নিয়েই ব্যস্ত সেই ফাঁকে দীপক ঘরের দরজাটা খুলে ফেলল সজোর লাথিতে। ভেতরে গিয়ে দেখল সামনেই শিপ্রা শুয়ে আছে। তার হাত-পা বাঁধা। দীপক তাকে পাঁজাকোল করে নিয়ে একদৌড়ে তার গাড়িতে গিয়ে উঠল।

গাড়িতে উঠে দীপক দেখল রতন তার কথামত কাজ করেছে। সে একটা জানালা দিয়ে দুটি বোমা ফেলে দস্যুদের ছত্রভঙ্গ করে দিচ্ছে। তারা রতনকে নিয়েই অত্যধিক ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

দীপক গাড়িতে উঠে সোজা কিছুটা এগিয়ে গেল। সেখানে একটা পোস্টের আড়ালে

দাঁড়িয়ে অনুশ্রী আর বিকাশ এইসব ঘটনাগুলো লক্ষ্য করছিল। দীপক তাদের গাড়িতে তুলে নিয়ে সজোরে গাড়ি চালিয়ে দিল।

বউবাজার স্ট্রীট...সার্কুলার রোড...শিয়ালদা...গাড়ি সজোরে ছুটে চলল উত্তর কোল্‌কাতার দিকে।

সবে মানিকতলা পেরিয়ে কিছুটা এগিয়ে গেছে এমন সময় দেখা গেল পুলিশ ও মিলিটারী বোঝাই একটি লরী।

দীপক সযত্নে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু লরীখানা বেঁকে এসে দীপকের গাড়ির সঙ্গে ধাক্কা খেলো...প্রচণ্ড সংঘর্ষ..

প্রবল শব্দ...চিৎকার...গণ্ডগোল...

দীপক গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়ে একছুটে পালিয়ে গেল।

পুলিসবাহিনী এসে গাড়িখানা ঘিরে ফেলল। শিপ্রা অচৈতন্য হয়ে পড়েছিল এই আকস্মিক দুর্ঘটনায়।

পুলিস অফিসার তাকে লরীতে তুলে নিলেন হাসপাতালে পৌঁছে দেবার জন্যে।

ওধারে দীপক যে কোন্ দিক দিয়ে পালিয়ে গেল তা বিকাশ বা অনুশ্রী কেউ বুঝতে পারল না।

কিন্তু দীপক ততক্ষণে একটা ট্যাক্সিতে চেপে সেখান থেকে অনেকটা দূরে গিয়ে উপস্থিত হয়েছে। একটা পাবলিক টেলিফোন থেকে সে ফোন করল ঃ হ্যালো মিঃ মরিসন...দীপক চ্যাটার্জী স্পীকিং...অল্‌ওয়েজ তৈরি থাকবেন..দস্যু ছত্রপতিকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করবার ব্যবস্থা করব। এখন আপনার ওপরেই সবকিছু নির্ভর করছে।

এগারো

—শূন্য পথের উদ্দেশ্যে—

পরদিন ভোরে এল আর একখানা চিঠি।

এখানাও ছত্রপতির লেখা ঃ

প্রিয় শশধর,

তোমাদের কাজে খুব খুশী হয়েছি। তোমার কাজের পদ্ধতি হয়েছিল নিখুঁত। বিপদকে তুচ্ছ করে তুমি আমার জন্যে যা করেছ তা সত্যিই অতুলনীয়। কিন্তু সামান্য একটা দুর্ঘটনায় শিপ্রা হাতছাড়া হয়ে গেল। সে দোষ অবশ্য তোমার নয়।

তোমাদের কাজের পুরস্কার এই সঙ্গেই পাঠালাম। তোমরা ঠিকমত ভাগ করে নেবে। আর এই সঙ্গে যে যে কথাগুলো লিখলাম তা হুবহু মেনে চলতে চেষ্টা করবে।

দক্ষিণেশ্বরের আড্ডার ওপর পুলিসের নজর পড়েছে। তাই অবিলম্বে ও বাড়ি ছেড়ে দেবে। তুমি নিজের জন্যে একটি বাড়ি পাবে। বাড়ি ভাড়া হয়ে গেছে। সেটা হচ্ছে...নং ধর্মতলা স্ট্রীট।

অনুশ্রী ভবানীপুরে ...নং রসা রোডে যে ফ্ল্যাটটা ভাড়া নিয়েছে আপাতত সেখানে থাকবে। আর বিকাশ তার দলবল নিয়ে আপাতত ওখানে থাকবে। পরে তাকে পৃথক নির্দেশ পাঠাব।

ড্রাইভার রণধীর তোমার সঙ্গেই থাকবে। সে তোমাকে আজই পৌঁছে দেবে। সে নির্দেশ তাকে দিয়েছি।

আর একটা কথা। আপাতত দু'দিন তোমার ছুটি। সম্পূর্ণ বিশ্রাম। পরে পৃথক্ কাজের নির্দেশ পাবে। ইতি—

ছত্রপতি।

চিঠি পেয়ে দীপক অনুশ্রীকে দেখাল। অনুশ্রীর জন্যে একখানা ট্যাক্সি ডেকে দিয়ে দীপক নিজে গাড়িতে উঠে বসল। রণধীর বসল পেছনে। ধর্মতলায় ফ্ল্যাটটিতে এসে দীপক রণধীরের দিকে চেয়ে বলল—আপাতত তোমার ছুটি। আমারও আজ ছুটি আছে। খানিকটা বিশ্রাম করে নেব। আর এই নাও, প্রভুর দেওয়া ছাড়াও একশো টাকা তোমায় অতিরিক্ত বকশিস দিলাম।

রণধীর সেলাম ঠুকে চলে গেল।

দীপক উঠে গেল ওপরে। সেখানে একজন বাচ্চা চাকর তার জন্যে অপেক্ষা করছিল। সে বলল—বাবু, এইমাত্র আপনার নামে একখানা চিঠি এসেছে।

দীপক অবাক হয়ে দেখল সত্যিই ওপরে তার গুপ্ত নামটি লেখা—শশধর পালিত। দীপক চিঠিটা দেখল।

তাতে লেখা ঃ

প্রিয় শশধর,

তোমাকে বহুভাবে পরীক্ষা করে দেখলাম, তুমিই আমার সবচেয়ে বিশ্বস্ত অনুচর হবার উপযুক্ত। সেইজন্যেই তোমাকে পৃথক্‌ভাবে সরিয়ে আনলাম।

বিরাট একটা কাজের ভার দিচ্ছি তোমার ওপর। জয়রাজের উপরে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করেছি আমি। তার যথাসর্বস্ব গ্রহণ করে তাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেছি আজকেই ভোরে।

আমি সেই সমস্ত অর্থ আর আমার ববাহনগরে ...নং ভিক্টোরিয়া রোডের আড্ডায় যে অর্থ সঞ্চিত আছে সব নিয়ে আজকেই বাইরে কোনও এক স্থানে রেখে আসব।

আমার প্লেন ছাড়বে বিকেল তিনটেয়। তুমি ইতিমধ্যে আমার বরাহনগরের আড্ডায় গিয়ে চিঠিখানা দেখিয়ে সেখান থেকে আমার সঞ্চিত বিপুল অর্থ ও বহুমূল্য সম্পদ নিয়ে আসবে। আজ আড়াইটের মধ্যে অবশ্যই সেই সমস্ত কিছু নিয়ে এরোড্রোমে এসে দেখা করবে।

এর জন্য প্রচুর পুরস্কার দেওয়া হবে তোমাকে। কিন্তু বিফল হলে যে কি দণ্ড আমি দিই তা বোধ হয় তোমার অজানা নয়...

তোমার এই কাজের পুরস্কার হচ্ছে পঞ্চাশ হাজার টাকা।

আর একটা কথা।

একটি মেয়েও আমার সঙ্গে যাচ্ছে। সেজন্যে তোমাকে যদি সঙ্গে নেওয়া প্রয়োজন বোধ করি তবে এরোড্রোমেই জানাব। সেজন্যেও প্রস্তুত থেকো। ইতি—

ছত্রপতি।

আগাগোড়া চিঠিখানার ওপর দিয়ে চোখ বুলিয়ে দীপকের মাথায় যেন আগুন ধরে গেল।

দস্যু ছত্রপতি পালাচ্ছে প্রচুর অর্থসম্পদ নিয়ে। জয়রাজ খুন হয়েছে। ছত্রপতির সঙ্গে যাবে একটি মেয়ে।

উঃ, এতগুলো খবর একসঙ্গে সে আশাই করতে পারেনি। কিন্তু কে এই মেয়ে? অনুশ্রী কি? কিন্তু কেন ছত্রপতি অনুশ্রীকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছে? কে জানে?

দীপক নাওয়া-খাওয়া সেরে বেরিয়ে পড়ল তৎক্ষণাৎ। গাড়িতে উঠে সজোরে চালিয়ে দিল উত্তর কোল্‌কাতার দিকে।

বরাহনগর...

ভিক্টোরিয়া রোডের নির্দিষ্ট ঠিকানায় পৌঁছে দেখল সেটা বাইরে থেকে একটা পোড়ো বাড়ি বলে মনে হয়।

কড়া নাড়তেই বেরিয়ে এলো একটা উড়ে চাকর। প্রশ্ন করল উড়ে ভাষায়, যার বাংলা অর্থ হচ্ছে—কাকে চাই?

দীপক বলল—ছত্রপতি।

একগাল হেসে লোকটি দীপককে ভেতরে নিয়ে গেল। সেখানে একজন বিশালবপু হিন্দুস্থানী সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে দীপকের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল—কি চাই আপনার?

দীপক বলল—বাক্সটা চাই, এক্ষুণি। এই দেখুন চিঠি।

চিঠির উপরে ছিল একটা নম্বর। সেটা আর নীচের নামটা দেখেই লোকটি বলল—এই ঘরে আসুন।

অন্ধকার ঘুপটি ঘরে রাখা ছিল একটা কালো ট্রাঙ্ক ভারী। কে জানত যে এই ভাঙা বাড়ির অন্ধকার গর্ভে এইসব বহুমূল্য জিনিসপত্রাদি রক্ষিত আছে।

ধরাধরি করে ট্রাঙ্কটি গাড়িতে তুলে দীপক গাড়ি চালিয়ে দিল ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড ধরে।

দীপকের মাথার মধ্যে অজস্র প্রশ্ন। এবার কি করে মিঃ মরিসনকে খবব দেওয়া যায়!

দীপক পেছনে চেয়ে দেখল। একটা হলদে বঙের ছোট হিন্দুস্থান গাড়ি তাকে অনুসরণ করছে। নিশ্চয়ই ছত্রপতির লোক। ওর চোখের আড়াল হতে না পারলে...

হঠাৎ দীপকের মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। পেছনের গাড়িতে লোক মাত্র একজন।

একটা ছোট্ট মোড়ের বাঁকে গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়েই দীপক ব্রেক কষে দিল। তারপর গাড়ি থেকে নেমে মোড়ে দাঁড়িয়ে রইল সে।

পেছনের গাড়িটা যেই মোড় ফিরেছে স্পীড কমিয়ে, তৎক্ষণাৎ দীপক গাড়ির পাদানির ওপর লাফিয়ে উঠে একটা রিভলবার লোকটার বুকের ওপর উঁচিয়ে ধরে বলল—নেমে এস শয়তান!

লোকটি নেমে আসতেই দীপক চিৎকার করে বলল—শয়তান, পুলিস ইনফর্মার, চালাকি পেয়েছ! দীপক তার চোয়ালে মাবল প্রচণ্ড ঘুষি। লোকটি ঘুষি খেয়ে পড়ে গেল ছিটকে। দীপক গাড়িতে উঠে স্টার্ট দিল।

তীব্রবেগে এগিয়ে চলল দীপকেব গাড়ি।

ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড...চিড়িয়া মোড়....দমদমের দিকে গাড়ির মোড় ফিরিয়ে দীপক ভাল করে দেখে নিল কেউ তাকে অনুসরণ করছে কিনা।

না, আর কেউ তাকে 'ফলো' করেনি।

রাস্তার ধারে দীপকের এক বন্ধুর বাড়ি। গাড়ি থামিয়ে নেমে পড়ল দীপক। ছুটে গিয়ে সংক্ষেপে বন্ধুকে সব কথা খুলে বলে টেলিফোন করল লালবাজারে।

ডেপুটি কমিশনার মিঃ মরিসন বললেন—ধন্যবাদ। এক্ষুণি যাচ্ছি। তিনটের আগেই পৌঁছবে।

দীপকের গাড়ি ছুটে চলল আবার নতুন উদ্যমে।

বারো

—ছত্রপতি কে?—

দমদম এরোড্রোম।

দীপকের গাড়ি এসে দাঁড়াল।

এরোড্রোমের চীফ অফিসারের কাছে গিয়ে দীপক প্রশ্ন করল—আজ কোনও স্পেশাল প্লেন তিনটের সময় রওনা হবার কথা আছে কি?

চীফ হেসে বললেন—হ্যাঁ, জয়নগরের মহারাজা শার্দুল সিং একটা চার্টার্ড প্লেনে যাচ্ছেন রেঙ্গুনে। প্লেন ঠিক তিনটেয় ছাড়বে।

দীপক বলল—ধন্যবাদ।

দুজন কুলি ধরাধরি করে বাক্সটা নিয়ে গিয়ে প্লেনে তোলার জন্যে প্রস্তুত হলো।

পৌনে তিনটে।

জয়নগরের মহারাজা এসে উপস্থিত হলেন। চোখে মোটা কালো চশমা। মুখে গালপাট্টা ও দাড়ি। মাথায় পাগড়ি। পরনে স্যুট।

ইনিই ছত্রপতি! দীপক মনে মনে বুঝতে পাবল। দীপক বলল—এসেছি স্যার!

—কোথায়?

—এই যে আপনার ট্রাঙ্ক। আমাকে সঙ্গে যেতে হবে নাকি?

—হ্যাঁ।

দীপক চারদিকে তাকিয়ে দেখল। কোন মেয়েকেই দেখা গেল না। তবে কি এটা মিথ্যা ধাপ্পা?

দীপক প্রশ্ন করল—অন্য লাগেজগুলো কি তোলা হয়েছে সব?

—হ্যাঁ।

দীপক ভাবল—তবে কি সেই সব জিনিসের মধ্যে কোথাও সেই নারীকে বন্দিনী করে রাখা হয়েছে? কে জানে?

দূরে দেখা গেল দুটি পুলিস লরি। আর্মড্ পুলিস বোঝাই। সামনের জীপে বসে বোধ হয় মিঃ মরিসন।

মিঃ মরিসন গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়ে ছুটে আসছিলেন।

পুলিসবাহিনী দেখে জয়নগরের মহারাজা চঞ্চল হয়ে উঠলেন। পাইলটের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলেন—এক্ষুণি রওনা হবার কোনও বাধা নেই ত?

—না স্যব।

—ওঠো হে। দীপকের দিকে চেয়ে আদেশ করলেন তিনি।

কিন্তু এ কি? এটা কি স্বপ্ন, না সত্য?

শশধরের হাতে বিভলবার কেন? জয়নগরের মহারাজা কি স্বপ্ন দেখছিলেন?

—মাথার ওপর হাত তোলো দস্যু ছত্রপতি...এক মুহূর্ত বিলম্ব করলেই তোমাকে কুকুরের মত গুলি করে মারব...

সদলে ছুটে আসছেন মিঃ মরিসন এদিকেই .

—তুমি.. তুমি শশধর...

দীপক হেসে উঠল সশব্দে। প্রচণ্ড অট্টহাসি। হ্যাঁ, আমি শশধর.. মানে দীপক চ্যাটার্জী।

মাথার পরচুলা খসিয়ে ফেলল দীপক। মুখের লম্বা গোঁফ খুলে ফেলল। নাকের নীচের বড়ো আঁচিলটা অদৃশ্য হলো...

—হাত তোলো ছত্রপতি। মিঃ মরিসন হাঁক দিলেন। জয়নগরের মহারাজা ওরফে ছত্রপতি হাত তুলল। মিঃ মরিসন ছুটে গিয়ে হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিলেন।

দীপক এগিয়ে গিয়ে মুখের দাড়ি গালপাট্টা আর পাগড়ি খুলে ফেলল।

—একি! এ যে দেখছি রায় সাহেব রাজেন্দ্রপ্রসাদ সিংয়ের পার্টনার বিনায়ক শর্মা!

—হ্যাঁ, দীপক বলল—প্লেনের ভেতর বড়ো একটা বাক্সে বোধ হয় অনুশ্রী বন্দিনী আছে। তার বাবার সর্বনাশ করেছে এই শয়তান। আবার বিনায়ককেই জব্দ করবে এইরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাকে নিজের দলে টেনে নিয়েছে। এইবার তাকে নিয়ে পালিয়ে বর্মায় যাচ্ছিল কি উদ্দেশ্যে কে জানে! আর এই সব সম্পদ তারই বাবাকে ঠকিয়ে ঐ শয়তান অধিকার করেছে!

আর রায় সাহেবের পার্টনার সেজে তাঁরই তিন লক্ষ টাকা মূল্যের জহরত আত্মসাৎ করার চেষ্টা হচ্ছিল। এর মত শয়তান পৃথিবীতে আর দুটি আছে বলে জানা নেই আমার।

বন্দিনী অনুশ্রীকে তক্ষুণি বড়ো একটা কাঠের বাক্স থেকে উদ্ধার করা হলো। ক্লোরোফর্মের ক্রিয়ায় সে তখন সম্পূর্ণ অজ্ঞান।

তিন দিন পর।

অনুশ্রীর আমন্ত্রণে দীপক আর রতন সেদিন তার বাড়িতে গিয়েছিল। খাবার শেষে দীপক যখন বেরিয়ে আসবে তখন অনুশ্রী হঠাৎ গড হয়ে তাকে প্রণাম করে বলল—ছোট বোন হয়ত আপনার মনে কারণে-অকারণে অনেক কষ্ট দিয়েছে। সেজন্যে কিছু মনে করবেন না দাদা।

দীপক হেসে বলল—মানুষের ভুলকে আমি ক্ষমা করতে জানি অনুশ্রী। আগামী জীবনে আশা করি সুখী হবে। মিথ্যাকে চিনে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করবে সব সময়।

অনুশ্রী হাসল। পাণ্ডুর হাসি।

ধীরে ধীরে দীপক বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে।

অনুশ্রী দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তার দু'চোখে অশ্রুর রেখা।

পাশের মন্দিরে ধ্বনিত হলো সান্ধ্য ঘণ্টাধ্বনি। মালিন্যকে এড়িয়ে পৃথিবীর সব কিছু মাঙ্গল্যের প্রতি ভগবানের আশীর্বাণী যেন।

—শেষ—

অব্যর্থ সন্ধান

এক

—মুণ্ডহীন মৃতদেহ—

রাত গভীর।

দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টার পর জটিল একটা কেসের সমাধান করতে সক্ষম হয়ে ডিটেকটিভ দীপক চ্যাটার্জীর মনটা ছিল হাল্‌কা। ভবানীপুরে তার নিজের বাড়ির দোতলার একখানা ঘরে পালঙ্কের ওপর নিশ্চিন্ত আরামে নিদ্রাভিভূত হয়ে পড়েছিল সে।

হাল্‌কা হাওয়া বইছিল পূবের জানালা দিয়ে।

চাঁদের রূপোলি আলো ঘরের মেঝের ওপর এসে পড়ে অপূর্ব সৌন্দর্যের সৃষ্টি করছিল।

ক্রিং ক্রিং ক্রিং...

টেলিফোন বাজছিল ঘন ঘন।

ঘুম ভেঙে গেল দীপকের। বিছানা থেকে উঠে ছুটে গেল টেলিফোনের কাছে।

দূরের কোনও একটা পেটা-ঘড়ি জানিয়ে দিল রাত তিনটে বাজে। এত রাতে আবার তাকে বিরক্ত করছে কে!

রিসিভারটা তুলে নিল দীপক।

—হ্যালো, কে?

—আমি পুলিশ ইনস্পেকটর মিঃ স্যানিয়েল কথা বলছি। আপনি?

—আমি ডিটেকটিভ দীপক চ্যাটার্জী।

—ধন্যবাদ। আমি ফোন করছি বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর সিংহের বাড়ি থেকে।

—কি ব্যাপার মিঃ স্যানিয়েল?

—মারাত্মক ঘটনা ঘটে গেছে! বীভৎস ঘটনা! মিঃ সিংহের সাথে আপনার পরিচয় আছে শুনতে পেলাম। তিনি আপনার সাহায্য চান এই ব্যাপারে।

—কিন্তু ঘটনাটা কি ধরণের?

—মাপ করবেন। টেলিফোনে এ সম্বন্ধে কিছু বলা সম্ভব নয়।

—ধন্যবাদ। এক্ষুণি আসছি।

দীপক উঠে দাঁড়ায়।

নিচের ঘরে নেমে এসে নাইট্ ড্রেস ছেড়ে বের হবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিল দীপক। এমন সময় দেখা গেল হাসিমুখে প্রবেশ করল দীপকের সহকর্মী রতনলাল।

—কি রে, এত রাতে বিছানা ছেড়ে উঠে এলি যে? দীপক প্রশ্ন করে।

—টেলিফোনটা শুনতে পেয়েছিলাম! কিন্তু একা একা যে চুপি চুপি পালিয়ে যাবে তা হচ্ছে না বাছাধন! আমিও সঙ্গে যাব।

—বেশ, বেশ। তা হলে তাড়াতাড়ি নে।

পনর মিনিটের মধ্যে প্রস্তুত হয়ে দুজনে মোটরে উঠে বসল। গাড়ি ছুটে চলল শ্যামবাজারের দিকে।

নিউ শ্যামবাজার স্ট্রীটের উপর মিঃ বীরেন্দ্র সিংহের বাড়ি।

দীপক পৌঁছেই গাড়ি হতে নেমে দেখে ইন্‌স্পেক্টর স্যানিয়েল উদ্বিগ্নমুখে তার জন্যে অপেক্ষা করছেন।

—কি ব্যাপার মিঃ স্যানিয়েল? দীপক প্রশ্ন করে।

—আমার চাকরীজীবনে কখনও এমন ভয়াবহ ঘটনা ঘটতে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। দোতলার ওই ঘরে—

—কি বলছেন আপনি?

—ঠিক বলছি। ওখানে গেলে আপনিও দেখতে পাবেন সে দৃশ্য।

—কিন্তু আপনি?

—বার বার ঐ দৃশ্য দেখতে আমাকে অনুরোধ করবেন না মিঃ চ্যাটার্জী।

দীপক কথা বাড়ায় না।

সোজা চলে যায় দোতলার নির্দিষ্ট ঘরখানার দিকে। বাইরে থেকে দরজাটা ভেজানো। ধাক্কা দিতেই খুলে যায়।

ঘরের মধ্যে পা দিয়ে দীপকের মুখে কথা সরে না।

বিশ্রী, ভয়াবহ দৃশ্য! বীভৎস!

ঘরের মেঝের ওপর পড়ে আছে একটি মৃতদেহের কতকগুলি টুকরো টুকরো অংশ। হাত, পা, বুক পৃথক পৃথক ভাবে কাটা। সারা ঘরে ছড়ানো মৃতদেহের মুণ্ডের কোনও সন্ধান পাওয়া যায় না।

—এটা কি কসাইখানা নাকি? মুখখানা ফিরিয়ে নিয়ে রতন বলে।

—উঃ, মানুষ যে কি করে এতবড়ো পশুর স্তরে নেমে আসতে পারে...দীপক কথা শেষ করে না।

—সত্যি। চল বেরিয়ে পড়ি।

—এক মিনিট।

দীপক মনোযোগ দিয়ে মিনিট দুয়েক কি যেন দেখে। তারপর নোটবুকে কয়েকটি কথা টুকে নিয়ে বলে—চল যাই—

দুজনে নিচে নেমে আসে।

সিঁড়ির নিচেই ইন্‌স্পেক্টর স্যানিয়েল দাঁড়িয়ে ছিলেন।

—কতদূর এগোলেন মিঃ চ্যাটার্জী?

—বিশেষ কিছু না।

—তাই বলুন! গর্বে যেন ফেটে পড়তে চাইলেন মিঃ স্যানিয়েল।—আমি তাই বলি, দীপকবাবু এমন কিছু দেবতা নন। অথচ বৈজ্ঞানিক মিঃ সিংহ বলছেন আপনি ছাড়া আর কেউ যেন এ কেসের ভার না নেয়। তাই মৃতদেহ আগে আপনাকে দেখানো হলো। তারপর পুলিশের সার্জনকে দেখানো হবে।

—আমার প্রতি দেখছি এঁর যথেষ্ট বিশ্বাস আছে। দীপক গম্ভীরভাবে বলে।

—তা ত দেখতেই পাচ্ছি।

—কিন্তু এ মৃতদেহটি কার?

—ওটা হচ্ছে বৈজ্ঞানিক মিঃ সিংহের ছেলে অরুণ সিংহের শয়নকক্ষ।

—বুঝলাম।

—শেষরাতে ঘরের মধ্যে কতকগুলি অস্বাভাবিক শব্দ শুনে মিঃ সিংহের ঘুম ভেঙে যায়। উনি শুতেন পাশের ঘরে। ঘুম থেকে উঠে দরজা খুলে এসে এ ঘরে কাউকে দেখতে পান না। শুধু এই দেহের টুকরোগুলো...

—হুঁ। গম্ভীরভাবে দীপক ঘাড় নাড়ে।

—আপনি কি মিঃ সিংহের সাথে একবার দেখা করবেন? উনি ড্রইংরুমে উদ্বিগ্নভাবে অপেক্ষা করছেন। অরুণ সিংহ ওঁর একমাত্র ছেলে। তার এই অকালমৃত্যুতে সহানুভূতি জানাবার ভাষা আমার নেই।

—থামুন! দীপক বাধা দেয়।—সহানুভূতি জানাবার জন্যে পুলিশবিভাগে আপনি চাকরী নেননি নিশ্চয়ই!

—তার মানে? আপনি একি কথা বলছেন?

—ঠিকই বলছি মিঃ স্যানিয়েল। আমার সঙ্গে মিঃ সিংহের ঘরে আসলেই বুঝতে পারবেন আমার কথার উদ্দেশ্য কি।

—বেশ, চলুন।

মিঃ স্যানিয়েল অনুগমন করেন।

দীপক ও রতন প্রবেশ করে মিঃ সিংহের ড্রইংরুমে।

মিঃ সিংহের দিকে তাকালে মনে হয়, কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তাঁর আয়ু যেন বিশ বছর কমে গেছে।

মিঃ সিংহ—দীপক ভদ্রভাবে নমস্কার না করে প্রথমেই কথা আরম্ভ করে—আপনি কাল রাতে শুতে যাবার সময় কি অরুণবাবুর সঙ্গে দেখা করে গিয়েছিলেন?

—হ্যাঁ, কাল রাত দশটার সময় তার সঙ্গে কয়েকটা জরুরী বিষয়ে কথা হয়েছিল...ব্যবসা সংক্রান্ত...

—বুঝেছি। তা হলে জেনে রাখুন এ মৃতদেহটি আপনার ছেলের নয়!

—সে কি! মিঃ সিংহের মুখে বিস্ময়।—অরুণ তা হলে বেঁচে আছে? আমার অরুণ...

—হ্যাঁ, মিঃ সিংহ। দুর্বৃত্তদল দু'দিন আগে নিহত কোনও একটি মৃতদেহ ওঁর ঘরে রেখে ওঁকে অপহরণ করে নিয়ে গেছে। কারণ এই যে খণ্ডবিখণ্ড দেহটি ওঘরে আছে সেটা দু'দিন আগে নিহত কোন মানুষের দেহ।

—আশ্চর্য ব্যাপার! মিঃ স্যানিয়েল কথার জের টানলেন।

—আশ্চর্যের কিছুই নয় মিঃ স্যানিয়েল। চোখ ও মন একটু খোলা রাখতে শিখলে আপনিও হয়ত এটা আবিষ্কার করতে সক্ষম হতেন।

—কিন্তু ওদের উদ্দেশ্য কি? ওরা কারা? কেন ওরা অরুণকে এভাবে অপহরণ করবে? একসঙ্গে এতগুলো প্রশ্ন করে বসলেন মিঃ সিংহ।

দীপক বললে—অতদূর পর্যন্ত আমি এগোতে পারিনি মিঃ সিংহ। তবে যতটা জেনেছি তা হচ্ছে এই যে কোনও বিশেষ জরুরী অথবা প্রয়োজনীয় ব্যাপারে ওরা আপনার ছেলেকে চুরি করে নিয়ে গেছে। তাঁর ঘরে ওই বীভৎস মুণ্ডহীন দেহটা ফেলে রেখে গেছে পুলিশকে ধোঁকা দেবার উদ্দেশ্যে।

—বুঝলাম।

মিঃ সিংহ যেন নবজীবন লাভ করলেন।—আপনাকে ধন্যবাদ দেবার ভাষা আমার জানা নেই মিঃ চ্যাটার্জী।

—ধন্যবাদ দেবার জন্যে এখন ব্যস্ত না হলেও চলবে। শুধু গোটাদুয়েক প্রশ্নের উত্তর দিন।

—বলুন।

—আপনার ছেলের এমন কোনও গুণ ছিল কি যে তাকে কেউ চুরি করে নিয়ে গিয়ে কোনও কাজে 'ইউটিলাইজ্' করতে পারে?

—সম্প্রতি সে বিলেত থেকে উন্নত ধরণের ছাপা এবং ওই ধরণের বিভিন্ন মেসিনারীর বিষয়ে জ্ঞান সংগ্রহ করে ফিরে এসেছে। অফসেট্, লিথো এবং অন্যান্য জটিল ছাপা সংক্রান্ত ফাইন কাজগুলি সম্বন্ধে সে একজন অথরিটি বলে সহজেই নিজেকে প্রচার করতে পারে। এ বিষয়ে সে ডিপ্লোমা পেয়েছে এবং এগুলি সম্বন্ধে তার মত নিখুঁত জ্ঞান এদেশে এখন পর্যন্ত কেউ সংগ্রহ করতে পারেনি। উন্নত ধরণের যা কিছু আধুনিক যন্ত্রপাতি তার সমবায়ে একটি বৃহৎ ছাপাখানা খুলবার জন্যে সে সম্প্রতি চেষ্টা করছিল। এ ধরণের প্রেস আমাদের দেশে নেই। আমি তাকে এজন্যে দশ লাখ টাকা ফাইনান্স করব বলে স্থিরও করেছিলাম—কিন্তু...

একসঙ্গে এতগুলো কথা বলে কিছুক্ষণের জন্য থামলেন মিঃ সিংহ।

দীপক বলল—একটা দিক খানিকটা স্বচ্ছ হয়ে এসেছে মিঃ সিংহ। এ সম্বন্ধে অন্যান্য অনেক কথা আছে। অবশ্য সেগুলো পরে হবে। মিঃ স্যানিয়েল, আপনি এখন পুলিশ সার্জনকে মৃতদেহটা পরীক্ষা করবার অনুমতি দিতে পারেন। আর মিঃ সিংহ, আপনার ছেলের যদি রিসেণ্ট কোনও ছবি থাকে তবে তা দেখালে যথেষ্ট সুবিধা হবে।

মিঃ স্যানিয়েল বেরিয়ে যান।

মিঃ সিংহ বলেন—আমার ছেলে বিলেত থেকে ফিরে আসার পরেই একখানা ছবি তুলিয়েছিল। সেটা বোধ হয় বড় এল্‌বামে রাখা আছে। এক্ষুণি আনছি সেখানা।

মিঃ সিংহ ধীরপদে এগিয়ে যান পাশের ঘরের দিকে।

দুই

—বার্মিজ তরুণী—

দীপকের মুখের দিকে চেয়ে রতনলাল হাসতে হাসতে বলল—জোর একটা আগুনে-বোমা ছাড়লি যা হোক্!

—হুঁ। দীপক বলে—অবশ্য পুলিশ সার্জন আগে মৃতদেহ পরীক্ষা করলে আমার আগেই তিনি এটা বলতে পারতেন।

—সেটা তোর বরাত।

—কিন্তু ভাবছি, শেষ পর্যন্ত কেসটা আমার কাঁধেই এসে চাপবে বলে মনে হচ্ছে।

—তা ত দেখতেই পাচ্ছি।

কথা শেষ হতে না হতেই দ্রুতপদে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলেন বৈজ্ঞানিক মিঃ সিংহ। দীপকের হাতে এল্‌বাম্‌টা দিয়ে বলে উঠলেন—এই দেখুন মিঃ চ্যাটার্জী—দিস্ ইজ্ দি পিক্‌চার...

দীপক মনোযোগ দিয়ে ছবিটা দেখতে লাগল।

সুশ্রী, সুন্দর, বলিষ্ঠ একটি তরুণ। মুখে স্মিত হাসি ঃ দু'চোখে যেন ঔজ্জ্বল্য ঠিক্‌রে পড়ছে।

—সো নাইস্...রতন বলে।

ছবি থেকে মুখ তুলে মিঃ সিংহের দিকে তাকিয়ে দীপক প্রশ্ন করে—আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞেসা করি মিঃ সিংহ।

—বলুন।

—আপনার ছেলের দেহে এমন কোন চিহ্ন ছিল কি যা দেখে তাকে তক্ষুণি সনাক্ত করা যায়?

একটু ভেবে মিঃ সিংহ বললেন—হ্যাঁ, মনে পড়ছে বটে। তার বাঁ বাহুতে একটা বড় তিলচিহ্ন—

—তবে মৃতদেহের হাতে সেই চিহ্নটি আছে কিনা দেখেননি কেন?

—দেখুন, এরকম একটা বীভৎস ব্যাপার দেখে আমার মাথার মধ্যে কেমন করে উঠতে পারে তা ত বুঝতেই পারছেন।

—সেটা অবশ্য স্বীকার করি। একমাত্র পুত্রের এই বীভৎস অবস্থা যে কোনও পিতার মনকেই বিকল করে দেবার পক্ষে যথেষ্ট।...আচ্ছা, সেটা একটু পরেই পরীক্ষা করছি। এবার গোটাকয়েক অন্য প্রশ্ন করব আপনাকে...

—অবশ্যই মিঃ চ্যাটার্জী। আমি আপনার প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় পেয়ে যে কি পরিমাণ খুশী হয়েছি তা ভাষায় বর্ণনাতীত। সত্যি বলতে কি আই অ্যাম্ চার্মড্।

—আমাকে এভাবে বাড়িয়ে বলবেন না মিঃ সিংহ। তাতে বড় লজ্জা পাই আমি। যাক্, এবার আমার প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে বিলেত থেকে ফিরে এসে আপনার ছেলে কি কোন চাকরীর অফার পেয়েছিলেন?

—হ্যাঁ। প্রথম অফার আসে ভারত গভর্ণমেণ্টের কাছ থেকে।

—কি ব্যাপারে?

—ভারত গভর্ণমেণ্টের নোট ছাপার যে প্রেস আছে তার আরও উন্নতিবিধান করবার জন্যে আমার ছেলেকে অ্যাপয়েণ্ট করতে চেয়েছিলেন তাঁরা। কিন্তু সে ওই চাকরী প্রত্যাখ্যান করে। নিজের হাতে বিরাট একটা সর্বাধুনিক বৈজ্ঞানিক ছাপাখানা নির্মাণের স্বপ্ন ছিল তার।

—আর কোনও চাকরীর অফার?...

—হ্যাঁ, আরও দু'একটা ছোটখাট অফার এসেছিল বটে। তবে সম্প্রতি একটা বড়ো অফার—

—তাই নাকি? কোত্থেকে?

—তা ঠিক জানি না। তবে ওর মুখে শুনেছিলাম দিন পনর আগে নাকি বর্মার কোনও একটা কোম্পানী ওকে বেশ ভাল মাইনে দিয়ে অ্যাপয়েণ্ট করতে চেয়েছিল। পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত মাসে দিতে প্রস্তুত ছিল তারা। আমার ছেলে ওই অফারের উত্তরে তাদের সঙ্গে দেখা করতে চায়।

—তারপর?

—তারপর দিন সাতেক আগে দেখা করতে আসে একটি সুন্দরী বার্মিজ তরুণী। তার সঙ্গে ছিল ভয়াবহ চেহারার একজন বার্মিজ। দুজনে প্রাইভেট্লি আমার ছেলের সঙ্গে দেখা করে।

—আপনার ছেলের সঙ্গে কি তাদের কোন চুক্তি হয়েছিল?

—না না, বরং ঠিক তার উল্টো। আমি লনে চেয়ারে বসে ছিলাম। হঠাৎ শুনতে পেলাম

আমার ছেলে অরুণ বার্মিজ তরুণীকে বলছে—আপনারা যদি এক্ষুণি আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে না যান তবে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করতে বাধ্য হব। তরুণী ও তার সঙ্গী দুজনে হন হন করে বেরিয়ে গেল বটে, তবে তাদের ভাবভঙ্গি দেখে মনে হলো যে তারা ভয়ানক ক্রুদ্ধ হয়েছে। সঙ্গীটির মুখখানা ত এমনই বীভৎস, তার ওপর অপরিসীম ক্রোধে তা যেন মারাত্মক আকার ধারণ করেছিল। আর তরুণীটির দিকে চেয়ে আমি অবাক হলাম বেশি। অত সুন্দর একখানা মুখ যে ক্রুদ্ধ হয়ে অত ভয়ানক হতে পারে তা আমি ধারণা করতে পারিনি।

—এরপর আর কখনও তারা এখানে এসেছিল?

—না। এরপর আমার ছেলেকেও আর ওদের সম্বন্ধে উচ্চবাচ্য করতে শুনিনি।

—আপনি কি আপনার ছেলেকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করেছিলেন?

—না। যদি কেউ কোনও কথা না বলে তবে তাকে তা নিয়ে প্রশ্ন করা আমাদের পারিবারিক নিয়মের বিরুদ্ধে।

—বুঝেছি। দীপক বলল—তবে এ নিয়ে প্রশ্ন করলে হয়ত আমার কাজের কিছুটা সাহায্য হতো।

—তাই নাকি? আপনি কি মনে করেন...

—হ্যাঁ, আমার ধারণা এর মধ্যে বিরাট একটা চক্রান্ত বিদ্যমান, এবং তা এই ব্যাপারটিকে কেন্দ্র করেই।

দীপক কথা বাড়ায় না। বলে—আচ্ছা যাই, এবার পুলিশ সার্জনের রিপোর্টটা শুনে আসি। তারপর তদন্ত সুরু করব অন্য পথে।

—আমি কি আপনার সঙ্গে আসতে পারি? মিঃ সিংহ প্রশ্ন করেন। ওই দেহটি যে আমার ছেলের নয় সে সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হতে চাই আমি।

—বেশ, চলুন।

দুজনে এগিয়ে চলেন দোতলার দিকে।

অরুণের শোয়ার ঘরে পুলিশ সার্জন মৃতদেহের অংশগুলি পরীক্ষা করছিলেন। মিঃ সিংহ প্রবেশ করতেই তিনি বললেন—আমি এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ মিঃ সিংহ যে এ মৃতদেহটি আপনার ছেলের নয়। অন্তত আটচল্লিশ ঘণ্টা আগে এর মৃত্যু ঘটেছে।

মিঃ সিংহ বললেন—ওর বাঁ হাতে একটা বড় তিলচিহ্ন ছিল। দেখুন ত সেটা...

পুলিশ সার্জন বাঁ হাতখানি উল্টেপাল্টে দেখলেন। সেখানে কোন তেমন চিহ্ন নেই।

দীপক বলল—পুলিশ যাতে অপহৃত অরুণবাবুর খোঁজ না করে সেজন্যেই ওরা এই মৃতদেহটি রেখে গেছে।

মিঃ স্যানিয়েল বললেন—আমরা তা হলে মৃতদেহটি মর্গে পাঠিয়ে দিই মিঃ সিংহ?

মিঃ সিংহ বললেন—বেশ ত, আমার তাতে আপত্তি নেই।

মিঃ স্যানিয়েল পুলিশবাহিনী নিয়ে গাড়িতে গিয়ে উঠলেন একটু পরেই।

মিঃ সিংহ দীপককে বললেন—আপনারা আজকের আহারটা আমার এখানেই—

দীপক আপত্তি করে না। বলল—আমার তদন্তের এখনও কিছু অবশিষ্ট রয়ে গেছে। সেটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত থাকতে আমার আপত্তি নেই। তবে দু'দিনের মধ্যেই এ তদন্তের সূত্র ধরে হয়ত...

মিঃ সিংহ বললেন—এত বড়ো একটা ব্যাপারে আমি সম্পূর্ণ আপনার ওপরেই নির্ভর করছি মিঃ চ্যাটার্জী। পুলিশকে প্রথমে আহ্বান জানানো কর্তব্য তাই...নইলে আমার আপনার ওপরে যা বিশ্বাস আছে তার শতাংশের একাংশও পুলিশের ওপর নেই।

—ধন্যবাদ।

—আর এর জন্যে যত পারিশ্রমিক লাগে এবং যেদিক থেকে আপনাদের সুবিধে হয় সবকিছু সাহায্য করতে আমি প্রস্তুত আছি। এখন দেখি আপনাদের লাঞ্চের ব্যবস্থাটা...

—আর একটা কথা। আমি অরুণবাবুর শোবার ঘর, লাইব্রেরী ইত্যাদি সবকিছু একবার ভাল করে পরীক্ষা করে দেখতে চাই। আশা করি সাহায্য পাব—

—হ্যাঁ, আমি তেওয়ারীকে দিচ্ছি আপনার সঙ্গে।

মিঃ সিংহ ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যান।

তিন

—গ্যাসোলিন—

অরুণের শোবার ঘর তন্ন তন্ন করে সার্চ করে দীপক।

মূল্যবান্ কোনও জিনিসপত্রের সন্ধান মেলে না।

সোফা—কৌচ—টেবিল—আলমারি।

আলমারির মধ্যে নানাধরণের সব পোষাক।

হঠাৎ আলমারির নিচের অংশে একটি ছোট্ট ড্রয়ার দীপকের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। টেনে খুলতেই দেখা গেল নানা প্রয়োজনীয় কাগজপত্র।

অধিকাংশই তার মধ্যে মূল্যবান্। কিন্তু দীপকের কোনও কাজে লাগবে না সেগুলি। কিন্তু একটা জিনিস দীপকের বিশেষ মনোযোগ আকর্যণ করল। সেটা হচ্ছে অরুণ সিংহের চিঠিপত্রের ফাইল।

যে সব জায়গা থেকে প্রয়োজনীয় চিঠিপত্র আসে এবং তার যা কিছু উত্তর দেওয়া হয়, সব অতি সযত্নে সাজানো। মনে মনে দীপক ভাবে, এতক্ষণে সে একটা সত্যিকারের প্রয়োজনীয় জিনিস বোধ হয় খুঁজে পেয়েছে।

পাতা উল্টে চলে সে।

একটা চিঠি ঃ

প্রিয় মিঃ অরুণ সিংহ,

আমরা কতকগুলি জরুরী ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে আপনাকে আমাদের কর্মী হিসেবে নিয়োগ করতে চাই। পত্রের মাধ্যমে সে বিস্তৃত কথাবার্তা সম্ভব নয়। আমাদের কর্ত্রী আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান। তিনিই আমাদের বিরাট ফার্মের মালিক। আপনাকে মাসে আপাতত মাত্র পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত দিতে সক্ষম হব আমরা। কিন্তু আপনার কাজ তাঁকে সন্তুষ্ট করতে পারলে তিনি আপনাকে দশ হাজার টাকা পর্যন্ত মাসিক বেতন দিতে প্রস্তুত আছেন।

কবে আপনার সঙ্গে তিনি দেখা করবেন এবং আপনি এতে সম্মত আছেন কিনা জানিয়ে সুখী করবেন। পত্রোত্তর পেলে তিনি আপনার সঙ্গে দেখা করবেন। প্রীতি ও শুভেচ্ছান্তে—

ভবদীয়
সিয়াংহা থিবো।

পরবর্তী পাতায় উত্তর লেখা ছিল।

অরুণ লিখেছে ঃ

মান্যবরেষু,

আপনাদের পত্র পেয়ে অত্যন্ত প্রীত হলাম। আমার আপাতত কোন ফার্মে চাকরী করবার ইচ্ছা ছিল না। তবে আপনাদের অফার পেয়ে ভাবলাম, যদি কাজটি আমার নিজের ঠিক স্যুটিং বলে মনে হয়, তবে আপত্তি করব না।

যে কোনও দিন যদি আপনাদের কর্ত্রীর পদধূলি পড়ে আমার কুটিরে তবে আমি নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান করব। তাঁর সাথে সাক্ষাতে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলাপ-আলোচনা হবে। প্রীতি জানবেন। ইতি—

ভবদীয়

অরুণ সিংহ।

চিঠি দুটিই আগাগোড়া ইংরাজীতে লেখা।

প্রথমখানা এসেছে বর্মার মান্দালয় থেকে। দ্বিতীয় চিঠিখানা তারই উত্তর। মান্দালয়ের ঠিকানায় পাঠানো হয়েছে।

চিঠি দুটো আগাগোড়া পড়ে রতন বলল—তা হলে এ রহস্যের কেমন যেন একটা সূত্র এর মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে বলে মনে হয়। কি বলিস?

—আপাতদৃষ্টিতে তাই মনে হচ্ছে বটে। অবশ্য—

কথা শেষ হলো না।

দীপক আচমকা রতনের হাত দুটো ধরে একটা টান দিয়ে তাকে দরজার সাম্‌নে নিয়ে এলো। তারপর এক লাফে দুজনে ঘরের বাইরে—

সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল প্রচণ্ড শব্দ...

একটা কাঁচের জার জানালা দিয়ে এসে আছড়ে পড়ল মেঝের ওপর। টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙ্গে ছিট্‌কে পড়ল চারদিকে। সঙ্গে সঙ্গে একটা তরল পদার্থ চারদিকে ছিটিয়ে আগুন ধরে গেল সারা ঘরে।

দীপক দরজার আড়াল থেকে রিভলবারটা জানালার দিকে উঁচিয়ে ধরে ফায়ার করল..

গুড়ুম!

একটা লোক ততক্ষণে জানালা থেকে পথের ওপরে লাফিয়ে পড়ে ছুটতে সুরু করেছে। তাকে মিথ্যা অনুসরণ করে কোনও লাভ নেই আর।

—উঃ কি মারাত্মকভাবে যে আমাদের আক্রমণ করেছিল...রতন বলতে থাকে।

—কিন্তু ঠিক সময়ে দেখতে পেয়েছিলাম বলে তাতে কোনও লাভ হয়নি ওদের। গ্যাসোলিন-বোমা এভাবে ব্যর্থ হয়েছে!

—গ্যাসোলিন-বোমা? সে কি? রতন বলে।

—গ্যাসোলিন হচ্ছে পেট্রোলিয়মের একটা অংশ। ওটা যদি কোনও ভঙ্গুর পাত্রে রেখে তার মুখটা কাপড় দিয়ে বেঁধে আগুন ধরিয়ে দিয়ে ছুঁড়ে দেওয়া হয় তবে সেটাতে আগুন লেগে আগুনে-বোমার কাজ করতে পারে।

—তা ত দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু কি করে তুই বুঝলি যে ওটা গ্যাসোলিন?

—গন্ধ থেকে। বিগত মহাযুদ্ধের সময় ইটালীয়ানরা এই ধরণের গ্যাসোলিন-বোমা ব্যবহার করত।

—কিন্তু ওদের উদ্দেশ্য কি?

—আমরা যে আসল জায়গায় ঘা দিতে চলেছি সেটা বুঝতে পেরেছে ওরা। যাক্, এবার ফায়ার ব্রিগেডে খবর দেওয়া যাক্, না হলে যেভাবে আগুন ছড়িয়ে পড়েছে...

দীপক ও রতন ছুটে যায় টেলিফোনের দিকে।

সারা বাড়িতে ততক্ষণে হৈ চৈ সুরু হয়ে গেছে।

সমস্ত ঘটনা আগাগোড়া দেখে-শুনে মিঃ সিংহও কেমন যেন হতভম্ব হয়ে পড়েছেন। শত্রুদের চক্রান্ত যে এত জটিল এ সম্বন্ধে তাঁর কোনও ধারণাই ছিল না।

তিনি পুলিশে আবার ফোন করলেন ফায়ার ব্রিগেড্‌কে সংবাদটা জানাবার পরেই। তাঁকে দেখে স্পষ্টই বোঝা যায় যে তিনি ভয়ঙ্কর রকম উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন।

চার

—মিস্ তপতী মিটার—

আগুন নেভাবার কাজে ফায়ার ব্রিগেডের লোকেরা ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল।

বাড়ির সকলের আকর্ষণ ওদিকে। কিন্তু দীপক অন্যদিকে মনোযোগ দিয়েছে ততক্ষণে।

প্রথমে গেটের বাইরে পাহারারত দারোয়ানের সামনে এসে দাঁড়ায় সে।

দারোযান সসম্ভ্রমে সেলাম জানায়।

—কালও কি তুমিই পাহারায় ছিলে এখানে? দীপক প্রশ্ন করে।

—হ্যাঁ জী। কিন্তু সেই রাত বারোটায় যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম আর একটু আগে সবে ঘুম ভাঙল। কেন এমন হলো ঠিক বুঝছি না।

দীপক বুঝল কোনও রকমে তার অন্যমনস্কতার সুযোগ নিয়ে তাকে ক্লোরোফর্ম করা হয়েছিল।

দীপক বলল—একটু আগে উপরের ঘরে আগুন দিয়ে যে লোকটা লাফ দিয়ে পালাল তাকে ধরলে না কেন?

—কি করে বুঝব হুজুর?

—কেন?

—লোকটা যখন দৌড়ে গিয়ে একটা মোটরে উঠল তখন ওর সারা গায়ে আগুন জ্বলছিল!

—আগুন! দীপক অবাক হলো। তারপর একটু ভেবে রতনের দিকে চেয়ে বলল—বুঝেছি, দুর্ভাগ্যক্রমে ওটা ছুঁড়তে বোধ হয় কয়েক সেকেণ্ড দেরী হয়েছিল যার জন্যে আমরা রক্ষা পেলাম বটে, তবে যে ছুঁড়েছিল তারই বিপদ ঘটেছে। তার হাতে এবং পোষাকে আগুন লেগে গেছে।

—এক কাজ করলে হয় না? রতন প্রশ্ন করে।

—কি?

—লোকটা যখন পুড়েছে তখন নিশ্চয়ই তাকে কোনও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হবে।

—বুঝেছি। তুই বলছিস সহরের সব হাসপাতালে ফোন করার কথা।

—হুঁ।

—কিন্তু আজই হয়ত সহরের চার-পাঁচটা হাসপাতালে এমনি পোড়া কেসের রোগীদের ভর্তি করা হয়েছে। তা থেকে...

—তা অবশ্য সত্যি। তবু একবার চেষ্টা করে দেখা যাক। ঠিক ঐ সময়ে ওই রকম চেহারার কোন বয়স্ক লোক....

—বেশ, চল্ ফোন করে দেখি। বলা যায় না, যদি ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়...

জবাব মিলল আর. জি. কর হাসপাতাল থেকে।

অন্য কোনও হাসপাতালে সেদিন সারাদিনে একটিও 'বার্ণ কেস ভর্তি হয়নি।

শ্যামবাজারের কাছাকাছি আর. জি. কর হাসপাতাল। সুতরাং এটাই বোধ হয় সেই কেস।

দীপক উৎফুল্ল হয়ে উঠল। ফোন ধরেছিলেন সার্জিক্যাল আউটপেসেণ্ট ডিপার্টমেণ্টের ডাঃ সর্বাধিকারী।

দীপক প্রশ্ন করল তাঁকে—লোকটির 'বার্ণ'টা কোন্ গ্রেডের?

ডাঃ সর্বাধিকারী উত্তরে বললেন—'বি' গ্রেডের। প্রাণের আশঙ্কা নেই।

—পেসেণ্ট কোথায়?

—আমরা তাকে ড্রেস করে ছেড়ে দিয়েছি। এক্রিফ্লেভিন আর গ্লিসারিন দিয়ে ড্রেস করে ঘণ্টাখানেক পরেই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। মনে হয় এ যাত্রা তার প্রাণ রক্ষা পেয়ে যাবে।

—বুঝেছি। তাঁর ঠিকানাটা?

—একটু দাঁড়ান। দেখে বলছি।

একটু থেমে ডাঃ সর্বাধিকারী জানালেন—পেসেণ্টের ঠিকানা গ্রেট ইণ্ডিয়ান্ হোটেল, রুম নম্বর থার্টিন।

—কিন্তু আপনারা এতবড়ো একটা 'বার্ণ' কেস আউটডোর থেকেই ছেড়ে দিলেন কেন ডাঃ সর্বাধিকারী?

—পেসেণ্টের যখন জীবনের খুব বেশি আশঙ্কা নেই, আর তাঁর সঙ্গের লোকেরাও তাঁকে নিয়ে যাবার জন্য চাপ দিলেন। আর তা ছাড়া হাসপাতালে এখন বড্ড সীটের অভাব চলছে—নইলে আমরা নিশ্চয়ই অব্‌জারভেশনে রাখতাম দু'দিন।

—বুঝেছি।

দীপক থামল। তারপর রতনের দিকে চেয়ে বলল—চল্, এক্ষুণি আমাদের একবার গ্রেট ইণ্ডিয়ান্ হোটেলে যেতে হবে। সন্ধানের একটা সূত্র পাওয়া গেল। অবশ্য সেটা সত্য কিনা জানি না।

গ্রেট ইণ্ডিয়ান্ হোটেল।

মোটর থামিয়ে দীপক ভেতরে প্রবেশ করল।

রিফ্রেশমেণ্ট রুমের চার্জে ছিলেন একজন বাঙালী ভদ্রলোক। দীপক সোজা তাঁর সামনে গিয়ে নমস্কার জানিয়ে বলল—আমার একজন বান্ধবীর এখানে থাক্‌বার কথা ছিল। তাঁর দেখা পাওয়া যাবে কি এখন?

—কত নম্বর রুম?

—রুম নম্বর থার্টিন।

—ও, আপনি তা হলে বার্মিজ তরুণী চিয়াং লীনের সঙ্গে...

—হ্যাঁ, তিনি এখানে আমার সঙ্গে দেখা করবেন বলে কথা দিয়েছিলেন...

—দুঃখিত। তিনি আজই সমস্ত চার্জ চুকিয়ে দিয়ে তাঁর সঙ্গী সিয়াংহা থিবোর সঙ্গে হোটেল ছেড়ে চলে গেছেন।

—সিয়াংহা থিবো!

দীপকের মাথার মধ্য দিয়ে যেন বিদ্যুৎ খেলে যায়।

সে অরুণের চিঠিপত্রের ফাইলে ঐ নামটিই দেখেছে বটে!

—কিন্তু কি কারণে তাঁরা হঠাৎ এভাবে হোটেল ছেড়ে চলে গেলেন তা ত ঠিক..

—ও, জানেন না বুঝি? ওঁদের একজন বন্ধুর হঠাৎ অ্যাক্সিডেন্ট ঘটেছে। মোটর অ্যাক্সিডেণ্টে তিনি আহত হন এবং তাঁর দেহের অনেকটা পুড়ে যায়। তাই তাঁরা এত তাড়াতাড়ি চলে গেলেন।

দীপক লোকটির হাতে দুখানা দশটাকার নোট গুঁজে দিয়ে বলে—আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

লোকটি প্রথমে চম্‌কে উঠেছিলেন। তারপর স্মিতমুখে বললেন—আপনি সদাশয় লোক...

দীপক একটু থেমে বলল—আরও দু-একটা কথা যদি আপনাকে জিজ্ঞাসা করি আশা করি কিছু মনে করবেন না...

—কি যে বলেন। আমরা আছি আপনাদেরই সার্ভিসের জন্যে।

বিনয়বিগলিত স্বর লোকটির।

—আচ্ছা, একটা মস্ত বড় প্যাকিং বাক্স কি ওঁরা সঙ্গে নিয়ে...

—হ্যাঁ হ্যাঁ। লোকটি বাধা দিয়ে বলেন—হোটেল ছেড়ে যাবার দু'দিন আগে ওটি তৈরী করানো হয়েছিল। ওঁদেব দেশে নাকি ওধরণের জিনিস পাওয়া যায় না।—কিন্তু আপনি এত খবর কি করে জানলেন? আশ্চর্য লোক মশাই আপনি!

দীপক বলল—আমাকে সেই খবরটা জানবার জন্যেই আসতে হয়েছে এতদূর। ওটার দাম আমি কোম্পানীর কাছ থেকে এখনও পাইনি কিনা।

—তা হলে এবার সেটা গেলেও আপনার কোনও বাধা নেই ত?

—না। আচ্ছা, ওঁদের কোনও খবরাখবর এলে এখানে কোনও ঠিকানায় জানাবার নির্দেশ দেওয়া আছে কি?

লোকটি একখানা ভারী খাতা উল্টে জবাব দেন—হ্যাঁ হ্যাঁ, হোটেল ছেড়ে যাবার সময় নির্দেশ দেওয়া ছিল যে কোনও জরুরী খবরাখবর যদি ওঁদের নামে আসে তবে যেন তা এই ঠিকানায় জানানো হয়।

একটা কাগজে ঠিকানাটা লিখে নিলো দীপক ঃ

মিস্ তপতী মিটার, নারায়ণী ম্যানশন, শিয়ালদহ।

ঠিকানাটা পেয়ে দীপকের চিন্তার ভার যেন অনেকটা লাঘব হলো। যাই হোক, অরুণকে খুঁজে বের করবার একটা ক্লু পাওয়া গেছে এতক্ষণে।

দীপক ঠিকানাটা টুকে নিয়ে হোটেল থেকে বেরিয়ে এলো। মোটরে উঠতে যাবে এমন সময় দেখল মোটরের গদির সঙ্গে এক টুকরো ছোট্ট কাগজ পিন দিয়ে আঁটা আছে।

দীপক তুলে দেখল সেটা একখানা চিঠি। তাকেই উদ্দেশ্য করে সেটি লেখা ঃ

গোয়েন্দাপ্রবর,

এখনও সাবধান! তোমার পেছনে আমরা ঠিকমতই অনুসরণ করছি এ কথা মনে রেখো।

মিঃ অরুণ সিংহকে আমরা বিশেষ কাজের জন্যেই অপহরণ করেছি। এখনও নিবৃত্ত না হলে তোমার জীবনে অনতিবিলম্বে যে বিপদ ঘনিয়ে আসবে তা থেকে কেউ তোমাকে রক্ষা করতে পারবে না।

আশা করি ভবিষ্যৎ চিন্তা করে অনর্থক আমাদের পেছনে পেছনে ছুটে বেড়ানো থেকে বিরত হবে।

তোমার কোনও হিতৈষী।

চিঠিখানা আগাগোড়া ইংরাজীতে টাইপ করা।

সেখানকার সবটুকু পড়ে দীপক বলল—যাক, আমরা তা হলে ঠিক পথেই এগোচ্ছি, তা না হলে পর পর এভাবে আমাদের সাবধান করে দেবার প্রয়োজন হতো না।

পাঁচ

—তদন্তের সূত্র—

পরদিন সকাল।

দীপক সর্বপ্রথমে গেল বৈজ্ঞানিক মিঃ সিংহের বাড়ির দিকে।

দীপককে দেখেই সাদর অভ্যর্থনা জানালেন তিনি।

—কি খবর মিঃ চ্যাটার্জী?

—খবর ভালই। আপনার ছেলে বেঁচে আছেন।

—বেঁচে আছে!

মিঃ সিংহ উৎফুল্লকণ্ঠে বললেন।

—হ্যাঁ। তবে বিরাট একটা চক্রান্তজালে আট্‌কে পড়েছেন। সেই রহস্যের জাল ভেদ করে তাঁকে মুক্ত করতে হবে।

—সে এখন কোথায়?

—তাঁকে বন্দী করে বোধ হয় বর্মায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

—বর্মায়?

—হ্যাঁ।

—তা হলে এখন কি করবেন?

—আমি বর্মার পাসপোর্টের জন্যে দরখাস্ত করব। আর ইতিমধ্যে এখানে যে দু-একটা সূত্রের সন্ধান পেয়েছি সে সব জায়গাতেও হানা দেব।

—বেশ। কিন্তু একটা কথা মিঃ চ্যাটার্জী—

—কি কথা বলুন।

—বর্মায় যাতায়াতের সমস্ত খরচ আমিই বহন করব। এ বিষয়ে আপনার কোনও আপত্তিই শুনব না আমি।

—বেশ। এতে বাধা দিয়ে আপনার মনে অযথা আঘাত দিতে চাই না আমি। যাক, এবার ঘটনাগুলো শুনুন। একমাত্র আপনাকেই জানাচ্ছি। আশা করি আর কাউকে আপনি...

—অবশ্যই মিঃ চ্যাটার্জী। সব সময় গোপনীয়তা রক্ষা করা উচিত।

দীপক একে একে তদন্তের সূত্রগুলো খুলে বলল।

মিঃ সিংহ শুনে বললেন—হাউ স্ট্রেঞ্জ! তা হলে কি আপনি বলতে চান যে ওই বিরাট প্যাকিং বাক্সের মধ্যেই অরুণকে ওরা বন্দী করে নিয়ে গেছে।

—হ্যাঁ, মিঃ সিংহ।

—কিন্তু কিভাবে?

—বোধ হয় প্লেনে। কারণ জাহাজে গেলে দীর্ঘদিন সময় লাগতে পারে, তাই প্লেনে যাবার সম্ভাবনাই বেশি।

—কিন্তু প্লেনে অতবড় বাক্স...

—টাকা খরচ করলে সব ব্যবস্থাই করে ফেলা যায় মিঃ সিংহ। অন্ততঃ আজকের যুগে।

—বুঝেছি। কিন্তু তপতী মিটারের কাছে গিয়ে এ সম্বন্ধে খোঁজখবর নেবার চেষ্টা করেছেন কি?

—না। এদিকে পাসপোর্টের ব্যবস্থা করে আজই বিকেলে সেখানে যাব। তারপর যতটা সম্ভব খবরাখবর সংগ্রহ করে যাত্রা করব প্লেনে।

—কিন্তু ডিরেক্ট মান্দালয়ে ত প্লেনে যাবার ব্যবস্থা করা যাবে না।

—না, প্রথমে প্লেনে যেতে হবে রেঙ্গুন। সেখান থেকে ট্রেনে বা অন্য যানবাহনে মান্দালয়ের দিকে।

—বেশ। তা হলে আপনি এই পাঁচ হাজার টাকার চেকটা রাখুন মিঃ চ্যাটার্জী।

—পরে হলেও চলত। তবে বলা যায় না, যদি আবার কার্যগতিকে আপনার সঙ্গে দেখা করতে না পারি...

মিঃ সিংহ চেকটা লিখে দীপকের হাতে দিলেন।

শিয়ালদহে বিরাট নারায়ণী ম্যানশন।

অসংখ্য ছোট ছোট ফ্ল্যাটে বিভক্ত এই বিশাল বাড়িখানা।

দীপক ম্যানশনের ম্যানেজারের ফ্ল্যাটখানার খোঁজ করতে লাগল। দোতলায় ম্যানেজার থাকেন। দীপক কড়া নাড়তেই প্রৌঢ় মত একজন লোক বেরিয়ে এলেন।

—কাকে চান?

—আমি মিস্ তপতী মিটারের ফ্ল্যাট কোন্‌টা জানতে চাই।

—ও সে ত পাঁচ নম্বর।

—কোথায়?

—ওই বাঁ দিকের কোণের ফ্ল্যাটটা। সোজা এগিয়ে যান।

গজ্‌গজ্ করতে করতে ম্যানেজার দরজা বন্ধ করলেন।—যত্তো সব আজকালকার মেমসাহেবী মেয়ে এসে জুটেছে। রোজ হাজার হাজার লোক এসে খোঁজ করতে থাকবে।—এরকম ভাড়াটে নিয়ে আর পারা যায় না বাপু!

কোণের ফ্ল্যাটটার দিকে এগিয়ে গেল দীপক।

ততক্ষণে সন্ধ্যা হয়ে গেছে।

ফ্ল্যাটে ফ্ল্যাটে আলোগুলো সব জ্বলে উঠতে সুরু করেছে।

দীপক কড়া ধরে নাড়ল...খট্ খট্ খট্।

—কে?

—দরজা খুলুন।

দরজা খুলে গেল। সাম্‌নে দাঁড়িয়ে একজন ছোকরা চাকর!

—কাকে চান?

—তপতী দেবীকে...

—ও, মিস্ মিটার। বসুন, ডেকে দিচ্ছি।

দীপককে বাইরের ঘরে বসিয়ে চাকরটা ভেতরে চলে যায়।

দীপক অবাক হলো। বাঙালীর ঘরের কোনও মেয়ে যে নিজেকে তপতী দেবী বলে পরিচয় না দিয়ে মিস্ মিটার বলে পরিচয় দিতে পারে এটা ছিল তার ধারণার বাইরে। সাধে কি আর ফ্ল্যাটের ম্যানেজার মেম-সাহেব বলে ঠাট্টা করছিল!

একটু পরেই বেরিয়ে এলো তপতী।

সুন্দর চেহারা। নিটোল স্বাস্থ্য। পরণে ড্রেসিং গাউন। এধরণের পোষাকে যেকোনও বাঙালী মেয়ে কোনও ভদ্রলোকের সাম্নে আসতে পারে এটা কল্পনা করাও যায় না।

—নমস্কার! দীপক বলে।

—গুড্ আফটারনুন! কোত্থেকে আসছেন?

—আমি এসেছি কয়েকটা জরুরী বিষয়ে সিয়াংহা থিবোর সঙ্গে কথা বলতে।

—দুঃখিত, তিনি কালকের প্লেনে চলে গেছেন।

—আপনিই কি তাঁর কোল্‌কাতার এজেণ্ট?

—তাঁর নয়, তাঁদের কোম্পানীর কর্ত্রী চিয়াং লীনই আমাকে এ কাজে নিয়োগ করেছেন।

—বুঝলাম। কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে যে সে বাক্সটা ওঁরা নিয়ে গেলেন কিনা...

—ও, সেই বড় বাক্সটা? কর্ত্রীর সৌখীন সেই প্যাকিং কাঠের বিশাল সুন্দর বাক্স?

—হ্যাঁ।

—ওটা ওঁরা নিয়ে গেছেন প্লেনে করে।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ। ওর জন্যে ওঁদের স্পেশাল চার্জও দিতে হয়েছে। কিন্তু কর্ত্রীর সখ, কাজেই...

—তা হলে ভালই হলো। এ সংবাদটাই চাইছিলাম আমি।

—কিন্তু আপনার পরিচয়?

—আমি কোম্পানীর কাছে এই বাক্সটির জন্যে প্রচুর টাকা পাব। ওটা আমারই তৈরী কিনা। তাই তিনি ওটা নিলেন কিনা জানতে এসেছিলাম। তা ছাড়া আমি ছাপাখানার কাজের জন্যেও কর্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে চাই।

—ও, কিন্তু আপনি কি ছাপাখানার কাজকর্ম জানেন?

—জানি, কিন্তু কোম্পানীর নামটা ভুল করে লিখে নিইনি কিনা, তাই মুস্কিল।

—ও সেজন্যে আর ভাবনা কি! লিখে নিন ঃ

মডার্ন বার্মিজ লিথো অ্যাণ্ড অফ্‌সেট প্রিন্টিং প্রেস্, রেঙ্গুন, বর্মা।'

নামটা লিখে নিয়ে দীপক বলল—আচ্ছা, আজকের মত তা হলে উঠি তপতী দেবী।

তপতী বলল—আজকে কর্ত্রীর তার আসবে। আমি কি জানাব যে আপনি যে কাজ চান, তাঁর জন্যে ওঁর সঙ্গে দেখা হওয়া সম্ভব কিনা?

—তার করে দেখতে পারেন।

দীপক কথা না বাড়িয়ে উঠে পড়ে সেখান থেকে। তার যা কিছু জানবার তা জানা হয়ে গেছে। তপতী মিটার আসলে ভেতরের ব্যাপার বিন্দুমাত্রও অবগত নয়। তবে যেটুকু খবর পাওয়া গেল সেটুকুই তার যথেষ্ট কাজে লাগবে।

ছয়

—নতুন ব্যাঘাত—

তপতীর ফ্ল্যাট থেকে বের হয়ে দীপক সোজা নিচে এসে গাড়িতে চেপে বসল।

তপতী ছাড়া যে ওদের দলের লোককে তার ওপর নজর রাখবার জন্যে নিযুক্ত করা হয়েছে এ ধারণা ছিল না দীপকের।

কিন্তু সে কথা যখন সে জানতে পারল তখন আরও সজাগ হয়ে উঠল সে।

তপতীর ফ্ল্যাট থেকে বের হয়ে দীপক মোটরে উঠে কিছুটা পথ গিয়েছে, এমন সময় তার মনে হলো একটা মোটর যেন তার গাড়িকে অনুসরণ করছে।

দীপকের কেমন যেন সন্দেহ হলো।

খুব জোরে গাড়ি চালাল সে।

পেছনের গাড়িখানা সমানে অনুসরণ করে আসছে। এভাবে বেশিক্ষণ চালানো চলে না।

তখন একটা নতুন বুদ্ধি অবলম্বন করল সে।

একটা সরু আঁকাবাঁকা গলির মধ্য দিয়ে গাড়িটা চালিয়ে দিল সে।

পেছনের গাড়িটাও তার পেছনে পেছনে আসছিল।

সে তখন গাড়ি থামাল ভবানীপুর পোস্ট আফিসের সাম্‌নে।

পেছনের গাড়িটাও দাঁড়িয়েছিল কিছু দূরে।

দীপক গাড়ি থেকে নেমে পোস্ট অফিসের টেলিফোনটা চেয়ে নিয়ে ফোন করল ভবানীপুর থানায়।

—হ্যালো, কে কথা বলছেন?

—দীপক চ্যাটার্জী স্পিকিং...

—মিঃ চ্যাটার্জী, কি ব্যাপার স্যর?

—শত্রুপক্ষের একটা গাড়ি আমাকে ফলো করছে। ভবানীপুর পোস্ট অফিস থেকে ফোন করছি। গাড়িটা আমার গাড়ির কাছেই দাঁড়িয়ে আছে। আপনারা যদি এক্ষুণি আসেন তবে...

—বুঝেছি...এক মিনিট লাগবে আসতে।

দীপক বেরিয়ে এসে গাড়িতে চড়ে বসল। তাকাল দূরে ব্রাউন রঙের গাড়িখানার দিকে। গাড়ির লোকটা একদৃষ্টে তার গাড়ির দিকে তাকিয়ে আছে।

এমন সময় দেখা গেল দু'দিক থেকে দুটি পুলিশ লরীকে ছুটে আসতে।

দীপক নিজের গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়ে ছুটে গেল ব্রাউন রঙের গাড়িটা লক্ষ্য করে। কিন্তু পুলিশ দেখে গাড়ির আরোহী লোকটি গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়ে পাশের গলির মধ্যে ছুট দিয়েছে।

ভবানীপুর থানার ও.সি. ছুটে এলেন।

—কি ব্যাপার স্যর?

—এই দেখুন গাড়িটা।

—আরোহী কোথায়?

—এই গলি দিয়ে পালিয়েছে।

—গাড়িখানা তা হলে পুলিশে জমা থাক?

—সেই ভাল।

কিন্তু একি!

গাড়ির পাদানের ওপর একটা কাগজ। তাতে লেখা ঃ

দীপক চ্যাটার্জী,

এখনও সাবধান! ভারত ছেড়ে বাইরে এক পা বাড়ালে তোমার নিশ্চিত মৃত্যু জেনো।

আমরা অদূর ভবিষ্যতে যে কোটি কোটি টাকা লাভ করতে চলেছি তা থেকে আমদের বঞ্চিত করবার চেষ্টা করলে তোমাকে এতটুকু ক্ষমা করব না জেনো।

ইতি

তোমার হিতৈষী।

চিঠিখানা ভাঁজ করে পকেটে পুরে ফেলে দীপক বলল—তা হলে আজকের মতো চলি স্যার। গাড়িখানা আপনাদেরই জিম্মাতেই রেখে দিন।

চিন্তিতমুখে দীপক নিজের গাড়িতে উঠে বসে সজোরে চালিয়ে দিল বাড়ির উদ্দেশে। চারদিকে যে চক্রান্তের বিষবাষ্প ঘনীভূত হয়ে উঠেছে তা থেকে একটি লোককে কি উপায়ে মুক্ত করা যেতে পারে এই চিন্তাই তখন আন্দোলন তুলেছিল তার মনে।

সাত

-মান্দালয়ের পথে—

সন্ধ্যা...

দীপক নিউ মার্কেটে কতকগুলি জিনিসপত্র কিনতে খুব বেশি ব্যস্ত ছিল। তাকে দু'দিন পরেই রওনা হতে হবে মান্দালয়ের দিকে।

আলোকোজ্জ্বল নিউ মার্কেট...

হঠাৎ উল্টো দিক থেকে দেখা গেল মিস্ তপতী মিটারকে এগিয়ে আসতে।

দীপককে দেখেই তপতী ভ্রূ কুঁচকে বলল—আপনি কে? সেদিন ওভাবে মিথ্যা পরিচয় দিলেন কেন?

—মিথ্যা?

—হ্যাঁ, আপনি ছাপাখানার লোক নন—আমার কর্ত্রীর সঙ্গে আপনার যে কোনকালেই পরিচয় ছিল না তা জানতে পারলাম।

—সে কি?

—হ্যাঁ। আমি কর্ত্রীকে তার করেছিলাম। সব কথা জানালাম। তিনি জানালেন যে আপনি নিশ্চয় পুলিশের লোক। আপনার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করতে বলেছেন তিনি।

দীপক হো হো করে হেসে উঠল।

—হাসছেন যে?

—এরকম অবস্থায় না হাসাটাই আশ্চর্য নয় কি? আপনার কর্ত্রী যদি নেহাৎ ভালমানুষ হন, এবং যদি সাধুভাবে ব্যবসা করাই তাঁর উদ্দেশ্য হয়, তবে আমি পুলিশের লোক জানতে পেরে তিনি এত উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠলেন কেন?

—পুলিশের সঙ্গে কোনও ভদ্রলোক বা ভদ্রমহিলা সংস্রব রাখতে চান না।

—কিন্তু আমি পুলিশের লোক নই তপতী দেবী। তবে একটা কথা, পুলিশের অনেক কর্মচারী আমার কথা মেনে চলেন।

—আপনি তবে কে?

—সে পরিচয় এখন দিতে চাই না। তবে আপনাকে জানাচ্ছি আপনি এই কোম্পানীর সংস্রব ত্যাগ করুন।

—কেন? আপনার হুকুম নাকি?

—না তা নয়। আপনি একটি কুখ্যাত দস্যুদলের সঙ্গে জড়িত এটা প্রমাণিত হলে আপনাকে যে উপযুক্ত দণ্ড ভোগ করতে হবে এটা আশা করি বুঝিয়ে না বললেও চলবে।

—দস্যুদল?

—হ্যাঁ, এবং বিরাট কতকগুলি চক্রান্তের সঙ্গে জড়িত। আশা করি এসব কথা আপনার কর্ত্রীকে জানাবেন না।

—কিন্তু...

—কোনও কিন্তু নয় তপতী দেবী। আমি আপনার ও আপনার কর্ত্রীর মধ্যে যা কিছু তারবার্তা হয় সব কিছুর নকল রাখবার জন্যে পুলিশ ও টেলিগ্রাফ বিভাগকে অনুরোধ জানিয়েছি।

তপতী উত্তর দিল না।

একটু ভেবে বলল—আপনি ঠিক বলছেন?

—হ্যাঁ। আশা করি অন্যত্রও উপযুক্ত সন্ধান করে নিতে পারবেন আপনি।

—বেশ। আমি তা হলে কর্ত্রীকে জানিয়ে দেব যে আপনার সঙ্গে সমস্ত সংস্রব ত্যাগ করেছি। এ ছাড়া ওদের আর কোন কাজই করব না আমি।

—ধন্যবাদ।

তপতী পাশ কাটিয়ে চলে যায়। দীপক চিন্তা করতে করতে এগিয়ে চলে।

নিউ মার্কেট থেকে বেরিয়ে সে গাড়ি চালাতে লাগল ভবানীপুরের দিকে।

চিন্তার খেয়ালে সে একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল।

হঠাৎ বিপরীত দিক থেকে আগত একটি গাড়ি ইচ্ছা করে মুখটা একটু ঘুরিয়ে তার গাড়ির সঙ্গে ধাক্কা মারল...

প্রচণ্ড শব্দ...

কোলাহল...পথচারীদের ছুটোছুটি। গাড়িতে ততক্ষণে আগুন ধরে গেছে।

দীপক পথের ওপর ঠিকরে গিয়ে পড়েছিল। হাতে-পায়ে খানিকটা আঘাত লেগেছিল বটে তবে খুব বেশি ক্ষতি হয়নি।

অন্য গাড়িটা ততক্ষণে উর্দ্ধশ্বাসে অদৃশ্য হয়েছে।

দুজন পুলিশ ছুটে এসেছিল। তারা পলায়মান গাড়িটার নম্বর টুকে নিচ্ছিল।

দীপক আপনমনেই যেন তাদের উদ্দেশে বলল—ও নম্বর টুকে কোনও লাভ হবে না। ওটা যে জাল নম্বর তা আমি হলফ করে বলতে পারি।

একটা ট্যাক্সি ডেকে দীপক বাড়ি ফিরল। ভাঙা মোটরটা সারিয়ে ফেলবার জন্যে এটা কোম্পানীতে ফোন করল সে।

রতন জিজ্ঞাসা করল—তোর হঠাৎ এভাবে আঘাত লাগল কি করে?

দীপক হেসে উত্তর দিল—শত্রুপক্ষের শেষ চাল...কিন্তু এবারেও তারা কিস্তি মাৎ করতে পারল না।

বর্মার রাজধানী রেঙ্গুন।

প্লেন থেকে নামল দীপক ও রতন। এখান থেকে পৃথক ট্রেনে যেতে হবে মান্দালয়ের দিকে।

বর্মার বুকে এর আগেও তাদেব দু-একবার পা দিতে হয়েছে।

দস্যু সর্দার 'বাজপাখি'র কেসের তদন্ত উপলক্ষে রেঙ্গুনে দীর্ঘদিন কাটাতে হয়েছিল দীপক ও রতনকে। তাই এর প্রতিটি পথঘাট তাদের অতি পরিচিত।

রেঙ্গুনের ক্রোনী পার্কের একটা হোটেলে সীট্ নিলো দুজনে। তাবপর স্টেশনে চলল মান্দালয়গামী ট্রেনের খবর নিতে।

খবর নিয়ে জানা গেল, দু-তিন দিনের মধ্যে মান্দালয়ের দিকে কোনও ট্রেনই যাবে না। পথে নানাধরণের বিপর্যয়ে ট্রেন চলাচল দুদিনের জন্যে বন্ধ। লাইন ক্লিয়ার করে ট্রেন চলাচল সুরু হতে দু'দিন লাগবে অন্তত।

খবরটা শুনে রতন বলল—উঃ, এসময়ে এক সেকেণ্ড কাটাতে বিরক্ত লাগে, আর দু-দুটো দিন!

দীপক হেসে বলল—ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যেই। নিশ্চয়ই কোনও দিক থেকে কোনও সুবিধা হবে রেঙ্গুনে থাকলে।

রতন বলল—সুবিধা আর কি হবে! মান্দালয়ের পথে দু' দিন কাটিয়ে আর লাভ কি হতে পারে! বিশেষ করে ঘটনার কেন্দ্র যখন হচ্ছে মান্দালয়।

দীপক বলল—দেখা যাক—আমার মন কিন্তু তাই বলছে।

দুজনে হোটেলে ফিরে এলো পৃথক গাড়িতে করে।

রতন প্রশ্ন করে—পৃথক গাড়ি নিচ্ছিস্ কেন?

দীপক হেসে উত্তর দেয়—আমরা দুজন যে একসঙ্গে কাজ করি এটা ওদের না জানানোই ভাল।

—কিন্তু এখানে ওরা আসবে আবার কোত্থেকে?

ফুটপাথের বিপরীত দিকে যে বার্মিজটা পকেটে হাত পুরে হাঁ করে আকাশের দিকে চেয়ে ছিল তার দিকে রতনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে দীপক বলল—এখানে সবসময় চোখ-কান খোলা রাখতে হবে। এতটুকু এদিক-ওদিক হলেই মৃত্যু নিশ্চিত...

রতন আর কথা বাড়ায় না।

ওদের গাড়ি চলতে আরম্ভ করতেই বার্মিজটা ধীরে ধীরে অন্য ফুট ধরে।

কিন্তু ওদের দিকে সে যেভাবে বার বার ফিরে ফিরে তাকাতে থাকে তাতে মনে হয় সে নিশ্চয়ই অন্য পথ দিয়ে অনুসরণ করবে।

অতঃপর কোন্ পথ ধরে ঘটনাচক্রের জটিলতা এগিয়ে চলবে তা কে জানে!

আট

—ছায়ামূর্তি—

প্রিয় ডিটেকটিভ চ্যাটার্জী,

আপনার কাজে আমাদের অত্যন্ত ব্যাঘাত ঘটছে এবং আমরা প্রচুর টাকা খরচ করে একটা কাজে অগ্রসর হয়েও হয়ত ব্যার্থতার সম্মুখীন হব।

এক্ষেত্রে আমাদের পক্ষে উত্তেজিত হয়ে ওঠা স্বাভাবিক। নয় কি? এর ফলে আমরা চেষ্টা করব যে কোনও উপায়ে হোক আপনাকে হত্যা করতে—আপনাকে আমাদের পথ থেকে সরিয়ে ফেলতে।

কিন্তু বর্তমানে আমরা এমন একটা পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছি যে, সেভাবে আপনার পেছনেই অজস্র সময় নষ্ট করা সম্ভব নয়। তাই আপনার কাছে আমরা একটি ভাল প্রস্তাব জ্ঞাপন করছি। আশা করি আমাদের প্রস্তাবে সম্মত হয়ে আপনি সুবুদ্ধির পরিচয় দেবেন।

আমরা চাই আপনি যে অজস্র পরিশ্রম আমাদের পেছনে করেছেন তার উপযুক্ত মূল্য দিতে হবে।

তাই, যদি আমাদের প্রস্তাবে সম্মত হন, তবে আপনাকে বিশ হাজার টাকা দিয়ে পুবস্কৃত করব।

টাকা প্রাপ্তির পরেই আপনাকে এ দেশ ছেড়ে ভারতে ফিরে যেতে হবে।

যদি এ প্রস্তাবে রাজি থাকেন তবে আজ রাত আটটায় পিয়ার্সন লেনের 'ফ্রেঞ্চ কাফে'র সামনে গিয়ে দাঁড়াবেন। সেখানেই উক্ত টাকা আপনার হাতে গিয়ে পৌঁছবে।

কিন্তু যদি আপনি আমাদের প্রস্তাবে রাজি না হয়ে উল্টো পথে চলবার চেষ্টা করেন তবে...

সেটা না লিখলেও বুঝে নিতে নিশ্চয়ই আপনার কষ্ট হবে না।

আমাদের কর্ত্রীর তরফ থেকেই এ প্রস্তাব আপনাকে জানানো হচ্ছে। ইতি—

ভবদীয়

সিয়াংহা থিবো।

হোটেলের ঠিকানাতে এসেছে চিঠিখানা।

দীপক বেশ ভাল করে উল্টেপাল্টে দেখল। এর হাতের লেখা থেকে আরম্ভ করে চিঠি লেখবার ধরণটুকু পর্যন্ত তার পরিচিত। এর আগে অরুণের কাছে লেখা চিঠিতেও সে এই ধরণের লেখা দেখেছে।

চিঠিখানা পড়ে দীপক রতনের দিকে চেয়ে বলল—এই দেখ্, কি বুঝছিস এর থেকে?

রতন চিন্তা করতে লাগল। একটু থেমে বলল—বোধ হয় ওদের আসল কারখানা মান্দালয়ে নয়—রেঙ্গুনের আশেপাশে কোথাও।

—ঠিক বলছিস ত?

—হ্যাঁ।

—তা হলে বুঝে দেখ্, আমাদের এখানে দু'দিন আটকে থাকাতে সুফল পাওয়া গেল কিনা। ওদের সব কিছু কাজ আগে হতো মান্দালয় থেকে। কিন্তু বর্তমানে প্রেস চালাবার জন্যে বোধ হয় ওরা এই রেঙ্গুনকেই বেছে নিয়েছে।

—তা না হয় হলো, কিন্তু এখন কোন্ পথে এগুনো যাবে...

—এগুবো কিরে? আজই বিশ হাজার টাকা নিয়ে সরে পড়া যাক না। কি বলিস্?

—তাই ত ভাবছি। রতন বলল—এতবড়ো বিরাট্ অঙ্কের টাকা দিতে ওরা নিশ্চয়ই সহজে চায় না! নিশ্চয়ই আমরা ওদের খুব কাছাকাছি এসে পড়েছি মনে হচ্ছে।

—মনে হচ্ছে কি রে! ওই দেখ্!

টেবিলের উপর থেকে রিভলবারটা তুলে নিয়ে দীপক আচম্কা জানালার দিকে এগিয়ে যায়।

কিন্তু তার আগে সাঁৎ করে জানালা থেকে একটা ছায়ামূর্তি যেন সরে গেল।

রতনও অবাক হয়ে গিয়েছিল।

দুজনে ছুটে এলো হোটেলের বাইরে।

দূরে একটি লোক ছুটতে ছুটতে পথের ধারে দণ্ডায়মান একটি মোটরে গিয়ে উঠল। মোটরটি ছুটে চলল উর্দ্ধশ্বাসে।

—ওদের সাহস ত কম নয়! রতন বলল।

—তাই ত দেখছি! কিন্তু আজ রাতে আমাদের আরও বেশি সাহসের পরিচয় দিতে হবে।

—সে কি রে?

—হ্যাঁ, দেখতেই পাবি।

দীপকের মুখে সংকল্পের ছায়া।

রতনের সঙ্গে দীপক পথে নেমে এলো।

সাম্নে ট্যাক্সি-স্ট্যাণ্ড।

কয়েকটি ট্যাক্সি সার সার দাঁড়িয়ে।

দীপক এগিয়ে গিয়ে একটি ট্যাক্সি ড্রাইভারকে আহ্বান করল। দুজনে গাড়িতে চড়ে বসল।

দীপক বলল—এই যে দূরের গাড়িখানা দেখা যাচ্ছে ওটাকে অনুসরণ করতে হবে।

গাড়ি ছুটে চলল তীব্রবেগে।

একটি মোড়ের মাথায় এসে ট্রাফিক পুলিশ হাত তুলল।

সাম্নের গাড়িটা থম্কে দাঁড়িয়ে পড়ল।

দূরত্ব বেশ কিছুটা কমে এলো।

রতনের দিকে চেয়ে দীপক বলল—ভাল করে চেয়ে দেখতে বুঝতে পারিস কি না ওদের গাড়িতে ক'জন লোক আছে।

রতন ভাল করে তাকাল। অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

শুধু একজন লোক।

সেই গাড়িটা চালিয়ে নিয়ে চলেছে।

গাড়িটা ততক্ষণে আবার স্টার্ট নিয়েছে।

দুটি গাড়িই চলতে লাগল।

দীপক ট্যাক্সি ড্রাইভারের দিকে চেয়ে বলল—খুব বেশি জোরে চালিয়ে লাভ নেই। খানিকটা দূরত্ব রেখেই চলো।

বেশ খানিকটা দূরত্ব রেখে দীপকের গাড়ি অগ্রবর্তী গাড়িখানাকে অনুসরণ করে চলল।

দুটি গাড়িই চলেছে।

পথ যেন আর ফুরোয় না।

ট্যাক্সি ড্রাইভার বার্মিজ ভাষায় বলল—আর কতদূর যেতে হবে বাবু?

দীপক বলল—যতদূর সাম্‌নের গাড়িখানা যায়।

সহরের প্রান্তে একটি গলির মধ্যে সামনের গাড়িখানা প্রবেশ করল।

গলির মোড়ে দীপকের গাড়িখানা দাঁড়িয়ে পড়ল। গাড়ি থেকে নেমে দীপক গলির মধ্যে প্রবেশ করল।

অগ্রবর্তী গাড়িটা একটা হোটেলের সাম্‌নে থামল। লোকটি নেমে হোটেলে প্রবেশ করল। এই হোটেলটিই ফ্রেঞ্চ কাফে।

দীপক গলি থেকে বেরিয়ে এসে বলল—এখন নয়, রাতে অভিযান সুরু হবে।

—কিন্তু এখন হলেই বা ক্ষতি কি ছিল?

—ক্ষতি নয়, রাতের আঁধারে যে কাজ অত্যন্ত সহজে করা যায়, দিনের আলোয় তা অনেক সময় কল্পনাও করা যায় না। বিশেষ করে এসব কাজ।

রতন আর কথা বাড়ায় না।

নয়

—ফ্রেঞ্চ কাফে—

সহরের নিরালা অঞ্চলের একটি গলির মধ্যে ফ্রেঞ্চ কাফে...

সন্ধ্যা পৌনে আটটা।

দুজন বার্মিজকে দেখা গেল ধীরপদে নিশ্চিন্ত মনে হোটেলের মধ্যে প্রবেশ করে দুখানি আসন দখল করতে।

অত্যন্ত শিক্ষিত-চক্ষুবিশিষ্ট গোয়েন্দা পুলিশও ধারণা করে উঠতে পারত না যে এই দুজনেই হচ্ছে ডিটেকটিভ দীপক চ্যাটার্জী এবং তার সহকর্মী রতনলাল। তাদের পোষাক-পরিচ্ছদ ও মেক্‌-আপ নিখুঁত এবং সুন্দর।

হোটেলে যারা খাদ্য ও পানীয় নিয়ে ব্যস্ত ছিল তারা সকলেই বার্মিজ। কাজেই দীপক ও রতনের দিকে কারও নজরই বিশেষভাবে আকৃষ্ট হলো না।

একজন বেয়ারা এসে জানতে চাইল তারা কি খাবার চায়। দীপক তার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বলল—সিয়াংহা থিবোর সাথে আমার কথা আছে। তাকে চাই।

কথাটা বলল সে বার্মিজ ভাষায়।

লোকটি দীপক ও রতনের আপাদমস্তক বেশ ভাল করে নিরীক্ষণ করে বলল—পাঠিয়ে দিচ্ছি।

একটু পরে লম্বা ও সবলদেহী একজন বার্মিজ এসে সেখানে দাঁড়াল। দীপক তার দিকে চেয়ে বুঝল যে সে নিশ্চয়ই সিয়াংহা থিবো।

—ভগবান বুদ্ধ আপনার মঙ্গল করুন! লোকটি বার্মিজ ভাষায় বলল।

—আপনার উপরেও তাঁর কৃপা বর্ষিত হোক্! উত্তর দিল দীপক।

—আমাদের প্রস্তাবে রাজি ত?

—এখানে ত সে সব কথা হতে পারে না।

—কেন?

—এসব গোপন কথাবার্তা একটু গোপনে হওয়াই ভাল নয় কি? দীপক বলল।

—তা বটে; আর তা ছাড়া আপনি যখন আমাদের প্রস্তাবে রাজি তখন আমাদেরই দলের লোক...

লোকটি যেন খুশীতে উপ্‌চে উঠেছে। একটু থেমে বলল—আসুন আমার সঙ্গে।

দীপক ও রতন উঠে দাঁড়াল।

লোকটি রতনের দিকে তাকিয়ে ভ্রূকুটি করল।

দীপক বলল—ও হচ্ছে আমার সহকর্মী, সব কাজেই আমার সঙ্গে থাকে।

—বেশ, চলুন।

তিনজনে কাফে থেকে উঠে ভেতরের দিকে চলল। সেখানে একটা ঘোরানো সিঁড়ি পেরিয়ে তিনজনে গিয়ে উপস্থিত হলো দোতলার একটা ঘরে।

ছোট্ট ঘর। যেন একটা পায়রার খুপ্‌রি।

ঘরে জনপ্রাণী নেই।

দীপক এবং লোকটি বসল মুখোমুখি। রতন একপাশে।

—টাকাটা দিতে হবে নগদ না চেকে? লোকটি বলল।

—যা খুশী।

—কিন্তু টাকাটা হাতে পাওয়ামাত্রই আপনি...

কথা শেষ হলো না।

দীপকের ইঙ্গিতে রতন লোকটির অজ্ঞাতে পেছন থেকে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার মুখে একটা ভেজা রুমাল চেপে ধরল।

লোকটি শব্দ করবারও অবকাশ পেলো না...

মুহূর্তের মধ্যে জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল।

সিয়াংহা থিবোর সমস্ত পোযাক-পরিচ্ছদ খুলে নিয়ে নিজেকে ঠিক তার মত করে সজ্জিত করতে দীপকের লাগল বড় জোর মিনিট কুড়ি।

তারপর সিয়াংহা থিবোর পকেট ও জামাকাপড় বেশ ভাল করে সার্চ করে দেখল সে।

কতকগুলি কাগজ...পেন...রিভলবার...ছোরা...টাকা...একটা ডায়েরী...

সবকিছু নিজের পকেটে পুরে ফেলে দীপক ও রতন নিচে নেমে এলো।

তারপর হোটেলের কক্ষ দিয়ে সে যখন যাচ্ছিল তখন প্রত্যেকে তাকে অভিবাদন জ্ঞাপন করতে লাগল।

দীপক বুঝতে পারল যে তার মেক্-আপ্ নিখুঁত ও নির্ভুল হয়েছে।

গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে সে ডায়েরীর পাতাগুলো উল্টে চলল। দ্রুতবেগে একের পর এক পাতাগুলো ওল্টাতে ওল্টাতে একটা পাতায় এসে থমকে দাঁড়াল সে।

বেশ বড় বড় হরফে লেখা :

মডার্ণ বার্মিজ লিথো অ্যাণ্ড অফ্‌সেট প্রিন্টিং প্রেস
২৩ নং ম্যাকেনসন এভেনিউ
রেঙ্গুন।

ঠিকানাটা বেশ ভাল করে দেখে নিয়ে দীপক গাড়ির মুখ ফেরাল।

দশ
—চিয়াং লীন—

ম্যাকেনসন এভেনিউ।

সহর থেকে বহুদূরে।

সহরতলীর প্রান্তে ফাঁকা, নিরালা অঞ্চলের পিচ্‌-ঢালা চওড়া মসৃণ পথ।

ছুটে চলেছে দীপকের গাড়ি। প্রচুর টাকা দিয়ে মাত্র সাত দিনের জন্যে গাড়িখানা ভাড়া করেছে সে। সাত দিনের মধ্যেই এ কেসের সমাধান করবার আশা সে রাখে।

গাড়ির গতি বেড়ে যায়...

দীপকের হাতে পড়ে যেন প্রাণ ফিরে পেয়েছে পুরোনো অনড় গাড়িটা..

স্পীডোমিটারে কাঁটা ঘোরে...

চল্লিশ...পঞ্চাশ...ষাট...

বাঁ দিকের পথ.. ম্যাকেনসন এভেনিউ..

তেইশ নম্বর বাড়িখানা খুঁজে পেতে দীপকের দেরী হয় না। বিশাল বাগান-বাড়ি। সামনে ফাঁকা জমি।

দীপক হর্ণ দেয়। দরজা খুলে যায়।

দীপকরে পরণে সিয়াংহা থিবোর পোষাক।

দারোয়ান দীপককে নমস্কার জানায়।

প্রতি-নমস্কার জানিয়ে দীপক গাড়ি নিয়ে ভেতরে চলে যায়।

বাগানের শেষে বিরাট একতলা বাড়িখানা।

দীপক বুঝতে পারে এখানেই ছাপা-সম্বন্ধীয় যাবতীয় কাজকর্ম হবে বলে ওরা স্থির করেছে।

বাড়িখানার সাম্‌নে এসে গাড়ি থেকে নেমে পড়ে দীপক। সঙ্গে সঙ্গে রতনও নামে।

বাড়ির ঠিক সামনে দাঁড়িয়ে দুজন দীর্ঘদেহী বিশালাকায় লোক। দীপকের ছদ্মবেশ তারা বুঝতে পারে না। দীপককেই সিয়াংহা থিবো মনে করে তারা সসম্ভ্রমে অভিবাদন জানায়।

—মিস্‌ লীন কোথায়?

দীপক প্রশ্ন করে গলাটা ভারী করে। সিয়াংহা থিবোর গলা যে তার চেয়ে ভারী সেটা সে আগেই শুনেছিল।

—প্রেসঘরে।

—মিঃ সিংহ?

আন্দাজে ভর করেই দীপক কথাটা বলে।

—ওই ঘরেই বসে আছেন।

কথা বাড়ায় না দীপক। সোজা বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করে।

সাম্নের ঘরেই টেলিফোন। রতনকে দাঁড়াতে বলে দীপক চারিদিকে চেয়ে দেখে কেউ তার উপরে নজর রাখছে কিনা। বেশ ভালভাবে নিঃসন্দেহ হয়ে সে রিসিভারটা তুলে নেয়।

—হ্যালো, নর্থ ফোর থ্রি থ্রি টু...

দীপক পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের নম্বর চায় ধীরস্বরে...

একটু পরেই কনেকশন পায় সে।

—হ্যালো, কে? প্রশ্ন ভেসে আসে।

দীপক পুলিশ কোডে উত্তর দেয়—আমি দীপক চ্যাটার্জী। ভারতের একজন ডিটেকটিভ। জরুরী প্রয়োজনে বর্মায় এসেছি একজন ক্রিমিন্যালকে ফলো করে—

—কোত্থেকে কথা বলছেন মিঃ চ্যাটার্জী?

—তেইশ নম্বর ম্যাকেনসন এভেনিউ, ক্রিমিন্যালদের হেড্‌কোয়ার্টার। অত্যন্ত জরুরী সাহায্য প্রয়োজন...

—আপনার নাম শুনেছি মিঃ চ্যাটার্জী, কিন্তু কোনও দিন দেখবার সৌভাগ্য হয় নি। আশা করি এবার হবে। এক্ষুণি আসছি সবদিক থেকে প্রস্তুত হয়ে।

—ধন্যবাদ।

দীপক এগিয়ে যায় পাঁচ নম্বর ঘরের দিকে। দেখে সেটাই প্রেসঘর।

বিরাট ঘরখানার মধ্যে অজস্র সব মূল্যবান যন্ত্রপাতি পর পর সাজানো।

ঘরের ভিতরে দুজনের মধ্যে কথা হচ্ছে।

কথাগুলো শুনে দীপক বাইরেই থম্‌কে দাঁড়াল। রতনও দাঁড়াল তার পাশে। কথাগুলো ভেসে আসছে।

একটি পুরুষ ও একটি নারীকণ্ঠ।

নারীকণ্ঠ বলছে—আপনি তা হলে মনস্থির করেছেন মিঃ সিংহ?

পুরুষকণ্ঠে উত্তর দিল—হ্যাঁ।

—ধন্যবাদ। আমরা আপনার উপর যে সমস্ত অত্যাচার করেছি সেজন্যে দুঃখিত। আপনার কাজের উপযুক্ত পারিশ্রমিক ত আপনি পাবেনই, তা ছাড়া—

—আর কিছু আমি চাই না মিস্ চিয়াং লীন...

—না না, তা আপনি বললেও আমরা শুনব না। আপনার এই নিদারুণ পরিশ্রমের যোগ্য পুরস্কার আপনি পাবেন।

—কি পুরস্কার?

—এই যতো কিছু বিভিন্ন দেশের মূল্যবান জাল নোট ও জাল কোম্পানীর কাগজ ইত্যাদি এখানে ছাপা হবে তার লভ্যাংশের দু'আনা অংশ...

—না না না..

—কেন, মিঃ সিংহ?

—ও পাপ অর্থের এক পয়সাও চাই না আমি। এক পয়সাও না। শান্তকণ্ঠে বলে অরুণ সিংহ।

—আপনি তাহলে এখনও এটাকে পাপ কাজ বলে ভাবেন?

—নিশ্চয়ই।

—কিন্তু দুনিয়ার বুকে জালজোচ্চুরি ও অসাধুতা ছাড়া কি আজ পর্যন্ত কেউ বড় হতে পেরেছে?

—নিশ্চয়ই পেরেছে এবং পারবেও। আর যারা অসাধুতার পথেই অর্থাগমের পথ করে নেয় তাদের সে অর্থাগম ক্ষণস্থায়ী। তাদের সে লাভ এবং উন্নতিও যে দীর্ঘদিন স্থায়ী হতে পারে না কিছুতেই, এ আমি প্রতিজ্ঞা করে বলতে পারি।

—আপনার মত ও পথ যখন ভিন্ন তখন আপনাকে জোর করে লভ্যাংশ দিতে চাই না! উপযুক্ত পারিশ্রমিক আপনি পাবেন।

—কিন্তু আমাদের কাজের উপযুক্ত ব্লক, এচার, মেসিনম্যান এসব ব্যবস্থা করতে হবে মিস্ চিয়াং লীন।

—সে ব্যবস্থা অবশ্যই করব।

—আচ্ছা, আপনাকে একটা প্রশ্ন করব মিস্ চিয়াং লীন?

—বলুন।

—আমার বদলে যে একটি লোকের মৃতদেহ আপনারা আমার ঘরে ফেলে এসেছিলেন ও মৃতদেহটি কার?

—ওটা হচ্ছে অমরেন্দ্র নামে একজন ভারতীয় বিশ্বাসঘাতকের দেহ। শয়তান চেয়েছিল আমাদের সবকিছু সংবাদ পুলিশের কাছে জানাতে। কিন্তু তার অনেক আগেই শয়তানের প্রাণ পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে মুছে গেল। ওর দেহটা খণ্ডবিখণ্ড অবস্থায় আপনার ঘরে ফেলে রেখে আসবার ব্যবস্থা করলাম পুলিশকে বিভ্রান্ত করবার জন্যে...আর ওর মুণ্ডটা আছে পাশের ঘরের কাঁচের জারে...আমাদের দলের যে কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করবে তারই যে এই পরিণাম হবে সেটা মনে করিয়ে দেবার জন্যে রাখা হয়েছে ওটা...

খিল খিল করে হেসে ওঠে চিয়াং লীন।

এত সুন্দরী একটি নারী যে কখনও এত ভয়ানক হতে পারে তা দীপকের ধারণার বাইরে ছিল।

দীপক ঘরের মধ্যে পা বাড়ায়।

এগারো

—সংঘর্ষ—

—ওঃ, ঠিক সময়ে আপনি এসে পড়েছেন দেখছি!

সিয়াংহা থিবোর ছদ্মবেশধারী দীপকের দিকে চেয়ে বলে ওঠে মিস্ চিয়াং লীন।

তারপর হেসে ওঠে খিল খিল করে। বলে—আমি আশা করেছিলাম যে মিঃ সিংহ শীঘ্রই মত পাল্টাতে বাধ্য হবেন।

—সত্যি নাকি? দীপক প্রশ্ন করে।

—হ্যাঁ। অরুণ সিংহ উত্তর দেয়—দিনের পর দিন চুপচাপ বসে থাকার চেয়ে অন্তত আপনাদের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকাও ভাল!

—তার ওপর যখন আমার কড়া দাওয়াই চলছিল! টিপ্পনী কাটে বার্মিজ রূপসী।

—যাক্ ভালই হলো। আপনি এবার এই লোকটিকে পরীক্ষা করে দেখুন ত!

—এ কে? চিয়াং লীন প্রশ্ন করে।

—হ্যাঁ, রতনের দিকে চেয়ে দীপক বলে—এ বলছে যে এ অফ্‌সেট প্রিন্টিংয়ের কাজ জানে।

—বার্মিজরা আবার ভাল কাজ শিখল কবে? চিয়াং লীন ঠোঁট উল্টোয়।

—দেখুন না চেষ্টা করে। দীপক বলে একটু বিরক্তভাবে।

অরুণ সিংহ প্রশ্ন করে—তুমি কোথায় কাজ শিখেছ?

—কোল্‌কাতায়।

—সেখানে কোথায় কাজ করতে?

—শ্যামবাজারের একটা প্রেসে।

—শ্যামবাজারে আধুনিক অফ্‌সেট প্রেস ত নেই একটিও। রতনের দিকে চেয়ে বলে অরুণ সিংহ।

হঠাৎ এ ধরণের প্রশ্নের জন্য রতন প্রস্তুত ছিল না। তাই সে ভুল বলে ফেলে।

অরুণ সিংহ বলে—এ লোকটা মিথ্যা কথা বলছে মিঃ সিয়াংহা থিবো।

—তাই নাকি? বলে চিয়াং লীন।—কি উদ্দেশ্যে এখানে এসে মিথ্যা কথা বলছ বলো ত বাপু!

রতন ঘাবড়ে যায়।

বলে—উনি কি করে জানবেন...বিলেত থেকে ফিরে এসে ত আর খবর রাখেন না...

—কি বললে? তুমি এত খবর জানলে কোত্থেকে? নিশ্চয়ই এ তবে পুলিশের গুপ্তচর—

কথা শেষ হয় না।

ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে স্বয়ং সিয়াংহা থিবো। চীৎকার করে বলে—ধরো ধরো, ওদের আটকাও...

অবাক হয়ে যায় চিয়াং লীন।

অবাক হয়ে যায় অরুণ সিংহ।

এদের মধ্যে কে যে আসল আর কে যে নকল সিয়াংহে তা বুঝতে না পেরে পরস্পরের মুখের দিকে তাকায়।

দুজনের চেহারাই হুবহু এক।

দীপক যেন এই ধরণের সুযোগের জন্যেই অপেক্ষা করছিল।

সে রতনকে ইশারা করে।

দুজনের হাতেই উদ্যত পিস্তল।

একজনের পিস্তল নিবদ্ধ সিয়াংহা থিবোর দিকে, অন্য জনের মিস্ চিয়াং লীনের দিকে...

—আত্মসমর্পণ করো শয়তান। মাথার পরচুলা এবং মেক্-আপ্ টেনে সরিয়ে ফেলে দীপক বলে...দুজনে মাথার ওপরে হাত তোলে।

এক মিনিট।

হঠাৎ সিয়াংহা থিবো মাটিতে শুয়ে পড়ে সজোরে দীপকের পায়ে মারে প্রচণ্ড লাথি। দীপক প্রস্তুত ছিল না। ছিট্‌কে পড়ে মেঝের ওপর...

সঙ্গে সঙ্গে পকেট থেকে একটা হুইস্‌ল্ বের করে প্রাণপণে সেটাতে ফুঁ দেয়।

বারো

—পরিশেষ—

প্রচণ্ড শব্দ!

কোলাহল!

হুইস্‌লের শব্দ শুনে সদ্য আগত পুলিশবাহিনী ছুটে আসে কারখানার দিকে সদম্ভ পদক্ষেপে।

দস্যুদলের যে সব অনুচর বাড়ির ভেতরে এগিয়ে যাচ্ছিল, পুলিশ এসে তাদের গ্রেপ্তার করে একে একে।

ঘরের মধ্যে প্রবেশ করেন রেঙ্গুন পুলিশ বিভাগের সুপার মিঃ ক্যানিং...সঙ্গে সশস্ত্র পুলিশবাহিনী।

—হ্যাণ্ডস্ আপ্...

কিন্তু সিয়াংহা থিবো হাত তোলে না। সে পিস্তলটা চোয়ালের নিচে চেপে ধরে ট্রিগারটা টিপে দেয়...

গুড়ুম্!

একপাশে ঢলে পড়ে তার দেহ। মুখ দিয়ে ঝলকে ঝলকে রক্ত বের হতে থাকে।

সিয়াংহা থিবো আত্মহত্যা করে।

চিয়াং লীন ধরা পড়ে পুলিশের হাতে!

মিঃ ক্যানিংয়ের দিকে চেয়ে দীপক বলে—ইনিই হচ্ছেন বৈজ্ঞানিক সিংহের অপহৃত পুত্র অরুণ সিংহ, আর তাঁর ঘরে যে মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছিল তা অন্য লোকের।

—কার?

—অমরেন্দ্র নামে একজন হতভাগ্য ভারতবাসীর। সে পুলিশকে এদের সব খবর জানাবার চেষ্টা করেছিল তাই তার ভাগ্যে ঘনিয়ে এসেছিল এই ধরণের নিষ্ঠুর সমাপ্তি। আর তার মাথাটা আছে পাশের ঘরের একটি কাঁচের জারের মধ্যে।

দস্যুদের সকলকেই গ্রেপ্তার করা হয়।

দীপকের দিকে চেয়ে মিঃ ক্যানিং বলেন—কিন্তু এই সব ছাপার যন্ত্রগুলো এখানে কেন?

—সেজন্যেই ত অরুণবাবুকে চুরি করেছিল ওরা। আধুনিক ছাপাখানার সাহায্যে দেশবিদেশের নোট জাল করে কোটি কোটি টাকার অধিপতি হতে চেয়েছিল ওরা।

—আই সী!

পাশের ঘর সার্চ করে প্রচুর জাল নোট, ডাইস, অন্যান্য যন্ত্রাদি এবং অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া যায়।

বন্দী অবস্থায় পুলিশের ভ্যানে ওঠবার আগেই চিয়াং লীন দীপকের দিকে চেয়ে দৃঢ়কণ্ঠে

বলে—তোমার এ শয়তানীর প্রতিফল তুমি একদিন অবশ্যই পাবে শয়তান! সিয়াংহা থিবো আত্মহত্যা করলেও আমি বেঁচে রইলাম তোমাকে শাস্তি দেবার উদ্দেশ্যে।

দীপক হেসে বলে—তোমার ভীতি প্রদর্শন কি এতদিনেও থামল না মিস চিয়াং লীন! এর আগে ত...

—তোমাকে শেষ করে দেওয়াই উচিত ছিল আমার!

—সে চেষ্টাও ত কম করনি। ভুলে যেও না ন্যায় আর সত্যের জয় সর্বত্র। ন্যায়ের পথে যে এগিয়ে চলে ভগবান সব সময় প্রতিটি পদে তার সহায় হন। তাই অরুণবাবু রক্ষা পেলেন—আর তুমি যাচ্ছ কারাগারে।

কথা না বাড়িয়ে দীপক গাড়িতে ওঠে রতন আর অরুণকে সঙ্গে নিয়ে।

মিঃ ক্যানিংকে ধন্যবাদ জানিয়ে সেক্‌হ্যাণ্ড করে বলে—আপনার সাহায্য না পেলে এ যাত্রা হয়ত সাফল্যলাভ সম্ভব হতো না মিঃ ক্যানিং!

পরদিনের প্লেনে দীপক রতন আর অরুণের সঙ্গে বর্মা ছেড়ে যাত্রা করে কোল্‌কাতার দিকে।

ছুটে চলে প্লেন কোল্‌কাতার পথে।

বাঙালী তরুণের জয়যাত্রায় যেন আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে ওঠে।

—শেষ—

বিষাক্ত হাসি

এক

—রহস্যময় আততায়ী—

ক্যাসানোভা।

বিচিত্রবর্ণের অজস্র আলোকের উদ্বেল প্রাচুর্য যেন স্বর্গের অমরাবতীকেও হার মানায়।

পৃথিবীর সব কিছু দুঃখ, গ্লানি, ক্লেশ যেন এই বিরাট বাড়িখানার চত্বরের বাইরে এসে থমকে দাঁড়িয়েছে।

—সেখানে শুধু আলো—শুধু আনন্দ—শুধু উচ্ছ্বাস।

ফুলের সুবাস। আতরের আর এসেন্সের গন্ধ। উপ্‌চে-ওঠা সুরার ফেনিল, বাঁধনহীন প্রবাহ।

মঞ্চে নৃত্য সুরু হয়েছে।

জিপ্‌সী-ডান্স।

নাচছে লক্ষ্ণৌ থেকে আগত বিখ্যাত নর্তকী মতিহারী বাঈ।

পরনে তার নানারঙের কাপড়ের মিশ্রণে তৈরি বিচিত্র একধরনের পোশাক। নাচের তালে তালে দেহের বিভিন্ন অংশের তরঙ্গায়িত ভঙ্গিমা দর্শকদের তৃষ্ণার্ত দৃষ্টিকে তৃপ্ত করছে।

নৃত্যের ছন্দ উঠছে দ্রুত লয়ে।

সঙ্গে সঙ্গে চলেছে বাজনা। বিলিতি সঙ্গীতের অপূর্ব মূর্ছনা দেওয়ালের গায়ে প্রতিহত হয়ে প্রতিটি মানুষের মনে দোলা দিচ্ছে।

একটি শরাহত রক্তাক্ত পাখি যেন সুদূর, সুনীল আকাশের দিকে উড়ে যাবার জন্যে মাথা কুটে কুটে মরছে।

বর্ষিত হচ্ছে অজস্র প্রশংসাবাক্য! উচ্ছ্বসিত উল্লাসধ্বনি।

মতিহারী বাঈয়ের চোখের কোণে বিদ্যুৎ—ঠোঁটের কোণে হাসি। নাচের প্রতিটি অঙ্গসঞ্চালন নির্ভুল।

অকস্মাৎ সেখানে দেখা যায় অদ্ভুত একটা পরিবর্তন।

নন্দনকাননের মাঝে যেন প্রেতলোকের বিষাদ ছায়া!

দর্শকদের মধ্য থেকে কে যেন একটা ছোরা ছুঁড়ে মেরেছে মতিহারী বাঈকে লক্ষ্য করে।

কে সে?

কে এই আততায়ী?

কোলাহল—বিশৃঙ্খলা—হট্টগোল।

মতিহারী বিবি এক পাশে সরে গেছে। অল্পের জন্য ছোরাটা তার বুকে না লেগে লেগেছে বাঁ হাতে।

একঝলক রক্তপ্রবাহ।

সুতীক্ষ্ণ আর্তনাদ।

আহত মতিহারী বিবি লুটিয়ে পড়ে মঞ্চের ওপরেই।

যেদিক থেকে ছোরাটা ছুটে এসেছিল সেখানে দাঁড়িয়েছিল একজন সুশ্রী অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান যুবক।

দর্শকদের নজর গিয়ে পড়ল তার ওপর।

নিশ্চয়ই এই লোকটাই মতিহারী বিবির উদ্দেশ্যে ছোরাটা নিক্ষেপ করেছে।

কিন্তু কেন?

কিন্তু কি তার স্বার্থ?

উন্মত্ত দর্শকেরা লোকটিকে প্রহার করতে উদ্যত হয়।

ছুটে আসে ম্যানেজার।

উচ্ছৃঙ্খল দর্শকদের হাত থেকে লোকটিকে বাঁচায় পুলিশের হাতে সমর্পণ করবার জন্যে।

দপ্ করে একসঙ্গে সমস্ত আলোগুলো নিভে যায় অকস্মাৎ।

উপস্থিত দর্শকদের চঞ্চলতা বৃদ্ধি পায়। সকলে অস্ফুট আর্তনাদ করে ওঠে একসঙ্গে।

কিন্তু সমস্ত কলরবকে ছাপিয়ে ভেসে ওঠে একঝলক তীব্র বিচিত্র অট্টহাসি।

কে যেন এই তীক্ষ্ণ অট্টহাসি দিয়ে উপস্থিত সকলকে অবহেলা করছে। সে তীব্র বিষাক্ত হাসি এক ফোঁটা সাল্‌ফিউরিক অ্যাসিডের মতোই মানুষের মনে যেন জ্বালা ধরিয়ে দেয়।

তীক্ষ্ণ সে হাসির শব্দ কোথা থেকে যে ভেসে এলো তা বুঝতে পারে না কেউ। তবে সে বিষাক্ত হাসি যেন মানুষের অন্তরের সূক্ষ্মতম কোণে গিয়ে বিদ্ধ হয়।

একটু পরেই আবার আলোগুলো সব একসঙ্গে জ্বলে ওঠে।

সকলে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে।

কিন্তু এই অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান যুবকটিকে আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না।

ম্যানেজারের হাত ছিট্‌কে কোন্ ফাঁকে সে পলায়ন করেছে।

আর একজন লোকও ভিড়ের মধ্যে থেকে কোন্ ফাঁকে যে অদৃশ্য হয়েছিল তা কেউ বুঝতে পারেনি।

সে হচ্ছে খ্যাতনামা ডিটেকটিভ দীপক চ্যাটার্জী।

কিন্তু ডিটেকটিভ দীপক চ্যাটার্জী আজ ক্যাসানোভায় এসেছিল কেন? কেউ তা জানে না।

ক্যাসানোভার পেছনদিকের দরজা পেরিয়ে সরু গলিপথে পা দিয়ে দীপক দেখল দুজন লোককে।

নৈশ আঁধারের আড়ালে গা-ঢাকা দিয়ে তারা ধীরে ধীরে বড় রাস্তায় গিয়ে পড়ল। দুজনেরই মাথায় ফেল্ট ক্যাপ। গায়ে ওভারকোট। তার কলারটা ওপরদিকে তোলা। চট্ করে দেখে তাদের চেনবার উপায় নেই।

নির্জন পথ।

হিম-ঝরা শীতের রাত।

কুয়াশার স্তবক নেমে এসে আচ্ছন্ন করেছে পৃথিবীর বুক—ফ্যাকাশে, সাদা কুয়াশা।

কাছের জিনিসগুলোকেও ভাল করে দেখা যায় না কুয়াশার রহস্যজাল ভেদ করে।

কুয়াশার কুহেলী-আবরণে আলোগুলো সব স্তিমিত। তাদের পাণ্ডুর চোখে যেন বিশ্বের ম্রিয়মাণতা।

লোক দুজনে পথে পা দিয়েই উঠে পড়ে সাম্‌নে দাঁড়িয়ে-থাকা একটা সীডান-বডি কারে।

নির্জন পথ গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দে মুখরিত হয়ে ওঠে।

পোড়া পেট্রলের গন্ধপূর্ণ ধোঁয়া ছেড়ে গাড়িটা দ্রুতবেগে চলতে থাকে।

দীপক ঘুরে গিয়ে উপস্থিত হয় হোটেলের সামনের দিকে। নিজের গাড়িতে উঠে বসে। দূরে ওদের গাড়িটা চলেছে।

পেছনের লাল আলোটা যেন হিংস্র দৈত্যের রক্ত-আঁখি।

নির্ভীক দীপক সেই লাল আলো লক্ষ্য করে গাড়ি চালায় দ্রুতগতিতে।

ক্যাসানোভায় ততক্ষণে 'ডুয়েট ডান্স' চলেছে মৃদু বাজনার তালে তাল মিলিয়ে।

—পুরোনো কথা—

দীপক চ্যাটার্জী সেদিন সন্ধ্যায় বিনা কারণেই ক্যাসানোভার বুকে পা দেয়নি। তার পেছনে ঘটনা লুকিয়ে ছিল সেটাই এখানে বলছি।

বেলা দশটা।

দীপকের গাড়ি নিয়ে তার সহকর্মী রতনলাল কি একটা কাজে বেরিয়ে গেছে।

দীপক তাই কয়েকটা কাজ সেরে বাসে করে ফিরছিল।

বাড়ির ঠিক আগের স্টপেজে সে অন্যমনস্কভাবে হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। এবারে নামতে হবে।

--স্যার! শুনছেন?

পেছন থেকে কে যেন আহ্বান জানায়।

ফিরে দাঁড়ায় দীপক।

একজন মাঝারি আকৃতির ভদ্রলোক। মুখে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি। পরনে স্যুট। গায়ের শার্টের ওপর ওয়েস্টকোট। মোটামুটি চেহারা দেখে সৌখীন বলেই মনে হয়।

—আমাকে ডাকছেন? দীপক প্রশ্ন করে।

--হ্যাঁ। আপনার পকেট থেকে ম্যাচটা পড়ে গিয়েছিল।

—ও। লজ্জিতভাবে দীপক বলল। তারপর দিয়াশলাইটা ভদ্রলোকের হাত থেকে নিয়ে পকেটে রেখে দেয়।

বাস থেকে নেমে দীপক এগিয়ে চলে বাড়ির দিকে দ্রুতগতিতে।

বাড়ির সামনে এসে কি মনে করে একটা সিগারেট বের করল সে। তারপর আগুন জ্বালাবার জন্যে ম্যাচবক্সটা খুলে দেখে তার মধ্যে একটা কাগজ ভাঁজ করে রাখা আছে।

আশ্চর্য!

সে ত কখনও ম্যাচবক্সের মধ্যে কাগজ রাখেনি। তবে কি বাসের সেই লোকটাই কাগজটা রেখে গেছে নাকি?

কৌতূহলী হয়ে ওঠে দীপকের মন।

কাগজটা বের করে নিয়ে ভাঁজটা খুলে ফেলে সে।

একটা চিঠি :

প্রিয় দীপকবাবু,

আপনি দীর্ঘদিন ধরে প্রাণজীর ওপর তীব্র নজর রেখেছেন জানি। কিন্তু আজ অবধি আপনি এতটুকুও অগ্রসর হতে পারেননি!

আর পারবেনই বা কেমন করে? প্রাণজী কখনও কাঁচা কাজ করে না। কখনও পেছনে কোনও প্রমাণ ফেলে রেখে যায় না সে। ক্রিমিন্যাল-জগতে সে একজন নমস্য ব্যক্তি।

আবার সাধারণ সমাজে তার অন্য পরিচয়। সে যাই হোক, আপনি যদি তার সম্বন্ধে কৌতূহলী হন তবে আজ সন্ধ্যা আটটায় যাবেন ক্যাসানোভায়।

হ্যাঁ, আজ সেখানে কতকগুলো ঘটনা ঘটবেই।

চিঠিটা বিশ্বাস করতে পারছেন না? জেনে রাখুন, বিশ্বাসঘাতকদের খবর সব সময়ই পাকা হয়।

আশা করি আপনি কৃতকার্য হবেন। ইতি—

আপনার বন্ধু।

চিঠিখানা উল্টেপাল্টে দেখল দীপক।

খুব ভাল করে। মনোযোগ দিয়ে।

তারপর বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করে সে। ড্রইংরুমে কোটটা খুলে রেখে চলে যায় ল্যাবরেটারী ঘরে।

এমন সময় বাইরে পাওয়া গেল একটা মোটরের ইঞ্জিনের শব্দ।

দীপক বুঝতে পারে রতনলাল ফিরে এসেছে।

একটু পরেই ল্যাবরেটারী রুমে প্রবেশ করে রতনলাল।

—তুই হঠাৎ এখানে এলি কেন? রতন প্রশ্ন করে—আবার নতুন কোনও কেসের ঝামেলা এসে চাপল নাকি?

কোনও কথা না বলে দীপক চিঠিখানা রতনের হাতে তুলে দিল।

আগাগোড়া পড়ে রতন বলল—এ থেকে আর কি বোঝা যাবে?

দীপক হেসে বলল—অনেক কিছু। আচ্ছা একে একে তোকে দেখাই কতগুলো পয়েন্ট এই একখানা চিঠি থেকে বের হতে পারে।

দীপক চিঠিখানা তুলে ধরে উজ্জ্বল আলোর দিকে। উজ্জ্বল আলোকে ফুটে ওঠে একটা হাতির ছবি...

দীপক বলল—এটা হচ্ছে এলিফ্যান্ট ব্র্যাণ্ড কাগজ। এ দেশেরই তৈরি। বোধ হয় টিটাগড় মিলের।

তারপর একটু থেমে বলল—কালিটা হচ্ছে জেট্ ব্ল্যাক। বোধ হয় দেশী কোনও মিলের কালি। এগুলো থেকে বোঝা যাচ্ছে, খুব বেশি দামী কাগজ বা কালি লোকটা ব্যবহার করে না। আচ্ছা, এবার এলো হাতের লেখা। লেখা থেকে বোঝা যাচ্ছে লোকটা চঞ্চল প্রকৃতির। লেখাপড়া জানে। তবে দু-একটা বানান ভুল আছে। সে চাঞ্চল্যের জন্যেই। খুব বেশি চেপে লেখা নয়। লোকটা বেশি লম্বা বা মোটা নয় অবশ্যই। আচ্ছা, এবার আসছে ফিংগার-প্রিন্ট বা থাম্ব-ইম্প্রেশন! তুই জানিস্ রতন, বুড়ো আঙ্গুলের ছাপই হচ্ছে মানুষের সিওরেস্ট সাইন্ অব্ আইডেন্টিফিকেশন্।

রতন বলল—তা ত নিশ্চয়ই।

দীপক কাগজটার ওপরে কতকগুলো সাদা পাউডার ছড়িয়ে দিতে দিতে বলল—মানুষের বুড়ো আঙ্গুলে যে সব দাগ আছে তা প্রত্যেক মানুষের ভিন্ন। টিশুগুলো যখন ঘামে তখন সূক্ষ্ম জলীয় বাষ্প যে কোনও জিনিসের ওপর জমে যায়। ফলে যে সব দাগ পড়ে তা বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ধরা পড়তে বাধ্য।

ম্যাগ্নিফাইং লেন্স দিয়ে দাগগুলো পরীক্ষা করে দীপক। তারপর বলে—আমার হাতের ছাপ ছাড়া অন্য একটি লোকের আঙ্গুলের ছাপ দেখছি। এ হচ্ছে সেই পত্রপ্রেরক। বেচারা জানে না যে সে আমাদের থেকে যত দূরেই থাক, তারা হাতের রেখা আমার ক্যামেরার ফিল্মের বুকে আঁকা হয়ে গেছে!

পরপর দুটো ফিল্ম এক্সপোজ্ করে দীপক বলে—যাক্ ঝামেলা চুকল। এখন কথা হচ্ছে রাতের অভিযান নিয়ে। কিন্তু প্রাণজীকে ধরিয়ে দেবার জন্যে উৎসুক এই বিশ্বাসঘাতক বন্ধুটির স্বার্থ যে কি সেটাই আমাকে এখন খুঁজে বের করতে হবে।

দীপক চিন্তিত হয়ে পড়ে।

তিন

—ব্ল্যাক্‌মেলার—

অগ্রবর্তী গাড়িটাকে অনুসরণ করে দীপক শহরের যে অংশে এসে উপস্থিত হলো সেটা কম্বুলীটোলা নামে খ্যাত।

পাশাপাশি কতগুলো ছোট ছোট একতলা বহু পুরোনো বাড়ি। বস্তি।

তার ঠিক পাশেই বিশাল একটা অট্টালিকা।

এ অঞ্চলে এ বাড়িটা যেন ঠিক খাপ খায় না।

সামনের গাড়িটা থামল।

দীপক নিজের গাড়িটা ঘুরিয়ে একটা গলির মধ্যে প্রবেশ করল। তারপর সেখানেই গাড়িটাকে রেখে ধীরে ধীরে গলি থেকে বেরিয়ে এলো।

ওধারে গাড়ি থেকে নেমে লোক দুটি বাড়ির মধ্যে অদৃশ্য হয়েছে।

দীপক কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল। চারদিকে ভাল করে চেয়ে দেখল। অন্য কোনও মানুষের সাড়াশব্দ বিশেষ নেই। নির্জন পথে পদশব্দ বিরল বলা চলে।

দীপক এগুলো বাড়িখানার দিকে।

মার্জারের মতো লঘুগতি।

প্রতিটি পদক্ষেপ সর্তক—চকিত—নিঃশব্দ।

বাড়ির সাম্‌নের দিকে দরজা হচ্ছে একটা কোল্যাপ্‌সিব্‌ল গেট্। ভেতর থেকে বন্ধ। কোনও জনপ্রাণীর অস্তিত্ব নেই।

তার ভেতরে একটা লন। গোটাকয়েক ফুলগাছ। তার পেছনে বাড়িটা।

গেটের সাম্‌নে কোনও মানুষের অস্তিত্ব নেই। গেটটা ধরে ধাক্কা দিল দীপক। ভেতর থেকে বন্ধ। ওরা বাড়িতে ঢুকেই দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। রাতের মধ্যে আর কোথাও বের হবে বলে মনে হয় না।

দীপক কিছুক্ষণ নিজের মনে চিন্তা করে।

গেটটা পেরিয়ে নিঃশব্দে ওপারে যেতে পারলে হয়ত অনেক খবরই মিলতে পারে। কিন্তু...

দীপক চিন্তিত হলো। তাতে বিপদও কম নয়। সহজেই শত্রুদের হাতে ধরা পড়বার আশঙ্কা থাকে। তার চেয়ে অন্য কোনও উপায়...

বাড়িখানার বাঁ দিকে একটা সরু গলি।

দীপক এগুলো গলিপথ ধরে।

ঠিক বাড়ির গা ঘেঁষে গলিটা। দোতলার ঘরে আলো জ্বলছে।

নিচে দাঁড়িয়ে দীপক কিছুক্ষণ চিন্তা করে।

পকেট থেকে বের করল একটা সিল্ক কর্ড। মোটা শক্ত সিল্কের তৈরি দড়ি। তার আগায় একটা লোহার হুক।

সেটা ছুঁড়ল দোতলার রেলিং লক্ষ্য করে।

খট্...

দোতলার রেলিং-এ হুকটা আট্‌কে গেছে। দীপক সজোরে টান দিয়ে দেখল সেটা ঠিকমতো আট্‌কে আছে কিনা।

দীপক নিঃসন্দেহ হলো। আর তার কোনও ভয় নেই। ধীরে ধীরে কর্ডটা বেয়ে ঝুলতে ঝুলতে দোতলার রেলিংটা ধরে ফেলল।

এ ধরণের মারাত্মক বিপদের সম্মুখীন হতে সে কোনও দিনই একটুও ভয় পায় না।

দোতলার বারান্দাটা সরু।

তার পাশের ঘরে আলো জ্বলছে। দীপক ভাল করে চারদিকে চেয়ে দেখল। কোনও লোকের অস্তিত্ব নেই। ঘরের মধ্যে দুজন লোক শুধু বসে বসে কি যেন কথা বলছে।

দীপক জানালা দিয়ে উঁকি মারল।

দুজনের মধ্যে কি একটা বিষয় নিয়ে যেন কথা কাটাকাটি হচ্ছে বলে মনে হলো।

দীপক উৎকর্ণ হলো।

একজন বলছে—আমি শেষবারের মতো তোমাকে বলছি প্রাণজী, যদি বাঁচতে চাও তবে মতিহারী বাঈয়ের সংস্রব ত্যাগ কর!

অন্য লোকটি দীপকের দিকে পেছন ফিরে বসে ছিল। তার মুখ দেখা যাচ্ছিল না। তবে স্পষ্ট শোনা যাচ্ছিল তার কথা।

সে বলল—মতিহারীর প্রয়োজন আমার অপরিহার্য।

—কেন?

—তাকে ছাড়া আমার চলার পথে অজস্র বাধা। আমার পথ যেমন কণ্টকময় তাতে কাউকে বিশ্বাস করা চলে না। তবে মতিহারীর ওপর বিশ্বাস না রাখলেও তার সাহায্যে অন্যের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা যায়। তাদের কাছ থেকে দু'পয়সা উপার্জনও...

—কিন্তু নারী সাপের জাত! সে তোমার বিরুদ্ধে যেভাবে বিষ ছড়াচ্ছে তাতে...

—জানি।

—তবে?

—সাপুড়েরা বিষাক্ত সাপ নিয়ে খেলা করে আনন্দ পায় জান ত ওসমান?

—হ্যাঁ।

—আমি চাই মতিহারীকে নিয়ে খেলা করতে। দেখা যাক্, সে খেলার যুদ্ধে কে জেতে!

—বুঝেছি।

—কিন্তু তোমরাও ত কম নও ওসমান! প্রাণজী কথাটা বলে উঠে দাঁড়ায়। তারপর ঠোঁটের ফাঁকে একটা সিগারেট রেখে সেটাতে আগুন ধরাতে ধরাতে বলে—ফাঁক পেলে তোমরাও কোনওদিন কামড় দিতে কসুর করবে না।

—আমি? ওসমান যেন বিস্মিত।

—শুধু তুমি নও, তোমরা সকলে।

—তার মানে?

—আজ তোমাদের মতো যে কয়েকজন আমার বিশ্বস্ত অনুচর—পাপ-পথের অন্তরঙ্গ সঙ্গী, তারা সুযোগ-সুবিধা আর অর্থ পেলে যে কোনও মুহূর্তে সে বিশ্বাসের মান শিথিল করতে এতটুকু কসুর করবে না, তা আমি জানি।

প্রাণজী হো হো করে হেসে ওঠে।

তারপর একটু থেমে বলে—জীবনে কি দেখলাম জান ওসমান? প্রচুর লেখাপড়া করেছি। সৎপথে চলবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু সে সাধুপথ অন্ধ-গলির মতোই অনিশ্চিত। আর অসাধুতার রাজপথে নির্বিঘ্ন আরামে গা ভাসিয়ে চলা যায়. সেখানে সঙ্গীর অভাব নেই। সেখানে প্রতিমুহূর্তে পাওয়া যায় শত ওসমানকে, সহস্র মতিহারীকে। কিন্তু তারা শুধু মুহূর্তের সাথী মাত্র। যখনই দেখা দেবে স্বার্থের বিন্দুমাত্র সংঘাত তারা পরস্পরের বিরুদ্ধে হাত তুলতে এতটুকু কসুর করবে না।

—কিন্তু আমি আজ কেন মতিহারীকে শেষ করতে চেয়েছিলাম, তা তোমার চেয়ে আর কেউ ভাল জানে না প্রাণজী।

—কিন্তু আমাকে কি জিজ্ঞাসা করেছিলে?

—প্রয়োজন মনে করিনি।

—না, ভয় পেয়েছিলে?

—ভয় কিসের?

—যে ভয়ে তুমি মতিহারীকে সরাতে চাও, সেটা যদি আমার কাছেও প্রকাশ হয়ে পড়ে এবং আমি তোমাকে বিপদে ফেলি!

—সেকি?

—হ্যাঁ, মতিহারী আজ স্বার্থের খাতিরে আমার হাতের পুতুল। তুমিও তাই। আমার প্রতাপে আজ তোমরা দুজন একসঙ্গে কাজ করছ। এটাকে অনেকটা সেই বাঘে-গরুতে একঘাটে জল খাওয়ার মতো বলা যেতে পারে। কিন্তু ইতিপূর্বে তোমার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে মতিহারী বহুদিন থেকে তোমাকে ব্লাক মেল করে আসছিল। কি বল ওসমান?

—কিন্তু এত জেনেও তুমি ত আমাকে ভয় দেখাওনি প্রাণজী!

প্রাণজী হো হো করে হেসে ওঠে আবার। বিষাক্ত, তীব্র একঝলক হাসি।

জানালার বাইরে দাঁড়িয়ে দীপক ভাবে এমন বিষাক্ত হাসি ইতিপূর্বে সে কখনও শুনেছে কিনা সন্দেহ।

প্রাণজী বলে চলে—তোমাদের মতো ছোটদের প্রতি আমার মনের ভাব যে কি তা ত তুমি জান ওসমান। দুর্বলদের আমি যেমন করুণা করি তেমনি তাদের তুচ্ছ জ্ঞান করতেও আমার বাধে না। আমার মনের মধ্যে কোথায় যেন লুকিয়ে রয়েছে একজন বিরাট ডিক্‌টেটর। সে চায় আমার চেয়ে যারা উঁচু, যারা গর্বী তাদের অহংকার আর দর্প চূর্ণ করে শিক্ষা দিতে। কাজেই তোমার দিকে আমার নজর কোনও দিনই পড়বে না।

ওসমান বলে—কিন্তু এত জেনেও মতিহারী বাঈকে পৃথিবীর বুক থেকে তুমি সরাতে চাও না কেন?

—ঠিক যে জন্য তুমি আজ আমার অমতে মতিহারীকে হত্যা করতে অগ্রসর হওয়া

সত্ত্বেও তোমাকে আমি রক্ষা করলাম। তুমি অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান যুবক সেজে ওভাবে তার দিকে ছোরাটা ছুঁড়ে মারলেও দর্শকদের চোখে ধরা পড়ে গেলে। তখন বাধ্য হয়ে আমি সুকৌশলে আলো নিভিয়ে তোমাকে ওদের কবল থেকে রক্ষা করলাম।

—কিন্তু তা করলে কেন?

—আমার তাতে স্বার্থ ছিল ওসমান।

—কি স্বার্থ?

—তুমি ধরা পড়ে পুলিশের হাতে গেলে হয়ত তোমার ওপর অত্যাচার করে পুলিশ আমার সম্বন্ধেও অনেক কথা বের করে নিতে পারত।

—তুমি এত ভেবে কাজ কর প্রাণজী?

—হ্যাঁ। তাই আমার বিরুদ্ধে এতটুকু প্রমাণও কেউ আজ অবধি সংগ্রহ করতে পারেনি। কিন্তু পুলিশের হাত থেকে বাঁচলেও বিনা কারণে তোমাকে আমি এতদূর নিয়ে আসিনি ওসমান। আমার মতের বিরুদ্ধে চলার জন্যে উপযুক্ত শাস্তি তোমাকে অবশ্যই পেতে হবে...

কথা শেষ হয় না।

ওসমান মুখ তুলে দেখে প্রাণজীর হাতে একটা চক্চকে অটোমেটিক রিভলবার। অগ্নিবর্ষণ করবার জন্যে উন্মুখ হয়ে আছে যেন।

ওসমানের মুখে বিস্ময়, দু'চোখে যেন বিশ্বের ভয় পুঞ্জীভূত।

প্রাণজী জুতোর গোড়ালীটা মেঝের ওপর জোরে দু'বার ঠুকে দেয়।

সঙ্গে সঙ্গে ঘরে প্রবেশ করে দুজন দীর্ঘদেহ পেশীবহুল লোক। দুজনকেই গুণ্ডাশ্রেণীর লোক বলে মনে হয়। টাকার জন্যে তারা বোধ হয় সব কিছু করতে পারে।

—আপাততঃ একে আটকে রাখ। মতিহারী এলে এর বিচার হবে।

প্রাণজী আপনমনেই পায়চারী করতে থাকে ঘরের মধ্যে। এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত কয়েকবার পায়চারী করে সে। নিজের মনেই বিড়বিড় করে বলে—না, ওকে এখনও শেষ করা চলবে না। কিছু কাজ এখনও বাকী রয়ে গেছে।

তার প্রতিটি ভঙ্গি সংকল্পে দৃঢ়। সারা গতিভঙ্গির মধ্যে একটা অনমনীয় তীক্ষ্ণতা।

বিস্মিত দীপক আবার বারান্দা থেকে নেমে ধীরে ধীরে পথের বুকে পা দেয়।

রাত তখন বোধ হয় দশটা বেজে গেছে।

চার

—একটি কালো রাত—

কল্‌কাতা থেকে চন্দননগরের দূরত্ব প্রায় কুড়ি মাইল।

অভিজাত সহর।

বাংলার যে কটি সহর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিক থেকে গর্ব করতে পারে তার মধ্যে এটি একটি।

সেদিন রাত বারোটা।

চন্দননগরের একটি হোটেল থেকে দুজন লোক বেরিয়ে এসে ধীরে ধীরে পথে পা দিল।

দুজনেরই পরণে স্যুট। দামী পোষাক। মাথার টুপীটা নিচের দিকে নামানো। গরম কোটের কলারটা ওপর দিকে তোলা। রাতের কালো আবরণ ভেদ করে তাদের বেশভূষা সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করা সম্ভব নয়।

শীতের রাত।

হু হু করে বয়ে যাচ্ছে ঠাণ্ডা হাওয়া। হাড়ে যেন কাঁপন লাগিয়ে দেয়। টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টি পড়ছে। আকাশে নিরন্ধ্র মেঘ। মাঝে মাঝে বিদ্যুতের চমক।

লোক দুটি পথে পা দিল। ভাল করে চারদিকে চেয়ে দেখে তারা। নাঃ, তাদের দুজনকে সন্দেহ করবার মতো কোনও লোকের অস্তিত্ব নেই কোথাও। এবার নিশ্চিন্ত হয়ে তারা হোটেলের মধ্য দিয়ে নিয়ে-আসা একটি অজ্ঞান লোককে ধরাধরি করে পথের ওপর দাঁড়িয়ে-থাকা ছোট্ট গাড়িতে তুলে নেয়।

অত্যন্ত অভিজ্ঞ লোকেরও ক্ষমতা নেই যে এই দুটি অজ্ঞাত রহস্যময় লোককে চিনতে পারে। তা ছাড়া এদের একজন পুরুষ, অন্যজন নারী। অবশ্য পুরুষের পোষাকে তাকে এমন সুন্দর মানিয়েছে যে নারী বলে সহজে ধরা যায় না।

গাড়িতে উঠে পুরুষটি বসল সামনের ড্রাইভারের আসনে আর নারীটি পেছনে। তার হাতে উদ্যত রিভলবার। সেটি জ্ঞানহীন লোকটির বুকের ওপর নিবদ্ধ। যদি সে আচমকা জ্ঞান ফিরে পেয়ে পালাবার চেষ্টা করে তা থেকে বিরত রাখবার জন্যেই এই ব্যবস্থা।

গাড়ি ছুটে চলল পিচ্ ঢালা মসৃণ পথ ধরে।

কিছুটা এগিয়ে একটা মোড়ের মাথায় এসে গাড়ির আরোহীরা থমকে দাঁড়াল।

সামনে পাহারারত বীটের কনস্টেবল। সে হাত তুলে তাদের গতিপথে বাধার সৃষ্টি করেছে।

—কোন্ হ্যায়?

কনস্টেবল হরিভকত সিং প্রশ্ন করে।

—আদমী।

—কোন্ আদমী? এতনা রাতমে কাঁহা পর যায়েগা?

হাতের লাঠিটা বাগিয়ে ধরে তাল ঠুকতে ঠুকতে হরিভকত এগিয়ে আসে। গায়ের ওভারকোটটা টেনে নিয়ে সারা দেহটা ভাল করে আবৃত করে নেয়।

মোটরের আরোহীরা এবার নিজেদের বিপদ বুঝতে পারে। কিন্তু এমন অবস্থায় কি করা যেতে পারে?

একটু ভেবে তারা আবার গাড়িতে স্টার্ট দেয়।

—এই, রোখো! একদম্ বাঁধকে—

হরিভকত তীব্রস্বরে চীৎকার করে ওঠে। তারপর প্রাণপণে তার হুইশেলে ফুঁ দেয়।

বহুদূর থেকে আর এক হুইশেলের শব্দ ভেসে আসে। অন্য একজন কনস্টেবলেরও নৈশ নিদ্রা টুটে গেছে বোধ হয়।

পেছনের আসনে উপবিষ্ট পুরুষবেশী নারীমূর্তি এবার অধৈর্য হয়ে পড়ে। না, আর এক মুহূর্তও অপেক্ষা করা চলতে পারে না। সে হরিভকতের দিকে হাতের রিভলবারটা তুলে ফায়ার করে।

গুড়ুম্ গুড়ুম্—

নৈশ প্রহর যেন থর থর করে কেঁপে কেঁপে ওঠে সেই প্রচণ্ড শব্দের তীক্ষ্ণতায়। কনস্টেবল হরিভকত সিং একটা আর্ত চীৎকার করে লুটিয়ে পড়ে পথের ওপরেই।

দূর থেকে ঘন ঘন হুইশেলের শব্দ ভেসে আসে। দ্রুত পদশব্দও যেন এদিকেই এগিয়ে আসছে।

—গাড়ি চালাও।

নারীকণ্ঠে আদেশধ্বনি।

গাড়ি চলতে থাকে তীব্রগতিতে গতিবেগের বাঁধন তুচ্ছ করে কক্ষচ্যুত নীহারিকার গতিতে।

চন্দননগর পেরিয়ে কল্‌কাতা অভিমুখে গাড়ি দ্রুত ধাবিত হয়।

শুধু অভিশপ্ত সহরের বুকে পড়ে থাকে কর্তব্যনিষ্ঠ পুলিশ কনস্টেবল হরিভকত সিংয়ের মৃতদেহ আর গোটাকয়েক সীসার তৈরি বুলেট।

নৈশ বাতাস শন্‌ শন্‌ শব্দে বয়ে যায়। মৃত হরিভকতের আত্মার উদ্দেশ্যে কাতর প্রার্থনা জানায় যেন।

পাঁচ

—প্রাণজীর কারসাজী—

সেদিন সকালে কল্‌কাতার প্রত্যেকটি সংবাদপত্রে বড় বড় হরফে একটা খবর বের হয়েছিল।

খবরটি অভিনব।

সারা সহরের বুকে এই অদ্ভুত খবরটি বিচিত্র একটা বিস্ময় ও কৌতূহলের আলোড়ন তুলেছিল।

চন্দননগরের হোটেল হইতে এক ব্যক্তি নিখোঁজ!
কনস্টেবল হরিভকত সিংয়ের মৃতদেহ প্রাপ্তি!
অজ্ঞাত আততায়ী কর্তৃক নিহত!

নির্দিষ্ট সময়ে খবরটা এসে পড়েছিল ডিটেকটিভ দীপক চ্যাটার্জীর কাছেও।

সে খবরটা দেখে প্রথমটা অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল। রতনও এ ধরণের আকস্মিক খবর প্রত্যাশা করেনি।

রতন দীপকের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল—যাই হোক্, এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে যে প্রাণজীর কোনও যোগাযোগ নেই এ সম্বন্ধে আমি নিঃসন্দেহ।

দীপক বলল—তোর এমন ধারণা কেন?

রতন বলল—প্রাণজী যেমন একদিকে সহরের কতকগুলো ক্রাইম্ ক্লাবের সঙ্গে জড়িত, অন্যদিকে তেমনি সমাজে তার সম্মান আর প্রতিষ্ঠা অগাধ। এমন কি মতিহারী বাঈয়েরও যথেষ্ট সুনাম আছে; বর্তমানে সে একদিকে যেমন শ্রেষ্ঠ নর্তকী ও গায়িকা, অন্যদিকে তেমনি একজন প্রখ্যাত অভিনেত্রী। কাজেই এরা গোপনে কোনও ক্রাইম্ ক্লাবের সঙ্গে জড়িত থাকলেও এভাবে প্রকাশ্যে কিছু করে বেড়াবে না বলেই আমার ধারণা।

দীপক উত্তর দেয় না।

বিচিত্র রহস্যময় হাসি ফুটে ওঠে তার ঠোঁটে।

রতন প্রশ্ন করে—এ সম্বন্ধে তোর ধারণা কি?

দীপক হেসে বলে—প্রত্যেকটি চ্যারিটেব্‌ল হাসপাতালে প্রাণজী মুক্তহস্তে দান করে থাকে।

প্রত্যেকটি বড় বড় কমিটির সে একজন হোমরাচোমরা সদস্য। কয়েকটি ব্যাঙ্কের সে ডিরেক্টর বোর্ডে আছে। স্বদেশী শিল্পে তার দান অনস্বীকার্য। তা ছাড়া...

রতন বাধা দিয়ে বলে—প্রাণজী সম্বন্ধে এ ধরণের ফিরিস্তি আমার না শুনলেও চলবে।

—তার মানে?

—তুই কতদূর এগোলি তাই আমি জানতে চাই।

দীপক বলে—যতদিন আমি সেই বিশ্বাসঘাতক বন্ধুটিকে খুঁজে বের করতে না পারছি ততদিন একপাও এগোনো অসম্ভব।

—কেন?

—কারণ প্রাণজী অত কাঁচা ছেলে নয় যে এককথায় একেবারে ফাঁদে পা দেবে।

—তা ত বুঝলাম। কিন্তু তাই বলে কি চুপ করে থাকবি নাকি?

—না, নতুন একটা পদ্ধতিতে আমি চেষ্টা করবো সে বিশ্বাসঘাতক বন্ধুকে খুঁজে বের করতে।

—অর্থাৎ?

—তুই জানিস, সেই লোকটির আঙ্গুলের ছাপ আমার কাছে আছে। এখন যে কোনও উপায়ে যদি ওদের দলের সব ক'জনের আঙ্গুলের ছাপ জোগাড় করা যায়..

—এ একেবারে অসম্ভব। বাধা দিয়ে রতন বলে।

—অসম্ভবকেও অনেক সময় সম্ভব করে তোলা যায়।

—কিন্তু কি প্রকারে?

—ওদের দলের মধ্যে বিশ্বাসঘাতকতা ও চক্রান্ত সুরু হয়েছে। আমি এই সুযোগ নেব। ওদের আগামী আলোচনা-সভা বসবে বুধবারে। দলের পাঁচ-ছ'জন সেখানে উপস্থিত হবে। নিজেদের মধ্যে যে গণ্ডগোল ও চক্রান্ত ফেনিয়ে উঠেছে তা কাটিয়ে ওঠবার জন্যেই এই বৈঠক। সেদিন একজন সদস্যের ছদ্মবেশে আমি সেখানে উপস্থিত হব।

—কিন্তু যদি তোকে চিনে ফেলে

—এমন একজন সদস্যের সন্ধান আমি জানি যার ছদ্মবেশে গেলে আমাকে আদৌ সন্দেহ করতে পারবে না। তাকে কিন্তু এর আগেই গোপনে বন্দী করে আটকে রাখতে হবে।

—কে সে সদস্য?

দীপক হাসতে হাসতে বলে—প্রাণজীর সবচেয়ে প্রিয় সদস্য ওসমান। আমি নিখুঁতভাবে তারই ছদ্মবেশ অনুকরণ করব।

দীপক আর রতন দুজনেই এরপরে কতকগুলো অত্যন্ত গোপনীয় কথাবার্তায় মনোনিবেশ করে। বাইরের কেউই সে গোপন আলোচনার এতটুকুও জানতে পারে না।

সেদিনই বিকেল বেলা।

দীপক চ্যাটার্জীর গাড়িটা এসে দাঁড়ায় প্রাণজীর প্রাসাদের মতো বিরাট বাড়িখানার সাম্‌নে। বেয়ারার হাত দিয়ে কার্ড পাঠিয়ে দীপক ভেতরে আমন্ত্রিত হয়।

—চ্যাটার্জী সাহেব যে! কি সৌভাগ্য, আজ এ দীনের কুটিরে আপনার পদধূলি—অভ্যর্থনা জানায় প্রাণজী।

—কয়েকটা জরুরী প্রয়োজনেই আমাকে আসতে হয়েছে। দীপক ভূমিকা করে।

সর্পের মতো ক্রূর দৃষ্টি প্রাণজীর দু'চোখে। মুখে একঝলক কুশ্রী বিষাক্ত হাসি।

প্রাণজী বলে—নিশ্চয়ই আসবেন মিঃ চ্যাটার্জী। টাকা থাকলে তার ঝামেলাও অনেক পোয়াতে হয় কি না!

প্রাণজীর কথায় দীপক প্রভাবিত হয় না। সে তার ওপর আর একটা চাল দেবার উদ্দেশ্যে হঠাৎ স্বরটা একটু গম্ভীর করে বলে—ওসমানকে চেনেন?

—ওসমান! প্রাণজী যেন আকাশ থেকে পড়ে।

দীপক কি যেন বলতে চেষ্টা করে। কিন্তু তার মুখে কথা ফোটে না। তার আগেই একঝলক হাল্‌কা হাওয়ার মতো ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে একটি নারীমূর্তি।

দীপক চেয়ে দেখে মতিহারী বাঈ।

দীপক হাত তুলে নমস্কার জানায়। মতিহারী বাঈ মৃদু ঘাড় হেলিয়ে রহস্যময় হাসি হেসে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ে।

প্রাণজী রহস্যমাখা হাসি হেসে বলে—দীপকবাবু বলছেন এক তাজ্জব বাত। শুনেছ বাঈসাহেবা?

—কি কথা? মতিহারী বিচিত্র ভঙ্গিতে গ্রীবাটি মৃদু আন্দোলিত করে প্রশ্ন করে।

—ওসমান বলে কোন্ একটা লোকের খোঁজ করতেই তিনি নাকি এসেছেন এ অধমের বাড়িতে।

—তাই নাকি?

খিল খিল করে হেসে গড়িয়ে পড়ে মতিহারী বাঈ। তারপর দীপকের দিকে মৃদু কটাক্ষ করে বলে—দীপকবাবু কি আজকাল পথঘাট ভুল করে যেখানে-সেখানে এসে যার-তার খোঁজ সুরু করছেন নাকি? কোথাকার কে ওসমান...

দীপক বুঝল তার অনুমান ব্যর্থ হয়েছে। তবু একবার শেষ চেষ্টা করবাব জন্যে বলল—আপনিও তাহলে ওসমান নামে কোনও লোককে চেনেন না বাঈসাহেবা?

—কোত্থেকে চিনব? ঠোঁট উল্টে মতিহারী বাঈ বলে।

দীপক এবার হো হো করে হেসে ওঠে প্রাণখোলা হাসি। মতিহারী বাঈয়ের দিকে চেয়ে বলে—সত্যিই, এতদিনে বুঝতে পারলাম কেন অভিনেত্রী হিসেবে আপনার এত সুনাম!

—তার মানে? ভ্রূকুটি করে মতিহারী বাঈ প্রশ্ন করে।

—যে ওসমান সেদিন ক্যাসানোভায় আপনাকে লক্ষ্য করে ছোরা নিক্ষেপ করল, আপনি বলছেন তাকে আপনি চেনেন না!...কি অদ্ভুত এই পৃথিবী...

মতিহারী বাঈ উঠে দাঁড়ায়। প্রাণজীকে লক্ষ্য করে বলে—আপনার এখানে আমি অপমানিত হবার জন্যে নিশ্চয় আসিনি প্রাণজী...

প্রাণজী বলে—বসো বাঈসাহেবা। অত উত্তেজিত হয়ে উঠছ কেন? দীপকবাবু অমনি উল্টোপাল্টা কথাই বলেন।

মতিহারী বলে—আপনি কি এক্ষুণি ক্লাবে যেতে প্রস্তুত, না দেরী আছে? আমি আর অপেক্ষা করতে পারছি না।

ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে মতিহারী বাঈ ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়।

মতিহারী বাঈ ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে দীপক হাসিভরা মুখে তাকায় প্রাণজীর দিকে।

—আজ আপনাদের অভিনয় আমাকে খুশী করেছে প্রাণজী। দীপক বলে!

—অভিনয়? প্রাণজী যেন দীপকের কথায় আদৌ আমল দেয় না।

—নয় ত কি? আপনার সঙ্গে বাঈসাহেবার যা সম্বন্ধ তাতে নিশ্চয়ই ও ধরণের 'আপনি' 'আজ্ঞে' ব্যবহার করবার কথা নয়!

তীক্ষ্ণস্বরে কথাটা বলে দীপক তীব্রদৃষ্টিতে তাকায় প্রাণজীর মুখের দিকে। সে দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা যে কোন মানুষের অন্তঃস্থলে গিয়ে বিদ্ধ হয়।

কিন্তু দীপকের কথায় এতটুকুও প্রভাবিত হয় না প্রাণজী। অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে জবাব দেয়—আপনার কথাগুলো বড়ই তাজ্জব বলে মনে হচ্ছে দীপকবাবু। বোধ হয় এখন আপনার মাথার ঠিক নেই!

প্রাণজীর কথার উত্তর না দিয়ে দীপক বলে—আজকের মতো উঠি। ভবিষ্যতে প্রমাণ করবার চেষ্টা করব আমার মাথাটার এখনও রাঁচিতে আশ্রয় নেবার মতো অবস্থা হয়নি। আচ্ছা, গুড্ বাই!

একটি মুহূর্তও আর অপেক্ষা না করে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায় দীপক।

ছয়

—অপরিচিতা—

দু'দিন কেটে গেছে।

বর্তমানে কল্‌কাতা সহর এবং সহরতলীতে যেভাবে আইন-অমান্যের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে তাতে কল্‌কাতার পুলিশ বিভাগ যথেষ্ট চঞ্চল ও সক্রিয় হয়ে উঠেছে।

কিন্তু তবুও তাতে কোনও ফল হয়নি।

অপরাধীদের সাহসের মাত্রা যেন দিনের পর দিন সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে।

ডিটেকটিভ দীপক চ্যাটার্জীর কাছেও কয়েকবার ফোন করেছেন পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর মরিসন।

দীপক বারবার একই উত্তর দিয়েছে। বলেছে—আমি এইসব ব্যাপার নিয়েই অত্যন্ত ব্যস্ত আছি। কোনও নির্দিষ্ট পথ ধরে না এগুনো পর্যন্ত আমি দেখা করতে পারছি না।

ইন্‌স্পেক্টর মরিসন নিজস্ব ধারাতেও চেষ্টার ত্রুটি করছেন না, কিন্তু ফল সেই এক।

চন্দননগরের কেসটারও কোনও কিনারা হয়নি। সেখানকার হোটেল থেকে যে লোকটিকে দুর্বৃত্তরা অপহরণ করল সে যে কে, সে সম্বন্ধে কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। দীপক এ সম্বন্ধে চেষ্টার ত্রুটি করছে না, কিন্তু সুফলের আশা সুদূরপরাহত।

অদ্ভুত একটা দুশ্চিন্তা যেন আচ্ছন্ন করেছে দীপককে। কোনও একটা সূত্র নেই যা ধরে এগুনো যায়। আর এদের দল যে কি ভাবে কাজ করে তার কোনও ধারাও তার জানা নেই। এরা কেমন যেন রহস্যময়। এ ধরণের কেস দীপকের হাতে এর আগে এসে পড়েনি।

এই ধরণের চিন্তা যখন দীপককে আচ্ছন্ন করেছে, এমন সময় পাওয়া গেল সূক্ষ্ম একটা আলোকের রেখা।

বিকেল পাঁচটা।

দীপক দোতলার ব্যাল্‌কনিতে বসে। গায়ে একটা গরম কাপড় চাপা দিয়ে বসে অপরাধীদের মনস্তত্ত্বসম্বন্ধীয় কয়েকটা বই নিয়ে পড়াশুনা করছে এমন সময় চাকর ভজুয়া এসে জানাল, একটি মেয়ে তার খোঁজ করছে।

—তাকে ভেতরে পাঠিয়ে দে। দীপক বলে।

একটু পরেই যে মেয়েটি তার সামনে এসে দাঁড়াল তাকে সাধারণ ভাষায় সুন্দরী বলে অভিহিত করা চলতে পারে।

—আপনি কি আমাকেই খুঁজছেন?

—হ্যাঁ।

—বসুন। কিন্তু আপনাকে ত এর আগে...

—বুঝেছি। বাধা দিয়ে মেয়েটি বলে—কিন্তু এর আগে ত দেখবার কথা নয়। আমি জরুরী একটা ব্যাপারে আপনার সাহায্য চাই।

—বলুন। যতদূর সম্ভব সাহায্য করার চেষ্টা করব।

—দেখুন দীপকবাবু, আমি একটা অনুমানের ওপর ভিত্তি করে কথাটা বলছি। আমার মনে হয় সম্প্রতি চন্দননগরে দুর্বৃত্তদল যে লোকটাকে অপহরণ করে তিনিই আমার বাবা।

—কি করে আপনার এ ধারণা হলো?

—বিগত পাঁচ দিনের মধ্যে ওঁর কোনও খবর পাইনি।

—কোথেকে উনি নিরুদ্দেশ হন?

—তা ঠিক জানি না বটে, তবে ওঁর চন্দননগরে যাবার কথা ছিল বলেই জানি।

—বুঝেছি। কিন্তু কি ব্যাপারে উনি সেখানে যান?

—সেটা তিনি আমাকে বলেননি। তবে আন্দাজে কতকটা...

—আচ্ছা ওঁর প্রফেশন—মানে পেশা কি ছিল?

—উনি একজন ভাল মেকানিক। যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে ওঁর জ্ঞান অপরিসীম।

—বুঝলাম।

—তা ছাড়া আরও একটা কথা। সম্প্রতি উনি বিভিন্ন সিন্দুক এবং তালা সম্বন্ধে কতকগুলি যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করেন।

—ওঁর নাম?

—বিনোদবিহারী চ্যাটার্জী।

—এখন, ওঁর চন্দননগরে যাওয়া সম্বন্ধে কোনও ইতিহাস বা ঐ ধরণের কিছু আপনার জানা আছে কি মিস্ চ্যাটার্জী?

—আমাকে আপনি মলয়া বলেই ডাকবেন। আমার নাম মলয়া চ্যাটার্জী। যাক্, ব্যাপারটা আমার খুব ভাল করে জানা নেই। তবে বাবার কাছ থেকে আকারে-ইঙ্গিতে যেটুকু শুনেছিলাম তাই বলছি। সম্প্রতি কয়েকটি বড় বড় আয়রণ অ্যাণ্ড স্টীল কোম্পানীতে উনি ভাল চাকরীর অফার পেয়েছিলেন। কিন্তু উনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। ওঁর ঝোঁক ছিল উনি নিজেই ও ধরণের একটা বড় ফার্ম করবেন। অবশ্য ছোট একটা দোকান এখনও আছে।

—বেশ।

—কিন্তু দিন তিনেক আগে কে একজন চন্দননগর থেকে একটা চিঠি লেখে ওঁর নামে। তাতে লেখা ছিল উনি সেখানে গেলেই ওঁকে একটি হাজার টাকা মাইনের চাকরী দেওয়া হবে।

—এত বড় অফার?

—হ্যাঁ। কাজেই বুঝতে পারছেন উনি তাতে সম্মত হন এবং সেখানে গিয়ে বোধ হয় ওই হোটেলেই ওঠেন! তারপর আর বিগত পাঁচ দিনের মধ্যে ওঁর কোন খবর পাইনি।

-বুঝলাম

—একটা প্রি-পেড় টেলিগ্রামও করি ঐ হেটেলের ঠিকানায়। কিন্তু বাবার কাছ থেকে কোনও জবাব আসেনি। সেটার উত্তরে ঐ হোটেলের ম্যানেজার জানিয়ে দেন যে বিনোদবাবু নামে কোনও লোক সেখানে থাকে না।

—আপনার অনুমানশক্তি সত্যিই প্রশংসনীয় মিস্ মলয়া চ্যাটার্জী।

—কেন বলুন ত?

—আমার মনে হয় ওঁর অন্তর্ধানের সঙ্গে সম্প্রতি কল্‌কাতার বুকে অনুষ্ঠিত ঘটনাগুলির একটা যোগাযোগ আছে।

—আপনার এমন মনে হওয়ার কারণ?

—বিগত কয়েকদিন এই দস্যুদলের লোকেরা যেভাবে দামী দামী তালা ইত্যাদি খুলছে তাতে মনে হয় জোর করে অথবা ভয় দেখিয়ে আপনার বাবার সাহায্য তারা আদায় করেছে।

—তা হতে পারে...

—বেশ, আপনাকে সাহায্য করব বলে প্রতিশ্রুতি...

কথা শেষ হলো না।

একটা ঢিল এসে পড়ল ব্যাল্‌কনির উপর। রাস্তার দিক থেকেই ঢিলটা ছুটে এসেছে। তাতে একটা কাগজ জড়ানো। দীপক এগিয়ে গিয়ে মুখ বের করে দেখে।

রাস্তার ওপর একটা লোক দাঁড়িয়ে। সে দ্রুত একটা সাইকেলে চড়ে উর্দ্ধশ্বাসে অদৃশ্য হলো।

দীপক এগিয়ে গিয়ে ঢিলটা কুড়িয়ে নিল। তারপর তার গায়ে আট্‌কে-থাকা কাগজটা খুলে নিয়ে দেখে সেটা একটা চিঠি।

তাতে লেখা ঃ

ডিটেকটিভ দীপক চ্যাটার্জী

প্রাণজীকে আমি দলপতি হিসাবে চাই না, কাজেই তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে তোমাকে সাহায্য করছি সত্যি। কিন্তু তাই বলে আমরা চাই না যে তুমি আমাদের দলের বিরুদ্ধে অগ্রসর হয়ে আমাদের কাজে বাধা দাও।

যদি মলয়ার কথায় বিশ্বাস করে তুমি আমাদের দলের বিরুদ্ধে সামান্যতমও হস্ত উত্তোলন কর, তবে তোমাকে চিরদিনের জন্যে নীরব করে দিতেও কসুর করব না জেনো।

কাজেই সাবধান।

ইতি—

তোমার বিশ্বাসঘাতক বন্ধু।

চিঠিটা মনোযোগ দিয়ে পড়ল দীপক। উল্টেপাল্টে দেখল। তারপর রেখে দিল পকেটে।

মলয়ার দিকে চেয়ে মৃদু হেসে বলল—আপনাকে সাহায্য করব বলে আমি ঠিকই প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। যাক্, আপনার ঠিকানাটা রেখে যান।

মলয়া একটা কাগজের ওপর বড় বড় অক্ষরে লিখল ঃ ২৩ নং বাগবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা। তারপর নমস্কার জানিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পা দিল পথে।

সাত

—সাউথ ইণ্ডিয়ান ব্যাঙ্ক—

ক্রিং ক্রিং ক্রিং...

টেলিফোনের শব্দে চমকিত হয়ে উঠল দীপক।

তখনও মলয়ার কথা তার মন থেকে সম্পূর্ণ মিলিয়ে যায়নি। ইতিমধ্যে আবার ফোন এলো কোত্থেকে।

দীপক রিসিভার তুলল।

—হ্যালো, কে?

—আমি ইন্‌স্পেক্টর মরিসন কথা বলছি। জরুরী প্রয়োজন মিঃ চ্যাটার্জী। আপনি যদি দয়া করে একবার লালবাজারে আসেন...

—কি ব্যাপার মিঃ মরিসন?

—ফোনে এসব কথা বলা চলে না।

—কিন্তু, এদিকে যে একটা ঘটনা নিয়ে আমি বিব্রত...

—কি ঘটনা?

—চন্দননগরের নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তির খোঁজ পাওয়া গেছে!

—কে সে?

—একজন মেকানিক। তালা, সিন্দুক ইত্যাদি সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ। তাঁর মেয়ে মলয়া আমার সাহায্য চাইতে এসেছিল।

—ভাল। এর সাথে আমার ঘটনাটারও সম্পর্ক আছে মনে হচ্ছে। আপনি দয়া করে যদি এক্ষুণি একবার এদিকে...

—বেশ, এক্ষুণি আসছি।

—ধন্যবাদ।

আধঘণ্টা পর।

দীপকের গাড়িখানা এসে দাঁড়াল লালবাজার পুলিশ হেড্‌কোয়ার্টার্সের সাম্‌নে।

দীপক মিঃ মরিসনের ঘরে প্রবেশ করল। তিনি যেন সাগ্রহে দীপকের জন্যেই অপেক্ষা করছিলেন।

—কি খবর মিঃ মরিসন?

—খবর কি আর সাধারণ! গত কয়েকদিন ধরে সহরে যা চলছে তার চোটেই অস্থির। তারপর আজ আবার সাউথ ইণ্ডিয়ান ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের কাছে একটা চিঠি এসেছে।

—কি চিঠি?

—এই দেখুন না।

মিঃ মরিসন একখানা কাগজ এগিয়ে দেন দীপকের দিকে।

দীপক কাগজটা দেখেই চম্‌কে ওঠে।

এ ঠিক সেই হাতের লেখা। সেই বাসের বিশ্বাসঘাতক যে লোকটি প্রাণজী সম্বন্ধে চিঠি দিয়েছিল।

দীপক বলল—এ লেখা আমার পরিচিত। এখন শুধু ফিংগার-প্রিণ্টটা মেলানো বাকী। তাহলেই এ লোকটির সঙ্গে আমার আগেই মুলাকাৎ হয়েছে কিনা সে সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হব।

দীপক চিঠিটা পড়তে লাগল।

ছোট চিঠি ঃ

ম্যানেজার,

সাউথ ইণ্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

সমীপেষু—

আগামী কাল বেলা এগারোটায় আপনার ব্যাঙ্কের অধিকাংশ সম্পদ্ আমরা অপহরণ করব বলে স্থির করেছি। আশা করি বাধা দেবার সর্বপ্রকার চেষ্টা করবেন।

মনে রাখবেন আমাদের কথা কখনও মিথ্যা হয় না।

ইতি--

জনৈক বন্ধু।

চিঠিটা বার বার উল্টেপাল্টে দেখল দীপক।

তারপর বলল--সেকালে জানতাম আগে খবর দিয়ে ডাকাতি করা হতো। কিন্তু আধুনিককালে মহাগনরীর বুকের ওপর এমন একটা ব্যাপার বিশ্বাস করতে মন চায় না।

মিঃ মরিসন বললেন---আমিও তাই ভাবছি।

—কি ভাবছেন?

--মনে হচ্ছে এটা একটা বিরাট ধাপ্পা।

--এ রকম মনে করবার কারণ?

—আগেই খবর দিয়ে, পুলিশবাহিনীকে প্রস্তুত হবার সুযোগ দিয়ে ও ধরণের কাজ কেউ করে না।

—তা বটে। কিন্তু সম্প্রতি যে ধরণের অদ্ভুত উপায়ে বিভিন্ন তালা ও সিন্দুক খুলে একদল লোক লুণ্ঠনকায সুরু করেছে তাতে এটাকে আমি আদৌ অসম্ভব বলে মনে করি না মিঃ মরিসন।

--তাহলে আপনি সাবধানে পাহারা দেবার ব্যবস্থা করতে বলেন?

—নিশ্চয়ই।

—আর আপনি?

-আমি যে কি ছদ্মবেশে কোথায় থাকব তা আপনাকে জানাতে চাই না মিঃ মরিসন।

---আর একটা মজার ব্যাপার কি জানেন?

—কি ব্যাপার বলুন।

--এই চিঠির কপি ওরা নাকি বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রেরণ করেছে। ফলে এই ব্যাপারে পুলিশ ব্যর্থ হলে সংবাদপত্রগুলো এটা নিয়ে যে খুব মাতামাতি করবে তা সুনিশ্চিত।

—তা ত বটেই। এখন যাতে ওরা সফল না হয়, সে চেষ্টা আপনি করুন।

---আপনি কি ব্যাঙ্ক খোলা রাখার পরামর্শ দেন?

—নিশ্চয়ই। খোলা না থাকলে পাব্লিক আরও ভয় পেয়ে যাবে এবং তারা ব্যাঙ্কের ওপর আস্থা হারিয়ে ব্যাঙ্ক থেকে সমস্ত টাকাপয়সা ও দামী জিনিসপত্র তুলে নেবার ব্যবস্থা করবে। ফলে সাউথ ইণ্ডিয়ান ব্যাঙ্কের কোনও পথ থাকবে না 'লিকুইডেশনে' যাওয়া ছাড়া।

একটু চিন্তা করে মিঃ মরিসন বললেন—তা বটে। বেশ, ব্যাঙ্ক যাতে খোলা থাকে সেই নির্দেশই দিচ্ছি।

দীপক নমস্কার জানিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে।

আট

—টাইম বম্ব—

দীপক বাড়িতে প্রবেশ করে দেখে মলয়া তার জন্যে অপেক্ষা করছে।

—নমস্কার, মলয়া দেবী!

—নমস্কার। উঃ, আধঘণ্টার ওপব আমি এখানে বসে...

—আপনি তাহলে আমি বেরিয়ে যাবার ঠিক পরেই এসেছেন বলে মনে হচ্ছে।

—তা হবে।

—কিন্তু হঠাৎ বিনা নোটিশে..

—জরুরী কারণে মিঃ চ্যাটার্জী...

—কি কারণ বলুন।

—আজ বাবার চিঠি পেলাম। এইমাত্র।

—তাই নাকি? কি ব্যাপার? চিঠিটা সঙ্গে করে এনেছেন ত?

—নিশ্চয়ই। এই দেখুন।

মলয়া একটা কাগজ এগিয়ে দেয় দীপকের দিকে।

দীপক দেখে সেটা একটা চিঠি।

হাতেব লেখা তার অপরিচিত। দীপক চিঠির মধ্যে মনঃসংযোগ করে।

তাতে লেখা ঃ

মা মলয়া,

বর্তমানে আমি বাধ্য হয়েই তোদের থেকে অনেক দূরে বাস করছি। আমার হাতে এখন অনেক কাজ। আমি সেই সব কাজে ব্যস্ত থাকায় তোদের সঙ্গে দেখা করতে পারছি না আপাতত। আশা করি, সফলতা অর্জন কবে শীগ্‌গির দেখা করব।

আমার সম্বন্ধে কোনও কথা পুলিশকে জানিও না। তাহলে আমি বিপদে পড়ব। এমন কি যাদের সঙ্গে আমি আছি তারা আমাকে হত্যা পর্যন্ত করতে পারে।

ভয় পেয়ো না। আমি শীগ্‌গিরই ফিরে আসব। তুমি আমার স্নেহাশীষ জেনো।

ইতি—

তোমার বাবা।

পরপর তিনবাব চিঠিটা পড়ে দীপক।

খামের ওপরে ডাকঘরের সীলটা পরীক্ষা করে। খিদিরপুর অঞ্চল থেকে এসেছে চিঠিটা।

দীপকের মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। খিদিরপুরের কাছাকাছি কোথাও ওদের একটা আড্ডা থাকা সম্ভব।

চিঠিটা মলয়ার হাতে ফেরত দিয়ে সে বলে—বেশ একটা চাল চেলেছে আমাদের ওপর।

মলয়া বলে—তার মানে?

দীপক হেসে বলে—মানে এই যে, ওরা জোর করে কিংবা যে কোনও উপায়ে আপনার বাবাকে দিয়ে এই চিঠি লিখিয়েছে, যাতে বাধ্য হয়ে আমরা দূরে থাকি।

—বুঝেছি। মলয়া বলে—কিন্তু এখন আমার কি কর্তব্য তাই ত ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না।

—ওদের ওপর আর একটা পাল্টা চাল দিতে হবে আর কি! হাসতে হাসতে দীপক বলে।

—তার মানে?

—মানে কিছু নয়। ওদের অনুচর নিশ্চয়ই আপনার ওপর দৃষ্টি রেখেছে। আপনি দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাবার সময় আমার সঙ্গে কিছুটা গরম গরম কথাবার্তার বিনিময় করবেন, তাহলেই হবে। যেন আপনি আমার কাজে সাহায্য দিতে ইচ্ছুক নন। তাহলেই ওরা ভাববে আমি আপনার ব্যাপারে মাথা ঘামাব না।

মলয়া হেসে বলে—সত্যি বুদ্ধিটা চমৎকার। এত চমৎকার আইডিয়া আমি কল্পনাও করিনি।

দীপক বলে—তাহলে চলুন।

দুজনে নিচে নেমে আসে।

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে দীপক মলয়াকে লক্ষ্য করে চীৎকার করে বলে ওঠে—আপনি এই মুহূর্তে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান! আপনার কেস নিয়ে মাথা ঘামাতে চাই না আমি।

মলয়াও সজোরে বলে—বেশ, আপনার মতো অপদার্থ লোকের হাতে এমন একটা কেস দিতে আমার বিন্দুমাত্রও আগ্রহ নেই। দরকার নেই আমার পুলিশ বা ডিটেকটিভে। আমি চললাম।

রাগত ভঙ্গিতে জোরে জোরে পা ফেলে মলয়া চলে যায়।

দীপক তার মুখের ওপর সজোরে দরজাটা বন্ধ করে দেয়। তারপর উঠে আসতে আসতে ভাবে—সত্যি, মলয়ার অভিনয়টা খুব ভালই হয়েছে।

পরদিন বেলা দশটা।

নির্দিষ্ট সময়ে ব্যাঙ্ক খুলেছে। আজকে ব্যাঙ্কে ভিড় একটু বেশি। মাসের শেষ। তাই বহু লোক এসে জমা হয়েছে টাকা তোলবার জন্যে। তাদের লম্বা একটা লাইন হয়েছে।

ব্যাঙ্কের সেফ্ ভল্ট ঐ বাড়িখানারই নিচে মাটির তলায়। দলে দলে পুলিশ ব্যাঙ্কের সামনে পাহারা দিচ্ছে। সেফ্ ভল্টের ওপর যদি আক্রমণ হয় এই ভয়ে দু'ধারে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়েছে পুলিশবাহিনী।

মিঃ মরিসন পুলিশবাহিনী তদারক করছিলেন। তিনি আদেশ দিলেন—সন্দেহজনক কাউকে দেখলেই সঙ্গে সঙ্গে অ্যারেস্ট করবে।

কথাটা বলে তিনি ব্যাঙ্কের মধ্যে প্রবেশ করলেন।

ব্যাঙ্কের ভেতরে গিয়ে চারদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাইলেন মিঃ মরিসন। কিন্তু কোথাও সন্দেহজনক কিছু তাঁর চোখে পড়ল না।

ব্যাঙ্ক থেকে বেরিয়ে এসে তিনি রাস্তার ওপর পায়চারী সুরু করে দিলেন।

এতগুলি পুলিশ দেখে রাস্তার ওপর কৌতূহলী জনতার ভিড় জমে উঠেছিল।

মিঃ মরিসন তাদের দিকে এগিয়ে গেলেন। সজোরে হেঁকে বললেন—এই ভিড় ভাঙ্গো। হিঁয়াপর মৎ ঠাহরো...

লোকগুলো ভয় পেয়ে চারপাশে ছড়িয়ে পড়ল।

এধারে একজন চীনাম্যান ব্যাঙ্কে প্রবেশ করতে চাচ্ছিল। পুলিশেরা তাকে সন্দেহজনক লোক মনে করে সঙ্গে সঙ্গে অ্যারেস্ট করল। মিঃ মরিসন ছুটে এলেন, ভাঙা ভাঙা ইংরাজীতে জিজ্ঞাসা করলেন—কি প্রয়োজনে এখানে ঢুকছ তুমি?

চীনাম্যানটি একটি চেক দেখিয়ে বলল—টাকা তুলব...

মিঃ মরিসন চেকটা ভাল করে দেখে তাকে ছেড়ে দিলেন।

উল্টো ফুটপাথে কৌতূহলী জনতা ততক্ষণে এ সব ব্যাপার দেখে হাসাহাসি সুরু করে দিয়েছে।

ওধারে কাউন্টারের সাম্‌নে এসে দাঁড়িয়েছে একটি নারী। অপূর্ব সুন্দরী। চমৎকার বেশভূষা। প্রসাধনের পারিপাট্য তার সৌন্দর্যকে আরও খানিকটা বাড়িয়ে তুলেছে।

তারা হাতে একটি সুশোভন ব্যাগ। ব্যাগটি টেবিলের ওপর রেখে সে কাউন্টারে গিয়ে দাঁড়াল।

তার হাতে একটা দু'হাজার টাকার চেক।

কেরাণী চেকটা নিয়ে তার হাতে একটি 'টোকেন' গুঁজে দিল। তারপর বলল—ক্যাশে যান। ওখানেই টাকাটা পাবেন।

দু'হাত একত্র করে অপূর্ব ভঙ্গিতে নমস্কার জানিয়ে মেয়েটি চলে যায় ক্যাশ ডিপার্টমেণ্টে। কিন্তু এধারে ব্যাগটা যে টেবিলের ওপর পড়ে থাকে সেদিকে তার খেয়ালই নেই।

কিছুক্ষণ পরে কেরাণীর যখন খেয়াল হয় যে ব্যাগটি ওখানে পড়ে আছে তখন মেয়েটি টাকা নিয়ে ব্যাঙ্ক থেকে অদৃশ্য হয়েছে।

কেরাণীটি অগত্যা ব্যাগটি নিয়ে গিয়ে জমা দেয় ম্যানেজারের কাছে।

ম্যানেজার আনমনে সেটা টেবিলের ওপর রেখে দেন। তারপর মনঃসংযোগ করেন অন্য কাজে। ভাবেন, যখন মনে পড়বে তখন নিশ্চয়ই এসে ব্যাগটা নিয়ে যাবে।

কাঁটায় কাঁটায় এগারোটা।

ব্যাঙ্কের কেরাণীমহলে একটু চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। তবে কি সত্যই সেই দস্যুদল ব্যাঙ্ক আক্রমণ করবে?

কিন্তু তা সম্ভব নয়। যেভাবে পুলিশবাহিনী ব্যাঙ্ক পাহারা দিচ্ছে তাতে তাদের এগিয়ে ব্যাঙ্ক আক্রমণ করা, আর নির্বিঘ্নে বন্দী হওয়া প্রায় একই কথা।

ঢং ঢং..

এগারোটা শব্দ হলো ঘড়িতে।

বুম্...বুম্..বুম্.

প্রচণ্ড শব্দে ব্যাঙ্ক বাড়িটা কেঁপে কেঁপে উঠল। এ যেন যুদ্ধক্ষেত্রের কোন এক কামানের গর্জন...

কোথায়?

ব্যাঙ্কের কর্মচারীদের মধ্যে আলোড়ন সুরু হয়ে গেল। প্রবল বিস্ময়ে তারা ছুটে গেল ম্যানেজারের ঘরের দিকে। ওই দিক থেকেই শব্দটা এসেছে বলে মনে হয়।

কিন্তু একি!

ম্যানেজার মিঃ স্যানিয়েল আহত—অজ্ঞান।

তার ঘরের ওপর দিয়ে যেন বিরাট একটা বিপ্লব ঘটে গেছে।

টেবিল, চেয়ার, আলমারী সমস্ত কিছু ভেঙেচুরে তছ্‌নছ্ হয়ে গেছে। তার টুকরোগুলো সারা ঘরময় ছড়ানো। কাগজপত্র ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। সুশোভন ব্যাগটি ছিন্নবিচ্ছিন্ন।

মিঃ মরিসন ছুটে এলেন।

ব্যাগটি পরীক্ষা করে বললেন—এটা কোত্থেকে এলো?

একজন কেরাণী বলল—একজন ভদ্রমহিলা এটা ফেলে গেছেন...

—তিনি নিশ্চয়ই দস্যুদলের লোক।

—কেন স্যার?

—এই ব্যাগের মধ্যে টাইম বম্ব ছিল। সেটাই ঠিক এগারোটায় ফেটে গিয়ে এই প্রলয়কাণ্ড ঘটিয়েছে।

সকলে অবাক। একি অসম্ভব ব্যাপার!

ম্যানেজার মিঃ স্যানিয়েলকে তক্ষুণি হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা করা হলো।

মিঃ মরিসন নিচে নেমে এলেন।

এমন সময় উল্টোদিকের ফুটপাথ থেকে খোঁড়াতে খোঁড়াতে এগিয়ে এল একজন ফলওয়ালা।

সে রাস্তার ওপর কতকগুলো ফল নিয়ে এতক্ষণ হাঁকছিল—দো দো আনা জোড়া লেবু...

মিঃ মরিসনের দিকে চেয়ে বলল—টাইম বম্ব, তাই না?

মিঃ মরিসন ভ্রূ কুঁচকে জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি কে?

লোকটি মিঃ মরিসনের কানে কানে কি যেন বলল।

মিঃ মরিসন বললেন—একটা মেয়ের কীর্তি...

লোকটি বলল—হুঁ, একটি মেয়েকে আমি পাশের এই বাড়িতে ঢুকতে দেখেছি। ব্যাঙ্ক থেকে বেরিয়েই সোজা ওই বাড়িতে ঢুকেছে।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ। আমার মনে হয় ব্যাঙ্কে বোমা বিস্ফোরণ শব্দ শুধু আর একটা শব্দকে চাপা দেবার জন্যে।

—তার মানে?

—মাটির তলায় সেফ্ ভল্টেও একই সময়ে বোমা ফেটেছে। কিন্তু ওপরের শব্দে সে শব্দ চাপা পড়েছে। যাক্, এই বাড়িটা সার্চ করলেই সব জানা যাবে।

মিঃ মরিসন বললেন—আচ্ছা, আমি এক্ষুণি তার ব্যবস্থা করছি।

এই ফলওয়ালা লোকটিই যে ছদ্মবেশী ডিটেকটিভ দীপক চ্যাটার্জী তা ভাল করে বুঝিয়ে না বললেও বোধ হয় চলবে।

পাশের বাড়িতে পুলিশবাহিনী প্রবেশ করল।

বিরাট বাড়িটা যেন খাঁ খাঁ করছে। জনপ্রাণীর সাড়া নেই কোথাও।

সবগুলো ঘর সার্চ করেও কিছু পাওয়া গেল না।

মাঝের হলঘরটাতে প্রবেশ করে হঠাৎ দীপক মেঝের ওপর জুতোসুদ্ধ পা ঠুকতে লাগল।

ফাঁপা শব্দ।

নিশ্চয়ই এর নিচে কোনও গহ্বর আছে।

অনেক চেষ্টার পর মেঝের একটা অংশ সরে গেল। সেখানে লম্বা একটা গহ্বরের মুখ সুড়ঙ্গপথ।

কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে কে জানে?

দীপক বলল—আসুন এখন নিচে নেমে দেখা যাক। এমন কংক্রীট-করা সুড়ঙ্গপথ বড় একটা চোখে পড়ে না। এই ধরণের প্ল্যান করেই এটা তৈরি মনে হচ্ছে।

আগে আগে চলল দীপক। পেছনে মিঃ মরিসন। লম্বা সুড়ঙ্গটা ব্যাঙ্ক বাড়ির দিকে গেছে।

তার শেষ প্রান্ত গিয়ে শেষ হয়েছে ব্যাঙ্কের সেফ্ ভল্টের গায়ে। তারপর বোমার আঘাতে ভল্টের গায়ে একটা গর্তের সৃষ্টি হয়েছে।

সকলে ভেতরে প্রবেশ করল।

ব্যাঙ্কের সেফ্ ভল্টের সমস্ত তালা খোলা। জিনিসপত্র চারদিকে ছড়ানো। মূল্যবান জিনিসগুলো সব উধাও।

মিঃ মরিসন বললেন—সত্যিই এদের কাজের ক্ষিপ্রতা আমাকে অবাক করেছে, মিঃ চ্যাটার্জী।

দীপক বলল—কারণ আছে মিঃ মরিসন। তালাগুলো খোলবার জন্যে উপযুক্ত লোকের সাহায্য ওরা পেয়েছে। যাক্, কোনও সিন্দুকের গায়ে মনে হয় ওদের হাতের ছাপ পাওয়া যাবে।

অল্পক্ষণের মধ্যে উপযুক্ত কেমিক্যালের সাহায্যে সিন্দুকের গায়ের ওপর যে সব আঙ্গুলের ছাপ পড়েছিল সেগুলো তোলবার ব্যবস্থা করা হলো।

সেগুলো পরীক্ষা করতে করতে দীপক বলল—সেই বন্ধুর ছাপটিও দেখতে পাচ্ছি মিঃ মরিসন। মনে হচ্ছে ব্যাপারটা যেন স্বচ্ছ হয়ে আসছে।

মিঃ মরিসন কোনও উত্তর দিলেন না। পর পর এ ধরণের ব্যর্থতা তাঁকে চঞ্চল করে তুলেছিল।

নয়

—কবরখানা—

পর পর কয়েকদিন ধরে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন বের হচ্ছিল।

বিগত কয়েকদিন ধরে সহরের বুকে যে সমস্ত অরাজকতা, বিশৃঙ্খলা ও আইন-অমান্যকর কার্যকলাপ চলেছে সে সম্বন্ধে যদি কেউ পুলিশকে কোনও সন্ধান দিয়ে সাহায্য করতে পারে, তবে তাকে প্রচুর পুরস্কার দেওয়া হবে।

কিন্তু তবু কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া যায়নি।

সেদিন বিকেল।

মিঃ মরিসন চিন্তিতমনে নানা কাজকর্মে ব্যস্ত ছিলেন। এমন সময়ে প্রবেশ করল দীপক।

মিঃ মরিসনকে লক্ষ্য করে দীপক প্রশ্ন করল—কি স্যর, এর মধ্যে কোনও খবর আপনার কাছে এসে পৌঁছেছে কি?

—না। মিঃ মরিসন বললেন—আমি চেষ্টার ত্রুটি করছি না মিঃ চ্যাটার্জী, কিন্তু...

কথা শেষ হয় না।

—একজন সার্জেন্ট এসে স্যালুট করে দাঁড়ায়।

একজন লোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান স্যর।

—কে? মিঃ মরিসন প্রশ্ন করেন।

—একজন বহুপুরোনো দাগী আসামী।

—কেন?

—সে কোনও কারণ বলছে না। আপনার সঙ্গে নাকি তার দেখা করার প্রয়োজন। জরুরী দরকার। একেবারে নাছোড়বান্দা লোক স্যর, কিছুতেই শুনছে না।

—বেশ, তাকে পাঠিয়ে দাও।

ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে প্রৌঢ় মতো একজন লোক।

মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। চেহারার মধ্যে কেমন একটা রুক্ষতা। তবে লোকটির বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা তার চেহারার মধ্যে বর্তমান। ক্রাইম্ জগতে তার নাম টেকো পাঁচু। সেটা বোধ হয় পঞ্চানন নামের অপভ্রংশ। ওর হাত সাফাইয়ের যথেষ্ট সুনাম আছে। তবে ধরাও পড়েছে বহুবার। বার আষ্টেক জেল খেটেছে।

—কি খবর পাঁচু? আজকাল ভালভাবেই আছ ত? না, আগের মতোই হাতসাফাই বিদ্যে ঠিকমতো চালাচ্ছ?

—কি যে বলেন কর্তা! পাঁচু গদ্গদকণ্ঠে বলল—ওসব ঝামেলার মধ্যে আর বুড়ো বয়সে যেতে চাই না। তাই ত আপনার শ্রীচরণে এসে হাজির হলাম।

—কিন্তু আমার কাছে আবার কেন?

—আপনারা কাগজে দিয়েছেন যে, খবর দিতে পারলেই টাকা দেবেন।

এতক্ষণে ইন্স্পেক্টর মরিসন যেন টেকো পাঁচুর রহস্য উদঘাটন করতে সক্ষম হলেন। তিনি হেসে বললেন—বুঝেছি তোমার মতলব, কিন্তু এসব খবর তুমি কি করে জানবে?

পাঁচু হেসে বলে—আমাদের জগৎটাই আলাদা কর্তা। এখানে একজনের খবর জানতে অন্যের দেরী হয় না। কয়েকজন স্যাঙাতের মুখে ওদের খবর পেলাম। ওদের দলে নাকি খুব ভাল টাকা দিয়ে লোক নিচ্ছে। তাই খবরগুলো নিয়ে ছুটে এলাম আপনার কাছে। কিছু টাকা পেলে শেষজীবনে বরং পশ্চিমের দিকে গিয়ে ছোটখাটো ব্যবসা করে জীবনটা কাটিয়ে দেব!

—তাহলে সুমতি হয়েছে দেখছি। মিঃ মরিসন বললেন।

—হেঁ হেঁ, তা আপনাদের আশীর্বাদে..বিনয়ে গদগদকণ্ঠে পাঁচু বলল।

—তা ওদের ঠিকানাটা কি শুনি!

ফিস্ ফিস্ করে পাঁচু বলে—খুব সাবধানে স্যর। ওদের দলের লোক সব জায়গাতেই ছড়ানো আছে। যাক্ শুনুন, ওদের আড্ডা হচ্ছে খিদিরপুরের একটা গলির ভেতর একটা তিনতলা বাড়ি। আর ওদের দলের মাথা হচ্ছে এই সহরেরই একজন বিখ্যাত ধনী লোক। তার নাম প্রাণজী।

—প্রাণজী! মিঃ মরিসন যেন আকাশ থেকে পড়লেন। তা কি করে সম্ভব?

—পৃথিবীতে অনেক আপাত-অসম্ভব জিনিসই পরে সম্ভব বলে প্রমাণিত হয় স্যর..দীপক বলল।

—তার মানে?

—প্রাণজীই যে এই বিরাট দলের মূল নায়ক তা আমি জানতাম স্যর। কিন্তু প্রমাণের অভাবে...

হো হো করে হেসে উঠল টেকো পাঁচু।

বলল—এতদিন জানতাম যে ক্রিমিন্যালরা থাকে চোখের আড়ালে। সব সময় তারা থাকে লুকিয়ে। কিন্তু প্রাণজীর কথা ভিন্ন। সে অবাধে বাস করে কম্বুলীটোলায় তার নিজের বাড়িতে। পৃথিবীতে এমন কোনও লোক নেই যে প্রাণজীর বিরুদ্ধে কোনও প্রমাণ সংগ্রহ করে তাকে গ্রেপ্তার করে। সে নির্বিবাদে তার কম্বুলীটোলার বাড়ির দোতলায় বসে নিশ্চিন্ত আরামে দিন কাটিয়ে চলেছে।

—কিন্তু খিদিরপুরের ঠিকানাটা...মিঃ মরিসন বললেন।

—খিদিরপুরের সেই বাড়িটা আমাদের জগতে কবরখানা বলে পরিচিত।

—কবরখানা?

—হ্যাঁ, হুজুর। কিন্তু আমার টাকা...

—সন্ধান না পাওয়া পর্যন্ত এক পয়সাও নয়। তোমার ঠিকানা রেখে যাও। যদি তাদের সন্ধান পাই তবেই টাকা।

—বেশ। এইবার তবে বাড়িখানার অবস্থান আপনাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি...

মিঃ মরিসন টেকো পাঁচুর কথায় মনোযোগ অর্পণ করলেন।

দশ

—আর এক দৃশ্য—

সন্ধ্যা হয়ে আসছে।

পৃথিবীর আত্মা ঝিমিয়ে আসছে বিশ্রামের আশায়। কর্মশেষে আনন্দ।

কিন্তু আর এক শ্রেণীর নিশাচর সরীসৃপদের জীবনে এটুকুই কর্মের সময়। নিয়তির ঘড়িবাঁধা কালো রাতের কয়েকটি ঘণ্টা।

খিদিরপুরের কফিখানা নামে খ্যাত বাড়িখানার দোতলায় একটা ঘরে বসে মতিহারী বাঈ।

অসীম ক্লান্তি যেন তার সারা দেহে আর মনে। করুণ কান্নার মতো একটানা কি একটা অবসাদ।

ছুটি চাই। চাই মুক্তি। একটুকরো শান্ত নিশ্বাস ফেলবার অবকাশ।

মতিহারী ভাবে।

সমাজের অত্যন্ত নিচু স্তরের মেয়ে ছিল সে। ছিল না বাপ-মায়ের ঠিকানা, নিজের পরিচয়। বাকী জীবনটুকু হয়ত তার কাটত হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে, ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে, দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফেলে।

কিন্তু কোত্থেকে এলো প্রাণজী।

রহস্যময় এক মানুষ। আজও সে তাকে চিনতে পারেনি, জানতে পারেনি তার গভীর মনের একটুকরো রহস্যও।

তবুও এই প্রাণজী তাকে অতলস্পর্শী সরোবরের না-জানা গহ্বর থেকে তুলে এনে প্রতিষ্ঠিত করেছে আজকের দুনিয়ায়। লফ্‌টি পোজিশন্। প্রচুর সম্পদ। কি আর তার চাইবার থাকতে পারে?

কিন্তু তবু আজ মতিহারী ভাবে জীবনে কি যেন সে চেয়েছিল, অথচ পায়নি তা। কি সে জিনিস?

সেই প্রার্থিত বস্তুটির অপ্রাপ্তির হতাশ্বাসেই কাটে সন্ধ্যার এই কয়েকটি অলস প্রহর।

তার বাকী জীবনটুকু শুধু বন্ধুর উচ্ছৃঙ্খলতা। অভিনয়। ন্যাকামি। জড়তা। এর বেশি আর কিছুই কি সে চাইতে পারে না?

তিনবার হাততালি দেয় মতিহারী।

ঘরে প্রবেশ করে দীর্ঘকায় একটি লোক। একচোখ কাণা। করবখানায় এ কাণাকড়ি নামে পরিচিত। এর হাতের ছুরি কখনও ব্যর্থ হয় না বলে সকলে জানে।

—মাইজী!

—শোন কাণাকড়ি, তোর সঙ্গে কথা আছে।

—ফরমাইয়ে।

—এ আদেশের কথা নয় কাণাকড়ি। এ হচ্ছে অনুভূতির কথা—চিন্তার কথা।

—বলুন।

—তোমাদের সারাজীবন কি এমনি আদেশ শুনে শুনেই কাটবে? এছাড়া কি আর কিছু তোমাদের পেতে নেই? চাইতে নেই?

কাণাকড়ির একচোখ জ্বলে ওঠে।

—উত্তর দাও।

—ভগবান যাকে যা দিয়েছেন মা..

কথা শেষ হয় না।

ঘরে প্রবেশ করে প্রাণজী।

একটা বিরাট বরফের চাপ যেন এসে আছড়ে পড়ে মতিহারী বাঈয়ের সামনে।

—বন্দেগী বাঈসাহেবা!

—এমন অসময়ে তুমি হঠাৎ.

—কেন, আসতে নেই নাকি?

—আশা করিনি।

—না, আশঙ্কা ছিল?

—মনকে নিয়ে অত চুলচেরা বিচার করতে আমি ভালবাসি না প্রাণজী।

—একটা দরকারে এসেছি। শোন

—দরকার ছাড়া যে তুমি আস না তা আমি জানি।

—অর্থাৎ?

—একদিন তোমার এই দরকারের খেয়াল মেটাতেই আমি সমাজের একটা তুচ্ছ গলির অন্ধকোণ থেকে উঠে এসে পা রেখেছি খ্যাতির চূড়ায়। আবার তোমার দরকার মিটে গেলেই হয়ত..

হা হা করে হেসে ওঠে প্রাণজী

একঝলক বিষাক্ত অট্টহাসি যেন। কি গভীর ব্যথা বেদনা সে হাসির সাথে জড়িত। কি অপরিসীম তিক্ততা!

—এ আমি জানতাম বাঈসাহেবা। জানি তুমি আমার অনুচরদের মধ্যে বিষ ছড়াচ্ছ। প্রচার করছ—বিদ্রোহ তিক্ততা। কিন্তু তবুও আমি তোমার প্রশংসা না করে পারি না মতিহারী..

—কারণ?

—তুমি একজন ইনবর্ণ আর্টিস্ট। তোমার অভিনয়-প্রতিভাকে আমি সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই। তোমাকে ছাড়া আমার কোনও প্ল্যানই আজ পর্যন্ত কার্যকরী হতে পারত না। এমন কি সেদিনও ব্যাঙ্কে যে-অভিনয় তুমি করলে তাতে সত্যিই আজকের মঞ্চের যে কোনও অভিনেত্রী লজ্জা পাবে।

—কি তোমার উদ্দেশ্য খুলে বল।

—খুলে বলবার আর বেশি কিছু বাকী নেই। কথাটা আমার চিরকালই জানা। ক্রাইম ডাজ্ নট্ পে। পাপের ঋণ একদিন কড়ায় গণ্ডায় চুকিয়ে দিতে হবেই।

—তোমার কথার অর্থ প্রাণজী...

—অর্থ বোঝাবার আর বেশি দেরী নেই বোধ হয়। ঐ যে বাঈসাহেবা। হাঃ হাঃ হাঃ.

বাইরে পর পর দুটি মোটর এসে থামবার শব্দ শোনা যায়।

প্রাণজী উঠে দাঁড়ায়। সবলে জানালার দুটি গরাদ ধরে টান দেয়! জীর্ণ গরাদ ফাঁক হয়ে যায়। সংকীর্ণ একটি পথ!

প্রাণজী সেই পথ দিয়ে অক্লেশে একতলায় লাফিয়ে পড়ে।

নিচেই দাঁড়িয়েছিল কাণাকড়ি।

তার পিঠ চাপড়ে প্রাণজী বলে—একদম সাবাড় কর দেনা। এক হাজার রূপাইয়া ইনাম।

প্রাণজী কথা বাড়ায় না আর।

রাতের নিকষকালো আঁধার-ঘেরা যবনিকার আড়ালে মিলিয়ে যায় প্রাণজীর দেহ।

কাণাকড়ি ওপরে উঠে আসে। তার চোখটা তখন হিংস্র উল্লাসে দপ্ দপ্ করছে।

এগারো

—কাণাকড়ির কর্তব্য—

পুলিশবাহিনী কবরখানা ঘেরাও করেছে।

দলে দলে পুলিশ এসে দাঁড়িয়েছে দরজায়। সারা বাড়ি পুলিশের বেষ্টনীতে আবদ্ধ।

সদর দরজায় কড়া নড়ে ওঠে সজোরে।

আঃ আ আ আ...

নারীকণ্ঠের আর্ত চীৎকার। মরণ-কাতর ধ্বনি! ধরিত্রীর পাঁজরে পাঁজরে যেন বেদনামাখানো মহাজিজ্ঞাসা। পাপের পথ বুঝি এমনই করুণ। মহাকালের খাতায় লেখা হয় মর্মছেঁড়া একটুকরো কাহিনী।

কড় কড় কড়াৎ...

সজোরে কড়া নড়তে থাকে। প্রবল চাপে বহু পুরোনো বাড়ির জীর্ণ অর্গল ভেঙে পড়ে।

পুলিশবাহিনী কলরব করতে করতে ভেতরে প্রবেশ করে।

প্রবেশ করেন মিঃ মরিসন। দীপক চ্যাটার্জী আর রতনলাল।

দোতলার ঘরে লুটিয়ে পড়েছে মৃত মতিহারী বাঈয়ের দেহ। তার শেষ নিশ্বাস বাতাসের তরঙ্গে তরঙ্গে মিশে গিয়ে বায়ুস্তরকে ভারী করে তুলেছে।

নিস্পন্দ কাণাকড়ি। হাতে তার রক্তমাখা ছোরা। মৃত্যুর নেশায় যেন প্রদীপ্ত—রাঙা।

ছুটে এসেছে প্রাণজীর অন্যান্য অনুচরেরা—ওসমান, শাহজাদা, হুসেন।

সকলের মুখে প্রশ্ন—মনে জিজ্ঞাসা। কাণাকড়ি এ কি কাণ্ড করে বসল!

পেছনে পুলিশবাহিনী।

হতচকিত মুহূর্তে পালাবার অবকাশ পায় না কেউ। সকলেই বিনা বাধায় একে একে ধরা দেয়।

সকলের শেষে বন্দী হয় কাণাকড়ি। কার নির্দেশে যে সে এমন একটা কাজ করে ফেলেছে সে সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র আভাসও পাওয়া যায় না তার কাছ থেকে।

সকলে শুধু ভাবতে থাকে একই কথা—বিখ্যাত নর্তকী মতিহারী বাঈ নিহত।

প্রাণজীর একমাত্র বিখ্যাত সহচর, প্রত্যেকটি কাজে তার নির্ভরযোগ্য সহচরী মতিহারী নিহত! কিন্তু কেন? কে দেবে তার উত্তর?

বারো

—পাপের দেনা—

রাত তখন দশটা।

লালবাজার থানায় ইন্‌স্পেক্টর মরিসন আর ডিটেকটিভ দীপক চ্যাটার্জী বসে। বিগত ঘটনারই আলোচনা করছিল তারা।

দীপক বলল—এমন একটা ঘটনা যে ঘটবে তা আমি আগেই জানতাম।

মিঃ মরিসন বললেন— কেন?

—ওদের ভেতরে ভেতরে যে একটা চক্রান্তের বিষ ফেনিয়ে উঠছিল তা আমি জানতাম। তার প্রমাণও পেয়েছি। কিন্তু সেই বিশ্বাসঘাতক যে কে তা বুঝতে পারিনি।

—এখন পেরেছেন?

—হ্যাঁ।

—কে?

—প্রাণজীর বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করছিল তার সবচেয়ে প্রিয় সহচরী এই মতিহারী বাঈ।

—সে কি?

—হ্যাঁ। ঠিক তাই।

—কিন্তু কি করে জানলেন?

—তার যে সব চিঠি আমি আগে পেয়েছি তার সাথে মিলিয়ে দেখলাম তার ফিংগার ইম্‌প্রেশন।

—কি পেলেন?

—মতিহারী বাঈই আমাকে বিশ্বাসঘাতকতা করে চিঠি লিখেছিল। আর পত্রবাহক তারই অনুচর।

—কিন্তু কেন?

—লাভ ফর পোজিশন্। ও আপনি ঠিক বুঝবেন না মিঃ মরিসন। ক্রিমিন্যালদের চেয়ে বড় শত্রু ক্রিমিন্যালদের আর কেউ নেই। ওরা না বিগড়ে গেলে পুলিশের কি সাধ্য যে...

—বুঝেছি।

—যাক্, ওদের চেষ্টাতেই ওরা ধরা পড়ল। মলয়ার বাবা বিনোদবাবুকেও পাওয়া গেল। কিন্তু...

—কিন্তু কি?

—প্রাণজী গেল কোথায়? ওর বিরুদ্ধে ত এখন আর প্রমাণের অভাব নেই। আমরা এক্ষুণি তাকে গ্রেপ্তার করতে পারি।

— তা জানি মিঃ চ্যাটার্জী। আর সেই জন্যেঃ আমি আজ তোমাদের হাতে আত্মসমর্পণ করতে এসেছি।

—একি, প্রাণজী?

—একি, তুমি?

ঘরের মধ্যে একটা বজ্রপাত হলেও বোধ হয় সকলে তত বিস্মিত হতো না।

প্রাণজী একটা নিঃশেষিত সিগারেটের আগুনে আর একটা সিগারেট ধরিয়ে নিল। তারপর বলল—ধরা আমাকে পড়তেই হবে। কাজেই আর লুকোচুরি খেলে কি লাভ? সমাজের উঁচু পোজিশন্ থেকে নেমে এসে তস্করের জীবন আর যাপন করতে চাই না আমি। কি প্রয়োজন এতে? কি লাভ? তার চেয়ে এই অনেক ভাল। আর তা ছাড়া...

—তা ছাড়া কি, বলো প্রাণজী।

প্রাণজী হাসল।

সেই সৃষ্টিছাড়া বিষাক্ত একঝলক হাসি। তারপর বলতে সুরু করল—যেদিন দেখলাম মতিহারী বাঈও আমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করছে সেদিন থেকেই এ পাপের জীবনে ধিক্কার এসে গেছে মিঃ চ্যাটার্জী। পাপের পথ বড় বিশাল। নিঃস্ব, রিক্ত অবস্থায় একদিন এ পথে এসে দাঁড়াই। সাধুতার পথ কণ্টকবহুল। অসাধুতার পথ পিচ্-ঢালা রাজপথের মতোই মসৃণ। কিন্তু তবু...

সিগারেটে দুটো সুদীর্ঘ টান দিয়ে প্রাণজী বলতে লাগল—এ-পথে এসে উপার্জন করেছি প্রচুর। টাকা নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছি। টাকা-টাকা খেলা করেছি। কিন্তু তবু দেখলাম শান্তি নেই এ-পথে। স্বস্তি নেই। বিশ্বাস নেই। নেই স্নেহ-মমতা-ভালবাসা। যে মতিহারীকে একদিন বস্তির কুঁড়েঘর থেকে তুলে এনে জীবনের সঙ্গী করে নিলাম, যাকে ঘিরে জীবনের স্বপ্নজাল রচনা করলাম—যার বিরুদ্ধে অজস্র ব্ল্যাকমেলিং চলছিল, সে সব থেকে তাকে বাঁচালাম, সেই কিনা শেষ পর্যন্ত চাইল দলের প্রধান আসন অলঙ্কৃত করতে। সাহায্য সে করেছে প্রচুর। বিশ্বাসঘাতকতাও করেছে অজস্র। মানদণ্ডে দেখলাম পরেরটাই বেশি ভারী। তাই আজ প্রাণজীর বিরুদ্ধে প্রমাণের অভাব নেই। ডিটেকটিভ দীপক চ্যাটার্জী চায় প্রাণজীকে গ্রেপ্তার করতে।

অথচ একদিন এই প্রাণজীর ছিল সম্মান, ছিল অর্থ, ছিল মর্যাদা, ছিল দান-ধ্যান-মাহাত্ম্য। কাগজে কাগজে কত সুনাম। ছবিও বোধ হয় দু-একবার ছাপা হয়েছে। যক্ষ্মা হাসপাতালে সাহায্য। কুষ্ঠরোগীদের দান। এমনি কত কি!

জীবনে মানুষ কি চায় তা বলতে পার দীপক?

একটু চিন্তা করে দীপক বলল—স্বস্তি। আনন্দ।

প্রাণজী হো হো করে হেসে বলল—ওঃ, এটা একটা ভেগ্ টার্ম। সততার পথে শান্তি নেই—কারণ অর্থের অভাবে শান্তি হয় না। আনন্দ ত নয়ই। আর অসাধুতার পথে? পথ অবশ্য বিরাট। সঙ্গীরও অভাব নেই। কিন্তু সেই সঙ্গীরাই একদিন...

মিঃ মরিসন কি যেন ভাবছিলেন।

প্রাণজী বলল—আর নয় মিঃ মরিসন। এবারে অ্যারেস্ট করুন। রাত অনেক হলো। বাকী রাতটুকু ঘুমোতে চাই। পাপের দেনা শোধ করতে ত হবেই। তার আগে যেটুকু বিশ্রাম...

প্রকাশ্য আদালতে প্রাণজী নির্বিবাদে সব কথা স্বীকার করে।

বলে—কাণাকড়ির দোষ নেই। আমি ওকে আদেশ দিই মতিহারী বাঈকে হত্যা করবার জন্যে। যদি কোনও শাস্তি দিতে হয় আমাকে দিন।

বিচারক বলেন—পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ড।

প্রাণজী হাসিমুখেই দণ্ড গ্রহণ করে।

পুলিশ ভ্যানে ওঠবার আগে অনেকেই প্রাণজীর সঙ্গে দেখা করে। মিঃ মরিসন, দীপক, বিনোদ চ্যাটার্জী, মলয়া।

প্রাণজী হঠাৎ আঙুল থেকে একটা হীরে-বসানো আংটি খুলে মলয়ার হাতে পরিয়ে দেয়।

বলে—জীবনে তোমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি বোন। আমার ওপর কোনও রাগ রেখো না তুমি।

প্রাণজী সকলের কাছে বিদায় নেয়। তারপর উঠে পড়ে পুলিশ ভ্যানে।

মলয়ার চোখ অশ্রুসজল। সেটা কি প্রাণজীর জন্য দুঃখে, না বাবাকে ফিরে পাওয়ার আনন্দে?

—শেষ—

মিথ্যা চমক

এক

—চ্যাং-এর আড্ডা—

ঢং ঢং...

দূরের পেটা-ঘড়িটা জানিয়ে দিল রাত দশটা।

ট্যাংরার নিম্ন-অঞ্চলের একটা বস্তি। ছোট ছোট সব কাঠের ঘর। স্যাঁৎসেঁতে মেঝে। ইলেকট্রিসিটি এখানে প্রবেশাধিকার পায়নি। খুপরির মত ঘরগুলোতে টিম্ টিম্ করে মোমবাতি জ্বলে। সে অল্প আলোয় অন্ধকারকে দূর করে আলোকের স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করা যায় না।

ঠিক রাত দশটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে একজন দীর্ঘকায় লোককে গলিপথ পার হয়ে একটা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াতে দেখা গেল।

পরনে স্যুট। তার ওপর ওভারকোট। মাথায় হ্যাট্। বেশভূষায় যতটা সম্ভব আভিজাত্যের প্রকাশ।

—কাকে চাই? চীনা ভাষায় একজন প্রশ্ন করে।

—ওয়াং হিন। চীনা ভাষায় উত্তর দেয় লোকটা।

সঙ্গে সঙ্গে শোনা যায় একটা অস্পষ্ট পেচকের ডাকের মত শব্দ। ধীরে ধীরে সেই ডাকের অনুকরণে ডেকে উঠল আরো অনেকগুলো লোক। সারা বাড়ির বুকে যেন ছড়িয়ে পড়ল ওই বিচিত্র শব্দ।

—ভেতরে যাও।

—ধন্যবাদ!

লোকটি এগিয়ে চলে।

সরু পথটার ওপর কিছুটা করে ফাঁক রেখে একজন করে চীনেম্যান বসে। তাদের চোখগুলো যেন নেশায় মুহ্যমান। কিসের এক অজানা সন্দেহে পাণ্ডুর যেন। ঢুলু-ঢুলু। পৃথিবীর ঘুম নেমে এসেছে তাদের সে চোখগুলোয়।

—দাঁড়াও!

দরজার ঠিক মুখোমুখি এসে একজন তার গতিরোধ করে।

—কি খবর ওস্তাদ? দীর্ঘকায় আগন্তুক পশ্ন করল।

উত্তরে অন্য লোকটি মৃদু হাসে। লোকটি বৃদ্ধ। বেশভূষা অবিন্যস্ত। চুল রুক্ষ। পৃথিবীর সবকিছুর প্রতি যেন একান্ত বীতরাগের ভাব তার চোখে-মুখে ফুটে উঠেছে।

—আমার পাওনা?

—ও, কমিশন?

—হ্যাঁ।

—আগে ঘুরে আসি ওস্তাদ। কিছু না পেলে কি করে...

—বেশ, যাও।

—চ্যাং আছে ত?

—হ্যাঁ। সোজা চলে যাও।

লোকটা এগিয়ে যায়। গতিভঙ্গিতে দৃঢ়তা। দৃপ্ত তেজ। পৃথিবীর কাউকে গ্রাহ্য বা ভয় করবার জন্যে তার জন্ম হয়নি।

—কি খবর ওস্তাদ?

ভেতরের ঘরে প্রবেশ করবার সঙ্গে সঙ্গেই একজন লোক প্রশ্ন করে।

এখানে ভেতরের ঘরখানির একটু বর্ণনা দেওয়া উচিত। বস্তির অন্য সব ঘরের তুলনায় এ ঘরটা একটু বড়। অনেকটা যেন একটা গুদামঘরের মত। পৃথিবীর মুক্ত প্রকৃতির অবারিত আলো-বাতাস এখানে খুব কমই প্রবেশ করবার অবকাশ পায়।

ঘরটার এক কোণে একটা মস্ত বড় টেবিল।

তার চারদিকে সার সার সব চেয়ার পাতা। ঠিক কেন্দ্রস্থলে একসঙ্গে জ্বলছে গোটা তিনেক মোমের বাতি।

টেবিলটাকে ঘিরে চেয়ারগুলোতে বসে কতকগুলো চীনে আর অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান যুবক। মরণ-সাগরের ওপারের দরবারে একদল বিচারপ্রার্থী যেন!

তাদের একাগ্র দৃষ্টি একটি প্রৌঢ় লোকের দিকে নিবদ্ধ। ওই প্রৌঢ়কে সকলে জানে চ্যাং বলে।

প্রৌঢ় লোকটি কতগুলি তাস নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল। তাদের হাবভাব দেখে বোঝা যায় পৃথিবী থেকে অনেক দূরে আশ্রয় নিয়েছে তাদের মন। তারা জানে শুধু তাস, টাকা আর নেশা। এছাড়া কোনও চতুর্থ বস্তু যে এ পৃথিবীতে আছে একথা তারা মানতে চায় না।

দীর্ঘকায় আগন্তুককে দেখে চ্যাং উঠে এসে প্রশ্নটা করে।

লোকটি উত্তরে বলে—তোমার কোনও ভাবনা নেই ওস্তাদ। মাল ঠিকই এসে পৌঁছে গেছে।

—কি মাল?

—দুশো ভরি আফিং আর এই এক কৌটো কোকেন।

—সাবাস! তোমাকে আমার তাই এত পছন্দ! যাক্, টাকাটা কি এখনই চাই?

লোকটা বিচিত্র ভঙ্গিতে ঘাড়টা নেড়ে বলে—টাকা বাকির কারবার করতে গেলে মালটাও বাকি থাকে ওস্তাদ। নগদ মাল মানেই নগদ টাকা।

কুশ্রী হাসিতে মুখখানা ভরিয়ে তুলে চ্যাং বলে—তা ত বটেই, তা ত বটেই। বিশ্বের উজাড়-করা লোভ যেন তার কুঁতকুঁতে দুটো চোখে। তারপর কোমর থেকে বের করে একটা চামড়ার ব্যাগ। তার মধ্য থেকে কতকগুলো নোট লোকটার হাতে তুলে দিয়ে চ্যাং বলে দু'হাজার আছে। গুনে নাও।

—আর বাকি পাঁচশো?

লোকটা প্রশ্ন করে।

—তার জন্য চিন্তা কি! আবার যে দিন মাল আনবে—

—তাহলে আফিং না হয় কিছু কম নাও—কি বল?

—আমাকে বিশ্বাস হয় না?

—বিশ্বাস, পুণ্য, সত্য, ধর্ম এসব কথাগুলোকে আমার অভিধান থেকে একেবারে কেটে বাদ দিয়ে দিয়েছি চ্যাং।

—বেশ। নাও তবে।

আরও কতকগুলো নোট চ্যাং লোকটার হাতে গুঁজে দিয়ে মালগুলো নিয়ে নেয়। তারপর পা বাড়ায় ভেতরের একটা চোরকুঠুরীর উদ্দেশ্যে।

ওদিকে জুয়োর টেবিলে ততক্ষণে গোলমাল সুরু হয়ে গিয়েছে।

—এদিকে এসো না হে চ্যাং...

—বলি, ফাঁকি দেবার মতলব নাকি হে তোমার?

—দেরী করছ কেন বাবা...সবুর সইছে না...

চ্যাং মালগুলো রেখে বেরিয়ে আসে খোঁড়াতে খোঁড়াতে। তার একটা পা ছোট, তাই জন্ম থেকেই সে এমনি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলতে অভ্যস্ত।

টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দেবার ভঙ্গিতে চ্যাং সুরু করে—জীবনে কখনও কাউকে ঠকাইনি। জুয়োর বোর্ডে কারো এক পয়সা কখনও মেরেছি এমন কথা কেউ বলতে পারে? কই বলুক দেখি কেউ...

দীর্ঘদেহ লোকটা টাকাগুলো গুনে নিয়ে পকেটে পুরেছিল। এবার সে টেবিলের কাছে এসে দাঁড়িয়ে বলে—বাবা দেখছি ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির!

চ্যাং বাংলা কথা বোঝে না। সে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে বলল—কি বললে? সাধুতা? হ্যাঁ, সততার গর্ব যদি কেউ করতে পারে ত সে এই চ্যাং—কি বল ওস্তাদ?

তারপর চোখ দুটো পিট্ পিট্ করতে করতে বলে—কি বাবা, হবে নাকি দু-এক দান?

দীর্ঘদেহ লোকটি হো হো করে হেসে উঠল। বলল—মিথ্যে কেন হেরে মরবে চ্যাং! তার চেয়ে এই সব ছেলেছোকরাদের ঠকিয়ে দু'পয়সা যা পাচ্ছ, তাই নিয়েই সন্তুষ্ট থাক।

—তার মানে?—চ্যাং যেন গর্জে উঠল। কি বলতে চাও হে ছোকরা? দু' দশ ভরি আফিং আর কোকেন বয়ে এনে মাথা কিনে নিয়েছ নাকি? এতবড় তোমার সাধ্যি যে, বলো কিনা আমি লোক ঠকাই...

অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ছেলেগুলো তখন চীৎকার করে উঠল—চ্যাং, তুমি তাহলে আমাদের ঠকিয়ে নেবার কারবার সুরু করেছ?

চ্যাং চীৎকার করে ওঠে—তোমরা পাগল হয়ে গেলে নাকি? এই লোকটার কথা শুনে...

লোকটি সমান তেজের সঙ্গে উত্তর দেয়—আমি বসব নাকি টেবিলে?

চ্যাং বলল—নিশ্চয়ই। এক্ষুণি বসো না। কে তোমাকে বারণ করছে? তোমার এত বড় সাহস যে আমাকে বল কিনা জোচ্চোর!

লোকটা টেবিলের এক কোণে বসে পড়ে।

খেলা সুরু হয়। চ্যাং 'সাফ্ল' করে তাস বেঁটে দেয়। সকলেই আপন আপন তাস তুলে নেয়, কেবল চ্যাং বলে—আমি ব্লাইণ্ড ধরব।

লোকটা উত্তর দেয় না। শুধু মৃদু হাসে। তারপর বলে—ধরো দেখি ওস্তাদ!

দান ধরা চলে।

শুধু চ্যাং আর সেই লোকটা। অন্য সকলেই তাস ফেলে দেয়।

চ্যাং ধরে পঞ্চাশ। লোকটা একখানা একশো টাকার নোট এগিয়ে দেয়। তারপর বলে—তাস দেখাও!

চ্যাং তাস তুলে গম্ভীর মুখে বলে—তোমার কি তাস?

লোকটা বলে—রান!

শিকারী বাঘের মত চ্যাং-এর কুত্‌কুতে দুটি চোখ থেকে যেন বিশ্বের লালসা ঝরে পড়ে। সামনের ঠোঁটটা উল্টে বলে—দুইয়ের ট্রাইও! বলে টেবিলের ওপরে রাখা রাশীকৃত নোটগুলো নিজের কোলের দিকে টেনে নেয়।

লোকটাকে হেরে যেতে দেখে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ছেলেগুলো অবাক হয়ে যায়। চীনা যুবকগুলো তার উত্তরে শুধু একটু অবজ্ঞার হাসি হাসে।

আবার খেলা চলে।

এবারেও লোকটা অনেক টাকা হেরে যায়। চ্যাং টাকাগুলো যেই কোলের দিকে টেনে নিতে উদ্যত হয়, অমনি লোকটা লাফিয়ে উঠে বলে—তোমার 'জোকার' দুটো দাগী চ্যাং। আর যার চোখেই ধুলো দাও, আমার চোখ দুটোকে ঠকানো অত সহজ নয়।

—তার মানে? চ্যাং যেন গর্জে ওঠে।

—ঠিকই বলছি। শান্তকণ্ঠে লোকটা বলে—হয় তাসজোড়া পাল্টাও, নয়ত আমার টাকা ফেরত দাও।

এবার অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান যুবকের দল চীৎকার করে ওঠে।

—চুরি! জোচ্চুরি! শয়তানী! তাস পাল্টাও, না হলে তোমাকে খুন করব শয়তান!

চ্যাং বাধ্য হয়ে নতুন আর এক জোড়া তাস বের করে। তাসটা বেশ ভাল করে পরীক্ষা করে লোকটা বলে—ঠিক আছে। তাস বাঁটো।

তাস বাঁটা হয়।

খেলা চলে শুধু দুজনের মধ্যে।

চ্যাং বলে—আমি ব্লাইণ্ড!

লোকটি মৃদু হেসে বলে—আমিও ব্লাইণ্ড!

চ্যাং একখানা দশ টাকার নোট ছুঁড়ে মারে টেবিলের ওপরে।

লোকটি ধরে একখানা একশো টাকার নোট।

চ্যাং পাঁচশো। লোকটি পাঁচশো। অবশেষে চ্যাং একগোছা নোট ধরে বলে—এই এক হাজার সই! লোকটিও এক হাজার টাকা গুনে গুনে ধরে বলে—তাস দেখাও!

চ্যাং বলে—বিবির জোড়।

লোকটা তাস ফেলে দিয়ে বলে—ফ্ল্যাশ।

সমস্ত টাকা নিজের পকেটে রেখে লোকটা বলে—কি হে স্যাঙাৎ, খেলার সখ মিটেছে ত?

চ্যাং বলে—আরও এক দান।

আবার খেলা চলে। চ্যাং দু' হাজার টাকা হেরে যায়।

গম্ভীর মুখে টাকাগুলো পকেটে রেখে লোকটা বলে—যাক্, আজ ভাগ্যটা ভাল ছিল। বেশ দু' পয়সা হলো দেখতে পাচ্ছি।

অকস্মাৎ হিংস্র নেকড়ের মত চ্যাং উঠে দাঁড়িয়ে কোমরে হাত দেয়। কোমরে তার একটা বিরাট ধারালো ছোরা গোঁজা।

লোকটা যেন তৈরী হয়েই ছিল।

একটা নিকষকালো ছোট্ট রিভলবার চ্যাং-এর দিকে উদ্যত করে বলে—খবরদার! এক-পাও নড়ো না চ্যাং। মনে রেখো দস্যু ইউকিনের হাতের টিপ কখনও ব্যর্থ হয় না।

—ইউকিন!

—তুমিই ইউকিন!

—রক্তখাবা!

সকলে বিস্মিত। চ্যাংও অবাক্‌।

ঘরের মধ্যে একটা বাজ পড়লেও বোধ হয় সকলে এত অবাক্‌ হতো কিনা সন্দেহ।

লোকটা বলে—হ্যাঁ, চীন ছেড়ে বর্মা, সম্প্রতি বর্মা ছেড়ে কোল্‌কাতা। তা দিনগুলো মোটামুটি মন্দ কাটছে না। কি বল চ্যাং?

চ্যাং বিমূঢ়!

সকলে নিশ্চুপ!

রিভলবারটা দোলাতে দোলাতে হাসিমুখে লোকটা বেরিয়ে যায়।

দরজার ঠিক মুখে দাঁড়িয়ে একবার শুধু বলে—তোমাকে ভুলব না চ্যাং। আবার হয়ত কোনও দিন দেখা হবে। কিন্তু পরিচয় যখন জেনেছ, তখন আর মালের কারবার তোমার সঙ্গে চলবে না। আচ্ছা, চলি বন্ধু। শুভরাত্রি!

কুয়াশায় মোড়া ফ্যাকাশে রাত।

নিথর, কালো, তুহিনতায় আচ্ছন্ন যেন। সুগভীর কোন্‌ এক অজানা মৌনতায় স্তব্ধ!

রাতের কালো ওড়না নিঃশেষে গ্রাস করে লোকটার সুদীর্ঘ দেহ।

মোড়ের গ্যাস্‌পোস্টের নিচে একবার শুধু তাকে দেখা যায়। তারপর পথের বাঁকে আবার অদৃশ্য হয়ে যায়।

গুদামঘরের টেবিলের সামনে বসে হতাশভাবে চ্যাং শুধু চীনেভাষায় বলে—হা বুদ্ধ, এখনও আমি মানুষ চিনতে শিখলাম না!

দুই

—রহস্যময়ী—

কোল্‌কাতা সহরের পুবদিকে নারকেলডাঙা, কাদাপাড়া, বেলেঘাটা, ট্যাংরা প্রভৃতি এলাকা ও তার সংলগ্ন অঞ্চলটাতে সম্প্রতি আইন-অমান্যকারীর সংখ্যা ভীষণভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রকাশ্য দিনের বেলায় পর্যন্ত সেখানে যে হারে চুরি, ডাকাতি, খুন, রাহাজানি ইত্যাদি লেগে থাকে তাতে কোল্‌কাতা পুলিশ ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে।

এখানে এমন একদল লোকের বাস, যারা আইন মানে না, পুলিশ মানে না। বীটের কনস্টেবলের সামনেই দুষ্কার্য সম্পন্ন করে নিশ্চিন্ত মনে গা-ঢাকা দেয়।

খবরটা পুলিশ বিভাগকে সচকিত করে তুলল।

খালপারের নিম্ন অঞ্চলগুলোতে পাহারার সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। এক-একটি পোস্টিং-এ দুজন করে পাহারাওয়ালা নিযুক্ত করা হয়েছে। তবুও কোনও সুফলই দেখা যায়নি। দু-একজন পুলিশকে আটকে রেখে বা বেঁধে রেখেও অনেক সময় দুর্বৃত্তদল পরম আরামে দুষ্কার্য করে চলে যায়। তারপর অন্য পুলিশ কনস্টেবল এসে হয়ত তাদের উদ্ধার করে।

এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে একবার নয়—বার বার।

স্থানীয় থানার সাহায্যে কোনও কিনারা না হওয়াতে অনেকে লালবাজার থানায় খবর পাঠায় এ ব্যাপারের সুব্যবস্থার আশায়।

লালবাজার থানা। বেলা তিনটে।

এইসব বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য সেদিন পুলিশ কমিশনার সাহেব একটি ঘরোয়া বৈঠক আহ্বান করেছিলেন। তাতে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি কমিশনার মিঃ চ্যাটার্সন, ইন্‌স্পেক্টর বঙ্কিমবাবু, ইন্‌স্পেক্টর তরফদার এবং বিখ্যাত ডিটেকটিভ দীপক চ্যাটার্জী।

কমিশনার সাহেব বললেন—আগে কোনও ড্রাস্‌টিক পথ অবলম্বন না করে বিষয়টি সম্বন্ধে গোপনে তদন্ত করা হোক।

ইন্‌স্পেক্টর তরফদার তাঁর কথায় সমর্থন জানালেন।

কমিশনার সাহেব তখন অনুরোধ জানালেন ডিটেকটিভ দীপক চ্যাটার্জীকে। এর আগে সে এ ধরনের কেসে বহুবার আশাতীত সাফল্য লাভ করেছে।

দীপক কথাটা শুনে বলল—স্থানীয় থানার সাহায্য পেলে এ ধরনের তদন্ত ব্যাপারে অনেকটা সুবিধে হয়।

কমিশনার সাহেব বললেন—অব্ কোর্স মিঃ চ্যাটার্জী। আমি কাদাপাড়া থানায় এক্ষুণি ফোন করে দিচ্ছি। ওখানকার ও.সি. মিঃ দেশাই বেশ জবরদস্ত লোক। আপনি কোনও খোঁজখবর পেলে তাঁর সাহায্য নিতে পারেন স্বচ্ছন্দে।

দীপক ধন্যবাদ জানিয়ে বলে—আমি এ ব্যাপারে যতটা সম্ভব চেষ্টা করব বলে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি স্যার। তবে সফলতা অর্জনের ব্যাপারে খানিকটা ভগবানের হাত থাকা চাই স্যার...

—আপনি তাহলে সুপারন্যাচারেল পাওয়ারে বিশ্বাস করেন মিঃ চ্যাটার্জী!

—অবশ্যই স্যার। একটা কথা আছে জানেন ত—'ক্রাইম্ ডাজ নট্ পে'। অপরাধীকে তাই ধরা পড়তেই হবে। আর যত বিপদেই আমরা গিয়ে পড়ি না কেন 'আল্‌টিমেট ভিকট্রি' আমাদের হতে বাধ্য।

কমিশনার সাহেব দীপকের সঙ্গে সেক্‌হ্যাণ্ড করে বলেন—আই উইশ ইউ সাক্‌সেস্ মিঃ চ্যাটার্জী!

পরদিন। বৈকাল সাড়ে পাঁচটা।

ডিটেকটিভ দীপক চ্যাটার্জী আর তার সহকারী রতনলালকে দেখা গেল এই অঞ্চলটায় ঘুরে বেড়াতে।

মোটামুটি সারা অঞ্চলটাতে একবার ঘুরে বেড়িয়ে দীপক একসময় হেসে রতনকে বলল—এই অঞ্চলে এই ধরনের আইন অমান্য না হলেই আমি একটু বিস্মিত হতাম।

—কেন?

—এখানে অধিকাংশই বস্তি। ছোট ছোট পায়রার খুপরির মত ঘর। আর এত গলি-ঘুঁপচি যে, কেউ কোনও অপরাধ করে মাসের পর মাস এখানে নিশ্চিন্তে লুকিয়ে থাকতে পারে।

—তা বটে।

—আর বস্তির লোকগুলোর দিকে তাকালে বোঝা যায়, ওরা আর যাই হোক, কখনই শ্রীচৈতন্য গোছের নয়।

—তা অস্বীকার করি না। কিন্তু এ ধরনের ছিল ত চিরদিনই। কিন্তু সম্প্রতি অত্যাচারটা এত বৃদ্ধি পেল কেন?

—সেটা ঠিক বুঝতে পারছি না। তবে মনে হচ্ছে সম্প্রতি কোনও মাথাওয়ালা লোক এদের মধ্যে এসে একটা দল পাকিয়েছে। সে একজন লোক, না, একের বেশি লোক তা অবশ্য জানি না। কিন্তু মনে হয় সে-ই এদের চালিয়ে এভাবে একের পর এক ক্রাইম্ করে চলেছে। সেটা বের করতে আমাদের একটু বেগ পেতে হবে হয়ত।

সন্ধ্যা হয় হয়।

অস্তরঙিন সূর্য পশ্চিম দিগন্তে সবেমাত্র ডুবেছে রাঙা আভা ছড়িয়ে।

বস্তিগুলোর মধ্যে ঝাপ্‌সা অন্ধকার জমতে সুরু করেছে। তার ফলে পরিবেশটা যেন আরও কেমন রহস্যময় হয়ে উঠেছে। দিগন্ত-ছোঁওয়া আঁধারের আলিঙ্গনে পৃথিবী নিজেকে নিঃশেষে সঁপে দিচ্ছে।

মায়া-মাখা প্রকৃতির দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে রতন বলল—সত্যি, এদিকে তাকালে মনেই হয় না যে এই সুন্দর পৃথিবীর বুকেও পর পর এভাবে একটির পর একটি দুষ্কার্য ঘটে চলেছে।

দীপক কি যেন বলতে যাচ্ছিল।

কিন্তু তার উত্তর দেবার আগেই একটা গোলমাল ভেসে এলো।

শোনা গেল ভারী জুতোর শব্দ।

দীপক চেয়ে দেখল একটা রোগা মত লোক একটা ব্যাগ হাতে নিয়ে প্রাণপণে ছুটে চলেছে। তার পেছনে পেছনে একটা মোটা কনস্টেবল তার বিশাল দেহটা নিয়ে প্রাণপণে দৌড়বার ব্যর্থ চেষ্টা করছে।

দীপক লোকটাকে ধরে ফেলল। তারপর কনস্টেবলটা এলে তার হাতে লোকটাকে তুলে দিয়ে বলল—থানামে চলো।

অনেকগুলি কৌতূহলী দর্শক এসে ভিড় জমাবার চেষ্টা করছিল। দীপক একবার ধমক দিতেই লোকের ভিড় কমল। ওদের উদ্দেশ্যে ভাল না-ও হতে পারে। এমন কি লোকটার দলের কোনও লোক দর্শকের মধ্যে থাকতে পারে।

দীপক তাই রতনকে বলল—চল্ রে, থানার দিকে যাওয়া যাক্।

থানার ও. সি. দীপককে চিনতে পেরেই সাদরে অভ্যর্থনার জানালেন—আসুন মিঃ চ্যাটার্জী। আপনি যে এখানে পদধূলি দেবেন তা জানতাম।

—কেন?

—আজই সকালে কমিশনার সাহেবের ফোন পেয়েছি। তিনিই ফোনে বললেন যে...

—বুঝেছি। বাধা দিয়ে দীপক বলল—কিন্তু এদিকে পা দিয়েই ত একটা চোর ধরবার ব্যবস্থা করে ফেললাম।

কথাটা বলেই হো হো করে হেসে উঠল দীপক।

মিঃ দেশাই হেসে উঠে বললেন—তাই নাকি? এখানে পা দিয়েই কাজের হাতেখড়ি হয়ে গেল!

দীপক হেসে বলল—হ্যাঁ, ওরা এক্ষুণি এসে পড়বে।

কথার সঙ্গে সঙ্গেই কনস্টেবল হরিভকত সিং প্রবেশ করল একজন লোকের হাত ধরে। আর তার সাথে একটি মেয়ে। বয়স তার পঁচিশের কাছাকাছি। সুন্দরী। চেহারার মধ্যে কেমন যেন একটা রহস্যময়তা।

থানা অফিসারের দিকে চেয়ে কনস্টেবলটি বলল—হুজুর, এই লোকটা ওঁর হাত থেকে ভ্যানিটি ব্যাগটা ছিনিয়ে নিয়ে পালাচ্ছিল।

দীপক মেয়েটির দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল—ওটা কি আপনার ব্যাগ?

মেয়েটি সলজ্জ ভঙ্গিতে ঘাড় নেড়ে বলল—হ্যাঁ। আমি পথ দিয়ে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ লোকটা কোত্থেকে ছুটে এসে হাত থেকে ব্যাগটা ছিনিয়ে নিয়ে পালাবার চেষ্টা করছিল। এমন সময় আপনি ওকে ধরে ফেললেন দেখলাম।

দীপক এবার তাকাল লোকটির দিকে। তাকে ধরবার সময় ঠিক খেয়াল হয়নি, এবার বেশ ভাল করে দেখে দীপকের মনে হলো লোকটি যেন তার পরিচিত। দীপক জিজ্ঞাসা করল—কি হে, জেল থেকে বের হয়েই আবার সুরু করে দিয়েছ নাকি?

লোকটি তেজের সঙ্গে উত্তর দিল—করব না ত কি করে পেট চলবে শুনি বাবুসাহেব?

—জেল থেকে বেরিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করলেই ত পারতে। যা হোক একটা কাজের ব্যবস্থা করে দিতাম। তা ক'বছর ঘানি ঘোরালে ইউসুফ?

—তিন বছর।

—কিন্তু এবার যে আরও বছরখানেক হবে।

—আমাকে সোজা পেয়েছেন বলেই বার বার গারদে ঠেলছেন, কিন্তু এবার যার পাল্লায় পড়বেন তাকে আর অত সহজে হবে না স্যর।

—তাই নাকি? তা লোকটা কে হে ইউসুফ?

—অত সহজে কথা বের হয় না টিকটিকি মশাই। চেষ্টা করুন, একদিন নিশ্চয়ই তার সঙ্গে দেখা হবে।

ইউসুফের সঙ্গে কথা না বাড়িয়ে তাকে তক্ষুণি হাজতে পাঠানো হলো। তারপর মেয়েটির দিকে চেয়ে দীপক প্রশ্ন করল—আপনার নাম?

—চপলা বসু।

—এ অঞ্চলটার বদনাম নিশ্চয়ই শুনেছেন। তবুও রাতের বেলায় এধারে এসেছিলেন কেন?

—আমার এক আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে।

—কিন্তু এখন যাবেন কি করে?

—তাইত ভাবছি।

—আচ্ছা, সেজন্যে চিন্তিত হতে হবে না। আপনার বিবৃতিটা শেষ করুন। যদি কিছু মনে না করেন, আমার গাড়িতে করে আপনাকে এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারি। আপনি থাকেন কোথায়?

—হোটেল রিজেন্ট।

—ও, সে ত ভবানীপুরে?

—হ্যাঁ, এসপ্ল্যানেডে পৌঁছে দিলেই বাকি রাস্তাটা আমি একাই যেতে পারব।

কিন্তু সেদিন কি দীপক কল্পনা করতে পেরেছিল যে অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই এই মেয়েটির সঙ্গে অনেকগুলি ব্যাপারেই তাকে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে কোনও একটা সুসংহত দুর্বৃত্তদলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে?

তিন

—আবার আক্রমণ—

অনেকক্ষণ কথা বলে ডেপুটি কমিশনার মিঃ চ্যাটার্সন তাঁর বক্তব্য শেষ করলেন।

মোটামুটি তাঁর বক্তব্য হচ্ছে এই যে এই সমস্ত ঘটনার মূলে নিশ্চয়ই কোনও একজন লোকের গোপন হাত আছে।

দীপক বলল—এই ধরনের ঘটনাগুলো আগে শুধু পূর্ব-কোল্‌কাতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু সম্প্রতি এগুলো সারা সহরের বুকে ছড়িয়ে পড়তে সুরু করেছে বলেই আমরা এতটা চিন্তিত হয়ে পড়তে বাধ্য হচ্ছি।

—এগুলি সব কি একই দলের কীর্তি?

—আমার ত তাই মনে হয়। গতকাল বিকেলের একটা ঘটনা শুনলেই এ সম্বন্ধে আপনি নিঃসন্দেহ হবেন।

দীপক বিগত ঘটনাগুলোর সারাংশ ডেপুটি কমিশনারের কাছে খুলে বলল।

সমস্ত শুনে তিনি বললেন—আপনি এদিকে কতদূর এগোলেন? যত শীঘ্র সম্ভব ব্যবস্থা না করলে...

দীপক বাধা দিয়ে বলল—এই অঞ্চলগুলোতে .আমার একজন গুপ্ত সংবাদদাতা আছে। তার নাম অনন্তপ্রসাদ। ইন্‌ফর্মার অনন্তপ্রসাদের কাছে আমি সাহায্য চেয়েছি। মনে হয় রহস্যগুলোর কিনারা করতে বেশিদিন লাগবে না।

ডেপুটি কমিশনার বললেন—ওহো, মনে পড়েছে বটে। গোটাকয়েক চুরি আর পকেটমারের কেসে লোকটা অপরাধীদের ধরিয়ে দিতে সাহায্য করেছিল। তাই না?

দীপক বলল—হ্যাঁ। লোকটা সংবাদ দেয় নেহাত মন্দ নয়। ও ধরনের দু-একজন ইন্‌ফর্মার না থাকলে কাজ করে ঠিক সুবিধে হয় না।

ডেপুটি কমিশনার হেসে বললেন—যা হোক, তাড়াতাড়ি একটা ব্যবস্থা করে ফেলুন মিঃ চ্যাটার্জী। এভাবে আইন অমান্য হতে থাকলে অবশেষে আইন এবং পুলিশের কোনও মূল্যই থাকে না।

দীপক নমস্কার জানিয়ে পথে বেরিয়ে পড়ল।

সেদিনই বিকেলে দীপক অনন্তপ্রসাদের কাছ থেকে একটা ফোন পেল।

—হ্যালো, দীপকবাবু?

—হ্যাঁ, অনন্ত। তারপর খবর কি বল।

—জরুরী খবর আছে।

—কখন জানাবে?

—টেলিফোনে এসব কথা হয় না। সবটুকু ভাল করে জেনে নিয়ে, তারপর আপনাকে সব জানাব।

—ধন্যবাদ।

—যতদূর জেনেছি, একজন লোক দলের সবকিছু। তার খোঁজ বের করবার চেষ্টা করছি। কিন্তু বুঝতেই ত পারছেন...

—বুঝলাম। আচ্ছা এখন থাক্। পরে সবটুকু শুনব। কেমন?

—সেই ভাল স্যর। আচ্ছা নমস্কার।

অনন্তপ্রসাদের ফোনটা ছেড়ে দিয়ে দীপক বের হলো আর একবার ওই অঞ্চলটা ঘুরে দেখবার জন্যে।

সন্ধ্যার মুখোমুখি।

দীপক নারকেলডাঙা অঞ্চলে নেমে গাড়ির ড্রাইভারকে বলল থানার দিকে গাড়িটা নিয়ে যেতে। তারপর পায়ে হেঁটে কাদাপাড়ার দিকে এগিয়ে চলল।

পরনে অতি সাধারণ পোষাক ছিল তার। তবে চিরসঙ্গী রিভলবারটিকে সে সঙ্গে নিতে ভোলেনি।

পথের মোড়ে মোড়ে সবে আলোগুলো জ্বলে উঠেছে।

একটা সরু গলির মাথায় পৌছে দীপক যা দেখল, তাতে তার সারা দেহের ওপর দিয়ে যেন মুহূর্তে একটা হিমপ্রবাহ বয়ে গেল।

হাত-পা-মুখ বাঁধা অবস্থায় একটি মেয়েকে দুজন দুর্বৃত্ত ধরাধরি করে একটা গাড়িতে তুলছে।

গুড়ুম্!

দীপকের হাতের পিস্তলটা গর্জে উঠল একবার।

দুর্বৃত্তদের গাড়ির টায়ারটা ফেঁসে গেল।

একটা ভীষণ শব্দ!

অবস্থা বেগতিক দেখে দুটি লোকই ছুটতে ছুটতে পাশের গলির মধ্যে ঢুকে পড়ল।

দীপক এবার গাড়িখানার দিকে এগিয়ে গেল। হাত-পা-মুখের বাঁধন কেটে দিয়ে মেয়েটার মুখের দিকে তাকিয়েই চম্‌কে উঠল দীপক।

এ সেই চপলা!

তক্ষুণি একটা ট্যাক্সিতে করে দীপক চপলাকে নিয়ে কাদাপাড়া থানায় গিয়ে পৌঁছল।

কাদাপাড়া থানায় পৌছলে ও.সি. মিঃ দেশাই চপলাকে দেখে বললেন—পর পর দু'বার আপনি এভাবে আক্রান্ত হলেন এ ত ভাল কথা নয়। মনে হচ্ছে যেন আপনার উপরে তাদের নিশ্চয়ই কোনও রাগ আছে।

চপলা হেসে বলল—হতে পারে। কিন্তু কি কারণে তাই ত বুঝতে পারছি না!

—বার বার তবে আপনার এ অঞ্চলে আসা নিশ্চয়ই ভাল হচ্ছে না, চপলা দেবী।

—কিন্তু কি করে বুঝব বলুন! দেশটা থেকে যে রাতারাতি একেবারে পুলিশ-শাসন লোপ পাবে এ আমার ধারণার বাইরে মিঃ দেশাই।

লজ্জিত স্বরে মিঃ দেশাই বললেন—কি করব বলুন! চেষ্টার ত ত্রুটি করছি না।

—আপনারা শুধু বলবেন, এ অঞ্চলে এসো না। কিন্তু কাজ থাকলে কি করে না এসে পারি বলুন?

—তা ত বটেই।

দীপক বলল—তবে এখন ধরা না পড়লেও খুব বেশিদিন যে এমন চলবে না, এ কথা আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি চপলা দেবী!

চপলা বলল—হ্যাঁ, আপনার ওপরে আমার কিছুটা বিশ্বাস আছে মিঃ চ্যাটার্জী। আপনার জন্যেই দু-দু'বার বাঁচলাম। সেদিক থেকে আপনার কাছে আমি সত্যই কৃতজ্ঞ।

দীপক বলল—ঠিক সময়ে আমি এসে পড়েছি বলেই ত! এখানে আপনি অবশ্যই ভগবানের

অদৃশ্য হস্ত স্বীকার করবেন। ঠিক এই মুহূর্তটিতে এসে পড়বার জন্যে আপনার হাতব্যাগটা ছাড়া আর কিছুই খোওয়া যায়নি।

—সে কি? হাতব্যাগটা খোওয়া গেছে? মেয়েটির মুখ যেন বিবর্ণ আকার ধারণ করে।

—কেন? হাতব্যাগে কোনও দামী জিনিস ছিল কি?

—দামী না হলেও একদিক থেকে সেটা অমূল্য।

—কি জিনিস?

—যদি ফিরে পাই ত জানাব। আচ্ছা, মিঃ দেশাই, আপনি তাহলে ঐটি লিখে নিন। আজকের মত চলি।

—একা যাবেন? দীপক প্রশ্ন করে।

—না, দীপকবাবু, আজকেও আমাকে একটা লিফট্ দিতে হবে। তবে আজ ত আর আপনার গাড়ি নেই। কাজেই ট্যাক্সিতে...অবশ্য শিয়ালদা পর্যন্ত হলেই চলবে।

দীপক বলে—গাড়ি আছে। তবে আমি ড্রাইভারকে দিয়ে সেটা এই থানায় পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। পায়ে হেঁটে ঘুরছিলাম প্লেন ড্রেসে। যাক্ প্রয়োজন হলে এস্‌প্ল্যানেডে পৌঁছে দিতেও আমার আপত্তি নেই।

রিপোর্টটা লিখিয়ে দিয়ে চপলা দীপকের সঙ্গে গাড়িতে উঠে বসল।

দ্রুত চালিয়ে দীপক নিরাপদে এস্‌প্ল্যানেডের মোড়ে এসে গাড়িটা দাঁড় করাল।

দীপক বলল—যদি কিছু মনে না করেন ত ফিরপোতে কিছু খাবার আর কফিপানের নিমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

চপলা বলল—হ্যাঁ, একটু নিরালায় দুজনে কিছুক্ষণ বসতে চাই। আমি গোটাকয়েক অত্যন্ত গোপনীয় কথা আপনাকে জানাব বলে স্থির করেছি।

—বেশ, চলুন।

দীপক গাড়ি থেকে নামল।

কিন্তু চপলা গাড়ি থেকে না নেমে ভিড়ের মধ্যে মিশে যাওয়া একজন লোকের দিকে তীক্ষ্ণভাবে চেয়ে কিছুক্ষণ কি যেন ভাবল।

দীপক বলল—নেমে আসুন।

লোকটা ততক্ষণে অদৃশ্য হয়েছে।

এবার নেমে এসে চপলা বলল—চলুন।

দুজনে হোটেলের মধ্যে প্রবেশ করল।

চার

—চপলা কে—

হোটেলের এক কোণে একটা কেবিনে বসে চপলা সুরু করল—গাড়ি থেকে নামবার আগের মুহূর্তে ওদের একজন অনুচরকে দেখলাম দীপকবাবু। কিন্তু আমি চিনতে পেরেছি বলে সে ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল।

দীপক বলল—আপনার ভাবভঙ্গি দেখেই সেই আন্দাজ করেছিলাম। কিন্তু সে কথা থাক। আপনি এই দল বলতে কাদের বোঝাচ্ছেন?

চপলা হেসে বলল—আচ্ছা দীপকবাবু, আপনি ত দীর্ঘদিন গোয়েন্দার কাজ করছেন। ভারত জুড়ে আপনার খ্যাতি। কিন্তু আপনি কি কখনও ইউকিন বলে কোনও লোকের নাম শুনেছেন?

দীপক একটু চিন্তা করে বলল—ইউকিন? মানে লোকটা কি বার্মিজ, না থাইল্যাণ্ডের অধিবাসী?

চপলা বলল—ওটা ওর ছদ্মনাম বলেই জানি। তবে ওই নামেই ও সর্বত্র পরিচিত। তবে ও যেমন নৃশংস আর যে ভাবে সর্বদা ওর হাত রক্তকলঙ্কিত হবার জন্যে উৎসুক সে জন্যে আমরা ওর নাম দিয়েছি রক্তথাবা। তবে রক্তথাবা নামে ও খুব বেশি পরিচিত নয়।

দীপক বলল—কই, এ ধরনের নাম ইতিপূর্বে শুনেছি বলে ত মনে হচ্ছে না।

চপলা বলল—লোকটা কিন্তু আসলে হিন্দুস্থানী। ইউকিন বোধ হয় ওর ছদ্মনাম। তবে বার্মিজ ভাষায় ওর সুন্দর দখল আছে। বর্মায় ও দীর্ঘদিন অতিবাহিত করেছে কিনা। সে যাক্, আমি শুধু এটুকু বোঝাতে চাই যে, এই লোকটা হচ্ছে আপনাদের উদ্দেশ্যহীন কাজগুলোর লক্ষ্য।

—তার মানে? অবাক বিস্ময়ে দীপক প্রশ্ন করে।

—সম্প্রতি আপনারা যাদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হচ্ছেন, তাদের মাথা হচ্ছে ওই লোকটি। এর আগে ওর কর্মক্ষেত্র ছিল বর্মা, থাইল্যাণ্ড ওই সব জায়গা। চীনেও কিছুদিন উপদ্রব করেছে। কিন্তু সম্প্রতি ও বাংলায় পা দিয়েছে। আর ওর বিরুদ্ধেই আমার অভিযান। সে জন্যেই আমাকে বাংলায় আসতে হয়েছে, দীপকবাবু।

—আপনার বাড়ি কি বাংলায় নয়?

—না। বর্মায় আমার বাবার বিরাট ব্যবসা ছিল। সে সব কথা যাক্। আপাতত যতটুকু বললে আপনার কাজের সুবিধা হবে সেটুকুই বললাম।

দীপক প্রশ্ন করল—কিন্তু কাদাপাড়ায় যে আত্মীয়ের বাড়িতে আপনি যান, তাঁর ঠিকানাটা দিতে নিশ্চয়ই আপনার আপত্তি নেই?

চপলা হেসে বলল—না না, তাতে আর আপত্তি কি হতে পারে? ৩৭১ নম্বর নারকেলডাঙা মেন রোডে তাঁর বাসা।

দীপক বলল—তাঁর নামটা জানবার জন্যেও আমায় খুব কৌতূহল হচ্ছে। তবে সেটা ওঁর কাছ থেকেও ইচ্ছে করলে জেনে নিতে পারি।

—তার প্রয়োজন নেই। আমিই বলছি। ওঁর নাম বিনায়ক শর্মা। উনি আমার দূরসম্পর্কের আত্মীয় হন। তবে কোল্‌কাতার কাছাকাছি উনি ছাড়া আমার আর কোনও আত্মীয়স্বজন নেই। তাই বাধ্য হই মাঝে মাঝে ওঁর সঙ্গে দেখা করতে।

—বুঝেছি। আচ্ছা, আপাততঃ আমি এটুকুর উপরে নির্ভর করেই বেশ চলতে পারবে। তবে এটুকু বেশ ভাল করেই বুঝতে পারছি যে আপনার ওপরে ওই ইউকিনের বেশ একটু নজর আছে। এমন কি আপনার পেছনে পেছনে ওর অনুচর পর্যন্ত ঘুরছে। তাই আপনার যথেষ্ট সাবধান হয়েই চলাফেরা করা উচিত।

—সেটা যদিও বুঝতে পেরেছি, তবু এর বেশি কিছু আপাততঃ আপনাকে খুলে বলতে পারলাম না। যদি এর চেয়ে বেশি এগোতে পারি, তবে অবশ্যই সবকিছু জানাব। আমি শুধু জানতে চাই এদের প্ল্যান্ অব্ অ্যাক্‌শন। সেটা অত্যন্ত গোপনে সংঘটিত হচ্ছে কিনা, তাই সেদিকে আর একপাও এগুনো সম্ভব হচ্ছে না আপাততঃ। তবে নিজের জীবনকে বিপদাপন্ন করেও আমি যে সব খবর জানবার চেষ্টা করছি তা নেহাত কম নয়।

—কিন্তু ইউকিনের বিরুদ্ধে আপনি একা কতটুকু এগোতে পারেন চপলা দেবী?

—যা পারি তাই কি নেহাত কম?

—তবুও আমাকে কিছুটা খুলে বললে সেটা ভাল হতো না কি? অন্ততঃ পৃথক্ পথে আমি চেষ্টা করতাম।

—হয়ত একদিন সব বলতে হবে। তবে আপাততঃ আর কিছু নয়। আচ্ছা, গুড্ বাই মিঃ চ্যাটার্জী। চলি আজকের মত। আশা করি আবার দেখা হবে।

দীপক হোটেল থেকে বেরিয়ে এসে চপলাকে একটা ট্যাক্সিতে তুলে দিল।

ট্যাক্সি ছুটে চলল ভবানীপুরের দিকে।

ফিরে যাবার জন্যে দীপক দু'পা এগিয়েছে, এমন সময় পেছন থেকে কে যেন তার পিঠে হাত রাখল।

দীপক চেয়ে দেখে পুলিশ অফিসার মিঃ তরফদার।

—একি, তুমি হঠাৎ এধারে দীপক?

—'হ্যাঁ, মিঃ তরফদার। তারপর আপনিই বা হঠাৎ এদিকে কি মনে করে?

—যাচ্ছিলাম এধার দিয়ে। হঠাৎ তোমার সঙ্গে ওই মেয়েটিকে দেখেই থম্‌কে দাঁড়ালাম।

—সে কি কথা? ওর মধ্যে এমন কিসের সন্ধান পেলেন যে তার জন্যে এভাবে থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়তে বাধ্য হলেন আপনি?

—বিশেষ কিছু না হলেও, তোমার সঙ্গে পরিচিত হবার যোগ্যতা ওর আছে, কারণ—

—সে কি? বাধা দিয়ে দীপক প্রশ্ন করে।

—বলছি, আগে বলো ওর সঙ্গে তোমার পরিচয় হলো কবে? মিঃ তরফদার প্রশ্ন করেন।

—ও, চপলার সঙ্গে? দিন তিন-চারের বেশি নয়। কাদাপাড়ার দিকে একটা কেসের তদন্ত ব্যাপারে ওঁর সঙ্গে পরিচয়।

—ও বুঝি সম্প্রতি চপলা ছদ্মনাম নিয়েছে? বর্মাতে ওর নাম ছিল অন্য। সেখানে ওকে সকলে মীরা বলেই জানত।

—সে কি?

—হ্যাঁ। সেখানে ও বিরাট একটা দলের নেত্রী ছিল বলে জানি। এমন কি দু' বছর জেলও খেটেছে ও। তুমি বোধ হয় জানতে না এসব কথা? খুব সাবধান চ্যাটার্জী। ট্র্যাপে পা দিও না যেন!

কথাটা বলেই হন্ হন্ করে পুলিশ অফিসার মিঃ তরফদার এগিয়ে যান।

দীপকের মাথাটা তখন যেন তার দেহ থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে। অবাক হয়ে সে শুধু ভাবতে থাকে, এও কি করে সম্ভব?

পাঁচ

—চড়কডাঙার ট্যাক্সি—

নারকেলডাঙার পুবদিকে, রেলপুল পেরিয়ে চড়কডাঙার কাছে যে একটা বড় ট্যাক্সির আড্ডা ছিল, সেটাতে প্রত্যেকদিন সন্ধ্যায় বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রায় ত্রিশ-চল্লিশখানা গাড়ি এসে জমত।

এই আড্ডার ট্যাক্সি সারা কোল্‌কাতা সহরের আরোহীদের কাছেই বেশ জনপ্রিয়। তার কারণেরও অবশ্য অভাব নেই। মোটা কুশন, ভাল গদী, ভেতরের সুন্দর বন্দোবস্ত—

কোনও কিছুরই অভাব নেই তাতে। এমন কি গাড়ির পেছন দিকে মালপত্র রাখবার ব্যবস্থাও বেশ চমৎকার।

কিন্তু গাড়ির আরোহীরা যে বিষয়টা জানত না, তা হচ্ছে গাড়ির সঙ্গে সংলগ্ন সাম্‌নের ডিক্‌টোফোন যন্ত্রটা।

সেটাতে যে আরোহীদের সমস্ত কথাবার্তাই ধরা পড়ে যায় এবং সুন্দর পরিপাটি অক্ষরে তা লেখা হয়ে থাকে, তা একমাত্র ড্রাইভাররা ছাড়া আর কেউ জানতে পারে না!

অবশ্য এজন্যে এ ধরনের গাড়ির ড্রাইভারদের যে উচ্চ হারে মাইনে দেওয়া হয়, তা আজকাল কোনও গাড়ির ড্রাইভার কল্পনাও করতে পারে না। এই গাড়ির ড্রাইভারের মাসিক মাইনে তিনশো থেকে চারশো টাকা। এজন্যে তারা প্রাণ গেলেও এই যন্ত্রের কথা কারও কাছে ঘুণাক্ষরে প্রকাশ করে না।

তাদের গোপনীয়তার অন্য কারণও অবশ্য আছে। এ ব্যাপারটা তাদের বেশ ভাল করেই জানানো হয়ে যে বিশ্বাসঘাতকতার একমাত্র শাস্তি মৃত্যু।

রোজ সন্ধ্যার পর যখন এই ট্যাক্সি ড্রাইভাররা তাদের মালিকের কাছে টাকা জমা দেয়, তখন টাকার সঙ্গে তাদের ডিক্‌টোফোন যন্ত্রের ওপরে রেকর্ড করা লেখা কাগজগুলিও জমা দিতে হয়।

আড্ডার পেছনে ছোট টিনের শেড দেওয়া ঘরে যে মোটা, কালো, মাথায় বিরাট টাক্‌ওয়ালা লোকটি বসে থাকে তার কাছে এই সবকিছু জমা পড়ে। সে এই সমস্ত খবরগুলো কোনও এক অজ্ঞাত মালিকের কাছে জানায়।

এই লোকটির নাম হরিধন পালিত।

হরিধন পালিত জীবনে কখনও তার মনিবকে দেখেনি। আর দেখার কথা কল্পনাও করে না সে। সে জানে, একবার মনিবকে জানবার কৌতূহল হওয়ার অপরাধে ভগবান দাস নামে একজন লোক প্রাণ হারিয়েছিল।

তাই আজ পর্যন্ত হরিধন পালিত শুধু চোখ বুজে হিসেবপত্তরই রেখে গেছে—মনিবের জন্যে কোনও দিনই মাথা ঘামায়নি।

তবে মনিবের খোঁজ রেখে লাভই বা কি?

মাসের প্রথম সপ্তাহেই সে নগদ পাঁচশোটি করে টাকা বরাবর পেয়ে থাকে।

তার মত বিদ্যাবুদ্ধিহীন লোককে যে কেউ মাসে একশো টাকা দিয়েও নিযুক্ত করবে না এ কথা হরিধন পালিতের অজানা নয়। তাই আজ পর্যন্ত সে জীবনে একচুলও কোনও কাজে গোলমাল করেনি। মনিব টাকার ব্যাপারে যেমন দিল্‌দরিয়া তেমনি কাজের ব্যাপারে যে অত্যন্ত কড়া এটাও হরিধন জানে।

এই সব খবর যে কি কাজে লাগে তা আগে হরিধন আন্দাজ করতে পারত না।

কিন্তু সম্প্রতি এর রূপটা তার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে। এই সব খবর সংগ্রহ করে তার মনিব যে সব কাজ করেন, তা যে পুলিশ এবং আইনের চোখে খুব সুনীতিপূর্ণ বা সুকার্য বলে বিবেচিত হয় না তাও হরিধন বুঝতে পেরেছে।

এই সব গোপন খবরকে অবলম্বন করে যে সম্প্রতি আরও কয়েকটি বড় বড় কাজ করা হবে তার গন্ধও হরিধন ঠিকই পেয়েছে। আর এই কাজগুলোর তুলনায় আগেকার কাজ সবই যে অত্যন্ত সাধারণ সেটাও হরিধন সহজেই বুঝেছে।

ঘস্‌ঘস্‌ শব্দ করে একটা গাড়ি এসে থামল।

সমস্ত টাকার হিসেব-নিকেশ নিয়ে ডিক্‌টোফোনের রেকর্ডে চোখ রেখেই চম্‌কে উঠল হরিধন।

কি সর্বনাশ! এত বড় একটা প্রয়োজনীয় খবর বোধ হয় সে জীবনে কোনও দিন তার মনিবকে জানাতে পারেনি।

রিসিভার তুলল হরিধন।

—হ্যালো, কে?

—আমি হরিধন, হুজুর।

—কি খবর?

—মস্ত বড় একটা খবর এলো এইমাত্র।

—কত নম্বর?

—তেরো নম্বর ট্যাক্সি থেকে এটা জানলাম।

—ও, তা কি খবর বল।

—আগামী এগারোই তারিখে একটা এরোপ্লেন গভর্ণমেণ্টের প্রচুর সোনা নিয়ে বর্মা থেকে ভারতে আসছে। কোল্‌কাতায় সেটা পরীক্ষা করে তারপর দিল্লীর দিকে যাবে। দিল্লীতে পৌঁছবার আগে যদি...

—বুঝেছি। এতবড় একটা খবরের জন্যে তোমাকে উপযুক্ত পুরস্কার দেবার ব্যবস্থা আমি করব হরিধন।

—আচ্ছা হুজুর, সে আপনার দয়া।

—বুঝেছি, আর বলবার প্রয়োজন নেই। খবরটা সত্যই খুব প্রয়োজনীয় হরিধন। এটার জন্যে তোমাকে আমি পাঁচশো টাকা অতিরিক্ত দেব পুরস্কার হিসেবে। আচ্ছা, ছেড়ে দিচ্ছি...

ফোন ছেড়ে দিয়ে হরিধন মধুর স্বপ্নে বিভোর হয়ে পড়ে।

ছয়

—ঘুঘু ও ফাঁদ—

সহরের বুকে পর পর তিনটি বড় ব্যাঙ্ক লুঠ হওয়ার সংবাদ যেমন সহরের লোকদের আতঙ্কের মাত্রা বৃদ্ধি করল, তেমনি পুলিশ বিভাগকে বেশ কিছুটা সচকিত করে তুলল।

এ ছাড়া চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি হঠাৎ যেন সারা সহরের বুকেই বিপুল সংখ্যায় বৃদ্ধি পেয়েছে।

এসব ব্যাপারে তদন্ত করে আজ পর্যন্ত একটি ক্ষেত্রেও কোনও সুফল পাওয়া যায়নি।

কমিশনার সাহেব দীপকের ঠিকানায় দু-একবার ফোন করে ঘটনার গুরুত্ব বোঝাতে চেষ্টা করেছেন, কিন্তু দীপকের কোন খোঁজ তিনি পাননি। গোয়েন্দা দীপক চ্যাটার্জী যেন সহরের বুক থেকে উবে গেছে!

কমিশনার সাহেব কি করবেন ঠিক করতে না পেরে যখন হতাশভাবে দীর্ঘশ্বাস ফেলছেন, এমন সময় হঠাৎ খবর পেলেন যে দীপক সেদিন সন্ধ্যায় তাঁর সঙ্গে দেখা করবে।

দীপকের হঠাৎ এভাবে গা-ঢাকা দেওয়ার কারণ ছিল।

পর পর এই যে একটার পর একটা মারাত্মক ব্যাপারগুলো সহরের বুকে ঘটে গেল,

তার কোনও চিহ্নমাত্রও পায়নি সে। অথচ কিভাবে যে এগুলো ঘটে যায় এবং কি উপায়ে এগুলো বন্ধ করা যেতে পারে তার সামান্যমাত্র হদিস বের করতে সক্ষম হয়নি সে। তাই লজ্জায় সে কমিশনার সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে অনিচ্ছুক ছিল।

কিন্তু সেদিন বিকেলের ডাকে ইন্‌ফর্মার অনন্তপ্রসাদের কাছ থেকে একখানা চিঠি পেল সে।

পেন্‌সিল দিয়ে লেখা। আঁকাবাঁকা অক্ষর।

কিন্তু চিঠির নিচে অনন্তপ্রসাদের সই দেখেই সে বুঝতে পারল যে এটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় তাই তার মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

অনন্তপ্রসাদ লিখেছে :

প্রিয় দীপকবাবু,

কয়েকটি অত্যন্ত জরুরী খবর পেয়েছি। কিন্তু আপনার সঙ্গে ভয়ে দেখা করতে পারছি না। আপনি কাদাপাড়ার তিন নম্বর বস্তির সবচেয়ে কোণের ভাঙা বাড়িটার সামনে আজ সন্ধ্যায় আসলে আমার দেখা পাবেন।

আশা করি অবশ্যই আপনি আসবেন। চিঠিতে এই সব প্রয়োজনীয় খবরগুলি জানানো সম্ভব নয়। আমার আসতে যদি কিছু দেরী হয়, আপনি অবশ্যই অপেক্ষা করবেন।

প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানবেন। ইতি—

ভবদীয়—

অনন্তপ্রসাদ।

চিঠিখানা পড়ে দীপক যেন গাঢ় আঁধারের মধ্যে একটা আলোর রেখা দেখতে পেল।

সে প্রথমে লালবাজারে গিয়ে কমিশনার সাহেবের সঙ্গে দেখা করল।

কমিশনার সাহেব সবকিছু শুনে বললেন—অনন্ত লোকটা খবর দেয় ভাল। তাই না? এর আগে দু-তিনটে কেস ওর খবরের ওপর নির্ভর করেই ধরা গেছে।

দীপক বলল—হ্যাঁ স্যর, আমার মনে হয় সুবিধেই হবে ওর সাহায্য পেলে।

কমিশনার সাহেব বললেন—কিন্তু অনন্ত লোকটা আবার বিপদে না পড়ে। ওদের সম্বন্ধে যা শুনলাম, তাতে ত বিরাট একটা প্ল্যান বলেই মনে হচ্ছে আমার।

দীপক হেসে বলল—হ্যাঁ, এত বড় চক্রান্ত এর আগে বিশেষত এ দেশে ঘটেছে বলে জানা নেই আমার। কিন্তু কেন্দ্রস্থল কোথায় আর লোকটাই বা কে সেটাই এখনও আমার ধারণার বাইরে।

কমিশনার সাহেব হেসে বললেন—আই উইশ ইউ সাক্‌সেস্ মিঃ চ্যাটার্জী। প্রয়োজন হলে স্থানীয় থানার সাহায্য না নিয়ে লালবাজার থানার সাহায্যও আপনি নিতে পারেন।

—ধন্যবাদ!

কাদাপাড়ার তিন নম্বর বস্তি।

মস্ত বড় ভাঙা বাড়িখানা যেন প্রাচীন ঐতিহ্যের ধারা বহন করে অনেক কষ্টে দণ্ডায়মান।

সেদিন সন্ধ্যার পর দীপককে বাড়িটার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল।

কিন্তু কোথায় কে? কোনও জনমানবের সাড়াশব্দ পর্যন্ত নেই—জীবন্ত মানুষ ত দূরের কথা।

প্রায় এক ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থেকে অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছিল দীপক। দু-একবার সে অত্যন্ত পরিচিত ভঙ্গিতে শিস দিয়ে উঠল।

অনন্তপ্রসাদ নিকটে কোথাও থাকলে এ শিসের অর্থ নিশ্চয়ই বুঝতে পারত। কিন্তু কোনও প্রত্যুত্তরই ভেসে এল না।

ভাঙা বাড়িটার দিকে চেয়ে দীপক ভাবল, এখানেই কেউ লুকিয়ে নেই ত?

সবে কয়েক পা এগিয়েছে এমন সময় কোথা থেকে দুজন লোক আচম্‌কা ঝাঁপিয়ে পড়ল দীপকের ওপরে।

কিন্তু দীপকও আজ অপ্রস্তুত ছিল না।

হুল্লোড়...

চীৎকার...

ছোরা...

রিভলবার...

গুড়ুম্ গুড়ুম্ শব্দ...

আর্তনাদ...

দীপককে ছেড়ে দিয়ে আততায়ীরা ছুটে পালাল।

দীপক কোন্ দিকে যাবে ভাবছে, এমন সময় কোথা থেকে একটা দশ-বারো বছরের ছোকরা ছুটে এসে তার হাতে ছোট একটা চিঠি দিল।

চিঠিতে লেখা ঃ

দূরে থেকে সব দেখছি! ভয়ে দেখা করতে পারিনি। আপনি উল্টো দিকের পুকুরের পাড়টাতে এসে আমার সঙ্গে দেখা করুন। সমস্ত খবর বলছি। ইতি—

অনন্তপ্রসাদ

দীপক হাতের লেখাটা ভাল করে পড়ে দেখল।

হ্যাঁ, এ অনন্তের লেখা বটে। নিঃসন্দেহ হয়ে দীপক এগোল। ঐ যে অনন্ত দাঁড়িয়ে আছে।

অনন্ত দীপককে দেখে বলল—আশ্চর্য! কিভাবে যে এরা টের পেল! আমি এদের দেখেই গা-ঢাকা দিয়েছিলাম।

দীপক বলল—শীগগির খবরগুলো বলে ফেল।

অনন্ত বলল—বর্মার একজন পুরোনো ঘুঘু তাদের দলের নেতা। তবে সে বার্মিজ নয় বলে শুনেছি। হিন্দুস্থানী।

দীপক বলল—এটুকু জানি।

অনন্ত বলল—জানেন স্যার? যে ক'টা ঘটনা আজ পর্যন্ত ঘটেছে তার সবগুলোই আগে থেকে প্ল্যান করে করা। ওদের একটা গোপন সংবাদ সংগ্রহ করবার ভাল ব্যবস্থা আছে। বিরাট দল। তাদের আড্ডা হচ্ছে নারকেলডাঙা রেলপুলের কাছাকাছি কোনও এক স্থানে।

দীপক বলল—তুমি ঠিক বলছ ত অনন্ত?

অনন্ত যেন একটু ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলল—প্রাণ বিপন্ন করে এই সমস্ত খবর যোগাড় করতে হয়েছে স্যার...

দীপক হেসে বলল—বেশ বেশ, তোমাকে আমি রিওয়ার্ড দেবার ব্যবস্থা করব।

অনন্ত আরও বলল—চপলা নামে একটা মেয়ে আছে স্যার। তাকে বোধ হয় আপনি চেনেন। সেও এই দলের সঙ্গে জড়িত। তবে আগে এদের সঙ্গে সম্পর্ক থাকলেও বর্তমানে সে এই দলে নেই। কি একটা গোলমাল হবার পর সে এই দল ছেড়ে দিয়েছে।

দীপকের মাথার মধ্য দিয়ে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। তার মনে তখন ভেসে উঠল সেদিন এস্‌প্ল্যানেডে ইন্‌স্পেক্টর তরফদারের কথাগুলো। সত্যিই ত, তিনি সেদিন দীপককে ঠিকমতই সাবধান করে দিয়েছিলেন। দীপক প্রশ্ন করল—বেশ বেশ, আর কিছু খবর আছে?

অনন্ত বলল—না স্যর, আর কিছু খবর নেই আপাতত। কিন্তু পেলে আবার জানাব অবশ্যই। পরে দেখা হবে রাজাবাজারের মোড়ের কাছে ওই ছোট দোকানটায়।

দীপক হেসে বলল—আচ্ছা।

কথা শেষ করে সে ফিরে চলবার জন্য এগুচ্ছে, এমন সময় অনন্ত বলল—একটা কথা স্যর!

—কি ব্যাপার?

—এ ঘটনাগুলো যে আমি আপনাকে জানিয়েছি, এটা যেন কিছুতেই কেউ জানতে না পারে! তাহলে সেই মুহূর্তেই আমাকে প্রাণ বিসর্জন দিতে হবে!

দীপক হেসে বলল—তা জানি। তোমার কোনও ভয় নেই অনন্ত। আচ্ছা চলি।

সাত

—ঘটনা-সংঘাত—

ভবানীপুর অঞ্চলের একটি অভিজাত হোটেল।

দ্বিতলের একটি ঘরে চপলাকে অত্যন্ত চিন্তিত অবস্থায় দেখা গেল। বারকয়েক ঘরের মধ্যে পায়চারী করল সে। তারপর নিজের মনেই কিছুক্ষণ বিড়বিড় করে হাতে তুলে নিল একটা চিঠি।

চিঠিটার দিকে বেশ ভাল করে আর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে সে বেশভূষার দিকে মনোযোগ অর্পণ করল।

বেশভূষা ও প্রসাধন শেষ করে সে চিঠিখানা টেবিলের ড্রয়ারে রেখে সোজা নিচে নেমে এল। তারপর ম্যানেজারকে বলল—যদি কেউ আমার খোঁজ করতে আসে, তবে তাকে বলবেন যে বিশেষ কাজে আমি বেরিয়ে গেছি। সন্ধ্যার আগে ফিরতে পারব না।

ম্যানেজার চপলার অপূর্ব সুন্দর চেহারার দিকে ঘাড় নেড়ে বললেন—বেশ, তাই হবে।

হোটেল থেকে বেরিয়ে চপলা একটা ট্যাক্সিতে চেপে বসল। তারপর ড্রাইভারের দিকে চেয়ে বলল—সোজা কাদাপাড়ার দিকে...

কিন্তু সে কি তখন আন্দাজ করতে পেরেছিল যে এই ট্যাক্সিটা কোনও একটি বিশেষ আড্ডার ট্যাক্সি?

চপলা নিঃশঙ্কমনে গাড়িতে উঠে বসল।

গাড়িখানা দ্রুতবেগে এগিয়ে চলল তার নির্দেশিত পথে।

ঘণ্টাখানেক পরে ট্যাক্সিটা এসে দাঁড়াল কাদাপাড়া অঞ্চলের একটি বাড়ির সামনে। এই বাড়িখানার কথাই সেদিন চপলা তার আত্মীয়ের বাড়ি বলে দীপকের কাছে বলেছিল।

কিন্তু বাড়িখানার মধ্য থেকে কোনও লোকের সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। তখন চপলা বাধ্য হয়ে কড়াটা নাড়ল। কিন্তু এ কি! দরজা খোলা। অর্গল মুক্ত। চপলা ফাঁকা দরজাটা দিয়ে সোজা বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করল। একটা অমঙ্গলের আশঙ্কা ছড়িয়ে পড়ল তার সারা

মনে। তবে কি যে-বিপদের সংবাদ সে চিঠিতে জানতে পেরে এতদূর ছুটে এসেছে তা সত্যে পরিণত হয়েছে? কিন্তু কি করে সে তাতে আর বাধার সঞ্চার করতে পারে?

এদিকে যে ট্যাক্সিটাতে চড়ে চপলা এসে গৃহের মধ্যে প্রবেশ করেছিল তার ড্রাইভার বেশ ভাল করে লক্ষ্য করে যখন দেখতে পেল চপলা বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করেছে, তখন সে তাড়াতাড়ি গাড়িটা নিয়ে একটা পাবলিক টেলিফোনের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলো। তার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হলো, সে অত্যন্ত উত্তেজিত। কেমন যেন উদ্দেশ্য তার চোখ-মুখে। সবচেয়ে বড় কথা এই যে গাড়ির ভাড়াটা পর্যন্ত নিতে সে ভুলে গেছে।

টেলিফোনের সামনে গিয়ে একটা দুয়ানি ফেলে দিয়ে ফোনটা তুলে নিয়ে সে বলল—হ্যালো, পুট্ মি টু বড়বাজার ফোর নট্ ফাইভ্ ওয়ান...

একটু পরেই উত্তর ভেসে এলো—কে?

—আমি সাত নম্বর ড্রাইভার। আপনি কি হরিধনবাবু?

—হ্যাঁ, আমি ট্যাক্সির আড্ডা থেকে কথা বলছি।

—ঠিক আছে স্যর। এদিকের কাজ তৈরী।

—কতদূর এগোল?

—মেয়েটা বাড়ির মধ্যে ঢুকেছে স্যর। আমি গাড়ি করে তাকে পৌঁছে দিয়েছি।

—বেশ, বেশ, তুমি নজর রাখ। আমি যত সত্বর সম্ভব হয় ব্যবস্থা করছি।

—আচ্ছা। কিন্তু আমার বকশিসটা...

—হ্যাঁ, তোমার মাইনে ছাড়াও এবার মোটা বকশিস তুমি পাবে।

অনন্তর কাছ থেকে সংবাদটা পেয়ে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে দীপক ফিরে এলো।

প্রথমেই সে পুলিশ অফিসে ফোন করে অনন্তর দেওয়া খবরটা জানাল। অবশেষে বলল—অনন্তর খবর যদি সত্যি হয়, তবে খালপুলের নিচেই কোথাও বোধ হয় কারখানাটা আছে। আপনি সেটা খুঁজে বের করতে লোক্যাল থানাকে নির্দেশ দিন স্যর।

ডেপুটি কমিশনার বললেন—আচ্ছা।

দীপক বলল—আমার দিক থেকে চেষ্টার ত্রুটি হবে না স্যর।

—তা জানি। কিন্তু এদিকে আগামীকাল বিকেলের দিকে এই সংক্রান্ত আর একটা কাজে আপনাকে আত্মনিয়োগ করতে হবে মিঃ চ্যাটার্জী।

—কি কাজ স্যর?

—বর্মা থেকে এরোপ্লেনে বহুমূল্যের সোনা ভারতের বুকে আসছে। সেটা কাল বিকেলে কোল্‌কাতায় এসে পৌঁছলে আপনারা প্রথমে সেটা পরীক্ষা করে দেখবেন। তারপর সারারাত পুলিশ এবং গোয়েন্দাদের সাহায্যে সেটা পাহারার ব্যবস্থা করা হবে। আমি চাই আপনিও সেই দলে থাকবেন।

—বেশ, আমার আপত্তি নেই।

—শুধুমাত্র এক রাত্রি। তারপর উপযুক্ত মোহর দিয়ে সেই সোনা-বোঝাই প্লেন সকালে যাত্রা করবে এবং যথাসময়ে দিল্লী পৌঁছবে। এতবড়ো একটা কাজে ব্যর্থ হলে কোল্‌কাতা পুলিশের দুর্নাম রটতে পারে।

—জানি স্যর।

—সেজন্যেই তীক্ষ্ণভাবে এ পাহারার ব্যবস্থা! আশা করি আপনি ঠিকমত নজর রেখে পুলিশের সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা করবেন।

—অবশ্যই স্যর।

ডেপুটি কমিশনার ফোন ছেড়ে দিলেন।

দীপক ধীরে ধীরে পরবর্তী কার্যপদ্ধতি সম্বন্ধে চিন্তা করতে করতে তন্ময় হয়ে পড়ে। তার একমাত্র দুর্ভাবনা শুধু ইউকিনের দল নিয়ে। তা নইলে এ ধরনের কাজে তেমন ভয়ের কিছুই নেই।

আট

—খুন-চুরি-গুম্—

ক্রিং ক্রিং ক্রিং...

টেলিফোনের ডাক দীপকের চিন্তাধারায় বাধার সৃষ্টি করল।

—কে?

—আমি ভবানীপুর থানা থেকে বলছি মিঃ চ্যাটার্জী।

—বুঝেছি। কিন্তু হঠাৎ কি আবার এমন ব্যাপার ঘটল যে...

—বেশি কিছু নয়, মিস্ চপলা বসু নামে একটি মেয়ে হঠাৎ নিখোঁজ হয়েছে।

—সে কি? কিভাবে নিখোঁজ হলো সে? সোজা হয়ে বসে প্রশ্ন করে দীপক।

—গতকাল দুপুরে তিনি হোটেল থেকে বেরিয়ে যান। আজ পর্যন্ত ফিরে আসেননি। কোন সংবাদও পাঠাননি।

—আপনি জানলেন কি করে?

—হোটেলের ম্যানেজার আমাকে ইন্‌ফর্ম করেন। আর আপনি ওঁর সঙ্গে কয়েকটি বিষয়ে জড়িত ছিলেন বলে জানতে পারলাম। তাই আপনাকে এ ব্যাপারটা জানাচ্ছি।

—ধন্যবাদ। আমি এক্ষুণি বিষয়টা দেখছি।

—একটা কথা মিঃ চ্যাটার্জী...

—বলুন।

—যতদূর মনে হয় তিনি ইচ্ছে করে কোথাও যাননি। তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে তাঁকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

—আপনার হঠাৎ একথা মনে হলো কেন? দীপক প্রশ্ন করে।

—আমি দেখলাম জিনিসপত্র সব ঠিকমতই আছে। তিনি কিছুই নিয়ে যাননি। তা ছাড়া বের হবার সময় ম্যানেজারকে বলে গিয়েছিলেন যে, কেউ সাক্ষাৎ করতে এলে তাকে যেন জানানো হয় যে তিনি সন্ধ্যায় ফিরবেন।

—আচ্ছা, এটা জেনে আমার খুব সুবিধে হলো। আমি বেশ ভাল করে বিষয়টা নিয়ে তদন্ত করব।

—আচ্ছা, এর মধ্যে অন্য কোনও মিসট্রি আছে কি মিঃ চ্যাটার্জী? আমার কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছে...

—হ্যাঁ। সম্প্রতি রক্তথাবা নামে যে একটা দল সহরের বুকে মারাত্মক সব কার্যকলাপ

করে বেড়াচ্ছে, মিস্ চপলা বসুর অন্তর্ধানরহস্য তার সঙ্গেই যুক্ত বলে মনে হচ্ছে। আচ্ছা, আপনার সংবাদের জন্য ধন্যবাদ।

ফোনের রিসিভারটা নামিয়ে রেখে দীপক পোষাক পরিবর্তন করে পথে বেরিয়ে পড়ল। একটা ট্যাক্সিতে চেপে ড্রাইভারের দিকে চেয়ে বলল—ভবানীপুর।

হোটেলের ঠিকানায় পৌঁছে দীপক সর্বপ্রথমে ম্যানেজারের ঘরে প্রবেশ করল।

ম্যানেজার ভদ্রলোক তার পরিচয় পেয়ে হন্তদন্ত হয়ে দাঁড়িয়ে উঠে বললেন—আরে, আপনিই বিখ্যাত ডিটেকটিভ দীপক চ্যাটার্জী?

দীপক তার পরিচয়-পত্রটা দেখিয়ে বলল—হ্যাঁ। আমি চপলা দেবীর ঘরটা একবার সার্চ করতে চাই। আশা করি তিনি জিনিসপত্র বিশেষ কিছুই সঙ্গে নিয়ে যাননি।

—না, তা অবশ্য নিয়ে যাননি তিনি।

—এখন তাঁর ঘরের দিকে একবার নিয়ে চলুন আমাকে।

হোটেলে যে ঘরখানা নিয়ে চপলা থাকত, সেটা বেশ তন্ন তন্ন করে সার্চ করে দেখল দীপক।

কিন্তু প্রয়োজনীয় তথ্য বিশেষ কিছুই সংগ্রহ করতে পারল না সে।

কতকগুলি শাড়ি, ব্লাউজ, প্রসাধন দ্রব্য, নিত্যব্যবহার্য কিছু জিনিসপত্র। এ ছাড়া এমন কতকগুলি চিঠি যা কোনও কাজে লাগবে না।

অবশেষে টেবিলের ড্রয়ারটা খুলেই চমকে উঠল দীপক। তার মধ্যে একখানি চিঠি দেখতে পেল সে। নীল কাগজের বুকে গোটা গোটা অক্ষরে লেখা ঃ

মীরা,

পত্রপাঠ আমার সঙ্গে দেখা করো। ইউকিন সম্বন্ধে এমন কতকগুলি খবর জেনেছি যা তোমার অসম্ভব রকম কাজে লাগবে এবং তার সাহায্যে তুমি তাকে গ্রেপ্তার করাতে পারবে। সেদিন তোমার ভ্যানিটি ব্যাগ চুরি যাওয়াতে তার পরিচয়-পত্র হারিয়ে তুমি যে অসুবিধেয় পড়েছিলে, তা আর থাকবে না।

কিন্তু আমি এখন বিপন্ন। তুমি এক্ষুণি পত্রপাঠ চলে এলে আমরা দুজনে সোজা চলে যাব বিখ্যাত গোয়েন্দা দীপক চ্যাটার্জীর কাছে। তাঁর কাছে সব খুলে বলব এবং সমস্ত সন্ধান দেব। রক্তথাবার হাত তাহলে আপনিই গুটিয়ে আসবে। ইতি—

তোমার অভিন্নহৃদয় বন্ধু

বিনায়ক শর্মা

চিঠিখানা ছিল একখানা খোলা খামের ভিতরে।

খামটা উল্টে চিঠির ওপরের ডাকঘরের ছাপটার দিকে আকৃষ্ট হলো দীপকের দৃষ্টি।

দীপক খুব ভাল করে সেটা পরীক্ষা করে ম্যানেজারকে লক্ষ্য করে বলল—এটা দেখছি কাল পোস্ট অফিস থেকে ডেলিভারী করা হয়েছে। তাই না?

ম্যানেজার বললেন—সেটা ঠিক জানি না স্যর। প্রত্যেকটা চিঠি ত ঠিক একই সময়ে আসে না। আর হোটেলের লেটার-বক্স থেকেই সকলে আপন আপন চিঠিপত্র নিয়ে যান।

দীপক বলল—ঠিক সময়টা আন্দাজ না করলেও অন্ততঃ এটুকু বোঝা যায় যে, ওই চিঠিটা পেয়ে চপলা দেবী বেরিয়ে যান। তা ছাড়া এর পেছনে যে রহস্যটা লুকিয়ে আছে তা নিশ্চয়ই তাঁর গোচরে এসেছিল। সেজন্যেই তাঁকে অন্তর্হিত হতে হয়েছে।

কাদাপাড়ার যে ঠিকানাটা চিঠির ওপরে লেখা ছিল সেটা তার নিজের ডয়েরীতে লিখে

নিয়ে দীপক সোজা বেরিয়ে এসে মোটরে চেপে বসল। এক্ষুণি পর পর যে সব ঘটনার সম্মুখীন তাকে হতে হবে সেজন্যে সে মনকে প্রস্তুত করে নিল।

হোটেল থেকে বেরিয়ে সোজা কাদাপাড়া থানায় উপস্থিত হয় দীপক। সেখানকার ও.সি. মিঃ দেশাইকে সঙ্গে নিয়ে সে চলল নির্দিষ্ট ঠিকানার দিকে।

এটুকু অন্তত দীপক বুঝতে পেরেছিল যে এই ঠিকানায় যে লোকটি থাকে সে ইউকিন বা রক্তথাবা সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানে এবং সেই সব তথ্যাদি জানাবার জন্যেই আজ চপলা বসুকে নিখোঁজ হতে হয়েছে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই নির্দিষ্ট বাড়ির সামনে গিয়ে উপস্থিত হলো তারা। সরু একটা গলির মধ্যে একতলা বাড়ি। বাইরে থেকে দরজাটা বন্ধ। মিঃ দেশাইকে একটু দূরে অপেক্ষা করতে বলে দীপক ভেতরে প্রবেশ করবার জন্যে দরজায় ধাক্কা দিল।

কিন্তু কোনও উত্তর নেই।

পর পর ক'বার জোরে জোরে ধাক্কা দিয়েও কোনও উত্তর মিলল না। সজোরে নাড়ল দরজার কড়া। তবুও ভেতর থেকে কোনও উত্তর ভেসে এলো না।

দীপক তখন বুঝতে পারল যে সামনে থেকে কোনও সংবাদই মিলবে না। সে মিঃ দেশাইকে সামনে অপেক্ষা করতে বলে বাড়িটার পেছনের দিকে অগ্রসর হলো।

দুটি একতলা বাড়ি পাশাপাশি।

মাঝে একটা সাধারণ প্রাচীর।

একটু চেষ্টা করেই দীপক প্রাচীরটার ওপরে উঠে পড়ল। তারপর এক লাফে বাড়ির মধ্যে।

বাড়ির সামনের বাঁধানো রকটা পার হয়ে পাশাপাশি দুটি ঘর। একটি তালাবন্ধ, অন্যটির দরজা খোলা। দীপক খোলা ঘরে প্রবেশ করে দেখে, একজন লোক একটি চেয়ারে বসে ঘুমোচ্ছে।

দীপক তাকে ঘুম থেকে জাগাবার জন্যে গায়ে হাত দিতেই অবাক হয়ে দু'পা পেছিয়ে পড়ল।

লোকটির গা বরফের মত ঠাণ্ডা। গায়ে হাত স্পর্শ করবার সঙ্গে সঙ্গে একপাশে ঢলে পড়ল সে।

বহুক্ষণ পূর্বেই লোকটির মৃত্যু হয়েছে।

দীপক দরজা খুলে বাইরে এসে মিঃ দেশাইকে ভেতরে ডেকে নিয়ে মৃতদেহটা দেখাল।

মৃতদেহের মুখের দিকে চেয়ে মিঃ দেশাই চমকে উঠলেন। তিনি বললেন—আরে, এঁকে ত আমি চিনতাম! ইনি আমার পূর্বপরিচিত। বহুদিন পূর্বে ইনি বর্মার পুলিশবিভাগে কাজ করতেন। সম্প্রতি অবসর গ্রহণ করবার পর প্রাইভেট ডিটেকটিভ ফার্ম খোলেন। একবার একটা কেসের ব্যাপারে এঁর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। এঁর আসল নাম ত মোহন সিং। কিন্তু ইনি কি করে চপলা দেবীর আত্মীয় হলেন?

মৃদু হেসে দীপক বলল—আত্মীয় নয় মিঃ দেশাই, বোধ হয় শুধু পরিচিত। ইনি বোধ হয় ইউকিনের বিরুদ্ধে চপলা দেবীর দ্বারা নিযুক্ত হন।

—কিন্তু এঁকে হত্যা করল কেন?

—ইউকিনের বিরুদ্ধে কতকগুলি প্রমাণ বোধ হয় ইনি সংগ্রহ করেছিলেন, আর সেই

জন্যেই বোধ হয় ইনি নিহত আর চপলা দেবী নিখোঁজ। এই ইউকিন বা রক্তখাবার বিরুদ্ধে আজ আমার অভিযান। কিন্তু ওরা দুজন ছাড়া আসল ইউকিনকে কেউ দেখেনি বা চেনেও না। এখন কিভাবে যে অগ্রসর হব সেই দুশ্চিন্তাই আমার মনে প্রধান হয়ে দেখা দিয়েছে। যাক্ সে কথা, আপনি লাশটা আগে মর্গে পাঠাবার ব্যবস্থা করুন। আমাদের জানা উচিত, কতক্ষণ আগে এঁর মৃত্যু ঘটেছে।

মিঃ দেশাই বললেন—তা ত বুঝলাম, কিন্তু ইউকিন নামে এই অজ্ঞাত লোকটির বিরুদ্ধে আমাদের এই যে অভিযান, এর যবনিকাপাত হবে কবে?

দীপক হেসে বলল—রতনকে ত এদিকে দৃষ্টি রাখবার জন্যে দু'দিন আগে আমি এই অঞ্চলে নিযুক্ত করেছি। কিন্তু আজ পর্যন্ত ওরও কোন খবর পেলাম না, এটাই আশ্চর্য।

মিঃ দেশাই বললেন—চেষ্টার ত ত্রুটি হচ্ছে না, এখন সার্থকতা বা বিফলতা ভগবানের হাতে।

নয়

—শয়তানর শয়তানি—

দীপক চ্যাটার্জীর সহকারী রতনলালের কথা অনেকক্ষণ আমাদের আলোচনার বাইরে গিয়ে পড়েছিল।

কিন্তু দীপকের নির্দেশমত কাদাপাড়া অঞ্চলে দৃষ্টি রাখতে চেষ্টা করে সেও সেদিন একটা মস্ত বড় কাজের ঠিক মুখোমুখি গিয়ে পড়েছিল।

দীপকের নির্দেশে কাজে হাত দিয়ে সে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে ছিল না। বিভিন্ন বস্তির ভেতরে ঘোরাফেরা করে নানা ধরনের তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করছিল রতন। দু-চারটে খবরাখবর যে সে সংগ্রহ করেনি, তা নয়। কিন্তু কে যে এই দলপতি ইউকিন বা রক্তখাবা এবং কিভাবে অগ্রসর হলে তার সন্ধান পাওয়া যাবে সে সম্বন্ধে সে একেবারে কোন খবরই বের করতে সক্ষম হয়নি।

সেদিন সন্ধ্যার দিকে নারকেলডাঙা মেন রোড ধরে ছুটে চলেছিল একটা গাড়ি।

গাড়ির ওপর নজর পড়তেই চম্‌কে উঠল রতনলাল। গাড়ির মধ্যে যে মেয়েটি বসে সে তার চেনা। এ সেই চপলা বসু।

এক মুহূর্ত ভেবে মনস্থির করে ফেলে রতন। ততক্ষণে গাড়িটা একটা গলির মধ্যে প্রবেশ করেছে।

বাড়িটা বর্মার ডিটেকটিভ মোহন সিং-এর। রতন দেখল চপলাকে নামিয়ে দিয়েই ড্রাইভার গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে একটা প্রাইভেট টেলিফোনের সামনে দাঁড়িয়ে কথাবার্তা বলছে। সে সব কথা সম্বন্ধে আগেই আলোচনা করা হয়েছে।

লোকটার কথা শুনে রতন বুঝতে পারল চপলার বিরুদ্ধে নিশ্চয়ই কোন চক্রান্ত চলেছে। কিন্তু হরিধন নামে যে একটা লোকের সঙ্গে এই লোকটা কথা বলল, রতন তাকে চিনতে পারল না। সেই লোকটা কে?

একটু পরেই চপলা বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল।

তার সারা মুখে কেমন যেন একটা আতঙ্ক আর দুশ্চিন্তার ছায়া। এই বাড়িটার মধ্যে

নিশ্চয়ই কোন দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে মনে হলো রতনের। কিন্তু কি ব্যাপার তা সে বুঝতে পারল না।

রতন ইতিমধ্যে একটা মারাত্মক কাজ করে বসল। সে এতক্ষণ গাড়িখানার পেছনে আঁধারে গা-ঢাকা দিয়ে লুকিয়ে ছিল। এবার সে গাড়ির তলার দিকের হুড়টা ধরে ঝুলে পড়ল। এভাবে ঝোলা যে কতটা বিপজ্জনক তা সে জানত। কিন্তু এদিকের অবস্থা যে পরিমাণ জটিল আকার ধারণ করেছে, তাতে ভয় করলে চলবে না কিছুতেই।

চপলাকে বুকে নিয়ে গাড়ি চলতে সুরু করল। জোরে...আরও জোরে...

গাড়ির ভেতর থেকে চপলার আর্তকণ্ঠ শোনা গেল। কে বা কারা নিশ্চয়ই তাকে আক্রমণ করেছে।

ঠিক একঘণ্টা পরে সহর ছাড়িয়ে বহুদূরে সহরতলীর প্রান্তে একটা আধাপাড়াগাঁ অঞ্চলের জঙ্গলের ধারে যখন গাড়িখানাকে দাঁড় করানো হলো, তখন রতনের দু'হাত যেন ছিঁড়ে পড়বার উপক্রম করেছে।

হাত ছেড়ে দিয়ে এবার সে নিশ্চিন্তমনে মাটির আশ্রয় পেয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

এদিকে একজন লোক গাড়িখানার দিকে এগিয়ে এলো। তার হাতে একটা টর্চ আর রিভলবার। মুখে একটা কালো কাপড়ের আবরণ।

চপলার দেহটা আলগোছে তুলে নিয়ে ড্রাইভারটা ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল, আর নূতন আগন্তুকটি চলল তার পেছনে পেছনে।

জঙ্গলটার প্রান্তে টিনের চাল-দেওয়া একটা ঘরে চপলার অচেতন দেহটাকে শুইয়ে রেখে ড্রাইভারটা প্রস্থান করল।

রতন বুঝতে পারল, কোনও একটা নির্দিষ্ট ওষুধের প্রতিক্রিয়ায় তাকে অজ্ঞান করে ফেলা হয়েছে।

চপলার জ্ঞান ফিরিয়ে আনবার জন্যে কালো-কাপড়বাঁধা লোকটি তার চোখে-মুখে জলের ঝাপ্‌টা দিতে লাগল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই তার জ্ঞান ফিরে এলো।

—কে? প্রশ্ন করে চপলা।

—আমি।

—আপনি?

—চিনতে পারছ না?

—ও, তুমি ইউকিন? শয়তান!

—তোমার কাছে তাই বটে।

—কি উদ্দেশ্যে আমাকে এখানে নিয়ে এসেছ?

—উদ্দেশ্য মহৎ। তোমার সঙ্গী বর্মার সেই টিকটিকিটাকে শেষ করেছি তা দেখতেই পেলে মীরা—

—ও নামে আমাকে ডেকো না। আমার নাম চপলা।

—সে যাই হোক। ওসব মিথ্যা তেজ দেখিয়ে কোনও লাভ নেই। তোমার প্রমাণ হাতছাড়া হয়েছে। অতএব মিথ্যা চেষ্টা করে লাভ কি? একমাত্র তুমি ছাড়া ভারতের বুকে কেউ আমাকে চেনে না।

—তা জানি।

—এই তো বুদ্ধিমতীর মত কথা। এখন তোমার মুখটা বন্ধ করতে পারলেই আমি নিষ্কণ্টক। তাই আমি চাই, তুমি আমাকে বিয়ে করে আমার দলে যোগ দেবে মীরা। আর যাই হোক, স্বামীকে কখনই ফাঁসিকাঠে ঝোলাতে তুমি পারবে না।

—তা হবে না শয়তান!

—ভেবে দেখ। এক ঘণ্টা সময় দিলাম। যদি বিয়ে করতে রাজী না হও এবং আমার দলে যোগ না দাও, তবে তোমাকে এ জগৎ থেকে সরাতে আমি বাধ্য হব।

—ব্রুট্! নৃশংস!

—যাই বলো, কোনও ফল হবে না মীরা। আমি চললাম। এক ঘণ্টা পরে ফিরে এসে তোমার মতামত শুনব।

ঘরের দরজা বন্ধ করে বাইরে বিরাট একটা তালা ঝুলিয়ে দিয়ে প্রস্থান করে লোকটি।

এতবড় সংকটময় মুহূর্ত রতনের জীবনে প্রথম নয়। আর এসব সময়ে মন দৃঢ় রেখে কাজ করতে সে জানে।

যে গাছের গুঁড়ির আড়ালে আত্মগোপন করেছিল রতন, সোজা সেখান থেকে বেরিয়ে এলো।

পকেট থেকে যন্ত্রাদি বের করে বড় তালাটা খুলতে তাকে খুব বেশি বেগ পেতে হলো না।

তারপর চপলার হাত-পায়ের বাঁধন খুলে দিয়ে বলল—শীগ্‌গির চলুন। দেরী করলেই বিপদ বাড়বে। আমি সব শুনেছি। আমি ডিটেকটিভ দীপক চ্যাটার্জীর সহকারী রতনলাল।

শূন্য ঘরের দিকে একবার ফিরে তাকিয়ে চপলা দ্রুতপদে রতনের অনুগমন করল।

ঘণ্টাখানেক পর।

রতনের নির্দেশে স্থানীয় দারোগা একদল পুলিশ নিয়ে নির্দিষ্ট বাড়িটার চারপাশে আত্মগোপন করে বসে রইলেন।

কিন্তু দস্যু ইউকিন যেন বাতাসের মাধ্যমে গন্ধ পায়! তাকে আর বাড়ির আশপাশে কোথাও দেখা গেল না।

স্থানীয় থানার দারোগা ব্যর্থ হয়ে ফিরে যাবার সময় মনে মনে ভাবলেন—উঃ, কোল্‌কাতার টিকটিকিগুলোর শুধু লম্বা লম্বা কথা। যত্‌তো সব বাজে খবর নিয়ে মাথা ঘামায় ওরা!

দশ

—অপহরণ—

সেদিন বিকেল থেকেই পুলিশ অফিস থেকে ফোনের পর ফোন দীপককে চঞ্চল করে তুলল।

এক্ষুণি বর্মা থেকে প্লেন আসবে, জানলেন পুলিশ কমিশনার সাহেব। সেদিন রাতে অন্য পুলিশ অফিসার এবং গোয়েন্দাদের সঙ্গে তাকেও উপস্থিত থাকতে হবে।

দীপক সেদিন খুব চিন্তিত ছিল। রতন তখনও ফেরেনি। আর ওদিকে যে সব জায়গার ওপর সে নজর রেখেছিল সেখানকার খবরও সে জানায়নি। সে আবার কোনও বিপদে পড়ল না ত!

সন্ধ্যার মুখে দীপক বাধ্য হয়ে গাড়িতে করে এরোড্রোমের দিকে রওনা হলো। কিন্তু সেখানে পৌছে অবস্থার গুরুত্ব দেখে সে অবাক হয়ে গেল। প্রায় আট-দশজন রাইফেলধারী পুলিশ ও পাঁচ-সাতজন সাধারণ পুলিশ অফিসারে জায়গাটা যেন সরগরম হয়ে উঠেছে।

ডেপুটি পুলিশ কমিশনার বেশ কিছুক্ষণ আগেই এসে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি দীপককে দেখে হেসে বললেন—আসুন মিঃ চ্যাটার্জী। এই প্লেনটাই বর্মা থেকে কোল্‌কাতায় এলো। এখন এর ভেতরের মালপত্রগুলো পরীক্ষা করে দেখে আমি চলে যাব। আপনারা আজ সারারাত এটা পাহারা দেবেন। কাল খুব ভোরে প্লেনখানা দিল্লীর দিকে যাত্রা করবে। পাইলট এবং ড্রাইভারেরা এটা ল্যাণ্ড করিয়ে এইমাত্র চলে গেল।

দীপক দুজন ডি.ডি. বিভাগের অফিসারের সঙ্গে প্লেনে উঠে সমস্ত সোনা পরীক্ষা করে দেখে বলল—ঠিক আছে।

ডেপুটি কমিশনার হেসে বললেন—আশা করি কোনও গোলমাল হবে না।

দীপক বলল—সেই রকমই ত মনে হয়। রক্তথাবা অন্ততঃ এক রেজিমেণ্ট দস্যু সৈন্য নিয়ে আক্রমণ না করলে কোনও ভয় নেই।

ডেপুটি কমিশনার সেক্‌হ্যাণ্ড করে গাড়িতে চড়ে বসলেন। দীপক অন্যান্য অফিসার ও আর্মড পুলিশদের উপদেশ দিয়ে নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে দাঁড়াল।

পরদিন ভোরে ড্রাইভার ও পাইলট ফিরে এলে প্লেনখানা কোল্‌কাতা ছেড়ে রওনা হলো দিল্লীর দিকে। যাত্রার আগে ডেপুটি কমিশনার আর একবার সমস্ত সোনা পরীক্ষা করে নিঃসন্দেহ হয়ে প্লেনটাকে রওনা হওয়ার হুকুম দিলেন।

কর্মক্লান্ত দেহে দীপক বাড়িতে ফিরে এসে দেখে সাম্‌নেই এখটি কৌচে দেহ এলিয়ে দিয়ে শুয়ে রয়েছে রতনলাল।

দীপকের পায়ের শব্দ পেয়ে রতন ধড়মড়িয়ে উঠে বসল। তারপর বলল—এতক্ষণ কোথায় ছিলি?

দীপক বলল—কপালের দুর্ভোগ। গভর্ণমেণ্টের সোনা পাহারা দিচ্ছিলাম।

—যাক্, কোনও গোলমাল হয়নি ত?

—না।

—ভাল কথা। এদিকের খবর জানিস? উপরে গিয়ে দেখ, একজন নতুন অতিথি।

—সেকি?

—হ্যাঁ। এঁকে উদ্ধার করে এই ঘণ্টা তিন-চার হলো ফিরেছি। উনি এখন বিশ্রাম করছেন। পরে সব শুনবি।

দীপক উপরে গিয়ে দেখল একটা খাটে চপলা বসু মৃতপ্রায় অবস্থায় পড়ে ঘুমোচ্ছে। দীপক আর তাকে বিরক্ত না করে নিজের ঘরে ফিরে এলো। তারপর বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে ঢলে পড়ল গভীর নিদ্রার কোলে।

ঘণ্টা দুয়েক পরে তার ঘুম ভাঙল টেলিফোনের ঘন ঘন আর্তনাদে।

—কে? টেলিফোন তুলে প্রশ্ন করে দীপক।

—আমি মিঃ চ্যাটার্সন কথা বলছি। ডেপুটি কমিশনার।

—সে কি? হঠাৎ জরুরী আহ্বান?

—ব্যাপার অত্যন্ত জরুরী আকার ধারণ করেছে মিঃ চ্যাটার্জী। গভর্ণমেণ্টের কাছে কৈফিয়ৎ দিতে দিতে আমাদের অবস্থা সাংঘাতিক হয়ে উঠবে।

—কি ব্যাপার স্যর?

—দমদম থেকে রওনা হওয়ার পর প্লেনের আর কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি।

—তবে গেল কোথায় প্লেনটা?

—পাইলট আর ড্রাইভার যারা সকালে এসে প্লেনটা চালিয়ে নিয়ে গেল তারা সব জাল লোক। রক্তথাবা না ইউকিন, কি যেন নাম—ওরা তাদের দলের লোক।

—কি করে জানলেন?

—আসল ড্রাইভার আর পাইলট যে হোটেলে থাকত, সেখানকার ঘরে তাদের হাত-পা-মুখ বাঁধা অবস্থায় সকালে পাওয়া গেল।

—হাউ স্ট্রেঞ্জ!

—সত্যি, এ যেন আরব্য উপন্যাসের গল্প মিঃ চ্যাটার্জী। কিন্তু শীঘ্র ব্যবস্থা না করলে আমাদের সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখা অসম্ভব হয়ে উঠবে।

—তা ত বটেই।

- কখন আসছেন?

—একটু দেরী হবে স্যর। ঘণ্টাখানেক। চপলা বসু নামে মেয়েটিকে রক্তথাবা চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল। আমার সহকারী তাকে উদ্ধার করেছে। এই চপলা বসু ছাড়া এদেশের আর কেউ তাকে চেনে না। যেমন করেই হোক. তার সাহায্য নিয়ে রক্তথাবাকে গ্রেপ্তার করতে হবে স্যর। পুলিশ-পাহারা দিয়ে তাকে নিরাপদে রাখবার ব্যবস্থা করতে হবে স্যর। আমার মনে হয়, রক্তথাবা আবার একে নিয়ে যাবার চেষ্টা করবে।

—সেটা অসম্ভব নয়। যা হোক ব্যবস্থা করুন মিঃ চ্যাটার্জী। যত সত্বর হয়।

দীপক উত্তর না দিয়ে রিসিভারটা নামিয়ে রাখল।

এগারো

—রক্তথাবা কে?—

ঘুম থেকে উঠে দুটো সিদ্ধ ডিম, মাখন-রুটি আর পর পর দু'কাপ কফি খেয়ে চপলা বেশ একটু চাঙ্গা হয়ে উঠল।

দীপক তার সামনে বসে বলল—আশা করি এবার আর আপনার সম্পূর্ণ ইতিহাস বলতে কোনও আপত্তি হবে না চপলা দেবী।

পাণ্ডুর হাসি হেসে চপলা বলল—না। আমি এবার ইউকিন সম্বন্ধে যা জানি এবং আমার প্রাচীন ইতিহাস সবটুকুই আপনার কাছে খুলে বলব মিঃ চ্যাটার্জী। আশা করি নিরপেক্ষ বিচার করে আপনি আমাকে সাহায্যই করবেন।

কোনও কথা না বলে দীপক একটা সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে চপলার কাহিনীর দিকে মনোযোগ অর্পণ করল।

চপলা বলে চলল ঃ প্রথম কথাই হচ্ছে, আমার সত্যিকারের নাম চপলা নয়। ওটা আমার ছদ্মনাম। আমার আসল নাম...

—মীরা বসু। দীপক বাধা দিয়ে বলল—এটুকু আমি জানি।

—ঠিক তাই। মীরা বলল—নিজের পরিচয় গোপন রাখবার জন্যেই এই পথ অবলম্বন করতে আমি বাধ্য হই। কিন্তু তাতেও কোন ফল হয়নি। আমার পরিচয় আপনিই প্রকাশিত

হয়ে পড়েছে। হাজার চেষ্টা করেও রক্তথাবার শ্যেনদৃষ্টি থেকে নিজেকে দূরে রাখতে পারিনি। সে যাক, আমার বাবা ছিলেন বর্মার একজন বিখ্যাত অ্যাটর্নী। বেশ ভালই ছিল তাঁর উপার্জন। অত্যন্ত অল্প বয়সে আমার মা মারা যান। তবু বাবার স্নেহ-যত্নে বেড়ে ওঠার ফলে কোনও দিনই মায়ের অভাব বুঝতে পারিনি এতটুকুও।

আমার বয়স তখন বছর ষোল। একদিন হঠাৎ দেখতে পেলাম ইউকিন নামে একজন লোকের সঙ্গে বাবা কি সব ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত আছেন। প্রথম দর্শনেই লোকটাকে আমার অত্যন্ত খারাপ মনে হয়েছিল। আমি বাবাকে সে কথা বলায় তিনি বললেন—না না, সব মানুষকেই এভাবে অবিশ্বাস করতে নেই। এঁকে অত্যন্ত সৎ লোক বলেই আমার মনে হয়।

এভাবে বছর খানেক কাটল। মাঝে মাঝে ও আমাদের বাড়িতে আসত। তখন দেখতাম ইউকিনকে দেখেই বাবার মুখ কেমন যেন বিবর্ণ হয়ে উঠত। আমি পিতার একমাত্র সন্তান। একদিন তাই আমি সাহস করে তাঁকে ব্যাপারটা জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, ইউকিনের সঙ্গে ব্যবসায়ে লিপ্ত হওয়াতে তাঁর প্রায় হাজার পঞ্চাশ টাকা ক্ষতি হয়ে গেছে। তার মধ্যে হাজার পনর-কুড়ি টাকা তিনি শোধ করেছেন। বাকিটা শোধ করা সম্ভব হয়নি। তাই বাজারে তাঁর অনেক দেনা রয়ে গেছে, তার জন্যে তাঁর নামে ওয়ারেণ্ট পর্যন্ত নাকি আসতে পারে। বুড়ো বয়েসে জেল খাটতে হবে এই দুশ্চিন্তাই তাঁকে মৃতপ্রায় করে তুলেছিল।

ইতিমধ্যে একদিন ইউকিন গোপনে আমার সঙ্গে দেখা করল। সে বলল যে আমি নাকি ইচ্ছা করলেই উপযুক্ত কাজ নিয়ে যথেষ্ট টাকা উপায় করে বাবাকে ঋণমুক্ত করতে পারি।

প্রথমটা আমি তার কথা বিশ্বাস করিনি। পরে জিজ্ঞাসা করলাম—কি সে কাজ? সে বলল—কাজ অত্যন্ত সামান্য। তার একটি চালানী ব্যবসা আছে। তাতে কাজ করলে নাকি মাসে দু'হাজার টাকা পর্যন্ত উপায় করা যেতে পারে। তবে কথাটা খুব গোপনে রাখতে হবে।

বাবাকে রক্ষা করবার জন্যে, ইচ্ছার বিরুদ্ধেও আমি এই প্রস্তাবে রাজী হলাম। কিন্তু তখন কি জানতাম যে এর পরেই আমাকে কি দুর্নিবার বিপদের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হবে!

মাস ছয়েক ভালই কাজ করলাম। আমার টাকা নিয়ে বাবা তাঁর ঋণের কিছু অংশ শোধ করে ফেললেন। কিন্তু একদিন হঠাৎ কাজ থেকে ফিরে বাড়ি এসে দেখি আমার নামে একটা অ্যারেস্ট ওয়ারেণ্ট এসে উপস্থিত। কি ব্যাপার জিজ্ঞাসা করতে পুলিশ থেকে জানাল যে আমরা নাকি গোপনে নানাধরনের চোরাই মাল এবং মাদক দ্রব্য চালান দিতাম। এভাবে বিপন্ন হয়ে আমি যখন হাজতে গিয়ে উপস্থিত হলাম তখন একদিন ইউকিন এসে দেখা করল। সে বলল, তিন হাজার টাকা দিয়ে আমাকে সে মুক্ত করবে। তবে বিচারের সময় কোর্টে আমি যেন ইউকিনের নাম না করি।

আমি সে প্রস্তাবেও রাজী হলাম। আমার দু'বছর জেল হয়ে গেল। কিন্তু ইউকিন নির্বিবাদে বাইরে ঘুরে বেড়িয়ে একের পর এক অপরাধ করে চলল।

যাই হোক্, জেল থেকে দু'বছর পরে ফিরে এসে শুনতে পেলাম ইউকিন তার একটি কথাও রক্ষা করেনি। বাবার নামে পাওনাদারেরা ওয়ারেণ্ট বের করেছিল। সেই শোকে হাসপাতালেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

এ কথা শুনে আমার মনের ওপর দিয়ে যেন জ্বলন্ত প্রতিহিংসার স্রোত বয়ে গেল। আমি সেদিনই প্রতিজ্ঞা করলাম, যেমন করে হোক ইউকিনকে গ্রেপ্তার করিয়ে প্রতিহিংসা নিতে হবে। আমার কাছে ওর একটা ফটো ছিল। তা ছাড়া বর্মার একজন প্রাইভেট

ডিটেকটিভকেও আমি তার বিরুদ্ধে নিযুক্ত করলাম। উনিই বিনায়ক শর্মা নামে কাদাপাড়ায় থাকতেন। ইউকিন ভারতে গিয়েছে খবর পেয়ে আমরা দুজনেই ভারতের দিকে যাত্রা করলাম।

কিন্তু ইউকিন তার লোক দিয়ে আমার ভ্যানিটি ব্যাগটি তার ফটোসুদ্ধ চুরি করিয়েছে। বর্মার ডিটেকটিভ মোহন সিংকেও সে হত্যা করেছে। অতঃপর সে আমাকে চুরি করে নিয়ে বিবাহ করবে বলে মনস্থ করেছিল। তাহলে আমাকে বাধ্য হয়ে তার দলেই কাজ করতে হতো।

এতগুলো কথা বলে চপলা চুপ করল।

দীপক সুরু করল—এখন আপনি ছাড়া সারা ভারতের বুকে তাকে কেউ চেনে না। তাই সে যেমন করে হোক আবার আপনাকে চুরি অথবা হত্যা করবার জন্যে নিশ্চয়ই চেষ্টা করবে।

—সেটা অসম্ভব নয়।

—সেটা যে ঘটতে পারে তা আমি জানি। যাক্,. আপনি এখন কোথায় থাকতে চান?

—আমার হোটেলে ফিরে যেতে কোনও আপত্তি নেই। তবে আমাকে রক্ষা করবার উপযুক্ত ব্যবস্থা যদি করেন...

—বেশ, সে ব্যবস্থা করছি। পুলিশ কমিশনারকে এক্ষুণি ফোন করে দিচ্ছি আমি।

বারো

—পরিশেষ—

সেদিন সকালে সহরের প্রত্যেকটি সংবাদপত্রে বড় বড় অক্ষরে বের হলো ঃ

দিল্লীগামী এরোপ্লেন হইতে সোনা উধাও!

পুলিশের শোচনীয় ব্যর্থতা!

রক্তথাবার অভিনব কীর্তি!

খবরের কাগজের খবরগুলির দিকে চোখ রেখে বিরক্ত হয়ে উঠেছিল দীপক। এভাবে যদি দিনের পর দিন তাদের এই সব ব্যর্থতার কাহিনী খবরের কাগজের বুকে বড় বড় অক্ষরে প্রতিফলিত হতে থাকে, তাহলে অবশেষে তাদের যে দুর্নাম রটবে তা থেকে কিছুতেই আর নিজেদের রক্ষা করা যাবে না। কি করবে বলে সে একমনে চিন্তা করছে এমন সময় প্রচণ্ড শব্দে টেলিফোনটা বেজে উঠল।

—কে?

—ইন্‌স্পেক্টর বাসু।

—কি খবর আপনার?

—আমি ভবানীপুরে হোটেল রিজেন্টের ওপর দৃষ্টি রেখেছিলাম। আজ সকালে দেখছি একদল লোক হোটেলের সাম্‌নে জটলা করছে। তাদের উদ্দেশ্যটা কি ঠিক বুঝতে পারছি না।

—তাই নাকি? আমি লালবাজারে ফোন করে এক্ষুণি আসছি। খুব অ্যালার্ট থাকবেন মিঃ বাসু। মেয়েটা যেন হাতছাড়া হয়ে না যায়।

লালবাজারে একটা জরুরী ফোন করেই দীপক রওনা হয় ভবানীপুরের দিকে।

গুড়ুম্! গুড়ুম্!

চলন্ত জীপটা থেকে পর পর দুটো গুলি ছুটে এলো পেছনের পুলিশবাহিনী লক্ষ্য করে।

—যে করেই হোক ওকে অ্যারেস্ট করতে হবে মিঃ চ্যাটার্জী। বললেন ইন্স্পেক্টর বাসু।—ওই যে, রক্তথাবা ওই গাড়িটাতে করে চপলা দেবীকে নিয়ে পালাচ্ছে।

একসঙ্গে তিনটি রিভলবার থেকে গুলি গিয়ে জীপের টায়ারটাতে লাগল।

টায়ারটা সশব্দে ফেটে গেল। সঙ্গে সঙ্গে একজন লোক জীপ্ থেকে পথের ওপর লাফিয়ে পড়ে প্রাণপণে ছুটে পালাতে লাগল।

পুলিশবাহিনী চলল বন্দিনী চপলাকে উদ্ধার করতে। কিন্তু দীপক ও রতন রিভলবার নিয়ে পলায়নরত লোকটির অনুধাবন করল।

একটা সরু গলির প্রান্তে এসে দুজনে দু'দিক থেকে পিস্তল উঁচিয়ে হেঁকে উঠল—এক পা নড়লেই তোমার মৃত্যু অবধারিত ইউকিন। এখনও আত্মসমর্পণ কর!

মুখোশধারী ইউকিন প্রতিবাদ করবার অবকাশ মাত্র না পেয়ে দীপক চ্যাটার্জীর হাতে বন্দী হলো।

ওধারে লালবাজার থেকে পর পর দুটি লরী বোঝাই সশস্ত্র পুলিশ হোটেলের সাম্নে এসে দাঁড়াল। সাম্নের লরী থেকে ডেপুটি পুলিশ কমিশনার নামলেন।

—ব্যাপার কি মিঃ চ্যাটার্জী?

—এই নিন আপনার আসামী।

চপলাকে ইতিপূর্বেই মুক্ত করা হয়েছিল। সে বলল—এই হচ্ছে রক্তথাবা ওরফে ইউকিন।

দীপক তার মুখ থেকে মুখোশটা সরিয়ে নিয়ে বলল—আপনি ঠিকই বলেছেন মীরা দেবী। কিন্তু আমাদের কাছে ওর নাম ছিল ইন্ফর্মার অনন্তপ্রসাদ।

ডেপুটি পুলিশ কমিশনার প্রায় চীৎকার করে উঠলেন—সে কি মিঃ চ্যাটার্জী?

দীপক হেসে বলল—হ্যাঁ, দিনকয়েক থেকে আমার সন্দেহ হয়েছিল। পরে দেখলাম, দলের দু-একজনকে ধরিয়ে দিয়ে নিজেকে সম্পূর্ণ সন্দেহমুক্ত রেখে কাজ করে যেতে চান ইনি। আমাকেও একবার বিপদে ফেলবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু ভাগ্যক্রমে সে যাত্রা খুব রক্ষা পেয়ে গেছি। এতদিনে প্রমাণ-সমেত একে ধরা সম্ভব হলো। এখন এর আর একটি কর্মক্ষেত্র নারকেলডাঙার পুলের তলে অবস্থিত ট্যাক্সির আড্ডার হরিধন পালিতকেও গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়েছে। আর তোমার লুট-করা সোনাটা কোথায় আছে বলে ফেল ইউকিন। না বললে, আমিই বলে দিচ্ছি। ওটা ওর নারকেলডাঙার গুপ্ত আড্ডার একটা শেডের মাটির তলায় রাখা হয়েছে। হরিধন পালিতকে তোমার আগেই আমি ধরেছি। তবে সব কথা খুলে বললে তাকে বাঁচার এই আশ্বাস দেওয়াতে সে ওটা বাধ্য হয়েই আমাদের কাছে স্বীকার করেছে।

অনন্ত ওরফে ইউকিন বলল—তোমাকে মেরে ফেললেই আমার সবচেয়ে সুবিধা হতো দীপক চ্যাটার্জী। সেটা না করেই আমি মস্ত ভুল করেছি। এখন সব শেষ হয়ে গেছে...

মীরা ওরফে চপলা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল—আমার প্রতিজ্ঞা যে আপনি সার্থক করে তুললেন এজন্যে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ মিঃ চ্যাটার্জী!

দীপকের ঠোঁটে ফুটে উঠল রহস্যময় হাসি।

—শেষ—

চায়না লজ

এক

—উড়ন্ত ছায়া—

চায়না লজ।

চীনেপাড়ায় অবস্থিত বলে বাড়িটার নাম 'চায়না লজ' নয়। বাড়ির মালিক একজন চীনেম্যান। দীর্ঘদিন কল্‌কাতায় ব্যবসা করে অজস্র টাকা উপার্জন করে লোকটা পার্ক সার্কাসের কড়েয়া অঞ্চলে একটা বাড়ি তৈরি করল।

দোতলা বাড়ি। বিরাট লম্বা।

চেহারা যেন অনেকটা দুর্গের মতো।

পাশাপাশি অনেকগুলো ঘর। একতলায় গোটা পনর। দোতলায় খান বারো।

সারা বাড়িটাকে টুকরো টুকরো অংশে ভাগ করে ভাড়া দিল সে। এখানেও সে তার চমৎকার ব্যবসায়বুদ্ধির পরিচয় দিল।

কড়েয়ার লোকদের কাছে আজ চায়না লজ সুপরিচিত একখানা বাড়ি। বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন লোকের আবাসস্থল।

অবশ্য কড়েয়ার যে কোন সাধারণ লোকের কাছেও বাড়ির মালিক চিয়াং ফু একজন অতি-পরিচিত লোক।

সহজ, সাধারণ লোক এই চিয়াং ফু। টাকার দেমাক নেই। কারও সঙ্গে রুক্ষ ব্যবহার করতে জানে না সে। মুখে সব সময়ই লেগে থাকে একটুকরো হাসি।

একদল লোক কিন্তু বলে, চিয়াং ফুর এটা নাকি বাইরের খোলস। এই বাইরের খোলসের আড়ালে তার মধ্যে যে দুরাত্মা বাস করে সেটার খবর জানে না কেউ।

অথচ কি ধরণের কুকার্যে যে চিয়াং ফু অভ্যস্ত তার নিদর্শন কেউ দেখাতে পারে না।

একদল লোক তার কাছে মাঝে মাঝে আসা-যাওয়া করে। দোতলায় যে কোণের ঘরটায় বাড়ির মালিক থাকে সেটা সাধারণের কাছে কেমন যেন রহস্যময়।

বিভিন্ন লোক বিভিন্ন ধরণের দামী জিনিসপত্র নিয়ে দেখা করে চিয়াং ফুর সঙ্গে—দামী সব হীরে-জহরৎ থেকে আরম্ভ করে কোনও জিনিসই বাদ যায় না। কিন্তু সেগুলোর বিনিময়ে চিয়াং ফুর কাছ থেকে সিকি মূল্যের বেশি কোনওদিনই পায় না তারা।

কিন্তু তবু তারা বাধ্য হয় চিয়াং ফুর কাছেই ওই সব জিনিসগুলো এনে তার সাহায্যেই ওগুলো বিক্রি করতে।

তার কারণ আর কিছুই নয়—ওগুলো সব চোরাই মাল।

সাধারণ লোক খুব বেশি কথাটা না জানলেও যে দু'একজন জানত তাদের মুখ থেকেই কথাটা কানাকানি হতে হতে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে।

লোকের তাই ধারণা চোরাই মালের কায়বার করেই আজ চিয়াং ফুর এত টাকাপয়সা।

দোহারা আকৃতির চেহারা তার। কুঁৎকুঁতে দুটো চোখে যেন অবিশ্বাসের ছায়া দিনরাত

লেপ্‌টে আছে। গতিভঙ্গির মধ্যেও কেমন যেন একটা সদা-সন্দিগ্ধ ভাব। সরু সরু লম্বা লম্বা গোঁফজোড়ার মতোই পাকানো, প্যাঁচাল তার বুদ্ধি।

বহুদিন চিয়াং ফুর জীবনে এত বড় একটা দাঁও বিশেষ মেলেনি।

সেদিন সন্ধ্যা। বাইরে ঝুপ্‌ ঝুপ্‌ বৃষ্টি পড়ছে। অবিশ্রান্ত বর্ষণের যেন আর শেষ নেই! এমন সময় চিয়াং ফুর ঘরের দরজাটা নড়ে উঠল।

একজন দীর্ঘকায় অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান দরজার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে।

—কাকে চান? কর্কশ স্বরে চিয়াং ফু প্রশ্ন করে। কুঁৎকুঁতে দুটি চোখ থেকে একরাশ সন্দেহ ঝরে পড়ে যেন।

—চিয়াং ফুকে!

—কেন? কি প্রয়োজন আপনার? চিয়াং ফুর স্বরে কৌতূহলের আভাস।

—মাল আছে।

—তাই নাকি? বেশ, ভেতরে আসুন।

আগন্তুক ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে। চিয়াং ফু দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করে দেয়।

—কি জিনিস, দেখান।

চিয়াং ফুর স্বরে প্রস্তরের কাঠিন্য।

—গোটাকয়েক হীরে। একদম সাচ্চা। আস্‌লী চীজ।

—জিনিস দেখি।

লোকটি তারা কোমর থেকে টেনে বের করে একটা বড় চামড়ার ব্যাগ। তারপর সেটা খুলে মেঝের ওপর উপুড় করতেই গোটাকয়েক ঝক্‌ঝকে হীরে গড়িয়ে পড়ে।

হীরের অপূর্ব দ্যুতিতে চারদিক আলোকিত হয়ে যায় যেন। তাদের সংখ্যা দশটির কম নয়।

চিয়াং ফু একটা তুলে নিয়ে তার চোখের কষ্টিপাথরে সেটা বেশ ভাল করে যাচাই করে নেয়।

ওগুলোর কোনটার দামই হাজার বিশ-পঁচিশের কম হবে না। সবগুলোর দাম মিলিয়ে প্রায় দু'লাখ টাকা।

চিয়াং ফুর দু'চোখ থেকে যেন অজস্র লোভ ঝরে পড়ে।

—কত দিতে হবে? গভীরভাবে প্রশ্ন করে চিয়াং ফু।

—আপনিই দাম বলুন না!

—হাজার পঞ্চাশ পর্যন্ত দিতে পারি আমি।

—এত কম? অবাক হয়ে লোকটা উঠে দাঁড়ায়। ফিরে যাবার উদ্যোগ করতেই চিয়াং ফু বলে—কত হলে দিতে রাজী আছেন?

—অন্তত এক লাখ।

—মাথা খারাপ! চিয়াং ফু টেনে টেনে হাসতে থাকে—বড় জোর হাজার ষাটেক দিতে পারি।

—ষাট? আচ্ছা, তাই দিন। টাকার বড় দরকার।

কথা বলে লোকটা তার চামড়ার থলেটি চিয়াং ফুর হাতে তুলে দেয়। চিয়াং ফু হীরেগুলো ভাল করে গুণে নিয়ে থলিতে রেখে উঠে দাঁড়ায়।

ঘরের কোণে মস্ত বড় একটা লোহার সিন্দুক। সিন্দুক খুলে হীরেগুলো তার মধ্যে রেখে একগাদা একশো টাকার নোট তুলে দেয় লোকটার হাতে।

ভাল করে টাকাটা গুণে নিয়ে লোকটা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায় দৃঢ়পদে।

সেদিনই রাত দুটো। সুদূর নীল আকাশের বুকে শোনা যায় অস্পষ্ট একটা শব্দ। একটা উড়ন্ত ছায়া যেন নিঃসীম আকাশ ভেদ করে উড়ে আসছে মহানগরীর কোনও একটা নির্দিষ্ট অঞ্চলের দিকে।

স্তব্ধ কলো রাত আচ্ছন্ন করেছে মহানগরীকে। তন্দ্রার জড়িমায় শহর আচ্ছন্ন। উড়ন্ত ছায়া সম্বন্ধে চিন্তা করবার জন্যে কেউই জেগে নেই।

উড়ন্ত একটা ছায়া ঘস্ ঘস্ শব্দ করতে করতে এসে নামল চায়না লজের ছাদের ওপর। বিরাট বাড়ির বুকে তখন কেউ জেগে নেই। সামান্যতম চাঞ্চল্যেরও সৃষ্টি হয় না কোথাও। ইঞ্জিনের শব্দ থেমে গেল বলে মনে হয়।

স্তব্ধ নৈশ প্রহরের নিঃসীমতা ভেদ করে ও কিসের শব্দ? কোন্ অজানা রহস্যের গোপন ইঙ্গিত লুকিয়ে আছে ঐ সব বিচিত্র ঘটনাবলীর পেছনে?

সমস্ত চায়না লজের কোনও লোকের ঘুম না ভাঙলেও একজন লোক কিন্তু ওই শব্দে জেগে উঠেছিল।

সে হচ্ছে চায়না লজের মালিক চিয়াং ফু। সে সোজা উঠে দাঁড়িয়ে জানলার ফাঁক দিয়ে ওই বিচিত্র ঘটনাগুলো লক্ষ্য করল। তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত যেন খেলে গেল একটা বিদ্যুতের শিহরণ।

টেবিলের ড্রয়ার থেকে রিভলবারটা বের করে নিয়ে চিয়াং ফু ধীরে ধীরে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়াল।

সবে সে একটা থামের আড়ালে এসে দাঁড়িয়েছে এমন সময় দেখল দুজন লোক দ্রুত তারই ঘরের দিকে এগিয়ে আসছে।

চিয়াং ফু থামের আড়ালে নিজের দেহকে যথাসম্ভব লুকিয়ে রাখবার চেষ্টা করল।

তার ভাগ্য ভাল। লোক দুজন তাকে দেখতে পেল না। তারা নিজেদের মধ্যে বিড় বিড় করে কি যেন বলতে বলতে এগিয়ে চলল। উৎকর্ণ হয়ে চিয়াং ফু শুনল তাদের কথা। একজন বলল—তুমি ঠিক জান ত যে ওই ঘরেই চীনেটার সব টাকাকড়ি থাকে?

উত্তরে অন্য লোকটি বলল—হ্যাঁ, হ্যাঁ। ভাল করে না দেখেই এত কষ্ট করে দশ মাইল উড়ে আসিনি।

আগের লোকটা বলল—তাহলে হীরের লোভ দেখিয়ে টাকাকড়ি রাখবার গুপ্ত জায়গাটা ঠিক খুঁজে পেয়েছ দেখতে পাচ্ছি। যাক্, এবার চল দেখি....

দুজনে চিয়াং ফুর ঘরের সাম্‌নে গিয়ে দাঁড়াল। দরজাটা খোলা দেখে তারা দুজনই কেমন যেন একটু অবাক হয়ে গেল। তারা কেউই এমনটা আশা করেনি বোধ হয়।

তবু চিন্তা না করে তারা ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল সরাসরি। কিন্তু সবে টর্চটা জ্বেলে কি যেন খুঁজে বের করবার চেষ্টা করছে এমন সময় পেছন থেকে গম্ভীর শব্দে কে যেন বলে উঠল—মাথার ওপর হাত তোল শয়তানেরা। এতটুকু নড়বার চেষ্টা করার সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের পরমায়ুর শেষ মুহূর্ত ঘনিয়ে আসবে জেনো।

লোক দুজন অবাক হয়ে চেয়ে দেখে তাদের পেছনে দাঁড়িয়ে বীভৎস হাসি হাসছে চিয়াং ফু স্বয়ং।

দুজনে অবাক হয়ে কি করবে ভাবছে এমন সময় চিয়াং ফু বলল—মিথ্যে নড়াচড়া করলে জীবনটা খোয়াবে। দুজনে মাথার ওপর হাত তুলে পাশের ঘরের দিকে এগোও। ওখানেই আজ রাতের মতো থেকে কাল সকালে বরং পুলিশের জিম্মায় যেয়ো।

লোক দুটির মধ্যে একজন বলল—আমাদের পুলিশের জিম্মায় দেবার চেষ্টা করলে তুমিও রক্ষা পাবে না চিয়াং ফু। তোমার অতীত কীর্তিকলাপ সব কিছু আমরা জানি। আর আমাদের পুলিশে দেবার চেষ্টা করলে তা ফাঁস করতে...

হাঃ হাঃ হাঃ! চিয়াং ফু হেসে উঠল প্রচণ্ড অট্টহাসি। তারপর বলল—একজন ভদ্রলোকের বাড়িতে চুরি করতে এসে ধরা পড়ে যারা, তাদের কথায় পুলিশ একটুও বিশ্বাস করবে না...

—বিশ্বাস না করলেও কি করে বিশ্বাস করাতে হয় তা আমরা জানি।

—কিভাবে?

—সমস্ত প্রমাণ আমাদের হাতে আছে। কাজেই মিথ্যাই ভয় দেখাচ্ছি না তোমায়...

কথা শেষ হলো না।

চিয়াং ফুর অন্যমনস্কতার সুযোগ নিয়ে লোক দুটির মধ্যে একজন একটা রিভলবারের মতো জিনিস তার দিকে তুলে ধরে ট্রিগারটা টিপে দিল।

কিন্তু তা থেকে আগুন বের হলো না। তার পরিবর্তে বেরিয়ে এলো একঝলক ধোঁয়া। তীব্র—বিষাক্ত!

সেই ধোঁয়া নাকে এসে লাগবার সঙ্গে সঙ্গেই চিয়াং ফু জ্ঞান হারিয়ে মেঝের ওপর লুটিয়ে পড়ল।

তার হাতের রিভলবারটা মেঝের ওপর ছিট্‌কে পড়ে আপন মনেই গর্জে উঠল—গুড়ুম্।

গুলিটা গিয়ে পাশের দেওয়ালে বিদ্ধ হলো।

গুলির শব্দে সমগ্র চায়না লজের লোক জেগে উঠল।

তারা দেখতে পেল যে সুদূর আকাশের বুকে ভেসে চলেছে একটা উড়ন্ত ছায়া। ইঞ্জিনের শব্দ হচ্ছে ঘস্ ঘস্, ঘস্ ঘস্।

ওই অদ্ভুত জিনিসটি যে কি আর কেনই বা চিয়াং ফুর ঘরে এত রাতে আততায়ীরা হানা দিল, তা কেউই বুঝে উঠতে পারল না।

সমস্ত চায়না লজের উত্তেজিত লোকেরা ছুটল পুলিশকে টেলিফোন করে বিষয়টা জানাতে।

চিয়াং ফুর শুশ্রূষার জন্যে একজন ডাক্তারকেও টেলিফোন করা হলো।

ডাক্তার এসে অনেক কষ্টে চিয়াং ফুর জ্ঞান ফিরিয়ে আনলেন।

দেখতে দেখতে অজস্র পুলিশ এসে ঘিরে ফেলল সারা চায়না লজ।

সুরু হলো তদন্ত। দেখতে দেখতে যেন প্রলয়কাণ্ড সুরু হয়ে গেল সারা চায়না লজের বুকে। চিয়াং ফুকেও এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হলো—সে কিছু জানে কিনা।

হতভম্ব চিয়াং ফু শুধু বলল—আমার মাথায় কিছু আসছে না। ভগবান বুদ্ধের দোহাই! আপনারা আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করবেন না। আমার যা কিছু বলবার সব পরে জানাব।

চায়না লজে উপযুক্ত প্রহরা দেবার ব্যবস্থা করে এণ্টালি থানার পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর বিদায় নিলেন।

সমস্ত ঘটনাটাই আচ্ছন্ন হয়ে রইল বিচিত্র এক রহস্য-যবনিকার আড়ালে।

দুই

—হেলিকপ্‌টার—

পরদিন শহরের প্রত্যেকটি খ্যাত-অখ্যাত সংবাদপত্রে চায়না লজ-সংক্রান্ত খবর বেশ বড় বড় অক্ষরে ছাপা হয়েছিল।

শহরের চারদিকে সুরু হলো বিস্ময়ের গুঞ্জন। প্রত্যেকটি লোকের মুখে মুখে খবরটা ফিরতে লাগল।

ছাপা হয়েছিল ঃ

কলকাতার আকাশে হেলিকপ্‌টার!
চায়না লজে বিচিত্র আততায়ী।
রহস্যভেদে পুলিশের আপ্রাণ চেষ্টা।
কে এই বৈজ্ঞানিক দস্যু সে তথ্য এখনও পর্যন্ত অজ্ঞাত!

চায়না লজের মালিক চিয়াং ফুকে চেনে না কড়েয়া অঞ্চলে এমন লোক বিরল। তাঁর অগাধ ধনৈশ্বর্যের কথা সর্বজনবিদিত।

গত ২৩শে এপ্রিল রাত দুটোয় কল্‌কাতার আকাশে একটি হেলিকপটার বিমানকে উড়তে দেখা যায়। এর চালক যে কে, এবং কেনই বা এই বিমানখানা উড়ে এসেছিল সেকথা জানা যায় না।

এদিকে ওই হেলিকপ্‌টার বিমানটি এসে নামে কল্‌কাতার কড়েয়া অঞ্চলের চায়না লজ নামক বাড়িখানার ছাদে। দুজন অজ্ঞাত আততায়ী ওই বিমানখানা থেকে নেমে চায়না লজের মালিক চিয়াং ফুকে আক্রমণ করে। বোধ হয় চিয়াং ফুর অগাধ ধনৈশ্বর্যই ওই আক্রমণকারীদের প্রলুব্ধ করেছিল। কে বা কাহারা এই বৈজ্ঞানিক দস্যু এবং কেনই বা তাদের এই আকস্মিক আক্রমণ সে তথ্য এখনও পর্যন্ত অনাবিষ্কৃত রয়েছে।

আশা করা যায়, পুলিশ বিভাগ আততায়ীকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হবে। এ ধরণের বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সংঘবদ্ধ আক্রমণ বোধ হয় আমাদের দেশে এই প্রথম। যদি এই বৈজ্ঞানিক দস্যুদের গ্রেপ্তার না করা যায়, তবে সারা ভারতের বুকে যে এদের প্রভাব বৃদ্ধি পাবে এ সম্বন্ধে কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই।

আমরা শান্তি ও শৃঙ্খলার রক্ষক পুলিশবাহিনীকে এ সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন হতে অনুরোধ করছি।

এণ্টালি থানার সাব্‌-ইনস্পেক্টর মিঃ হালদার বেশ জবরদস্ত লোক বলে পুলিশমহলে সুপরিচিত।

তিনি স্বরটাকে যথেষ্ট গম্ভীর করে চিয়াং ফুর দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলেন—একটা কথাও গোপন করবেন না। এ সম্বন্ধে কোনও চালাকীই চলবে না আমার সঙ্গে।

চিয়াং ফু তার সরু সরু গোঁফদুটো দুলিয়ে বলল—হা বুদ্ধ! গোপন করে আমার বিপদ বাড়াতে যাব কেন?

মিঃ হালদার বললেন—বেশ, এবার বলুন আপনার বক্তব্য।

চিয়াং ফু তার চোখ দুটো পিট্ পিট্ করতে করতে বলল—ভগবান বুদ্ধের দোহাই, ইন্দোচীনের সানি উপত্যকায় বাড়ি ওই লোকটার।

—কোন্ লোকটা? মিঃ হালদার যেন আকাশ থেকে পড়লেন।

—তবে আর বলছি কি! ওই যে লোক দুটো আমাকে আক্রমণ করেছিল, তার মধ্যে যে পালের গোদা, তার কথাই বলছি।

—ওদের আপনি চেনেন তাহলে?

—হা বুদ্ধ! ওদের দুজনকে নয়। একজনকে।

—ও, যে দলপতি তাকেই আপনি চেনেন?

—হ্যাঁ স্যর।

—আর অন্য লোকটা?

—তাকে চিনি না। সে সেদিন সকালে ছদ্মবেশে এসে আমার কাছে কিছু হীরে বিক্রি করে গিয়েছিল।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ স্যর। আমার টাকাপয়সা কোথায় থাকে তার সন্ধান জানবার জন্যেই বোধ হয় ছদ্মবেশে এসেছিল হীরে বিক্রি করতে।

—কিন্তু আপনার ওপরেই বা ওদের এত নজর কেন?

—তা ঠিক জানি না। তবে আমার প্রচুর টাকাপয়সার কথা হয়ত ওরা শুনেছে। তা ছাড়া এই লোকটা ত আমাকে আগে থেকেই চিনত।

—হ্যাঁ, এবার ওর কথা কি বলছিলেন, শেষ করুন।

—ব্যাপারটা স্যর এমন কিছু জটিল নয়। ওই লোকটা গত চীন-জাপান যুদ্ধের সময় ইন্দোচীন থেকে পালিয়ে দক্ষিণ চীনে গিয়ে হাজির হয়। সেখানে সে-সময়ের অরাজকতার সুযোগ নিয়ে লোকটা একটা বিরাট দস্যুদল গঠন করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করতে থাকে।

—তারপর? উদ্‌গ্রীব হয়ে মিঃ হালদার প্রশ্ন করেন।

—তারপর? চীন-জাপান যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে পর কমিউনিস্টরা গোটা চীন দখল করে ফেলল। তখন ও আমেরিকানের ছদ্মবেশে সেখান থেকে পালিয়ে আসে জাপানে। সেখানে আমেরিকান জেনারেলের ছদ্মবেশে একটা হেলিকপ্টার বিমান আর একখানা জেট্‌প্লেন নিয়ে দুজন সঙ্গীর সাথে পালিয়ে যায়। এ খবর আমি শুনেছিলাম আমার একজন জাপানী বন্ধুর কাছ থেকে।

—সে কতদিন আগের কথা?

—তা প্রায় বছরখানেক হবে।

—তারপর?

—তারপর আর কিছু জানতাম না। কিন্তু কে জানত দস্যু লিউসিন* এতদিন বাদে কল্‌কাতার বুকে ফিরে আসবে!

—এই কি সেই বিখ্যাত ইন্দো-চাইনীজ দস্যু লিউসিন?

* দস্যু লিউসিনের পূর্ব কাহিনী এই সিরিজের তৃতীয় বই 'ভ্রান্ত পথের শেষে'তে পড়ুন।

—হ্যাঁ স্যর।

—মাই গড! মিঃ হালদার বিস্ময়োক্তি করলেন। তারপর একটু থেমে বললেন—ওর দলের অন্য কারোও নাম-টাম জানেন নাকি?

—ঠিক মনে নেই। তবে যতদূর মনে পড়ছে একটি মেয়ে ছিল ওর দলে। তার নাম বোধ হয় ফ্লোরা। জাতে মেয়েটা অ্যাংলো-চাইনীজ। আর দুজন ইন্দোনেশীয় দস্যুও ওদের দলে ছিল।

—তাদের নামও কি মনে আছে আপনার?

—না, শুধু ফ্লোরার কথাটা শুনেছিলাম সেই জাপানী বন্ধুর মুখে।

—কিন্তু ফ্লোরা নাম্নী মেয়েটাও যে সেই দলের, এমন কোনও প্রমাণ দেখাতে পারেন আপনি?

—প্রমাণ কোথা থেকে সংগ্রহ করব?

—তবে মিথ্যা কেন এর সাথে তার নামকে জড়িত করছেন? ফ্লোরা নামে একটি অ্যাংলো-চাইনীজ গার্ল ত হোটেল রিগ্যালের নর্তকী! তার বিরুদ্ধে কতকগুলি রিপোর্ট ইতিপূর্বে শুনেছিলাম আমি—কিন্তু বহু অনুসন্ধান করেও এমন কোনও প্রমাণ পাইনি যার বলে তাকে গ্রেপ্তার করা বা তার বিরুদ্ধে চার্জসীট্ চলে।

—হা বুদ্ধ! হোটেল রিগ্যালের নর্তকী! এ বোধ হয় তবে অন্য কোনও ফ্লোরা।

—নাঃ, আপনি কি বলছেন, তা নিজেই ঠিক রাখতে পারছেন না দেখছি।

—ঠিক রাখব কি করে স্যর? নর্তকী ফ্লোরার সঙ্গে দস্যু লিউসিনের কি সম্বন্ধ তা ত ভেবে পাচ্ছি না! এমন একটা জটিল রহস্য—সবকিছু মিলে যে মাথার মধ্যে কেমন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে স্যর!

—রহস্য এমনি জটিলই হয়। তাকে সরল করবার জন্যে চাই বুদ্ধি। যাক্, আপনার সঙ্গে মিথ্যা কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। আপনি এখন বিদায় নিতে পারেন।

চিয়াং ফু উঠে ধীরে ধীরে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে।

মিঃ হালদার এতগুলো ঘটনার আকস্মিকতায় একবার দীর্ঘশ্বাস ফেললেন শুধু। চিন্তার ছায়া তাঁর মনকে নিঃশেষে গ্রাস করে।

তিন

—হোটেল রিগ্যাল—

ওয়েলেস্‌লী অঞ্চলটাতে ভাল হোটেলের সংখ্যা খুব কম। তা ছাড়া খুব বেশি সংখ্যায় ভাল হোটেল চলবার মতো জায়গাও এটা নয়।

তবে এর মধ্যে যে হোটেলটা সবচেয়ে বড় এবং প্রচুর খ্যাতি-অখ্যাতি যে হোটেলের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে, তার নাম হচ্ছে 'হোটেল রিগ্যাল'।

সেদিন বিকেল পাঁচটার সময় একটি ঝকঝকে পন্টিয়াক গাড়িকে এসে দাঁড়াতে দেখা গেল হোটেল রিগ্যালের সামনে।

হোটেল খোলা আছে। তবে ভিড় এখন নেই। ভিড় হবার সময়ও এটা নয়। ভিড় হবে রাত আটটার পর থেকে।

তার কারণও অবশ্য আছে।

হোটেলের ঠিক সাম্‌নেই একটা বিরাট বোর্ডের ওপর লেখা আছে বেশ বড় বড় হরফে ঃ

রাত আটটায় ব্যালে ডান্স
প্রধান আকর্ষণ অ্যাংলো-চাইনীজ নর্তকী ফ্লোরা

যে একদল রূপপিপাসু লোকের তৃষ্ণার্ত চোখ রাত আটটার পর থেকে হোটেলে এসে ভিড় জমায় তাদের কাছে ফ্লোরার নাম সুপরিচিত। যেমন সুপরিচিত তাদের কাছে 'কেরুর হুইস্কি' বা 'জনি ওয়াকার' ব্রান্ডি। এই দুইয়ের সংমিশ্রণে রাত আটটা থেকে বারোটা পর্যন্ত কাটে অজস্র হৈচৈ আর হুল্লোড়ে।

অর্কেস্ট্রা, নর্তকীদের দেহভঙ্গিমা, দর্শকদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা হোটেল রিগ্যালকে সরগরম করে তোলে। মদ আর পোড়া চুরুটের গন্ধে বাতাস হয়ে ওঠে মাতাল।

তারপর অর্কেস্ট্রার বাজনা থামে। কলরব স্তব্ধ হয়। অর্ধ-উন্মত্ত লোকগুলি নিজস্ব প্রিয় নর্তকীদের দেহভঙ্গিমার বিশেষ টুকরোগুলো নিয়ে মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করতে করতে হোটেল থেকে বেরিয়ে নিজ নিজ গন্তব্যপথের দিকে পা বাড়ায়।

তাদের প্রলাপ আর উল্লাসধ্বনি ভদ্রঘরের গৃহস্থদের মধ্যরাত্রির নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটায়।

এই হচ্ছে হোটেল রিগ্যালের একটা অংশের রূপ।

তার অন্য একটা অংশও অবশ্য আছে। বেশ, এবার আপনাদের সেখানেই নিয়ে চলি।

বিকেল পাঁচটায় যে মোটরটা হোটেল রিগ্যালের সামনে এসে দাঁড়াল তা থেকে নেমে এলো দুজন লোক।

দুজনের পোষাক দেখেই তাদের সাধারণ ইউরোপীয় বা আমেরিকান ভদ্রলোক মনে না করে উপায় নেই।

কিন্তু এরা তার কোনওটাই নয়। একজন ইন্দো-চাইনীজ, অন্যজন চীনেম্যান।

দুজনেরই ঢুলু-ঢুলু চোখে বিশ্বের তন্দ্রা মাখানো। তারা যে বিশেষ কোনও নেশায় অভ্যস্ত এটা তাদের চেহারা মনোযোগ দিয়ে দেখলেই বোঝা যায়।

হোটেলের বুকে পা দিতেই ম্যানেজার মিঃ আয়েঙ্গার ঘাড় নেড়ে বিচিত্র কায়দায় তাদের অভিবাদন জ্ঞাপন করল।

এটা কিন্তু ভক্তি বা শ্রদ্ধা মিশ্রিত নয়। প্রত্যহ এই ধরনের কাজ করতে করতে মিঃ আয়েঙ্গারের এটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে।

সে জানে এই দুজন ভদ্রলোককে হোটেলের মালিক যথেষ্ট সম্মান ও ভয় করে। আর সে সামান্য দুশো টাকা মাইনের চাকর হয়ে তা না করলে, যে কোনও মুহূর্তে চার চাকরী নিয়ে টানাটানি পড়তে পারে।

দুজনেই হন্ হন্ করে একতলা পেরিয়ে দোতলার দিকে পা বাড়ায়। ম্যানেজারের অভিবাদনের প্রত্যভিবাদন জানাতেও তারা ভুলে যায় যেন।

ম্যানেজার মিঃ আয়েঙ্গার নিজের মনেই বিড়বিড় করে বলে—শূকরের সাম্‌নে মুক্তো ছড়ালেই বা কি, না ছড়ালেই বা কি...

—কার উদ্দেশ্যে কথাটা বলছ হে?

পেছন থেকে গম্ভীর গলায় প্রশ্ন ভেসে আসে।

মিঃ আয়েঙ্গার চেয়ে দেখে তার পেছনে দাঁড়িয়ে স্বয়ং হোটেলের মালিক আল্লাবক্স। তার দু'চোখে বিরক্তি আর ক্রোধ মিশে একাকার হয়ে গেছে।

মিঃ আয়েঙ্গারের গলা শুকিয়ে কাঠ। সে কোনওমতে ঘাড়টা নেড়ে বলল—নিজের মনেই বলছিলাম স্যর...

—বলি চাকরীটা কি বজায় রাখবে, না খোয়াতে চাও?

—আজ্ঞে স্যর উনি নমস্কার...

– ওঁদের মতো লোকের সময়ের দাম আছে, বুঝেছ হে? তোমাকে নমস্কার জানানোর জন্যে ওঁদের সময় নষ্ট করা চলে না...

—কিন্তু আমি ত ঠিকমতই স্যালুট করেছিলাম।

—তাই করবে। এটা তোমার ডিউটি। উনি কি করছেন তা নিয়ে সমালোচনা করাটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। অন্তত যদি চাকরীটা বজার রাখার ইচ্ছে তোমার থাকে।

—তা ত বুঝলাম স্যর। কিন্তু...

—এই বুঝেই সব সময় চলবে মিঃ আয়েঙ্গার।

কথা না বাড়িয়ে আল্লাবক্স দ্রুত দোতলার দিকে এগিয়ে যায়।

মিঃ আয়েঙ্গার অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে একটা মুখভঙ্গি করে বলে—দুত্তোর চাকরী!

দোতলার একটা ঘরের দরজায় তিনবার টোকা পড়ল।

ভেতর থেকে মেয়েলি গলায় উত্তর ভেসে এলো—ভেতরে আসতে পার।

লোকদুটির মধ্যে একজন বাইরে দাঁড়িয়ে থাকে। অন্যজন ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে।

—কি খবর লিউসিন?

আয়নার সামনে প্রসাধনরতা মেয়েটি প্রশ্ন করে।

—এখনও দেখছি তৈরি হতে পারনি ফ্লোরা।

—মাত্র আধঘণ্টা আগে তোমার ফোন এলো। এত অল্প সময়ের মধ্যে কি করে..

মুখে পাউডারের পাফটা বুলোতে বুলোতে ফ্লোরা উত্তর দেয়।

—কিন্তু আমি এর মধ্যেই রেডি হয়ে চলে এলাম।

—মেয়েদের একটু সময় বেশি লাগে।

ফ্লোরা হেসে ওঠে খানিকটা ওজন-করা হাসি।

—বিশেষ করে তোমার সময় লাগে সব চেয়ে বেশি। লিউসিন টেনে টেনে হাসতে থাকে।—তোমার পোষাকের উপরেই অনেক কিছু নির্ভর করে কিনা। আহা, ওই পুরোনো হল্‌দে গাউনটা বাদ দাও ফ্লোরা। তার চেয়ে দামী লাল রঙের সেই গাউনটা বরং...

—কেন, আজকের শিকারটা খুব দামী নাকি?

—হ্যাঁ, রুই-কাতলা।

—তোমার কথার কোনও দাম দিই না আমি লিউসিন।

—তার মানে?

—সেবার তুমি বললে চিয়াং ফু খুব বিরাট এক শিকার। কিন্তু কাজের বেলায় পাঁচটা হাজারও মিলল না।

—সেটা আমাদের অসাবধানতার জন্যে। বুড়োর যা টাকা আছে তাতে পাঁচ হাজার কেন পাঁচ লাখও বেশি কিছু নয়।

—তবে ছেড়ে দিলে কেন?

—দাঁড়াও, ওদিকে পুলিশের হৈ-চৈটা একটু কমে যাক। তারপর আবার চেষ্টা করা যাবে।

—তা আজকে যেতে হবে কতদূর?

—রওনা হয়েই বুঝতে পারবে কোন্ দিকে যেতে হচ্ছে।

মুখে পাউডারের প্রলেপটা হাল্কা তুলি দিয়ে মুছতে মুছতে ফ্লোরা বলে—কিন্তু সাতটার মধ্যে ফিরতে হবে মনে থাকে যেন। ওদিকে নাচের সময় হয়ে আসবে।

—সে কথা মনে আছে আমার। চল। সবে সওয়া পাঁচটা হলো দেখতে পাচ্ছি।

ঠোঁটের রক্ত-রাঙা লিপস্টিকের প্রলেপটা বুলানো হয়ে যায়। তারপর গালের হাল্কা গোলাপী রঙের আমেজ।

সবশেষে ফ্লোরা তার ভ্যানিটি ব্যাগটি হাতে নিয়ে দোলাতে দোলাতে বলে—আই অ্যাম্ অলসো রেডি...

ওদের দুজনকে বুকে নিয়ে দামী পণ্টিয়াক গাড়িটি তীব্রবেগে মহানগরীর পথ ধরে এগিয়ে চলে।

হোটেলের ম্যানেজার মিঃ আয়েঙ্গারের ঘরের সামনে একজন দোহারা চেহারার ভদ্রলোক এসে দাঁড়ান।

আয়েঙ্গার সেলাম ঠুকে প্রশ্ন করে—কাকে চাই?

—এ হোটেলে কি ফ্লোরা নামে কোনও মেয়ে...

আয়েঙ্গার মনে করে, দামী খদ্দের বোধ হয়। বিগলিত হেসে বলে—নিশ্চয়ই স্যর। তাঁর সাথে কি কোনও প্রয়োজন আছে আপনার?

—হ্যাঁ, ছিল। কিন্তু তিনি বোধ হয়...

—হ্যাঁ, বেরিয়ে গেছেন...

—তবে?

—যে কোনও দিন আসতে পারেন রাত আটটার পর। উনি 'ব্যালে'তে অংশগ্রহণ করেন।

—ধন্যবাদ! একখানা দশটাকার নোট আয়েঙ্গারের হাতে গুঁজে দেন ভদ্রলোকটি—চলি তাহলে আজকের মতো। আবার দেখা হবে।

লোকটির মুখে ফুটে ওঠে রহস্যময় হাসি।

আকস্মিক অর্থপ্রাপ্তির আনন্দে আয়েঙ্গারের মনে কিন্তু লোকটির বিষয়ে কোনও সন্দেহই জাগে না।

চার

—আর এক প্রান্ত—

আবার চায়না লজ।

এবার আর মালিক চিয়াং ফু নয়। তিন নম্বর ফ্ল্যাটে থাকেন ধনী বিদেশী ব্যবসায়ী লালা যোধমল শঙ্করপ্রসাদ। বিখ্যাত ধনী। শহরের বুকে তিন-চারটি বাড়ি। কিন্তু সবগুলো বাড়িই ভাড়া দেওয়া। মাসের শেষে মোটা টাকা ভাড়া আদায় করেন। আর নিজে সস্ত্রীক থাকেন এই চায়না লজের তিন নম্বর ফ্ল্যাটে।

লোকে জিজ্ঞাসা করলে শঙ্করপ্রসাদ বলেন—কি দরকার অত বড় বাড়িতে! তার চেয়ে এই বেশ ভাল। ছোটখাট ফ্ল্যাটে থাকলে বেশ কিছুটা স্বাচ্ছন্দ্য পাওয়া যায়। বড় বাড়ি হলে খরচও হয় বেশি।

অনেকে তাই বলে—শঙ্করপ্রসাদ লোকটা হাড়-কিপ্‌টে। ছেলে নেই, পুলে নেই—কি দরকার বাপু অত টাকা জমিয়ে?

সেদিন সন্ধ্যা ছটা।

তিন নম্বর ফ্ল্যাটে কড়াটা নড়ে উঠল।

—কে? শঙ্করপ্রসাদ দরজার ধারে এগিয়ে যান।

—মিঃ চিদাম্বরম্, স্যর। দরজাটা খুলুন।

দরজাটা খুলে শঙ্করপ্রসাদ দেখেন একজন পুরুষ আর একজন নারী। দুজনেরই বেশভূষায় বিপুল আভিজাত্যের চিহ্ন। তবে মিঃ শঙ্করপ্রসাদের দৃষ্টি বেশি আকৃষ্ট হলো নারীটির দিকেই। তার গলায় ঝুলন্ত দামী হীরা-বসানো নেকলেসটির দিকে চেয়ে তিনি ভাবতে থাকেন—ওগুলো আসল হীরে হলে তার দাম কমসে কম হাজার পঞ্চাশের কাছাকাছি হতে বাধ্য।

—নমস্কার মিঃ প্রসাদ!

—নমস্কার মিঃ চিদাম্বরম্! তারপর খবর কি আপনার?

মৃদু হাসির রেখা মুখে ফুটিয়ে তুলে মিঃ চিদাম্বরম্ ওরফে দস্যু লিউসিন বলে—খবর ভালই। সব কিছু ঠিক করে ফেলেছি। আমাদের কোম্পানীর নাম দেওয়া হবে 'চিত্ররূপা লিমিটেড'। কেমন, ভাল নয় কি?

—সত্যিই চমৎকার নাম! গ্রীবায় অপূর্ব ভঙ্গি করে ফ্লোরা বলে।

বিগলিত হেসে মিঃ প্রসাদ মিঃ চিদাম্বরমের দিকে চেয়ে বলেন—ওঁর সঙ্গে পরিচয় হলো না ত!

মিঃ চিদাম্বরম্ দ্বিধাহীন কণ্ঠে বলেন—উনিই আমাদের বইতে নায়িকার ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন।

মিঃ প্রসাদ তাঁর চোখের দৃষ্টিটাকে বারকয়েক ফ্লোরার ওপর বুলিয়ে নিয়ে বলে ওঠেন—সত্যিই, চমৎকার মানাবে। আমাদের পিক্‌চার হিট্ করতে বাধ্য। কি বলেন মিঃ চিদাম্বরম্?

মিঃ চিদাম্বরম্ সে কথায় বিন্দুমাত্র মনোযোগ না দিয়ে একটা সিগারেট ধরান। তারপর দামী সিগ্যারেটের টিনটা মিঃ প্রসাদের দিকে এগিয়ে ধরেন।

মিঃ প্রসাদ একটা সুদীর্ঘ টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলেন—তারপর স্টোরী কার নিচ্ছেন?

মিঃ চিদাম্বরম্ ধোঁয়ার রিং ছাড়তে ছাড়তে বলেন—বোম্বের বিখ্যাত ফিল্মস্টোরী-লেখক কে. এ. আব্বাস কে তার করে দিয়েছি। তাঁর দুখানা বই-ই পর পর তোলা হবে।

—ভেরী গুড্! মিঃ প্রসাদ উঠে দাঁড়ান।

ফ্লোরা মিঃ প্রসাদের বাঁ পাশের কৌচে এসে বসে পড়ে। মিঃ প্রসাদের দিকে চেয়ে মৃদু কটাক্ষ হেনে বলে—বসুন না মিঃ প্রসাদ। ওভাবে ঘুরে বেড়ালে কি কথা হয় নাকি?

মিঃ প্রসাদ এ আহ্বানকে উপেক্ষা করতে পারেন না। তিনি ফ্লোরার ঠিক পাশেই বসে পড়ে বলেন—এর আগে কোনও বইতে কি আপনি অভিনয় করেছেন নাকি?

—না। মিঃ চিদাম্বরম্ বলে ওঠেন—ফ্রেশ্ ফিগারের দামই ফিল্ম ওয়ার্লডে বেশি। বর্তমানে উনি কল্‌কাতার বিখ্যাত নর্তকীদের মধ্যে একজন। তবে ফিল্ম জগতে এই ওঁর প্রথম পদক্ষেপ। ওঁর নতুন নামকরণও করা হয়েছে। ফিল্ম জগতে ওঁর নাম হবে শ্রীমতী শকুন্তলা।

—বেশ ভাল নাম। মিঃ প্রসাদ বলেন—ঠিক ওঁর চেহারার মতোই মিষ্টি নাম দিয়েছেন আপনি মিঃ চিদাম্বরম্। সত্যি, ফিল্ম ডাইরেক্টরের কাজ আপনার মতো লোকদেরই উপযুক্ত বটে।

মিঃ চিদাম্বরম্ বিনয়পূর্ণ ভঙ্গি করে বলেন—কি যে বলেন আপনি!

মিঃ প্রসাদ কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন। বাধা দিয়ে ফ্লোরা বলে ওঠে—তারপর কাজের কথাগুলো এবার শেষ করে ফেলুন মিঃ চিদাম্বরম্। আমার ডান্স আটটায়। এক্ষুণি উঠতে হবে।

যেন আকস্মিকভাবে সম্বিৎ ফিরে পেয়েছেন এমনি একটা ভঙ্গি করে মিঃ চিদাম্বরম্ বলেন—হ্যাঁ হ্যাঁ। এবার কাজের কথাটা—মানে ওই স্টুডিওর ব্যাপারটা স্যর।

—বলুন না। গম্ভীর কণ্ঠে মিঃ প্রসাদ বলেন।

—স্টুডিওর ফ্লোর ভাড়া করতে হবে। অভিনেতা-অভিনেত্রীদের বুক করতে হলে কিছু আগাম দিতে হবে। তারপর ধরুন গিয়ে মিউজিক ডাইরেক্টর, আর্ট ডাইরেক্টর, 'র' ফিল্ম কিছু কেনা...

বাধা দিয়ে মিঃ প্রসাদ বলেন—আপনার লিস্ট এখন থামান মিঃ চিদাম্বরম্। বলি, সবশুদ্ধ কত হলে চলবে?

—বেশি নয় স্যর, বেশি নয়। হাজার দশেক হলেই সব ম্যানেজ করে ফেলতে পারব।

—বেশ বেশ। তাই নিন।

মিঃ প্রসাদ ড্রয়ার থেকে চেকবই বের করে একখানা দশ হাজার টাকার চেক লিখে তুলে দিলেন মিঃ চিদাম্বরমের হাতে।

মিঃ চিদাম্বরম্ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—চলি স্যার আজকের মতো।

বেরিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ পিছনে ফিরে ডান হাতটা তুলে একটা বিচিত্র ভঙ্গি করে মৃদু হাসিমুখে ফ্লোরা বলল—টা টা...

মিঃ প্রসাদের একাগ্র দৃষ্টি ফ্লোরার দিকে আবদ্ধ হয়। তাঁর দৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে সারা মনটাও বোধ হয় জয় করে ফেলে ফ্লোরা।

কিন্তু মিঃ প্রসাদ বোধ হয় তখন ধারণাও করতে পারেননি যে, উজ্জ্বল সিল্কের শাড়ি পরা, রঙের আবরণে মোড়া. দামী হীরের নেকলেস গলায় এই মেয়েটা জীবনে আর কোনও দিনই চায়না লজের বুকে পা ফেলবে না!

পাঁচ

—অগ্রসর—

হোটেল রিগ্যালে ডুয়েট ডান্স চলছিল।

দর্শকবৃন্দের উচ্ছ্বাস। আলোর প্রাচুর্য। আনন্দের বিচিত্র সব বহিঃপ্রকাশ। আর তার সাথে সফেন সুরার উদ্বেল প্রবাহ।

হঠাৎ পাঁচ নম্বর বক্সে শোনা গেল একটা আর্ত চীৎকার। মুমূর্ষুর অন্তিম ক্রন্দন যেন! মৃত্যুপথযাত্রীর শেষ দীর্ঘশ্বাস বুঝি কোন্ এক হতভাগ্যের জীবনদীপ নির্বাণের সংকেত ঘোষণা করল!

দর্শকরা একসঙ্গে চীৎকার করে উঠল।

দপ করে জ্বলে উঠল সব আলো একসঙ্গে। হোটেলের সারা বুক জুড়ে হৈচৈ আরম্ভ হলো।

একটু পরেই সকলেই মুখে মুখে ফিরতে লাগল একটি খবর—পাঁচ নম্বর বক্সে একজন লোক নিহত হয়েছে। বুকের পাঁজরে একটি বৃহৎ ছোরা আমূল বিদ্ধ। আততায়ীর কোনও সংবাদ পাওয়া যায়নি।

ম্যানেজার ফোন তুলল—হ্যালো পুলিশ স্টেশন...

ওধারে হোটেল রিগ্যালের দোতলার কক্ষে ফ্লোরার হাতে একটা ব্যাগ গুঁজে দিতে দিতে মিঃ চিদাম্বরম্ ওরফে দস্যু লিউসিন বলল—এটা ভাল করে রেখে দাও। সেই গুপ্ত ফোকরে। আমাকে এক্ষুণি এখান থেকে পালাতে হবে।

ফ্লোরা অবাক হয়ে প্রশ্ন করে—কেন?

—হোটেলে এক্ষুণি পুলিশ আসবে।

--পুলিশ?

—হ্যাঁ, পাঁচ নম্বর বক্সে একজন লোক খুন হয়েছে।

—কে খুন করল তাকে?

—সেটা জেনে তোমার লাভ নেই। ওর মধ্যে যা আছে তার দাম হাজার পঞ্চাশের কম নয়। আচ্ছা চলি আজ রাতের মতো। পেছনের ঘোরানো সিঁড়িটা দিয়ে নেমে যাব।

দস্যু লিউসিনের দেহটা অদৃশ্য হয়ে যায় রাতের আঁধার-ঘেরা নিঃসীম কালো যবনিকার আড়ালে।

ফ্লোরার কানে ভেসে আসে অপসৃয়মান মোটরের ইঞ্জিনের ক্ষীণ গর্জনের শব্দ।

খবরটা যেন ওয়েলেসলী পুলিশ স্টেশনকে চঞ্চল করে তুলল। হোটেল রিগ্যালের বুকে খুনের খবরটা পেয়েই ও.সি. মিঃ তরফদার ছুটলেন ঘটনাস্থলের দিকে।

সবকিছু গতানুগতিক তদন্ত আর জেরা শেষ হলো। মিঃ তরফদার এমন কোনও সূত্রই আবিষ্কার করতে পারলেন না যা থেকে বোঝা যায় ওই হত্যারহস্যের মূল নায়ক কে?

সামান্য যেটুকু তিনি জানতে পারলেন তা হচ্ছে এই যে নিহত ব্যক্তির বাড়ি কড়েয়া অঞ্চলে। সেখানে কতকগুলি ছোটখাট ব্যবসায়ের সঙ্গে সে জড়িত ছিল। তা ছাড়া কল্‌কাতার বুকে তার একটি চালু কারখানা ও ছোট একটা মনোহারী দোকানও আছে।

বিরাট অন্ধকারের বুকে এ যেন সামান্যতম আলোকরেখাও নয়। এইটুকু অবলম্বন করে এগুনো চলে, কিন্তু তাতে সফলতার আশা বিশেষ কিছুই থাকে না।

মিঃ তরফদার যখন হতাশ হয়ে ফিরে যাচ্ছেন, এমন সময় একজন কনস্টেবল এসে তাঁকে স্যালুট্ করে বলল—স্যর ওই লোকটার পায়ের জুতোর মধ্যে এই কাগজটা পাওয়া গিয়েছে।

—সেকি?

—হ্যাঁ। এই দেখুন। জুতোর মধ্যে লুকানো ছিল।

মিঃ তরফদার ভাঁজ খুলে কাগজটা পড়তে লাগলেন।

ছোট ছোট অক্ষরে কাগজের বুকে লেখা ঃ

চায়না লজ
২০শে অক্টোবর

প্রিয় মিঃ থিবো,

তোমাকে যা বলা হয়েছে, সেই অনুসারে যাতে কাজ হয় তাই আমি চাই। মিথ্যা গোলমাল করে জিনিসটাকে ঘোরালো করে তুলো না।

ওধারের ব্যবস্থা শেষ করে তুমি রাতে আমার সঙ্গে দেখা কোরো। মালের জন্যে তোমার যা প্রাপ্য তা তুমি পাবে। আমার কথার কখনও নড়চড় হয় না। তোমার কথার ওপরেও বোধ হয় আমি বিশ্বাস করতে পারি।

আজকেই আসছো জেনে সবকিছু তৈরি রাখলাম। শুভেচ্ছা জেনো। ইতি—

ভবদীয়
চিয়াং ফু।

চায়না লজ আর চিয়াং ফু।

আশ্চর্য যোগাযোগ!

মিঃ তরফদারের মাথার মধ্য দিয়ে যেন তড়িৎ শিখার কাঁপন বয়ে গেল। দিন কয়েক আগে চায়না লজের বুকে অনুষ্ঠিত ঘটনাগুলি তাঁর মনের পরদার ওপর দিয়ে পর পর ঝিলিক দিয়ে গেল একে একে।

এক্ষুণি এণ্টালি থানার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা উচিত। তিনি টেলিফোন তুলে এণ্টালি থানার ও.সি. মিঃ হালদারের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করলেন।

—হ্যালো, আপনিই মিঃ হালদার?

—হ্যাঁ।

—আমি ওয়েলেস্‌লী পুলিশ স্টেশন থেকে বলছি। আমি তরফদার...

—ও, নমস্কার! কি ব্যাপার মিঃ তরফদার? এত জরুরী যে!

—হ্যাঁ, চায়না লজ সংক্রান্ত কেসটা ত আপনার হাতেই আছে। সে সম্পর্কেই...

—কোনও নতুন ক্লু নাকি?

—হ্যাঁ, তার সঙ্গে জড়িত একটা মার্ডার কেস ঘটেছে আমারই এলাকায়। শুনুন...

তারপর যে সব কথাবার্তা তিনি সুরু করলেন তা সাধারণের শোনবার মতো নয়। পুলিশ কোডের ভাষায় চলল তাঁদের আলাপ।

ছয়

—অনুরোধ—

রহস্যপূর্ণ যে সব ঘটনার কিনারা করা পুলিশ বিভাগের পক্ষে অসম্ভব বলে মনে হয়, তাতে হাত দেওয়া ডিটেকটিভ দীপক চ্যাটার্জীর চিরদিনের অভ্যাস। এতে সে শুধু আনন্দই পায় না, কেমন যেন একটা নেশাও আছে এসব ব্যাপারের মধ্যে। এসব ঘটনার সঙ্গে যেন তার আত্মার অবিচ্ছিন্ন যোগাযোগ।

তাই সেদিন বিকেলে লালবাজার থানা থেকে দীর্ঘদিন বাদে যখন আহ্বান এলো তখন সে নবনিযুক্ত ডেপুটি কমিশনার মিঃ মুখার্জীর সঙ্গে দেখা না করে পারল না।

সাধারণ ভদ্রতাসূচক বাক্যবিনিময় শেষ হলো। অবশেষে মিঃ মুখার্জী বললেন—একটা জরুরী প্রয়োজনেই আপনাকে ডেকে আনতে বাধ্য হয়েছি মিঃ চ্যাটার্জী।

—বলুন।

—ব্যাপারটা হচ্ছে চায়না লজ সংক্রান্ত। কিছুদিন আগে ওখানে একটা মারাত্মক ধরণের ষড়যন্ত্রমূলক কার্যকলাপ সংঘটিত হয়েছিল—এ কথাটা বোধ হয় মনে আছে আপনার?

—হ্যাঁ, খবরের কাগজে দেখেছিলাম বটে।

—গতকার রিগ্যাল হোটেলে একটা ডান্সের সময়ও অদ্ভুত একটা হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়েছে। আর রিগ্যাল হোটেলের ওই হত্যার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে চায়না লজের ঘটনাটির।

—কি করে বুঝলেন?

—আচ্ছা শুনুন।

মিঃ মুখার্জী দীপককে ঘটনাগুলি বিস্তাতিরভাবে বলতে সুর করলেন একে একে।

আমরা ততক্ষণে ঘটনার সূত্র ধরে আর একটা দৃশ্যের যবনিকা উত্তোলন করি।

রায় বাহাদুর অসীম ব্যানার্জীকে চেনে না কল্‌কাতা শহরে এমন লোক যারা আছে, তাদের সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য।

শিক্ষিত সমাজের প্রতিটি লোকের মুখে মুখে ফেরে তাঁর নাম। তবু তাঁর নাম বললে ভুল হবে—তাঁর পরিবারের প্রত্যেকটি লোকের নাম।

তাঁর মেয়ে রীটা ব্যানার্জী ইণ্টারমিডিয়েটে গোল্ড মেডেল পেয়েছে। কাগজে কাগজে তার ছবি ছেপে বের হয়েছিল। একশ্রেণীর যুবকদের কল্পলোকের আদর্শ একটি নারী।

অসামান্যা সুন্দরী ও শিক্ষিতা এই মেয়ের জন্যে রায় বাহাদুর অসীম ব্যানার্জী আর তাঁর স্ত্রীর গর্বের অন্ত ছিল না। রায় বাহাদুর কথায় কথায় বলতেন—মেয়ে যদি সুশিক্ষিতা হয়ে পরিবারের মুখ উজ্জ্বল না করল, তবে তেমন মেয়ের নাম কারও মুখে আনা উচিত নয়।

কিন্তু মেয়ের গর্ব নিয়ে অসীম ব্যানার্জী বেশিদিন বেঁচে রইলেন না। হঠাৎ হার্টফেল করে একদিন তাঁর মৃত্যু হলো আকস্মিকভাবে। আর তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সারা পরিবারের বুকের উপর দিয়ে যেন বিরাট একটা ঝড় বয়ে গেল।

মানুষ কথায় বলে, দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা কেউ বোঝে না। কথাটি যে কত বড় সত্যি তা এক্ষেত্রে বেশ ভাল করে বোঝা গেল।

পরিবারের হিতৈষী যে সব যুবক মিঃ ব্যানার্জী বেঁচে থাকতে তাঁর বাড়িতে ঘন ঘন যাতায়াত করত, তাদের আর টিকিরও সন্ধান পাওয়া যায় না।

পাছে আবার এই পরিবারের সঙ্গে জড়িত থাকলে কারণে-অকারণে কোনও সাহায্য চেয়ে বসে এই ভয়ে আর কেউ ও-বাড়িতে পা দেয় না।

কিন্তু শুধু একটা জিনিসের ওপরে ভরসা রেখে মিঃ ব্যানার্জীর মেয়ে রীটা আর তার মা খানিকটা আশ্বস্ত ছিলেন।

মৃত্যুর বছর দশেক আগে মিঃ ব্যানার্জী একটা লাইফ্ ইন্সিওর করিয়েছিলেন। টাকার অঙ্কটা হাজার বিশেক হবে। এই বিশ হাজার টাকাটা এবার পাওয়া যাবে নিশ্চয়ই। আর তা হলেই আসন্ন সংকটের হাত থেকে এই পরিবার রক্ষা পাবে।

এই খবরটি কিন্তু কেউ বড় একটা জানত না। কেবল জানত একজন লোক। সে হচ্ছে ফিল্ম ডাইরেক্টর মিঃ চিদাম্বরম্।

মিঃ চিদাম্বরমের এ বাড়িতে যাতায়াত আজ প্রায় পাঁচ-ছ' মাস থেকে। তিনি একজন উদ্যোগী ও ফুর্তিবাজ লোক। তা ছাড়া রীটার গানবাজনা ও নাচের ওপর ভয়ানক ঝোঁক আছে—এ খবর তিনি রাখতেন।

তিনিই রীটাকে প্রথমে ফিল্মে নামতে উপদেশ দেন। কিন্তু সম্প্রতি সেই উপদেশটা আরও সুন্দরভাবে কার্যকরী হতে চলেছে। রীটার তখন টাকার খুবই দরকার। কাজেই এখন যদি মিঃ চিদাম্বরমের সাহায্যে ফিল্মে নামা যায় এই আশায় রীটা তাঁর সঙ্গে খুব বেশী মেলামেশা সুরু করেছে।

মেলামেশাটা প্রায় বন্ধুত্বের পর্যায়েই গিয়ে পড়েছিল। প্রথমটা মিসেস্ ব্যানার্জী এতে আপত্তি জানিয়েছিলেন, কিন্তু এখন মেয়ের ভবিষ্যৎ উন্নতির সুযোগ দেখে তিনি আর কোন বাধাই দেন না।

তাই মিঃ চিদাম্বরমের সঙ্গে এই পরিবারের যোগাযোগটা বেশ ঘনিষ্ঠই হয়ে উঠেছে।

সেদিন মিঃ চিদাম্বরম্ কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করলেন—এবার একটা কিছু করতে হয়, কি বলেন মিস্ রীটা?

—হ্যাঁ, তা ত বটেই।

—দু-একদিনের মধ্যেই আমাদের স্যুটিং বোধ হয় আরম্ভ হবে। আপনার নিশ্চয়ই বর্তমানে টাকার খবু প্রয়োজন...

—না, এখন অবশ্য ততটা নয়...

—কেন? আপনার বাবার অন্তিম কার্যাদি...

—সে জন্যে চিন্তা নেই মিঃ চিদাম্বরম্।

—তাই নাকি? তিনি ব্যাঙ্কে কোনও অর্থ গচ্ছিত রেখে গিয়েছিলেন নাকি?

—না।

—তবে?

—তাঁর হাজার বিশেক টাকার লাইফ্ ইনসিওর‍্যান্স ছিল। সেই পলিসির টাকাটা বর্তমানে...

—ও, বুঝেছি।

মিঃ চিদাম্বরম্ যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। বললেন—যাক, আপাতত তাহলে আপনাদের সে রকম বিপদ কিছু নেই। এর মধ্যে যদি কোনও কাজ পান তাহলেই একরকম চলবে। কি বলেন?

—হ্যাঁ। রীটা মৃদু হেসে উত্তর দেয়।

—তাহলে এতদিন টাকাটা তোলার ব্যবস্থা করেননি কেন?

—তেমন সুযোগ হচ্ছে না, তাই...

—কোন্ কোম্পানীতে আপনার বাবার ইন্সিওর ছিল?

—সাদার্ন ইণ্ডিয়া লাইফ্ ইন্সিওর‍্যান্স কোম্পানী।

—ও হো, তার হেড্ অফিস ত চৌরঙ্গী টেরেসে।

—চেনেন নাকি?

—চিনি মানে? তার ম্যানেজিং ডাইরেক্টর আমার ইন্‌টিমেট্ ফ্রেণ্ড।

—তাই নাকি? তবে ত খুব সুবিধেই হলো...

—নিশ্চয়ই! কই পলিসিটা একবার দেখান ত।

রীটা উঠে দ্রুত পাশের ঘরে যায়। চপলা বনহরিণীর গতিভঙ্গী যেন ফুটে ওঠে তার সে চলায়।

কয়েক মিনিট পরে দ্রুতপদে ফিরে এসে বলে—এই যে পলিসিটা—

—দেখি।

ভাল করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে মিঃ চিদাম্বরম্ বলেন—এর টাকা সাধারণ ভাবে পেতে গেলে ছ' মাস লাগবে। তবে আমি চেষ্টা করলে বোধ হয় মাসখানেকের মধ্যেই ব্যবস্থা করতে পারব।

—তাই নাকি? এই সামান্য কাজটুকু যদি দয়া করে...

—না না। এর মধ্যে দয়ার কি আছে! এটা আমার ডিউটি। পলিসিটা দিন। সব ব্যবস্থা ঠিক করে মাসখানেক বাদে আমি আপনাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাব কোম্পানীর অফিসে। আপনি সই করে দিলেই টাকাটা...

—আপনাকে যে কি বলে ধন্যবাদ জানাব মিঃ চিদাম্বরম্ তা আমার জানা নেই। রীটার কণ্ঠ আবেগপূর্ণ।

পরদিন বেলা দশটা।

সাদার্ন ইণ্ডিয়া লাইফ্ ইন্সিওর‍্যান্স কোম্পানীর অফিসে প্রবেশ করল দুজন লোক। একজন পুরুষ, অন্যজন নারী।

পুরুষের পরনে স্যুট। আভিজাত্যের আলোয় সারা দেহ ঝলমল করছে।

মেয়েটির পরনে সিল্কের শাড়ি আর লাল টক্‌টকে সিল্কের ব্লাউজ। সারা দেহে যেন আগুনের নেশা মাখানো।

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর মিঃ জোন্সের ঘরে সোজা প্রবেশ করল দুজন।

মিঃ জোন্সের মুখ আলোকোজ্জ্বল হয়ে উঠল ওদের দিকে চেয়ে।

—কি চাই আপনাদের?

—জরুরী একটা বিষয় নিয়ে কথা বলতে চাই স্যর।

—বেশ বলুন।

—আপনি বোধহয় সংবাদপত্রে পড়েছেন যে রায় বাহাদুর অসীম ব্যানার্জীর সম্প্রতি মৃত্যু ঘটেছে।

—হ্যাঁ, কথাটা মনে আছে আমার।

—সেই সূত্রেই কথা বলতে এসেছি আমরা। আপনাদের কোম্পানীতে ওঁর একটা পলিসি ছিল।

—হ্যাঁ, বিশ হাজার টাকার।

—ধন্যবাদ। ইনিই হচ্ছেন মিঃ ব্যানার্জীর মেয়ে রীটা ব্যানার্জী।

—ও, তাই নাকি? নমস্কার! পরিচিত হয়ে বিশেষ আনন্দিত হলুম মিস্ ব্যানার্জী।

—বিশেষ কারণেই আজ ওঁকে আপনার কাছে ছুটে আসতে হয়েছে মিঃ জোন্স।

—বুঝেছি। ওই টাকাটার এখন খুবই প্রয়োজন আপনাদের, তাই না?

—হ্যাঁ।

—পলিসিটা দেখি।

রীটার ছদ্মবেশধারিণী ফ্লোরা একটা পলিসি এগিয়ে দিল মিঃ জোন্সের দিকে। তার দুটি লাবণ্যপূর্ণ চোখে যেন বিশ্বের আকুতি। মিঃ জোন্সের তরুণ হৃদয়ে গিয়ে বিদ্ধ হলো সে দৃষ্টির অসহনীয়তা।

মুখ তুলে তিনি বললেন—মাসখানেকের আগে টাকাটা পাওয়া সম্ভব নয়। তবে আমি এটা একটা স্পেশ্যাল কেস হিসেবে ধরছি। পরশুর মধ্যে যাতে আপনারা টাকাটা পান সে জন্যে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব মিস্ ব্যানার্জী।

—কি বলে যে আপনাকে ধন্যবাদ জানাব সে ভাষা আমার জানা নেই মিঃ জোন্স...

সাত

—আড্ডাখানা—

কলকাতা থেকে কুড়ি মাইল।

সুন্দরবনের প্রান্তসীমা।

বড় বড় শাল, মহুয়ার জঙ্গল না হলেও ছোট ছোট অজস্র গাছের জটলা জঙ্গলকে নিবিড় করে তুলেছে।

বেলা তখন দশটা।

দুজন লোককে জঙ্গলের ধার দিয়ে এগিয়ে চলতে দেখা গেল। তাদের গতিবিধি কেমন

যেন সন্দেহজনক। নিঃশঙ্ক মনে না চলে তারা চারদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভয়ে ভয়ে এগোচ্ছে।

কিছুদূর গিয়ে জঙ্গলের একাংশে বড় ঝোপের আড়ালে একটা বিরাট গুদামের মতো ঘর।

লোক দুটি সেখানে গিয়ে চারদিকে চেয়ে কিছুক্ষণ কিছু যেন ভাবল।

একজন বলল—কানেক্‌শনটা ফিট্ করবো নাকি স্যর?

অন্যজন উত্তর দিল—না, এখন থাক। পরে বরং চিন্তা করা যাবে।

—কিন্তু ওদিকে কি হচ্ছে সে খবর...

—একটু দেরী হলেও এমন কিছু ক্ষতি হবে না। যদি কোনও জরুরী খবর থাকে তাহলে ওরাই তদারক করবার জন্যে লোক পাঠাবে।

—তাহলে প্লেন দুটো এখন পরিষ্কার করে রাখি।

—হ্যাঁ, তা বরং করতে পার। যদি এর মধ্যে কোনও খবর আসে সেইমতো ব্যবস্থা করা যাবে।

দুজনে এগিয়ে গুদোম ঘরটার মধ্যে প্রবেশ করল।

এমন সময় দপ্ দপ্ করে দুটো লাল আলো জ্বলে উঠল পর পর তিনবার।

একজন বলল—সংকেত এসেছে স্যর।

অন্যজন ঘাড় নেড়ে এগিয়ে গেল। তারপর কতকগুলো তার ফিট্ করে একটা রিসিভার তুলে নিয়ে বলল—ইয়েস্ স্যর। রেডি!

এই ধরনের অদ্ভুত বৈজ্ঞানিক যোগাযোগ করবার ক্ষমতা দেখে মনে হয়, এরা নিশ্চয়ই দীর্ঘদিন এ কাজে অভ্যস্ত। আর বাস্তবিক পক্ষেও তাই। বহুদিন যুদ্ধক্ষেত্রের সংলগ্ন অঞ্চলে এরা এই সব কাজ করেছে।

ওধার থেকে উত্তর ভেসে এলো—তোমাদের সাবধান করে দিচ্ছি চ্যাং। আমাদের ওপর পুলিশের নজর পড়েছে। এইমাত্র খবর পেলাম ডিটেকটিভ দীপক চ্যাটার্জীকে আমাদের বিরুদ্ধে নিযুক্ত করা হয়েছে। তোমরা এরোড্রোম ওখান থেকে তিন মাইল দক্ষিণে সরিয়ে ফেলবে।

—আচ্ছা স্যর।

—আর খুব সাবধানে থাকবে। কেউ যেন টের না পায়। কারও সঙ্গে বেশি মেলামেশা করবে না। আর সব সময় তৈরি থাকবে।

—ঠিক আছে স্যর।

কথার শেষে সে যোগাযোগটা ছিন্ন করে উঠে দাঁড়াল। তারপর তার সঙ্গীকে বলল—তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নাও। আমাদের এরোড্রোম এক্ষুণি তিন মাইল দক্ষিণে স্থানান্তরিত করা হবে।

—কেন স্যর?

—উপরের হুকুম।

—পুলিশ লেগেছে নাকি?

—তাই ত মনে হয়।

—কিন্তু শেষে আমরা শুদ্ধ না জড়িয়ে পড়ি!

—তা হতে পারে। বড়র সঙ্গে চুনোপুঁটিও মারা পড়ে সব সময়। এ আর এমন কিছু বিচিত্র কথা নয়।

—আর কোনও হুকুম আছে নাকি?

—হ্যাঁ, সব সময় তৈরি থাকতে বলেছে।

—কেন?

—বোধ হয় কোনও নতুন শিকার জালে পড়েছে।

—হা বুদ্ধ, অন্ধকারের মধ্যে ঘুরে ঘুরে দেখছি মাথাটাই খারাপ হয়ে যাবে!

আট

—বিচিত্র যোগাযোগ—

চায়না লজের মালিক চিয়াং ফুর গোপন কক্ষে এবার নিয়ে যাচ্ছি আপনাকে।

রাত তখন দুটো।

পৃথিবীর বুকে জেগে-থাকা একটা মানুষেরও স্পন্দন মেলে না কোথাও। চোখে পড়ে না কোনও আলোর সামান্যতম রেখাও।

ঠিক সেই সময় চায়না লজের তিনতলার কক্ষে দেখা গেল একজন লোককে।

ক্রিং ক্রিং করে বেজে উঠল টেলিফোন।

লোকটি রিসিভারটা তুলে নিয়ে প্রশ্ন করল—হ্যালো, কে?

—আমি চ্যাং, কর্তা।

—কি খবর?

—সব ঠিকমতো হয়েছে।

—কোথায় রেখেছ হেলিকপ্টার আর জেট্‌প্লেনটাকে?

—তিন মাইল দক্ষিণে।

—তৈরি থেকো ঠিকমতো। পরশু রাত একটায় আবার উড়তে হবে আকাশে।

—আচ্ছা স্যার। আর কোনও খবর?

—আপাতত কিছু নেই। পরে শোনাব। তবে খবরটা খুব জরুরী মনে রেখো।

—আচ্ছা। আপনার আদেশমতোই কাজ হবে।

সংযোগ কেটে যায়।

তিন মিনিট পরে।

আবার সশব্দে টেলিফোনটা বেজে ওঠে।

—হ্যালো, কে?

—ফ্লোরা।

—কি খবর?

—এ দিকের খবর সব ভাল। তুমি কতদূর এগোলে?

—আমি এধারে ঠিকমতোই কাজ করেছি।

—সব ব্যবস্থা রেডি ত?

—হ্যাঁ।

—লোকটাকে আটকেছ?

—হ্যাঁ, তাকে সেই কুঠরীটাতেই রাখা হয়েছে।

—ভেরী গুড্। আজ তাহলে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করছি। কাল আমার এখানে আসবে রাত নটার পরে।

—ঠিক আছে। তোমার কালকের প্রোগ্রাম ক্যান্‌সেল করে দিও ফ্লোরা।

—আচ্ছা, চেষ্টা করব।

—চেষ্টা নয়। এটা করতেই হবে। পরশুর মধ্যেই সব শেষ করতে চাই।

—কেন?

—পরশুর মধ্যে আমরা চলে যাব বেঙ্গল ছেড়ে।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ, পুলিশের কড়া নজর পড়েছে চায়না লজের ওপর।

—তা ত জানি। সন্দেহ করেনি ত?

—না।

—আমি কিন্তু নিঃসন্দেহ নই এখনও।

—কেন?

—সে কথা তোমাকে পরে বলব। হোটেল রিগ্যালের ওপর ওদের কড়া নজর আছে দেখতে পাচ্ছি।

—সেটা আমিও জানি ফ্লোরা। সেইজন্যেই চাই যতো সত্বর হোক সব কিছু শেষ করে

সেদিনই রাত তিনটে।

এণ্টালি থানার ও.সি. মিঃ হালদারের ঘরে টেলিফোনটা ঘন ঘন বেজে উঠল। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেল মিঃ হালদারের।

—কে?

—ডিটেকটিভ দীপক চ্যাটার্জী স্পীকিং...

ডিটেকটিভ দীপক চ্যাটার্জীকে মিঃ হালদার ভাল করেই জানতেন। লোকটা যে কর্মক্ষম ও বিশ্বাসী একথা তিনি এর আগে বহুবার টের পেয়েছেন।

—কি খবর আপনার?

—জরুরী ব্যাপার স্যর। মিঃ চিদাম্বরম্ এই নাম নিয়ে দস্যু লিউসিন পর পর কল্‌কাতার বুকে দুজনকে মারাত্মকভাবে চীট্ করেছে স্যর।

—কে সেই দুজন লোক?

—একজন হচ্ছেন বিখ্যাত বিজ্‌নেসম্যান মিঃ শঙ্করপ্রসাদ। চায়না লজের একটি ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে তিনি থাকেন। মিঃ চিদাম্বরম্ বিখ্যাত ফিল্ম ডাইরেক্টর এই পরিচয় দিয়ে দস্যু লিউদিন আর তার সহকর্মী ফ্লোরা তাঁর কাছ থেকে দশ হাজার টাকা চীট্ করেছে!

—আপনার খবরটা আমাকে খুবই সাহায্য করবে মিঃ চ্যাটার্জী। আর অন্য খবরটা?

—সেটা ঘটেছে সম্প্রতি।

—কোথায়?

—মিস রীটা ব্যানার্জীর বাবা রায় বাহাদুর অসীম ব্যানার্জীর লাইফ্ ইন্‌সিওর‍্যান্স ছিল বিশ হাজার টাকার। সেই টাকাটা নিয়ে উধাও হয়েছে দস্যু লিউসিন আর তার সহকর্মী ফ্লোরা।

— কিন্তু কি করে তা ঘটল?

—মিঃ চিদাম্বরমের ছদ্মবেশে দস্যু লিউসিন মিঃ ব্যানার্জীর বাড়িতে যাতায়াত করত। সেখান থেকেই কৌশলে সে পলিসিটা হাত করেছে। তারপর ফ্লোরাকে সে রীটার পরিচয়ে সাদার্ন ইণ্ডিয়া লাইফ্ ইন্‌সিওর‍্যান্স কোম্পানীতে নিয়ে যায়। আজকেই সে টাকাটা হাত করেছে। এইমাত্র আমরা সেই সংবাদটা পেলাম।

—কিন্তু এখন কি করা যায় মিঃ চ্যাটার্জী?

—আপনি কি হোটেল রিগ্যাল আর চায়না লজ এই দুটো জায়গা সার্চের ওয়ারেণ্ট কোনওমতেই বের করতে পারেন না?

—হোটেল রিগ্যাল হয়ত পারি। কিন্তু চায়না লজ সার্চের ওয়ারেণ্ট ত সহজে 'ইসু' করা যাবে না।

—তা আমি জানি মিঃ হালদার। তবুও ঘটনাগুলো আপনাকে জানিয়ে রাখলাম। আরও ভাল প্রমাণ সংগ্রহের চেষ্টা করব আমি।

মিঃ হালদার রিসিভারটা নামিয়ে রাখেন। তাঁর সারা মুখে ফুটে ওঠে বিস্ময়ের রেখা।

নয়

—বোবা ভিখারী—

কড়েয়া স্ট্রীটের ফুটপাথের ওপর সেদিন বিকেলের দিকে দেখা গেল, একজন বোবা ভিখারীকে।

চায়না লজের উল্‌টো দিকের ফুটপাথের ওপর বিকেলের দিকে বসে লোকটা বিচিত্র ভঙ্গিতে চীৎকার করছে।

চীৎকার শুনেই বোঝা যায় লোকটা বোবা। তার মুখ থেকে কোনও কথাই স্পষ্ট করে ফুটে বের হচ্ছে না। তাই তার চীৎকারটা অর্থহীন।

কিন্তু অর্থহীন হলেও পথচারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিল সে।

মাঝে মাঝেই পথ-চল্‌তি দু-একজন লোক দু-একটা পয়সা বা আনি-দুয়ানি তার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে চলে যাচ্ছে। কেউ বা মুখ বেঁকিয়ে বলে উঠছে—ন্যাস্‌টি!

লোকটির দৃষ্টি কিন্তু তাদের কারও দিকেই নিবদ্ধ নেই। সে আড়চোখে মাঝে মাঝে তাকাচ্ছে চায়না লজের বিশেষ একটি ঘরের দিকে।

ঘরের মধ্যে কি ঘটছে তা জানবার জন্যেই যে সে উদ্‌গ্রীব এটা সহজেই বোঝা যায়।

এমনি করেই সময় কেটে চলে।

সাতটা...আটটা...নটা...

পথ জনহীন হয়ে পড়ে। কুয়াশার সাদা আবরণ ধীরে ধীরে পৃথিবীকে গ্রাস করতে থাকে।

ঢং ঢং।

রাত দশটা।

বোবা ভিখারী উঠে দাঁড়িয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে যায়।

চারধারে একবার ভাল করে চেয়ে দেখে—কেউ তাকে লক্ষ্য করছে কিনা।

সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ হয় সে। কেউ তাকে সামান্যতম ভাবেও লক্ষ্য করছে না।

উঠে দাঁড়িয়ে পথের ওপরে বারকয়েক পায়চারী করল সে। তারপর ধীরে ধীরে চায়না লজের পেছন দিকের পথে এসে দাঁড়াল।

পথ জনহীন।

বহুদূরে দাঁড়িয়ে একজন বীটের কনস্টেবল এতক্ষণ পাহারা দিচ্ছিল, সে এবার অন্যদিকে চলে গেছে।

নিশ্চিন্ত হয়ে সে বাড়ির পেছন দিকের জলের পাইপটা ধরে ওপরে ওঠবার চেষ্টা করল।

এ কাজে সে যে বেশ অভ্যস্ত তা তার ভাবভঙ্গি দেখলেই বোঝা যায়।

টিকটিকির মত সোজা সে পাইপ ধরে উঠে চলল সাবলীলভাবে। নিঃশব্দে।

পাইপের শেষ প্রান্তে দোতলার কার্নিশ। তার পাশেই একটা জানালা।

জানালার গরাদেটা ধরে ফেলে ঘরের মধ্যে উঁকি মারল সে। কিন্তু বিশেষ কোনও কিছুই তার নজরে পড়ল না।

ঘর সম্পূর্ণ অন্ধকারে আচ্ছন্ন। কোনও জীবন্ত মানুষের সামান্য সাড়াশব্দও পাওয়া যায় না কোথাও।

একটু চিন্তা করে লোকটা ছাদের কার্নিশ ধরে এগিয়ে চলল। সামান্য একটু পা ফস্‌কে গেলেই যে নীচে পড়ে গিয়ে মারাত্মকভাবে আহত হতে হবে এ কথাটা তার অজানা নয়। কিন্তু তবু নিঃশঙ্কভাবে সে এগিয়ে চলল। কার্নিশের শেষ প্রান্তে ছাদ। ছাদের রেলিং টপকে সে সোজা ছাদের ওপর গিয়ে দাঁড়াল।

ছাদে কোনও লোকজনকে না দেখে সে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘরখানার দিকে এগিয়ে গেল।

কিন্তু ঘরের মধ্যে কোনও লোককে দেখতে না পেয়ে সে একটু যেন বিস্মিত হলো।

একটা টর্চ বের করে সে ঘরের কোণে রাখা একটা বড় লোহার সেফের ওপরে আলো ফেলল।

সেফ্‌টার সামনেই বিরাট একটা তালা ঝোলানো।

ভাল করে তালাটা পরীক্ষা করে লোকটা পকেট থেকে একটা সবখোল চাবি (মাস্টার-কী) বের করল। তারপর সেটা তালার ভেতরে ঢুকিয়ে ঘোরাতেই তালাটা খুলে গেল।

সেফ্‌টা খুলে সবে লোকটা কতকগুলি জিনিস নিয়ে নাড়াচাড়া করছে এমন সময় পেছন থেকে কে যেন বলে উঠল—আর বেশি জারিজুরি করবার চেষ্টা করবেন না টিকটিকি মশাই। তাহলে জীবনটাকে এখানেই রেখে যেতে হবে।

লোকটা পেছনের দিকে ফিরে তাকায়।

তার পেছনে উদ্যত রিভলবার হাতে দাঁড়িয়ে একটি নারীমূর্তি। হাতের রিভলবারটি যেন যে কোনও মুহূর্তে গুলিবর্ষণ করবার জন্যে উন্মুখ।

লোকটির মুখ দিয়ে সামান্যতম শব্দও বের হয় না। সে নিঃশব্দে হাত দুটো মাথার ওপর তুলে সোজা উঠে দাঁড়ায়।

মেয়েটির মুখে ফুটে ওঠে সাফল্যের হাসি।

হঠাৎ লোকটি আকস্মিকভাবে তাকায় দরজার দিকে। যেন কোনও একজন লোককে আসতে দেখেই সে সেদিকে তাকাচ্ছে।

মেয়েটিও মুখ ফেরায় কে এলো তা দেখবার জন্যে।

লোকটি ঠিক এই সুযোগের জন্যেই অপেক্ষা করছিল।

পকেট থেকে কি একটা জিনিস বের করে সে মেঝের ওপর ছুঁড়ে দেয়।

বুম্!

প্রচণ্ড শব্দ।

মুহূর্তের মধ্যে সারা ঘর অজস্র ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে যায়। লোকটি সেই সুযোগে এক লাফে ঘর ছেড়ে ছাদের ওপর লাফিয়ে পড়ে।

সেখান থেকে সে তীব্রবেগে রেলিং টপকে লাফিয়ে পড়ে একতলায়।

সারা চায়না লজ জুড়ে তখন প্রচণ্ড হৈচৈ সুরু হয়ে গেছে।

দশ

—দ্বন্দ্বযুদ্ধ—

লালবাজার।

ডেপুটি কমিশনার মিঃ মুখার্জীর কক্ষের টেলিফোনটা ঘন ঘন বেজে উঠল।

—হ্যালো, কে?

—ডিটেকটিভ দীপক চ্যাটার্জী স্পীকিং। আপনি এক্ষুণি চায়না লজের একটা সার্চ ওয়ারেন্ট ইস্যু করতে পারবেন স্যর?

—ডেফিনিট্ প্রুফ্ কিছু আছে?

—হ্যাঁ স্যর।

—বেশ, আপনি এক্ষুণি আমার সঙ্গে দেখা করুন।

মিঃ হালদার বললেন—আপনি ঠিক বলছেন মিঃ চ্যাটার্জী?

দীপক হেসে বলল—নির্ভরযোগ্য প্রমাণ না পেয়ে কথা বলি না আমি।

—সেদিন রাতে আপনি ভিখারীর ছদ্মবেশে চায়না লজে হানা দিয়ে যে চেষ্টা করেছিলেন তাতে কি প্রমাণ সংগ্রহ করতে পেরেছেন?

—সেটা দেখাতেই আমি এসেছি। এখান থেকে সোজা যাব ডেপুটি কমিশনার মিঃ মুখার্জীর কাছে। তারপর সার্চ ওয়ারেন্ট নিয়ে চায়না লজে।

—কিন্তু আপনার প্রমাণ? কে এই দস্যু লিউসিন?

—এই দেখুন সব একে একে।

অবাক বিস্ময়ে মিঃ হালদার বললেন—একি? এ কি করে সম্ভব মিঃ চ্যাটার্জী?

দীপক মৃদু হাসল শুধু।

চায়না লজের মালিক চিয়াং ফু তিনতলার ঘরটা থেকে নেমে এলো।

সোজা পথে।

অপরিচিত জনস্রোত। চিয়াং ফু একটা গাড়িতে উঠে বসল।

গাড়ি ছুটে চলল তীব্রবেগে কল্‌কাতার রাজপথ ধরে।

একটু পরেই পেছনে দেখা গেল একটা পুলিশেব গাড়ি।

চিয়াং ফু সেদিকে তাকিয়ে দেখল। কোনও কথা বের হলো না তার মুখ দিয়ে।

গাড়ি ছুটে চলল। পেছনের পুলিশের গাড়িটাও তাকে অনুসরণ করে চলেছে। সামনের গাড়িটার গতিবেগ বর্ধিত হলো।

উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলেছে যেন। জোরে...আরও জোরে...

পেছনের গাড়িটাও অনুসরণরত।

কে জানে এ অজানা রহস্যের শেষ কোথায়!

কল্‌কাতা থেকে বহুদূরে জঙ্গলঘেরা একটা মাঠের প্রান্তে বিরাট একটা গুদোমঘর।

একটা মোটরকার এসে দাঁড়াল গুদোমঘরটার পাশে।

মোটর থেকে নামল দুজন লোক। একজন পুরুষ, অন্যজন নারী।

পুরুষটির চেহারা দেখে তাকে চিনতে ভুল হয় না। এ হচ্ছে সেই চায়না লজের মালিক চিয়াং ফু। আর মেয়েটিও ফ্লোরা ছাড়া অন্য কেউ নয়।

দুজন লোক এসে চিয়াং ফুকে প্রণাম জানায়।

—সব কিছু তৈরি?

—হ্যাঁ কর্তা।

—খবর সব ভাল?

—হ্যাঁ! হেলিকপ্টারখানা রেডি আছে।

চিয়াং ফু আর ফ্লোরা এগিয়ে গেল প্লেনটার দিকে। দুজনে উঠে বসল।

দূরে শোনা গেল মোটরের ইঞ্জিনের শব্দ।

ফ্লোরা ইঞ্জিনে স্টার্ট দিতে দিতে বলল—ওরা আমাদের ফলো করছে বলে মনে হচ্ছে।

চিয়াং ফু বলল—কিন্তু আমাদের ফলো করে ওদের লাভ কি? আমাদের সঙ্গে রহস্যের কি যোগাযোগ ওরা খুঁজে পাবে যে...

ফ্লোরা প্রাণপণে হাতলটা ঘোরায়। এক্সিলেটারে চাপ দিয়ে বলে—আর ওদের ক্ষমতা নেই আমাদের অনুসরণ করে।

ঘস্ ঘস্...বোঁ-ও-ও-ও...

হেলিকপ্টারখানাতে যেন প্রাণসঞ্চার হয়েছে।

দূরে পুলিশ-ভ্যান ছুটে আসছে দেখা গেল।

বন্ বন্ শব্দে মাথার ওপরকার পাখাটা ঘুরতে লাগল।

স্টার্ট নিয়ে সুদূর আকশের বুকে উড্ডীন হলো ছোট্ট হেলিকপ্টারখানা।

ফ্লোরার মুখে ফুটে উঠল সাফল্যের হাসি। পুলিশবাহিনীর আর সাধ্য নেই তাদের ধরতে পারে।

চিয়াং ফু বলল—এ যাত্রা তোমার জন্যেই রক্ষা পেলাম বলে মনে হচ্ছে ফ্লোরা।

হেলিকপ্টার উড়ে চলল তীব্রগতিতে।

নিচে এসে দাঁড়াল পুলিশ-ভ্যান। মোটর লরী আর জীপ।

গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ে একজন পুলিশ সার্জেণ্ট হেলিকপ্টারটিকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ল।

গুড়ুম্!

কিন্তু সেখানা তখন বন্দুকের নাগাল ছাড়িয়ে অনেক দূরে চলে গেছে।

এগারো

—আকাশপথে—

পুলিশবাহিনী এসে সারা এরোড্রোমকে ঘিরে ফেলল।

জঙ্গলের আড়ালে এই গোপন এরোড্রামের প্রত্যেকটি প্রাণীকে গ্রেপ্তার করা হলো একে একে।

পুলিশবাহিনী জেট্‌প্লেনটি দখল করল।

দীপক বলল—চলুন মিঃ মুখার্জী, আমরা এবার জেট্‌প্লেনটা নিয়ে হেলিকপ্টারের পেছনে অনুসরণ করি।

—কিন্তু প্লেন ড্রাইভ করবে কে?

দীপক হেসে বলল—এ কাজটাও কিছু-কিছু জানা আছে আমার মিঃ মুখার্জী। এক্ষুণি তার পরিচয় আপনি পাবেন।

—কিন্তু দস্যু লিউসিনকে ত কোথাও দেখলাম না। চিয়াং ফু আর ফ্লোরাকে দেখা গেল শুধু। ওদের বন্দী করার আগে...

—বুঝেছি। তার উত্তর দিচ্ছি একটু পরে।

কোনও কথা না বলে সশস্ত্র চারজন সার্জেন্ট, মিঃ মুখার্জী আর দীপক জেট্‌প্লেনটাতে উঠে বসল।

সুনীল আকাশের বুক দিয়ে ভেসে চলল দুরন্তগতি জঙ্গী-বিমানখানা।

দূরে আকাশের গায়ে দেখা যাচ্ছে সশব্দ হেলিকপ্টারটির অগ্রগতি।

দূরবীনটা চোখে লাগিয়ে দীপক ক্রমশই তার জেট্‌প্লেনটার গতি বৃদ্ধি করতে থাকে।

দুটি প্লেনের মধ্যে দূরত্ব ক্রমশই কমে আসতে থাকে। জেট্‌প্লেনটার গতি হেলিকপ্‌টারখানার চেয়ে অনেক বেশি দ্রুত। আর সামান্য কিছুটা পার্থক্য রয়েছে দুটি প্লেনের মধ্যে।

মিঃ মুখার্জী উত্তেজিত ভাবে বললেন—আরও জোরে মিঃ চ্যাটার্জী। মোর স্পীড্...

দীপক মৃদু হেসে ফ্লাইং-হুইলটা চেপে ধরে।

খটাখট্, খটাখট্, খট্ খট্ খট্...

শন্ শন্...শোঁ...

মুখোমুখি সংগ্রাম চলছে প্লেন দুটোর মধ্যে। জেট্‌প্লেন আর হেলিকপ্‌টার। আধুনিক বিজ্ঞানের দুটি শ্রেষ্ঠ অবদান।

অজস্রধারে বর্ষিত হচ্ছে মেশিনগানের গুলি।

প্রপেলারের গর্জন বাতাসকে মথিত করছে যেন।

পর পর এক ঝলক গুলি ছুটে এলো জেট্‌প্লেনটাকে লক্ষ্য করে।

দীপক অনেক কষ্টে প্লেনটাকে নিচে নামিয়ে সেই গুলির কবল থেকে নিজেকে রক্ষা করল।

আকস্মিকভাবে দুটি গুলি গিয়ে বিদ্ধ হলো হেলিকপ্‌টারটির গায়ে।

দপ্ করে আগুন জ্বলে উঠল।

একটা পাক খেয়ে সেটা নেমে আসতে লাগল নিচের দিকে।

মিঃ মুখার্জী বললেন—এবার মৃত্যুকে বরণ করা ছাড়া ওদের আর কোনও গতি নেই মিঃ চ্যাটার্জী।

দীপক বলল—আমারও তাই মনে হয়।

কিন্তু ও কি?

সকলে অবাক হয়ে দেখতে পেল দুটি লোক আকস্মিকভাবে শূন্যের ওপর লাফিয়ে পড়েছে।

তাদের প্যারাস্যুটটা খুলে যেতেই আকাশের বুকে ভাসতে ভাসতে ধীরে ধীরে তারা অক্ষতভাবে মাটিতে এসে নামল।

ওধারে হেলিকপ্‌টারখানা ততক্ষণে প্রচণ্ডভাবে মাটিতে এসে আছড়ে পড়ে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে।

জেট্‌প্লেনখানা মাটিতে এসে ল্যাণ্ড করল।

দীপক চ্যাটার্জী আর মিঃ মুখার্জী ছুটে এলেন অদূরে দণ্ডায়মান লোক দুটির দিকে।

—মাথার ওপর হাত তোল চিয়াং ফু।

বজ্রকণ্ঠে হেঁকে উঠলেন মিঃ মুখার্জী।

দীপক ততক্ষণে ফ্লোরাকে গ্রেপ্তার করতে ব্যস্ত ছিল। এবার সে এগিয়ে এসে বলল—আপনি ভুল করছেন মিঃ মুখার্জী। এ কোনওদিনই আসল চিয়াং ফু নয়। এ হচ্ছে চিয়াং ফুর ছদ্মবেশে দস্যু লিউসিন।

—হাউ স্ট্রেঞ্জ!

মিঃ মুখার্জী যেন আকাশ থেকে পড়লেন।

—আমি ঠিক কথাই বলছি মিঃ মুখার্জী। চায়না লজের মালিক আসল চিয়াং ফুকে অজ্ঞান করে সেই বাড়িরই একতলার একটা চোরাকুঠরীতে দস্যু লিউসিন আটকে রাখে। সেটা আজ প্রায় চার-পাঁচ দিন পূর্বের ঘটনা।

—কিন্তু তার এ কাজের অর্থ?

—পর পর যে ধরনের কাজগুলি সে করেছিল তাতে পুলিশের নজর যে তার ওপর পড়বে এটা সে জানত। তাই অবশেষে চেষ্টা করল চিয়াং ফুর ছদ্মবেশে গা ঢাকা দিয়ে এ দেশ ছেড়ে পলায়ন করতে।

—কিন্তু আপনি সেটা কি করে জানলেন?

—সেদিন চিয়াং ফুর ঘরে ফ্লোরাকে দেখেই প্রথম এই সন্দেহটা আমার মনে উঁকি মারে। তারপর যখন দেখতে পেলাম চিয়াং ফু মোটরে ফ্লোরাকে নিয়ে পালাচ্ছে তখনই আমি সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ হলাম।

—কিন্তু আসল চিয়াং ফু তাহলে কোথায়?

—সে চায়না লজেই বন্দী আছে মিঃ মুখার্জী।

পুলিশবাহিনী চিয়াং ফু'র ছদ্মবেশধারী দস্যু লিউসিনের হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিয়েছিল। বন্দী দস্যু লিউসিন আর ফ্লোরাকে নিয়ে মিঃ মুখার্জী আর দীপক গাড়িতে উঠে বসল।

আদালতে দস্যু লিউসিন তার সমস্ত অপরাধ স্বীকার করল।

হোটেল রিগ্যালে সেই-ই যে নরহত্যা করেছিল একথাও সে স্বীকার করতে বাধ্য হলো। চিয়াং ফু'র ছদ্মনামে সে-ই লোকটার কাছে চিঠি দেয়। সে আগেই জানত যে তার কাছে সে সময়ে ঐ পরিমাণ অর্থ ছিল। তারপর টাকাটা আত্মসাৎ করবার জন্যেই সে তাকে হত্যা করে।

অন্যান্য সব অপরাধের কথাও সে গোপন রাখল না।

বিচারক দস্যু লিউসিন আর ফ্লোরার দশ বৎসর কারাদণ্ডের আদেশ দিলেন।

রীটা ব্যানার্জীর পরিবার গভর্ণমেণ্টের কাছ থেকে যাতে উপযুক্ত সাহায্য পায় সে ব্যবস্থা করবার জন্যেও বিচারক গভর্ণমেন্টকে অনুরোধ করলেন।

মিঃ হালদারের পদোন্নতির সুপারিশও থাকল তার মধ্যে।

মিঃ হালদার কিন্তু দীপকের সঙ্গে দেখা হলে বলেন, চায়না লজ মিস্ট্রীর সমস্ত ব্যাপারে সফলতার মূলেই আপনি। আপনি না থাকলে শত পরিশ্রম করলেও আমি এ ব্যাপারে সফল হতে পারতাম কিনা সন্দেহ।

-শেষ—

বিজয়িনী তন্দ্রা

এক

—দুর্ঘটনা—

বিকেলের দিকে একবার বেড়াতে বের হওয়া ডিটেকটিভ দীপক চ্যাটার্জীর বহুদিনের অভ্যাস।

গাড়িটাকে খুব জোরে হাঁকিয়ে সে কিছুটা ইতস্তত ঘুরে বেড়ায়। তারপর সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ বাড়ি ফিরে নিজের কাজে মন দেয়।

তবে কাজের চাপ খুব বেশি থাকলে আর বেড়ানো হয়ে ওঠে না।

সম্প্রতি একটা জটিল ইন্‌ভেস্টিগেশন্ শেষ করে তার হাতে ছিল অখণ্ড অবকাশ। তাই সেদিন সন্ধ্যায় দেখা গেল তার মোটরটা চৌরঙ্গী পেরিয়ে সজোরে পার্ক স্ট্রীট ধরে ছুটে চলেছে।

পার্ক সার্কাসের মোড়।

দীপক গাড়ি থেকে নেমে ঢুকল একটা বড় স্টেশনারী দোকানে। অল্পক্ষণের মধ্যেই জিনিসপত্র কেনাকাটা শেষ করে গাড়িতে এনে রাখল। কিন্তু গাড়িতে আর উঠতে হলো না তাকে। হঠাৎ একটা ঘটনা তার মনোযোগ আকর্ষণ করতেই সে সেই দিকে ছুটে গেল দ্রুতগতিতে।

বহুদূর থেকে ছুটে আসছিল একখানা প্রাইভেট কার। কিন্তু দ্রুতগতিতে ছুটে চললেও হর্ণ বাজায়নি গাড়ির ড্রাইভার।

ওধার থেকে একটি তরুণী মেয়েও ঠিক এই সময়েই রাস্তা পার হচ্ছিল। গাড়িটাও সেই সময়েই দ্রুত তার দিকে ছুটে আসছিল।

এ ধরণের ঘটনার জন্যে তরুণী আদৌ প্রস্তুত ছিল না। গাড়িখানাকে দ্রুত তার দিকে ছুটে আসতে দেখে কেমন যেন হকচকিয়ে গেল সে।

গাড়িখানা ধূমকেতুর মতো ছুটে এসে ধাক্কা মারতে গেল তাকে।

এ ধরণের ঘটনা দীপকের জীবনে প্রথম নয়।

এতবড়ো মারাত্মক ঘটনার সামনে পড়েও তাই সে মোটেই বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়নি। সে জানে মাথা ঠিক রেখে কাজ করাই এ সব ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড়ো প্রয়োজনীয় বস্তু।

দীপক একলাফে পথের মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়ে মেয়েটিকে সজোরে টেনে নিল একপাশে।

গাড়িটাও পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল তীব্রবেগে।

মেয়েটি তরুণী। এভাবে যে পথের মাঝে সে একটা দুর্ঘটনার কবলে পড়তে পারে এ সম্বন্ধে তার বিন্দুমাত্র ধারণা ছিল না।

দীপকের দিকে চেয়ে সে এবার বলল্—উঃ, আপনি না থাকলে যে কি হতো তা ধারণা করতেও আমার মাথা ঘুরে যাচ্ছে।

দীপক মৃদু হেসে বললে—আর একটু সাবধানে চলাফেরা করবেন তন্দ্রা দেবী।

মেয়েটি অবাক!

বলল—আমার নাম আপনি কি করে জানতে পারলেন বলুন ত!

দীপক মৃদু হেসে বলল—আর কেউ না পারলেও ডিটেকটিভ দীপক চ্যাটার্জীর কাছে এটা অসম্ভব নয় মোটেই।

—সে কি? আপনিই প্রখ্যাত ডিটেকটিভ দীপক চ্যাটার্জী?

—ঠিকই ধরেছেন। নামটা ওই বটে, তবে প্রখ্যাত কিনা জানি না।

—আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুবই আনন্দিত হলাম মিঃ চ্যাটার্জী। কিন্তু এমনভাবে পরিচয়টা যে ঘটবে তা জীবনে কোনও দিনই ধারণা করতে পারিনি। উঃ, এখনও বুকের ভেতরটা কাঁপছে...

—ভগবান সত্যিই একজন বড় 'হিউমারিস্ট', কি বলেন আপনি, তন্দ্রা দেবী?

—কিন্তু আমার নামটা কি করে জানলেন তা ত বললেন না!

—আমি কেন, তীক্ষ্ণদৃষ্টি থাকলে যে কেউ ওটা বলতে পারত। আমি যখন আপনার হাত ধরে টানলাম, তখনই আপনার হাতের আংটিটার দিকে আমার নজর পড়েছিল। ওতেই লেখা আছে 'তন্দ্রা'। কিন্তু আপনার উপাধিটা জানবার সৌভাগ্য আমার হয়নি—তাই ডাকলাম 'তন্দ্রা দেবী'।

—ও, হেসে ওঠে তন্দ্রা। আমার পুরো নাম শ্রীমতী তন্দ্রা গুপ্তা।

—ধন্যবাদ। কিন্তু এরপর থেকে আপনি আরও একটু সাবধানে চলাফেরা করবেন মিস্ গুপ্তা।

—কেন?

—এটা দুর্ঘটনা বলে মনে হয় না আমার। এর পেছনে রয়েছে সুগভীর চক্রান্ত।

—চক্রান্ত?

—হ্যাঁ, আপনাকে পৃথিবী থেকে সরাবার উদ্দেশ্য ছিল ওদের।

—সেকি? কেন? আমাকে মেরে ফেলে কার কি উদ্দেশ্য সাধিত হবে?

—হয়ত এমন অনেক বিষয় পৃথিবীতে আছে যা আপনার কল্পনার বাইরে।

রহস্যময় ভাবে হেসে ওঠে দীপক।

—কিন্তু...

তন্দ্রা কেমন যেন অন্যমনস্ক।

—যদি কখনও কোনও অসুবিধেয় পড়েন, আমার সাহায্য আপনি নিতে পারেন নির্বিবাদে। আমার দিক থেকে সব রকমের সাহায্য আপনি পাবেন। এই নিন আমার ঠিকানা।

দীপক একখানা কার্ড তুলে দেয় তন্দ্রার হাতে। তন্দ্রা সেটা তার ভ্যানিটি ব্যাগে পুরে ফেলে।

দীপক বলে—এখন গাড়িতে উঠুন। আপনি যেখানে বলবেন সেখানেই পৌঁছে দেব।

তন্দ্রা আপত্তি করে। বলে—না না, আমি বাসেই যেতে পারব।

দীপক বলে—আপাতত এটুকু সাহায্য আপনি নিতে বাধ্য। কারণ ওই যে গাড়িখানা আপনাকে ধাক্কা দেবার চেষ্টা করেছিল, ওর মধ্যে এমন একজন লোককে আমি দেখেছি, যার কথা চিন্তা করতে সাধারণ মানুষ ভয় পায়।

—আপনি এতও মানুষকে ভয় দেখাতে পারেন। তন্দ্রা বলে।

—মিথ্যা ভয় নয়, তন্দ্রা দেবী। ভগবান করুন, আর কোন দুর্ঘটনা যেন না ঘটে। কিন্তু

আমি বুঝতে পারছি না, কেন সেই শয়তান, ব্ল্যাকমেলার, স্মাগ্‌লার দস্যু বলবন্তের দৃষ্টি গিয়ে পড়ল আপনার ওপর।

—দস্যু বলবন্ত?

—হ্যাঁ, আপনি তাকে পুরো চেনেন না তন্দ্রা দেবী। তার সমস্ত ইতিকথা আমার জানা, তাই তাকে এত বেশি ভয় করি আমি। যে পথ দিয়ে ও চলে তার দু'পাশে ও রেখে যায় অজস্র ক্ষতচিহ্ন। থাক্, ওর সম্বন্ধে বেশি কথা বলে আপনার মন খারাপ করতে চাই না। যাক্, কোথায় যেতে চান তাই বলুন।

তন্দ্রা বলে—শ্যামবাজার।

—কোন্ রাস্তা?

—মোহনবাগান লেন। তেইশ নম্বর।

—বেশ, উঠুন আমার গাড়িতে।

তন্দ্রা আর আপত্তি করতে সাহস পায় না। ধীরে ধীরে গাড়িতে উঠে বসে।

দীপক জিনিসপত্রগুলো একপাশে সরিয়ে গাড়ি ড্রাইভ করে শ্যামবাজারের দিকে।

কিন্তু তার পেছনে অনেকটা দূরত্ব রেখে আর একটা গাড়ি যে তার গাড়িকে অনুসরণ করছে, এটা তন্দ্রার নজর এড়ালেও দীপকের নজর এড়াতে পারেনি।

আঁকাবাঁকা কয়েকটা গলির গোলকধাঁধার মধ্য দিয়ে তীব্রবেগে গাড়ি ড্রাইভ করে দীপক যখন বড় রাস্তায় এসে পড়ে, তখন পেছনের গাড়ির আর কোনও অস্তিত্বই দেখা যায় না।

তন্দ্রা অবাক্ হয়ে শুধু ভাবে, দীপক এমন অদ্ভুতভাবে গাড়ি চালাচ্ছে কেন?

দুই

—নন্দনবাগানের মনোহর দেশাই—

নন্দনবাগান অঞ্চলের সাধারণ মানুষের কাছে মনোহর দেশাই একজন অতি পরিচিত ব্যক্তি।

অবশ্য কোনও ব্যাপারেই বিখ্যাত লোক সে নয়। খ্যাতির আশাও সে রাখে না কোনওদিন। কিন্তু সাধারণের কাছে তার এই পরিচিতির মূলে রয়েছে সম্পূর্ণ অন্য একটা কারণ। সে বিষয়ে পরে আলোচনা হবে।

মনোহর দেশাই লোকটা বাইরে থেকে সাধারণ মনে হলেও, আসলে তার প্রকৃতি কিন্তু সম্পূর্ণ অন্য ধরণের।

তার গোবেচারা নিরীহ ভাবভঙ্গি দেখলে সে যে গ্রাম্য লোক এবং অল্পদিন হলো কলকাতায় এসেছে এমন কথাই মনে জাগা স্বাভাবিক।

তার এই গুণটির জন্যে সে পুলিশ বিভাগে ইন্‌ফর্মারের কাজ পেয়েছিল। দীর্ঘদিন সে যোগ্যতার সঙ্গে এই কাজে বহাল ছিল।

কিন্তু মনোহরের মনে ধীরে ধীরে অন্য কতকগুলো চিন্তা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল।

যদি ইন্‌ফর্মারের কাজই করতে হয়, তবে পুলিশ বিভাগে কেন? তার চেয়ে বিভিন্ন বড় লোকের গোপন খবরাদি জেনে যদি তাকে ব্ল্যাক্‌মেলিং করা যায়, তবে উপার্জন হতে পারে আরও বেশি।

ইতিমধ্যে এক দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ায় মনোহর দেশাইয়ের মনের ভাব আরও সুদৃঢ় হয়ে উঠল।

একদিন মনোহর হঠাৎ এক গুণ্ডাদলের লোকের দ্বারা আক্রান্ত হলো। অনেক কষ্টে সে এ যাত্রায় রক্ষা পেল বটে, তবে মনে মনে স্থির করল, ইন্‌ফর্মারের চাকরীতে আর একদিনও নয়। কথায় কথায় তাতে প্রাণ যাবার ভয়, অর্থপ্রাপ্তি সে তুলনায় অনেক কম, তার উপরে লোকের অবিশ্বাসের পাত্র হয়ে দাঁড়ানো।

অবশেষে সে একদিন পুলিশের কাজে ইস্তফা দিয়ে অন্য ব্যাপারে মনোযোগ অর্পণ করল। কিন্তু এই অন্য ব্যাপারটা যে কি তা সাধারণ লোকের ধারণার সম্পূর্ণ বাইরে ছিল।

নন্দনবাগান বস্তির এক কানাগলির মধ্যে ছিল মনোহর দেশাইয়ের বাড়িটা। এই পাড়ার অধিকাংশই নিম্নশ্রেণীর অশিক্ষিত লোক। তবে মাঝে মাঝে দোতলা বাড়িও দু-একটা আছে। কিন্তু বাড়ির দিক থেকে মর্যাদা বেশি হলেও পেশা এবং শিক্ষাদীক্ষার দিক থেকে সকলেই প্রায় সমান।

এই বস্তির 'সাতাশের বারোর এ' নম্বর বাড়িটা দোতলা হলেও একটু ভেতর দিকে।

এই বাড়ির সাম্‌নে দিন কয়েক থেকে একখানা বড় মোটর এসে দাঁড়াচ্ছে।

আশ্চর্য ব্যাপার!

এই বস্তির ভেতর এমন জমকালো মোটরগাড়ি!

ঘটনাটা মনোহর দেশাইয়ের নজর এড়ায়নি। আর এ ধরণের ঘটনা তার মতো সুচতুর ও ধূর্ত লোককে কৌতূহলী করে তুলল।

এ বাড়িখানার মালিকের নাম বিনয়ভূষণ পাল।

লোকটা চিরদিনই ছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর। কি একটা অ্যাটর্ণী অফিসে কেরাণীগিরির কাজ করে মাসে গোটা আশি টাকা মাইনে পায় সে।

তার পক্ষে মোটর কেনা সম্পূর্ণ অসম্ভব। তা ছাড়া তার নিকটতম আত্মীয়ও এমন কেউ নেই যে মোটরে চড়ে আসতে পারে।

তাই বিনয়ের বাড়ির সাম্‌নে ঘন ঘন এই ধরণের মোটর এসে দাঁড়ানো, সুচতুর মনোহরের মনোযোগ আকর্ষণ করল।

তা ছাড়া আজকাল বিনয় যেন সম্পূর্ণ অন্য মানুষে পরিবর্তিত হয়েছে।

পরনের ময়লা ধুতিটা বিদায় নিয়েছে। আজকাল দামী তাঁতের ধুতি পরে, গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবী চড়িয়ে, পায়ে লপেটা জুতো এঁটে সে যখন পথে বের হয় তখন যে কোনও লোক দেখলে বেশ ভাল করেই বুঝতে পারে যে লোকটির হঠাৎ প্রচুর অর্থপ্রাপ্তি ঘটেছে।

ব্যাপারটা সাধারণ নয়। কেমন যেন রহস্যময়। বিগতদিনের পুলিশ ইন্‌ফর্মার মনোহর ভাবল, এবার যেদিন রাতে মোটর এসে দাঁড়াবে সেদিন তাকে গোপনে দেখতে হবে ভেতরের ব্যাপারটা কি।

এ রকম একটা দাঁও কাজে লাগাতে পারলে হাতে যে মোটা কিছু টাকা এসে পড়বে এ সম্বন্ধে সে নিশ্চিত।

ভাবনার সঙ্গে কাজের খুব বেশি তফাৎ মনোহরের মতো লোকদের দেখা যায় না।

তাই দিন তিনেক পরে একদিন সন্ধ্যার পর দেখা গেল মনোহরকে ধীরপায়ে বিনয়ের বাড়ির দিকে এগিয়ে যেতে।

লক্ষ্য করলে দেখা যেত, বিনয়ের বাড়ির ঠিক সাম্‌নে যথানিয়মে গাড়িখানা এসে দাঁড়িয়েছে।

বিনয়ের বাড়ির পেছনে একটা প্রাচীর। মনোহর বাড়ির পেছন দিকে গিয়ে প্রাচীরটা পেরিয়ে একলাফে বাড়ির মধ্যে গিয়ে পড়ল। তার গতিভঙ্গি দেখলে বোঝা যায়, এ ধরণের কাজে সে খুব বেশি অভ্যস্ত।

দোতলার ঘরে আলো জ্বলছে। নিশ্চয়ই বিনয় মোটরারোহী আগন্তুককে ওই ঘরে বসিয়েই কথাবার্তা বলছে। মনোহর দোতলায় উঠল।

দোতলার জানালা দিয়ে মনোহর উঁকি মারল। হ্যাঁ, ঘরের মধ্যে লোক মাত্র দুজন। একজন বিনয়। অন্যজনকে পেছন থেকে ঠিক চেনা যাচ্ছে না। গভীর মনোযোগের সঙ্গে মনোহর তাদের প্রতিটি কথা কান পেতে শুনতে চেষ্টা করল।

শুনতে শুনতে মনোহরের সারা দেহে দেখা দিল রোমাঞ্চের রেখা। শিউরে উঠল তার সারা শরীর।

কয়েকজন নিরীহের বিরুদ্ধে চলেছে ঘোরতর চক্রান্ত। কয়েকজন লোককে নিয়ে গঠিত হয়েছে বিরাট একটা জটিল রহস্য-জাল। কিন্তু কে যে সেই চক্রান্তের নায়ক তা বোঝা গেল না তাদের কথা থেকে।

আগন্তুকের মুখের সামনের দিকটা দেখা যাচ্ছিল না। পেছনের দিক থেকে তাকে দেখলেও কথাগুলো সব শুনতে পাচ্ছিল সে।

বিনয়ের দিকে চেয়ে আগন্তুক বলল—তাহলে এই কথাই থাকল বিনয়। এই ছেলেটাকেই তুমি ত কাজে পাঠাবে?

বিনয় বলে—কিন্তু যদি ঠিকমতো ফাঁদ পাততে না পারি?

—যদির প্রশ্ন নয় বিনয়, এ কাজ তোমাকে করতেই হবে, মনে রেখো।

—চেষ্টা করতে হয়ত পারি, কিন্তু কথা দিতে পারছি না।

—চেষ্টার অসাধ্য কাজ দুনিয়ায় নেই। যদি কথা দিতে না পার ত বল, আমি অন্য চেষ্টা দেখি।

—না না, এ কি বলছেন আপনি? বিনয় কেমন যেন হকচকিয়ে যায়।

—তাহলে এবার তুমি কথা দিচ্ছ ত?

—হ্যাঁ, যতটা সম্ভব।

—বেশ, তোমার প্রাপ্য টাকার মধ্যে এই অগ্রিম দুশো এক্ষুণি তোমার হাতে দিচ্ছি।

বিনয় বিগলিত হাসি হেসে লোকটির হাত থেকে একতাড়া নোট নিয়ে পকেটে পুরে ফেলে।

হঠাৎ আগন্তুক ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল—আচ্ছা, চলি তাহলে বিনয়। প্রতিটি কথা যেন ঠিকমতো মনে থাকে।

বিনয় বলল—আপনার প্রতিটি কথা অনুযায়ী ঠিকমতো কাজ করবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করব স্যর।

কিন্তু একি?

আগন্তুকের মুখটা দেখেই মনোহর চমকে উঠল।

মনোহরের সারা দেহের ওপর দিয়ে বিদ্যুতের প্রবাহ খেলে গেল যেন! এ নিশ্চয়ই সেই দুর্দান্ত দস্যু, স্মাগলার ও ব্ল্যাকমেলার বলবন্ত খাঁ!

কিন্তু বলবন্তের সঙ্গে বিনয়? অসম্ভব! অদ্ভুত যোগাযোগ! মনোহর ব্যাপারটা দেখে যতটা অবাক হলো, আনন্দিতও হলো তার চেয়ে কম নয়। যাক্, এবার একটা মোটা ফাঁদ পেতে বেশ দু'পয়সা রোজগার করা যাবে।

মনোহরের মনে চকিত দ্বিধা।

পুরোনো দিনের পুলিশ ইন্‌ফর্মারী চাড়া দিয়ে উঠল তার মনে। ওদের পুলিশে ধরিয়ে দিলে কেমন হয়?

কিন্তু পুলিশ আর ক'টাকাই বা দেবে? তার চেয়ে ভালভাবে ব্ল্যাকমেল্ করতে পারলে বেশ মোটা দাঁও...

মনোহর সংকল্প স্থির করে পথে পা দিল। প্রবল উত্তেজনায় তার মাথাটা তখন রীতিমতো গরম হয়ে উঠেছে।

তিন

—অ্যাটর্ণী মিঃ পালিত—

গণেশ এভেনিউ-এর ওপর মিঃ মনোহর পালিতের বিরাট অ্যাটর্ণী অফিস। ঠিক বড় রাস্তার ওপরেই একখানি পাঁচতলা বাড়ির একতলা জুড়ে তাঁর অফিসটা চলেছে দীর্ঘদিন ধরে।

অফিসের সাজসজ্জা আধুনিক রুচিসম্মত। দামী মেহগনি কাঠের সব চেয়ার-টেবিল। মাথার উপরে ফ্যান ঘুরছে। লিফ্‌টে ওঠা-নামা করছে লোক। অফিসের দুজন কেরাণী আর একজন মেয়ে-টাইপিস্ট দিবারাত্র কাজ নিয়ে ব্যস্ত।

কেরাণী দুটিকে মোটামুটি বিশ্বাস না করলে চলে না বলেই তাদের হাতে শুধুমাত্র ছোট ছোট কাজের ভার দেন মিঃ পালিত। কিন্তু বড় বড় সব কাজের হিসেব-নিকেশ রাখতে হয় লেডি-টাইপিস্ট তন্দ্রাকে। সেও অবশ্য কোনওদিন ওসব কাজে গাফিলতি দেখায় না।

বেশ চালাক-চতুর মেয়ে তন্দ্রা। সামান্য একটু ইংগিত পেলেই কোন্ কাজ কিভাবে করতে হবে তা সে ভালভাবে বুঝতে পারে।

কিন্তু এত বড়ো অ্যাটর্ণী ফার্মের মালিক হয়েও মিঃ পালিতের ম'নে কোনও সুখ নেই। নেই কাজের প্রতি আকর্ষণ বা উৎসাহ। সব সময় তিনি যেন কি একটা ব্যাপারে চিন্তিত।

বিষয়টা আর কিছুই নয়, দীর্ঘদিন যাবৎ তিনি বিভিন্ন মক্কেলের কাছ থেকে যে লক্ষ লক্ষ টাকা জমা রেখেছেন, এখন যদি সকলে তার পূর্ণ হিসাব চেয়ে বসে, তবে প্রায় এক লক্ষ টাকার কাছাকাছি ঘাট্‌তি দেখা যাবে।

তিল তিল করে যে টাকা তিনি খরচ করেছেন, তাই আজ একত্রে পর্বত-প্রমাণ হয়ে উঠেছে। সে সব চিন্তায় রাতে মিঃ পালিতের ভাল ঘুম হয় না।

কিন্তু কোত্থেকেই বা তিনি এই বিপুল অর্থ সংগ্রহ করে এই ঘাট্‌তি পূরণ করতে সক্ষম হবেন? এই ধরণের নানা চিন্তায় আর দুর্ভাবনায় মিঃ পালিতের বিনিদ্র রাত কাটে।

উপায় যে তিনি একটা স্থির করেননি তা নয়। তবে সে উপায়ে যে কতটা সফলতা অর্জন করতে তিনি পারবেন, তা আজও মিঃ পালিত স্থির করে উঠতে পারেননি।

তাই আজ দিন তিনেক থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ঠিক বেলা চারটেয় তিনি কেরাণী দুজন ও মেয়ে-টাইপিস্ট তন্দ্রাকে ছুটি দিয়ে দিচ্ছেন। ঠিক সন্ধ্যার মুখে মুখে একজন মক্কেল আসে বলে তিনি অফিসে বসে থাকেন। কিন্তু যারা আসে, মক্কেল তারা কোনও দিনই নয়।

অন্যদিনের মতো সেদিনও দেখা গেল রাত আটটায় একজন লোককে ধীরে ধীরে মিঃ পালিতের অফিসে প্রবেশ করতে। পরনে তার কালো স্যুট, মুখে একটা গগ্‌লস-এর মতো কালো আবরণ।

আগন্তুককে দেখেই মিঃ পালিত উঠে দাঁড়ালেন সসম্মানে।

আগন্তুক প্রশ্ন করল—তাহলে এধারের কতদূর?

মিঃ পালিত বললেন—তন্দ্রার কাছে একটি ছেলে আসে মাঝে মাঝে। অসীম না, কি যেন নাম। গরীব আর গোবেচারা গোছের। টাকার লোভ দেখিয়ে ওকে রাজী করানো যাবে।

—খুব ভাল।

—আমার কিন্তু ওই পরিমাণ...

—জানি মিঃ পালিত। আপনি মক্কেলদের যে পরিমাণ টাকা খেয়ে বসে আছেন সেটা পূরণ করতে হবে।

—আজ্ঞে হ্যাঁ, মানে বুঝতেই ত পারেন...

—বেশি কথা বলবার প্রয়োজন নেই। সমস্ত কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পূর্ণ করতে পারলে এক লাখ আপনি পাবেন।

—আর একটু বেশি...

—বেশি লোভ ভাল নয় মিঃ পালিত। প্রবোধ সমাদ্দারের সম্পত্তির পরিমাণ পঁচিশ লাখের বেশি নয়। তার মধ্যে তাঁর উইলে অন্যেরা প্রায় লাখ পাঁচেক পাচ্ছে। বাকি কুড়ির মধ্যেও...

—আচ্ছা আচ্ছা তাই হবে। তাহলে ওদিকের কথাবার্তা...

কথাবার্তা চলল।

প্রতিটি কথার মধ্যে কি সুগভীর চক্রান্ত!

কি কূট রহস্যের জাল বিস্তার করে দুটি নিরীহ তরুণ আর তরুণীকে যে তার মধ্যে জড়ানো হলো তা সংক্ষেপে বর্ণনা সম্ভব নয়। তারই প্রতিক্রিয়া চলল পরবর্তী অজস্র ঘটনাগুলির মধ্যে।

বিদায় নেবার সময় মিঃ পালিতের পিঠে একটা চাপড় মেরে আগন্তুক বলল—আমি তাহলে নন্দনবাগান বস্তির বিনয়কে ও কাজে লাগিয়ে দিচ্ছি। দেখবেন আপনার দিক থেকে যেন সব ঠিক থাকে।

ধূর্ত হাসিতে মুখখানা ভরিয়ে তুলে মিঃ পালিত বললেন—আপনার কোনও দুশ্চিন্তা নেই সর্দার বলবন্ত খাঁ। প্রবোধ সমাদ্দারের বাগানবাড়িতে আবার আমাদের দেখা হবে।

চার

—চক্রান্তজালে অসীম—

অসীম সেনগুপ্তের জীবনটা ভগবান বিচিত্র এক ধাতুতে তৈরী করেছিলেন।

মাঝে মাঝে সে ভাবে স্বর্গ-নরক, ধর্ম-অধর্ম, নীতি-দুর্নীতি এসব কথাগুলো শুধু মানুষের সৃষ্ট কাল্পনিক কতকগুলি ব্যাপার।

সারাজীবন সৎপথে কাটিয়েও মানুষ একটা পয়সাও উপার্জন করতে সক্ষম হয় না—অথচ সামান্য এতটুকু নীতিভ্রষ্ট হয়েও বহু লোক লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করছে।

তার এসব কথা ভাববার উপযুক্ত কারণ ছিল। আজীবন সে দারিদ্র্যের মধ্যে কাটিয়েও প্রচুর বিদ্যা অর্জন করেছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত সে উপযুক্ত কোনও কাজের সন্ধান পেল না।

তা ছাড়া সম্প্রতি তন্দ্রা নামে একটি মেয়ের সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছে, এবং দুজনে পরস্পরকে গভীরভাবে ভালবাসা সত্ত্বেও তারা বিবাহ করতে পারছে না কেবলমাত্র অর্থের অভাবের জন্যে।

এই চিন্তাটাও অসীমকে অহরহ দগ্ধ করছে। যদি সৎপথে সারাজীবন কাটিয়েও সে প্রিয়জনের মুখে হাসি ফোটাবার মতো সামান্য অর্থও উপার্জন করতে না পারল, কি প্রয়োজন তার নীতি-দুর্নীতির বড় বড় সব বাঁধা বুলির!

মেসে টাকা বাকি পড়েছে। জামা-কাপড় ধোপার বাড়িতে আট্‌কে আছে। অথচ কোনও দিক থেকে একটি পয়সা আসার পথও তার সাম্‌নে খোলা নেই।

দেশবন্ধু পার্কের একটি নিরালা কোণে একখানা বেঞ্চির ওপরে বসে বসে অসীম এই সব ভাবছিল।

কিন্তু দীর্ঘক্ষণ স্থায়ী হলো না তার এ দুর্ভাবনা।

ভগবানের প্রেরিত দূতের মতো কে একজন যেন পাশ থেকে বলে উঠল—টাকা রোজগার করবেন? টাকা?

—টাকা?—অবাক্ বিস্ময়ে প্রশ্ন করে অসীম।

—হ্যাঁ, পাঁচশো টাকা।

—পাঁচশো! অসীমের চোখদুটো বড় বড় হয়ে ওঠে।

—অগ্রিম আড়াইশো, আর বাকি আড়াইশো কাজ শেষ হলে।

—কিন্তু কি কাজ করতে হবে আমাকে?

—বেশি কিছু নয়। শুধু একটা চিঠি পৌঁছে দেওয়া।

—কিন্তু আপনি কে?

—আমি একটা প্রাইভেট্ ডিটেকটিভ কোম্পানীর লোক। আমি নিজে কোনও কারণে যেতে পারছি না বলেই আপনাকে পাঠাচ্ছি।

আজ রাত নটায় এই চিঠিখানা দক্ষিণেশ্বরের জমিদার প্রবোধ সমাদ্দারের বাগানবাড়িতে তাঁর হাতে পৌঁছে দিতে হবে। তিনি সেই সময় এই চিঠিখানার জন্যে বাইরের বৈঠকখানা ঘরে অপেক্ষা করবেন।

—কিন্তু যে কোনও একজন ছোকরাও ত এ কাজ করতে পারে!

—না, সকলকে এই গুরুত্বপূর্ণ কাজে বিশ্বাস করা চলে না।

—তা বটে।

—আর তা ছাড়া এই চিঠিখানা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও জরুরী। কে কোথায় ফেলে দিয়ে হয়ত বলবে দিয়ে এসেছি। তা ছাড়া কৌতূহলের বশে কেউ এটা খুলে দেখে তাও আমরা চাই না।

—বুঝেছি।

—আপনি তাহলে সম্মত?

—হ্যাঁ, কই চিঠিটা দিন।

—এই নিন চিঠি। আর এই তাড়ায় পঁচিশখানা দশ টাকার নোট আছে। আড়াইশো। কাজ শেষ হলে কাল সকালে আপনি এই পার্কে আমার কাছ থেকে আরও আড়াইশো পাবেন।

অসীমের মনে চকিত দ্বিধা। কোনও অভিসন্ধি এর পেছনে লুকানো নেই ত? কিন্তু তার মতো একজন সাধারণ লোককে অভিসন্ধির মধ্যে জড়িয়ে কার কি লাভ হবে?

অসীম সম্মত হলো। টাকাটা গুণে পকেটে রেখে চিঠিটা বুক-পকেটে রাখল।

নমস্কার জানিয়ে লোকটা চলে যায়।

ভাবতে থাকে, তার সুদিন বোধ হয় এবার ফিরে আসবে। সর্বপ্রথম সে একটা খাবারের দোকানে ঢুকে কিছু খেয়ে নেয়। তারপর চিন্তিত মনে নূতন কাজের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে।

কিন্তু তখন কি সে জানত যে পরবর্তী ঘটনাচক্র তার বিরুদ্ধে রচনা করবে চক্রান্তের জাল? আরও বিপদের মধ্যে ঠেলে দেবে তাকে?

পাঁচ

—অদৃশ্য আততায়ী—

অমাবস্যার নিশুতি রাত।

রাত আটটার পর থেকে ঝির্ ঝির্ করে বৃষ্টি পড়তে সুরু করেছে।

দিক্‌চক্রবাল আঁধারের আলিঙ্গনে নিজেকে সঁপে দিয়ে নিঃশব্দে প্রহর গুণছে।

মেঘে মেঘে সূচিত হচ্ছে কোন্ একটা বিষাক্ত চক্রান্তের ঘন কালো ছায়া। তারই ভয়ে যেন আজ সারা পৃথিবী তন্দ্রাতুর।

বহুদূরে একটা বড় গাছের মাথায় কড়্ কড়্ শব্দে বাজ পড়ল।

কিন্তু একজন লোককে একটি বাস থেকে দক্ষিণেশ্বরের মোড়ে নেমে দুর্যোগ উপেক্ষা করেও সজোরে এগিয়ে যেতে দেখা গেল। তার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হয়, পৃথিবীর বুকে যত বড়ই দুর্ঘটনাই ঘটে যাক না কেন সে তার কর্তব্য পালন করবেই। এই লোকটাই যে আগের পরিচ্ছেদে বর্ণিত অসীম তা না বুঝিয়ে বললেও চলবে।

একটা বিরাট বাগানবাড়ির সাম্‌নে এসে দাঁড়িয়ে সে চিন্তা করতে লাগল কি উপায়ে ভেতরে প্রবেশ করা যায়।

বৃষ্টি তখনও কমে আসেনি। লোকটার জামা-কাপড় ভিজে একসা হয়ে গেছে। কিছুক্ষণ ইতস্তত করে সে সদর দরজাটা দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করল।

অবাক হয়ে গেল লোকটা। কই, চাকর দারোয়ান কারো টিকির সন্ধানই ত পাওয়া যাচ্ছে না!

বাগান পেরিয়ে বাইরের বৈঠকখানা ঘর। দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ। পেছনের জানালা দিয়ে লোকটি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল।

পকেট থেকে চিঠিটা বের করে হাতে নিয়ে দেখে জমিদার প্রবোধ সমাদ্দার একটা চেয়ারের ওপর শুয়ে অঘোরে ঘুমুচ্ছেন। মিনিট খানেক চিন্তা করল লোকটা।

তারপর ডাকল—শুনছেন স্যর! আপনার চিঠি।

কোনও উত্তর নেই।

কি করবে তা ঠিক করতে না পেরে অসীম এগিয়ে গিয়ে লোকটির গায়ে হাত দিল।

একি!

দেহ যে বরফের মতো ঠাণ্ডা। জমিদার প্রবোধ সমাদ্দার তবে মারা গেছেন!

কিন্তু কে তাঁকে মারল?

আর এ ত সাধারণ মৃত্যু নয়। একখানা রক্তমাখা ছোরা পাশে পড়ে আছে। কে তবে ওঁকে হত্যা করল?

অসীম কি করবে ঠিক করতে পারল না। ঘর থেকে চলে যাওয়াই এখন সর্বোৎকৃষ্ট উপায়।

কিন্তু...

চলে যাওয়ার অবসর অসীমের মিলল না।

শোনা গেল দরজা খোলার শব্দ।

—কে? অসীম পেছন ফিরে তাকাল।

একজন লোক তার পেছনে দাঁড়িয়ে। তার মুখখানা একখানা কালো মুখোশের আড়ালে আবৃত।

অসীম একপাশে সরে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে মাথার উপরে পড়ল প্রচণ্ড একটা আঘাত।

একটা লোক ডাণ্ডা দিয়ে যেন পেছন থেকে অসীমের মাথায় সজোরে আঘাত করেছে।

অসীমের চোখের সাম্‌নে অখণ্ড আঁধার।

অস্ফুট একটা শব্দ করে অজ্ঞান হয়ে পড়ল সে।

তুমুল কলরবের শব্দে জ্ঞান ফিরে এলো অসীমের। সহস্র রজনীর নিদ্রাশেষে জেগে উঠল যেন!

মাথার মধ্যে ঝিম্ ঝিম্ করছে। কি করে কি ঘটল তা ভাল করে বোঝবার আগেই সে দেখতে পেল একদল লোক ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল সশব্দে।

অনেকগুলি কণ্ঠের মিলিত কলরব কানে গেল তার। ধীরে ধীরে চোখ মেলে তাকাল সে।

সবচেয়ে সুমুখে যে লোকটি প্রবেশ করেছিল সে প্রশ্ন করল—কি নাম হে তোমার? তোমাকে ত দাগী আসামী বলে মনে হচ্ছে না।

উত্তরে আর একজন বলল—আমি ঘরের মধ্যে ঢুকেই দেখলাম ও ঠিক জমিদারবাবুর পাশে ছোরা হাতে দাঁড়িয়ে। ভয় পেয়ে আমি ছুটে গিয়ে টেলিফোন করলাম।

অন্য লোকগুলো একসঙ্গে বলল—আচ্ছা বদমাশ ত! কিন্তু ও ব্যাটা জখম হলো কি করে?

প্রথমে যে লোকটি প্রবেশ করেছিল তার দিকে চেয়ে অসীম বুঝতে পারল যে সে পুলিশের লোক। বোধ হয় দারোগা। সে বলল—সত্যি, ও জখম হলো কি করে মিঃ শর্মা?

মিঃ শর্মা জমিদার প্রবোধবাবুর প্রাইভেট্ সেক্রেটারী। তিনি বললেন—ঠিক বুঝতে পারছি না। তবে আমি পুলিশে ফোন করে এসে দেখি ও অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। পালাতে গিয়ে বোধ হয় আছাড় খেয়ে পড়ে জখম হয়েছে আর কি!

—তা হতে পারে।

—হ্যাঁ, মনে হচ্ছে ওই টেবিলের কোণে মাথা ঠুকে...

তাঁর কথা শেষ হলো না। অসীম চীৎকার করে উঠল—না না, ওসব মিথ্যা কথা দারোগাবাবু। আমার মাথায় পেছন থেকে আঘাত করে আমাকে অজ্ঞান করে ফেলা হয়।

—কে মাথায় আঘাত করল?

—পেছন থেকে আঘাত করেছে, দেখতে পাইনি।

—কিন্তু তুমি এ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলে কেন?

—একটা প্রাইভেট্ গোয়েন্দা ফার্ম থেকে একটা চিঠি তাঁকে দিতে এসেছিলাম গোপনে।

—কোথায় সে চিঠি?

পকেটে হাত দিয়ে অসীম দেখল চিঠিটা নেই। কিন্তু সেটা ছিল তার হাতে। হাত থেকে সেটা তবে গেল কোথায়?

—আজ্ঞে, সেটা ত দেখতে পাচ্ছি না এখন। নিশ্চয় যে আঘাত করেছিল সেই ওটা সরিয়েছে।

—মিথ্যা কথা। বললেন প্রবোধ সমাদ্দারের প্রাইভেট্ সেক্রেটারী মিঃ শর্মা।

—চিঠির কথাটাও যেমন মিথ্যা, পেছন থেকে আঘাতও তেমনি। ধরা পড়ে ওরকম গাঁজা চালিও না হে বাপু, বুঝলে? সত্যি মশাই, এ লোকটার সবই কেমন যেন অদ্ভুত। কথা নেই বার্তা নেই হঠাৎ এসে প্রবোধবাবুকে খুন করে নিজেও অজ্ঞান হয়ে পড়ল। এখন বলছে আবার কি এক চিঠির কথা!

দারোগা সাহেব গম্ভীরভাবে মন্তব্য করলেন—চল হে, এখন কিছুক্ষণ হাজতঘরটা দেখে আসবে।

অসীমের এতক্ষণ মনে হচ্ছিল সে বোধ হয় স্বপ্ন দেখছে। কিন্তু এ ত তা নয়। এ নির্মম রূঢ় বাস্তব। কঠোর সত্য।

জমিদারবাবুর মৃতদেহের পাশে তাকে অজ্ঞান অবস্থায় পাওয়া গেছে। তা ছাড়া সে সত্যিই ছোরাটা তুলে একবার হাতে করে দেখেছিল। ওতে তার হাতের ছাপ থাকাও আশ্চর্য নয়। সব দিক থেকেই তার বিরুদ্ধে অকাট্য প্রমাণ।

এদিকে তার চিঠির কোনও অস্তিত্ব নেই। কে তার কথা বিশ্বাস করবে?

অসীমের মাথার মধ্য দিয়ে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। সে শুধু বলল—বিশ্বাস করুন দারোগাবাবু, আমি নির্দোষ! আমি ওসবের কিছুই জানি না। আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা হয়েছে।

দারোগাবাবু নিষ্ঠুর হাসি হেসে শুধু বললেন—ধরা পড়লে সকলেই এ কথা বলে হে, বুঝলে! দু'দিন ঠাণ্ডা গারদে রাখলেই সব কিছু ঠিক কব্‌লে ফেলে।

অসীম বুঝতে পারল সব চেষ্টা নিষ্ফল। তার উদ্ধারের কোনও আশা নেই। তার হাতে হাতকড়া পরানো হলো। দুজন পুলিশ বন্দুক উঁচিয়ে তার সামনে আর পেছনে এসে দাঁড়াল। তারপর তাকে নিয়ে দারোগাবাবু যাত্রা করলেন থানার উদ্দেশে।

দরজার কাছে পৌছতেই একটি মেয়ে হঠাৎ বিপুল বেগে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল। তন্বী যুবতী। দু'চোখে তার জল টলমল করছে। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে সে বলল—বাবাকে যে এরকম নির্মমভাবে হত্যা করেছে তার উপযুক্ত শাস্তির জন্য আমি সব কিছু অর্থ ব্যয় করতে প্রস্তুত দারোগাবাবু।

দারোগাবাবু মিঃ শর্মার দিকে চাইলে তিনি বললেন—ইনি হচ্ছেন মৃত জমিদার প্রবোধবাবুর একমাত্র কন্যা বীণা। পিতার মৃত্যুর পর তাঁর সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হবেন ইনি। অবশ্য তাঁর উইলের কথা আমরা জানি না। তবে এ ছাড়া আর কি হতে পারে!

দারোগাবাবু শোকাচ্ছন্ন বীণার দিকে তাকিয়ে বললেন—আপনি অত অধীর হবেন না বীণা দেবী। এর উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা আমি অবশ্যই করব।

অসীমের মনে হলো সারা রাত্রিটা যেন কেটে গেছে কোন একটা দুঃস্বপ্নের মধ্য দিয়ে। পত্রবাহক—চিঠি—জমিদার বাড়ি—খুন—এই গারদ—সবই যেন বিরাট এক দুঃস্বপ্নের এক-একটি অংশ।

ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে প্রভাতের আলো এসে ছড়িয়ে পড়ল পৃথিবীর বুকে। অসীম উঠে এসে ভাবতে লাগল, তার দুঃখের সময় নিশ্চয়ই কেটে গেছে। এবার বোধ হয় প্রকৃত হত্যাকারী ধরা পড়বে।

বেলা প্রায় নটা।

একজন পুলিশ অফিসার তালা খুলে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলেন। তারপর হুকুম দিতেই অসীমের হাতকড়াটা খুলে ফেলা হলো।

অসীম বলল—উঃ, বাঁচালেন মশাই! হাতটা যেন খসে পড়ছিল।

অফিসার অসীমের হাতের একটা ছাপ নিলেন। তারপর ছোরার উপরে যে ছাপ ছিল তার সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে লাগলেন।

কিছুক্ষণ পরে গম্ভীর মুখে বললেন—না, আপনাকে বাঁচাবার কোন উপায়ই দেখছি না আমি।

—কেন?

—ছোরার উপর আপনার হাতের ছাপ।

—তা হতে পারে। ছোরা মেরে হত্যাকারী সেটা মেঝের ওপর ফেলে রেখেছিল। আমি সেটা ওভাবে পড়ে থাকতে দেখে তুলে ধরে দেখেছিলাম যে ওটা দিয়েই জমিদারবাবুকে খুন করা হয়েছে কিনা।

—কিন্তু হত্যাকারী বা পৃথক্ কারও হাতের ছাপ ত এতে নেই।

—বুঝতে পারছি ঘটনাচক্র আমার বিপক্ষে। আচ্ছা, এখানকার প্রধান অফিসারের সঙ্গে কি দেখা হতে পারে?

—কেন?

—একটা ফোন করব।

—আচ্ছা চলুন, দারোগাবাবুর কাছে নিয়ে যাই আপনাকে।

—বেশ চলুন। তিনি অনুমতি দিলে...

সে অনুমতি অসীম সহজেই পেল। অসীম তখন ফোন করল তন্দ্রার কাছে। সব কিছু ঘটনা জানিয়ে তার কাছ থেকে সাহায্য প্রার্থনা করল।

কিন্তু এই টেলিফোনই কিভাবে ঘটনাচক্রকে আরও জটিলতার দিকে মোড় ফিরিয়ে দিল, সে সম্বন্ধেই পরবর্তী পরিচ্ছেদগুলোতে আলোচনা চলবে।

ছয়

—আঙ্গুলের ছাপ—

বিখ্যাত প্রাইভেট্ ডিটেকটিভ দীপক চ্যাটার্জীর সুনাম এবং তার আধুনিক উপায়ে উন্নতশ্রেণীর কার্যপদ্ধতির কথা তন্দ্রা জানত।

ইতিমধ্যে হঠাৎ সেদিন পথের মাঝে সেই ঘটনাটিকে উপলক্ষ্য করে দীপকের সঙ্গে তার আকস্মিক পরিচয় ঘটে গেল।

তন্দ্রা তাই ভাবল দীপকের সাহায্য নিলেই তার সবচেয়ে বেশি সুবিধে হবে এ ব্যাপারে।

অসীমের টেলিফোন পেয়ে সেই দিনই সকালে দীপকের সঙ্গে দেখা করে তার সাহায্য প্রার্থনা করল সে।

দীপক সব কিছু শুনে বলল—দেখুন তন্দ্রা দেবী, আপনার কেসটা সত্যিই কৌতূলোদ্দীপক। আমার মনে হয়, এর মধ্যে কোনও জটিল রহস্য লুকানো রয়েছে।

—এ কথা আপনার মনে হলো কেন?

—অনেকটা অনুমান। তবে একটা কথা। যদি আপনার বন্ধুই সত্যিকারের অপরাধী বলে আমি তদন্তের ফলে জানতে পারি তবে তাঁকেও আমি গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হব।

তন্দ্রা হেসে বলল—দেখুন মিঃ চ্যাটার্জী, আমি যতদূর তাকে দেখেছি এবং চিনেছি, তাতে খুন ত দূরের কথা সামান্যতম কোনও দুর্নীতিপূর্ণ কাজ করাও তার দ্বারা অসম্ভব।

—অবশ্য সেটা তদন্ত সাপেক্ষ।

—তা ত বটেই।

—আমি প্রথমেই থানায় গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই। তবে তিনি যদি সত্যি নির্দোষ হন, আমি স্থির নিশ্চয় যে তাঁকে মুক্ত করতে সক্ষম হব!

—আপনার উপরে সে বিশ্বাস আমার আছে মিঃ চ্যাটার্জী। আমি জানি অসীমবাবু একমাত্র আপনার সাহায্যেই মুক্তি পেতে পারেন। যাক্, আপনি আপনার কাজের জন্যে এই অগ্রিম টাকাটা...

—ধন্যবাদ। কাজ শেষ না হলে আমি কখনও অগ্রিম টাকা গ্রহণ করি না তন্দ্রা দেবী।

—ও, আচ্ছা। আমি তাহলে আজকের মতো উঠি। আশা করি সাধ্যমতো আপনি আমায় সাহায্য করবেন।

নমস্কার জানিয়ে তন্দ্রা ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে।

দীপক প্রথমেই গিয়ে দেখা করল দক্ষিণেশ্বর থানার দারোগার সঙ্গে। সেই রাত্রে যে দারোগা তদন্তে বের হয়েছিলেন তাঁর নাম মিঃ প্রামাণিক।

দীপকের নাম শুনেই মিঃ প্রামাণিক তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। তারপর বললেন—আপনি আসামীকে নির্দোষ প্রমাণ করবার চেষ্টা করলেও ঘটনা-পরম্পরায় যে সব কিছু প্রমাণিত হচ্ছে, তাতে কিছুতেই তাকে নির্দোষ প্রমাণ করা সম্ভব নয়।

—পৃথিবীর অনেক অসম্ভব জিনিসই পরে সম্ভব হয়ে দেখা দেয় মিঃ প্রামাণিক।

—অবশ্য আপনার তদন্তের পদ্ধতি আলাদা।

—সে যাই হোক, আসামী কি ধরণের কথা বলছিল তা কি আপনার মনে আছে?

—সে নাকি কার একখানা চিঠি বহন করে নিয়ে গিয়েছিল। ঘরে ঢুকেই সে দেখতে পায় প্রবোধবাবু মৃত অবস্থায় পড়েছিলেন। আর পাশে পড়েছিল রক্তমাখা একখানা ছোরা। সে ছোরাখানা হাতে তুলে নিয়ে দেখতে থাকে, এমন সময় তার মাথায় পেছন থেকে কে যেন আঘাত করে। তার ফলেই সে অজ্ঞান হয়ে যায়।

—আচ্ছা, এখন তার সঙ্গে দেখা করা সম্ভব হবে কি?

—অবশ্যই।

—বেশ, তাহলে তাকে এখানে আনতে বলুন।

মিঃ প্রামাণিকের আদেশে তখনি দুজন পুলিশ কনস্টেবল অসীমকে এনে উপস্থিত করল।

তার দিকে কিছুক্ষণ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে দীপক প্রশ্ন করল—আপনি যে চিঠিটা নিয়ে এসেছিলেন সেটা কে দিয়েছিল আপনাকে?

—দেশবন্ধু পার্কে একজন অচেনা লোক আমার সঙ্গে দেখা করে বলে যে চিঠিটা পৌঁছে দিলেই সে আমাকে পাঁচশো টাকা দেবে। আড়াইশো টাকা সে আমাকে অগ্রিম দিয়েছিল।

—আপনি ঘরে ঢুকেই কি প্রবোধবাবুকে আহত দেখতে পান?

—আহত নয়, মৃত।

—সে রাতে কি খুব দুর্যোগ ছিল?

—হ্যাঁ, ঝড়বৃষ্টি হয়েছিল তার কিছুক্ষণ আগেই।

—বুঝেছি। আচ্ছা, তন্দ্রা দেবীর সঙ্গে আপনার পরিচয় কতদিনের?

—মাস তিনেক ত বটেই।

—হুঁ, আচ্ছা আপনি যেতে পারেন।

অসীম চলে গেলে দীপক মিঃ প্রামাণিকের দিকে চেয়ে বলল—চলুন এবার ঘটনাস্থলের দিকে গিয়ে ব্যাপারটার মোটামুটি আরও কিছু তদন্ত করা যাক।

মিঃ প্রামাণিকের সঙ্গে দীপক যাত্রা করে প্রবোধবাবুর বাগানবাড়ির দিকে।

ঝির্ ঝির্ করে বৃষ্টি পড়ছিল।

সেই বৃষ্টি আর আব্ছা আঁধার ভেদ করে দীপকের মোটর ছুটে চলল সোজা জমিদার প্রবোধ সমাদ্দারের বাড়ির দিকে। বাড়ির দেউড়ি পার হয়ে মোটর এসে থামল। তার সঙ্গে ছিলেন দারোগা মিঃ প্রামাণিক আর সহকারী রতনলাল।

দারোগা মিঃ প্রামাণিককে দেখে দারোয়ান লছমন সিং একটা লম্বা সেলাম ঠুকে বলল—আবার এলেন যে দারোগাবাবু?

দারোগা মিঃ প্রামাণিক বললেন—কিছু তদন্ত বাকী ছিল, তাই শেষ করতে এলাম লছমন সিং। বাবুর ঘরটা একবার খুলে দাও ত।

কথা শেষ হবার আগেই ভিতর থেকে মিষ্ট কণ্ঠে কে যেন প্রশ্ন করল—কে এলো লছমন সিং?

প্রবেশ করল একটি নারী।

দীপক কিছু বলবার আগেই মিঃ প্রামাণিক বললেন—ইনিই মিস্ বীণা সমদ্দার। আর ইনি বিখ্যাত গোয়েন্দা দীপক চ্যাটার্জী। এই কেসটার বিষয়ে এঁর কিছুটা কৌতূহল আছে।

—দীপক চ্যাটার্জী! নাম শুনেছি বটে। কিন্তু বাবার হত্যাকারী ত ধরা পড়েই গেছে।

—কিন্তু দীপকবাবুর ধারণা এই কেসে আরও কিছু নিগূঢ় রহস্য লুকানো আছে। তাই তিনি কৌতূহলী হয়ে...

মিস্ সমাদ্দার বললেন—তাই নাকি? আশ্চর্য ত!

—না, আশ্চর্যের কিছু নয় মিস্ সমাদ্দার। ওটা আমার অনুমান। অবশ্য সত্য না হতেও পারে।

—বেশ বেশ। আমি শুনে সত্যিই সুখী হলাম মিঃ চ্যাটার্জী। আমি চাই বাবার হত্যাকারী ধরা পড়ে শাস্তি পাক। কিন্তু যে লোক ধরা পড়েছে সে অপরাধী নয়, আপনার ওরূপ ধারণার কাবণ কি মিঃ চ্যাটার্জী?

—অবশ্য আমি স্থিরনিশ্চয় নই। আচ্ছা আপনাকে এখন আর বিরক্ত করব না। আপনি আপনার বাবার প্রাইভেট্ সেক্রেটারী মিঃ শর্মাকে পাঠিয়ে দিন বরং। আমি এদিকে সব দেখছি।

—বেশ বেশ। সে ত ভাল কথা।

মিস্ বীণা সমাদ্দার আর কথা না বাড়িয়ে ধীরগতিতে অদৃশ্য হয়ে যায়।

সেদিকে চেয়ে দীপক বলে—চলুন মিঃ প্রামাণিক, এবার যে ঘরে ঘটনাটা ঘটেছিল সেদিকেই যাওয়া যাক।

ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে সব কিছু তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান করল দীপক। কোথাও কোনও অসাধারণ কিছু দেখা গেল না। টেবিলের ওপর একখানা বই খোলা অবস্থায় পড়েছিল।

হঠাৎ দীপক জোরে বলে উঠল—ইউরেকা! আই হ্যাভ্ গট্ দি ক্লু।

মিঃ প্রামাণিক বোকার মতো চেয়ে প্রশ্ন করলেন—কি পেয়েছেন মিঃ চ্যাটার্জী?

—এই দেখুন, বইয়ের দু'পাতায় রক্তের দাগ।

—তাতে কি প্রমাণ হয়?

—ওইখানে বসে বই পড়তে পড়তে তিনি নিহত হন।

—তাতে আর আশ্চর্য কি আছে?

—খুন হবার সময় তিনি জেগে ছিলেন। আর জানালাটা ঠিক তাঁর সামনে। তাই জানালা দিয়ে অপরিচিত লোক ঢুকলে তিনি নিশ্চয়ই বাধা দিতেন। তা হলে খুনী নিশ্চয়ই পরিচিত কেউ।

—কিন্তু তা হলে ত ছোরার উপর অসীমের সঙ্গে খুনী লোকের হাতের ছাপও থাকবে।

—দস্তানা পরলেই হাতের ছাপ পড়বে না, মিঃ প্রামাণিক।

—তা হলে খুনী ত খুব ধূর্ত!

—অবশ্যই। চলুন এবার জানালার দিকে দেখা যাক।

জানালাটা পরীক্ষা করে দেখে দীপক বলল—সেদিন ছিল বৃষ্টি। তাই জানালার শার্সিতে হাতের ছাপ। হুঁ, ওই বেঁটেটা দেখছি বটে অসীমের ছাপ। কিন্তু ওই লম্বাটা?

—তাই ত! এতটা ত খেয়াল করিনি!

রতনের দিকে চেয়ে দীপক বলল—শীগ্‌গির কাছাকাছি কোনও ফটোগ্রাফারকে ডেকে নিয়ে আয় ত। এটা এন্‌লার্জ করে প্রিণ্ট নিতে হবে।

রতন ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

দারোগা মিঃ প্রামাণিকের দিকে চেয়ে দীপক বলল—কেসটা বড় জটিল মিঃ প্রামাণিক। আপনি যদি এতে সফল হন, তবে আপনার সুনাম বৃদ্ধি ও পদোন্নতি অবশ্যম্ভাবী।

—সে আপনারই দয়া মিঃ চ্যাটার্জী।

দীপক কি বলতে যাচ্ছিল। কথা আরম্ভ হবার আগেই শোঁ করে একখানা ছোরা তার কানের কাছ দিয়ে পেরিয়ে গিয়ে খট করে দেয়ালে বিদ্ধ হলো।

দীপক মাথাটা নামিয়ে রিভলবার বের করল।

জানালার পাশে ছায়ামূর্তি।

ধপ্!

লোকটা অদৃশ্য হলো।

—কে মিঃ চ্যাটার্জী?

—ওকে ধরুন মিঃ প্রামাণিক।

মিঃ প্রামাণিক ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেলেন।

কিন্তু ততক্ষণে লোকটির কোনও চিহ্ন পাওয়া গেল না।

—ও কে মিঃ চ্যাটার্জী?

—নিশ্চয়ই হত্যাকারীর অনুচর।

ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল মিস্ বীণা সমাদ্দার আর মিঃ শর্মা।

—মিঃ চ্যাটার্জী, কি ব্যাপার? প্রশ্ন করে বীণা।

—ব্যাপার সামান্য। শুধু একখানা ছোরা।

—সে কি?

—হ্যাঁ, আমাকে লক্ষ্য করে ছোঁড়া হয়েছিল।

—কে ছুঁড়ল? মিঃ শর্মা প্রশ্ন করলেন।

—যাদের কাজে আমি বিঘ্ন ঘটাচ্ছি।

—অর্থাৎ?

—হত্যাকারীর অনুচর।

—আশ্চর্য ত!

—হ্যাঁ, আশ্চর্য বটে! তবে এটুকু বুঝলাম আমি সঠিক পথেই অগ্রসর হচ্ছি। না হলে এ ধরণের আক্রমণের সম্মুখীন আমাকে হতে হতো না মিঃ শর্মা।

দীপকের স্বর সারা ঘরের মধ্যে গম্ গম্ করে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

সাত

—ধাত্রী সুনন্দা—

একটু পরেই একজন ফটোগ্রাফারকে সঙ্গে নিয়ে রতনলাল প্রবেশ করল। দীপক তাকে শার্সির উপরের দুটি ছাপেরই ফটো নিতে নির্দেশ দিল। ফটো নেওয়া শেষ হলে দীপক মিঃ শর্মাকে বলল—আপনার সঙ্গে গোটাকয়েক কথা বলতে চাই মিঃ শর্মা।

—অবশ্যই।

—একটু নিভৃতে।

—বেশ, চলুন পাশের ঘরে যাওয়া যাক্।

পাশের ঘরে গিয়ে মিঃ শর্মার দিকে চেয়ে দীপক প্রথম প্রশ্ন করল—আপনি কতদিন কাজ করছেন এখানে?

—দু' বছর।

—এর আগে?

—অন্যত্র চাকরী করতাম।

—বীণা দেবীই কি সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী?

—তাই ত হওয়া উচিত।

—উনি ছাড়া মিঃ সমাদ্দারের আর কে কে আত্মীয় আছেন?

—দুজন দূরসম্পর্কীয় ভাগ্নে। তারা বিদেশে থাকে।

—তারা কিছু পাবে না?

—কিছু কিছু অবশ্য পেতে পারে। আমি উইল ত জানি না।

—ওঁর উইলটা কার কাছে আছে তা কি জানা আছে আপনার?

—হ্যাঁ, ওঁর অ্যাটর্ণী মিঃ পালিতের অফিসে।

—আচ্ছা, মিঃ সমাদ্দারের কি কোনও শত্রু ছিল?

—সেরকম ত দেখি না।

—ওঁর পুরোনো জীবন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানেন কি?

—তেমন বিশেষ কিছু না।

—কোনও নিকটতম বন্ধুকে চেনেন?

—না, তেমন কেউ নয়।

—আচ্ছা, বীণা দেবীর মা মারা যান কতদিন?

—তা প্রায় কুড়ি বছর। উনি তখন তিন বছরের মেয়ে।

—ওঁকে তা হলে মানুষ করে তোলে কে?

—সুনন্দা নামে এক ধাত্রীর কাছে ও মানুষ।

—সে এখন কোথায় থাকে?

—তার বর্তমান ঠিকানা জানি না।

—আচ্ছা, মিঃ সমাদ্দারের সমস্ত সম্পত্তির পরিমাণ কত হবে বলে মনে হয় আপনার?

—প্রায় পঞ্চাশ লাখ মতো হবে।

—আচ্ছা, এতেই আমার আপাতত চলবে। পরে কিছু জানবার প্রয়োজন হলে সাহায্য অবশ্যই পাব, কি বলেন?

—হ্যাঁ, সে ত নিশ্চয়ই।

দীপক ঘর ছেড়ে বেরিয়ে মোটরে চড়ে বসে।

পরদিন সকালে দীপক হানা দিল অ্যাটর্ণী মিঃ পালিতের অফিসে।

মিঃ পালিত কি একটা কাজে ব্যস্ত ছিলেন! দীপক কার্ড পাঠিয়ে দিতেই মিঃ পালিত তাকে ডেকে পাঠালেন।

—নমস্কার মিঃ চ্যাটার্জী!

—নমস্কার মিঃ পালিত!

—তারপর হঠাৎ কি প্রয়োজন?

—প্রয়োজনটা জরুরী। আশা করি সদুত্তর পাব।

—সাধ্যমতো চেষ্টা অবশ্যই করব। কিন্তু বিষয়টা কি?

—মিঃ সমাদ্দারের হত্যাব্যাপার নিয়ে।

—কিন্তু খুনী ত ধরা পড়েছে।

—ধরা পড়লেও আমরা ঠিক নিঃসন্দেহ নই। সে রকম প্রমাণও পাইনি। তাই সুবিধার জন্যে...

—বেশ, কি জানতে চান বলুন।

—প্রথম কথা, মিঃ সমাদ্দারের মৃত্যুর পর ওঁর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবেন কে কে?

—এটা গোপনীয় কথা।

—কিন্তু দিন তিনেকের মধ্যেই ত সংবাদপত্রে বের হবে।

—বেশ, বলতে আপত্তি নেই। তাঁর একমাত্র মেয়ে বীণা সমাদ্দারই হচ্ছেন ওঁর সম্পত্তির পঁয়তাল্লিশ লাখ টাকার উত্তরাধিকারিণী।

—আর বাকিটা?

—সে ওঁর দুই ভাগ্নে, চাকর, সেক্রেটারী ইত্যাদির মধ্যে কিছু কিছু করে ভাগাভাগি হবে।

—কি ধরণে?

—ভাগ্নেরা প্রত্যেকে দুই লাখ করে পাবে। আর সব দশ হাজার বিশ হাজার—এম্‌নি আর কি!

—আপনার অংশে কি পরিমাণ...

—আমি পাব তিন হাজার। সামান্যই বলতে পারেন...

—তা ত বটেই।

কথা শেষ হলো না। হঠাৎ শোনা গেল বাইরে তুমুল বচসা। একটি গম্ভীর নারীকণ্ঠ তন্দ্রাকে লক্ষ্য করে বলল—বিরক্ত করোনি বাপু। আমায় এখুনি অ্যাটর্ণী সাহেবের সঙ্গে দেখা করতেই হবে।

তন্দ্রা বলল—কিন্তু তিনি এখন ব্যস্ত।

—ওসব বাজে কথায় অন্য লোককে ভুলিও, আমাকে নয়।

—কিন্তু আপনি ত পরেও দেখা করতে পারেন।

—না না, আমার প্রয়োজন জরুরী। সরে যাও এখান থেকে।

কথার শেষে দীর্ঘাঙ্গী এক প্রৌঢ়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে মিঃ পালিতের দিকে চেয়ে বলল—তোমার ওই মেয়েটা আমাকে আট্‌কাতে চায়! সাহস ত কম নয়!

মিঃ পালিত বললেন—আহা, অত চটে উঠছ কেন?

—চটবো না! এই লোকটা আবার কে হে? এসব লোককে হটাও। তোমার সঙ্গে জরুরী কথা আছে।

মিঃ পালিতের মুখ যেন পাংশুবর্ণ ধারণ করল। তিনি উঠে গিয়ে মহিলাটির কানে কানে কি যেন কথা বললেন। মহিলাটি সে কথা শুনে একবার আড়চোখে দীপকের দিকে তাকাল, তার সমস্ত তেজ যেন একমুহূর্তে মিইয়ে গেছে।

ধীরে ধীরে ঘর ছেড়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল সে।

মহিলাটি বাইরে যেতেই দীপক মিঃ পালিতকে প্রশ্ন করল—ও মেয়েটির নাম কি, মিঃ পালিত?

—দেখুন না, অত্যন্ত অসভ্য। বার দুয়েক এসেই যেন একেবারে মজা পেয়ে গেছে, সুনন্দা না কি যেন নামটা...

—সুনন্দা...ও...আচ্ছা চলি মিঃ পালিত। আপনি ওর সঙ্গে কথা বলুন। আমার কাজ আপাতত শেষ হয়েছে।

মিঃ পালিতকে কথা বলবার অবকাশ মাত্র না দিয়ে দীপক ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়।

আট

—ঘটনাচক্র—

পরদিন সকালে লালবাজার থেকে রিপোর্ট পাওয়া গেল যে মিঃ সমাদ্দারের ঘরের শার্সিতে যে হাতের ছাপ পাওয়া গেছে তা হচ্ছে ভূতপূর্ব একজন পুলিশ ইন্‌ফর্মার মনোহর দেশাইয়ের।

খবরটা দীপককে চঞ্চল করে তুলল। সে তক্ষুণি লালবাজারে গিয়ে সোজা ইন্‌স্পেক্টর মরিসনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করল।

ইন্‌স্পেক্টর মরিসন হঠাৎ দীপককে দেখে অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন—কি খবর মিঃ চ্যাটার্জী?

—খবর সামান্যই।

—তবু?

—দু-একটা ব্যাপার জানতে ইচ্ছা করি বলেই...

—ও বুঝেছি। তবে বিষয়টা কি?

—জমিদার প্রবোধবাবুর হত্যার মামলাটা নিয়ে...

—কি জানতে চান?

—মনোহর দেশাই আগে পুলিশের ইন্‌ফর্মার ছিল?

—হ্যাঁ।

—ওর বাড়িটা কোথায়?

—নন্দনবাগান বস্তি, শ্যামবাজার।

—পুলিশের চাকরী ছাড়ল কেন, তা কি বলতে পারেন?

—হ্যাঁ। একবার গুণ্ডার দ্বারা আক্রান্ত হয়ে...

—বুঝেছি। লোকটার সম্বন্ধে সন্দেহের কিছু আছে না কি?

—মনে হয় না।

—কেন?

—শুনেছি দু-একটা ব্ল্যাকমেল ও করেছে। তবে তার বেশি এগিয়েছে বলে মনে হয় না আমার। তা ছাড়া...

—কি বলুন...

—ও-খুনে ওর স্বার্থই বা কি!

—সত্যি কথা।

—তবে সে যে খুনটা জানালার আড়াল থেকে প্রত্যক্ষ করেছে এমন হতে পারে।

—হুঁ।

—আর কিছু জানতে চান?

—না। আমি প্রথমে দেখা করতে চাই মনোহর দেশাইয়ের সঙ্গে। তারপর মিস বীণা সমাদ্দারের ধাত্রী সুনন্দার সঙ্গে।

—কতদূর এগোলেন কেসটা নিয়ে?

—দিন তিনেকের মধ্যে শেষ করে ফেলব মনে হয়। আচ্ছা চলি মিঃ মরিসন। নমস্কার!

পথে পা দিয়ে দীপক একটা ট্রামে করে সোজা নন্দনবাগানে গিয়ে হাজির হলো। গাড়ি নিয়ে গেল না। কারণ সেক্ষেত্রে ব্যর্থ হবার সম্ভাবনা বেশি।

নন্দনবাগান বস্তিতে পৌঁছে দীপক খোঁজ করল মনোহর দেশাইয়ের বাড়িটা। কিন্তু বাড়িতে গিয়ে দীপক অবক হলো। বাড়ি খাঁ খাঁ করছে। কেউ নেই।

দীপক কড়া নাড়ল। কেউ উত্তর দিল না।

দীপক আশেপাশের বাড়িতে খোঁজ করতেই দুজন অশিক্ষিত লোক বেরিয়ে এলো। দীপক বলল—মনোহর বাড়ি নেই। ও কোথায় গেছে বলতে পার?

—কোথায় গেছে বলতে পারি না বাবু, তবে...

—তবে?

—কাল বেরিয়েছে একটা গাড়িতে করে।

—গাড়িতে করে? কখন?

—সন্ধ্যা ছটায়।

—কার গাড়ি সেটা?

—তা ত জানি না।

—এ ধরণের গাড়িতে কি মনোহর প্রায়ই চড়ে থাকে?

—না বাবু।

—বুঝলাম। তারপর সে আর ফিরে আসেনি?

—না।

—আচ্ছা, গাড়িটা দেখতে কেমন?

—খয়েরী রঙের পুরোনো অস্টিন।

আর কথা না বাড়িয়ে দীপক সোজা থানায় পৌঁছল। সেখানে গিয়ে যে খয়েরী রঙের অস্টিনে করে মনোহর দেশাইকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে সেটি খুঁজে বের করবার জন্যে চারদিকে খবর পাঠাল।

কিন্তু তবু কোনও খোঁজ পাওয়া গেল না।

খোঁজ পাওয়া গেল বিকেলের দিকে।

হাবড়া থেকে খবর এলো একটা গাড়ির মধ্যে একজন লোকের মৃতদেহ পাওয়া গেছে। তার দেহের যা বর্ণনা শোনা গেল তাতে স্পষ্টই বোঝা যায় যে ওই লোকটিই মনোহর দেশাই।

দীপক খবরটি শুনে হতভম্ব হয়ে পড়ল। সে যেদিক থেকেই অগ্রসর হচ্ছে, সেদিকেই শুধু ব্যর্থতা।

শত্রুপক্ষের বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা দেখে অবাক হলো সে।

নয়

—হত্যা ও ষড়যন্ত্র—

মনোহর দেশাইয়ের আকস্মিক মৃত্যু দীপককে যে পরিমাণ বিস্মিত করে তুলল, ঠিক সেই পরিমাণে চিন্তিতও হয়ে পড়ল সে। তার প্রথম কাজ হলো মিস্ বীণা সমাদ্দারের ধাত্রী সুনন্দার সঙ্গে দেখা করা। সেদিন সুনন্দার সঙ্গে অ্যাটর্ণী মিঃ পালিতের কথাবার্তা তার কাছে রহস্যজনক বলেই বোধ হয়েছিল।

সন্ধ্যার কিছু আগে দীপক গাড়িতে করে রওনা হলো বরাহনগরের দিকে তেঁতুলতলায় একটা বস্তিতে ধাত্রী সুনন্দার বাড়ির উদ্দেশে।

কিন্তু বাড়িখানার সাম্‌নে পৌঁছে দীপক একটু হতভম্ব হয়ে পড়ল। বাড়ির ঠিক সাম্‌নে অজস্র লোকের ভিড়। দুজন কনস্টেবল ভিড় নিয়ন্ত্রণ করছে।

দীপক সাম্‌নে গিয়ে একজন কনস্টেবলের কাছে নিজের পরিচয় দিতেই সে একটা লম্বা সেলাম ঠুকে বলল—এই বাড়ির মধ্যে একটা মেয়েলোক মারা গেছে, হুজুর।

—মেয়েলোক?

—হ্যাঁ, সুনন্দা না কি যেন নাম।

—আশ্চর্য! কখন মারা গেল সে?

—আজ দুপুরে তার বাড়িতে গিয়ে একজন লোক দেখতে পায় তার গলায় ফাঁসি, সে একটা উঁচু জায়গা থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছে।

—কিন্তু হঠাৎ এইভাবে নিজেকে ফাঁসি দেবার কোনও কারণ ত নেই। নিশ্চয়ই অন্যভাবে একে মেরে এইভাবে রাখা হয়েছে। সহকারী রতনের দিকে চেয়ে দীপক বলল।

ঘরের মধ্যে সার্চ করে বিশেষ কিছু পাওয়া গেল না। দীপক রতনকে বলল—এরা যেন প্রতিটি পদে ঠিক আগের মুহূর্তে এসে প্রমাণটা লুপ্ত করে দিচ্ছে। কিভাবে যে প্রমাণ সংগ্রহ করব, তা আমার ধারণার বাইরে।

দীপকের মনের চিন্তা তার মুখের রেখায় কিন্তু ফুটে উঠল না। তার নির্বিকার ভাব দেখে কিন্তু মনে হয়, ভেতরে ভেতরে সে নিশ্চয়ই কোনও প্রমাণ সংগ্রহ করেছে।

দীপকের গাড়ি সেখান থেকে বের হয়েই এগিয়ে চলল থানার দিকে।

থানা থেকে কিছুটা দূরে একটা জঙ্গল। জঙ্গলের ঠিক সাম্‌নে এসে দীপকের গাড়ির টায়ার হঠাৎ বিরাট একটা শব্দ করে ফেটে গেল।

দীপক গাড়ি থেকে নেমে দেখল একটা বড় কাঁচের টুকরো তার গাড়ির টায়ারের মধ্যে প্রবেশ করে ওটাকে বিদীর্ণ করেছে। দীপক রতনকে বলল—থানা থেকে দারোগা মিঃ প্রামাণিককে ডেকে নিয়ে আয় ত!

রতন বলল—কিন্তু আমি দেখছি এখানে অজস্র কাঁচের টুকরো ছড়ানো। নিশ্চয়ই আমাদের এখানে আট্‌কাবার জন্যেই এভাবে কাঁচ ছড়ানো হয়েছে। এভাবে তোর একা থাকাটা ঠিক নিরাপদ নয়।

দীপক হেসে বলল—তোর কোনও ভয় নেই রে। আমি কখনই নিজেকে বিপদে ফেলে কিছু করব না। এখানে শীগ্‌গিরই কোনও একটা দৃশ্যের অভিনয় হবে।

রতন অগত্যা জোরে জোরে থানার দিকে চলল। দীপক গাড়ির পাদানিতে ভর দিয়ে সোজা হয়ে যেন কার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল।

রতন ফিরল আধঘণ্টার মধ্যেই।

সঙ্গে দারোগা মিঃ প্রামাণিক।

কিন্তু কোথায় দীপক চ্যাটার্জী?

—দীপক, দীপক!

—দীপকবাবু! মিঃ চ্যাটার্জী!

কোনও উত্তর নেই।

বাতাসে পাওয়া গেল বারুদের গন্ধ। রতন বলল—একটু আগেই এখানে গুলি চলেছে মিঃ প্রামাণিক।

—তা ত বুঝতে পারছি।

—কিন্তু দীপক কোথায় গেল?

—তাঁকে ত দেখা যাচ্ছে না।

—চলুন ওই জঙ্গলটার ভেতরে খুঁজে দেখা যাক।

—কিন্তু এত রাত্রে?

—যদি ও আহত হয়ে ওধারে পড়ে থাকে!

রতনের স্বরে উৎকণ্ঠা।

কিন্তু কোথায় দীপক? বোধ হয় তার দেহটা শেয়াল কিংবা অন্য কোনও জন্তু টেনে নিয়ে গেছে। অথবা আততায়ীরাই তাকে বন্দী করে রেখেছে। কিন্তু তার এই আকস্মিক অন্তর্ধানের পেছনে রহস্য কি?

রতন ফিরে এসে খবরটা লালবাজারে জানাল।

সর্বত্র সুরু হয়ে গেলো কর্মচঞ্চলতা। কিন্তু দীপকের সন্ধান পাওয়া গেল না।

দশ

—তন্দ্রার বিস্ময়—

তন্দ্রা ঠিক দশটার মধ্যেই অ্যাটর্ণী মিঃ পালিতের অফিসে এসে উপস্থিত হয়ে থাকে।

সেদিনও অন্য দিনের মতো সে দশটার মধ্যেই উপস্থিত হয়েছিল। অফিসে উপস্থিত হয়ে সে দেখতে পেল মিঃ পালিত তখনও এসে পৌঁছাননি।

তন্দ্রা সোজা তার ঘরে গিয়ে বসল। একজন দারোয়ান এসে তার হাতে একটা চিঠি দিয়ে গেল।

—কে দিলে চিঠি?

—আমাদের অফিস থেকে এসেছে।

—তোমাদের অফিসের নাম কি?

—সেনগুপ্ত অ্যাণ্ড কোং, অ্যাটর্ণী অফিস।

তন্দ্রা দেখল চিঠির উপরে নাম লেখা—তন্দ্রা দেবী সমীপে।

তন্দ্রা অবাক্ হয়ে ভাবল—একি আশ্চর্য ব্যাপার! সে একখানা পিওন বুকে সই করে দারোয়ানকে বিদায় দিল।

তারপর চারদিকে চেয়ে দেখল একবার।

অফিস ফাঁকা, কেউ কোথাও নেই।

চিঠিটা খুলে পড়তে লাগল সে।

তাতে লেখা ঃ

তন্দ্রা দেবী সমীপে,

আমাদের মক্কেল শ্রীযুক্তা সুনন্দা দেবী তাঁর মৃত্যুর দিন এই চিঠিখানা আমাদের দিয়ে যান। এটার মুখ বন্ধ ছিল এবং এখনও বন্ধ আছে। তিনি বলেন, কোনও কারণে তাঁর মৃত্যু হলে এটি আপনার কাছে পৌঁছে দিতে হবে। আমরা সেই কর্তব্য পালন করেছি। চিঠিতে কি লেখা আছে তা আমরা জানি না। যদি এ ব্যাপারে আপনার কিছু বলবার থাকে তা হলে পরে আমাদের কছে জানাবেন। পত্র প্রাপ্তি স্বীকার করে আমাদের দায়মুক্ত করবেন।

ইতি—

ম্যানেজার,

সেনগুপ্ত অ্যাণ্ড কোং, অ্যাটর্ণী অফিস।

বিস্মিত তন্দ্রার মুখ দিয়ে কথা ফুটল না। একি বিস্ময়ের ব্যাপার! কি অদ্ভুত প্রহেলিকা!

তন্দ্রা চিঠি পড়ে চলল।

প্রতি ছত্রে তার বিস্ময়ের ভাব বৃদ্ধি পেতে লাগল।

আশ্চর্য হয়ে সে শুধু ভাবতে লাগল, এও কি সম্ভব?

ধীরে ধীরে তন্দ্রা উত্তেজিত হয়ে উঠল। চিঠিতে লেখা আছে, মৃত প্রবোধ সমাদ্দারের মৃত্যুর কারণ...অসীমের নির্দোষিতার কথা...কে কে এই ষড়যন্ত্রের মূলে আছে তাদের খবর...মনোহর দেশাইয়ের মৃত্যুর কারণ...আর লেখা সুনন্দা দেবীর জীবনও নাকি বিপন্ন!

বিপন্ন? তারপরই সুনন্দা দেবী মারা গেছে! আশ্চর্য! তন্দ্রার সারা দেহের উপর দিয়ে যেন বিদ্যুৎ-স্রোত বয়ে গেল।

পেছনে পদশব্দ।

—কে?

চিঠিটা লুকোবার চেষ্টা করে তন্দ্রা।

—শয়তানি! তুই তা হলে সবকিছু জেনেছিস!

তন্দ্রার দু'চোখে বিস্ময়! এই তা হলে এর পরিচয়?

তন্দ্রার গলাটা টিপে ধরল সে সজোরে।

তন্দ্রা আর্তনাদ করে উঠে জ্ঞান হারাল।

এগারো

—ছদ্মবেশী আততায়ী—

পরদিন কল্‌কাতার প্রত্যেকটি কাগজে বেশ বড় বড় অক্ষরে বের হলো যে সংবাদটি তাতে নগরীর বুকের ওপর দিয়ে যেন বিস্ময়ের ঢেউ বয়ে গেল।

গোয়েন্দা দীপক চ্যাটার্জী অজ্ঞাত

আততায়ীর হাতে নিহত!

বনের মধ্যে মৃতদেহ প্রাপ্তি!

হত্যাকারীর সন্ধানে পুলিশ বিভাগের ব্যর্থ প্রচেষ্টা!

শহরের বুকে বিস্ময়ের ঢেউ!!

দেখতে দেখতে সেদিনের খবরের কাগজের বিক্রীর সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হয়ে দাঁড়াল। প্রত্যেকের মুখে মুখে ফিরতে লাগল গোয়েন্দা দীপক চ্যাটার্জীর এই আকস্মিক মৃত্যুর সংবাদ।

শহরের সর্বত্র শোকের প্রবাহ বইতে সুরু করলেও লালবাজার থানায় কিন্তু কর্মচাঞ্চল্য বৃদ্ধি পেল।

লালবাজার থেকে ইন্‌স্পেক্টর মরিসন দক্ষিণেশ্বর থানায় কি যেন সব নির্দেশ প্রেরণ করলেন। তারপর কিছুক্ষণ পরে ওই নির্দেশের উত্তরে যে খবর ভেসে এলো তার উত্তরে তিনি আরও কি সব জানালেন।

দীপক চ্যাটার্জীর সহকারী রতনলালের কাছে সংবাদপত্রের রিপোর্টাররা এসে ভিড় জমাতে লাগল।

কিন্তু এই আকস্মিক শোকপূর্ণ সংবাদে রতন এমন বিমূঢ় হয়ে পড়েছিল যে সে কোনও কথাই বলতে পারল না।

তবে তার কাছে যেটুকু জানা গেল, প্রত্যেকটি খবরের কাগজে সেই খবরই ছাপাল ফলাও করে।

নগরের লোকেরা সব কৌতূহলী হয়েছিল। তারা খবরটা নিয়ে নানাধরণের জল্পনা-কল্পনা শুরু করে দিল।

নগরের লোকজন যখন এই ভীষণ হত্যাকাণ্ডের সংবাদে চঞ্চল ও উদ্‌ভ্রান্ত তখন এই সংবাদ শুনে একজনের বীভৎস মুখে যেন হাসির প্রবাহ খেলে গেল।

লোকটি একটি ভাঙা কুঁড়েঘরের সাম্‌নে দাঁড়িয়েছিল।

বিশ্রী একটা আবহাওয়া যেন সেই অঞ্চলটার চারদিকে ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে। ঘরের মধ্যে পূর্বদিনের ভুক্তাবশিষ্ট কতকগুলো হাড় পড়ে আছে।

লোকটার নাম হারাণ উজবেগ।

সে জমিদার প্রবোধ সমাদ্দারের বাড়িতে মালীর কাজ করে। তবে তাঁর বাড়ি থেকে অনেকটা দূরে এই বস্তিতে থাকে সে।

আগের দিনে বোধ হয় শূকর মারা হয়েছিল।

বাতাসে বিশ্রী দুর্গন্ধ।

হারাণ বসে বসে কি যেন ভাবছিল। তার কদর্য মুখ থেকে সরে গিয়েছিল চিন্তার ছায়া।

কড়াটা নড়ে।

—কে?

—আমি।

—বুঝেছি। ভেতরে এসো।

—না হে, ভেতরে যা দুর্গন্ধ! তুমি বাইরে এসো।

হারাণ বাইরে বেরিয়ে এলো। তার দিকে চেয়ে আগন্তুক বলল—ওই মেয়েটাকে অজ্ঞান করে বাক্সে রাখা হয়েছে, তুমি ওকে মাটিতে পুঁতে ফেলবে।

—আচ্ছা হুঁজুর।

—কাল টাকাটা পাবে। বুঝেছ?

—আচ্ছা।

—কাজ যেন ঠিক করা হয়। আর গতবারে তুমি যা হাতের টিপ্ দেখিয়েছ তাতে আমি, সত্যি খুশি হয়েছি।

লোকটি চলে যায়।

হারাণ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে।

বারো

—গ্রেপ্তার—

পরদিন বেলা দশটা।

একদল পুলিশ এসে অ্যাটর্ণী মিঃ পালিতের অফিসে হানা দিল।

মিঃ পালিত বেরিয়ে এসে প্রশ্ন করলেন—কাকে চান আপনারা?

—আপনাকেই।

—আমাকে?

—হ্যাঁ।

—কি প্রয়োজন?

—হত্যাকাণ্ডে সহায়তা করার অভিযোগ আছে আপনার বিরুদ্ধে।

—সেকি!

—হ্যাঁ, আমাদের অপরাধ মার্জনা করবেন মিঃ পালিত। রামভকত সিং, হাতকড়া লাগাও।

—এর জন্যে আপনাকে কিন্তু পরে অনুতাপ করতে হবে মিঃ মরিসন।

—ধরা পড়লে সকলেই একথা বলে থাকে মিঃ পালিত।

—কিন্তু প্রমাণ?

—প্রমাণ এই চিঠি।

—চিঠি?

—দেখুন। এটি আপনি মৃত জমিদার প্রবোধ সমাদ্দারের বাগানের মালী হারাণ উজ্জবেগকে দিয়েছিলেন।

মিঃ পালিতের মুখ শুকিয়ে গেল।

—আপনি অপরাধ স্বীকার করে স্বীকৃতিপত্র লিখে দিলে আপনার অপরাধ ক্ষমা করা হবে।

—বেশ, আমি স্বীকৃতিপত্র দিতে প্রস্তুত।

—বেশ, তাই দিন, এক্ষুণি।

সেদিনই বেলা তিনটে।

একদল পুলিশ এসে সদলে হানা দিল মৃত জমিদার প্রবোধ সমাদ্দারের বাড়ি।

—কাকে চান? প্রশ্ন করে দারোয়ান লছমন সিং।

—ভেতরে গিয়ে বল ইন্‌স্পেক্টর মরিসন এসেছেন। আমরা মৃত প্রবোধ সমাদ্দারের প্রাইভেট্‌ সেক্রেটারী মিঃ শর্মার সঙ্গে দেখা করতে চাই।

মিঃ শর্মা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলেন একটু পরে।

তাঁর পেছনে মিস্‌ বীণা সমাদ্দার।

মিঃ মরিসন আদেশ দিলেন—মিঃ শর্মা, মিথ্যা পালাবার চেষ্টা করবেন না আশা করি। আপনার বিরুদ্ধে হত্যা ও চক্রান্তের অভিযোগ।

—আমার বিরুদ্ধে?

—হ্যাঁ।

—প্রমাণ?

—এই দেখুন অ্যাটর্ণী মিঃ পালিতের স্বীকৃতিপত্র।

—এটা আমি বিশ্বাস করি না।

—আর এই দেখুন আপনার অনুচর হারাণ উজবেগ...

—হারাণ উজবেগ?

ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল হারাণ।

—শয়তান! গর্জে উঠলেন মিঃ শর্মা।

—হাঃ হাঃ হাঃ! হেসে উঠল হারাণ। তারপর মাথার পরচুলা ও মুখের দাড়ি খুলে ফেলতেই দেখা গেল, এ আর কেউ নয়, এ হচ্ছে স্বয়ং ডিটেকটিভ দীপক চ্যাটার্জী।

—হ্যাঁ, আমি যে মরিনি তা ত দেখতেই পাচ্ছ মিঃ শর্মা, ওরফে দস্যু বলবন্ত খাঁ!

—বলবন্ত খাঁ!

ঘরের মধ্যে যেন প্রবল বিস্ময়েব ঢেউ বয়ে গেল।

—হ্যাঁ, এই সেই নটোরিয়াস্‌ স্মাগ্‌লার, ব্ল্যাকমেলার দস্যু বলবন্ত খাঁ। দীপক সজোরে বলে উঠল।

—শয়তান! স্কাউণ্ড্রেল! বলবন্ত খাঁ রাগে ফুঁসতে লাগল যেন।

দীপক বলে চলল—ওই মেয়েটা, মানে বীণা সমাদ্দার, ও হচ্ছে আর কেউ নয়—ও হচ্ছে মিঃ শর্মা ওরফে দস্যু বলবন্তের হাতে গড়া মেয়ে।

প্রবোধ সমাদ্দারের আসল মেয়ে হচ্ছেন তন্দ্রা দেবী। তিনি ছেলেবেলা থেকেই মানুষ হয়েছেন গরীবের ঘরে। তারপর মিঃ পালিত তাঁকে চাকরী দিয়ে নিজের কাছে রেখেছে। এর মধ্যেও রয়েছে দস্যু বলবন্তের কারসাজি। তন্দ্রার মা ছেলেবেলায় মারা যান। বলবন্ত আর অ্যাটর্ণী মিঃ পালিত ধাত্রী সুনন্দাকে হাত করেছিল। তারপর জমিদার প্রবোধ সমাদ্দারের

অজ্ঞাতে একটি গরীবের ঘরের মেয়ে বীণা দেবীর সাথে তন্দ্রা দেবীকে বদল করে। তন্দ্রা দেবী সেই গরীবের ঘরেই মানুষ হতে থাকেন, আর বীণা সমাদ্দার প্রবোধ সমাদ্দারের সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী সাব্যস্ত হয়।

একটু থেমে দীপক সুরু করল—হ্যাঁ, বীণা সমাদ্দার ধীরে ধীরে যখন বড় হলো তখন টের পেল যে সে প্রবোধ সমাদ্দারের মেয়ে নয়। তার এ তথ্য জানে দস্যু বলবন্ত খাঁ, ধাত্রী সুনন্দা আর অ্যাটর্ণী মিঃ পালিত। ওরা দুজনও দস্যু বলবন্তের হাতের পুতুল। কাজেই তন্দ্রা দেবী দস্যু বলবন্তের সহযোগিতা করতে রাজী হন। দস্যু বলবন্ত চক্রান্ত করেছিল জমিদার প্রবোধ সমাদ্দারকে হত্যা করে সে দোষ চাপাবে নির্দোষ অসীমের ওপর। তন্দ্রাকে আর ধাত্রী সুনন্দাকে পৃথিবী থেকে সরানো হবে। অ্যাটর্ণী মিঃ পালিতকে এক লক্ষ টাকা দিয়ে হাত করা হবে।

আজ থেকে প্রায় আঠারো-কুড়ি বছর আগে এ রহস্যের জাল বুনতে সুরু করে মিঃ শর্মা ওরফে দস্যু বলবন্ত। আজ তার শেষ।

বীণা সমাদ্দার আর দস্যু বলবন্ত নির্বাক্।

মিঃ মরিসন বললেন—সবই ত বুঝলুম এদিকের ব্যাপার, কিন্তু তন্দ্রা দেবী কোথায়?

দীপক বলল—মিঃ শর্মা ওরফে দস্যু বলবন্ত কাল তন্দ্রাকে ছদ্মবেশী হারাণ উজবেগ, মানে আমার হাতে দিয়ে আসে, তাঁকে পুঁতে ফেলবার জন্যে। উনি একটি কাঠের বাক্সে বন্দিনী ছিলেন।

—কিন্তু ওঁকে হত্যা করবার চেষ্টা করল কেন?

—সম্প্রতি তন্দ্রা দেবী তাঁর সমস্ত পরিচয় জানতে পেরেছিলেন।

—কি করে জানলেন সে সব কথা?

—মৃত্যুর আগে সুনন্দা দেবী চিঠি দিয়ে জানিয়েছিল তাঁকে।

—সে কি?

—হ্যাঁ, চরিত্রের দিক থেকে প্রচুর অধঃপতিত হলেও এতটা অধঃপাতে যায়নি সুনন্দা। তাই শেষ মুহূর্তে ও স্বীকার করে গিয়েছিল সব কিছু।

—কিন্তু সুনন্দা দেবীকে মরতে হলো কেন?

—কারণ আর কিছুই নয়, শেষ মুহূর্তে ও দস্যু বলবন্তের উপরে ব্ল্যাকমেল করতে চেয়েছিল।

—শুধু সেই জন্যেই?

—হ্যাঁ, ঠিক এটুকুর জন্যে সে প্রাণ হারাল।

—আর মনোহর দেশাই মরল কেন?

—বিনয় নামে একটি লোকের হাত দিয়ে বলবন্ত অসীমের কাছে চিঠি পাঠায়। সেই সময় মনোহর তা দেখতে পেয়েছিল। তারপর ঠিক খুনের দিন সে উপস্থিত হয়ে সমস্ত কিছু ঘটনা প্রত্যক্ষ করে।

—এর ভেতর এত চক্রান্ত ছিল?

—হ্যাঁ।

—মিঃ পালিতও কি এসব কথা জানত?

—হ্যাঁ, জানত বলেই ত ব্যাপারটা এতদূর গড়িয়েছে। বলবন্ত তাকে এক লাখ টাকা দিতে রাজী হয়েছিল।

দীপকের কথা শেষ হলো। ইন্‌স্পেক্টর মরিসন দস্যু বলবন্তের হতে হাতকড়া পরিয়ে দেবার জন্যে এগিয়ে গেলেন।

গুড়ুম্! গুম্!

ঘরের ঠিক মাঝখানে একটা প্রচণ্ড শব্দ।

স্মোক্ বম্ব!

ধোঁয়া!

সব ধোঁয়া সরে গেলে দেখা গেল দস্যু বলবন্ত খাঁ অদৃশ্য।

মিঃ মরিসন বীণার হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিলেন। হত্যাকাণ্ডে বলবন্তকে সাহায্য করবার অভিযোগ প্রমাণিত হলো তার বিরুদ্ধে।

মিঃ মরিসন শুধু বললেন—এত করেও শেষ পর্যন্ত বলবন্তকে ধরা গেল না, এটাই আফশোসের কথা।

দীপক বলল—তবে ঘটনার যবনিকাপাত হলো। আর একজন নির্দোষীকে শাস্তির হাত থেকে বাঁচাতে পারলাম এটাও কম কথা নয়।

মিঃ মরিসন বললেন—অফ্ কোর্স!

এমন সময় ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল তন্দ্রা। তার ঠিক পেছনে পেছনে প্রবেশ করল অসীম।

দীপক বলল—তন্দ্রা দেবী, অসীমবাবুর নির্দোষিতা প্রমাণ হলেও কারাগারের বাঁধন থেকে তাঁর মুক্তি নেই!

তন্দ্রা কোনও কথা বলতে পারল না। লজ্জায় মুখখানা রাঙা করে মাথাটা নোয়াল সে।

অসীমের দু'চোখে কৃতজ্ঞতাপূর্ণ দৃষ্টি।

আদালতের বিচারে বীণা প্রবোধ সমাদ্দারের মেয়ে নয় সে কথা প্রমাণিত হলো। প্রবোধ সমাদ্দারের সম্পত্তির মালিক হলো তন্দ্রা দেবী।

কয়েক দিন বাদেই শুভলগ্নে তন্দ্রার সঙ্গে অসীমের শুভ বিবাহপর্বে হলো এ গল্পের সমাপ্তি। দীপক, রতন, ইন্‌স্পেক্টর মরিসন আর দারোগা মিঃ প্রামাণিক সেই বিবাহে উপস্থিত ছিলেন।

—শেষ—

শ্বেতপদ্ম

এক

—ত্রিমূর্তির বৈঠক—

বিকেল ছ'টা।

দীপক তার গাড়িটা নিয়ে একটু বেড়াতে বের হবার জন্যে তৈরী হচ্ছিল।

ক্রিং ক্রিং ক্রিং...

উপরের ঘরে শোনা গেল টেলিফোনের শব্দ।

ডিটেকটিভ দীপক চ্যাটার্জীর সহকারী রতনলাল দোতলার ঘরে বসে ধরল টেলিফোনটা।

টেলিফোনের শব্দ দীপকের কানে এসেছিল। তাই সে আর বের হতে চাইল না। একটু থেমেই বের হওয়া উচিত। শোনা যাক টেলিফোনটা আবার বয়ে নিয়ে এল কিসের বার্তা।

দু'মিনিট।

রতন নেমে এলো একতলায়। গ্যারেজের সামনে দীপক চিন্তিতমুখে দাঁড়িয়ে।

—আজ আর বের হওয়া চলবে না বন্ধু। হাসতে হাসতে বলল রতনলাল।

—কেন রে? কি আবার হলো হঠাৎ?

—ঠিক জানি না। তবে আমাদের দীর্ঘদিনের অভিন্নহৃদয় বন্ধু পুলিশ ইন্স্পেক্টর মিঃ মরিসন দেখা করতে আসছেন।

—কারণ কিছু বলেননি?

—না। শুধু বললেন জরুরী ব্যাপার। আরজেন্ট্। যেখানে যে অবস্থাতেই তুই থাকিস না কেন, তোকে তাঁর এক্ষুণি চাই।

—বেশ। আমি না হয় একটু অপেক্ষাই করি। কি বল?

—শুধু অপেক্ষা নয়, হয়ত আবার নতুন কাজে হাতও দিতে হবে। উঃ, কাজের পর কাজ! একটা কেস্ সলভ্ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আর একটা। এক মুহূর্তও বিশ্রাম নেবার উপায় নেই।

দীপক হেসে বলে—তা ত দেখাই যাচ্ছে। কিন্তু তাই বলে আমাদের বন্ধুর যেন অমর্যাদা না হয়।

—কেন? অমর্যাদা হবার কারণ?

—মানে ভজুয়াকে বলে ভাল খাবার তৈরী করবার ব্যবস্থা করিস। মনে আছে ত, উনি একটু বেশি ডিমের ভক্ত!

এ কথাটা শুনে রতন হো হো করে হেসে উঠল। তারপর বলল—হ্যাঁ, সেইজন্যেই লালবাজারে অনেকে মিঃ মরিসনকে ঠাট্টা করে মিঃ এগ্ বলে ডাকে বটে! কিন্তু আশ্চর্য, এক দিনে পনর-বিশটা ডিম উনি কি করে হজম করেন!

দীপক বলল—অভ্যাস করলে সবই পারা যায় বন্ধু। মানুষ অফুরন্ত শক্তি ও স্বাস্থ্যের অধিকারী হতে পারে, আর ও ত সামান্য ডিম হজম করা!

কথা না বাড়িয়ে ধীরে ধীরে দুজনে ভেতরে চলে যায়।

আধঘণ্টা পর।

দোতলার হলঘরটা ইতিমধ্যেই পরিপাটি করে সাজানো হয়েছিল। দীপক মিঃ মরিসনকে সেখানে নিয়ে গিয়ে বসাল।

চাকর ভজুয়া দু' প্লেট সিদ্ধ ডিম, চারটে ডিমের ডেভিল আর এক পট চা দিয়ে গেল।

এতগুলো ডিমের দর্শন পেয়ে আনন্দিত হলেন মিঃ মরিসন। অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে ডিমগুলো শেষ করে চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বললেন—এবার শুনুন আমার কাহিনী।

দীপক আর রতন মনোযোগ দিল।

মিঃ মরিসন বলতে সুরু করলেন—অনেক দিন ত এ লাইনে আছেন মিঃ চ্যাটার্জী, কিন্তু শ্বেতপদ্ম নামে কোনও এক দুর্দান্ত দস্যুদলের নাম শুনেছেন কি?

দীপক চিন্তিত হলো।

একটু ভেবে বলল—শ্বেতপদ্ম নামটা ভারতের ইতিহাসের অতি-প্রাচীন একটা নাম। সিপাহী বিদ্রোহের সময় এই শ্বেতপদ্ম আর রুটি দিয়ে দেশী সিপাহীদের মধ্যে বিদ্রোহ ছড়ানো হতো। কিন্তু বর্তমানে...

মিঃ মরিসন হেসে বললেন—বর্তমানের শ্বেতপদ্ম হচ্ছে অত্যন্ত শিক্ষিত ও বৈজ্ঞানিক-বুদ্ধিসম্পন্ন একজন লোক।

—সে কি স্যর?

—হ্যাঁ। এরা ইতিপূর্বে ছিল আফগানিস্তান ও পারস্য অঞ্চলে। সে প্রায় দশ বছর আগের ঘটনা।

দীপক চিন্তিত স্বরে বলল—তারপর?

—তারপর দীর্ঘদিন ওরা উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের অরাজক অঞ্চলে নির্বিঘ্নে তাদের ভয়াবহ গুণ্ডামি ও ধ্বংসলীলা চালিয়ে যায়। সবচেয়ে মজা হচ্ছে এই যে, দিনের বেলায় এরা অত্যন্ত সাধারণভাবে সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশে থাকে। তারপর রাত নামবার সঙ্গে সঙ্গেই এরা নিজেদের ভয়াবহ ধ্বংসলীলা সুরু করে দেয়। যখন যে অঞ্চলে এরা কাজ করে, তখন সেখানে এরা আকাশের বুকে জ্বেলে দেয় অদ্ভুত এক লাল আলো। তারপর সেই লাল আলোটা মিলিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে ফুটে ওঠে একটি শ্বেতপদ্মের 'সিম্‌বল্‌'।

—সেটি কি জিনিস?

—সেটা হচ্ছে এই যে, এরা আগেই বুঝিয়ে দেয়, নির্দিষ্ট একটা অঞ্চলে তাদের ধ্বংসলীলা অনুষ্ঠিত হবে।

—কিন্তু আজ পর্যন্ত তাদের দলের কি কেউ ধরা পড়েনি?

—না। এরা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে এমনভাবে ঘুরে বেড়ায় যে এদের সহজে ধরা যায় না। আর দিনের বেলায় দলের সকলে সাধারণভাবে গা-ঢাকা দিয়ে থাকে। সাধারণ নাগরিকদের সঙ্গে মিশে থাকে এরা। তাই কে যে শ্বেতপদ্ম দলের নায়ক পুলিশ শত চেষ্টা করেও তার হদিস পায় না।

—কিন্তু এদের বিষয়ে আপনি এত চিন্তিত কেন?

—চিন্তার কারণ আছে মিঃ চ্যাটার্জী। কিছুদিন আগে জানতে পেলাম এই শ্বেতপদ্ম দল উত্তরপ্রদেশে হানা দিয়েছিল। সেখান থেকে পুলিশের তাড়া খেয়ে ওরা যায় বিহারে। বিহারে

ন' মাসে প্রায় তিন লক্ষ টাকা লুণ্ঠন করেছে ওরা। সম্প্রতি পুলিশের গুপ্ত-বিভাগের ধারণা এই যে, ওরা নাকি কল্‌কাতার বুকে হানা দেবে।

—কিন্তু তেমন কোন প্রমাণ ত...

—প্রমাণ না পেলেও আমাদের তদন্ত চালাতে হবে। এরা সারা ভারতের বুকে এভাবে 'হ্যাভক্' সৃষ্টি করেছে যে এদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করতেই হবে।

—তা ত বুঝলাম। কিন্তু কোনও নির্দিষ্ট কর্মপদ্ধতি অবলম্বন না করলে কারও বিরুদ্ধে এগোনো কত কঠিন তা ত জানেন আপনি!

—জানি নিশ্চয়ই। কিন্তু উপর থেকে চাপ এসেছে সারা কল্‌কাতার সমস্ত সন্দেহজনক জায়গাগুলো সার্চ করতে হবে। এত অল্প সময়ে কি করে তা সম্ভব বলুন? কল্‌কাতায় ত আর একটা-দুটো এ-ধরণের আড্ডা নেই যে...

—আচ্ছা, একটা কাজ করলে হয় না মিঃ মরিসন?

—কি কাজ বলুন।

—আমরা সবদিক থেকে এমনভাবে প্রস্তুত থাকব যে কোথাও কোন অঘটন ঘটবার সঙ্গে সঙ্গেই ওদের দু-একজন পাণ্ডাকে 'ট্র্যাপ্' করতে পারব।

—কিন্তু ওদের দলের পাণ্ডা মাত্র একজন। কিন্তু সে লোকটি কে বা কেমন তার চেহারা তার ভালমত কোনও বিবরণ আজ অবধি মেলেনি। সবদিক থেকে মুস্কিলে পড়েই ত আপনার শরণাপন্ন হয়েছি।

দীপক কিছুক্ষণ কি যেন চিন্তা করে। তারপর বলে—এখনকার মত করবার বিশেষ কিছুই নেই মিঃ মরিসন। তবে যদি কিছু ঘটে আমি সঙ্গে সঙ্গে নিজে যতটা পারি চেষ্টা করব। ওরা যতই চালাক হোক না কেন, সমস্ত পুলিশবাহিনীর আয়ত্তের বাইরে যে সব সময় থাকতে পারবে তা মনে হয় না আমার। কিন্তু হঠাৎ আপনি শ্বেতপদ্মের দলের কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন কেন মিঃ মরিসন?

মিঃ মরিসন বললেন—কতকগুলো এমন ঘটনা নিশ্চয়ই ঘটছে যে জন্যে তাদের খবর দেওয়া আমার বিশেষ প্রয়োজন।

—কিন্তু কি সে ঘটনা? কৌতূহলী দীপক জিজ্ঞাসা করে।

—এখন কোনও কিছু বলবার প্রয়োজন নেই। তবে যদি আমার কথা সত্য হয় তবে সত্বর হয়ত এবিষয়ে আমাকে আপনার সাহায্য গ্রহণ করতে হবে।

দীপক মিঃ মরিসনের কথা শুনে চিন্তিতমুখে তাঁর দিকে তাকায়।

দুই

—আকাশের বুকে রাঙা আলো—

সীমাহারা আকাশের দক্ষিণ কোণে দপ্ করে জ্বলে উঠল একটা রক্তাভ বিজলীর চকিত চমক।

অবাক হয়ে সকলে চেয়ে দেখল সেদিকে। কিসের ওই আলো? কোন্ অজানা, ভয়াল, মৃত্যুর মত করাল, নিয়তির মত দুর্বার, আগামী একটা ধ্বংসের প্রতিবিম্ব উদ্ভাসিত ওই আলোকের শিখায়?

ট্রাম, বাস, হোটেল, রেস্টুরেন্ট, পথচারী—অজস্র, অগণিত জনতার প্রতিটি মানুষের দৃষ্টি পড়েছিল ওদিকে। ভাবতে লাগল সবাই। এই নির্মেঘ, নির্মুক্ত আকাশে ওই বিদ্যুৎশিখা এলো কোথা থেকে?

আর বিদ্যুতের ঝলক ত কখনও ওরূপ রক্তাভ শিখায় জ্বলে ওঠে না। তবে কি সৃষ্টি ধ্বংসের পথে চলেছে?

তবে কি বিশাল কোন নীহারিকা অথবা অনামা কোনও নক্ষত্রের সংঘাতে পৃথিবী চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে—এ তারই পূর্ব-ইঙ্গিত? এটা কি মহাকালের প্রলয়নর্তনের পূর্ব-ইশারা?

আকাশের দিকে চেয়ে রইল সবাই নিমেষহীন দৃষ্টিতে। সবার মুখেই শুধু ওই একই প্রশ্ন—ওই বিদ্যুৎচমক কিসের?

সবার বিস্ময়কে আরও বর্ধিত করে দিয়ে আর একবার জ্বলে উঠল সেই রক্তাভ আলোর ঝলক। আরও দীর্ঘস্থায়ী যে আলোকের দীপ্তি।

এবার আর বিদ্যুৎলেখা বলে ভুল হবার উপায় নেই। কিন্তু সেটা যে কি তাও নির্দিষ্ট করে বলতে পারে না কেউ।

বিজ্ঞানে তারা এমন কিছুই পড়েনি, জীবনে কখনও দেখেনি, কিংবা দেখবার কথা কল্পনাও করেনি।

চারিদিকে বিস্ময়ের গুঞ্জন—নির্বাক্ জনসাধারণের মূকদৃষ্টি! চিন্তাশক্তি যেন হারিয়ে ফেলেছে তারা। এ তাদের চোখের সাম্‌নে তারা কি দেখছে? এ কি তারা কোনও স্বপ্নরাজ্যের যাদুর মধ্যে প্রবেশ করেছে নাকি?

তাদের সমস্ত বিস্ময়কে নিমেষে অন্তর্হিত করে দিয়ে সঞ্চার হলো বিপুল, অব্যক্ত ভয়। শোনা গেল পর পর তিনবার বিস্ফোরণের শব্দ। আকাশ যেন থর থর করে কেঁপে কেঁপে উঠল সে গর্জনে! দুরু দুরু করে কেঁপে উঠল সবার বুক!

সৃষ্টির শেষ দিন বুঝি আসন্ন। কামানের বজ্রনির্ঘোষও বুঝি হার মেনে যায় এর কাছে, ডিনামাইটের গগনভেদী আওয়াজও বুঝি পারে না এর সাথে পাল্লা দিতে। এ তবে কিসের গর্জন? পৃথিবী কি ধসে পড়বে প্রচণ্ড শব্দে? মহাপ্রলয়শেষে কি বিশ্ব মিলিয়ে যাবে অকূল অনন্ত মহাশূন্যে?

স্তম্ভিত, বিস্মিত, হতবাক্, সবাই ছুটল আপন আপন গৃহকোণে। যে করেই হোক্ এই ধ্বংসের হাত থেকে নিজেদের বাঁচাতে হবে। দোকানপাট বন্ধ হয়ে এলো। পথঘাট জনশূন্য।

ট্রামে, বাসে সুরু হলো ঠেলাঠেলি, মারামারি, হট্টগোল। পালাও, পালাও! যঃ পলায়তি স জীবতি। সবাই একনিশ্বাসে ছুটে ঘরে পৌঁছুতে পারলে বাঁচে।

হঠাৎ সকলের চমক ভাল করে কাটতেই দেখতে পেল দক্ষিণ আকাশে ফুটে উঠল বড় বড় জ্বলন্ত শ্বেতাভ রেখা। শ্বেতপদ্ম।

ভয় গেল কেটে। দেখা গেল প্রভূত বিস্ময় আর বিহ্বলতা। অদ্ভুত! অপূর্ব! অদৃষ্টপূর্ব! অশ্রুতপূর্ব! অচিন্তনীয়! সকলে বাড়ির ছাদে কিংবা উঁচু কোনও স্থানে উঠে চেয়ে দেখতে লাগল আকাশের দিকে। অমাবস্যার সান্ধ্য মসীবর্ণ, তমসাময়ী আকাশে ভেসে বেড়াচ্ছে একটি শ্বেতপদ্ম।

শ্বেতপদ্ম! শ্বেতপদ্ম! সবার মুখে একটিমাত্র কথা! সমস্ত মহানগরীর প্রত্যেকের মুখে মুখে জেগে উঠল একটি কোলাহল-গুঞ্জন—সারা ভারতের পুলিশবাহিনীকে হেলায় তুচ্ছ করে শ্বেতপদ্মের দল মহানগরীর বুকে হানা দিয়েছে।

ওই আলোকশিখা বুঝি শ্বেতপদ্মের বিজয়-পতাকা। ওই গগনবিদারী গর্জন বুঝি তারই সম্মানসূচক তোপধ্বনি। সে প্রমাণ করছে আজ জগতের সাম্‌নে যে সে অপরাজেয়! সে দুর্ধর্ষ! সে অজর-অমর! শ্রদ্ধা, বিস্ময়, ভয় ও আশ্চর্যের একটা মিশ্র সমাবেশ দেখা গেল সকলের মনে।

কিন্তু এই সমস্তকে কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করে একটি বিরাট, কালো, ঢাকা মোটরগাড়িকে দেখা গেল টালিগঞ্জ পেরিয়ে দক্ষিণের দিকে ছুটে চলতে।

তবে সে উন্মাদ গতিবেগ দেখে ভয়ে কোনও পুলিশ কিংবা ট্রাফিক কনস্টেবল হাত তুলে তাকে বাধা দিতে পারল না। সে যেন বাঁধনহারা কল্পনার অগ্রদূত। মাইলের হিসেবে তাকে বোঝা যায় না। ষাট, সত্তর, আশী কিংবা নব্বুই!

তবে কক্ষচ্যুত কোনও নীহারিকার গতিও বুঝি হার মেনে যায় এর কাছে। সব বাধাকে তুচ্ছ করে নিমেষে প্রচুর পথ অতিক্রম করতে পারাটাই যে তার একমাত্র উদ্দেশ্য তাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই।

গাড়িতে বসে দুটি প্রাণী—দীপক চ্যাটার্জী আর তার সহকারী রতনলাল।

ঘনিয়ে এলো বুঝি মুখোমুখি দ্বৈরথ সমর! কে জানে তার পরিণাম কোথায়!

তিন

—শ্বেতপদ্মের চিঠি—

বিখ্যাত ধনী রায় বাহাদুর বিমল বসু অস্থিরভাবে পায়চারী করছিলেন তাঁর বিড্‌ন স্ট্রীটের নিজ বাসভবনে।

কিছুক্ষণ আগেই তিনি সেদিনের ডাকে আগত কয়েকখানি চিঠির উপর দ্রুত চোখ বুলিয়ে যাচ্ছিলেন, এমন সময় চোখ পড়ল অদ্ভুত পুরু একটি খামের উপর।

সামান্য একটি খাম, কিন্তু তা যেন নিমেষে শুষে নিল তাঁর মুখের সব রক্তটুকু।

খামের ঠিক ওপরে একটি কোণে আঁকা রয়েছে বিরাট একটি পদ্মের ছবি।

শ্বেতপদ্ম!

ছুরি দিয়ে খামটার মুখ কেটে ভেতরে চোখ দিলেন তিনি।

সামান্য কয়েক লাইন মাত্র লেখা, কিন্তু তাতেই যেন তাঁর মধ্যে এনে দিল অদ্ভুত একটা পরিবর্তন!

ধীরে ধীরে তাঁর মুখের মাংসপেশী কঠিন হয়ে উঠল। দপ্‌ দপ্‌ করে জ্বলতে লাগল তাঁর চোখ দুটি জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ডের মত।

কয়েকটিমাত্র মুহূর্ত।

তার পরেই খামটি মেঝের উপর ছুঁড়ে ফেলে চীৎকার করে উঠলেন তিনি—না, না, এ হতে পারে না, এ সম্পূর্ণ অসম্ভব! অবাস্তব!

প্রাণপণে নিশ্চিন্ত হবার চেষ্টা করে তিনি ধরালেন একটা সিগারেট।

কিন্তু আবার চোখ গিয়ে ঠিকরে পড়ল মেঝেয় পড়া চিঠিটার উপরে।

আবার চিঠিটা হাতে তুলে নিয়ে পড়তে সুরু করলেন তিনি।

প্রিয় বিনয় পালিত,

জীবনে অনেক অদ্ভুত কার্যই করেছ তুমি। তবে সবচেয়ে যা অদ্ভুত তা হচ্ছে তুমি নিজে। আজ তুমি নাম পাল্টে প্রাণপণে রায় বাহাদুর বিমল বসু হবার চেষ্টা করছ।

কিন্তু মারাত্মক ভুল তুমি করে ফেলেছ এক জায়গায়। তোমাকে চিনতে আমার কষ্ট হয়নি একটুও। আজ আমি যদি তোমার আসল পরিচয় প্রকাশ করে দিই সকলের কাছে তবে তোমার ঘৃণিত, পুরানো দিনের কথা স্মরণ করে সবাই শিউরে উঠবে।

আজ যদি তুমি বিশ বছর আগের দিনে ফিরে যাও তবে তোমার এত ধন-ঐশ্বর্যও সব বৃথা প্রতিপন্ন হবে। লোকে তোমায় জানবে ঘৃণিত, নীচ একটা খুনী বলে।

কিন্তু তাই কি তুমি চাও?

যদি এই ঘোর দুর্বিপাক থেকে নিজেকে রক্ষা করতে চাও তবে কিছু টাকা তোমায় খরচ করতেই হবে।

ভুলো না যে তোমার অসৎ উপায়ে উপার্জিত অর্থে বহু দীন-দরিদ্র দু'মুঠো খেয়ে বাঁচবে।

মাত্র বিশ হাজার টাকার খুচরো নোট একটা তাড়ায় বেঁধে পরশু রাত দেড়টার সময় গড়ের মাঠে মনুমেণ্টের পশ্চিম কোণে রেখে আসবে, তাহলেই ত আমার হস্তগত হবে।

নইলে বন্ধু, তোমার নিস্তার নেই। পুলিশকে জানাতে গেলেই এই চিঠি তাদের দেখাতে হবে, তাহলে পুলিশ জেনে ফেলবে তোমার পুরানো পরিচয়—সুতরাং সে চেষ্টা অবশ্যই করো না।

এখন নিজের ভাল যা বোঝ করো। আর একটা কথা, তোমার পুরানো পরিচয় প্রমাণ করবার ক্ষমতাও আমার আছে। ইতি—

তোমার বন্ধু
শ্বেতপদ্ম।

রায় বাহাদুরের হাত দুখানা কাঁপতে লাগল।

বিশ বছর পরে কালের হাতের যাদুস্পর্শে তাঁর দেহের এমন অদ্ভুত পরিবর্তন হয়েছে যে কেউ কোনও দিন তাঁকে দেখে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ করতে পারবে না যে তিনিই অতীতের কঙ্কাল—বিনয় পালিত।

কিন্তু তবু কি করে ওরা জানতে পারল তাঁর পুরানো দিনের কাহিনী? কি করে আজ এ অসম্ভব সম্ভব হয়েছে? তবে কি ওরা মায়াবী না যাদুকর?

রায় বাহাদুর তাড়াতাড়ি গিয়ে দাঁড়ালেন একটা বড় আয়নার সামনে। সমালোচকের দৃষ্টিতে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তাকালেন নিজের প্রতিফলিত প্রতিবিম্বের দিকে।

নাঃ, সম্পূর্ণ অন্য লোক আজ তিনি। পেশীবহুল দেহেও যথেষ্ট পরিবর্তন। মাথায় টাক। মুখে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি। রগের কাছে চুল পাকতে সুরু করেছে। অদ্ভুত এক গাম্ভীর্যপূর্ণ প্রৌঢ় তিনি আজ।

দরজার খিল এঁটে একটা ড্রয়ার থেকে বের করলেন পুরানো একটা বাক্স। তার ভেতর থেকে একটি দীর্ঘদিন পূর্বের বহু পুরানো একখানা তরুণ যুবকের ফটো। নাঃ, কোনও মিলই দেখা যায় না দুজনের চেহারায়।

অনেকটা নিশ্চিন্ত হলেন তিনি। না, আজ শ্বেতপদ্ম শত চেষ্টাতেও প্রমাণ করতে পারবে না যে রায় বাহাদুর বিমল বসুই স্বয়ং বিনয় পালিত!

ধীরে ধীরে আর একবার খামটা তুলে নিলেন তিনি। ভাল করে উল্টেপাল্টে দেখতে লাগলেন সেটা।

নতুন কোনও তথ্য আবিষ্কৃত হলো না, শুধু দেখা গেল যে খামের উপরে বিড্‌ন স্ট্রীট পোস্ট অফিসের সীল দেওয়া।

সেদিনই চিঠিটা পোস্ট করা হয়েছে।

তার মানে পত্রপ্রেরক তাঁর আশেপাশেই কোথাও গা-ঢাকা দিয়ে রয়েছে।

কিন্তু কোথায় সে? কে সে?

ধীরে ধীরে তাঁর মুখে ফুটে উঠল বিরক্তির রেখা।

কেউ নিশ্চয় বাজে চিঠি দিয়ে তাঁকে ব্ল্যাকমেল করতে চায়। ওদিকে মন দিয়ে লাভ নেই। কিন্তু কেউই ত জানে না যে তাঁর পূর্ব নাম ছিল বিনয় পালিত।

আর এই শ্বেতপদ্ম! এর পূর্ব-কীর্তিগুলি যেন আর একবার তাঁর চোখের উপর দিয়ে ঝিলিক মেরে গেল।

এ লেখা কি জাল? আবার ভাবতে সুরু করলেন তিনি। বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠল তাঁর কপালে। তারপর এক সময় টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেললেন চিঠিটা।

তারপর উঠে ঘরের খিল খুলে ব্যালকনিতে এসে দাঁড়িয়ে চাকর হরিকে ডেকে বললেন—হরি, চা নিয়ে আয়।

হরি চা নিয়ে এসে রাখল টেবিলের উপর। তারপর তাঁর হাতে দিল একখানা কাগজ। বলল—বাবু, এইমাত্র একজন লোক এই কাগজখানা দিয়ে গেল। বলল যে, এটা নাকি আপনার জরুরী চিঠি।

বিস্মিত রায় বাহাদুর কাগজটি খুলে দেখলেন তাতেও একটি শ্বেতপদ্মের ছবি জ্বলজ্বল করছে। ছবির নিচে লেখা ঃ

বিনয় পালিত,

যতই চিঠি ছিঁড়ে ফেলে নিশ্চিন্ত হবার চেষ্টা করো আমার প্রাপ্য টাকা পুরোপুরি না পেলে তোমার নিস্তার নেই তা জেনো।

জেনে রাখো, আমার দৃষ্টি রয়েছে তোমার প্রতিটি কার্যের এবং গতিবিধির উপরে।

এমন কি তুমি কি বেশে কোথায় দাঁড়িয়ে কি করছ তা পর্যন্ত আমার দৃষ্টিগণ্ডীর মধ্যে! এখনও শেষবারের মত তোমায় সাবধান করে দিচ্ছি, যদি মান-সম্মান, প্রতিপত্তি, অর্থ নিয়ে বাঁচতে চাও আমার সামান্য দাবীটি পূর্ণ করো।

আমার বিরাট শক্তিকে তুচ্ছ করা মানেই তোমার ধ্বংসকে নিকটতর করে তোলা।

ইতি—

তোমার বন্ধু

শ্বেতপদ্ম।

রায় বাহাদুর গর্জন করে উঠলেন—যে চিঠি দিয়ে গেল সে চলে গেল কোন্ দিক দিয়ে?

ভীতকণ্ঠে হরি বলল—আজ্ঞে হুজুর, সে ত চিঠিটা দিয়েই একটা সাইকেলে চড়ে চলে গেল তক্ষুণি।

রায় বাহাদুর চিৎকার করে কি যেন বলতে গেলেন, কিন্তু তাঁর মুখে স্বর ফুটল না।

ধপ্ করে সোফার উপরে গা এলিয়ে দিলেন তিনি। তাঁর দু'চোখে তখন অকূল অজস্র রাত নেমে এসেছে।

চার

—গোপন বৈঠক—

হোটেল প্যাসচার।

চীনেপাড়ার গলিঘুপচির গোলকধাঁধায় ঘুরতে ঘুরতে সঙ্কীর্ণ এই গলিতেও যে একটা হোটেল থাকতে পারে এটা অনেকের কাছেই একটা অভূতপূর্ব বিস্ময়।

তবু এটা সত্য।

এক শ্রেণীর লোকের কাছে এই হোটেলটি বেশ লোভনীয় বাসস্থান। ক্ষুদ্র, অপরিসর, প্রায়ান্ধকার গলির বাসিন্দাদের সাথে এই হোটেলের লোকগুলিও যেন অভিন্নশ্রেণীভুক্ত।

বহু পুরোনো বাড়ি। চুনবালি খসে খসে পড়েছে, দাঁত বের করে রয়েছে নোনাধরা ইটগুলো।

বাড়িটার নীচের তলায় অনেকগুলো গুদাম ও দোকান। উপরের তলায় এই হোটেলটি। দোকানগুলিতে খদ্দের বিশেষ আসে না—তবে কি করে যে এদের দিন কাটে জানে না কেউ।

হোটেলটিতে নানা শ্রেণীর এবং বর্ণের এক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মিশ্রণ। যেন বিভিন্ন জাতির একটা প্রদর্শনী এটা। কিন্তু কি যে কি করে তা নিয়েও কখনো মাথা ঘামায় না।

আর মাথা ঘামিয়েই বা লাভ কি?

এই বিরাট হোটেলের কোন্ গোপন কক্ষে যে কে বাস করে সে সম্বন্ধে ধারণা করাও সাধারণ মানুষের সাধ্যের অতীত।

এই হোটেলটিরই একটি গোপন কক্ষে এবার আমাদের গল্পের যবনিকা উঠল।

হোটেলের সাত নম্বর ঘর। রাত সাড়ে বারোটা।

ঢং করে বেজে উঠল যেই সময়-নির্দেশক ঘণ্টাটি, সঙ্গে সঙ্গেই দেখতে দেখতে ঘরে উপস্থিত প্রায় পনর জন লোক উঠে দাঁড়াল। সজোরে টিপল দালানের উপরে দণ্ডায়মান একটি কাঠের পুতুলের বুকের মাঝামাঝি। একটা ছোট্ট শব্দ করেই ঘরের মেঝের কিছুটা অংশ সরে গেল। দেখা গেল একটা লম্বা সুড়ঙ্গপথ। কিন্তু তা যে কোথায় গেছে কেউ জানে না।

সুড়ঙ্গপথটিতে ঘোরানো ঘোরানো একসার সিঁড়ি নীচের দিকে নেমে গেছে। নীচে—আরও নীচে। বুঝি পাতালের কোন্ অতল গহ্বরের সন্ধান দেবে এই পথ!

মাটির তলায় একটা ভূগর্ভস্থ কক্ষে গিয়ে পথ শেষ হয়েছে। সেখানে অনেকগুলি বসবার আসন। একে একে সবাই বসে পড়ল।

সবাই স্তম্ভিত। সবাই বিস্ময়ে হতবাক্। বহুদিন পরে আবার তাদের ডাক এসেছে। তাদের অজ্ঞাতবাস হয়েছে সমাপ্ত। আর পালিয়ে থাকতে হবে না। আবার সাড়া দিতে হবে নূতন কর্মের আহ্বানে। কিন্তু কি সে কর্ম?

ওদের মধ্যে মৃদু কথাবার্তার গুঞ্জন উঠছিল, কিন্তু তা এত ধীরে যে বাইরের কোনও লোকের কানেই পৌঁছবে না তা। ধীর কথাবার্তা শুনে শুধু মনে হচ্ছিল যে এদের স্থির ধারণা—দালানেরও বুঝি কান আছে।

এদের মধ্যে কয়েকজন পুলিশের অতি-পরিচিত মহাপ্রভু। অপর দু-একজন সম্বন্ধে যদিও পুলিশ নীরব তবু জনসাধারণের কাছে তারা সন্দেহের পাত্র।

দালানের পেছনদিকে একটা কালো সিল্কের ওপর আঁকা একটি শ্বেতপদ্মের ছবি।

ক্রিং ক্রিং...

বেজে উঠল একটা ঘণ্টা অদ্ভুত শব্দে। পাতাল ফুঁড়ে যেন আবির্ভূত হলো সর্বাঙ্গ কালো পোষাকে আবৃত এবং মুখে কালো মুখোশ পরা একজন লোক। ঘরের স্বল্প আলোয় মনে হচ্ছিল লোকটির সারা দেহই যেন রোমাঞ্চ দিয়ে তৈরী। সে আবহাওয়ার মাঝে কল্‌কাতা সহরে নামজাদা বদমায়েশ, গুণ্ডা, ব্ল্যাকমেলারদের বুকও কেমন যেন কেঁপে উঠল।

সবাই একসঙ্গে উঠে দাঁড়াল তাকে সম্মান দেখাবার জন্যে। এটা কারও নির্দেশে নয়—মনের ভয় ও ভক্তি মিশে তাদের মনে এমন একটা ভাবের সৃষ্টি হয়েছিল যে তারা যেন নিজের অজ্ঞাতেই কাজ করে চলেছে।

কালো মূর্তিটি ধীরে ধীরে হাত নাড়ল। সবাই বসে পড়ল একে একে। ঘরের মধ্যে একটা পিন পড়লেও শব্দ শোন যায় এমনি নিস্তব্ধ আবহাওয়া। সকলের একাগ্র দৃষ্টি নিবদ্ধ সামনের দিকে।

গম্ভীর কণ্ঠে ভেসে এলো ছোট্ট ছোট্ট কথা—বন্ধুগণ, তোমাদের আমি ডাক দিয়েছি বহুদিন পরে। নূতন কাজ তোমাদের সামনে।

এগিয়ে চলবে নিজের উপরে সম্পূর্ণ বিশ্বাস রেখে—সাফল্য তোমাদের যে সুনিশ্চিত এতে সন্দেহ নেই। কর্তব্য পালন করলে যে উপযুক্ত মূল্য পাবে এর নিশ্চয়তা তোমাদের আমি দিচ্ছি। তোমরা জান কোনও দিন কথার খেলাপ আমি করি না।

শ্বেতপদ্ম মরেছে, এ ধারণা নিয়ে যারা বসে আছে তাদের ঘুম ভাঙবে।

তোমরা জান বঙ্গোপসাগরে পুলিশের চোখে ধুলো দেবার জন্যে ডিনামাইট দিয়ে জাহাজ ধ্বংস আমি করেছিলাম। কিন্তু তার অনেক আগেই আমার পলায়ন করবার পথ খোলা ছিল। মুখে গ্যাস-মুখোশ পরে তিন মাইল পথ সাঁতার দিয়ে কূলে গিয়ে উঠেছিলাম।

কিন্তু ওদের সে ভুলের শাস্তি ওরা পাবে। ওরা জানবে না আমাকে, চিনবে না। শুধু বরণ করে নেবে অনন্ত মৃত্যুকে।

প্রথমে ধ্বংস করব দীপক চ্যাটার্জী আর তার সহকারী রতনলালকে। তারপর ইন্‌স্পেক্টর মরিসনের পালা। আমার বিপক্ষে এসে যারা দাঁড়াবে তাদের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে নিজের বুকের তাজা রক্ত দিয়ে।

দিকে দিকে আবার ছড়িয়ে পড়বে আতঙ্ক। মূর্খ পুলিশের দল আমার সন্ধানে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে মিথ্যা ঘুরে ঘুরে মরবে, আমার কেশাগ্র স্পর্শ করবার ক্ষমতাও হবে না তাদের।

আর আমি তাদেব পাশেই বসে তাদের প্রতিটি কাজের উপরে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে এগিয়ে চলব। সুরু হবে শ্বেতপদ্মের নব অভিযান। তোমরা হবে আমার অভিযানের সহায়ক। কিন্তু সাবধান বন্ধুগণ, বিশ্বাসঘাতকতার আমি একটিমাত্র শাস্তি দিই—মৃত্যু!

এখন তোমাদের কর্তব্য সম্বন্ধে তোমাদের কিছু বলি।

এরপর যে সমস্ত কথা সেখানে আলোচিত হতে লাগল তা শুনলে, যে কোনও সভ্য মানুষের বুকই ভয়ে আঁৎকে উঠত! কিন্তু ওরা নির্বিকার হয়ে সব শুনে যেতে লাগল।

গভীর রাত্রির গাঢ় অন্ধকার অবগুণ্ঠনের মাঝেই লুকিয়ে থাকল এই ভীষণ, হৃৎকম্পনকারী দৃশ্যগুলো।

পাঁচ

—টেলিফোন—

বিখ্যাত প্রাইভেট ডিটেকটিভ দীপক চ্যাটার্জী তার ড্রইংরুমে বসে সহকারী রতনের সাথে গল্প করছিল।

রতন বলল—দীপক, আজ পর্যন্ত তুই যে কয়টা কেসে হাত দিয়েছিস, প্রায় প্রত্যেকটাতেই সফলতা লাভ করায় সবার নিশ্চিত ধারণা যে তুই হাত দিলেই যে কোনও সমস্যার সমাধান হতে বাধ্য। কিন্তু শ্বেতপদ্ম যে কোন্ দিক দিয়ে সেদিন সমস্ত বেড়াজাল এড়িয়ে পলায়ন করল তা সত্যিই অভূতপূর্ব।

দীপক হেসে বলল—না, অভূতপূর্ব নয়। তবে এ দেশে এই প্রথম। এ সত্যিই তার আবির্ভাব ঘটল যেন একটা অদ্ভুত রোমান্টিক পরিবেশে। আকাশের গায়ে পর পর পাঁচটি হাইড্রোজেনপূর্ণ বেলুন উড়িয়ে পরস্পরের সাথে তার দিয়ে সংযোগসূত্র স্থাপন করে, প্রত্যেকটি বেলুনে একটি করে ইলেকট্রিক আলোর টিউব আটকে আকাশের গায়ে উড়িয়ে দেওয়া। তারপর ব্যাটারীকে 'ফিক্স' করা। সত্যিই আমি তার সম্বন্ধে যখন চিন্তা করি তখনই ভাবি কি অদ্ভুত ক্ষমতা, কি চিন্তাশীল মস্তিষ্ক লোকটির! সবাইকে জানিয়ে, সকলের মনে অদম্য একটা কৌতূহল এবং ভয়ের সঞ্চার করে যেন হঠাৎ এসে উদিত হলো ধূমকেতুর মত! মনে হচ্ছে যেন সত্যি একজন যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী আমি পেয়েছি রতন।

রতন বলল—ফিরে এলো বটে, কিন্তু তার অভিযানের কোনও প্রমাণ ত পাচ্ছি না এখনও!

দীপক বলল—চিন্তা করো না, একবার যখন তার প্রমাণ পাবে তখন ভয়ে ভয়ে ভাবতে থাকবে কি করে রেহাই পাওয়া যায়! পূর্বের কীর্তিকাহিনীগুলো এখনও ভোলনি আশা করি।

তার কথার মাঝখানেই বাইরে শোনা গেল পদশব্দ। দীপক রতনের দিকে চেয়ে বলল—অচেনা পদশব্দ মনে হচ্ছে, বোধ হয় কোনও নূতন বন্ধু!

তার কথার সত্যতা প্রমাণ করে ঘরের মধ্যে আবির্ভূত হলেন একজন অজানা ভদ্রলোক। মাথায় টাক, পরিধানে দামী স্যুট, চোখে-মুখে ব্যস্ততার ছাপ। চেহারা দেখে বেশ অভিজাত বলেই মনে হয়।

দীপক ও রতন মুখ তুলে কোনও কথা বলবার পূর্বেই আগন্তুক ব্যস্তসমস্তভাবে বলে উঠলেন—আমাকে আপনি চিনবেন না দীপকবাবু। তবে পরিচয় দিলে হয়ত চিনতে পারেন। আমার নাম রায় বাহাদুর বিমল বসু।

দীপক হেসে বলল—ও, হ্যাঁ মনে পড়েছে বটে। শুনেছি আপনার নাম। আপনি বোধ হয় বিড্‌ন স্ট্রীটে থাকেন, না?

ভদ্রলোক হেসে বললেন—মনে রেখেছেন দেখছি। আমার মত ক্ষুদ্র ব্যক্তিকে যে চেনেন, আশ্চর্য!

দীপক বলল—না, আশ্চর্য নয়, কারণ উঁচু মহলে আপনার বেশ কিছু নাম-ডাক আছে। কিন্তু দেখে মনে হচ্ছে যে আপনি কোনও কারণে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে উঠেছেন। তাছাড়া কখনও বিনা কারণে এ অভাজনের কুটিরে যে আপনার মত ব্যক্তির পদার্পণ হবে না তা জানি। এখন যদি ধীরে-সুস্থে একটু জিরিয়ে নিয়ে ধীরে ধীরে কারণটি ব্যক্ত করেন ত বাধিত

হব। অবশ্য আপনাকে সাহায্য করতে পারব কিনা সেটা নির্ভর করছে অনেকটা কারণটির উপর।

একটু থেমে দীপক আবার বলল—দেখুন, ফী-এর লোভ দেখিয়ে আমার কাজে নামাবেন এ যদি আপনি ভেবে থাকেন তবে আপনি ভুল বুঝেছেন রায় বাহাদুর। সত্যি বলতে কি আমি একজন ক্রিমিনলজিস্ট্। ছোটখাট চুরি-বাটপাড়ি নিয়ে মাথা ঘামানো আমার পেশা নয়। কোনও বড় ক্রাইম যেখানে অনুষ্ঠিত হয়, কিংবা হবার উপক্রম হয় সেখানেই আমার দেখা পাবেন আপনি। যাক্, আপনার কেস্টা যে কি তা সংক্ষেপে আমাকে বলুন।

রায় বাহাদুর হাসতে হাসতে বললেন—ঠিক বলেছেন আপনি, এতদিন আপনার নামই কেবল শুনেছি, আজ সাক্ষাৎ পরিচয় হলো। সত্যি, এই ত যোগ্য লোকের মুখের উপযুক্ত কথা। এখন শুনুন সংক্ষেপে আমার কেস্টি—মনে হয় একবার শুনলে আর তা এড়াতে চাইবেন না আপনি!

দীপকের যে কিছুটা কৌতূহল না হচ্ছিল তা নয়। ধীরে ধীরে বলল—বলুন, শুনি।

রায় বাহাদুর বলতে সুরু করলেন—ঘটনার সুরু হয় দিন তিনেক আগে। প্রথমে একদিন শুভ প্রভাতে অনেকগুলি চিঠি ঘাঁটতে ঘাঁটতে একখানা চিঠি পেলাম। পুরু খামের উপরে একটি শ্বেতপদ্মের ছবি আঁকা। নামটা আমি আগেই শুনেছি বটে, তবে প্রথম তার চিঠিখানা পেলাম সেদিন।

শ্বেতপদ্ম! দীপক ও রতন যেন একসঙ্গে লাফিয়ে উঠল। একাগ্র মনোযোগ নিবদ্ধ হলো রায় বাহাদুরের কথার উপরে। দীপক কৌতূহলপূর্ণ কণ্ঠে বলল—তারপর?

রায় বাহাদুর পুনরায় আরম্ভ করলেন—চিঠিতে নূতনত্ব কিছু ছিল না, সাধারণ ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় করবার ফন্দী। তবে এত সহজে ভয় পাবার ছেলে ত আমি নই। তবু খুব বেশি সুবিধা তার হলো না। আমিও চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলে নিশ্চিন্ত হলাম। ভাবলাম এটা নিশ্চয়ই কেউ ভয় দেখিয়ে লিখেছে মাত্র। ওটা নিয়ে মাথা ঘামালাম না আর।

তার পরের ঘটনা কাল রাতে। সন্ধ্যার পর খাওয়া-দাওয়া শেষে আমি বাইরের বারান্দায় একটু পায়চারী করি। এটা আমার বহুদিনের অভ্যাস। কালও ঠিক তেমনি রাত ন'টায় খাওয়া-দাওয়ার শেষে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

শীতের দিন, তাই গায়ে ছিল আমার গরম নাইট ড্রেস আর মাথায় নাইট ক্যাপ। হঠাৎ চম্‌কে উঠলাম একটা রিভলবারের প্রচণ্ড গর্জনে! ভয় পেয়ে চুপচাপ বসে পড়লাম আমি। দেখলাম একজন লোক ওপাশের রেলিং থেকে মাটিতে লাফিয়ে পড়ে ছুটতে ছুটতে পথে গিয়ে পড়ল। তার সারাদেহ কালো পোষাকে আবৃত থাকায় একটুও চিনতে পারিনি তাকে।

তারপর হঠাৎ নাইট ক্যাপটিতে হাত দিয়ে দেখলাম যে গুলিটা টুপি ভেদ করে চলে গেছে। সামান্য আধ ইঞ্চির জন্যে আমার মাথাটা যে বেঁচে গেছে এটা আমার মস্তবড় সৌভাগ্য।

শয়তানের প্রথম উদ্যম হয়ত ব্যর্থ হয়েছে, কিন্তু এর পরেও ত আমার উপরে সে নূতন আক্রমণ চালাতে পারে! তাই আপনার শরণাপন্ন হয়েছি সাহায্যের আশায় দীপকবাবু। আশা করি এ আহ্বানে সাড়া দেবেন আপনি।

দীপক কোনও কথা না বলে অকস্মাৎ ড্রয়ার থেকে রিভলবারটা তুলে নিয়ে জানালার দিকে লক্ষ্য করে তিনবার পিস্তল ছুড়ল। ধুপ্ করে একটা শব্দ শোনা গেল ঠিক জানালার বাইরে।

তিনজনে ছুটে বাইরে এসেই দেখল একটা লোক সাইকেলে চড়ে অনেকদূরে পালিয়ে

গেছে। তার অপসৃয়মান মূর্তিটির দিকে চেয়ে রতন দীপককে জিজ্ঞাসা করল—ওকে অনুসরণ করব নাকি?

দীপক হেসে বলল—না থাক। ওসব চুনোপুঁটিদের নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। তারপর ঘরের ভিতরে প্রবেশ করে রায় বাহাদুরকে লক্ষ্য করে বলল—আপনার কেস্ আমি গ্রহণ করলাম রায় বাহাদুর। শ্বেতপদ্মের সাথে আমার সংঘাত সুরু হলো, জানি না এর শেষ কোথায়!

রায় বাহাদুর উচ্ছ্বসিত হাসির সঙ্গে বললেন—ধন্যবাদ দীপকবাবু। আমি পুলিশের সাহায্য না নিয়ে আপনার কাছে এই জন্যেই ছুটে এসেছি। কারণ জানি যে আপনি পুলিশের চেয়ে অনেক বেশি কর্মক্ষম। আর আপনি কাজে হাত দিলে শ্বেতপদ্মের নজরে তা পড়বে না।

দীপক একটু থেমে বলল—কিন্তু আমার বন্ধুদের নজর অনেক আগেই পড়েছে দেখতে পাচ্ছি। ওদের নজর এড়ানো সত্যিই খুব মুস্কিল।

এমন সময় ঝন্ ঝন্ শব্দে টেলিফোন বেজে উঠল।

ভেসে এলো পরিচিত এবং বহুশ্রুত কণ্ঠস্বর—হ্যাঁ বন্ধু, ঠিকই বলেছ তুমি। আমার নজর এড়ানো সত্যিই খুব কঠিন। তুমি রায় বাহাদুরের কেস্ গ্রহণ করলে জেনে খুবই খুশি হলাম। কিন্তু আমার একজন অনুচরকে ভয় দেখালে কি হবে, আমার অনুচর ছড়িয়ে আছে সারা ভারতবর্ষের প্রতিটি কোণে। ভয় আমাকে আর কি দেখাবে? আমার শক্তির কাছে তুমি যে কত ক্ষুদ্র, কত তুচ্ছ তা ত বুঝতেই পারছ! ঠিক তিন দিন তুমি আর তোমার সহকারী পৃথিবীর আলো-বাতাস উপভোগ করবে। তারপর উপযুক্ত শাস্তি ঘনিয়ে আসবে তোমাদের উপরে। মানে মৃত্যুর গ্রাস এসে তোমাদের চিহ্ন অবলুপ্ত করে দেবে পৃথিবীর বুক থেকে। তারপর স্বর্গে গিয়ে গোয়েন্দাগিরি করো। বেশ মজা হবে, না? হাঃ হাঃ হাঃ—শ্বেতপদ্মের কথার খেলাপ কখনও হয় না বন্ধু! হাঃ হাঃ হাঃ!

দীপক চ্যাটার্জী দাঁতে দাঁত চেপে বলল—দেখি শয়তানের কত বড় ক্ষমতা! এই দ্বন্দ্বযুদ্ধে হয় আমি জিতব, নয় সে। দেখা যাক নিয়তি কার কপালে এঁকে দেয় সে জয়টিকা!

ছয়

—এরা কারা—

চিন্তারামের চায়ের দোকানটি ক্ষুদ্র হলেও তাতে যে তার আয় নেহাৎ কম হয় না তা বোঝা যায় তার ক্রমবর্ধমান স্ফীতকায় চেহারাটার উপর একবার চোখ বুলিয়ে নিলেই।

দোকানের সারি সারি কাঠের বেঞ্চিগুলি অত্যন্ত নোংরা।

মাত্র দুটি চেয়ার—বোধ হয় সম্ভ্রান্ত দু'একজনের পদধূলি পড়লে তাদের অভ্যর্থনার আশায়। কিন্তু তাও আবার হাতলবিহীন।

অথচ দোকানের আয়ের পয়সা সে যে অসৎপথে ব্যয় করে না তাও নিশ্চিত। লোকের ধারণা, চিন্তারাম একটি আস্ত কৃপণ—মরে গেলে বোধ হয় যক হয়ে তার সঞ্চিত টাকাকড়ি আগলাবে।

ভোরবেলা খদ্দের যে কতগুলি হয় তা নির্দিষ্ট কিছু নেই, তবে যে কতকগুলি খদ্দের চিন্তারামের দোকানে নিয়মিত হাজিরা দেয় তাদের প্রত্যেকটিকে সে বেশ ভাল করেই চেনে। কিন্তু এত ভোরে নূতন একজন ভদ্রলোককে এককোণে বসে নিবিষ্টমনে চা খেতে দেখে

তার প্রতি সে বড় বেশি সুনজর দিল না। সাধারণত এ রকম ভদ্রবাবুরা কখনও এত ভোরে দোকানে চা খেতে আসে না। তাদের ঘুম ভাঙে না আটটার আগে।

এদিকের খদ্দের ক'জন বেশ নিশ্চিন্ত মনে বসে। এদের চিন্তারাম চেনে। একজন সবে জেলখানায় পুরো পাঁচটি বছর ঘানি ঠেলে মাস দেড়েক ফিরেছে। তার নাম রংলাল।

পরণে তার ময়লা পাজামা, গায়ে তালি-দেওয়া আধময়লা সার্ট, তার উপরে একটা অত্যন্ত ময়লা সুতীর জহরকোটে শীতকে আটকে রাখবার চেষ্টা। আপন মনেই দিলদরিয়া মেজাজে সে যেমনভাবে চা খাচ্ছে তাতে মনে হয় একজন রাজা না হয় উজির কেউ হবে বোধ হয়!

তার কিছুটা বাঁয়ে অপর যে দুজন ফিস্‌ফাস্ কথাবার্তা বলে চায়ে দু'একটা চুমুক দিচ্ছে আর মাঝে মাঝে দৃষ্টি বুলিয়ে নিচ্ছে সে দুজনই চিন্তারামের বাঁধা খদ্দের। একজন রশিদ খাঁ আর একজন ভরত সিং। ওদের দুজনকে চিন্তারাম বেশ একটু সমীহ করে। ওদের সম্বন্ধে তার মনে কেমন যেন একটা ভাব বা ঠিক বোঝানো যায় না, তবে সেটা বেশ ভয়ঙ্কর গোছের কিছু হবে।

রশিদ খাঁর মাথায় ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া চুল। বেশ দোহারা পেশীবহুল চেহারা। পোষাক সাধারণ—পাজামা, পাঞ্জাবী আর কালো কাপড়ের একখানা কোর্তা। গলায় কালো সুতো দিয়ে আঁটা একটা চৌকো রুপার চাকতি। চোখে-মুখে সর্বদাই কেমন যেন একটা ত্রস্ত ভাব।

ভরত সিং যে মস্ত বড় একজন পালোয়ান কিংবা কুস্তিগীর এমনি একটা ধারণা হঠাৎ এসে মনে বাসা বাঁধে তার দিকে ভালভাবে নজর দিলেই। বিরাট বাঘের মত গোল একখানা মুখ। তেমনি বিশাল চেহারা। ঘাড়ে-গর্দানে মিশে এক হয়ে গেছে।

ওরা নিজেদের মধ্যে যে সব কথা বলাবলি করছিল তার মধ্যে দু'একটা হঠাৎ নিজেদের অজ্ঞাতেই জোরে উচ্চারিত হচ্ছিল। তারপর আবার সতর্ক হয়ে ধীরে ধীরে কথা বলছিল। বাইরের কেউ যে ওদের কথা শুনে ফেলবে তা ওদের মোটেই ইচ্ছা নয়।

হঠাৎ একসময় রংলাল উঠে দাঁড়াল। তারপর কোনদিকে না তাকিয়ে লম্বা পা ফেলে এগিয়ে চলল দরজার দিকে।

চিন্তারাম হাঁকল—ওহে শুনছ!

রংলাল আড়চোখে একবার চিন্তারামের দিকে চেয়ে দেখল। তারপর মুখখানা ঈষৎ গোমড়া করে বলল—কি গো, কিছু বলবে নাকি রামা দোস্ত?

চিন্তারাম তারা চাঁছা গলায় বলতে সুরু করল—বলি বলব তোমার মাথা আর আমার মুণ্ডু! নবাবপুত্তুরের মত ঢক্ ঢক্ করে রোজ দু'বেলা চা ত একবাটি করে বেশ মেরে যাও। কিন্তু এদিকে যে প্রায় আড়াই টাকা বাকী পড়েছে সেটি দেবার ত নামগন্ধ নেই। টাকা না দিলে তোমাকে আজ দোকানের বার হতে দেব না। অমন কত লোককে চিন্তারাম গলায় গামছা লাগিয়ে টাকা আদায় করেছে।

রংলালের চোখ দিয়ে যেন আগুন ফেটে পড়ছিল। সে বলল—তোমায় ত অনেকদিন বলেছি ওস্তাদ যে, হাতে টাকা আসুক মিটিয়ে দেব। এতগুলো লোকের সামনে কি এ অপমান না করলে চলছিল না?

গলার সুর আর এক পর্দা চড়িয়ে চিন্তারাম সুরু করল—ওরে আমার মানী যুধিষ্ঠির রে! গায়ে একেবারে ফোস্কা পড়ে গেল! বলি টাকার যোগাড়ই যদি না করতে পারবে ত পাত চাটতে আস কেন? একবেলা চায়ে একটু চিনি কম হলে ত তেড়েফুঁড়ে ওঠো। বলি

টাকা কি ছেলের হাতের মোয়া যে তোমার হাতে সুড়সুড় করে চলে আসবে! কাজটাজ কিছু না করলে কোত্থেকে আসবে টাকা? না, আবার সেই পুরোনো ব্যবসা ধরবার তালে আছ বুঝি!

রাগে অপমানে যেন ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছিল রংলাল। তার মনে হচ্ছিল এখনই গিয়ে ওই বদমাশ, কৃপণ, হাড়কঞ্জুস চিন্তারামের টুঁটিটা টিপে ধরবে।

ক্রোধে অগ্নিশর্মা হলেও তার মুখ দিয়ে কিন্তু বেরুল মাত্র দুটি কথা—যা পার করগে, তোমাকে একটি পয়সা আমি দেব না। গালাগাল দিয়ে পয়সা আদায় হয় না। যদি ক্ষমা চাও তবেই পয়সা দিতে পারি, তার আগে নয়।

চিন্তারামও রেগে উঠে বলল—আগে পয়সা ফেল্ তারপর অন্য কথা। জোচ্চোর, পাজী, হতভাগা! জোচ্চুরি করবার আর জায়গা পাওনি!

রেগে দুজনেই পরস্পরের দিকে ধেয়ে যাচ্ছিল এমন সময় এক কোণ থেকে কে যেন বলে উঠল—থাম তোমরা!

তার সে সুরে কেমন যেন অদ্ভুত একটা গাম্ভীর্য।

অদ্ভুত সে কণ্ঠস্বর। তা শুনে চুপচাপ আদেশ পালন করা ছাড়া উপায় থাকে না। দুজনেই থমকে দাঁড়াল। সবার দৃষ্টি গিয়ে পড়ল কোণের সেই ভদ্রলোকটির উপরে। ভদ্রলোক ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে চিন্তারামকে জিজ্ঞাসা করলেন—এর কত বাকী হয়েছে?

বিনয়ে বিগলিত হয়ে চিন্তারাম তার কুৎসিত মুখে বিকৃত একটা হাসি ফুটিয়ে বলল—আজ্ঞে, আড়াই টাকা হুজুর।

ভদ্রলোক গম্ভীরভাবে একটি দশটাকার নোট বের করে দিলেন চিন্তারামের হাতে। বললেন—আমার চায়ের দামটাও কেটে নিও এর থেকে। আর বাকী টাকাটা একে দিয়ে দাও। বলে তিনি অঙ্গুলি নির্দেশ করলেন রংলালের দিকে।

এমন একটা ঘটনাবৈচিত্র্যে রংলাল একটু বোকা বনে গিয়েছিল। এবার সে একবার ভদ্রলোকের দিকে মুখ তুলে বলল—হুজুর আপনি...

ভদ্রলোক বাধা দিয়ে বললেন—থাক্ আর গুণ ব্যাখ্যা করে কাজ নেই।

ওদিকে ঘরের কোণে রশিদ খা ভরত সিংকে বলল—বেশ ভাল মাল রে। পকেটে বেশ দু'পয়সা আছে! দেব নাকি পকেটের ভারটা লাঘব করে? বাছাধন টের পাবেন রশিদ খাঁর হাত কেমন সাফাই!

বাধা দিয়ে ভরত সিং বলল—এই সাবধান! দলের নিয়ম আছে যে দলে কাজ করতে হলে দলের কাজ ছাড়া বাইরের কাজ করা চলবে না। মনে নেই বুঝি?

ঘরের ঠিক দরজার কাছে বসে ছিল একজন লোক। সে আমাদের চুনীলাল। কাপ-ডিশ ধোয়। চা-টা তৈরী করে। মাস গেলে পায় খাওয়া-পরা বাদে সাতটি টাকা। সে একবার দশ টাকার নোটটির উপরে তার লোলুপদৃষ্টি নিক্ষেপ করল।

চুনীলাল একবার ভদ্রলোকটিকে সেলাম ঠুকে বলল—হুজুর বকশিস!

ভদ্রলোক একটি দু'আনি ফেলে দিয়ে রংলালের সাথে কি সব গল্প করতে করতে বেরিয়ে গেলেন।

এ দৃশ্য চিন্তারামের ভাল লাগল না। একটা ধনী ভদ্রলোকের সাথে এই একটা জেলের ঘানি-টানা কয়েদীর এতটা অন্তরঙ্গতা অসহনীয়।

ওরা দুজনে ফিস্‌ফিস্ করে কি যেন সব বলতে বলতে চলল। পথের বাঁকে এসে যখন

ভদ্রলোক বললেন—বুঝলে ত! মনে থাকবে? টালিগঞ্জের ঠিক পোলটির গায়ে লাগা বাঁ ধারের সরু রাস্তাটা ধরে...

রংলাল একবার তার দন্তপংক্তি বিকশিত করে বলল—হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক মনে থাকবে হুজুর। তেমন মনই নয় যে একবার শুনলেই ভুলে যাব।

ওধার থেকে একজন এক-চোখ-কানা ভিখিরি একটা মোটা লাঠিতে ভর দিয়ে ঠুক্ ঠুক্ করে এসে ভদ্রলোকটির সামনে তার হাতটা মেলে ধরে বলল—অন্ধ-নাচারকে একটা পয়সা দিয়ে যান বাবা, ভগবান আপনার ভাল করবেন বাবা...

ভদ্রলোক একবার নাকটা বেঁকিয়ে পাশ কাটিয়ে চলে গেলেন।

কানা ভিক্ষুক তার গমনপথের দিকে একবার চেয়ে মুচ্‌কি হাসল। একটু ভাল করে চেয়ে দেখলে বুঝতে পারা যেত যে এই ভিক্ষুকটি ডিটেকটিভ দীপক চ্যাটার্জীর সহকারী রতনলাল।

সাত

—নারীহত্যা—

বর্ষণক্লান্ত কল্‌কাতা। পথঘাট পিচ্ছিল, কর্দমাক্ত, জনশূন্য। সন্ধ্যা পেরিয়ে গেছে অনেকক্ষণ। নেমে এসেছে রাতের আঁধার।

সমস্ত বাড়ির দরজা-জানালা বন্ধ। শুধু একটি মাত্র বাড়িতে দেখা গেল তার কিছুটা ব্যতিক্রম। সমস্ত দরজা-জানালা খোলা। বাড়িতে যেন বয়ে যাচ্ছে আলোকের বন্যা। মাঝে মাঝে টেলিফোন্ ঝন্ ঝন্ শব্দে বেজে উঠছে।

এই বাড়িটিই প্রাইভেট ডিটেকটিভ দীপক চ্যাটার্জীর। ফোন তুলে জিজ্ঞাসা করল দীপক—হ্যালো, কে কথা বলছেন? ইন্‌স্পেক্টর মরিসন? হ্যাঁ, কি খবর বলুন দেখি।

উত্তর ভেসে এলো—দেখুন, রায় বাহাদুর বিমল বসুর পুরানো ইতিহাস অজ্ঞাত। তিনি মাত্র সাত বৎসর কল্‌কাতায় আছেন, তার আগেকার ইতিহাস পাওয়া যায়নি। যেন তিনি হঠাৎ আকাশ থেকে পড়েছেন বলে মনে হচ্ছে। একটু সন্দেহজনক বৈকি!

তিনি রায় বাহাদুর উপাধি পেয়েছেন গত বছর। তবে তাঁর মত বদান্য ব্যক্তির পূর্ব পরিচয় না থাকাটা অস্বাভাবিক। তাঁর কল্‌কাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও উপাধি নেই, তবে তাঁকে দেখে মনে হয় তিনি অন্তত একজন গ্রাজুয়েট। হয়ত তিনি অন্য কোনও নামে বি-এ পাশ করেছেন, হয়ত তাঁর নামটাই একটা মিথ্যা নাম।

দীপক হেসে বলল—হ্যাঁ, এটাই আমি আশা করেছিলাম। তাঁর কোনও দুর্বল স্থানে ঘা দিয়ে হয়ত চিঠি লিখেছে শ্বেতপদ্মের দল। তাই তিনি ভয়ে আমার শরণাপন্ন হয়েছেন। গোপন রহস্যের ভয়ে পুলিশের কাছে যেতে ভরসা পাননি। আর চিঠিটাও ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছেন।

হ্যাঁ, আর একটা কথা। পিস্তলের গুলি তাঁর নাইট ক্যাপ্ লক্ষ্য করে অন্য কেউ ছোঁড়েনি,—তিনি নিজেই গুলি করে নিজের টুপি ফুটো করে সাহায্য চাইতে এসেছেন যাতে প্রমাণ জোরালো হয়। তবে দীপক চ্যাটার্জীর চোখে ধুলো দেওয়া অত সহজ নয়। হয়ত শ্বেতপদ্মের বিরুদ্ধে তাঁকে সাহায্য আমি করব, কিন্তু তাঁর উপরেও আমার তীক্ষ্ণ নজর থাকবে।

মিঃ মরিসন জিজ্ঞাসা করলেন—ওদিকের কতদূর এগোল?

দীপক বলল—শ্বেতপদ্ম ফোনে বলেছে যে আমি নাকি মাত্র আর তিন দিন পৃথিবীর আলো-বাতাস উপভোগ করতে পারব! তারপর নাকি আমাদের দুজনকেই সে পৃথিবীর বুক থেকে চিরদিনের মত সরিয়ে দেবে। দেখি, রতনের কোনও সংবাদ পাচ্ছি না। একটা দলকে ফলো করে সে কতদূর এগোল কে জানে! আচ্ছা, ছেড়ে দিচ্ছি। গুড্ নাইট্।

ফোন রেখে দীপক একটু চিন্তা করছিল এমন সময় আবার টেলিফোন বেজে উঠল।

—কে?

—আমি রতন। তুই দীপক ত?

—হ্যাঁ, কতদূর এগোলি বল্ দেখি।

ওধার থেকে ভেসে এলো—অনেক দূর এগিয়েছি। ওদের দলের অনেক চ্যালা-চামুণ্ডারই ত সাক্ষাৎ পাচ্ছি কিন্তু আসল চাঁই যে কোথায় এদের মধ্যেই গা-ঢাকা দিয়ে আছে টের পাচ্ছি না। উঃ কি বিরাট এদের দল! এর মাথামুণ্ডু বের করা যার তার কর্ম নয়। তবে একটা খবর দিচ্ছি তোকে, চেষ্টা করে দেখতে পারিস। টালিগঞ্জের পোলের লাগা বাঁ দিকের সরু রাস্তায় তৃতীয় বাড়িতে আজ গোপন অভিসার হবে। চেষ্টা করে দেখতে পারিস। আমি এদিকে দলের আরগুলোর জন্যে তক্কে তক্কে ঘুরছি। আচ্ছা ভাই ছেড়ে দিচ্ছি।

অল্প সময়ের মধ্যেই দেখা গেল একটা মোটরকে সোজা দক্ষিণের দিকে ছুটে চলতে।

চৌরঙ্গী পেরিয়ে ছুটে চলেছে—আশুতোষ মুখার্জী রোড ধরল। স্টীয়ারিং হাতে বসে রয়েছে দীপক চ্যাটার্জী স্বয়ং। গতির দিকে হুঁশ নেই। দুর্যোগের রাতের ফাঁকা রাস্তা পেয়ে সে গতির পূর্ণতায় ছেড়ে দিল গাড়িকে। মনে হয় মুহূর্তের দেরীও বোধ হয় তার অসহ্য।

জগুবাবুর বাজারের কাছে দেখা গেল দুটো গাড়ি উল্টো দিকে থেকে আসছে। একটি লরী, অপরটি ট্যাক্সি। কোনও ভ্রূক্ষেপ না করে দীপক ঠিক মাঝখানের কয়েক হাত জায়গার মাঝ দিয়ে গাড়িটাকে চালিয়ে নিয়ে গেল একটুও না থেমে। কয়েক ইঞ্চির ব্যবধান হলেই হয়ত বিরাট দুর্ঘটনা ঘটে যেতো। কিন্তু সে সব দিকে নজর দেবার অবকাশ বোধ হয় তার নেই। গাড়ি ছুটে চলল। যেন বন্ধনমুক্ত কোনও হিংস্র শার্দুল।

হঠাৎ চমক ভাঙ্গল। একটা লোক তার গাড়ির সামনে এসে পড়েছে আচম্কা। প্রাণপণ শক্তিতে ব্রেক কষল দীপক। বেঁচে গেল লোকটি মাত্র কয়েক ইঞ্চির ব্যবধানে। লোকটি পথের উপরে হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

দীপক গাড়ি থেকে নেমে ছুটে গেল।

লোকটি ধীরে ধীরে উঠে বসেছে। দীপক তার কাছে ছুটে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল—এমন দুর্যোগের রাতে এভাবে পথ চলছিলেন কেন? খুব বেঁচে গেছেন এ যাত্রা—আর কয়েক ইঞ্চি এগিয়ে এলেই এতক্ষণ আপনাকে আর পাওয়া যেত না।

লোকটি হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে বলল—আমি বড় গরীব বাবু। মফঃস্বল থেকে সবে কল্কাতায় পা দিয়েছি, পথঘাট ভাল চিনি না।

দীপক বলল—আমার সময় নেই, ভীষণ জরুরী একটা কাজে যাচ্ছি, তুমি গাড়িতে উঠে বসো।

লোকটিকে গাড়িতে তুলে নিয়ে দীপক আবার পরিপূর্ণবেগে গাড়ি ছেড়ে দিল। বেগের

তীব্রতায় গাড়ি আবার ছুটে চলল গন্তব্য পথে। লোকটির দিকে ভালভাবে নজর দেবার অবকাশও দীপকের হলো না।

প্রায় মিনিট সাতেক গাড়ি চালিয়ে দীপক টালিগঞ্জের কাছাকাছি এসে পড়ল। হঠাৎ তার খেয়াল হলো পেছনের সীটে লোকটি নেই। কোথায় গেল সে? হাওয়ায় মিশে গেল নাকি কর্পূরের মত? নিশ্চয়ই পথের মাঝে কোথাও নেমে পড়েছে।

দীপক তাড়াতাড়ি গাড়ি থেকে নেমে পড়ে দাঁতে দাঁত চেপে বলল—বুঝেছি, শয়তানদের কারসাজি!

তার কথা শেষ হবার পূর্বেই অকস্মাৎ একটা বিকট শব্দ করে গাড়িটা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল।

বর্ষণমুখর কর্দমাক্ত পথের চারদিকে পেট্রল ও আগুন ছড়িয়ে পড়ল। দীপক বুঝল তার জীবননাশের জন্যে গাড়িতে টাইম-বোমা রেখে লোকটি নেমে গেছে। লোকটি নিশ্চয়ই শ্বেতপদ্মের দলের লোক। তার প্রতিটি গতিবিধির উপরেই ওদের তীক্ষ্ণদৃষ্টি রয়েছে। গাড়ি থেকে তার নামতে একটু দেরী হলেই এতক্ষণ তার দেহের পরিবর্তে কতকগুলো পোড়া মাংস পথের উপরে পড়ে থাকত।

অপরিসীম ক্রোধে দীপকের মূর্তি ভীষণ আকার ধারণ করল। একটু এগিয়ে কিছুক্ষণ খুঁজেই সে একটা বড় দোকানের সামনে এসে বলল—আপনাদের টেলিফোনটা একটু ব্যবহার করতে চাই।

দোকানদার আপত্তি করছিল, কিন্তু দীপক নিজের পরিচয় দিতেই সসম্মানে তাকে অনুমতি দিল।

দীপক ইন্স্পেক্টর মরিসনকে ফোন করল।—কে? ইন্স্পেক্টর মরিসন? এখনি যদি শ্বেতপদ্ম এবং তার দলবলকে গ্রেপ্তার করতে চান ত টালিগঞ্জের পুলের গায়ে বাঁ দিকের সরু রাস্তা ধরে তৃতীয় বাড়িখানার সামনে এসে পড়ুন। আমি ওদের আক্রমণ করলাম। আপনি তাড়াতাড়ি না এলে আমার জীবন-সংশয় হতে পারে। তবে আমাকে ভয় দেখাতে কেউ পারবে না—আমার প্রাণনাশের চেষ্টা ওরা করেছিল। আমার গাড়িটা পুড়ে গেছে, কিন্তু তবুও আমাকে আটকাতে পারবে না কেউ। হয় তাকে ধ্বংস করব নয় মরব। কিন্তু চলে আসুন এক্ষুণি—মুহূর্তের দেরীও আমার জীবন বিপন্ন করে তুলতে পারে!

কিন্তু দীপক বোধ হয় সামান্য একটু ভুল করেছিল তার হিসেবে—কারণ ওটি শ্বেতপদ্মের কোনও গোপন আড্ডা নয়। ওখানে ওদের একটা অভিযান সুরু হবে এই মাত্র।

ছোট্ট অপরিসর একটা গলি দিয়ে দীপক এগিয়ে চলল। কিছুটা গিয়েই সে এমন একটা দৃশ্য দেখল যা তাকে মুহূর্তের মধ্যে হতচকিত করে ফেলল। বাড়িটা থেকে একটা লোক সবে পথে পদার্পণ করছিল। বোধ হয় সেই পাশের বাড়িটির দরজা খুলেছে রাস্তায় বেরুবার জন্যে—এমন সময় সরু পথটিতে দণ্ডায়মান একটা মোটরের চারটি দরজা খুলে চারজন লোক মুহূর্তে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তার মাথায় ছোট ডাণ্ডার দুটি আঘাত করে নিমেষে তাকে ধরাশায়ী করে ফেলল—তারপর ধরাধরি করে তাকে গাড়িতে তোলবার উদ্যোগ করতে লাগল।

এমন একটা অবস্থায় প্রথম বিমূঢ় ভাবটা কাটিয়ে উঠেই দীপক ছুটে গিয়ে একজন লোকের তলপেটে সবেগে লাথি মারল। অপর ব্যক্তিটি সাবধান হবার আগেই তার চোয়ালে পড়ল ভীষণ একটা ঘুষি। দুজনেই পর পর কাত হয়ে গড়িয়ে পড়ল।

অবস্থার এই বিপর্যয়ে সবেগে [illegible] দীপকের দিকে।

দীপক সুযোগ বুঝে মাথা নীচু করে একজনের হাঁটুর ফাঁকে মাথাটা গলিয়ে দিয়ে আচম্‌কা সোজা হয়ে দাঁড়াল এবং সঙ্গে সঙ্গে লোকটি পপাত ধরণীতলে।

অপরজন বেগতিক দেখে মোটর গাড়িটির দিকে ধাবমান হচ্ছিল এমন সময় পেছন থেকে দীপক তাকে মারল এক লাথি। মুখ থুবড়ে লোকটি পড়ে গেল মাটির উপর।

দীপক ওদের শিকারকে কাঁধে তুলে নিয়ে বাড়িটির দিকে এগোবে এমন সময় শুনতে পেল পেছনে কে যেন হেঁকে উঠল—এই মাথার উপরে হাত তোল্‌ শয়তান, আর ওই লোকটাকে এই গাড়িতে এনে রাখ্‌।

দীপক ভাল করে শিকারটির মুখের দিকে চাইবার অবকাশও পেল না, হতভম্ব হয়ে পড়ল সে।

সে ভেবেছিল আততায়ী মাত্র চারজন, কিন্তু গাড়িতে যে পঞ্চম ব্যক্তি লুকিয়ে বসে আছে এ ধারণা তার হয়নি। দেখল, পঞ্চম ব্যক্তির সারাদেহ কালো কাপড়ে ঢাকা। মুখে মুখোশ। হাতে একটা কালো পিস্তল। কোন উপায়ান্তর না দেখে সে ধীরে ধীরে লোকটিকে বহন করে গাড়িটির দিকে অগ্রসর হলো।

পিস্তলধারী লোকটি বলল—শয়তানের দেহে তাকৎ আছে বটে! একাই ওই চারটে ভেড়াকে মেরে খুব শক্তি দেখিয়েছিস্‌ যা হোক্‌! ওই চার বেটাকেও গাড়িতে তুলে দে, তারপর যে জাহান্নমে খুশি চলে যা।

দীপক একটু খুশি হলো। মুখোশধারী তাকে গোয়েন্দা দীপক চ্যাটার্জী বলে চিনতে পারেনি, মনে করেছে সাধারণ কোনও পথচারী।

দীপক ধীরে ধীরে দেহগুলি বহন করে মোটরে তুলে দিল। তারপর যেই সে দেখল যে সে লোকটির পাশে এসে দাঁড়িয়েছে এবং পিস্তলের মুখ আছে সামনের দিকে—সে তার হাতের ছোট ডাণ্ডাটা দিয়ে আচম্‌কা সজোরে আঘাত করল লোকটির হাতে।

সঙ্গে সঙ্গে তার হাতের পিস্তল ছিট্‌কে পড়ল। মুহূর্তের অপেক্ষা না করে দীপক তার উপরে ভীমবেগে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে কাবু করে ফেলল। তার পর চট্‌ করে শিকারটিকে কাঁধে নিয়ে পাশের বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করল। তারপর সোজাসুজি দরজায় খিল্‌ এঁটে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে লোকটিকে একটি সোফার উপর শুইয়ে দিল। আন্দাজে সুইচ টিপে আলো জ্বালতেই দেখল লোকটি আর কেউ নয় রায় বাহাদুর বিমল বসু স্বয়ং।

রায় বাহাদুরের মাথায় ফেল্ট হ্যাট্‌ থাকার জন্য আঘাতটা তত গুরুতর হয়নি। একটু পরেই তিনি ধীরে ধীরে চোখ মেলে চাইলেন। চারদিকে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে বিহ্বলভাবে তিনি শুধু বললেন—আমি কোথায়? আমার মাথাটা এমন ঘুরছে কেন?

দীপক বলল—আপনি এই বাড়ি থেকে বাইরে বেরিয়েছিলেন, এমন সময় জন পাঁচেক লোক আপনাকে আক্রমণ করেছিল, কিন্তু ঠিক সেই সময় আমি এসে পড়ায় লোকগুলোকে তাড়িয়ে আপনাকে এখানে নিয়ে আসি।

রায় বাহাদুর বললেন—হ্যাঁ, মনে পড়েছে বটে। এটি আমার এক বান্ধবীর বাড়ি। তিনি একটু আগে বাইরে গেছেন, আমি একাই বসেছিলাম এখানে। এমন সময় কড়া নাড়ার শব্দে দরজা খুলতেই অকস্মাৎ কোথা থেকে চারজন লোক একসঙ্গে আক্রমণ করল। আমার মাথাটাকে

তারা যেন বল মনে করে তাদের হাতের ডাণ্ডা দিয়ে অবিরাম আঘাত করে চলল, আর আমিও জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়লাম। কিন্তু আপনাকে কোথায় দেখেছি বলে মনে হচ্ছে যেন! আপনিই গোয়েন্দা দীপকবাবু, না?

দীপক হেসে বলল—হ্যাঁ, আমি একটা খবর পেয়ে এদিকে এসে পড়েছিলাম। আমার ঠিক ধারণা ছিল এটা বোধ হয় মস্তবড় একটা আড্ডাখানা, কিন্তু এটি যে শিকারস্থল তা জানতাম না। কিন্তু একটা কথা, আপনি যে আজ এখানে আসবেন তা কি কেউ জানত?

রায় বাহাদুর বলতেন—না, তেমন কেউই জানত না বটে। তবে আমার বান্ধবীকে একটা চিঠি লিখেছিলাম।

দীপক কোনও কথা বলবার পূর্বেই দরজার কড়া নড়ে উঠল। ঘরে প্রবেশ করল একটি তরুণী। দীপক একবার তার দিকে চাইতেই সে উচ্ছ্বসিত স্বরে বলে উঠল—একি, রায় বাহাদুর, আপনি শুয়ে রয়েছেন কেন? আপনার কি শরীর খারাপ? আর ইনি কে? এঁকে ত চিনি না।

দীপক ভাল করে চেয়ে দেখল মেয়েটি অনিন্দ্যসুন্দরী। অপরূপ লাবণ্য তার সর্বাঙ্গে। বাংলায় কথা বললেও তার কথার মধ্যে একটা বিদেশী টান আছে। দীপক একদৃষ্টে মেয়েটির দিকে চাইল।

মেয়েটি তার তীব্র দৃষ্টি সহ্য করতে না পেরে মাথা নামিয়ে নিয়ে বলল—কি ব্যাপার রায় বাহাদুর?

রায় বাহাদুর অস্ফুটস্বরে কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন, তাঁকে বাধা দিয়ে দীপক বলল—আপনি বেরিয়ে যাবার একটু পরেই এঁর উপরে আক্রমণ হয়েছিল। একদল লোক দরজা খোলামাত্রই এঁর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে এঁর মাথায় আঘাত করে। আমি ঠিক সেই সময় এসে পড়ায় দুর্বৃত্তগণ পলায়ন করতে বাধ্য হয় এবং আমি এঁকে উদ্ধার করেছি।

তারপর একটু থেমে বলল—কিন্তু আপনাকে কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবার আছে, আশা করি যথাযথ উত্তর পাব।

মেয়েটি তীব্রকণ্ঠে বলে উঠল—না, আপনার কোনও প্রশ্নের জবাব দিতে আমি বাধ্য নই।

রায় বাহাদুরের ক্ষীণকণ্ঠ শোনা গেল—উনি যা জিজ্ঞাসা করবেন তার জবাব দাও লছমী, উনিই বিখ্যাত প্রাইভেট ডিটেকটিভ দীপক চ্যাটার্জী।

ঘরের ভিতরে বজ্রপাত হলেও বোধ হয় লছমী এতটা চমকে উঠত না। সে একবার তার দৃষ্টিটা দীপক চ্যাটার্জীর মুখের উপর তুলে ধরে শুধু বলল—বলুন—

দীপকের মনে হলো সে এ মেয়েটিকে ইতিপূর্বে কোথায় যেন দেখেছে, কিন্তু কোথায় তা সে মনে করে উঠতে পারল না। একটু থেমে সে প্রশ্ন করল—আজ সন্ধ্যায় রায় বাহাদুর এখানে আসবেন বলে যে চিঠি লিখেছিলেন সে সংবাদ কি অন্য কেউ জানত?

লছমী একটু ইতস্তত করে বলল—না।

দীপক তারপর জিজ্ঞাসা করল—রায় বাহাদুরের সাথে আপনার কতদিনের পরিচয়?

মেয়েটি বলল—পরিচয় দীর্ঘদিনের নয়, মাত্র দিন পাঁচ-ছয় হবে। প্রথম ওঁর সাথে আমার আলাপ হয় মেট্রোতে, তারপর সে পরিচয় ঘনিষ্ঠতর হয়—কিন্তু এই সামান্য আলাপেই উনি আমার বন্ধুশ্রেণীভুক্ত হয়েছেন।

দীপক শুধু বলল—হুঁ। তারপর একটু থেমে বলল—আপনি এই বাড়ি ভাড়া নিয়েছেন কতদিন?

মেয়েটি বলতে যাচ্ছিল—বছর তিনেক।

দীপক বাধা দিয়ে ধমক দিয়ে উঠল—মিথ্যা কথা! আপনি দিন সাতেকের বেশি এ বাড়ি ভাড়া নেননি—

মেয়েটি বাধা পেয়ে চুপ করল। দীপক বলল—কি, সত্যি কি না?

মেয়েটি বলল—হ্যাঁ।

দীপক বলল—ওই যে দালানের গায়ে পূর্বতন মালিকের নাম পেন্সিল দিয়ে লেখা আছে। তার সাথে যে তারিখ বসানো আছে তা গত মাসের। সুতরাং...

তারপর একটু থেমে বলল—এই জলবৃষ্টির রাতে হঠাৎ বেরিয়েছিলেন কোথায়?

মেয়েটি বলল—রসা রোডের মোড়ে আমার এক বান্ধবীর বাড়ি—

দীপক ধমক দিয়ে বলল—আবার মিথ্যা কথা! আপনি আশেপাশেই কোথাও ছিলেন, এতখানি যাতায়াত করবার ক্লান্তি নেই আপনার দেহের কোথাও। বলুন, কি উদ্দেশ্যে রায় বাহাদুরের মত প্রৌঢ় লোককে নাচিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছেন? কার কাছে আপনি টাকা নিয়ে এ কাজে নিযুক্ত হয়েছেন?

মেয়েটি তীব্রকণ্ঠে বলে উঠল—সব মিথ্যা কথা, আমাকে ষড়যন্ত্রে ফেলবার জন্যে মিথ্যা চেষ্টা করছেন...

দীপক হেসে বলল—উত্তেজিত হবেন না। আপনি যে কার দ্বারা নিয়োজিত হয়েছেন তা আমি জানি। কিন্তু আপনি নিজেও জানেন না। আপনি কেবল প্রচুর টাকা পেয়ে তাকে এ কাজে সাহায্য করছেন। ভয় নেই, আপনাদের মত চুনোপুঁটিদের নিয়ে আমার কারবার নয়। আমি চাই সেই দলপতি শ্বেতপদ্ম এবং তার সাঙ্গোপাঙ্গদের।

বাইরে শোনা গেল প্রচণ্ড হর্ণের শব্দ।

দীপক বলল—ওই যে ইন্‌স্পেক্টর মরিসন এসে গেছেন। আর চিন্তা নেই, তিনি আপনাকে নিয়ে যা ইচ্ছা করুন। আমি চললুম শ্বেতপদ্মের সন্ধানে।

মিঃ মরিসন সদলে প্রবেশ করে বললেন—কই মিঃ চ্যাটার্জী, আপনার শ্বেতপদ্ম কোথায় গেল?

দীপক বলল—আর একটু আগে আসলে হয়ত পেতেন, কিন্তু এখন বাসা একেবারে ফাঁকা। পাখী অনেক আগেই গা-ঢাকা দিয়েছে। এই যে তার এক অনুচর, একে নিয়ে আপনারা গারদে পুরতে পারেন। এর পেছনে চেষ্টা করলে অনেক তথ্য বের হতে পারে—এই বলে সে মেয়েটির দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করল।

এমন সময় শোনা গেল একটা পিস্তলের শব্দ। মেয়েটি অস্ফুট আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়ল।

দীপক ও মিঃ মরিসন ছুটে গেলেন পিস্তল হাতে জানালার দিকে। দূরে দেখা গেল একটা কৃষ্ণবস্ত্রাবৃত অপসৃয়মান মূর্তি। লোকটি মোটর সাইকেলে উঠে বসল। সেই মুহূর্তেই মোটর সাইকেলটি তাকে বুকে নিয়ে তীব্রবেগে অদৃশ্য হয়ে গেল।

দীপক ক্ষীণ হেসে বলল—শ্বেতপদ্ম কোনও প্রমাণ ফেলে রাখে না।

আট

—শ্বেতপদ্মের আরও কীর্তি—

রাতের অফুরন্ত ক্লান্তির শেষে দীপক যখন বাড়ি ফিরল তখন ভোর হতে অল্প বাকী আছে। কখন যে টলতে টলতে গিয়ে নিজের বিছানায় গা এলিয়ে দিল তা সে নিজেও বোধ হয় জানে না।

যখন তার ঘুম ভাঙ্গল তখন প্রভাতের রোদ সারা পৃথিবীর বুকের উপরে দেবতার আশীষের মত ঝরে পড়ছে।

চাকর মধু এসে এক পেয়ালা চা এনে তাকে ডেকে বলল—বাবু, অনেক বেলা হয়েছে, এবারে উঠুন।

দীপক হেসে বলল—হ্যাঁ, কাল সারারাত যা পরিশ্রম গেছে! পর পর দু'বার ত প্রাণ প্রায় যায় যায় হয়েছিল। যাক্‌গে, স্নানের ঘরে জল এসেছে ত? একটু স্নান করব।

মধু বলল—হ্যাঁ বাবু, অনেকক্ষণ জল এসে গেছে কলে। এবারে উঠে স্নান করে চা-টা খেয়ে ফেলুন।

স্নান করে চা খেয়ে দীপক যখন খবরের কাগজটা হাতে নিয়ে বসল তখন তার দেহে রাতের ক্লান্তির চিহ্নমাত্রও অবশিষ্ট নেই।

খবরের কাগজ থেকে মুখ তুলে দীপক একসময় বলল—এত বেলা হলো—রতন ত এখনও ফিরল না। কোথায় যে ঘুরছে!

মধু বলল—সে কি বাবু, কাল রাতে আপনি ফোন পেয়ে বেরিয়ে যাবার ঘণ্টাখানেক পরেই ত ছোটবাবু ফিরে এসেছিলেন! তারপর আপনিই ত তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। আপনার সাথে ছোটবাবুকে ফিরে আসতে না দেখে আমি মনে করেছি আপনিই বোধ হয় তাঁকে কোথাও পাঠিয়েছেন।

দীপক আশ্চর্য হয়ে বলল—আমি তাকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম? কি বলছিস তুই মধু? আমি ত তার বিন্দুবিসর্গও জানি না।

মধু কম বিস্মিত হয়নি। সে বলল—হ্যাঁ, কাল রাতে একজন লম্বা দোহারা চেহারার লোক এসে ছোটবাবুকে বলল যে আপনি তাঁকে অত্যন্ত জরুরী প্রয়োজনে নাকি তলব করেছেন। এমন কি সে আপনার লেখা একখানা চিঠিও দেখাল। তাই ত ছোটবাবু বিন্দুমাত্রও অপেক্ষা না করে তৎক্ষণাৎ ছুটে বেরিয়ে গিয়েছিলেন।

দীপকের আশ্চর্যের মাত্রা আরও বেড়ে গেল। সে বলল—আমি চিঠি দিয়েছি? কই দেখি সে চিঠি!

মধু বলল—চলুন, ছোটবাবুর ঘরে সে চিঠিটা আছে।

দুজনে একসঙ্গে রতনের ঘরে প্রবেশ করল। রতনের টেবিলে দেখা গেল একটা সাদা কাগজ পড়ে আছে—তার উপরে ছোট ছোট অক্ষরে কয়েক ছত্র লেখা—

ভাই রতন,

তোর কথামত যাত্রা করেছি। কিন্তু তোর সাহায্য আমার অত্যন্ত প্রয়োজন। তুই পত্রপাঠ পত্রবাহকের সাথে রওনা হয়ে চলে আয়। ইতি—

তোর

দীপক।

দীপক ভাল করে চেয়ে দেখল হাতের লেখাটা এমনভাবে হুবহু তার হাতের লেখাকে অনুকরণ করা হয়েছে যে সহজে বোঝা যায় না সেটা জাল না আসল।

দীপক নিজের অজ্ঞাতেই অস্ফুট কণ্ঠে বলে উঠল—অদ্ভুত ধীশক্তি শ্বেতপদ্মের দলের।

মধু জিজ্ঞাসা করল—ছোটবাবু কোথায় গেছেন বাবু?

দীপক বলল—সে শয়তানদের জালে আট্‌কা পড়ে গেছে মধু।

তারা কয়েক পা এগিয়ে বাইরের বারান্দায় পা দিতেই দীপকের নজর পড়ল একটা অদ্ভুত পুরু খাম সেখানে পড়ে আছে। কাল রাতের আঁধারে সে সেটা দেখতে পায়নি।

দীপক খামটা তুলে নিয়ে মুখ খুলতেই একটা ছোট্ট কাগজ বেরিয়ে এলো। তাতে লেখা—

প্রিয় গোয়েন্দাপ্রবর,

শ্বেতপদ্ম কোনও দিন প্রতিহিংসা নিতে ভুল করে না বন্ধু। তোমার সহকারীকে নিয়ে চললাম। যদি সাধ্য থাকে আমার হাত থেকে তাকে তোমার সমস্ত পুলিশবাহিনীর সাহায্যে ছাড়িয়ে আনতে পার। এর পরেই পড়বে তোমার পালা। আশা করি যথেষ্টই বুঝতে পেরেছ যে শ্বেতপদ্ম তার কথা রাখতে জানে। ইতি—

তোমার বন্ধু
শ্বেতপদ্ম।

দীপকের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠল। ক্রোধে তার সারা দেহ কাঁপতে লাগল। মুহূর্তে সে যেন বিভীষণ আকার ধারণ করল। শ্বেতপদ্মের দলপতিকে সামনে পেলে সে তক্ষুণি টুঁটি চেপে তাকে মেরে ফেলতে ইতস্তত করত না।

মধু ভীতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল—কি হলো বাবু?

দীপক দাঁতে দাঁত চেপে বলল—শ্বেতপদ্মের শেষ দিন ঘনিয়ে এসেছে। শয়তানকে এমন শিক্ষা আমি দেব যে তার কথা চিন্তা করতেও অন্য যে কোনও লোক ভয়ে শিউরে উঠবে। এক মুহূর্ত সময়ও আমি আর তাকে দেব না।

দীপক উঠে গিয়ে চা-টা খেয়ে গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে বলল—চললাম মধু। তোর ছোটবাবুকে নিয়ে ফিরে আসব।

গাড়ি ছুটে চলল ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড ধরে।

নয়

—মুখোমুখি—

ব্যরাকপুর অঞ্চলে চিন্তারামের চায়ের দোকান পাঠকের পূর্বপরিচিত। বড় রাস্তা থেকে বেরিয়ে কিছুদুর গিয়ে দোকানটি। আশেপাশে জনমানবের স্বল্পতা।

গাড়িটাকে একটা জঙ্গলের ভিতরে লুকিয়ে রেখে সারাদিন দীপক এই দোকানটির উপর নজর রেখেছে। সর্বাঙ্গে ঘা, এক পা খোঁড়া যে ভিক্ষুকটা সর্বক্ষণ দোকানের অদূরে বসে তারস্বরে চীৎকার করে ভিক্ষা করছে, সেই যে গোয়েন্দা দীপক চ্যাটার্জী তা বুঝে ওঠা অত্যন্ত পরিচিত লোকের পক্ষেও অসম্ভব।

পথ-চলতি প্রত্যেকটি লোককে লক্ষ্য করে এবং অনেক কথা শুনেও তার মনে কোনও নির্দিষ্ট ধারণা হয়নি কোথায় শ্বেতপদ্মের গোপন আস্তানা এবং কে আসল শ্বেতপদ্মের দলপতি।

তবে তার দলবল যে আশেপাশে এবং সর্বত্র ছড়িয়ে আছে তা সে বুঝতে পেরেছে বেশ স্পষ্টই। অনেকের মুখেই সে শুনেছে 'কর্তা'র কথা, কিন্তু কে যে এদের দলের কর্তা এবং কিভাবে তার আদেশ প্রচারিত হয় তার বিন্দুমাত্র আভাসও সে জানতে পারেনি।

তারপর একসময় সে দেখল যে চায়ের দোকানটি বন্ধ হয়ে গেল এবং দোকানে চাবি লাগিয়ে চিন্তারাম আলো হাতে নিয়ে চলে গেল তার গৃহের পথে। দীপকের পাশ দিয়ে যাবার সময় দীপক হাত তুলে বলল—বাবু, এ খোঁড়াকে একটা পয়সা—

তার মুখের কথা শেষ হবার আগেই চিন্তারাম এবং তার সঙ্গের চুনীলাল নাক সিঁটকে বলে উঠল—যত সব ভিখিরীর উৎপাত! এদের যন্ত্রণায় টেকা দায়।

চুনীলাল চিন্তারামের দোকানে সামান্য মাইনেয় কাপ্-ডিশ্ ধোয়। তার মুখে এই কথা শুনে দীপকের ধারণা হলো, নিশ্চয় তারও বেশ কিছু উপরি আয়ের পথ খোলা আছে, নইলে এত বড় কথা তার মুখ দিয়ে বের হতো না।

ওরা চলে গেল। দীপক চুপচাপ বসে রইল। মিনিট পনেরো কেটে গেল। আধঘণ্টা—

কে একজন ধীরে ধীরে যেন এগিয়ে চলেছে দোকানের দিকে। একটু পরেই তালা খুলে দোকানের ভিতরে প্রবেশ করল মূর্তিটি। দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল। একটা আলোকের রেখা এসে পড়ল পথের উপরে জানালার ফাঁক দিয়ে।

লাঠিতে ভর দিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে দীপক এগিয়ে চলল দোকানের দিকে। তারপর জানালার সেই ছিদ্রে চোখ দিয়ে অনেক কষ্টে ভিতরে দৃষ্টি সঞ্চালন করল।

ভিতরে চোখ দিয়ে যে দৃশ্য উদঘাটিত হলো তার চোখের সামনে তা যেমন আশ্চর্য, তেমনি অভূতপূর্ব!

একজন লোক সর্বাঙ্গ কালো পোষাকে আবৃত, মুখে মুখোশ, বসে আছে তার দিকে পেছন ফিরে। একটা ট্রান্সমিটার তার সামনে ফিট করা।

সে যেন বিড় বিড় করে কি সব বলে চলেছে। কাকে যেন কোন একটা অজানা নির্দেশ দিচ্ছে যা দীপক ধারণা করতে পারল না মোটেই।

দীপক ইতস্তত করতে লাগল। কি করা যায় স্থির করতে পারল না মোটেই। তার আপাদমস্তকে যেন বিদ্যুতের শিহরণ বয়ে গেল। একবার কোমরে হাত দিয়ে অনুভব করল তার পিস্তলটা যথাস্থানেই আছে। তারপর আবার লোকটির দিকে মনোনিবেশ করল।

একসময় শুনল লোকটি যেন একটু ব্যস্ত হয়ে উঠল। একটু তীব্রকণ্ঠে বলল—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি যা বলছি তার একবিন্দু ব্যতিক্রম যেন না হয়। রতনলালকে ওই ভূগর্ভস্থ কক্ষেই আট্‌কে রাখবে। যে করেই হোক্ দীপক চ্যাটার্জীকে কাল সকাল হবার পূর্বেই আটক করা চাই!

তারপর একটু থেমে বলল—কি বললে? দীপক চ্যাটার্জী সারাদিন তার বাড়িতে চুপচাপ শুয়ে আছে, তার সহকারী অদৃশ্য হওয়াতে সে একটুও বিচলিত হয়নি! আশ্চর্য! কিন্তু প্রয়োজন হলে তাকে ভুলিয়ে এনে এক ফাঁকে আট্‌কে ফেলতে হবে।

দীপক শুনে মনে মনে হেসে উঠল। সে তার শোবার ঘরে তার নিজের আকৃতির একটি মোমের পুতুল শুইয়ে রেখে এসেছিল যা দেখে শ্বেতপদ্মের অনুচরেরা মনে করেছে যে দীপক চ্যাটার্জী নিশ্চিন্ত হয়ে শুয়ে আছে। কিন্তু এ অভিনয় আর বেশিক্ষণ চলবে না। একবার ওরা টের পেলেই যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করবে।

দীপক শুনতে পেল কালো পোষাক পরা লোকটি বলে চলেছে—দীপক চ্যাটার্জী আর তার সহকারীকে একই সঙ্গে আমি ধ্বংস করবো। আর রায় বাহাদুরের ওপরেও এবার আমার আক্রমণ সুরু হবে। তোমরা তিনজন সেখানে চলে যাও।

রায় বাহাদুরকে দীপক চ্যাটার্জীর নামের জাল চিঠি দিয়ে বাড়ির বাইরে আনবে। তারপর তাকে ফাঁদে ফেলতে হবে। শয়তানের কাছ থেকে আরো চাপ দিয়ে টাকাটা আদায় করতে হবে। আগে চেকটা পেয়ে নিই—তারপর ওকেও শেষ করে ফেলতে বিন্দুমাত্র মমতা জাগবে না আমার মনে। শয়তানকে দেখিয়ে দিতে হবে দীপক চ্যাটার্জীর চেয়ে শ্বেতপদ্মের ক্ষমতা অনেক বেশি।

এর বেশি শোনার ইচ্ছা আর দীপক চ্যাটার্জীর ছিল না। সে ধীরে ধীরে দরজাটার সামনে গিয়ে পিস্তলটা বের করে নিলো। তারপর উদ্যত পিস্তল নিয়ে দরজাটা ধাক্কা দিয়ে খুলে এক লাফে এসে দাঁড়াল শ্বেতপদ্মের দলপতির ঠিক পেছনে। গর্জন করে বলল—মাথার উপরে হাত তোলো শ্বেতপদ্ম।

কালো মুখোশ পরা লোকটি একবার দীপকের দিকে তাকাল, আর একবার হাতের উদ্যত পিস্তলটির দিকে। তারপর হাত দুটো তুলে মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল—ও, তুমিই দীপক চ্যাটার্জী? তোমার বুদ্ধির তারিফ করছি বন্ধু। তোমার মেক-আপের কৌশলের কথা অনেক শুনেছি বটে, তবে তুমি যে ভিখিরী সেজে আমাদের চোখের সামনেই দাঁড়িয়ে কাজ করে যাবে তা ছিল সম্পূর্ণ আমার ধারণার বাইরে...

দীপক বলল—হ্যাঁ, তোমার লীলাখেলা এবারেই শেষ হবে বন্ধু!

লোকটি অট্টহাস্যে ভেঙ্গে পড়ে বলল—কি বন্ধু, দস্যু প্রদ্যুম্নকে গ্রেপ্তার করবে তুমি? তোমার যথেষ্ট সাহস আছে দেখছি—হাঃ হাঃ হাঃ—

মুহূর্তের মধ্যে কি যে ঘটে গেল দীপক বুঝতেই পারল না। লোকটি একবার পা দিয়ে ঘরের মেঝের একস্থানে চাপ দিল। তারপর প্রচণ্ড একটা শব্দ শোনা গেল। থর থর করে কেঁপে উঠল চারদিক। দীপক চ্যাটার্জীর মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। জ্ঞানহারা হয়ে লুটিয়ে পড়ল সে। শুধু শোনা গেল শ্বেতপদ্মের দলপতির বিকট অট্টহাসির শব্দ—হাঃ হাঃ হাঃ...

মধ্যরাত্রির গাঢ় অন্ধকারাচ্ছন্ন আকাশ তখন অগ্নির লেলিহান শিখায় আলোকিত হয়ে উঠেছে। চিন্তারামের চায়ের দোকানের একটি টুকরোও আর অবশিষ্ট রইল না।

দশ

—বৈঠকে—

ওদিকে সহরের অন্য প্রান্তেও চলছিল অদ্ভুত কতকগুলি ঘটনার সমাবেশ।

মাঝরাতে হঠাৎ রায় বাহাদুর বিমল বসুর ঘুম ভাঙ্গল টেলিফোনের ঝন্ ঝন্ শব্দে। ছুটে গিয়ে তিনি টেলিফোন তুললেন—হ্যালো, কে?

ওপার থেকে শোনা গেল অনেকটা দীপক চ্যাটার্জীর অনুরূপ কণ্ঠস্বর—আমি দীপক চ্যাটার্জী কথা বলছি, রায় বাহাদুর।

বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে রায় বাহাদুর বললেন—এত রাতে হঠাৎ আপনার আবার কি প্রয়োজন হলো আমাকে?

ওপার থেকে ভেসে এলো—হ্যাঁ, আপনাকে আমার অত্যন্ত জরুরী প্রয়োজন। শ্বেতপদ্মের সমস্ত ষড়যন্ত্র ভেদ করে তাকে গ্রেপ্তার করেছি। এখন সে বলছে যে আপনিই নাকি অতীতের কোন্ একটা খুনের কেসের আসামী বিনয় পালিত। কিন্তু আমি তা মোটেই বিশ্বাস করি না। আমার মনে হয় এটা তার অন্য কোনও উদ্দেশ্য-প্রণোদিত। এই কথাটাই আমি আপনার সাহায্যে প্রমাণ করতে চাই।

রায় বাহাদুর নিজের বিচলিত ভাবকে অনেক কষ্টে দমন করে বললেন—না না, ওসব স্রেফ ধাপ্পা! বিনয় পালিত আমি নিজে হওয়া ত দূরের কথা, ওরকম নামের কোনও লোককে চিনি না পর্যন্ত! যাক সে কথা, আপনি ফোন ছেড়ে দিন। আমি এক্ষুণি আসছি। শ্বেতপদ্মকে যে গ্রেপ্তার করেছেন এতে আমি যে কি পরিমাণ আনন্দিত হয়েছি তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। কোথা থেকে আপনি এখন কথা বলছেন?

ওধার থেকে উত্তর এলো—আজ্ঞে আপনি সোজা ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড ধরে চলে এসে সতু ব্যানার্জী লেনের মোড়ে গাড়ি থেকে নামবেন। এখানেই আমি অপেক্ষা করছি আপনার জন্যে। বাঁদিকের ছোট দোতলা বাড়িটায়।

রায় বাহাদুর খুশিভরা কণ্ঠে বললেন—ধন্যবাদ আপনাকে।

তিনি নীচে নেমে এসে ড্রাইভারকে গাড়ি বের করতে বললেন। তাঁকে নিয়ে গাড়ি যখন তীব্রবেগে নিশীথ নগরীর পথ ধরে ছুটে চলল তখন রাত দুটো বেজে গেছে।

সতু ব্যানার্জী লেনের সামনে এসে যখন তাঁর গাড়ি পৌঁছুল তখন তিনি অবাক হলেন চারদিকের নিস্তব্ধতা ও গাঢ় অন্ধকার দেখে।

চারদিকে ভাল করে চেয়ে তিনি দেখতে লাগলেন। না, কেউই ত তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছে না। দীপক চ্যাটার্জী কি তাঁর সাথে রসিকতা করল? কিন্তু রসিকতা করবার লোক ত দীপক চ্যাটার্জী নয়! তবে!

ধীরে ধীরে সাহসে ভর করে গাড়ি থেকে নেমে তিনি এগুতে লাগলেন। ড্রাইভার গাড়ির মধ্যেই চুপচাপ বসে রইল।

অন্ধকারের মধ্যে পা টিপে টিপে কিছুটা এগিয়েই বাঁদিকে ছোট একতলা দোতলা বাড়ি। রায় বাহাদুর স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। তিনি ঠিকই এসেছেন।

বাড়িটা ঘুটঘুটে আঁধারের মধ্যে যেন ডুবে আছে। দোতলায় একটা ঘরে মিটমিট করে আলো জ্বলছে।

রায় বাহদুর দু-একবার জোরে চীৎকার করেই ধরাশায়ী হয়ে পড়লেন।

ওধারে রায় বাহাদুরের ড্রাইভারকেও কয়েকজন দুর্বৃত্ত বেঁধে ফেলল।

তিনি যে মস্ত একটা ফাঁদে পা দিয়েছেন একথা ভাল করে বুঝে ওঠবার পূর্বেই শ্বেতপদ্মের হাতে বন্দী হলেন রায় বাহাদুর বিমল বসু।

তাঁকে ভাল করে বেঁধে ফেলে, মুখে একটা রুমাল গুঁজে দিয়ে রশিদ খাঁ বলল—যাক্, এতদিন পরে খুব বড় একটা শিকার পাওয়া গেল। কর্তার কাছে মোটা কিছু বকশিস মিলবে।

তার সাথে ছিল ভরত সিং। সে হেসে বলল—আরে খাঁচায় পুরে বাঘকে আট্কাতে সবাই পারে। আসল কাজ ফোন করলাম ত আমি। দীপক চ্যাটার্জীর গলার স্বর এমন নকল করেছিলাম যে রায় বাহাদুরের বাবার সাধ্যি ছিল না যে বুঝতে পারে!

রশিদ খাঁ বিকৃত হাসি মুখে ফুটিয়ে বলল—আসল দীপক চ্যাটার্জী এতক্ষণ মাটির তলার ঘরে শুয়ে শুয়ে নিজের মৃত্যুর প্রহর গুণছে।

দু'জনে একসঙ্গে হাসিতে মুখর হয়ে উঠল।

এগারো

—পলায়ন—

দীপক ধীরে ধীরে জ্ঞান ফিরে পেলো। সহস্র রাত্রি গাঢ় নিদ্রার পর সে চোখ মেলে চাইল যেন।

নড়বার চেষ্টা করতেই দেখল যে তার হাত-পা বেশ দৃঢ়ভাবে বাঁধা। স্যাঁৎসেঁতে ভিজা মাটির উপরে সে শুয়ে রয়েছে। চারদিকে গাঢ় অন্ধকার।

ধীরে ধীরে সে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। সামান্য ভুলের জন্য আজ তাকে শ্বেতপদ্মের দলের হাতে এভাবে বন্দী হতে হয়েছে!

কোমরে অনুভব করে দেখল সেখানে রিভলবার নেই। এদিকের কোমরে ছোট্ট ছুরিটা এখনও আছে। কিন্তু হাত-পা যেভাবে দৃঢ়সংবদ্ধ তাতে ছুরিটা পাবার কোনও উপায় নেই।

দীপক মাটির সাথে হাতটা ঘষবার চেষ্টা করল। কিন্তু তাতেও কোন লাভ নেই। ভিজা স্যাঁৎসেঁতে মাটির সাথে সারাদিন ঘষলেও হাত দুটো মুক্ত হবে না! ব্যর্থ ক্ষোভে সে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল।

ওধার থেকে তার দীর্ঘশ্বাস শুনে কে যেন প্রশ্ন করল ফিস্ ফিস্ করে—কে?

দীপকের সমস্ত অনুভবশক্তি যেন তীক্ষ্ণ হয়ে উঠলো। সেও ফিস্ ফিস্ করে উত্তর দিল—কে ওখানে? যেই হোন নিশ্চয়ই আপনি শ্বেতপদ্মের হাতে বন্দী?

এবারে কণ্ঠস্বর দীপক স্পষ্ট চিনতে পারল। খুশিভরা মনে বলল—আরে রতন, তুইও ওখানে?

রতনও বোধ হয় দীপকের গলার স্বর শুনে চিনতে পেরেছিল। হেসে বলল—হ্যাঁ ভাই। আমাকে ফাঁদে ফেলে আচ্ছা জব্দ করেছে বটে! কিন্তু তুইও এখানে এলি কি করে?

দীপক হেসে বলল—নিয়তির চক্র! যাকে গ্রেপ্তার করলুম, সেই আমাকে গ্রেপ্তার করল।

তারপর একটু থেমে বলল—কিন্তু শ্বেতপদ্ম নির্বিঘ্নে কাজ করে যেতে থাকলে কত নিরীহের যে সর্বনাশ হবে তার ঠিক নেই। যে করেই হোক মুক্ত হতে হবে।

রতন বলল—কিন্তু আমার যে হাত-পা বাঁধা।

দীপক গড়িয়ে গড়িয়ে রতনের পাশে গিয়ে উপস্থিত হলো। তারপর বলল—আমার কোমরে যে ছোট্ট একটা ছুরি ছিল তা বোধ হয় ওরা টের পায়নি। যাই হোক আমার কোমর থেকে ছুরিটা বের কর দেখি।

গড়িয়ে গড়িয়ে দীপক তার কোমরকে রতনের হাতের কাছে এনে ফেলল।

রতন অনেক কষ্টে তার কোমর থেকে ছুরিটা নিতেই দীপক কেঁচোর মত বুকে হামাগুড়ি দিয়ে তার হাত দুটি রতনের হাত দুটির সামনে এনে ধরল।

রতন অনেক কষ্টে দীপকের হাতের বাঁধন কেটে ফেলল।

দীপক উঠে বসে তার নিজের পায়ের এবং রতনের বাঁধন কেটে ফেলল। কিন্তু বের হবার কোনও উপায়ই ওদের চোখে পড়ল না।

অনেক অনুসন্ধানের পর কোনও উপায় না পেয়ে দীপক একটু হতাশ হয়ে পড়েছিল। রতন একসময় বলল—এক কাজ করলে মন্দ হয় না কিন্তু। বেশ ভাল প্ল্যান...

দীপক বলল—কি প্ল্যান?

রতন বলল—এটা মাটির তলার একটা গুদামঘর। এখান থেকে বাইরে বের হওয়া প্রায় অসম্ভব। এর কোথাও একটা এমন সুইচ আছে যা টিপলেই এই দরজাটা আপনি খুলে যায় আর গোটা ঘরটাই একটা খাঁচার মত ধীরে ধীরে উপরে উঠে যায়। তার ঠিক বিপরীত সুইচ টিপলেই দরজা বন্ধ হয়ে ঘরটা নীচে নেমে আসে। সে পথ ছাড়া অন্য কোনও পথ নেই। কিন্তু সে সুইচটাই বা চালিয়ে দেবে এমন সাহস কার আছে।

দীপক কিছুক্ষণ ঘরের চারদিক দেখে বলল—আচ্ছা, এদিকের দরজাটা সুইচ টেপার জন্যই বৈদ্যুতিক উপায়ে বন্ধ হয়ে ঘরটা নীচে নেমে আসে; কিন্তু ওদিকের দরজাটা কিসের জন্যে?

রতনের মাথায় এটা আসেনি। সে উৎসাহের সাথে বলল—ঠিক, ঠিক, ওই বন্ধ দরজাটার মধ্যেও নিশ্চয় কোনও গোপনতম রহস্য আছে। কিন্তু কি সে রহস্য? কিভাবে ওই দরজাটা খোলা যায়? কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে এই দরজার গোপন-পথের শেষ প্রান্ত?

দুজনে আঁধারে হাতড়ে হাতড়ে খুঁজতে লাগল।

দীপক বলল—বন্ধ দরজাটা খোলবার কোনও উপায় ত দেখছি না।

হঠাৎ দীপক কিসের স্পর্শে যেন অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল—উঃ!

রতন বলল—কি হলো রে?

দীপক বলল—উপায় পেয়েছি রতন। আমার হাতে লাগল ইলেকট্রিক শক্। এখান দিয়ে ইলেকট্রিকের তার গেছে এবং নিশ্চয়ই তারই টানে এই দরজা কোনও ভাবে বন্ধ থাকে। যদি তারটা কেটে ইলেকট্রিক 'circuit' নষ্ট করে ফেলা যায় তবেই এই দরজা হয়ত খুলতে পারে।

রতন বলল—কিন্তু সুইচটা কোথায়?

দীপক বলল—সুইচ খুঁজে পেলে ত কাজই হতো। কিন্তু শ্বেতপদ্ম এত বোকা নয় যে সুইচ এই ঘরেই রাখবে। যাক্‌গে, দেখা যাক আমাদের ভাবনা সত্যি কি মিথ্যা।

রতনের হাত থেকে ছুরিটা নিয়ে দীপক এক টানে তারটা কেটে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গেই দুজনে চমকে উঠল। যেন একটা স্প্রিং-এর টানে একপাশে সরে গেল দরজাটা। কিছুটা আলো এসে পড়ল ঘরের মধ্যে সেই পথে।

দুজনের মনেই যেন বয়ে গেল একটা আনন্দ-শিহরণ। সার্থক তাদের পরিশ্রম এবং চিন্তা—

সামনে একটা সুড়ঙ্গপথ—আঁকাবাঁকা। কোথায় যে তার শেষ, কতদূর যে তার সীমা তা কে জানে!

রতন ফিস্ ফিস্ করে বলল—একটা আলো থাকলে ভাল হতো, নইলে কে জানে এর মধ্যে কোনও সাপখোপ আছে কিনা!

দীপক হেসে বলল—না, এ পথটা মাঝে মাঝেই যখন ব্যবহৃত হয় তখন নিশ্চয়ই সাহসে ভর করে এগুতে পারা যায়।

মাথা নীচু করে এঁকেবেঁকে দুজনে এগিয়ে চলল। মাথায় ঠোক্কর লাগছে, হাত-পা অবশ

হয়ে আসছে। এতবড় একটা লম্বা পথ যে পার হতে হবে এ ধারণা তাদের ছিল না। এই পথের কি শেষ নেই? ক্রমশ উপরের দিকে উঠছে ওই যে ক্ষীণ-আলোকের আভাস আসছে—নিশ্চয়ই ওইখানেই সুড়ঙ্গের শেষ।

সুড়ঙ্গের মুখে কে একজন পাহারা দিচ্ছে। দীপক উপরে মুখটা তুলেই দেখল একজন লোক বসে ঝিমুচ্ছে। পেছন থেকে আচমকা তার দেহের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওরা দুজনে, কোনও টুঁ শব্দ না করে লোকটি মাটির উপরে লুটিয়ে পড়ল। তার হাত, পা, মুখ ভাল করে বেঁধে ওরা চারদিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করল।

কিন্তু যা দেখল তাতে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল দুজনেই। একি! এ যে তারা এত বড় লম্বা সুড়ঙ্গপথ অতিক্রম করে চিন্তারামের চায়ের দোকানের কাছেই একটা জঙ্গলের মধ্যে এসে উঠেছে! শ্বেতপদ্ম কি তবে এই পথেই আসা-যাওয়া করতো?

দীপক বলল—চল, ওধারে আমার মোটরটা লুকানো আছে—ওদের বিন্দুমাত্রও বুঝতে পারার সুযোগ দেওয়া যাবে না যে আমরা পালাচ্ছি।

মোটর ছুটল কলকাতার দিকে। রাত্রি তখন শেষ হতে চলেছে।

বারো

—ভ্রান্তি প্রদর্শন—

—রায় বাহাদুর এখনও তোমাকে শেষবারের মত বলছি—এই চেকবইটায় সই কর। মাত্র এক লাখ টাকা দিয়েই তুমি রেহাই পাবে—আমরা তোমার কোনও ক্ষতি করব না।

কিন্তু যদি তা না কর তবে তোমার উপরে যে অমানুষিক অত্যাচার চলবে তা বুঝতে পারছ কি? ওই যে চুল্লীতে আগুন জ্বলছে তার উপরে তোমাকে বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা হবে। তোমার পায়ের চামড়া গলে পুড়ে ঝলসে যাবে। এই হচ্ছে তোমার প্রথম নম্বর শাস্তি।

কথাটুকু বলে মুখের কোণে বাঁকা হাসি হেসে মুখে মুখোশ পরা, সর্বাঙ্গ কালো পোশাকে ঢাকা লোকটি একটা অট্টহাস্যে ভেঙে পড়ল।

পাতালগর্ভের এই কক্ষটির মাঝখানে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় রায় বাহাদুর বিমল বসু পড়েছিলেন। ওপাশে সারি সারি প্রায় দশজন লোক দাঁড়িয়ে—প্রত্যেকের মুখে মুখোশ।

রায় বাহাদুর ক্ষীণকণ্ঠে বললেন—না। ভয় দেখিয়ে যদি আমাকে জব্দ করবে ভেবে থাক তবে তোমরা খুব বেশি ভুল বুঝেছ। আমার জীবনে একটি বস্তু নেই, তা হচ্ছে ভয়। নইলে অনেক আগেই ভয় দেখিয়ে আমাকে জব্দ করতে পারতে।

আমার জীবনের একটা পুরানো দুর্বলতার সন্ধান তুমি করেছ শ্বেতপদ্ম কিন্তু চক্রান্তের জাল ফেলে আমাকে সর্বস্বান্ত করে ফেললেও আমার কাছ থেকে সাহায্য পাবে না তুমি।

শ্বেতপদ্মের দলপতি, আমি তোমায় চিনি। একদিন যেবার রামেশ্বর সিংহ আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে আমাকে নরহত্যার ষড়যন্ত্রে ফেলেছিল সেই লোকই তুমি। আজ তোমার স্বরূপ আমি জানতে পেরেছি। তোমার পুরানো খোলস ছেড়ে আসল মানুষটি বেরিয়ে পড়েছে, তবে আমি তোমার ষড়যন্ত্রের এবং তোমার বুদ্ধির ততটা প্রমাণ আগে পাইনি। আজ যদি আমি চেক লিখে তোমায় অর্থসাহায্য করি, আমি জানি যে চেকের টাকাটা তোমার হস্তগত হওয়ামাত্রই আমার অস্তিত্ব পৃথিবীর বুক থেকে মুছে যাবে।

পুরানো দিনে আমি কোনদিনই নরহত্যা করনি। তুমি—তুমিই ডাঃ রামেশ্বর সিংহ ওরফে শ্বেতপদ্মের দলপতি সেদিন আমাকে নরহত্যার চক্রান্তে ফেলে সর্বস্বান্ত করেছিলে। তারপর আমি পুরানো পারিচয় লুকিয়ে রায় বাহাদুর বিমল বসু সেজে নিশ্চিন্তে বাস করছিলাম তা তোমার সহ্য হলো না শয়তান! ধূমকেতুর মত আবার আমার জীবনে আবির্ভূত হলে! তোমাকে প্রাণ থাকতে এক পয়সা দেব না—না—কিছুতেই না।

কালো পোষাক পরা লোকটি গর্জে উঠল—হ্যাঁ রায় বাহাদুর ওরফে বিনয় পালিত, তুমি ঠিকই চিনেছ আমাকে। আমিই সেদিন নরহত্যা করে তোমাকে চক্রান্তে ফেলেছিলাম। আমি পুলিশত্রাস শ্বেতপদ্ম। কিন্তু আজ তোমাকে রক্ষা করতে কেউ নেই। দীপক চ্যাটার্জী এবং তার সহকারী রতনলাল আমার খাঁচায় বন্দী। তাদের আমি তোমার সামনে পুড়িয়ে মারব। আর তোমার কাছ থেকে কি ভাবে টাকা আদায় করতে হয় তাও আমি দেখছি।

তারপর একজন অনুচরের দিকে চেয়ে বলল—ভরত সিং, তুমি এই রিভলবারটা নিয়ে গিয়ে দীপক চ্যাটার্জী আর রতনকে বাঁধা অবস্থাতেই টানতে টানতে এখানে নিয়ে এস।

অপর দুজন অনুচরের দিকে চেয়ে কি একটা ইঙ্গিত করতেই একজন রায় বাহাদুরকে তুলে ধরল এবং অপরজন একটা দড়ি দিয়ে তাঁর হাতটা বাঁধতে লাগল, তাঁকে শূন্যে ঝুলিয়ে রাখবার জন্য।

রায় বাহাদুরকে শূন্যে ঝুলিয়ে চুল্লীটা তাঁর পায়ের নীচে রাখা হলো। কিছুটা উত্তাপ লাগতেই রায় বাহাদুর আর্তনাদ করে উঠলেন। তাঁর কানে বাজতে লাগল শ্বেতপদ্মের অট্টহাসি—হাঃ হাঃ হাঃ

রায় বাহাদুর জ্ঞান হারিয়ে ঝুলতে লাগলেন।

ভোর

—পরিশেষ—

তীরের কাছে এসে অকস্মাৎ নৌকা ডুবে গেলে যাত্রীদের চোখে-মুখে যে অসহনীয়তা ফুটে ওঠে ঠিক তেমনি ভাব ফুটে উঠল শ্বেতপদ্মের দলপতির চোখে-মুখে। ভরত সিং ছুটতে ছুটতে এসে বলল—হুজুর দীপক চ্যাটার্জী আর তার সহকারী রতন কোঠার পেছনকার ইলেকট্রিক দরজা খুলে সুড়ঙ্গপথে পালিয়েছে।

শ্বেতপদ্মের দলপতি চীৎকার করে উঠল হিংস্র শার্দুলের মত—আর সুড়ঙ্গের মুখে যে পাহারা দিচ্ছিল সে কি করছে?

লোকটি ভীতকণ্ঠে বলল—আজ্ঞে সে হাত, পা, মুখ বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে।

ঘরের মধ্যে অস্থিরভাবে পায়চারী করতে লাগল শ্বেতপদ্ম। বলে উঠল—যত সব অপদার্থের দল! তোমাদের নিয়ে আমি দল চালাচ্ছি! সামান্য দুটো লোককে বেঁধে খাঁচার মধ্যে পুরে যারা আটকে রাখতে পারে না তারাই দল চালাবে! আমি তোমাদের প্রত্যেককে শাস্তি দেব! কুকুরের মত গুলি করে মারব!

কিন্তু তার কথা শেষ হলো না।

প্রচণ্ড একটা অট্টহাসির শব্দ শোনা গেল—হাঃ হাঃ হাঃ....

—মাথার উপরে হাত তোল শ্বেতপদ্ম এবং তোমরা প্রত্যেকে।

শ্বেতপদ্ম চম্‌কে উঠে দেখল ঘরের ভিতরে প্রবেশ করেছে দীপক চ্যাটার্জী, রতনলাল, মিঃ মরিসন এবং একপাল সশস্ত্র পুলিশ...

দীপক হেসে বলল—রায় বাহাদুরের কাছে তোমার স্বীকারোক্তি হুবহু লেখা হয়ে গেছে পাশের ঘরের ডিক্টোফোন যন্ত্রে। প্রমাণিত হয়েছে রায় বাহদুর নির্দোষ আর তুমি খুনী!

পালাবার চেষ্টা করো না যেন, তা হলেই কুকুরের মত গুলি করে তোমার ভবলীলা সাঙ্গ করব শ্বেতপদ্মের দলপতি ওরফে কাপ-ডিশ ধোয়া চাকর চুনীলাল ওরফে রায় বাহাদুরের সহচর ডাঃ রামেশ্বর সিংহ...

শ্বেতপদ্ম এক পা এক পা করে পিছু হটতে হটতে ঘরের প্রান্তে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। তার সমস্ত ভঙ্গীতে যেন একটা ভীত, ত্রস্ত, অবসাদগ্রস্ত ভাব অত্যন্ত পরিস্ফুট।

দাঁতে দাঁত চেপে সে বলল—শয়তান! তোমার ষড়যন্ত্র বুঝতে না পেরেই আমার এই অবস্থা। তোমার ক্ষমতাকে আমি ছোট করে দেখেছিলাম দীপক চ্যাটার্জী, তাই তুমি পাশার দানে জিতলে। কিন্তু শ্বেতপদ্ম ধরা দেয় না—হাঃ হাঃ হাঃ...

সামান্য পায়ের চাপে একটা সুইচ টিপতেই মাটিসমেত শ্বেতপদ্ম নীচের দিকে নেমে গেল। শুধু শোনা যেতে লাগল দূরাগত ধ্বনি—আবার দেখা হবে দীপক চ্যাটার্জী। পালাবার পথ না রেখে শ্বেতপদ্ম কাজে হাত দেয় না—শুভরাত্রি!

ইন্‌স্পেক্টর মরিসন শুধু বললেন—আশ্চর্য!

শ্বেতপদ্মের দলের অন্য সকলেই ধরা পড়ল। রায় বাহাদুরের বাঁধন কেটে তাঁকে মুক্ত করা হলো।

শ্বেতপদ্মের খোঁজে দীপক আর মিঃ মরিসন ছুটে চললেন। রতন এবং পুলিশের দল রইল দস্যুদলের পাহারায়।

আদালতে বিচারে শ্বেতপদ্মের দলের সকলের জেল এবং দ্বীপান্তরের খবর আমরা সংবাদপত্রেই পড়েছি। কিন্তু দলপতির কোনও সংবাদ আজ অবধি পাওয়া যায়নি।

—শেষ—

অদৃষ্টের পরিহাস

এক

—একটি ভাঙা গ্লাস—

বৈঠক তখন বেশ জমে উঠেছে।

কোল্‌কাতার কয়েকটি অঞ্চলের নামকরা গুণ্ডা ও বদমাইশদের বৈঠক এটা। তাই ঘটনাস্থলও অত্যন্ত কুরুচিপূর্ণ একটা অঞ্চল।

দমদম। সাউথ সিঁথি রোড ধরে কিছুটা গিয়ে বাঁদিকের ঘনবসতিপূর্ণ বস্তি অঞ্চলটার একটা ঘর। বিভিন্ন স্থান থেকে রাত আটটার পরেই এখানে লোক জমতে সুরু হয়। বৈঠক বসে। বিভিন্ন ধরণের জিনিসের আলোচনা চলে। তবে সেগুলো সাধারণ লোকের কাছে বোধ হয় অরুচিকর বলেই মনে হবে।

শুধু আলোচনই নয়—তার সঙ্গে চলে নেশা আর তাসের জুয়ো। মাঝে মাঝে এই নিয়ে কিছুটা হট্টগোলও হয় ওদের মধ্যে। দু-একবার ছোরা-মারামারিও যে না হয়েছে এমন নয়। তবুও এই নিত্যনৈমত্তিক বৈঠক যথাসময়ে বসবেই।

তাসের জুয়োর বদলে নতুন এক ধরণের জুয়োখেলা চলেছে আজ। রোজ একঘেয়ে ফ্ল্যাস্ খেলা তাদের ভাল লাগছিল না বলেই বরাহনগরের একজন গুণ্ডা কাল্লু খাঁ আজ এই নতুন খেলাটার আমদানী করেছে।

এই খেলাটাকে কেন্দ্র করেই আজ বেশ একটু নতুন ধরণের উৎসাহ দেখা গেল ওদের মধ্যে। আর সেই সঙ্গে চলতে থাকে গ্লাসের পর গ্লাস ফেনিল সুরার উদ্দাম প্রবাহ।

খেলা জমে ওঠে। কাঁটা খেলাতে ঘন ঘন মোটা মোটা টাকার আমদানী হওয়াতে একদল যথেষ্ট উৎসাহিত হয়ে ওঠে, আর একদল বার বার হেরে গিয়ে বেশ কিছুটা মনঃক্ষুণ্ণ হয়।

কাল্লু খাঁ, মীরজা আর ইস্‌মাইল প্রত্যেকে পঁচিশ-ত্রিশ টাকা জিতেছিল। আর বেশির ভাগ হারছিল ভরত সিং আর শাহ্‌জাদা হুসেন এই দুজন গুণ্ডা। শাহ্‌জাদার বেশ দু পয়সা আছে। তাই চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকা হেরেও সে বিশেষ মনঃক্ষুণ্ণ হয়নি। কিন্তু এক্‌কেবারে মিইয়ে গিয়েছিল ভরত সিং। তার হাবভাব দেখে মনে হচ্ছিল যে আর দু-একটা দান খেলেই সে উঠে পড়বে।

এমন সময় একটা দানে ভরত সিং বেশ মোটা কিছু টাকা জিতে গেল। শেষবারের মতো সব টাকা হেরে উঠে যাবে এই মনে করে সে দুইয়ের ঘরে ধরেছিল শেষ সম্বল সাতটি টাকা। সৌভাগ্যের বিষয়, কাঁটা থামলে দেখা গেল সেটার মুখের সাম্‌নে তিনটি সাত।

মনের আনন্দে লাফিয়ে ওঠে ভরত সিং। একটি দানেই সে পেয়েছে পঁচিশ টাকার কিছু বেশি।

ঠিক এমনি সময় দরজাটা খুলে গেল।

ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল দীর্ঘকায় একটি মূর্তি। পরণে তার দামী স্যুট। পায়ে বুট। মুখে দামী সিগারেট।

একটি মুহূর্তের মধ্যে সারা ঘরের বুকে মৃত্যুর তুহিনতা ঘনিয়ে আসে যেন। চারদিক নিঃসীম চুপচাপ। প্রত্যেকে সামান্য শব্দ করতেও ভুলে গেছে বলে মনে হয়।

লোকটিকে দেখেই সকলে উঠে দাঁড়ায়। অবশ্য এটা তাদের শিখিয়ে দেওয়া হয়নি। গভীর শ্রদ্ধায় অথবা ভয়ে তারা এমনি করে থাকে। এ লোকটিই হচ্ছে উত্তর কোল্‌কাতার বিখ্যাত ক্রিমিন্যাল শঙ্করপ্রসাদ মিশ্র।

অদ্ভুত লোক এই শঙ্করপ্রসাদ। তার জীবনের তেত্রিশটি বছরের মধ্যে সে তেরোটি মানুষকে নিজের হাতে খুন করেছে। শুধু খুন বললেই চলবে না। তাদের দেহের প্রত্যেকটি অংশ কেটে টুকরো টুকরো করবার প্রতি একটা দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা শঙ্করপ্রসাদের।

কথা বলে অত্যন্ত কম। গতিভঙ্গী দুর্বিনীত। পৃথিবীর কাউকে সে সামান্যতম ভয় করে বলে আজ পর্যন্ত জানা যায়নি। কিন্তু মাঝে মাঝে এমন এক একটি কাজ সে করে বসে যার কোনও অর্থ খুঁজে পাওয়া যায় না।

পুলিশের কালো খাতার পাতায় বেশ বড় বড় অক্ষরেই লেখা আছে শঙ্করপ্রসাদের নাম।

কিন্তু আজ অবধি সে একবারও ধরা পড়েনি। কিংবা কোনও দিন যে তাকে ধরা যাবে এ আশাও পুলিশমহলের কারও ছিল না। গভর্ণমেণ্ট থেকে মোটা টাকা রিউয়ার্ড ঘোষণা করা হয়েছিল শঙ্করপ্রসাদকে জীবিত অথবা মৃত ধরে দেবার জন্যে। কিন্তু অত টাকা রিউয়ার্ডের লোভেও কেউ তার সম্বন্ধে কোনও খবর পুলিশকে জানায়নি।

শুধু জনসাধারণই নয়, আণ্ডারওয়ার্লডের দুর্ধর্ষ ক্রিমিন্যালরাও জানে যে, শঙ্করপ্রসাদ সম্বন্ধে কোনও কথা পুলিশকে জানালে, অথবা তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করলে তাকে প্রায় মৃত্যুর সাম্‌নে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। ক্ষমা কথাটা শঙ্করপ্রসাদের অভিধানের কোথাও লেখা নেই। আর বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি সে একটাই দিয়ে থাকে—তা হচ্ছে মৃত্যু!

তাই তাকে ধরা যাবে কি করে! তার ভয়ে সারা কোল্‌কাতার প্রত্যেকটি লোক এমন সন্ত্রস্ত যে কেউ কখনও তার বিরুদ্ধে কোনও সংবাদ সাহস করে পুলিশে রিপোর্ট করে না।

সাধারণ মানুষ জানে, শঙ্করপ্রসাদের বিরুদ্ধে কোনও সংবাদ পুলিশের কাছে যে জানাবে, ঠিক কয়েকটি ঘণ্টার মধ্যেই তার শেষ নিঃশ্বাস বাতাসের সঙ্গে মিলিয়ে দিতে দ্বিধা করবে না সে।

তাই মানুষ তাকে ভয় করে। সম্ভ্রমও করে কিছুটা।

সম্ভ্রম করারও কারণ আছে। জীবনে কোনও দিনই বিনা কারণে শঙ্করপ্রসাদ কোনও কাজ করে না।

বিনা কারণে নারীর মর্যাদাকে কোনও দিন সে নষ্ট হতে দেয়নি। কখনও কোনও গরীব-দুঃখী বা নিপীড়িত মানুষের একটি টাকাও জোর করে ছিনিয়ে নেয়নি সে।

আর যে সব লোককে সে হত্যা করেছে তার জীবনে, তারা প্রত্যেকেই সাধারণ মানুষের চোখে ঘৃণার্হ, নিন্দার্হ। তাদের হত্যা করে শঙ্করপ্রসাদ কিছু অন্যায় করছে বলে সাধারণ মানুষ ভাবে না।

এই হচ্ছে শঙ্করপ্রসাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

শঙ্করপ্রসাদকে দেখে ঘরের মধ্যে উপস্থিত সকলে উঠে দাঁড়িয়েছিল। শঙ্করপ্রসাদ

ইঙ্গিতে তাদের বসতে বলল। তারপর গম্ভীরভাবে প্রশ্ন করল—আজ যে দেখছি নতুন খেলা চলেছে?

—হ্যাঁ, কাল্লু খাঁ উত্তর দিল—আমিই ওটা নিয়ে এসেছি। রোজ রোজ ফ্ল্যাস্ খেলতে আর ভাল লাগছিল না।

শঙ্করপ্রসাদ উত্তর দেয় না। গম্ভীরভাবে খেলা দেখতে থাকে।

মিনিট তিনেক খেলা দেখে শঙ্করপ্রসাদ। তার পরেই কাল্লু খাঁ একটি সুরাপূর্ণ গ্লাস এগিয়ে দেয় তার দিকে।

গ্লাসটির দিকে তাকিয়েই শঙ্করপ্রসাদ যেন আঁৎকে ওঠে। তার মুখখানা ফ্যাকাশে আকার ধারণ করে। রগের শিরাদুটো দপ্ দপ্ করতে থাকে। চোখদুটো থেকে যেন বিশ্বের ঘৃণা আর ক্রোধ একসঙ্গে ঝরে পড়ে।

তার ভাবপরিবর্তন লক্ষ্য করে কাল্লু খাঁ গ্লাসটা টেবিলের ওপর রাখে।

শঙ্করপ্রসাদের মনে হতে থাকে গ্লাসের সফেন সুরার প্রতিটি ফেনায় যেন প্রতিফলিত হচ্ছে একটি মুখ।

একখানি মুখের কাতর ভয়ার্ত চাউনি যেন প্রতিটি ফেনার মাঝ দিয়ে প্রতিবিম্বিত হয়ে তাকে নিদারুণভাবে পরিহাস করছে। তার দিকে চেয়ে ঘৃণার হাসি হাসছে। বিদ্রূপ করছে তাকে।

কি কাতর এবং আতঙ্কপূর্ণ দৃষ্টি! অথচ তা থেকে কেমন যেন ঘৃণা আর পরিহাস ফুটে উঠে তার সারা মনে জ্বালা ধরিয়ে দিচ্ছে।

কি ওটা?

কার মুখের প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে ওর মধ্যে? কেন ওই একখানি মুখের চিত্র প্রতিবিম্বিত হচ্ছে সফেন সুরার প্রতিটি বুদ্‌বুদের মধ্যে?

শঙ্করপ্রসাদের আকৃতি ভয়াবহ হয়ে ওঠে। কপালে তার বিন্দু বিন্দু ঘাম। দু'চোখে ক্রোধ আর জিঘাংসার মিশ্রণ।

শঙ্করপ্রসাদ প্রাণপণে আত্মসংবরণ করবার চেষ্টা করে। কিন্তু কিছুতেই আত্মসংবরণ করতে পারে না সে। প্রাণপণে গ্লাসটার ওপর সজোরে একটা ঘুষি মারে।

একটি মুহূর্ত!

ঝন্ ঝন্ করে গ্লাসটা টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে যায়।

চারদিকে ছিট্‌কে পড়ে কাঁচের টুকরোগুলো।

কতকগুলো কাঁচ শঙ্করপ্রসাদের হাতের মধ্যে ঢুকে যায়।

ঝর ঝর করে রক্ত পড়তে থাকে।

সারা মেঝেতে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত ছড়িয়ে পড়ে। পকেট থেকে দ্রুত রুমালটা বের করে শঙ্করপ্রসাদ হাতে বেঁধে ফেলে।

ভরত সিং হঠাৎ অখণ্ড নীরবতা ভেঙে প্রশ্ন করে—এটা কেন করলেন স্যর? এতে ত আপনারই হাত জখম হল!

কিন্তু শঙ্করপ্রসাদ কোনও উত্তর দেয় না।

ঘাড়টা ফিরিয়ে নেয় ওদের দিক থেকে। তারপর দ্রুত ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়।

সারা ঘরে তখন বিস্ময়ের গুঞ্জন সুরু হয়ে গেছে।

শঙ্করপ্রসাদের আলোচনা নেশাখোর জুয়াড়ীদেরও তাদের খেলা থেকে বিরত করে। কিন্তু

এই সব দুর্ধর্ষ ক্রিমিন্যালদের মনেও এতটুকু সাহস ছিল না যে তারা শঙ্করপ্রসাদকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করে।

আজীবন তারা শঙ্করপ্রসাদকে ভয় করতেই শিখেছে। শিখেছে শ্রদ্ধা করতে। তার আদেশ মান্য করতে। কিন্তু তার কাছে কোনও কাজের কৈফিয়ৎ চাইবার সাহস আজ পর্যন্ত কারও হয়নি।

জুয়াড়ীদের এটা বুঝতে দেরী হয় না যে, নিশ্চয়ই কোথাও কিছু অঘটন ঘটেছে। নিশ্চয়ই শঙ্করপ্রসাদ মনে আঘাত পেয়েছে। কিন্তু সেটা কি তা কেউ স্থির করতে পারে না।

তাই তারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে থাকে। তাদের এত সাধের নতুন জুয়াখেলাও থেমে যায় অল্পক্ষণের মধ্যেই।

সকলের মুখে মুখে শুধু ফিরতে থাকে শঙ্করপ্রসাদের কথা। ও কি পাগল, উন্মাদ না প্রতিহিংসাপরায়ণ কোনও প্রেতাত্মা?

দুই

—অকরুণ বিভ্রান্ত হত্যা—

হিম-ঝরা রাত। কুয়াশায় মোড়া।

পৃথিবীশুদ্ধ লোক ঢলে পড়েছে নিথর নিদ্রার কোলে। বহুদূরের কোন্ একটা পেটা-ঘাড় জানিয়ে দিল, রাত তখন দুটো।

জেগে-থাকা কোনও প্রাণীর স্পন্দন নেই। গ্যাসপোস্টগুলোর ক্লান্ত চোখে যেন অসীম পাণ্ডুরতা। নৈশ প্রহরের জাগর রক্ষক যেন।

অস্পষ্ট শব্দ।

ধীরপদে এগিয়ে চলেছে একজন লোক।

শহরতলী পার হয়ে শহরের প্রান্তে সে এসে পড়েছে। আর কিছুটা এগোলে ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড শেষ করে সে কোল্‌কাতার বুকে পা ফেলবে।

ব্রিজের ওপর ওঠবার জন্যে পা বাড়ায় লোকটা। কিন্তু এগোতে পারে না।

পা শ্লথ। অসীম শ্রান্তি যেন তার সারা দেহে আর মনে। প্রতিটি পা ফেলতে অসহ্য কষ্ট সহ্য করতে হচ্ছে তাকে এমনি অবস্থা হয়েছে তার।

পেছনে শব্দ।

দূরে—বহুদূরে।

কে যেন কাঁদছে! গুম্‌রে গুম্‌রে। অসহ্য যন্ত্রণার অব্যক্ত গোঙানি ভেসে আসছে যেন। কাকে যেন ডাকছে!

ওরা কারা? কাদের এ বুকফাটা মর্মভেদী আর্ত আহ্বান?

শঙ্কর! শঙ্কর!

কে শঙ্কর? কোথায় শঙ্কর? আজকের শঙ্করপ্রসাদ পুলিশের চোখে পলাতক আসামী। তাকে কে ডাকবে?

শঙ্করপ্রসাদ ফিরে তাকায়। অসহ্য উত্তেজনায় তার সে দৃষ্টি যেন ফেটে পড়ছে। নিদারুণ বিস্ময় তার সঙ্গে মেশানো।

কিন্তু কই, কেউ নেই। ফাঁকা প্রান্তর বাঁ দিকে। ডান দিকে বহুদিনের পুরোনো কতকগুলো

বাড়ির কঙ্কাল। পেছনে সর্পিল রেখার মতো পড়ে আছে সুবিস্তীর্ণ, শান্ত, ঘুমন্ত ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড।

না, এ তবে প্রহেলিকা। রাত্রির বীভৎস বিদ্রূপ। এ হতে পারে না। এ কাদের কণ্ঠস্বর? মরণ-সাগরের ওপার থেকে বহুদিন পূর্বের কতকগুলি লোকের স্বর যেন তার পেছনে পেছনে ধাওয়া করেছে।

শঙ্করপ্রসাদ এগিয়ে চলে। আরও এগিয়ে। ধীরপদে। টেনে টেনে পা ফেলে ফেলে এগোয়।

আবার শব্দ।

নারীকণ্ঠের আহ্বান—শঙ্কর! শঙ্কর!

কে ওই নারী? এ যেন বহুদিন পূর্বে মৃতা অনমিত্রার কণ্ঠস্বর!

অনমিত্রা!

এ স্বর কি তবে অনমিত্রার?

কিন্তু....

শঙ্করপ্রসাদের সারা দেহে-মনে বিপুল উত্তেজনা। আজই সন্ধ্যায় সে একটি সুরাপূর্ণ পাত্রের প্রতিটি বুদ্‌বুদের মধ্যে প্রতিফলিত দেখেছে অনমিত্রার ছবি। অনমিত্রা যেন তাকে বিদ্রূপ করছিল। করছিল পরিহাস। সে যেন বলতে চাইছিল—কি দেখছ? মরেও আমি মরিনি। আমি জীবন্ত। আমি বেঁচে আছি। চিরদিন এমনি বেঁচে থাকব। তোমার প্রতিটি কাজে তোমার পেছনে পেছনে ছায়ার মতো ঘুরে বেড়াব আমি। বহুদিন পূর্বে যে অনমিত্রার মৃত্যু হয়েছে, বহু—বহু পূর্বে যার অন্তিম দীর্ঘশ্বাস বাতাসের বুকে মিশে গেছে, সে কি করে আজ ফিরে এসে দাঁড়াবে তার সামনে।

আর অনমিত্রার এ মৃত্যু ঘটেছে তারই চোখের সামনে। অন্য কারও মুখে-শোনা কাহিনী এ নয়—এ নিষ্ঠুর জ্বলন্ত সত্য।

কিন্তু তবু যেন অনমিত্রা ঘুরছে তার পায়ে পায়ে। তার আশেপাশে। প্রতিটি পদবিক্ষেপে সে দেখছে তার ছবি।

কি করে তা সম্ভব? শঙ্করপ্রসাদ কি পাগল হয়ে গেছে?

জীবনে অজস্র নরহত্যা করতেও যে শঙ্করপ্রসাদের হাত একটুকু কাঁপেনি—অসংখ্য নররক্তে হাত রঞ্জিত করেও অমিতবিক্রমে পুলিশবাহিনীর চোখে ধূলিনিক্ষেপ করে পালিয়ে বেড়িয়েছে, সে শঙ্করপ্রসাদের এ চিত্তবিভ্রম কেন? কেন তার এ অসহনীয় দুর্বলতা? এ অবসাদ?

ঠাণ্ডা রাতেও শঙ্করপ্রসাদের সমস্ত পোষাক ঘামে ভিজে যায়। সারা মন কেমন যেন তোলপাড় করতে থাকে।

অনেক কষ্টে মনকে দৃঢ় করে শঙ্করপ্রসাদ এগোয়। জোরে জোরে পা ফেলে ফেলে। ভারী বুটের শব্দ ওঠে—ধপ্ ধপ্!

আবার আহ্বান!

শঙ্কর! শঙ্কর!

এবার শুধু অনমিত্রার কণ্ঠ নয়।—অনেক—অ-নে-ক-গুলি কণ্ঠস্বর একসঙ্গে যেন তাকে আহ্বান জানায়।

এতদিন ধরে সে একে একে যাদের নিজের হাতে হত্যা করেছে—যাদের সে পশুর মতো নিজ হাতে টুকরো টুকরো করে কেটেছে, যাদের মৃত বীভৎস চাউনির দিকে চেয়ে সে আপন মনেই পৈশাচিক অট্টহাসি হেসেছে, তারাই যেন আজ একে একে তার পেছনে পেছনে ছুটে আসছে।

তাকে আজ তারা ডাকছে। তাকে বিদ্রূপ করছে। তাকে জানাচ্ছে অবজ্ঞা আর ঘৃণা।

শঙ্করপ্রসাদ যেন লাফিয়ে ওঠে।

মুমূর্ষু মানুষের করুণতা তার দু'চোখে। কিন্তু সে শুধু একটা মিনিট। তারপরেই সেখানে ফুটে ওঠে ভয়াবহ জিঘাংসা। নেশা। হত্যাকারীর বিভীষণ রূপ ফুটে ওঠে তার দেহের প্রতিটি রেখায় রেখায়। আপন মনেই সে ভয়ার্ত চীৎকার করে ওঠে।

—কৌন হ্যায়?

বহুদূর থেকে আগত একটি বীটের কনস্টেবলের কণ্ঠধ্বনি ভেসে আসে।

নীরব নৈশ প্রহরে এই অদ্ভুত ভয়ঙ্কর শব্দ তাকে বিচলিত করেছে। সে দ্রুত ছুটে আসতে থাকে ঘটনাস্থলের দিকে।

—কৌন হো তুম্?

শঙ্করপ্রসাদকে দেখতে পেয়েই সে সশব্দে প্রশ্ন করে বসে।

শঙ্করপ্রসাদ কোনও উত্তর দেয় না। শুধু একটা অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকায় তার দিকে। ভয়াবহ সে চাউনি। মারাত্মক। বীভৎস।

কনস্টেবলটি শঙ্করপ্রসাদের নীরবতা দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। পরিষ্কার বাংলায় এবার প্রশ্ন করে—তুমি কে?

কোনও উত্তর নেই।

প্রচণ্ড অট্টহাসি হেসে ওঠে শঙ্করপ্রসাদ।

—এখুনি উত্তর না দিলে তোমাকে থানায় নিয়ে যাওয়া হবে। কনস্টেবলের স্বরে দৃঢ়তা।

বীভৎস প্রেতের মতোই হেসে ওঠে শঙ্করপ্রসাদ। প্রচণ্ড বেগে লাফিয়ে উঠেই প্রাণপণে কনস্টেবলটির কণ্ঠনালীটা চেপে ধরে তাকে মাটিতে শুইয়ে ফেলে।

প্রাণপণে চেষ্টা করে কনস্টেবলটি শঙ্করপ্রসাদের হাত থেকে ছাড়া পাবার জন্যে।

কিন্তু শঙ্করপ্রসাদের দেহের শক্তি যেন দশগুণ বেড়ে গেছে। তার সঙ্গে পাল্লা দেবার ক্ষমতা পৃথিবীর কোনও মানুষের নেই।

ধীরে ধীরে নিস্তেজ হয়ে আসে কনস্টেবলটির দেহ। ক্রমশ দেহের শক্তি কমে আসে। মুখখানা রক্তাভ হয়ে ওঠে। তারপর ক্রমশ নীল হয়ে যায়।

মৃত।

কয়েকটি মুহূর্তের মধ্যে একটি নিরপরাধ মানুষের শেষ নিশ্বাস বাতাসকে ভারী করে তোলে।

শঙ্করপ্রসাদ হেসে ওঠে যেন পিশাচের অট্টহাসি। কোমর থেকে বের করে একটা বিশাল সুদীর্ঘ ছুরি।

তারপর—

দেহের প্রতিটি অংশ কেটে টুকরো টুকরো করতে থাকে শঙ্করপ্রসাদ। প্রতিটি অংশ কেটে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে রাখে। হাত, পা, মাথা।

মুখখানা কুচি কুচি করে কেটে তাকে বীভৎস আকার করে তোলে।

কিন্তু সে তখন উন্মাদ। খেয়াল নেই ভোরের হাওয়া কখন পৃথিবীর বুকে পেলব স্পর্শ নিয়ে ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়েছে বিধাতার আশীর্বাদের মতো।

পুবের আকাশে শুকতারাটা শঙ্করপ্রসাদের এই ভয়াবহ হত্যাকাণ্ডের সাক্ষ্য বহন করে মিট্‌মিট্ করে জ্বলতে থাকে শুধু।

তিন

—থানা-পুলিশ—

সারা কোল্‌কাতার বুকে বাতাসের মতো দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এই খবরটা।

সর্বত্র অসীম চাঞ্চল্য। প্রত্যেকটি নগরবাসীর মনেই বিপুল ভয়ের সঞ্চার হয় ঘটনাটাকে উপলক্ষ করে। এ ধরণের কোনও ঘটনার কথা তারা ইতিপূর্বে কল্পনাও করতে পারেনি।

কিন্তু পুলিশের কাছে এ ধরণের ঘটনা নতুন নয়। এ ধরণের আরও অনেকগুলি ঘটনার কথা তারা ইতিপূর্বে জ্ঞাত হবার অবকাশ পেয়েছে। কিন্তু তা এত প্রকাশ্যে ঘটেনি। তাই সাধারণ মানুষ সেগুলি নিয়ে ভাববার অবকাশ পায়নি।

এই ঘটনার ভয়াবহতা দেখেই পুলিশ ও.সি. মিঃ দেশাই বুঝে নিলেন যে এর সাথে বিখ্যাত ক্রিমিন্যাল শঙ্করপ্রসাদের যোগাযোগ আছে।

কিন্তু তবু কেন এমন ঘটল? শঙ্করপ্রসাদ ত এভাবে প্রকাশ্য পথের মাঝে পুলিশ কনস্টেবলকে হত্যা করবার পাত্র নয়।

একটা সন্দেহ উঁকি মারতে থাকে মিঃ দেশাইয়ের মনের মধ্যে। হয়ত অন্য কেউ লোকটাকে হত্যা করে দোষটা শঙ্করপ্রসাদের কাঁধে চাপাবার জন্যে এভাবে কসাইয়ের মতো তাকে টুকরো টুকরো করে কেটেছে।

তার কারণও অবশ্য আছে। সাধারণ মানুষ শঙ্করপ্রসাদকে না চিনলেও ক্রাইম্ জগতে সে একজন সুপরিচিত ব্যক্তি। অনেক ক্রিমিন্যালই শঙ্করপ্রসাদের খোঁজখবর রাখে। তাই এটা তাদের কীর্তি হওয়াও বিচিত্র নয়।

মিঃ দেশাই প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগলেন যাতে কোনওভাবে কোনও একটা ফিংগরপ্রিন্ট আবিষ্কার করা যায়। তাহ্‌লে কেসটা সল্‌ভ্ করা অনেকটা সহজ হয়ে আসবে।

কিন্তু কোথাও কোনও ফিংগারপ্রিন্ট পাওয়া গেল না। ছোরা বা ওই ধরণের কোনও জিনিসই ফেলে যায়নি আততায়ী যার ওপর আঙ্গুলের ছাপ মিলতে পারে।

অবশেষে ব্যর্থমনোরথ মিঃ দেশাই লালাবাজারে লম্বা রিপোর্ট দাখিল করতে বসে গেলেন।

কিন্তু তখন কি আর কেউ জানত যে প্রখ্যাত ডিটেকটিভ দীপক চ্যাটার্জীও এই হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে জড়িত হয়ে পড়বে? উন্মোচন করবে বিরাট রহস্যের এই গ্রন্থি?

পরদিন কোল্‌কাতার প্রত্যেকটি খ্যাত-অখ্যাত কাগজের পাতায় খবরটি নিয়ে বেশ কিছু। আলোড়ন সুরু হয়েছে দেখা গেল।

একটি খবরের কাগজে বের হয়েছিল :

'বিচিত্র নরহত্যা!

বীটের কনস্টেবল ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের উপরে নিহত!

দেহকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন ও খণ্ডবিখণ্ড করিয়া আততায়ীর পলায়ন!

বিগত ২৩শে ডিসেম্বর রাত্রে ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের উপরে একজন বীটের কনস্টেবলকে বীভৎভাবে হত্যা করা হয়। লোকটি যখন রাস্তার উপরে পাহারা দিবার কাজে রত ছিল, তখন কে বা কাহারা তাহাকে আক্রমণ করিয়া হত্যা করে। তারপরে তাহার দেহকে টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া রাস্তার উপরেই ফেলিয়া রাখিয়া প্রস্থান করে।

কনস্টেবলটির মুখ এমন করিয়া কাটিয়া কাটিয়া টুকরা টুকরা করা হয় যে তাহাকে অতঃপর ভাল করিয়া চিনিতেও কষ্ট হইতেছিল।

তবে যতদূর মনে হয়, ইহা হত্যাকারী স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়াই করিয়াছে। তাহার ইচ্ছা ছিল, মৃত ব্যক্তিকে যাহাতে সনাক্ত না করা যায় সেই চেষ্টা করা। আমরা জানি এভাবে কোনও মৃত মানুষকে টুকরা টুকরা করিয়া কাটিবার অভ্যাস আছে একজন ক্রিমিন্যালের। সেই ক্রিমিন্যাল শঙ্করপ্রসাদকে পুলিশ আজ পর্যন্ত গ্রেপ্তার করিতে সমর্থ হয় নাই। কোনওদিন হইবে কিনা তাহাও আমাদের অজ্ঞাত।

মানুষ যে কোন্ স্তরে উঠিলে এরূপ পিশাচে পরিণত হইতে পারে তাহা আমরা জানি না, তবে আমরা চাই, যত সত্বর হয়, খুনী ধরা পড়িয়া উপযুক্ত শাস্তি ভোগ করুক।

এই ঘটনায় উত্তর কলিকাতার নরনারী অত্যন্ত ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। মনে হয়, সত্বর খুনীকে গ্রেপ্তার করা না হইলে জনসাধারণের আতঙ্ক আরও বৃদ্ধি পাইবে। পুলিশবিভাগের অবিলম্বে এই ঘটনাটি সম্বন্ধে তৎপর হওয়া বাঞ্ছনীয়।

আর একটি পত্রিকায় বের হয়েছিল ঃ

'সর্বপ্রথমে ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড দিয়ে আগত একটি লরী ড্রাইভার এই ঘটনটি আবিষ্কার করে। সে ভীত হইয়া ঘটনাটি অবিলম্বে নিকটস্থ পুলিশ স্টেশনে জানায়। তারপর পুলিশবাহিনী এই ঘটনাটির বিষয়ে তদন্ত করে।

এ পর্যন্ত কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই।'

চার

—তদন্তচক্রে দীপক চ্যাটার্জী—

বেলা তখন সাড়ে আটটা হবে।

চা আর খাবার শেষ করে প্রাইভেট ডিটেকটিভ দীপক চ্যাটার্জী খবরের কাগজের পাতায় মনোযোগ দিয়েছে, এমন সময় টেলিফোনের সশব্দ আহ্বান তাকে বিচলিত করল।

ক্রিং ক্রিং—

রিসিভারটা তুলে দীপক প্রশ্ন করে—হ্যালো, কে কথা বলছেন?

উত্তর ভেসে এল—আমি কাশীপুর থানার ও. সি. কথা বলছি।

—ও, আপনি মিঃ দেশাই?

—হ্যাঁ।

—বুঝেছি কেন আপনি ফোন করছেন আমাকে। নিশ্চয়ই সেই হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারটা নিয়ে।

—সে কি কথা? আগেই জানলেন কি করে?

—ওটা ছাড়া সম্প্রতি তেমন কোনও মারাত্মক ঘটনা আপনার 'এরিয়া'তে ঘটেনি যার জন্যে আপনি আমার সাহায্য চাইবেন।

হো হো করে হেসে উঠে মিঃ দেশাই বলেন—ঠিক ধরেছেন আপনি। আন্দাজে ঢিল ছুঁড়লেও চমৎকার এসে লেগে গেছে কিন্তু সেটা।

—মাঝে মাঝে কল্পনাশক্তিকে এমন প্রখর না করে তুললে কোনও রহস্যেরই সমাধান করা আমাদের দ্বারা সম্ভব হতো না মিঃ দেশাই।

—তা বটে মিঃ চ্যাটার্জী। কিন্তু কথা হচ্ছে এই যে, আমি যদিও জানি কোল্‌কাতার একমাত্র শঙ্করপ্রসাদ নামে একজন ক্রিমিন্যাল এমনি ধরণের ক্রাইম্ করতে অভ্যস্ত, তবু মনে কেমন যেন খট্‌কা বাজছে।

—কেন?

—শঙ্করপ্রসাদ কখনও প্রকাশ্যে এভাবে হত্যা করেছে বলে জানা নেই আমার।

—করেনি বলেই যে করবে না এমন কোনও ধরাবাঁধা নিয়ম ত নেই মিঃ দেশাই। বিশেষ করে ক্রিমিন্যালদের বেলায়।

—কিন্তু শঙ্করপ্রসাদের ইতিহাস জানলে আপনি একথা বলতেন না মিঃ চ্যাটার্জী। সে এমন ক্রাইম্‌ই সাধারণতঃ করে থাকে যাতে থাকে সাধারণ মানুষের বিবেকের মৌন সম্মতি। এছাড়া যেখানে-সেখানে 'সিন ক্রিয়েট্' করতে ভালবাসে না সে।

—বুঝলাম। আর কোনও পয়েন্ট?

—শঙ্করপ্রসাদকে খুঁজে বের করবার জন্যে আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করেছি বটে—কিন্তু তার সন্ধান পাওয়া বড়ই কঠিন ব্যাপার স্যর!

—আচ্ছা, এই লোকটার কি সত্যই কোনও একটা 'হোমিসাইড্যাল ম্যনিয়াক্' (homicidal maniac) আছে না কি?

—কথাটা ঠিক জানি না, তবে মনে হয়, কোনও একটা পুরোনো ইতিহাস ওর সঙ্গে জড়িত।

—ওর বিরুদ্ধে প্রথম কোন্ ইতিহাস আপনার জানা আছে?

—সে দীর্ঘ ছ' বছর আগের কথা। অনমিত্রা নামে একটি মেয়েকে ও খুন করেছিল।

—কিন্তু কেন?

—তা জানি না। তাকে হত্যা করে তাহার দেহের প্রতিটি অংশ টুকরো টুকরো করে কেটে মাটিতে পুঁতে ফেলেছিল। আর ঠিক তার পর থেকেই তার মনের এই পরিবর্তন।

—কিন্তু আজও কি সে ঠিক তেমনি আছে?

—হ্যাঁ, জীবনে সবশুদ্ধ তেরোটি নরহত্যা সে করেছে। যার বিরুদ্ধে তার মনে বীতরাগের সঞ্চার হয়, তাকে সে নিঃশেষে হত্যা করে থাকে। এটা হলে বোধ হয় চৌদ্দটা পূর্ণ হবে। অথচ এমন একদিন ছিল যখন সে ছিল বিদ্বান্ অর্থবান্। সমাজের খুব একটা উঁচু স্থানেই ছিল তার আসন।

—কিন্তু এর সঙ্গে আপনি অন্য কোনও একটা ব্যাপারকে টেনে আনছেন কেন মিঃ দেশাই? টুকরো টুকরো করে কাটাটাই ত আর শঙ্করপ্রসাদের সম্বন্ধে নিঃসন্দেহে কোনও কথা প্রমাণ করছে না!

—তা বটে। মিঃ দেশাই কেমন যেন চিন্তিত হয়ে ওঠেন।

—আপনি নিরপেক্ষ মন নিয়ে তদন্ত করুন মিঃ দেশাই। তবে আমার সাহায্য আপনি পাবেন অন্যভাবে। প্রত্যক্ষভাবে নয়—পরোক্ষে।

—কথাটা ঠিক বুঝলাম না মিঃ চ্যাটার্জী।

হেসে দীপক বলে—এটা একটা অত্যন্ত সাইকোলজিক্যালি জটিল কেস। তাই সাধারণভাবে তদন্ত করে অপরাধীকে খুঁজে বের করবার আশা সুদূরপরাহত। এর জন্যে চাই নিখুঁত মনোবিশ্লেষণপূর্ণ মনোভাব। আর সে ব্যাপারে চাই ব্যাক্‌গ্রাউণ্ড ওয়ার্ক।

অদ্ভুত রহস্যময় শোনায় দীপকের কথা। মিঃ দেশাই নিঃশব্দে রিসিভারটা নামিয়ে রাখেন।

পাঁচ

—আর একটি দৃশ্য—

উত্তর কোল্‌কাতার একটি চারতলা বাড়ি।

বাড়িটা বিশাল হলেও বহুদিনের পুরোনো। সংস্কার অভাবে কিছুটা জীর্ণ।

গোটা বাড়িটাকে টুকরো টুকরো অংশে ভাগ করে সেটা ভাড়া দেওয়া আছে। চারতলার ছোট ঘরখানা নিয়ে যে লোকটি থাকে সেই হচ্ছে আমাদের পূর্বপরিচিত শঙ্করপ্রসাদ।

বেলা দশটা। ঘরের মধ্যে একা বসেছিল শঙ্করপ্রসাদ। এখনকার শঙ্করপ্রসাদকে দেখলে কিন্তু তাকে আর পূর্বরাত্রির সেই লোকটি বলে বিন্দুমাত্রও চেনবার উপায় নেই।

এ শঙ্করপ্রসাদ ভিন্ন। সম্পূর্ণ পৃথক্। শান্ত, সৌম্য, সুদর্শন একটি মানুষ। চেহারার মধ্যে কেমন যেন করুণতা। ব্যবহার অত্যন্ত ভদ্র। তবে একটু গম্ভীর প্রকৃতির।

কিন্তু শঙ্করপ্রসাদ নিজেও জানে না, রাত দশটার পর থেকে কেন সে ধীরে ধীরে যেন অন্য একটি মানুষে রূপান্তরিত হয়। সে মানুষটি এ শঙ্করপ্রসাদের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক্ একটি মানুষ। বীভৎস তার রূপ। জঘন্য! ভয়াবহ।

এই মুহূর্তের শঙ্করপ্রসাদ নিজেই রাতের সে ভয়াবহ পিশাচটিকে ঘৃণা করে। তার কথা ভাবতে সুরু করলেই যেন আজকের এই মুহূর্তের এই লোকটির মনে জেগে ওঠে একটা তুমুল আলোড়ন। মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্ব।

কিন্তু তবু রাত ঠিক দশটা বাজবার পরে শঙ্করপ্রসাদ পারে না ঘরে বসে থাকতে। এমনি নিশ্চিন্ত আরামে আর একটি মুহূর্ত কাটানোরও ধৈর্য থাকে না তার।

ক্রুদ্ধ পদবিক্ষেপে শঙ্করপ্রসাদ ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়। বিরক্তি আর অস্বস্তিতে তার সারা দেহ তখন যেন আঁকুপাঁকু করতে থাকে। বিদ্রোহী হয়ে ওঠে শঙ্করপ্রসাদের মন।

সে তখন ছুটে যায় শহরতলীতে গুণ্ডাদের গোপন আড্ডায়। যেখানে মদের গন্ধে ভারী বাতাস গুম্‌রে ওঠে নিঃসীম ব্যথায়।

জুয়া আর নেশার ছিনিমিনি খেলা চলে।

টাকার বড় বড় নোটগুলো পাখ্‌না মেলে উড়তে থাকে হাল্‌কা পাখির মতো। আর সেই নোটগুলোকে কেন্দ্র করেই মাঝে মাঝে ঝিলিক মেরে ওঠে চক্‌চকে ছোরার শাণিত ইস্পাত। মানুষের বুকের তাজা রক্তে দামী নোটগুলো ভিজে ওঠে মাঝে মাঝে।

মানুষের বুকের রক্ত!

হা হা করে হেসে ওঠে শঙ্করপ্রসাদ। ভয়াবহ প্রেতের পৈশাচিক অট্টহাসির মতো শোনায় তার সে হাসি।

তার এই সুদীর্ঘ জীবনে এই একটিমাত্র জিনিসের প্রতিই তার কেমন যেন নেশা। মানুষকে আজ শঙ্করপ্রসাদ ভালবাসতে জানে না। ভালবাসা? শঙ্করপ্রসাদ ভাবে। ও কথাটাকে সে দীর্ঘদিন পূর্বেই তার অভিধানের পাতা থেকে নিশ্চিহ্নে মুছে ফেলেছে।

মানুষকে সে হত্যা করতে চায়। রাত ঠিক দশটা বাজার সঙ্গে সঙ্গেই তার বুকের এই ক্ষুধা হয়ে ওঠে উদ্দাম। শঙ্করপ্রসাদ তখন দুর্ধর্ষ। শঙ্করপ্রসাদ অমানুষ।

শুধু হত্যাই নয়। মানুষকে টুকরো টুকরো করে কেটে তার দেহের প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছিন্নবিচ্ছিন্ন করেই তার যেন অপার আনন্দ।

মৃত মানুষের চোখের বিভ্রান্ত দৃষ্টি তাকে আকর্ষণ করে। তাকে যেন নীরবে আহ্বান জানায়।

জীবনে যে অজস্র মানুষকে সে হত্যা করেছে তাদের অন্তিম মুহূর্তের সকরুণ দৃষ্টি যেন তার মনের প্রতিটি কোণে জ্বলন্ত অক্ষরে আঁকা আছে।

রাত দশটা বাজবার সঙ্গে সঙ্গেই তারা যেন একে একে তার সাম্‌নে এসে দাঁড়ায়। তাকে পেছন থেকে আহ্বান জানায়। তাকে বিদ্রূপ করে।

ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে শঙ্করপ্রসাদ। বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। কেমন যেন বিপর্যস্ত। সেই ক্রুদ্ধ মুহূর্তে সে যাকে সাম্‌নে পায় তাকেই খুন করে বসে। তারপর তার দেহকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করেই তার অসীম তৃপ্তি!

কিন্তু কেন?

ধীরে ধীরে দীর্ঘদিন পূর্বের কয়েকটি ঘটনা শঙ্করপ্রসাদের মনের মধ্য দিয়ে পাক খেয়ে যায়।

ঠিক ছয়টি বছর পূর্বেকার একটি ঘটনা।

রাত তখন দশটা।

ঠিক কাঁটায় কাঁটায় দশটা। একটি মুহূর্তও কম-বেশি নয়। ঘড়ির শব্দ তখনও বাজছিল ঢং ঢং!

কিন্তু সে শব্দকে স্তব্ধ করে দিয়ে ভেসে উঠেছিল আর একটি শব্দ। একটি নারীকণ্ঠের করুণ অন্তিম ক্রন্দন। শেষ দীর্ঘশ্বাস।

একটি নারীকে স্বহস্তে হত্যা করেছিল শঙ্করপ্রসাদ। আর সেই নারীই হচ্ছে অনমিত্রা।

কিন্তু অনমিত্রাকে সে একদিন ভালবাসত। অনমিত্রার নামে একদিন তার দেহে শিহরণ লাগত। কিন্তু কেন সে হত্যা করল তাকে?

শঙ্করপ্রসাদের মনে পড়ে সে ঘটনাগুলো। সামান্য কারণে সে এই অনমিত্রাকে ভুল বুঝেছিল। একটি যুবককে সে একদিন অনমিত্রার সঙ্গে মিশতে দেখল। এই যুবকটিকে এর আগে সে কখনও তার সঙ্গে দেখেনি।

শঙ্করপ্রসাদের মনে তখন থেকেই ভুল ধারণা বাসা বাঁধতে সুরু করল। সে ভাবল, নিশ্চয়ই অনমিত্রা তার সঙ্গে শুধু অভিনয় করেছে। এ ছাড়া এ রকম ঘটনাকে সে তার উত্তেজিত মন নিয়ে আর কি ভাবেই বা ব্যাখ্যা করতে পারে?

কিন্তু সে সময় শঙ্করপ্রসাদ বিষয়টা নিয়ে ধীর মস্তিষ্কে চিন্তা করবার মতো একটা মুহূর্তও সময় পায়নি। একটু খোঁজ নিলেই সে জানতে পারত যে এই যুবকটি আসলে অনমিত্রার সহোদর ভাই। দীর্ঘদিন বিদেশে থেকে সে সময় ফিরে এসেছিল।

তাই সে নিজেই বসে গেল অনমিত্রার বিচার করতে। তার মাথায় তখন যে কোন্ অন্ধ দেবতা এসে ভর করেছিল তা সে আজও জানে না। তাই বুঝি সারা জীবন দিয়ে সে তার অতীত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে চলেছে। করছে অতীত ভুলের সংশোধন।

ক্রুদ্ধ মুহূর্তে শাণিত ছোরা দিয়ে সে পরদিন রাত ঠিক দশটায় অনমিত্রাকে স্বহস্তে খুন করেছিল।

কিন্তু অনমিত্রা?

না, প্রতিবাদ সে করেনি। শঙ্করপ্রসাদের হাতে প্রাণবিসর্জন দিতেও সে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত ছিল না।

কিন্তু শঙ্করপ্রসাদ সেদিন নিষ্ঠুর। অনমিত্রাকে হত্যা করেই সে ক্ষান্ত হয়নি। নিজ হাতে তাকে টুকরো টুকরো করে কেটেছিল সে। স্বহস্তে শঙ্করপ্রসাদের প্রথম নরহত্যা! তারপর?

তারপর সে একদিন সব কথা জানতে পারল। বুঝতে পারল নিজের ভুল। ক্ষোভ আর অনুতাপ তার মনকে ক্ষতবিক্ষত করে তুলতে লাগল।

দিনের পর দিন কাটে। পুরোনো গ্লানি তার মন থেকে এতটুকুও মুছে যায়নি। বরং যত দিন কাটে ততই সে যেন দেখে অনমিত্রা প্রতিটি কাজে তাকে অনুসরণ করছে। দিনে দিনে শঙ্করপ্রসাদ যতই অধঃপাতের পথে পা বাড়ায় ততই যেন মনে হয় অনমিত্রার আত্মা তাকে বাধা দেবার জন্যে আসছে তার পিছে পিছে। তাকে নিরস্ত করবার জন্যে চেষ্টা করছে। কিন্তু তা না পেরে গভীর ব্যথায় গুম্‌রে গুম্‌রে কাঁদছে।

তারপর থেকেই শঙ্করপ্রসাদ খুনী আসামী। রাত ঠিক দশটা বাজবার সঙ্গে সঙ্গেই যেন অভিশপ্ত আত্মারা এসে ভিড় করতে থাকে তার চারপাশে। যতোই সে খুন করে ততোই তার উন্মাদনা বেড়ে চলে। আর সেই উন্মাদনায় যাদের সে মনে-প্রাণে ঘৃণা করে তাদেরই সে খুন করে বসে।

কিন্তু এই পুলিশ কনস্টেবলটিই হচ্ছে একমাত্র লোক যাকে বিনা অপরাধে শঙ্করপ্রসাদ খুন করল। আর সেইজন্যেই সে আজ এত বেশি অনুতপ্ত। কিছুতেই সে আর পুরোনো শান্তি ফিরে পাচ্ছে না তার মনে।

শঙ্করপ্রসাদ ভাবে। যেমন করেই হোক্ এই অসহনীয় অবস্থা থেকে তাকে মুক্তি পেতে হবে!

কিন্তু কেমন করে?

তবে কি সে আত্মহত্যা করবে?

বিভ্রান্ত শঙ্করপ্রসাদ প্রবল উত্তেজনায় সোজা হয়ে দাঁড়ায়।

ছয়

—একটি মানুষ নিখোঁজ—

বিকেল পাঁচটা।

দীপক তার নিজের বাড়ির ব্যাল্‌কনিতে বসে চিন্তা করছিল। হাতে তার একখানা ক্রিমিনোলজির বই।

অপরাধতত্ত্বের বইখানার পাতা উল্টে সে খুঁজছিল একটা বিষয়। একটি পাতায় এসে সে থম্‌কে দাঁড়ায়।

দীপক পড়ে চলে। ক্রাইম্-এর সঙ্গে জড়িত রয়েছে মানুষের স্বার্থ। একটা ঈভ্‌ল্ ইন্‌টেন্‌শন্ মানুষকে ক্রাইমের পথে চালনা করে থাকে। সে ইন্‌টেন্‌শন্ হচ্ছে কিছু একটা অর্থ, সম্পত্তি বা প্রতিপত্তি পাবার লোভ। আবার হঠাৎ ক্রোধ থেকেও একটি মুহূর্তের উত্তেজনায় মানুষ ক্রাইম্ করে থাকে। তাই ক্রাইমের মূলে স্বার্থ অথবা ক্রোধ, হিংসা ইত্যাদি জড়িত থাকে।

কিন্তু নিঃস্বার্থভাবে, কেবল মস্তিষ্কের একটা ক্রিমিন্যাল প্রপেন্সিটি কি মানুষকে ক্রাইমের পথে নিয়ে যেতে পারে না?

হ্যাঁ তাও পারে। দীপক পড়তে থাকে। মানুষের সেই বিশেষ অবস্থাকে বৈজ্ঞানিকরা বলেছেন 'হোমিসাইড্যাল ম্যানিয়াক্'। বিশেষ কোনও একটা আঘাত বা এম্‌নি কোনও একটা মারাত্মক ঘটনা সুস্থ মানুষের মনেও এমনি অবস্থার সৃষ্টি করতে পারে। হয়তো তেমনি বিশেষ

অবস্থায় বা বিশেষ সময়ে তার মধ্যে চাড়া দিয়ে ওঠে এমনি 'ম্যানিয়াক্'। কিন্তু পরে আবার সে পূর্ব অবস্থায় ফিরে আসতে পারে। আবার অনেক সময় সারা জীবন ধরে তার মনে থাকে এমনি একটা ভাব।

দীপক আনমনে ভাবে। শঙ্করপ্রসাদের মনে কি 'হোমিসাইড্যাল ম্যানিয়াক্' বর্তমান? জীবনের কোনও একটি সময়ে কোনও একটি নারীকে সে হত্যা করেছিল বলেই কি তার মনের বর্তমান এমনি অবস্থা?

হয়তো তাই!

কোনও কোনও মনস্তত্ত্বের বৈজ্ঞানিক বলেছেন, এই ধরণের মানসিক বৈকল্যজনিত ক্রিমিন্যালের শাস্তি হওয়া উচিত নয়। কারণ সে জানে না সে কি করে চলেছে। এবং তার পক্ষে প্রয়োজন মানসিক সর্ববিধ স্বাচ্ছন্দ্যের। মানসিক চিকিৎসার।

কিন্তু অন্য বৈজ্ঞানিকরা বলেন, এরা অপ্রকৃতিস্থ হতে পারে—কিন্তু সম্পূর্ণ উন্মাদ নয়। তাই এদের শাস্তি হওয়া উচিত। মানুষ উন্মাদ অবস্থায় কোনও কাজ করলে তার শাস্তি হয় না বটে, কিন্তু এ অবস্থায় তাকে কখনই সম্পূর্ণ উন্মাদ বলা যায় না।

দীপকের চিন্তায় বাধা পড়ে। চাকর ভজুয়া এসে বলে—একটি মহিলা আপনার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে অপেক্ষা করছেন।

—মহিলা?

—হ্যাঁ। নিচের হলঘরে বসিয়ে রেখে এসেছি।

—আচ্ছা, তুই গিয়ে তাঁকে বসতে বল, আমি আসছি।

ভজুয়া চলে যায়। দীপক চিন্তা করে, বর্তমান ঘটনাগুলোর সঙ্গে এর কোনও সম্বন্ধ নেই ত? কে জানে?

দীপক নিচে নেমে আসে।

বাইরের হলঘর। একটি মেয়ে চুপচাপ বসেছিল কৌচের ওপর। দীপককে দেখে উঠে দাঁড়ায়। অবিবাহিতা। বয়স বছর কুড়ির কাছাকাছি।

—নমস্কার মিঃ চ্যাটার্জী!

—নমস্কার প্রণতি দেবী! আপনি নিশ্চয়ই অত্যন্ত জরুরী প্রয়োজনেই আমার এখানে এসেছেন বুঝতে পারছি। কলেজ থেকে ফিরেই হঠাৎ একেবারে আমার এখানে!

—সে কি! আপনি এত সব কথা কি করে জানলেন? আর আমার নামই বা—

—ওই ত আপনার হাতে কলেজ-নোট-বুক। ওর ওপরেই ত আপনার নাম লেখা দেখছি। আর কলেজ থেকে ফিরে উত্তেজিত হয়ে সোজা আমার এখানে এত তাড়াতাড়ি এসেছেন যে খাতাটা রেখে আসতে পর্যন্ত ভুলে গেছেন। কাজেই আমার 'ডিডাক্‌শন্' কি ভুল?

—সত্যি, আমি তাহলে আপনার উপরে বিশ্বাস স্থাপন করে ভুল করিনি দেখছি। আপনার উপস্থিতবুদ্ধি দেখেই তা বুঝতে পারছি দীপকবাবু। দীর্ঘদিন ধরে আপনার সম্বন্ধে যে সব কাহিনী শুনে আপনার প্রতি আমার মনে বিশ্বাস স্থাপিত হয়েছিল, আজ প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেয়ে সে বিশ্বাস আরও অনেক দৃঢ় হলো।

—কিন্তু ঘটনাটা কি?

—পরশু সকালে আমার বাবা শিবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষ একটা কাজে ব্যারাকপুর গিয়েছিলেন। একটা মস্ত বড় ব্যবসায়ে প্রায় এক লাখ টাকা তিনি ফাইনেন্স করবেন বলে

মনস্থ করেন। টাকা যোগাড় করবার জন্যেই ব্যারাকপুরে গিয়েছিলেন তিনি। আমাদের অনেকগুলো সম্পত্তি বাড়ি ইত্যাদি বরাহনগরের মহাজন মিশিরজীর কাছে বাঁধা রেখে তিনি টাকাটা আনতে গিয়েছিলেন। কাল সকলে তাঁর ফেরবার কথা ছিল। কিন্তু কাল তিনি ফেরেননি। আমরা উৎকণ্ঠিত হয়ে প্রতীক্ষা করছিলাম। কাল সারাদিন গেল। আজ সকালে নায়েবমশাইকে সেখানে পাঠিয়েছিলাম ব্যাপারটার খোঁজখবর আনতে। তিনি ফিরে এসেছেন একটু আগে। আমি কলেজ থেকে ফিরে এসে সব কথা তাঁর কাছে শুনলাম।

—কি শুনলেন?

—বাবা পরশু রাতেই কাজ শেষ করে টাকা নিয়ে কোল্‌কাতার দিকে রওনা হয়েছিলেন। এমন কি বাবার হাতের সই পর্যন্ত মিশিরজী নায়েবমশাইকে দেখিয়েছে।

—মিশিরজী লোক কেমন?

—বিরাট ধনী লোক। এর আগেও বাবার সঙ্গে দু-একবার আদান-প্রদান হয়েছে।

—কোনও লোক কি এই আদান-প্রদানের কথা জানত?

—অনেকেই জানত। কিন্তু তারা কি করতে পারে?

—কে কতটা ক্ষতি করতে পারে তা ভেবে লাভ নেই। আপনি সব কথা নিঃসঙ্কোচে বলে যান।

—এই আদান-প্রদানের ব্যাপার জানতেন নায়েবমশাই, বাবার অন্য পার্টনার হরবল্লভবাবু আর তাঁর বন্ধু ব্রজেনবাবু।

—তিনি কি ট্রেনে গিয়েছিলেন, না বাসে?

—আমাদের নিজের মোটরে। বাবা নিজেই ড্রাইভ করে নিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর ড্রাইভিং লাইসেন্স ছিল। ড্রাইভার রাখা তিনি কোনও দিনই পছন্দ করতেন না।

—ভাল কথা, সে গাড়ির কোনও খবর...

—না, সে গাড়িখানারও কোনও পাত্তা সম্প্রতি পাওয়া যায়নি।

—পুলিশে ব্যাপারটা ইন্‌ফর্ম করেছেন কি?

—না, জানাবার সুযোগ ঘটেনি এখনও। তাছাড়া পুলিশের ওপর খুব বেশি আস্থাও আমার নেই। আপনার প্রচুর খ্যাতি আমি এর আগে শুনেছি তাই...

—কিন্তু তবু পুলিশকে ঘটনাটা জানানো আপনার উচিত। কারণ এত বড়ো একটা সিরিয়াস্ কেস পুলিশের ডায়েরীতে থাকা দরকার।

—আপনি কি তবে এ কেস গ্রহণ করতে সম্মত নন? বিশ্বাস করুন দীপকবাবু, যতো টাকা ফীজ্ লাগে আমি দেব, কিন্তু বাবাকে আপনি যতো তাড়াতাড়ি পারেন খুঁজে এনে দিন।

প্রণতির কথায় আন্তরিকতা ধ্বনিত হয়ে ওঠে।

দীপক বলে—কে বলল, আমি এ কেসে হাত দেব না। আমি ত সেরকম কোনও কথা আপনাকে বলিনি।

—তবে পুলিশে ইন্‌ফর্ম করতে বললেন কেন?

—সাধারণভাবে ব্যাপারটা পুলিশকে জানানো উচিত। আমি তদন্তভার গ্রহণ করছি পৃথক্ ও গোপনীয়ভাবে। সাধারণ লোককে এটা জানাতে চাই না আমি।

—বুঝেছি। প্রণতি বলে—বেশি জানাজানি হলে আপনার তদন্তে বিঘ্ন ঘটবে। আমি তাহলে নায়েবমশাইকে দিয়ে পুলিশে ইন্‌ফর্ম করবার ব্যবস্থা করব।

—আর দুটি কথা জানতে চাই শুধু। প্রথম হচ্ছে আপনাদের বাড়ির ঠিকানা আর দ্বিতীয়—মোটরের নম্বরটা।

—বাড়িটার ঠিকানা আটচল্লিশ, মনোহরপুকুর রোড—মোটরের নম্বর ডব্লিউ বি সি ৭৬০।

—ধন্যবাদ। অন্য কোনও কিছু জানবার প্রয়োজন হলে পরে আবার আপনার সাহায্য নেব।

প্রণতি দীপককে নমস্কার জানিয়ে ধীরপদে পথের উদ্দেশ্যে পা বাড়ায়।

সাত

—একটি রক্তমাখা ছুরি—

দীপক বাড়ি থেকে বের হয়ে প্রথমে যায় কাশীপুর থানায়। ও.সি. মিঃ দেশাইকে দীপক সাদর অভিবাদন জানান।

—কি সৌভাগ্য, আপনি খবরটা পেয়েই জরুরী ইন্‌ভেস্টিগেশন্ করবার জন্যে লেগে গেছেন মিঃ চ্যাটার্জী!

দীপক হেসে বলে—যে কোনও কেসই দ্রুত সল্‌ভ্ করে ফেলে আনন্দ পাই আমি।

—তা ত জানি। মিঃ দেশাই বলেন—কিন্তু এখনও কোন ট্রেস আবিষ্কার করতে পারলেন কি?

—না, একটা পয়েণ্ট জানবার জন্যেই এসেছিলাম আপনার কাছে।

—কিন্তু তার চেয়েও বড় একটা খবর আছে মিঃ চ্যাটার্জী।

—বড় খবর?

—হ্যাঁ, যেখানে পুলিশ কনস্টেবলটির মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছিল তার থেকে কিছু দূরেই ব্যারাকপুর ব্রিজ। ব্রিজের নিচে খালের ধারে আজ একখানা রক্তমাখা ছুরি কুড়িয়ে পাওয়া গেছে।

—সে কি মিঃ দেশাই?

—হ্যাঁ, এটা আবিষ্কার করেছেন ওই অঞ্চলেরই স্থানীয় একজন লোক।

—কি করে আবিষ্কার হলো সেটা?

—লোকটি কি একটা কাজে খালের ধারে গিয়েছিল। সেখানেই দেখতে পায় রক্তমাখা ছুরিটা। সেটা পেয়েই সে কুড়িয়ে নিয়ে এসে থানায় জমা দিয়েছে।

—লোকটিকে কি কোনওরকম সন্দেহ করা চলে?

—না, সে একজন সাধারণ কারখানা-মজুর।

—কোনও আঙ্গুলের ছাপ-টাপ কি ছোরাটায় পাওয়া গেছে?

—হ্যাঁ, লোকটার আঙ্গুলের ছাপ ছাড়াও অন্য একটি হাতের আঙ্গুলের ছাপ পাওয়া গিয়েছে তাতে।

—আচ্ছা, ছোরাটা একবার দেখান ত।

মিঃ দেশাই হাঁকলেন—দরওয়াজা!

একজন পুলিশ কনস্টেবল এসে সেলাম ঠুকে দাঁড়াল। বুটের শব্দ হলো খট্।

—জমাদার সাবকো তলব করো।

আবার খট্। দরওয়াজার প্রস্থান।

একটু পরেই জমাদার সাবের আগমন। মিঃ দেশাই বললেন—কালকের ছোরাটা এনে দেখান ত!

মিনিট তিনেক পর জমাদার সাব্ সাবধানে একটা কাগজ দিয়ে ধরে ছোরাটা নিয়ে এলো।

—এই নিন স্যর।

দীপক ভাল করে দেখল ছোরাটা। লম্বায় ইঞ্চি দশেক হবে তার ফলাটা। ধারাল ইস্পাত দিয়ে তৈরি সেটা। ফলার অনেকটা জুড়ে শুক্‌নো রক্ত জমাট বেঁধে আছে।

—ছোরার বাঁটে যে আঙ্গুলের ছাপগুলো পাওয়া গেছে সেগুলো কি শঙ্করপ্রসাদের? দীপক প্রশ্ন করে।

—ও, সেই পুরোনো কালপ্রিট্ শঙ্করপ্রসাদ? না, আশ্চর্য ব্যাপার স্যর! শঙ্করপ্রসাদ বহুদিন আগে একবার 'কন্‌ভিকটেড্' হয়েছিল, তার আঙ্গুলের ছাপের রেকর্ড আছে। তার সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হয়েছিল। কিন্তু এটা শঙ্করপ্রসাদের হাতের ছাপ নয়। কি করে যে এমনটা সম্ভব হলো তা বুঝতে পারছি না।

—শঙ্করপ্রসাদের ওপর আপনার সন্দেহ কি সুদৃঢ়?

—হ্যাঁ, সেদিন রাতে শঙ্করপ্রসাদ দমদম থেকে ফিরছিল এ খবরও পেয়েছি। এ রাস্তা ছাড়া সে দমদম থেকে কি করে ফিরবে? কিন্তু ছোরার বাঁটে অন্য ছাপ...

—গোলকধাঁধায় পড়ে বেশ জব্দ হয়েছেন, কি বলেন? দীপকের স্বরটা লঘু।

—কিন্তু স্যর আপনাকে ত মোটেই চিন্তিত বলে মনে হচ্ছে না।

—না হবার কারণও অবশ্যই আছে।

—তার মানে?

—মানে অত্যন্ত সহজ। প্রকৃত হত্যাকারী কে এই কন্‌ফিউশন? তা একটু ভাল করে মাথ ঘামান না!

—কিভাবে?

—দুজন হত্যাকারীও ত হতে পারে।

—একই লোকের দুজন হত্যাকারী?

—বুঝেছি। আপনার মাথায় আসছে না এখন। যাক্। পরেই সব ব্যাপার স্পষ্ট করে বলব। শুধু জেনে রাখুন, সেই দিনই বৈকাল থেকে একজন ধনী ব্যক্তি এক লাখ টাকা সহ ঐ অঞ্চলেই নিখোঁজ হয়েছিলেন।

—কে সেই ধনী ব্যক্তি?

—সেটা এখনও থানায় ডায়েরী হয়নি। তবে শীগ্‌গিরই হবে। আপনি এ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।

—কিন্তু তবুও সমস্ত ব্যাপারটা ধোঁয়াটে বলে মনে হচ্ছে!

—তা হবে বটে—কিন্তু পরে দেখবেন সমস্ত জটিলতা অত্যন্ত সহজেই সল্‌ভ্ হয়ে গেছে। যাক্, এখনকার মতো চলি। উপযুক্ত সময়ে আবার দেখা করব।

কথা না বাড়িয়ে দ্রুতপদে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায় দীপক।

আট

—শঙ্করপ্রসাদের অপমৃত্যু—

আত্মহত্যা করতে উদ্যত শঙ্করপ্রসাদ সোজা হয়ে দাঁড়ায়। বিচিত্র একটা চিন্তা যেন খেলা করতে থাকে তার মনে।

না, আত্মহত্যা নয়। আত্মহত্যা করে এর প্রায়শ্চিত্ত হতে পারে না। তার চেয়ে অনেক ভাল হচ্ছে আত্মসমর্পণ করা।

হ্যাঁ, সে তাই করবে।

আইনের চোখে যে পাপ সে করেছে, আইনই তার শাস্তি দিক। আইন উপযুক্ত শাস্তিবিধান করলে সে তা মাথা পেতে নেবে। কিন্তু নিজের হাতে শাস্তি নিলে উপযুক্ত শাস্তিগ্রহণ হবে না।

তিল তিল করে অনুতাপের আগুনে এর প্রায়শ্চিত্ত হোক্।

মৃত্যু।

অদ্ভুত কথাটা। বিচিত্র। শঙ্করপ্রসাদের একে একে মনে পড়ে সেই মৃত্যুপথযাত্রীদের করুণ মুখগুলির কথা—যাদের সে নিজের হাতে হত্যা করেছে। যাদের অন্তিম মুহূর্তের সঙ্গে জড়িয়ে আছে তার জীবনের কয়েকটি দীর্ঘশ্বসিত প্রহর।

কি বীভৎস দেখায় মৃত্যুর পূর্বে তাদের মুখের চেহারাগুলি! কি যেন একটা অপরিসীম করুণতা লেপ্‌টে থাকে তার সঙ্গে। ভয়ার্ত মানুষের চেহারা তার কাছে নতুন ধরণের আনন্দ পরিবেশন করে এসেছে এতদিন।

শঙ্করপ্রসাদ ভাবে।

মৃত্যুর পূর্বে তার মুখের চেহারাও নিশ্চয়ই পাল্টে যাবে। তার মুখেও খেলা করবে এমনি ভয়ার্ত ভাব।

দেখাই যাক না কেমন দেখায়।

শঙ্করপ্রসাদ উঠে যায় ঘরের কোণের দিকে। ড্রয়ারটা খুলে বের করে একটা রিভলবার। কার্তুজ ভরা আছে তাতে। লোড্ করা। ট্রিগারটা টিপলেই গুলি বেরিয়ে আসবে।

শঙ্করপ্রসাদ রিভলভারের নলটা চোয়ালের নিচে চেপে ধরে। তারপর নিজে গিয়ে বসে একটা আয়নার সাম্‌নে।

বিশাল আয়নাটা।

তারা সারা শরীর আয়নার বুকে প্রতিবিম্বিত হচ্ছে। কিন্তু কই, তার মুখ ত বীভৎস দেখাচ্ছে না!

এমন কেন হলো? তবে কি সে এমনি চুপচাপ বসে থেকেই মৃত্যুকে আলিঙ্গন করবে?

তাই বা কি করে সম্ভব?

আচ্ছা, সে যদি মনে করতে থাকে যে সে আত্মহত্যা করবে? তাহলে কেমন দেখাবে তার মুখ?

শঙ্করপ্রসাদ চোয়ালের নিচে আরও জোরে রিভলভারটা চেপে ধরে। মনে মনে ভাবতে চেষ্টা করে, আর মাত্র কয়েকটি মুহূর্ত তার আয়ু। মাত্র কয়েকটি মুহূর্ত। তারপরেই তার অন্তিম নিশ্বাস বাতাসের বুকে মিলিয়ে যাবে। সে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করবে।

কিন্তু কই, তবুও ত তার মুখে কোনও ভয়ের রেখা ফুটছে না। এ কি অসম্ভব ব্যাপার?

প্রচণ্ড বেগে অট্টহাসি হেসে ওঠে শঙ্করপ্রসাদ।

সারা বাড়ি যেন গম্‌গম্‌ করতে থাকে তার হাসির শব্দে। রিভলভারটা টেবিলের ওপর রেখে উঠে দাঁড়ায়। তারপর সাম্‌নে-রাখা বিরাট পেপারওয়েটটা ছুড়ে মারে আয়নায় তার প্রতি ম্বাব দিকে।

ঝন্‌ ঝন্‌...

আয়নার কাঁচ ভেঙে ভেঙে পড়ে। সারা ঘরের মেঝেতে কাঁচের টুকরোগুলি ছড়িয়ে যায়।

ভাঙা আয়নায় প্রতিফলিত শঙ্করপ্রসাদের মুখখানা এবার বীভৎস দেখায়। আঁকাবাঁকা। ভাঙা-ভাঙা।

হো হো করে হেসে ওঠে শঙ্করপ্রসাদ। এতক্ষণ যেন ঠিক এইটাই চাইছিল।

দ্রুতপদে সে বেরিয়ে যায় ঘর ছেড়ে। থানায় গিয়ে আত্মসমর্পণ করবার জন্যে মনকে প্রস্তুত করে নেয়।

সোজ কাশীপুর খানায় এসে ভেতরে ঢুকে পড়ে শঙ্করপ্রসাদ।

সাম্‌নেই দেখা হয় একজন অফিসারের সঙ্গে।

—কি প্রয়োজনে আপনি এখানে এসেছেন?

—আমি একবার ও.সি.-র সঙ্গে দেখা করতে চাই।

—মিঃ দেশাই? সোজা ভেতরের ঘরে চলে যান।

শঙ্করপ্রসাদ ভেতরের ঘরে প্রবেশ করে। সাম্‌নেই বসেছিলেন ও. সি. মিঃ দেশাই।

—নমস্কার! শঙ্করপ্রসাদ বলে।

প্রতি-নমস্কার জানিয়ে মিঃ দেশাই প্রশ্ন করেন—আপনার সাক্ষাতের কারণ খুলে বলুন।

এমন সময় শোনা যায় পায়ের শব্দ।

প্রখ্যাত ডিটেকটিভ দীপক চ্যাটার্জী ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে।

—আসুন মিঃ চ্যাটার্জী।

—নমস্কার মিঃ দেশাই! তারপর খবরাখবর কি?

—নতুন খবর কিছু নেই। কেবল ইনি এসেছেন আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে। অবশ্য কি প্রয়োজনে তা এখনও বলেননি।

দীপক আসন গ্রহণ করে। শঙ্করপ্রসাদের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করে—আপনার নাম?

—শঙ্করপ্রসাদ মিশ্র।

—ও, আপনার নামেই পুলিশবাহিনী এত চঞ্চল?

—হতে পারে। অবশ্য আমি অত খবর রাখবার অবকাশ পাই না।

—ভাল কথা। বসুন ওই চেয়ারটায়।

পকেট থেকে একটা সিগারেট কেস বের করে দীপক একটা সিগারেট এগিয়ে দেয় শঙ্করপ্রসাদের দিকে।

মিঃ দেশাই উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। সভয়ে তিনি বলে ওঠেন—দরওয়াজা!

একজন পুলিশ কনস্টেবল এসে সেলাম ঠুকে দাঁড়ায়—জী সাব্‌!

দীপক হেসে ওঠে। ইঙ্গিতে মিঃ দেশাইকে নিরস্ত হতে বলে দরওয়াজার দিকে তাকিয়ে

বলে—পরে তোমাকে ডাকা হবে। আপাতত কোনও প্রয়োজন নেই। পরে প্রয়োজন হলে জানানো হবে।

—সেলাম। দরওয়াজার প্রস্থান।

দীপক শঙ্করপ্রসাদের দিকে চেয়ে বলে—কই, ওটা ধরান।

শঙ্করপ্রসাদ হেসে সিগারেটটা ধরায়। দীপক নিজেও একটা সিগারেট ধরায়। একটা এগিয়ে দেয় মিঃ দেশাইয়ের দিকে।

—দেখুন মিঃ মিশ্র, দীপক সুরু করে—আপনি যে এখানে আত্মসমর্পণ করতে এসেছেন তা আমি বুঝতে পারছি। আমি জানি, আপনার মধ্যে একটা বিপুল অন্তর্দ্বন্দ্ব সুরু হয়েছে। বিগত দিনের যতো স্মৃতি তারা ঘুরে বেড়ায় আপনার পেছনে। দিবারাত্র আপনাকে অনুসরণ করে। তাদের সে বীভৎসতা আপনি আর সহ্য করতে পারছেন না...

—উঃ, শঙ্করপ্রসাদ দারুণ উদ্বেগে আর অসহনীয় উত্তেজনায় সোজা হয়ে দাঁড়ায়।

—শুনুন মিঃ মিশ্র, দীপক বলে—অযথা উত্তেজিত হবেন না আপনি। আপনার মনকে অযথা, এভাবে ফিক্‌ল্ করে তুলবেন না।

—কিন্তু...

—কোনও কিন্তু নয়। কোনও দ্বিধাসংশয় নয়। আজ আপনি জীবনের প্রতি সমস্ত মমতা ত্যাগ করেছেন। কাজেই আপনার মনের সমস্ত কথা আমার কাছে নিঃশেষে খুলে বলতে নিশ্চয়ই আপনার আপত্তি নেই?

—না, মিঃ চ্যাটার্জী, আমি তা পারব না—কিছুতেই না—

—পারবেন। নিশ্চয়ই পারবেন। মনকে দৃঢ় করুন। সবল করুন। হ্যাঁ, এবার বলতে সুরু করুন আপনার কাহিনী।

সোজা উঠে দাঁড়ায় শঙ্করপ্রসাদ। ধীরে ধীরে বলে—বেশ, এবার শুনুন আমার পুরোনো দিনের ইতিহাস। আজ থেকে ঠিক ছ' বছর আগে একটি মেয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে আমারই এক বন্ধুর মাধ্যমে। তার নাম ছিল অনমিত্রা। ধীরে ধীরে সে পরিচয় পরিবর্তিত হয় নিবিড় ভালবাসায়। আমি ছিলাম কলেজের একজন সেরা ছাত্র। ধনীর ছেলে। তা ছাড়াও সে সময় অপূর্ব দৈহিক সৌন্দর্য ছিল আমার। তাই সেও আমার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। আমাকে ভালবেসেছিল।

কিন্তু তারপরেই যেন সুরু হলো বিয়োগান্ত নাটক। নিষ্করুণ বিধাতা যেন আমার জীবন নিয়ে কঠোর এক খেলা খেলতে সুরু করলেন। একদিন—

কথা শেষ হয় না।

গুড়ুম্! গুড়ুম্!

প্রচণ্ড শব্দ।

পিস্তলের গুলি। ধোঁয়া।

শঙ্করপ্রসাদ লুটিয়ে পড়ে ঘরের মেঝের ওপর। ছট্‌ফট্ করতে করতে ধীরে ধীরে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে সে।

দীপক ও মিঃ দেশাই ছুটে যায় তার দিকে। জানালার বাইরে থেকে গুলি ছুঁড়ে শঙ্করপ্রসাদকে আহত করা হয়েছে।

সকলে ছুটে যায় বাইরের দিকে।

দেখা যায় দ্রুতগামী একটা ঢাকা-মোটর ছুটে চলেছে রাস্তা ধরে দক্ষিণের দিকে।

মিঃ দেশাই চীৎকার করে বলে ওঠেন—ওদের অনুসরণ করুন মিঃ চ্যাটার্জী! এক্ষুণি গাড়িটা তৈরি করতে বলুন।

দীপক হেসে বলে—সেজন্যে চিন্তিত হবার কারণ নেই মিঃ দেশাই। ওদের কোথায় পাওয়া যাবে তা আমি ভাল করে জানি। চলুন ভেতরে যাওয়া যাক।

হতভম্ব মিঃ দেশাইয়ের মুখ থেকে কোনও কথা বের হয় না।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে।

দীপক আর মিঃ দেশাইকে সেদিনই দেখা যায় দক্ষিণ কোল্‌কাতার নির্জন অংশে একটা বাড়ির সাম্‌নে ঘোরাফেরা করতে।

দীপকের দিকে চেয়ে মিঃ দেশাই বলেন—আমাকে হঠাৎ বিনা কারণে বিনা নোটিশে এখানে টেনে আনলেন কেন?

দীপক বলে—আপনার কোনও চিন্তা নেই। আপনি শুধু অপেক্ষা করুন বাইরে। আমিই সব ম্যানেজ করব।

—কিন্তু আমি?

—আপনি কিছুটা দূরে অপেক্ষা করবেন শুধু। আমি ভেতরে প্রবেশ করছি। যদি কোনও বিপদে পড়ি, তবে তা থেকে রক্ষা করবেন আপনি। আপনি এ দায়িত্ব নিতে রাজি থাকলেই আমি ভেতরে যেতে পারি।

—কিন্তু আপনি হঠাৎ এত বড় বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিচ্ছেন কেন, তা বুঝতে পারছি না দীপকবাবু।

—আপনার বোধ হয় মনে আছে যে, আমি বলেছিলাম, কোথায় ওদের পাওয়া যাবে তা আমি জানি। সেই সূত্রটুকু বের করবার জন্যেই আজ আমাকে এখানে আসতে হয়েছে। কিন্তু আপনি যদি সঙ্গে না থাকেন তবে ততটা ভরসা পাওয়া যায় না।

—বেশ, আমার সাধ্যমতো আমি চেষ্টা করব।

মিঃ দেশাই চুপচাপ দাঁড়ান। দীপক বলে—আচ্ছা চলি মিঃ দেশাই।

দীপক দ্রুতপদে জলের পাইপটা বেয়ে তরতর করে ওপরে উঠে যায়।

দোতলার জানালা।

দীপক ভেতরে প্রবেশ করে না। জানালার সাম্‌নে দাঁড়ায়। ভেতরে উঁকি মেরে দেখতে চেষ্টা করে কি ঘটনা ঘটছে সেখানে।

শেকলে বাঁধা একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করতে থাকে।

বলিষ্ঠদেহ একজন লোক হেঁকে ওঠে—জিমি, জিমি! চুপ কর! দিনরাত কানের কাছে চীৎকার ভাল লাগে না।

তার ঠিক সামনের টেবিলের ওপাশে বসেছিল আর একজন লোক। সে এবার প্রশ্ন করে—আমার কথার উত্তর কিন্তু এখনও পেলাম না!

—আমার উত্তর দেবার কিছু নেই। সবকিছু ঘটনার মূলকেন্দ্রই হচ্ছে টালার সেই ব্যাপারটার ওপরে।

—তার মানে?

—কবে ওদের কাছ থেকে উত্তর পাবে জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?

—নিশ্চয়ই। যতো সত্বর সম্ভব চেষ্টা করছি। মনে হয় দু-একদিনের মধ্যেই—

—আমি শুধু উপলক্ষ মাত্র। আমার কিছু করবার নেই এ ব্যাপারে। ওদের কাছ থেকে উত্তর না পেলে—

কথা শেষ হয় না।

দীপক হঠাৎ প্রচণ্ড বেগে হেঁচে ওঠে। বহু চেষ্টা করেও সে হাঁচিটা চাপতে পারে না।

—কে? দুজনে সোজা হয়ে দাঁড়ায়

তরতর করে নেমে আসে দীপক।

পথের ওপাশেই অপেক্ষা করছিলেন মিঃ দেশাই। দীপককে এত দ্রুত নামতে দেখে তিনি সন্দেহ করেন নিশ্চয়ই একটা কিছু ব্যাপার ঘটে গেছে।

কিন্তু কি ব্যাপার? তিনি তা আন্দাজ করতে পারেন না।

পেছন থেকে চীৎকার ভেসে আসে—চোর! চোর!

ঘন ঘন কুকুরের চীৎকার।

দুজনে দূরে দাঁড়িয়ে থাকা গাড়িটাতে উঠে বসে। গাড়িতে উঠে বসেই দীপক সেল্‌ফ স্টার্টারে চাপ দেয়। মৃদু গর্জন করে ইঞ্জিন সচল হয়ে ওঠে। গাড়ি তাদের বুকে নিয়ে ছুটে চলল মহানগরীর পথ ধরে।

রাত তখন সাড়ে আটটার বেশি নয়।

নয়

—রহস্যের সূত্র—

সন্ধ্যা সাড়ে আটটা।

দীপক চ্যাটার্জীর সহকারী রতনলালের সঙ্গে দীপকের কথা হচ্ছিল।

রতন বলল—আজ অবধি কিন্তু ব্যাপারটার কোনও হদিস বের করা গেল না দীপক। যাই বল্‌, এই ব্যাপারটা কেমন যেন রহস্যময়।

দীপক বলে—আপাতদৃষ্টিতে তাই মনে হয় বটে। শঙ্করপ্রসাদ একজন মর্বিড্ ক্রিমিন্যাল। ক্রাইম্‌টাই তার নেশা। তাই সে হয়ত পুলিশ কনস্টেবলটাকে হত্যা করল। কিন্তু একজনের স্বার্থে সে আঘাত করতে চলেছিল তার স্বীকারোক্তির মধ্য দিয়ে। তাই সে সবার আড়াল থেকে তাকে প্রকাশ্যে থানার মধ্যে এসে গুলি করে পালিয়ে গেল। এখন পর্যন্ত শঙ্করপ্রসাদের আঘাতটা কতদূর মারাত্মক জানি না—সে এখনও বেঁচে আছে, না ইতিপূর্বেই মারা গেছে তাও বুঝতে পারছি না আমি। প্রথম দর্শনে ব্যাপারটা অদ্ভুত বলেই মনে হয়, তাই না?

—সে কথাই ত আমি বলছি।

—পত্রিকাওয়ালারা ত একসঙ্গে সব আদা-নুন খেয়ে লেগে গেছে পুলিশবাহিনীকে অশ্রাব্য-কুশ্রাব্য সব মন্তব্য দিয়ে বিভূষিত করতে। ও. সি. মিঃ দেশাই ত সকাল থেকে বার তিনেক ফোন করেছেন। কিন্তু এ রহস্য ভেদ করতে হবে সদলবলে নয়—একা। সম্পূর্ণ একা। আমাকে আর তোকে এক্ষুণি যেতে হবে আটচল্লিশ নম্বর মনোহরপুকুর রোডে। তার আগে শুধু একটা খবর জানতে চাই।

—সে কি কথা?

—হ্যাঁ, ওটা হচ্ছে প্রণতি দেবীর বাড়ি। যে প্রণতি দেবী সেদিন আমার কাছে এসেছিলেন আমার সাহায্য পাবার জন্যে।

—কিন্তু সেখানে কেন?

—আমার মনে হচ্ছে প্রণতি দেবীর বাবা শিবপ্রসাদবাবুর অন্তর্ধানের সঙ্গে শঙ্করপ্রসাদের ব্যাপারটার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে।

—কি করে তা সম্ভব?

—খুলে বলে তোকে বোঝাতে পারব না। তবে ঘটনাপরম্পরায় প্রমাণ পাওয়া যাবে নিশ্চয়ই। যাক্, আমার সঙ্গে রওনা হতে তোর কোনও আপত্তি নেই ত?

—না, না, আমি চাই য়্যাকশন্। চাই কাজ। চুপচাপ বসে থেকে সময় নষ্ট করতে রাজি নই আমি।

—বেশ চল। আমার মনে হয় শীগ্‌গিরই এ রহস্যের সমাধান করবার মতো সূত্র আমার হাতে আসবে।

টেলিফোনের রিসিভারটা তুলে দীপক কাশীপুর থানার সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে।

—হ্যালো, কে?

—আমি মিঃ দেশাই কথা বলছি। উত্তর ভেসে আসে।

—শুধু একটা খবর জানবার জন্যে আপনাকে টেলিফোন করছি মিঃ দেশাই।

—কি খবর জানতে চান বলুন।

—খবরটা মারাত্মক কিছু নয়। শঙ্করপ্রসাদকে কি হাসপাতালে ভর্তি করে দেওয়া হয়েছে?

—হ্যাঁ।

—তার জ্ঞান কি ফিরে এসেছে?

—একটু আগে জ্ঞান ফিরে এসেছে বটে, তবে রক্তক্ষরণে ভয়ানক দুর্বল হয়ে পড়েছে।

—ব্লাড্ ট্রান্সফিউশন করা হলে জীবনের ভয় বোধ একটু কমে যাবে। কারণ ওকে বাঁচানো আমাদের অবশ্য কর্তব্য।

—সে চেষ্টা আমরা প্রাণপণে করছি মিঃ চ্যাটার্জী। স্যালাইন্ আর অ্যাট্রোপিন্ ইন্‌জেকশন দিয়েছেন ডাক্তারসাহেব। বলেছেন জীবনের ভয় বিশেষ নেই। তবে সম্পূর্ণ সেরে উঠতে আট-দশ দিনের কিছু বেশি লাগবে।

—গুলিটা লেগেছিল কোথায়?

—ডান বাহুতে। ওরা বোধ হয় বুক লক্ষ্য করেই গুলি করেছিল। তবে সৌভাগ্যবশতঃ সেটা লেগেছে হাতে। তাই এযাত্রা প্রাণে বেঁচে যাবে বলেই মনে হয়। কিন্তু আপনি এ খবরটা জানতে চাইছেন কেন?

—শঙ্করপ্রসাদের বেঁচে থাকা আমি চাই। আমার তদন্তে তাহলে বিরাট একটা সাহায্য করতে পারবে সে।

—কিন্তু সে কেমন নিঃঝুম মেরে গেছে। পৃথিবীর কোনও কিছুর প্রতি তার সামান্যতম আকর্ষণ আছে বলেও মনে হয় না।

—বুঝেছি। এটা হবেই। এটা হচ্ছে মনস্তত্ত্বের কথা। এই 'রিয়্যাক্‌শন্' আসাটাই মনুষ্যত্বের

লক্ষণ। আমার মনে হয় এর পরে তার পুরোনো স্বভাব অনেকটা পাল্‌টে যাবে। এমন কি তার ম্যানিয়া চিরদিনের মতো বন্ধ হয়ে যাওয়াই আমি স্বাভাবিক বলে মনে করি।

—তাহলে ত খুবই ভাল হয়। মিঃ দেশাইয়ের কণ্ঠস্বর চিন্তিত বলে মনে হয়।

—আচ্ছা, এখন তাহলে রেখে দিচ্ছি দীপকবাবু।

—হ্যাঁ, উপযুক্ত সময়ে তার সঙ্গে আমি দেখা করব। নমস্কার।

দীপক টেলিফোনের রিসিভারটা নামিয়ে রাখে।

দশ

—আকস্মিক ঘটনাচক্র—

দীপকের মোটর ছুটে চলেছে দক্ষিণ কোল্‌কাতার দিকে দ্রুতগতিতে।

বালিগঞ্জ। মনোহরপুকুর রোড।

নম্বরটা খুঁজে বের করতে দীপককে খুব বেশি বেগ পেতে হয় না। কড়া নাড়তেই দরজাটা খুলে যায়।

একজন দাসীশ্রেণীর মেয়ে এসে প্রশ্ন করে—কাকে চান স্যর?

—প্রণতি দেবীকে।

—ও, তিনি ত সকালে বেরিয়ে গেছেন। এখনও বাড়িতে ফিরে আসেননি।

—আশ্চর্য! নায়েবমশাই বাড়িতে আছেন?

—না, তিনিও সকাল থেকে বাড়িতে নেই।

—আচ্ছা, আমাকে একটা জরুরী কাজে এখানে আসতে হয়েছে। আমি পুলিশের লোক। ডিটেকটিভ। জরুরী কারণে শিবপ্রসাদবাবুর ঘরটা একবার ভাল করে দেখতে চাই।

—আসুন আমার সঙ্গে।

দাসীশ্রেণীর মেয়েটার ভাবভঙ্গি দেখে বোঝা গেল যে বাধ্য হয়ে এ কাজ করলেও, মনেপ্রাণে সে খুব বেশি সন্তুষ্ট নয়। যেন দীপক এ কাজ না করলেই ভাল হয়!

দোতলার কোণের দিকের বড় ঘরখানা শিবপ্রসাদবাবুর শয়নকক্ষ। দীপক ও রতনকে ঘরখানায় পৌঁছে দিয়েই দাসীশ্রেণীর মেয়েটি প্রস্থান করে।

এই ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে দূরের রাস্তাটা বেশ ভাল করেই নজরে পড়ে।

দূরের রাস্তাটার দিকে রতনের মনোযোগ আকর্ষণ করে দীপক বলে—আমি এ ঘরটা সার্চ করছি। তুই ততক্ষণ ওই দূরের রাস্তাটায় একবার ঘুরে আয়।

—সে কি? অবাক বিস্ময়ে রতন প্রশ্ন করে।

দীপক হেসে বলে—আমরা যখন মোটরে চড়ে এদিকে আসছিলাম তখন আর একটা মোটর বহুদূর থেকে আমাদের অনুসরণ করছিল। এই রাস্তাটায় তারা আসেনি। মনে হয় বড় রাস্তার ওপর মোটরটা দাঁড় করিয়ে রেখে ওরা ওখানেই অপেক্ষা করছে। যদি তা সত্যি হয়, তক্ষুণি পুলিশ স্টেশনে ফোন করবি।

রতন ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানায়। তারপর ধীরপদে বেরিয়ে নিচে নেমে যায়।

দীপক এবার ভাল করে ঘরের আসবাবপত্রগুলির দিকে মনঃসংযোগ করে।

বেশ বড় ঘরখানা। আলমারী, খাট, কুশন-লাগানো চেয়ার এবং অন্যান্য ফার্ণিচারের অভাব নেই। টেবিলের ওপর কতকগুলি কাগজপত্র নেড়ে দীপক তেমন প্রয়োজনীয় কিছু পায় না। আলমারীর মধ্যে অজস্র পুরোনো দলিলপত্র আর ব্যবসায় সংক্রান্ত কাগজপত্র। তা থেকে কোনও তথ্য মেলে না।

টেবিলের ড্রয়ারটা খুলে একটা চিঠি দীপকের হাতে পড়ে। চিঠিটার মধ্যে নতুন একটা তথ্যের ইঙ্গিত যেন। দীপক রুদ্ধনিশ্বাসে চিঠিটা পড়তে থাকে। তাতে লেখা ঃ

প্রিয় প্রণতি দেবী,

বিশেষ কয়েকটা ব্যাপারে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করা আমার অবশ্যই প্রয়োজন। এমন কতকগুলি তথ্য আপনাকে জানাব যা থেকে বিরাট একটা ব্যাপার আপনার ধারণার মধ্যে আসবে। আপনার পিতা নিখোঁজ হয়েছেন বলে আপনার যে ধারণা আছে তা ভুল। তিনি শত্রুর চক্রান্তে নিহত হয়েছেন। বিরাট একটা জটিলতা আছে এর মধ্যে। আপনি পত্রপাঠ আমার এখানে চলে এলে আপনাকে সব জানাতে পারি। খুব সাবধানে আসবেন। যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব চলে আসবেন। মনে রাখবেন শত্রুর চক্রান্তে আমার জীবনও বিপন্ন।

পত্রপাঠ আসবেন। কাউকেই এ চিঠিখানার কথা জানাবেন না। এটার কথা গোপন না রাখলে আপনার আর আমার জীবন বিপন্ন হয়ে উঠতে পারে। মনে রাখবেন, কারও কোনও কথায় বিশ্বাস স্থাপন করবেন না। এখনই আসছেন ত? ইতি—

ভবদীয়

হরবল্লভ সিংহ।

চিঠিখানা পড়ে দীপকের মুখ আলোকিত হয়ে উঠল। চিঠিটা পড়ে সকালে প্রণতি দেবী বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছে—এখন পর্যন্ত সে ফিরে আসেনি। হয়ত কোনও বিপদে পড়েছে সে।

হরবল্লভবাবুর নাম সে ইতিপূর্বেই শুনেছে বলে তার মনে হল। নামটা সে শুনেছে প্রণতি দেবীর কাছেই। ইনি ছিলেন নিরুদ্দিষ্ট অথবা নিহত প্রণতি দেবীর পিতা শিবপ্রসাদবাবুর ব্যবসায়-সংক্রান্ত পার্টনার। আর ইনি বিরাট একটা চক্রান্তের খবর রাখেন বলেও জানা যাচ্ছে। কিন্তু এঁর ঠিকানাটা কি?

দীপক তাকাল চিঠির মাথাটার দিকে। ঠিকানাটা লেখা আছে ৮ নং খেলাৎবাবু লেন, টালা। টালা! সে ত বহুদূর। কিন্তু সেখান থেকে কি এ ব্যাপারের কোনও সূত্র মিলবে? কে জানে!

দীপক চিঠিখানা পকেটে পুরে ফেলল। তারপর ধীরে ধীরে নেমে এলো একতলায়। কিন্তু আশ্চর্য! রতন ত এখনও ফিরে এলো না। কি ব্যাপারে ওর এত দেরী হচ্ছে কে জানে!

দীপকের কথামতো রতন বড় রাস্তার ওপর গিয়ে দেখল সেখানে একটা সিডান-বডি কার দাঁড়িয়ে আছে। ভেতরে দুজন লোক বসে। নিজেদের মধ্যে তারা কি একটা বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা করছিল।

রতন সেদিকে মন দিল না। সে নিশ্চিন্ত মনে ধীরপদে এগিয়ে চলল। বড় রাস্তার কোনও পাব্লিক টেলিফোন থেকেই ফোন করা যাবে।

ভালভাবে চারদিকে চেয়ে দেখল রতন। কিন্তু কই? পথে লোকচলাচল বিরল। শীতের রাত্রি।

তার ওপর এ অঞ্চলে লোকবসতিও ঘন নয়। রাতও বোধ হয় সাড়ে নটার কাছাকাছি। এখন লোকচলাচল কমে আসাটাই স্বাভাবিক।

রতন এগোচ্ছিল আপন মনে। এমন সময় পেছন থেকে কে যেন ডাকল—একটা কথা ছিল স্যর! এক মিনিট।

—কে? চম্‌কে উঠে রতন চাইল পেছনের দিকে।

—কিছু মনে করবেন না, আপনার দিয়াশলাইটা যদি একবার দিতেন ত ভাল হত। হেঁ হেঁ, শীতের রাত। একটা সিগারেট ধরাব।

—ধরান না।

রতন পকেট থেকে দিয়াশলাইটা বের করে দেয় লোকটার হাতে। লোকটা এক প্যাকেট সিগারেট বের করে। নিজে একটা নেয়। আর একটা রতনের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে—কিছু মনে না করেন ত একটা সিগারেট অফার করি।

রতন সিগারেট নেয় একটা।

লোকটা নিজের সিগারেটে আগুন ধরিয়ে রতনের সিগারেটেও অগ্নিসঞ্চার করে।

কিন্তু সিগারেটটাতে সজোরে টান দিতেই কেমন যেন একটা অবসাদ ঘনিয়ে আসে রতনের সারা দেহে।

মাথার মধ্যে কেমন যেন ঝিম্‌ঝিম্ করতে থাকে। দারুণ অস্বস্তিতে রতনের সাবা শরীর যেন পাক খেয়ে ওঠে।

রতন কি যেন বলতে চায়। কিন্তু মুখ দিয়ে কোনও কথা বের হয় না।

ধীরে ধীরে জ্ঞান হারিয়ে রতন সেখানেই লুটিয়ে পড়ে।

তার কানে শুধু বার বার বাজতে থাকে একটি বিদ্রূপাত্মক হাসির শব্দ। তারপরেই আর কিছু অনুভব করবার ক্ষমতা থাকে না তার।

দুজন লোক ধরাধরি করে রতনকে তাদের গাড়িতে ওঠায়। তারপরেই গাড়িখানা তীব্রবেগে ছুটে চলে উত্তর দিকে।

কি ঘটল তা ভালভাবে বোঝবার আগেই রতন নিশ্চেষ্টভাবে তাদের হাতে বন্দী হলো।

লোকদুটো একবার আড়চোখে রতনের নিশ্চল দেহটার দিকে তাকায়। এত সহজে যে রতনকে বন্দী করা যাবে তা তারা কল্পনাও করতে পারেনি।

তাদের মুখে ফুটে ওঠে পৈশাচিক হাসি।

এগারো

—হরবল্লভের বিস্ময়—

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেও রতনকে ফিরতে না দেখে দীপক বেশ একটু চিন্তিত হলো।

নিজের গাড়িতে এসে উঠে বড় রাস্তার মোড়ে যাবার জন্যে সংকল্প করল সে। রতনের ত এত দেরী করার কথা ছিল না।

কিন্তু গাড়িতে ওঠবার জন্যে সে এগিয়ে এসেই দেখতে পেল গাড়ির গদীর সঙ্গে পিন দিয়ে একটা কাগজ আটকানো আছে।

কাগজটা কি দেখবার জন্যে কৌতূহল হলো তার। দ্রুত গাড়ির সামনে গিয়ে কাগজটা একটানে খুলে ফেলল সে।

আশ্চর্য! বিস্ময়ের প্রবাহ বয়ে গেল দীপকের সারা দেহের ওপর দিয়ে।

কাগজটা একটা চিঠি। তাকে উদ্দেশ্য করেই লেখা।

প্রিয় গোয়েন্দাপ্রবর,

এখনও বলছি সাবধান। মিথ্যা এ ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবার চেষ্টা করো না। আমরা চাই না অকালে তোমাদের জীবনের ওপর মৃত্যুর কালো যবনিকা ঘনিয়ে আসে।

তোমার সহকারীকে বন্দী করে নিয়ে গেলাম। তাকে যদি ফিরে পেতে চাও তবে এ ব্যাপার থেকে দূরে থাক। আমার সম্বন্ধে কোনও খবর বের করবার আশা যে দুরাশা তা বেশ ভাল করে জেনে রাখ।

প্রণতিও আমার কাছে বন্দী আছে। তাকে বিশেষ একটি কারণে আমার প্রয়োজন। যথাসময়েই সে মুক্তি পাবে। আর তোমাকেও সাবধান করে দিচ্ছি। যথাসময়ে সাবধানতা অবলম্বন না করলে তোমার ভবিষ্যৎ খুব মঙ্গলময় হবে না।

মনে রেখো আমাদের বিরুদ্ধে এতটুকু অগ্রসর হলে আর আমরা তা ক্ষমার চোখে দেখব না।

আরও জেনে রাখ, তোমার ভবিষ্যৎ কুবুদ্ধি যদি আবার তোমাকে আমাদের বিরুদ্ধে নিয়োজিত করে, তবে তোমার সহকারীকে আর কোনও দিনই জীবিত অবস্থায় দেখতে পাবে না। ইতি—

তোমার কোনও হিতৈষী।

চিঠিখানা উল্টেপাল্টে পড়ে দেখ দীপক কি যেন ভাবল। মিনিট খানেকের কিছু বেশি সময় ব্যয়িত হলো তার এ ভাবনায়। তারপর গাড়িতে উঠে এসে দ্রুত গাড়ি চালাল সে।

গাড়ি ছুটে চলল উত্তরের দিকে।

দীপকের গাড়িখানা এসে যখন টালার খেলাৎবাবু লেনের আট নম্বর বাড়িখানার সামনে দাঁড়াল রাত তখন সাড়ে দশটা।

হরবল্লভবাবুর সাক্ষাৎ মিলতেও খুব বেশি দেরী হলো না। বেঁটেখাটো দোহারা চেহারা। মাথায় টাক। মুখে গোঁফ। চেহারার মধ্যে কেমন যেন একটা বুদ্ধিহীনতার ছাপ বেশ স্পষ্টই চোখে পড়ে।

দীপক নিজের পরিচয় দিলে হরবল্লভবাবু বললেন—আপনিই কি নিরুদ্দিষ্ট শিবপ্রসাদবাবুর কেসটা নিয়ে কাজ করছেন নাকি?

দীপক বলে—হ্যাঁ। জরুরী একটা প্রয়োজনে এসেছি আপনার কাছে। আজ সকালে আপনার একটা চিঠি পেয়ে শিবপ্রসাদবাবুর মেয়ে প্রণতি দেবী এসেছিলেন আপনার সঙ্গে দেখা করতে। কিন্তু তারপর এখন পর্যন্ত তিনি বাড়ি ফিরে যাননি।

—আমার চিঠি?

—হ্যাঁ, এই দেখুন। দীপক পকেট থেকে চিঠিটা বের করে তাঁকে দেখায়।

চিঠিখানা দেখে হরবল্লভবাবু অবাক। তিনি বলেন—আশ্চর্য! এই চিঠি মোটেই আমার লেখা নয়। তবে হাতের লেখা দেখছি অনেকটা আমার হাতের লেখা নকল করে লেখা।

দীপক ভ্রূদুটো কুঁচকে বলে—তাহলে আপনি স্বীকার করছেন এ চিঠি জাল?

—হ্যাঁ।

—আপনার হাতের লেখা তাহলে ওদের হাতে গেল কি করে? আপনার হাতের লেখার নমুনা না পেলে ওরা জাল করবে কি করে?

—তা ত আমি বলতে পারব না দীপকবাবু! বিশ্বাস করুন এ ব্যাপারে আমি আদৌ কিছু জানি না। আই য়্যাম্ কম্প্লিট্‌লি ইন্ দি ডার্ক!

দীপক মৃদু হেসে বলে—আমি এমনটাই আশা করেছিলাম। প্রণতি দেবীকে ফাঁদে ফেলবার উদ্দেশ্যেই বোধ হয় কেউ চিঠিটা দিয়েছিল। আচ্ছা চলি, হরবল্লভবাবু। মিথ্যাই আপনাকে বিরক্ত করলাম এতক্ষণ।

হরবল্লভবাবু বোকার হাসি হাসেন।

দীপক কোনও কথা না বলে যতো দ্রুত সম্ভব গাড়িতে চড়ে বসে।

বারো

—পথরেখা—

রতনের জ্ঞান ফিরে আসতেই সে ধীরে ধীরে চোখ মেলে চারদিকে চাইল বেশ ভাল করে। কিন্তু চারদিকে শুধু নিবিড় অন্ধকার। কোনও কিছুই তার ধারণার মধ্যে আসে না। বোঝা যায় না, দিন বা রাত। মধ্যাহ্ন না গভীর রাত্রি। বন্ধ ঘরের মধ্যে আলো প্রবেশের সামান্যতম পথও নেই কোথাও।

অনেক কষ্টে উঠে বসে সে। কিন্তু মাথার মধ্যে তখনও যেন ঝিম্‌ঝিম্ করছে তার।

হাত দুটোতে টান দিয়ে বুঝতে পারে শক্ত দড়ি দিয়ে দুটি হাত একত্র বাঁধা আছে।

রতন বুঝতে পারল সে একটা ঘরের মধ্যে বন্দী। তবে আশেপাশে অন্য কাউকে দেখা যাচ্ছে না তার ওপর নজর রাখবার জন্যে। দরজা বাইরে থেকে বন্ধ করে বোধ হয় ওরা চলে গেছে।

চুপচাপ বসে রতন চারদিকে চাইতে লাগল। অন্ধকারটা ততক্ষণে তার চোখে সহ্য হয়ে এসেছিল।

হঠাৎ ঘরের কোণের দিকে নজর পড়তেই চম্‌কে উঠল রতনলাল। সেখানে আর একটি মানুষ বন্দী অবস্থায় চুপচাপ শুয়েছিল। তারও হাত দুটি বাঁধা বলে মনে হলো রতনের।

রতন এগিয়ে গেল অনেক কষ্টে। বন্দিনী একটি নারী। রতন তাকে উদ্দেশ্য করে বলল—আপনি কি জেগে আছেন নাকি?

মেয়েটি চম্‌কে ওঠে। তারপর মুখ ফিরিয়ে রতনের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করে—আপনি জ্ঞান ফিরে পেয়েছেন দেখছি!

রতন বুঝতে পারে এই মেয়েটিই শিবপ্রসাদবাবুর মেয়ে প্রণতি। সে তার বাঁধা হাত দুটো ধীরে ধীরে প্রণতির হাতের কাছে এগিয়ে নিয়ে যায়। বলে—দাঁড়ান আগে আপনার বাঁধনটা খুলে দিই, তারপর আপনিও আমার বন্ধন মোচন করবেন।

মেয়েটি উত্তর দেয় না। রতন অনেক কষ্টে ধীরে ধীরে প্রণতির হাতের বাঁধন খুলে দেয়। তারপর নিজের হাত দুটো এগিয়ে দেয় প্রণতির দিকে।

প্রণতি দ্রুত রতনের হাতের বাঁধন খুলে দেয়।

এমন সময় বাইরে শোনা যায় পায়ের শব্দ। দুজন লোক ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে। একজনের এক হাতে টর্চ, অন্য হাতে খাবারের দুটো থালা। অন্যজনের হাতে একটা রিভলভার।

—এই যে জ্ঞান ফিরে পেয়েছ দেখছি!

রতন চুপ করে এমনভাবে শুয়েছিল যে তারা জানতেও পারেনি যে তার হাতটি মুক্ত হয়ে গেছে।

আচম্‌কা সে ক্ষিপ্ত বাঘের মতো লাফিয়ে উঠে যে লোকটির হাতে রিভলভার ছিল তার হাতের ওপর সজোরে আঘাত করে।

লোকটার হাত থেকে রিভলভারটা ছিট্‌কে পড়ে। রতন সেটা দ্রুত কুড়িয়ে নিয়ে বজ্রকণ্ঠে বলে—মাথার ওপর হাত তুলে দাঁড়াও শয়তানেরা, না হলে তোমাদের দুজনকেই কুকুরের মতো গুলি করতে এতটুকু দ্বিধা করব না আমি।

লোক দুটো হাতের জিনিস ফেলে দিয়ে মাথার উপরে দু' হাত তুলে দাঁড়ায়।

রতন প্রণতির দিকে চেয়ে বলে—আপনি ওদের দুজনকে এই দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলুন। এতটুকু বাধা দিলে আমি ওদের গুলি করব।

প্রণতি ছুটে গিয়ে ওদের দুজনকেই পর পর বেঁধে ফেলে। তারপর দুজনে লোক দুটির পোযাকে নিজেদের সজ্জিত করে নিজেদের পোষাকগুলি ওদের পরিয়ে দেয়।

বাইরে থেকে দরজাটি বন্ধ করে দুজনে দ্রুতপদে এগিয়ে চলে।

রতন প্রণতিকে নিয়ে যখন বাড়িতে এসে পৌঁছল তখন রাত শেষ হতে খুব বেশি দেরী নেই।

দীপকের ঘুম তখনও ভাঙেনি। রতন ওপরের ঘরে প্রণতি দেবীর বিশ্রামের ব্যবস্থা করে দিয়ে এসে দীপকের ঘুম ভাঙাল।

দীপক ঘুম থেকে উঠে রতনকে দেখেই কেমন যেন চমকে উঠল। সে জানত রতন শত্রুদের হাতে বন্দী। কি করে সে এত তাড়াতাড়ি ফিরে এলো এই কথা ভেবে সত্যি সে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল। বিস্ময়ের ভাবটা কেটে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই সে আনন্দে রতনকে জড়িয়ে ধরল।

রতন বলল—আনন্দ পরে করলেও চলবে। এখন অন্য একটা জরুরী কাজ করতে হবে।

—জরুরী কাজ?

—হ্যাঁ, প্রণতি দেবীকেও মুক্ত করে এনেছি।

—কিন্তু তাঁকে কোথায় পেলি?

—এক ঘরেই বন্দী ছিলাম আমরা দুজন। অনেক কষ্টে পালিয়ে এসেছি। তবে শীগ্‌গির ব্যবস্থা না করলে ওদের চক্রান্তকে ব্যর্থ করা যাবে না।

—সে কি? প্রণতি দেবীকে বন্দী করেছিল কারা?

রতন দীপকের কানে কানে কি একটা কথা বলল। কথাটা শুনেই আনন্দিত মুখে দীপক বলল—সত্যি?

—হ্যাঁ। মিথ্যা বলে আমার লাভ? তুই বোধ হয় এতটা ধারণা করে উঠতে পারিসনি?

—না। আচ্ছা, এক্ষুণি আমি মিঃ দেশাইকে ফোন করছি। তুই তাহলে বাড়িতেই থাক।

—না, প্রণতি দেবীকে একা রেখে যাওয়া উচিত নয়।

—বেশ। রতন আপত্তি করে না।

দীপক টেলিফোনের রিসিভারটা তুলে বলে—হ্যালো মিঃ দেশাই। শঙ্করপ্রসাদের কেস্‌টার সমাধান যদি করতে চান এক্ষুণি আমার এখানে চলে আসুন। আসল আসামীকে যদি গ্রেপ্তার করতে চান ত দেরী করবেন না এক মুহূর্তও।

মিঃ দেশাইকে সঙ্গে নিয়ে দীপক সোজা চলে যায় মনোহরপুকুর রোডে প্রণতিদের বাড়িতে।

বাড়ির দাসীটি এসে এত ভোরে দীপক ও পুলিশবাহিনীকে দেখে অবাক হয়ে যায়। প্রশ্ন করে—কাকে চান?

দীপক বলে—নায়েবমশাই আছেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। কিন্তু তাঁকে কি দরকার?

—আমাদের সঙ্গে এক জায়গায় যেতে হবে। এক্ষুণি পাঠিয়ে দাও।

ঘুম থেকে উঠে নায়েবমশাই চোখ মুছতে মুছতে এসে বলেন—আপনারা হঠাৎ এত ভোরে?

দীপক মিঃ দেশাইয়ের দিকে চেয়ে বলে—মিঃ দেশাই, এই আপনার আসামী।

নায়েবমশাইয়ের হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিয়ে মিঃ দেশাই বলেন—আপনার বিরুদ্ধে নরহত্যা, চৌর্য ও জালিয়াতির অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে। সেইজন্য আপনাকে দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, ইউ আর্ আণ্ডার্ এ্যারেস্ট।

হতচকিত নায়েবমশই বিস্ময়ের ঘোরটা সাম্‌লে নিয়ে সজোরে বলেন—কোন্ প্রমাণের বলে আপনারা আমাকে গ্রেপ্তার করছেন?

দীপক বলে—আপনার বিরুদ্ধে একাধিক প্রমাণ বর্তমান। মৃত শিবপ্রসাদবাবু তাঁর পার্টনার হরবল্লভবাবুর সঙ্গে ব্যবসা করবার জন্যে বরাহনগরে গিয়ে সেখানকার মহাজন মিশিরজীর কাছে তাঁর বাড়ি ও সম্পত্তি বাঁধা রেখে এক লাখ টাকা নিয়ে ফিরছিলেন। আপনি এ খবর জানতেন। তাই গোপনে সেদিন রাত্রে আপনি ও আপনার দলবল গাড়ি আটক করেন এবং তাঁকে হত্যা করেন। একটি রক্তমাখা ছোরা পাওয়া যায় ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের ব্রিজের নিচে। তাতে আপনার হাতের ছাপ ছিল। ওধারে শঙ্করপ্রসাদ একটি পুলিশ কনস্টেবলকে হত্যা করেছিল সেদিনই রাত দুটোয়। আপনি সেই জায়গায় শিবপ্রসাদবাবুর লাশকে ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় রেখে আসল পুলিশ কনস্টেবলের দেহটিকে একটি কারখানায় পুঁতে রেখে এসেছিলেন। শঙ্করপ্রসাদ যখন আসল ঘটনা বলতে যাচ্ছিল তখন আপনি ও আপনার দলের লোক তাকে হত্যা করবার চেষ্টা করে। শঙ্করপ্রসাদ যাকে খুন করেছিল তার মুখ ছিল অক্ষত। সে কবল দেহটাই টুকরো টুকরো করেছিল। কিন্তু আপনি শিবপ্রসাদবাবুর মুখখানাও ক্ষতবিক্ষত করেছিলেন যাতে কেউ চিনতে না পারে।

নায়েবমশাই বিস্ময়বিমূঢ়। দীপক বলে চলে—তারপর আপনি যে প্রণতি দেবীর নামে জাল চিঠি ছেড়েছিলেন হরবল্লভবাবুর নাম দিয়ে তার উদ্দেশ্য ছিল প্রণতি দেবীকে আট্‌কে

দোষটা হরবল্লভবাবুর কাঁধে চাপান। কিন্তু আপনার সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়নি। আমার সহকারী তাকে মুক্ত করে এনেছে।

সেকি! নায়েবমশাই হতভম্ব ও বিমূঢ় হয়ে পড়েন। দীপক মৃদু হেসে বলে—আপনার নিজের প্রতি অসীম বিশ্বাসই আপনার বিপদ ডেকে এনেছে নায়েববাবু।

আদালতে শঙ্করপ্রসাদ সমস্ত অপরাধ স্বীকার করেছিল। বিচারক তার প্রতি সদয় হয়ে তাকে মাত্র তিন বছরের কারাদণ্ড দেন। আর নায়েবমশাইয়ের হলো দশ বছর সশ্রম কারাদণ্ড। প্রণতি দেবী পিতার সম্পত্তি ফিরে পেলেন। নায়েববাবুর কাছ থেকে প্রায় আশী হাজার টাকা ফেরত পাওয়া গিয়েছিল, সেটাই মিশিরজীকে ফিরিয়ে দেওয়া হলো। বাকীটা ধীরে ধীরে প্রণতি দেবী তাঁকে দিয়ে দেবেন এই সর্ত থাকল।

বিচারক রতনলালের তীক্ষ্ণবুদ্ধিরও অজস্র প্রশংসা করলেন।

—শেষ—

ব্যথার প্রদীপ

এক

—ওরা কে—

—একটি পয়সা দাও বাবু! একটি পয়সা ভিক্ষা দাও মা জননী!

সকরুণ প্রার্থনা।

পথচারীদের কেউ কেউ দয়াপরবশ হয়ে দু-একটা পয়সা ফেলে দেয়। কেউ বা মুখ বেঁকিয়ে চলে যায়। কেউ হাসে বিদ্রূপের হাসি।

একটি অন্ধ লোক আর একটি ছোট ছেলে। মাণিকতলার পোলের ওপর মাঝে মাঝে দেখা যায় ওদের এমনি ভিক্ষা করতে।

দিনের পর রাত নামে।

ওরা ধীরপায়ে ফিরে চলে কোন্ এক অজ্ঞাত বাসস্থানের দিকে।

এইটুকই ওদের দৈনন্দিন সাধারণ জীবন। একটানা গতিতে এমনিই চলে ওদের ভিক্ষাবৃত্তি। কখনল মাণিকতলা, কখনও ট্যাংরা, কখনও হাওড়া, কখনও বা ভবানীপুরের মোড়ে ওদের দেখা যায়।

কিন্তু জনসাধারণ ওদের সম্বন্ধে কতটুকুই বা জানে? জানবার অবকাশও তাদের থাকে না।

এদের সে জীবন সম্বন্ধে যবনিকার আড়ালে ঢেকে থাকা সে বিস্তীর্ণ জীবননাট্যের একটা অংশ আজ তুলে ধরছি আপনাদের সাম্‌নে। আপনারা যদি তা দেখতে আর শুনতে চান তবে আমার সাথে নেমে আসুন ধূলিরুক্ষ পৃথিবীর ক্ষুদ্র একটি অন্ধ কোণের নির্জন বাস্তবতাপূর্ণ অংশে।

আসুন, আমার সাথে সাথে আপনিও এই অন্ধ ভিখারী আর তার সঙ্গী ছেলেটাকে অনুসরণ করুন।

রাত নটা।

পথ জনহীন হয়ে আসছে।

ধীরে ধীরে ওরা দুজন পথ ধরে এগিয়ে চলে। কিছুদূরে ওদের ওপর নজর রেখে একজন দীর্ঘকায় লোক অপেক্ষা করছিল।

সে এবার এগিয়ে এসে প্রশ্ন করে—কত হলো রুখুলাল?

—পাঁচ সিকা।

—দেখি।

অন্ধ লোকটি এবার তার ট্যাকে গুঁজে রাখা পয়সাগুলো তুলে দেয় দীর্ঘদেহী লোকটার হাতে।

—আর নেই? দীর্ঘদেহী লোকটা কর্কশস্বরে প্রশ্ন করে।

—না। শুধু এই পেয়েছি।

—মিথ্যা কথা! লোকটা যেন গর্জে ওঠে। এখনও বলছি সব দাও। না হলে সর্দারকে বলে দেব আমি। আর সর্দারের হাতে পড়লে যে কি অবস্থা হবে তা নিশ্চয়ই জানা আছে তোমার!

—না না, ওকথা বলো না। সর্দারকে বললে একেবারে মেরে ফেলবে। উঃ!

অন্ধ লোকটির গালে সজোরে চপেটাঘাত করে সে বলে—এখনও দাও যা আছে সব। মিথ্যা কথা বলে আমাকে ভোলাবার চেষ্টা করো না।

রুখুলাল কাঁদতে কাঁদতে বলে—আমাকে মেরো না বলছি। ফের অমন করলে আমি শেষে গিয়ে পুলিশের কাছে সব কথা ফাঁস করে দেব। বলব তোমরা কি করে সমস্ত ছেলেমেয়েদের ধরে এনে তাদের অধঃপাতের পথে ঠেলে দাও। তাদের উপার্জনের ওপরেও ভাগ বসাতে ছাড় না তোমরা!

—কি বল্‌লি! লম্বা লোকটা রুখুলালের দেহে পদাঘাত করে বলে—আজ তোরই একদিন কি আমারই একদিন! সারা রাত আজ তোকে উপোস করিয়ে রাখব! যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! আমার ওপর তেজ দেখানো!

এমন সময় আরও তিন-চারজন ভিখিরী এসে জুটে যায়। এরা এতক্ষণ বাগমারীর খালপোল অঞ্চলে ভিক্ষে করছিল। দলে দলে ভিখিরীরা এসে রুখুলাল আর লোকটার চারপাশে ভিড় করে দাঁড়িয়ে যায় মজা দেখবার জন্যে। এ সব যেন তাদের কাছে নিত্য নৈমিত্তিক একটা অতিসাধারণ ঘটনা ছাড়া আর কিছু নয়!

লোকটা রুখুলালকে নির্দেশ করে তাদের দিকে চেয়ে বলে—তোরা সব পয়সা জমা দিয়ে একে ধরে নিয়ে যা। আজ সারা রাত ওর উপোস। শয়তান বলে কিনা পুলিশে জানাবে।

অন্য ভিখিরীরা হি হি করে হাসে। বিদ্রূপের হাসি। নিষ্করুণ হাসির বিশ্রী প্রবাহ যেন রুখুলালের সারা দেহকে ক্ষতবিক্ষত করে দেয়।

সকলে আপন আপন পয়সা দীর্ঘদেহী লোকটির হাতে তুলে দেয়। এই লোকটিই হচ্ছে এ অঞ্চলের অর্থসংগ্রাহক। সমস্ত অর্থসংগ্রহ করে ও ফিরে যায় বড় আস্তানায়। সর্দারের কাছে রাত দশটার মধ্যে সব পয়সা জমা দিতে হয়।

অন্য ভিখিরীরা রুখুলালকে টানতে টানতে নিয়ে যায়। রুখুলালের চোখ দুটো অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। চোখের জলে তার গালদুটো ভিজে যায়। সুগভীর বেদনায় তার সারা মনটা যেন টন্ টন্ করে ওঠে। নিস্পন্দ বুক ভেদ করে বেরিয়ে আসে এক ঝলক দীর্ঘশ্বাস। ধীরে ধীরে তার মনে ভেসে ওঠে সুদূর কোন্ এক দিনের কাহিনী।

বহুদিন পূর্বের বিস্মৃতপ্রায় ইতিকথা যেন।

বাংলা থেকে দূরে—অনেক দূরে বিহার অঞ্চল ছিল তার বাড়ি। পল্লীর ছেলে সে। আজীবন পল্লীতেই মানুষ। তখন সে বাংলা ভাষাও ভালমতো শেখেনি।

বছর সাত-আটের বেশি তার বয়স নয়। গাঁয়ের পথেঘাটে ঘুরে বেড়ায়। সঙ্গীদের সঙ্গে খেলা করে। বাড়িতে খাবার অভাব ছিল না। নদীর জলে স্নান করে, ক্ষেতের গমের রুটি খেয়ে আর গ্রা রে থ ঘুরে বেড়িয়ে তার দিন কাটত। কি আনন্দপূর্ণ স্বপ্নের মতো ছিল সে সব দিনের ইতিহাস।

তারপর?

ঠিক আট বছর তখন তার বয়স। সন্ধ্যাবেলা খেলাধুলো শেষ করে ধীরে ধীরে ঘরে

ফিরছিল। বাড়ি থেকে অল্প দূরে একটা পুকুরপাড়ের পথ দিয়ে হেঁটে চলছিল সে। হঠাৎ যেন কে পেছন থেকে তার মুখ চেপে ধরল। রুখুলাল এর জন্যে আদৌ প্রস্তুত ছিল না। তা ছাড়া তার মতো অল্পবয়সের একটা ছেলের দেহে এমন শক্তি ছিল না যে অত বড় একটা লোককে বাধা দিতে পারে।

কাঁদতে গিয়েও কাঁদতে পারল না রুখুলাল। তার মুখ জোর করে চেপে বন্ধ করে ফেলা হলো। একটা মিষ্টি গন্ধ প্রবেশ করল তার নাকে। কে বা কারা তাকে এভাবে বন্দী করল এটা ভাল করে জানবার আগেই তাদের হাতে ধরা পড়ল রুখুলাল।

তারপর কোল্‌কাতা। কতদিন বা কতক্ষণ ঘুমের মধ্যে দিয়ে কেটেছিল তা তার মনে নেই। যখন জ্ঞান ফিরল, সে দেখতে পেল একটা মস্ত ঘরের মধ্যে সে বন্দী। হাত-পা শক্ত করে বেঁধে রেখে তাকে একটা টেবিলের ওপর শোয়ানো হয়েছে। মুখও বেশ শক্ত করে বাঁধা। এতটুকুও শব্দ করবার উপায় নেই তার।

একজন বিরাট চেহারার স্যুটপরা লোক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছিল। সে রুখুলালের দিকে চেয়ে নির্বিকার কণ্ঠে হুকুম দিল—ওর চোখ দুটোকে শেষ করে দাও! কোনও মানষ যে এত ভয়ঙ্কর হতে পারে সে সম্বন্ধে কোনও ধারণা এর আগে রুখুলালের ছিল না।

উঃ তারপর সে কি ভীষণ যন্ত্রণা! ভালমতো খেয়াল করতে আজও যেন তার সারা শরীর ভয়ে অবশ হয়ে আসে।

যন্ত্রণার চোটে সে জ্ঞান হারাল।

অবশেষে যখন তার জ্ঞান ফিরল তখন থেকে চোখে দেখতে পায় না কিছু। পৃথিবী যেন তার কাছে সম্পূর্ণ অন্ধকার হয়ে গেছে। যে দিকে তাকায় শুধু অসীম অখণ্ড আঁধার।

কে একজন তাকে ভয় দেখিয়ে বলল—আমাদের কথামতো কাজ না করলে একেবারে খতম করে দেওয়া হবে।

ভয়ে রুখুলালের গলা শুকিয়ে কাঠ। সে শুধু বলল—যা বলবেন, তাই করব হুজুর। কিন্তু—

—বেশ বেশ। কোন ভয় নেই তোমার! শুধু আমাদের লোক তোমাকে যেখানে বসিয়ে দেবে সেখানে বসে ভিক্ষা করবে।

তারপর থেকে রুখুলাল এমনি ভিক্ষে করে বেড়ায়। সেই শৈশব থেকেই তার ভিখিরী জীবনের সুরু। যা পায় সব এদের লোকের হাতে তুলে দেয়। বিনিময়ে বিনা পয়সায় থাকা আর খাওয়া পায় এদের কাছ থেকে।

শুনেছে এদের দলে নাকি এমনি আরও অনেক ভিখিরী আছে। হাজার হাজার ভিখিরী নাকি এদের দলে। কোল্‌কাতা, বম্বে, মাদ্রাজ সব জায়গাতেই নাকি এদের দলবল ছড়ানো রয়েছে।

মালিক নাকি বদলে গেছে। আগে যে লোক মালিক ছিল সে মারা গেছে। তার ছেলে এখন মালিক। আগে দল এত বড় ছিল না। এখন নাকি বিরাট দল হয়েছে।

সব শুনেছে রুখুলাল। কিন্তু সবই তার কাছে ধোঁওয়ার মতো লাগে।

কোথায় এদের দলের সব লোকজন তা সে জানে না। এদের কতগুলি ঘাঁটি তাও জানতে পারেনি সে।

সে শুধু একই আস্তানায় ত্রিশ-চল্লিশ জন ভিখিরীর সঙ্গে আজীবন আছে। রোজ সন্ধ্যায় একই লোক এসে সব পয়সা নিয়ে যায়।

যে ছোট ছেলেটা তার সঙ্গে বসে সে এদেরই দলের আর একটি ভিখিরী। নতুন এদের দলে এসে ঢুকেছে। কোন্ মায়ের কোলছেঁড়া ধন তা কে জানে?

শিশু রুখুলাল আজ ত্রিশের কোঠা পেরিয়ে গেছে। এমনি করে ভিক্ষে করতে করতে কোন্ দিন তার সঙ্গী ছোট ছেলেটাও বার্ধক্যে গিয়ে পৌঁছবে। কিন্তু তবু এদের অমানুষিক ব্যবসা চলতে থাকবে অপ্রতিহত গতিতে।

এদের এই নিষ্ঠুর জঘন্য কাজে বাধা দিতে পারে এমন কোনও লোককেই কি ভগবান এ পৃথিবীতে সৃষ্টি করেননি?

একটি চোরাকুঠুরীর মধ্যে রুখুলালকে এনে ঢুকিয়ে দেয় সঙ্গী ভিখিরীরা। তারপর বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দেয়। আজ রাতের মতো সে চোরাকুঠরীতে বন্দী। কিছুই খেতে দেওয়া হবে না তাকে।

অন্য ভিখিরীরা হি হি করে হাসছে। তারা ভাবছে, তাদের বোধ হয় এমন কুক্ষণ আসবে না। কিন্তু রুখুলাল মনে মনে ভাবে, ওদেরও একদিন এমন অবস্থা আসতে পারে। ওরা জানে না যে ওদের অবস্থাও তার চেয়ে এতটুকুও উন্নত নয়।

ধীরে ধীরে রুখুলাল মেঝের ওপর বসে পড়ে চুপচাপ।

তার সারা শরীর প্রবল শ্রান্তিতে কেমন যেন ঝিম্‌ঝিম্ করতে থাকে। উপবাসক্লিষ্ট দেহ ঘিরে নেমে আসাতে থাকে অসীম অবসাদ।

সারা মনটা কেমন যেন তোলপাড় করতে থাকে।

এমন সময় বাইরে শোনা যায় কণ্ঠস্বর—এই তোরা এই মুহূর্তে এখান থেকে চলে যা। কেন এখানে এসে এভাবে জটলা সুরু করেছিস্!

বাইরে ভিখিরীদের কলরব থেমে যায়। তারা যে কে কোথায় যায় তার কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না।

কণ্ঠস্বর রুখুলালের অপরিচিত নয়। লোকটা প্রশ্ন করে—তোরা এখানে জটলা করছিস্ কেন?

—রুখুলালকে সারাদিন খেতে না দিয়ে আট্‌কে রাখা হয়েছে।

—বেশ, আমি দেখছি কি ব্যাপার। তোরা গোলমাল করিস্ না আর এখানে।

কণ্ঠস্বর থেমে যায়।

রুখুলালের মনে কিছুটা আশা ফিরে আসে যেন।

একটু পরেই দরজা খুলে যায়।

—কে? রুখুলাল প্রশ্ন করে।

—আমি রে আমি। বিরিজলাল।

—ও, তুমি এসেছ?

—হ্যাঁ, কিন্তু কি ব্যাপার বল্ তো! তোকে হঠাৎ আটক করল কেন? কি জন্যেই বা তোকে আজ সারাদিন উপোস থাকতে হলো? তুই কি কোনও কিছু অন্যায় কাজ করেছিস্ নাকি?

—জানি না! রুখুলালের কণ্ঠে অভিমান।

—বল্ না! বাজে সময় নষ্ট করিস্ না।

—ভেবেছিল আমি পয়সা লুকিয়ে রেখেছি, তাই মেরেছিল আমাকে। আমি তাতে রেগে বলেছিলাম যে পুলিশে—

—চুপ ওরকম কথা বলিস্ না আর।

—কিন্তু আমাকে মারবে কেন? আমি কি কোনওদিন পয়সা লুকিয়ে রেখেছি নাকি? বরং ওই নাকি মাঝে মাঝে টাকা-পয়সা মেরে দেয়। লুকিয়ে রাখে। সর্দারকে সব টাকা দেয় না। ওর মতো গাঁজা-ভাঙ্ খাওয়া ত আর অভ্যাস নেই আমার!

—আচ্ছা, সে আমি সর্দারকে বলে ব্যবস্থা করব।

রুখুলাল উত্তর দেয় না।

বিরিজলাল বলে—এবার বাইরে চল্। তোর খাবার ব্যবস্থা করে দিয়ে যাচ্ছি আমি। কোনও ভয় নেই তোর! ওরা গেল কোথায়?

—জানি না।

—বেশ, আমিই খাবার আনিয়ে দিচ্ছি। আর ওরা ফিরে এলে বুঝিয়ে বলব'খন।

বিরিজলাল বাইরে বেরিয়ে যায়। বোধ হয় চলে গেল খাবারের সন্ধানে।

রুখুলালের চোখ অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। তার মতো সামান্য ভিখিরীর প্রতি এত অসীম মমতা যে কারও থাকতে পারে এ ধারণা তার ছিল না।

বিরিজলাল কি মানুষ না দেবতা! সত্যি, এদের দলে যেন বিরিজলালকে মানায় না। সে যেন এ জগতের কেউ নয়। এখানে এসে পড়েছে নেহাৎ পথ ভুল করে।

একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে রুখুলালের বুক ভেদ করে।

দুই

—দু-নম্বর ঘাঁটি—

হাওড়া পোলের ওপর একটা খোঁড়া লোককে দেখা গেল বসে বসে ভিক্ষা করতে। পা দুটো হাঁটুর ওপর থেকে সরু লিক্‌লিকে। দেহের নিচের অংশটাই অপরিণত। কেমন যেন বিশুষ্ক।

ভোরবেলা একটা চাকা-লাগানো গাড়িতে করে ঠেলতে ঠেলতে একজন লোক তাকে এখানে নামিয়ে রেখে গিয়েছিল। আবার সন্ধ্যার কাছাকাছি তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে সেই চাকা-লাগানো গাড়িতে করেই।

শুধু এই লোকটাই নয়, হাওড়ার ঘাঁটিতে থাকে আরও অনেক ধরণের ভিখিরী। এই ঘাঁটিতে ভিখিরীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। তার কারণও অবশ্য আছে। এই ঘাঁটি থেকে সর্দারের আয় হয় কোল্‌কাতার মধ্যে সবচেয়ে বেশি।

বড়বাজারের মোড়ে একটি মেয়ে বসে ভিক্ষে করছিল। মাথায় লম্বা করে ঘোমটা টানা। কোলের কাছে শুয়েছিল একটি মাস পাঁচ-ছয়ের ছেলে। দুধের সঙ্গে সামান্য আফিং খাইয়ে তাকে ঘুম পাড়ানো হয়েছিল। ঘোমটা-দেওয়া মেয়েটিকে দেখে গৃহস্থঘরের বধূ বলে মনে হলেও আসলে কিন্তু সে তা নয়। এদের দলেরই মেয়ে সে। এখন ঘোমটার আড়ালে একে দেখতে পাচ্ছেন না বটে, তবে যদি কখনও একে অন্য বেশে কোনও পুরুষকে প্রলুব্ধ করতে

দেখেন, তবে চম্‌কে উঠবেন না যেন। একেও ছোটবেলায় অল্প পয়সায় কোনও গ্রাম থেকে কিনে এনে এই আড্ডায় মানুষ করা হয়েছে।

মেয়েটি সাম্‌নে হাত পেতে চুপ করে বসেছিল। পথচারীরা প্রায়ই তার সাম্‌নে দু-চারটে পয়সা ফেলে দিয়ে চলে যাচ্ছে।

কিন্তু এতেও পথচারীরা কেউ সামান্যও সন্দেহ করতে পারে না, এদের পিছনে রয়েছে কি বিরাট একটা চক্রান্তজাল। কারা এদের পরিচালিত করে এদেরই রোজগারের পয়সা থেকে নিজেদের বিপুল অর্থ উপার্জন করছে।

সে সব কথা জানতে হলে যেতে হবে এদের সঙ্গে সঙ্গে দু-নম্বর আড্ডায়। একটি গোপন স্থানের জনপূর্ণ একটি ষড়যন্ত্র-চক্রে যেতে হবে আপনাকে।

হাওড়া স্টেশন থেকে প্রায় আধ মাইল দূরে একটি পুরানো আমলের জীর্ণ, ব্যারাক প্যাটার্নের বাড়ি। বর্তমানে ওখানে কে বা কারা থাকে তা নিয়ে সাধারণ মানুষ খুব বেশি মাথা ঘামায় না। কিন্তু ভিখিরী সমাজ ও গুণ্ডা শয়তানদের কাছে এই দু নম্বর ঘাঁটি একটি সুপরিচিত স্থান।

বাড়িখানায় মোট আট-দশটি কক্ষ। দিনের বেলায়ও বাড়ির কক্ষগুলো অন্ধকারাচ্ছন্ন বলে মনে হয়। চুণ-বালি-খসে-পড়া, গাছপালার জটিলতায় আচ্ছন্ন ঐ বাড়িখানাই হচ্ছে ভিখিরী তৈরির কারখানা।

শুধু ভিখিরী নয়, এখানে বহু সুন্দরী মেয়েকে জোর করে ধরে নিয়ে এসে তাদের মানুষ করে পরে নারী-ব্যবসায়ীদের কাছে উচ্চমূল্যে বিক্রি করা হয়।

শুধু ভিখিরী তৈরিই নয়, তাদের উপযুক্ত জায়গায়, বিভিন্ন ঘাঁটিতে পাঠানো হয় এই দু-নম্বর ঘাঁটি থেকেই। এখানকার সঙ্গেই বোম্বাই, মাদ্রাজ ইত্যাদির সংযোগ আছে। বোম্বাই, মাদ্রাজ ইত্যাদি অঞ্চলের ভিখিরীদের পাঠানো হয় কাশী অথবা কোল্‌কাতায়। আর কোল্‌কাতার আড়কাঠিরা যে সব ছেলে-মেয়েদের সংগ্রহ করে তাদের পাঠানো হয় দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন স্থানে।

কোল্‌কাতায় যে কয়টি ঘাঁটি আছে তার সেণ্টার হচ্ছে এই দু-নম্বর ঘাঁটি।

এখানে আছে অপারেশন-রুম। উপযুক্ত লোকের হাতে ভার দেওয়া আছে সংগ্রহ-করা ছেলেদের দৈহিক অবস্থা পরিবর্তনের। দৈহিক অবস্থার পরিবর্তন না ঘটলে সাধারণ অবস্থায় এরা কারও মনে করুণার উদ্রেক করতে পারে না। তাই এই বিশেষ অপারেশন-রমের ব্যবস্থা করা হয়েছে এখানে। কোনও ছেলের চোখ নষ্ট করা হয়, কারও বা জিভ কেটে বোবা করে দেওয়া হয়। অনেক অল্পবয়স্ক শিশুকে চুরি করে এনে হাঁড়ির মধ্যে আট্‌কে রেখে তাদের দেহের নীচের অংশটিকে অপরিণত করে দেওয়া হয়। এতে তার জীবনে আর কখনও সোজা হয়ে চলতে পারে না।

বড় হলে এদের দেহের নিচের অংশে চট জড়িয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়। এরা গড়িয়ে গড়িয়ে রাস্তা দিয়ে এগিয়ে চলে। আর এদের সঙ্গে সঙ্গে একজন লোক হাঁকতে হাঁকতে আর ভিক্ষা করতে করতে এগিয়ে চলে। কিভাবে সাধারণ মানুষের মনে করুণা উদ্রেক করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করা যেতে পারে সে বিষয়ে দলের সর্দারের যথেষ্ট জ্ঞান আছে বলেই মনে হয়।

এছাড়াও অনেক শিশুর জিহ্বার কেন্দ্রস্থলে ছিদ্র করে দেওয়া হয় অত্যন্ত অল্পবয়সে।

পরে বয়স কিছুটা বাড়লে সেই ছিদ্রের মধ্যে সরু লোহার তৈরি ত্রিশূল ঢুকিয়ে, গায়ে ছাই মাখিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয় ভিক্ষে করতে। এরা দেবতার অনুগৃহীত এ-কথা মনে করে সাধারণ লোক এদের প্রচুর পয়সা ভিক্ষে দেয়।

সাধারণ ভিখিরীদের চেয়ে এই সব বিশেষ কোয়ালিফিকেশন যে সব ভিখিরীর থাকে তাদের আদর একটু বেশি। যে আড্ডায় এদের পাঠানো হয়, সেখানে এরা একটু বেশি যত্ন পায়। আর এরা রোজ ভিক্ষেয় বের হয় না, ভিক্ষেয় বের হয় মাঝে মাঝে। কোনও বিশেষ পার্বণ বা উৎসব কেন্দ্র করে চলে এদের এই ভিক্ষাবৃত্তি।

এই সব বিভিন্ন আড্ডাকে পরিচালিত করে দু-নম্বর আড্ডা। আর দু-নম্বর আড্ডার সঙ্গে যোগ রয়েছে বোম্বাই, কাশী, এলাহাবাদ, মাদ্রাজ ইত্যাদি অঞ্চলের আড্ডাগুলোর। বড় সর্দার জয়ন্ত শেঠ যখন কোল্‌কাতা পরিদর্শন করতে আসে তখন সে সর্বপ্রথমে আসে এই দু-নম্বর আড্ডাতে। এখানকার স্থানীয় ভারপ্রাপ্ত সর্দার বশীর খাঁই তাকে বিভিন্ন আড্ডাগুলো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখায়। কোল্‌কাতার সব আড্ডাগুলোতে তাই বশীর খাঁর অপ্রতিহত প্রভাব। সব আড্ডার লোকই তাকে ভয় করে যমের মতো।

কাশী থেকে সম্প্রতি খবর এসেছে সর্দার জয়ন্ত শেঠ কোল্‌কাতার আড্ডা পরিদর্শন করতে আসছে।

খবরটা পেয়েই বশীর খাঁ ডেকে পাঠাল বিরিজলালকে।

বিরিজলালের হাতে সমস্ত ভিখিরীদের নাড়ি-নক্ষত্র। বিরিজলাল সব ভিখিরীদের খোঁজখবর রাখে। এমন কি কোনও আড়কাঠি চুরি করে অন্যত্র ছেলে বিক্রি করলেও সে আশ্চর্য উপায়ে খবরটা যথারীতি সংগ্রহ করে বশীর খাঁকে এসে জানায়। তাই বশীর খাঁ বিরিজলালের কথামতো চলে সব সময়। আর আজ পর্যন্ত তার কথা অনুসারে কাজ করে সে কখনও ঠকেনি।

বিরিজলালের ওপর বশীর খাঁর এতটা নির্ভর করার আরও একটা কারণ ছিল। সে কারণটি হচ্ছে বিরিজলালের বৌ রুক্‌মিণী।

সাধারণ ভিখিরীরা না জানলেও বশীর খাঁ জানে সর্দার জয়ন্ত শেঠ রুক্‌মিণীকে কতটা ভালবাসে। ভালবাসা মানে অবশ্য সাধারণ অর্থে নয়—অর্থের উৎস হিসেবেই রুক্‌মিণীর প্রতি সর্দারের এই আকর্ষণ। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে যত মেয়ে সংগ্রহ করা হয় তাদের সকলকে মানুষ করার ভার রুক্‌মিণীর ওপর। আর রুক্‌মিণী এত চমৎকারভাবে শিখিয়ে পড়িয়ে তাদের মানুষ করে যে তা নিয়ে সর্দারকে আর বেগ পেতে হয় না।

দু-চার বছর পরে মোটা মূল্যে সেই মেয়েগুলোকে বিক্রি করে সর্দার যা পায় তার সিকি লাভও তার ভিখিরীদের আড্ডা থেকে হয় না। তাই রুক্‌মিণীর প্রতি সর্দারের এই কৃপাকটাক্ষ।

বিরিজলাল এই দলে আছে আজ প্রায় পাঁচ-ছ' বছর। এই পাঁচ-ছ' বছর বশীর খাঁরও কাজের সুবিধে হয়েছে অনেকটা। তাই সর্দার জয়ন্ত শেঠের আসার সংবাদ পেয়েই বশীর খাঁ বিরিজলালকে ডেকে পাঠায়।

কিন্তু ডেকে পাঠালেও কোনও সুবিধেই হয় না বশীর খাঁর। একজন ভিখিরী দলপতি কোত্থেকে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বলে—সর্বনাশ হয়েছে সর্দার! বিরিজলাল পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে।

—ধরা পড়েছে? বশীর খাঁর মুখখানা যেন ফ্যাকাশে হয়ে যায়।—কি বলছিস্ তুই?

—ঠিকই বলছি সর্দার। একজন আড়কাঠির লোক শয়তানী করে পুলিশে খবর দিয়ে ধরিয়ে দিয়েছে ওকে।

—কে সেই লোক? আমাদের দলের কি?

—হ্যাঁ, আমাদেরই দলে কাজ করত। তবে দু-একটা ছেলে চুরি করে ও অন্য জায়গাতে বিক্রি করবার চেষ্টা করেছিল। তাই বিরিজলাল ওকে ভয় দেখিয়েছিল যে সব কথা সর্দারকে বলে দেবে। সেই লোকটা তারপর গোপনে পুলিশে খবর দিয়ে—

—বুঝেছি! বাধা দিয়ে বশীর খাঁ বলে ওঠে—তার নামটা কি তাই শুনি। তারপর কতো বড়ো তার বুকের পাটা তা পরে দেখা যাবে।

—ওর নাম হচ্ছে কিশোরী। মাণিকতলা অঞ্চলের টাকা আদায় আর ছেলে যোগাড় করার ভার আছে তার ওপর।

—মনে পড়েছে বটে। কিন্তু তার হঠাৎ এতদূর সাহস হলো কি করে তা ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না।

—শুধু বিরিজলালের কথাই যে পুলিশে জানিয়েছে তা নয়, আরও দু-একটা এমনি মারাত্মক কাজ সে করেছে শুনলাম। রুখুলাল নামে একটা ভিখিরী আমাদের দলে আছে বড় সর্দারের বাবার আমল থেকে। আজ রিপোর্ট পেলাম, সামান্য কারণে সে নাকি রুখুলালকে মারধোর করেছে। এমন কি তাকে সারা রাত খেতেও দেয়নি।

ইতিমধ্যে বিরিজলাল সেখানে গিয়ে উপস্থিত হয়। সমস্ত বিষয় জানতে পেরে সে রুখুলালকে মুক্ত করে দেয় এবং তার খাবার ব্যবস্থাও করে দেয়। এর মধ্যেই আবার কিশোরী ফিরে এসে সমস্ত কথা জেনে ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। বিরিজলালের সঙ্গে তার বাদানুবাদ হতে থাকে এই ব্যাপার নিয়ে। বিরিজলালও তাতে রেগে গিয়েছিল বলেই নাকি ওভাবে পুলিশে খবর দিয়েছে সে। এমন কি পুলিশের কাছে দলের দু-একটা গোপন তথ্যও সে ফাঁস করে দিয়েছে। প্রয়োজন হলে সে নাকি দলের বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে সাক্ষী দিতেও রাজী হয়েছে বলে শুনতে পেলাম।

—বুঝেছি। বড় সর্দার এলে এ সব বিষয়ের উপযুক্ত ব্যবস্থা অবশ্যই করতে হবে! আর সেই সঙ্গে নতুন তৈরি করা ভিখিরীগুলোকেও তাঁকে দেখাতে হবে। মনে হয় এবার সব দেখে তিনি খুবই সন্তুষ্ট হবেন।

—কিন্তু একটা কথা সর্দার—

—কি কথা বলো? ভিখিরী দলপতির দিকে চেয়ে প্রশ্ন করে বশীর খাঁ।

—আমার আর একটু সুবিধের ব্যবস্থা যদি করেন তবে আমি চিরদিন আপনার প্রতি একান্ত অনুগত হয়ে থাক্‌ব!

—বেশ বেশ! গম্ভীরকণ্ঠে বশীর খাঁ বলে। এখন একটু ওধারে যাও—আর একটু ভাবতে দাও আমাকে।

বশীর খাঁকে যথেষ্ট চিন্তিত মনে হয়।

শুধু বিরিজলালের জন্যেই তার এই চিন্তা নয়—তার চিন্তা কিশোরীর জন্যেও। একে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে না পারলে বড় সর্দারের কাছে তার মান থাকবে না। আর বিরিজলাল পুলিশের হাতে পড়লে রুক্‌মিণীর সাহায্যও আর বিশেষ পাওয়া যাবে না!

বশীর খাঁ চিন্তিতভাবে পায়চারী করতে থাকে।

তিন

—তদন্ত ঃ রিপোর্ট—

বিভাগীয় তদন্ত একটা অদ্ভুত জিনিস। এমন সব অজস্র জটিলতার মধ্য দিয়ে তদন্তচক্র এগিয়ে চলে যে কোনও একটা বিষয়ে সম্পূর্ণ সফলতা লাভ করতে হলে দীর্ঘদিনের পূর্বে কোনও কিছু ঘটে ওঠা সম্ভব নয়।

ঠিক তেমনি ব্যাপার ঘটেছিল বোম্বাইয়ের একটি সি. আই. ডি.-চীফের রিপোর্ট ব্যাপারেও।

বোম্বাইয়ের একজন সি. আই. ডি. চীফ অফিসার মিঃ স্বামীনাথম্ একটা গুণ্ডার আড্ডায় হানা দিয়ে তদন্তক্রমে একটা নতুন ধরণের কেসের সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য তথ্যাদি সংগ্রহ করলেন।

ব্যাপারটা হচ্ছে, একজন গুণ্ডা ধরা পড়ে স্বীকার করল, যে সে স্বেচ্ছায় আইন অমান্য করেনি, বিরাট একটা দলের হুকুমেই সে এ কাজ করতে বাধ্য হচ্ছে। এর সঙ্গে জড়িত যে দল তারা দুটি-একটি নয়, দলে দলে ভিখিরীদের নিয়ে বিরাট ব্যবসা চালায়। তা ছাড়াও তারা ছোট ছোট মেয়েদের ধরে এনে মানুষ করে বিদেশে চালান দেয়।

সবকিছু শুনে মিঃ স্বামীনাথম্ যে অবাক্ হলেন তা নয়, এদেশে অনুষ্ঠিত নতুন এক ধরণের অপরাধ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করলেন তিনি।

দু-একটা আড্ডায় তিনি হানা দিলেন। কিন্তু কোনও সুফল হল না। এদের কর্মপদ্ধতি অত্যন্ত নিখুঁত। তবে একটা জিনিস তিনি জানতে পারলেন। তা হচ্ছে, এর কর্মকেন্দ্র হচ্ছে কোল্‌কাতা। কোল্‌কাতা থেকে অপহৃত ছেলেমেয়েদের এদেশে চালান দেওয়া হয়, আর এদেশের ছেলেমেয়েদের পাঠানো হয় কাশী অথবা কোল্‌কাতায়।

মিঃ স্বামীনাথম্ সি. আই. ডি.-র আপার অথরিটিকে জানালেন এই বিষয়টা। তিনি জানালেন বোম্বের পুলিশ কমিশনারকে।

পুলিশ কমিশনার ফাইলটা দেখে খানিকটা অবিশ্বাস্য ভঙ্গীতে সেটা আগাগোড়া নিরীক্ষণ করে মনে মনে বললেন—যত্তো সব আজগুবি রিপোর্ট। কোথা থেকে কি গল্প শুনে একেবারে এমন এটা অসম্ভব কল্পনা করে বসল। সঙ্গে সঙ্গে রিপোর্ট এসে হাজির। এ রকম আজগুবি ঘটনা সম্ভব নাকি! বলে কিনা, ইণ্টার-প্রভিন্সিয়্যাল বেগার বিস্‌নেস! যত্তো সব পাগলামি!

পুলিশ কমিশনার পাঁচ বছর বিলেতে ছিলেন। তাই তিনি এদেশের যাবতীয় ক্রাইমকে বিলিতী দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই দেখতে অভ্যস্ত।

বিলেতে ভিখিরীদের কোনও আস্তানা নেই। পথে-ঘাটে এত ভিখিরীর উপদ্রবও সেখানে সম্ভব নয়। তাই বেগার বিস্‌নেস কথাটা শুনে তিনি মনে মনে হাসলেন। এ যেন কোন্ রূপকথার একটা গল্প।

কিন্তু তবু রিপোর্টের একটা স্টেপ্ নিতেই হবে। তিনি ডেপুটি কমিশনারের কাছে ব্যাপারটা পাঠালেন রিপোর্টের জন্যে। ডেপুটি কমিশনার ত ব্যাপারটা দেখে হেসেই খুন! তিনি মনে মনে ভাবলেন, এই স্বামীনাথম্ লোকটার মাথায় নিশ্চয়ই কিছু গোলমাল আছে।

কিন্তু তবুও রিপোর্ট নেবার জন্যে তিনি ব্যাপারটা এন্‌কোয়্যারির জন্যে পাঠালেন তাঁর অধীন বিভিন্ন থানার ও. সি.-দের কাছে।

ও. সি.-দের মেজাজ একটু কড়াই হয়ে থাকে সাধারণত। তার ওপর এই আজগুবি ব্যাপারের তদন্ত করতে হবে শুনে তাঁরা ত রেগে অস্থির!

ও. সি.-রা ডি. ও. সি., জমাদার ও হাবিলদার ইত্যাদির কাছ থেকে মোটামুটি শুনে

রিপোর্ট লিখলেন—'দেশের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক বিপর্যয়ই এই অধিকসংখ্যক ভিখিরীদের উৎপত্তির কারণ।'

কেউ বা লিখলেন—'এই ভিখিরী সম্প্রদায় নিজেদের আস্তানায় থাকে, খায় ও ভিক্ষা করে। ওদের কেউ পরিচালনা করে না।'

আসলে এই ব্যাপারের তদন্ত যে কিছুই হলো না তা বলাই বাহুল্য। জমাদারেরা রাস্তার মোড়ে থেকে দু-একজন করে ভিখিরীকে ধরে ধরে গরম গরম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করল। তারা প্রাণের ভয়ে জানাল যে তারা শুধু খায় আর ভিক্ষা করে। এর বেশি জানবার আর দরকার কি?

তাই জমাদারদের কথামতো রিপোর্ট লেখা হলো। সেই রিপোর্ট ডি. ও. সি. হয়ে ও. সি.-র কাছে হাজির হলো যথারীতি।

এম্‌নি সব অজস্র অর্ধ-সত্য, অর্ধ-মিথ্যা রিপোর্ট গেলেও দু-একজন ও.সি. লিখলেন—'ব্যাপারটার মধ্যে জটিলতার গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। আমাদের ধারণা এই সব ভিখিরীদের উৎপত্তির মূল উৎস হচ্ছে কোল্‌কাতা।'

এই সব রিপোর্ট ঘুরতে ঘুরতে যখন বোম্বের পুলিশ কমিশনারের কাছে পৌঁছল তখন তিন মাসেরও বেশি দিন কেটে গেছে।

ব্যাপারটার তদন্ত এত স্বল্প (বিভাগীয় মতে) দিনের মধ্যে সংঘটিত হয়েছে দেখে পুলিশ কমিশনার খুবই খুশি হলেন। তিনি তখনই ইণ্টার-প্রভিন্সিয়্যাল্ কন্‌স্‌পিরেসীর এই বিরাট কেসটার সংবদা বাংলায় প্রেরণের চেষ্টা করতে লাগলেন।

কোল্‌কাতার পুলিশ কমিশনার বোম্বে থেকে এই খবরটা পেয়ে যখন যথারীতি চঞ্চল হয়ে উঠেছেন তখন তাঁরই বিভাগ থেকে একজন ডেপুটি কমিশনার জানালেন—কোল্‌কাতায় আজকাল যে পরিমাণে চুরি, জোচ্চুরি, পকেটমার, ব্ল্যাকমেলিং ও ফোর টোয়েণ্টির কেসগুলো হচ্ছে তার সঙ্গে জড়িত একটা বিরাট দল। আর সেই দলের নায়ক হচ্ছে মাত্র একজন লোক।

এই দলের অধীনে হাজার কয়েক লোক আছে । তাদের অধিকাংশ করে ভিক্ষাবৃত্তি। দেশের বুকে যে সব ছেলে ও মেয়ে চুরি যায় তাও চুরি করে এরাই। আবার এদের দলের লোক ওই সব ক্রাইম্‌ও করে থাকে।

এই সব চুরি-যাওয়া ছেলে-মেয়েদের ওরা একটি গোপন আড্ডায় মানুষ করে থাকে। যথারীতি এই ছেলে-মেয়েরা বড় হয়। তাদের অধিকাংশকে এরা ভিক্ষাবৃত্তিতে নিযুক্ত করে। সুন্দরী মেয়েদের মানুষ করে তুলে অধিক মূল্যে বিক্রি করা হয় নারী-ব্যবসায়ীদের কাছে।

কিন্তু এত সব জানলেও কোথায় এই আড্ডা বা কে যে এর পরিচালক সে সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র খবরও পুলিশবিভাগ জানতে পারেনি।

ডেপুটি পুলিশ কমিশনারের রিপোর্ট পড়ে পুলিশ কমিশনার তাঁকে ডেকে পাঠালেন। তিনি ডেপুটি কমিশনার মিঃ মরিসনকে বললেন—শুনুন মিঃ মরিসন, আপনার রিপোর্টের যে যথেষ্ট গ্র্যাভিটি আছে সে কথা স্বীকার করি আমি। কারণ আমিও বোম্বে থেকে সম্প্রতি একটি নোটে জানতে পেরেছি যে, কোল্‌কাতা থেকে রপ্তানী করা ভিখিরী ছেলেদের নিয়ে সেখানকার একদল লোক ব্যবসা চালাচ্ছে। আমার মনে হয় নেহাৎ সামান্য বলে যে ব্যাপারটা আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে, আসলে তা সামান্য নয়। এর পেছনে হয়ত রয়েছে বিরাট একটা

জটিলতা। রহস্য আর তার সমাধান করতে হলে চাই উপযুক্ত একজন লোক যে এর ভেতরে প্রবেশ করে সমস্ত মিস্‌ট্রি সল্‌ভ্‌ করতে পারে।

—তাই নাকি স্যর?

—হ্যাঁ। তাই আমি চাই একজন বিশ্বস্ত লোকের হাতে এ-ব্যাপারের তদন্ত ভার দিতে।

—কিন্তু পুলিশবিভাগে তেমন কর্মঠ ও বিশ্বস্ত লোক—

—জানি। সেইজন্যেই আমি চাই বিখ্যাত প্রাইভেট ডিটেকটিভ দীপক চ্যাটার্জীকে গোপনে এই ব্যাপারের পেছনে নিয়োগ করতে।

—ঠিক বলেছেন স্যর! হি ইজ্‌ দি ফিটেস্ট্‌ ম্যান্‌। ওঁর চেয়ে ভাল লোক আর কোথাও যে মিলবে না এ সম্বন্ধে আমি নিঃসন্দেহ।

—তা হলে আমি আজকেই তাঁকে ফোন করব ত?

—হ্যাঁ স্যর!

পুলিশ কমিশনার মিঃ মরিসনের মুখের দিকে চেয়ে বললেন—আপনি তাঁকে সর্ববিষয়ে সাহায্য করবেন এটাই আমি চাই মিঃ মরিসন।

—নিশ্চয়ই স্যর, মিঃ চ্যাটার্জীর সঙ্গে আমার বহুদিনের পরিচয়। তাঁর সঙ্গে একত্রে কাজও করেছি এর আগে।

—তা হলে ত খুবই ভাল হয়।

পুলিশ কমিশনার টেলিফোনের রিসিভারটা তুলে নিয়ে বলে উঠলেন—হ্যালো, পুট মি টু সাউথ থ্রি থ্রি ডব্‌ল্‌ থ্রি...

চার

—বিচিত্র কেস—

পুলিশ কমিশনার দীপককে তখন টেলিফোনে পেলেন না। এক্সচেঞ্জ বলল—এন্‌গেজ্‌ড্‌। তার কারণও অবশ্য ছিল।

দীপক তখন শুনছিল বড়বাজারের ও. সি. মিঃ সিংহের কথা তার টেলিফোনে।

মিঃ সিংহ দীপকের পূর্বপরিচিত পুলিশ অফিসার। একটি জটিল কেসে বিরিজলালকে অ্যারেস্ট্‌ করে তিনি এই কেসটার পেছনে অদ্ভুত একটা চক্রান্তজালের গন্ধ পান। তাই তিনি বাধ্য হয়ে ফোন করলেন ডিটেকটিভ দীপক চ্যাটার্জীকে।

দীপক রিসিভার তুলে প্রশ্ন করে—হ্যালো, কে?

—আমি বড়বাজার থানা থেকে বলছি। আমি মিঃ সিংহ।

—ও, আপনি? তা হঠাৎ কোনও জরুরী কেস নাকি?

—জরুরী না হলেও রহস্যপূর্ণ।

—কি রকম?

—বিরিজলাল নামে একজন লোককে অ্যারেস্ট্‌ করেছি। তার কাছ থেকে যে হিস্ট্রি পাচ্ছি তা সত্যই অদ্ভুত। কল্পনাতীত! সো স্ট্রেঞ্জ এ কেস ইউ ক্যান্‌ট ড্রীম্‌ অফ্‌!

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ, আমি পাছে ভালভাবে ক্রশ করতে না পারি, কিংবা কোনও পয়েন্ট মিস্ করি তাই আপনাকে জানাচ্ছি।

—খুব ভাল। আই অ্যাম্ ভেরী গ্ল্যাড্ ফর ইওর কাইণ্ডনেস্।

—তা হলে এক্ষুণি আসছেন ত?

—হ্যাঁ, এক্ষুণি।

রিসিভারটা নামিয়ে রেখে দীপক সাজগোজ করে বের হবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে এমন সময় বেজে উঠল টেলিফোন।

পুলিশ কমিশনার দীপককে ফোন করলেন।

সব শুনে দীপকের মুখ আলোকোজ্জ্বল হয়ে উঠল। মনে মনে সে ভাবল, এর সঙ্গে বড়বাজারের ও. সি. মিঃ সিংহের ফোনের কোনও সম্বন্ধ নেই ত?

পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে সময় অ্যাপয়েণ্ট্ করে নিয়ে দীপক বেরিয়ে পড়ল বড়বাজারের উদ্দেশ্যে।

কিন্তু গেটের সামনেই দেখা রতনলালের সঙ্গে।

—আরে, একা একা চলেছিস্ কোথায়?

—একটা জরুরী কেসের ব্যাপারে চলেছি বড়বাজার। সেখান থেকে লালবাজার হয়ে ঘুরে আসব।

—অনেকগুলো কেস একসঙ্গে এসে জুটেছে বুঝি?

—হ্যাঁ। তবে মিঃ সিংহ ফোন করেছেন, একটা অদ্ভুত রহস্যপূর্ণ কেস নাকি এসে পড়েছে তাঁর হাতে। তিনি একা সেটা নিয়ে নাড়াচাড়া না করে আমার সাহায্য চান। তাই চলেছি তাঁব সঙ্গে দেখা করতে। বিবিজলাল নামে একটা লোককে অ্যারেস্ট্ কবে তিনি নাকি এই রহস্যের সন্ধান পেয়েছেন। বিরিজলালকে তোর মনে আছে নিশ্চয়?

—হ্যাঁ, অনেকদিন আগে কি একটা ব্যাপাবে তাকে যেন ফলো করেছিলাম আমরা।

—তারপর তার সাক্ষাৎ পাইনি বহুদিন। এবার দেখা যাক তার মাধ্যমে কি আবার নতুন হদিস মেলে।

—কিন্তু আমি এক্কেবারে বাদ পড়ে গেলাম?

—তা কেন? তুই ইচ্ছে করলে আসতে পারিস্। তুই বাড়িতে ছিলি না, তাই একা—

—কিন্তু মনে রাখিস, আমাকে ছাড়া একা আজ পর্যন্ত কোনও কেসে তুই সফল হতে পারতিস্ না।

হেসে দীপক বলে—তা কি বলেছি আমি? দীপক বুঝতে পারে রতন অভিমান করেছে। সে তাই ধীরকণ্ঠে বলে—এ কেসেও তোর সাহায্য লাগবে রতন। কোন লোককে ফলো করবার দরকার হলে, তোর মতো এত মূল্যবান সাহায্য আমি কারও কাছ থেকে আশা করতে পারি না। তা ছাড়া তোর মতো চট্পট কাজ সারতে পারে কে? তাই তোর কথা আমি ভাবছিলাম। কিন্তু তোকে না পেয়ে অগত্যা একাই রওনা হতে হচ্ছিল আমাকে।

মুহূর্তে রতনের অভিমান জল হয়ে যায়। সে হেসে বলে—সত্যি?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। চল্ না।

কিন্তু দীপক তখন মোটেই ধারণা করে উঠতে পারেনি যে সত্যি আজ রতনের প্রয়োজন তার কাছে একটু পরেই অপরিহার্য হয়ে দেখা দেবে।

পাঁচ

—জয়ন্ত শেঠ ঃ রুক্মিণী—

কোল্‌কাতা থেকে কিছু দূরে হাওড়া স্টেশনের কাছাকাছি সেই দু-নম্বর আড্ডায় নিয়ে যাচ্ছি আপনাকে।

বেলা এখন সাড়ে দশটা।

বশীর খাঁ উত্তেজিত ভাবে ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছিল। তার উত্তেজনা দেখলে স্পষ্টই বোঝা যায় যে এর কারণ শুধুমাত্র জয়ন্ত শেঠের আগমনই নয়, অন্য কোথাও তার কারণ নিহিত আছে নিশ্চয়ই।

সে কারণটা আর কিছু নয়—বিরিজলালের আকস্মিক অন্তর্ধান। যে মুহূর্তে ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেল যে বিরিজলাল পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে, তখনই বশীর খাঁ একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়ল।

বিরিজলাল এত সব খবর জানে—পুলিশের চাপে সে যে কোনও মুহূর্তে সব খবরগুলো বলে ফেলতে পারে। তা ছাড়া আর একটা ভয় এই যে, বিরিজলালের আকস্মিক অন্তর্ধানের কথা জয়ন্ত শেঠ জানতে পারলে সবদিক থেকেই মুস্কিল হবে। জয়ন্ত শেঠ তা হলে বশীর খাঁকেও সন্দেহ করতে সুরু করতে পারে।

বশীর খাঁ ভাবল, বিরিজলালের ব্যাপারটা যদি চাপা দেবার জন্য কোনও ব্যবস্থা করতেই হয়, তবে তা জয়ন্ত শেঠ কোল্‌কাতা ছেড়ে চলে যাবার পর করাই ভাল।

বশীর খাঁ চিন্তা করল, এক্ষুণি কার সাহায্য নিলে ব্যাপারটার সুরাহা হতে পারে।

একটু চিন্তা করতেই তার মনে পড়ল কিশোরীর নাম। কিশোরী মাণিকতলা অঞ্চলের আড়কাঠি। সেখানকার ভিখিরীদের টাকাপয়সা আদায় করে জমাও দেয় সে। কিন্তু তার কাছেও বিরিজলালেব মতো অনেক খবরাখবর থাকে। তার সাহায্য নিলে এ যাত্রা সুবিধে হয়।

কিশোরী অবশ্য দু-একটা অন্যায় কাজ করেছিল সম্প্রতি। প্রথমত, রুখুলালকে মারধোর। দ্বিতীয়ত, কিশোরী যখন বিরিজলালের উল্টো দলের লোক তখন সন্দেহ করা যেতে পারে যে তার গ্রেপ্তারের পেছনে হয়ত কিশোরীরও হাত আছে।

কিন্তু এত সব জানলেও আপাতত কিছু করা যাচ্ছে না। তার সাহায্য না নিলে এ যাত্রা সব কিছুর ব্যবস্থা করা খুবই মুস্কিল।

বশীর খাঁ তাই হাঁকল—কোই হ্যায়?

একজন সর্দার ভিখিরী বাইরে দাঁড়িয়েছিল। সে ছুটে এসে প্রশ্ন করল—কি বলছেন সর্দার?

—একটা জায়গায় তোমাকে এক্ষুণি যেতে হবে। পারবে?

—কোথায় সর্দার?

—মাণিকতলা।

—বুঝেছি সর্দার। কিশোরীর আড্ডায় ত?

—হ্যাঁ। তাকে এক্ষুণি এখানে ডেকে আনবে। বিশেষ দরকার। বুঝেছ ত? শোন, যত তাড়াতাড়ি পার তাকে এখানে এনে উপস্থিত করতে হবে। তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করলে মোটা বকশিস পাবে তুমি। পাঁচ টাকা বকশিস দেওয়া হবে তোমাকে।

—আজ্ঞে সর্দার, এক্ষুণি ডেকে আনছি তাকে!

ছুটতে ছুটতে লোকটা বেরিয়ে যায়।

বেলা তখন সাড়ে পাঁচটা।

একজন আলখাল্লা-পরা মুসলমান ফকীরকে দু-নম্বর আড্ডার সাম্‌নে দেখা গেল।

একটু ঘুরে ফিরে আড্ডার ভিতরে উঁকিঝুঁকি মেরে কি যেন দেখবার চেষ্টা করছিল সে। এমন সময় একজন লোক হঠাৎ তার হাতখানা পেছন থেকে চেপে ধরে বলল—এই কোন্ হ্যায় তুম্?

মুসলমান ফকীর কথা না বলে মৃদু হাসল। তারপর তাকে প্রশ্ন করল—বশীর খাঁ আছে ভেতরে?

—হ্যাঁ, কিন্তু তুমি কে?

গম্ভীরকণ্ঠে মুসলমান ফকীর বলল—সে কথা এখানে নয়। ভেতরে গিয়ে বশীর খাঁর সঙ্গে সে কথা হবে।

লোকটির কণ্ঠে কেমন যেন একটা আদেশের সুর। তাতে মনে জাগে সম্ভ্রম। জাগে ভয় ও শ্রদ্ধা।

—বেশ, চলো ভেতরে। কিন্তু মনে থাকে যেন বাছাধন, যদি বুঝতে পারা যায় যে তুমি টিকটিকি তা হলে কিন্তু—

লোকটি যে ভঙ্গিটা দেখাল তার অর্থ হল টিকটিকি হলে তাকে একেবারে খতম্ করে দেওয়া হবে।

মুসলমান ফকীর ভ্রূ কুঁচকে বলল—অন্দরমে চলো।

দুজনে ভেতরে প্রবেশ করে। সামনের ঘরটায় দেখা হয় বশীর খাঁর সঙ্গে।

লোকটি বলে—সর্দার, এই লোকটা আড্ডার সামনে ঘোরাঘুরি করছিল। আমার মনে কেমন যেন সন্দেহ হলো, তাই একে নিয়ে এলাম ধরে।

বশীর খাঁ ফকীরের দিকে তাকাল। কাঁচাপাকা চুল আর সুদীর্ঘ দাড়ি। পরণে আলখাল্লা আর পাজামা। পায়ে নাগড়াই।

বশীর খাঁ মনে করতে পারল না, এর আগে এই লোকটিকে সে কোথায় দেখেছে।

মুসলমান ফকীর একটু হেসে বলল—তোমার কেরামতি বোঝা গেছে বশীর খাঁ, আমাকেই বেমালুম ভুলে বসে আছ—

কথার শেষে লোকটি মুখের লম্বা দাড়ি আর পরচুলা একটানে খুলে ফেলতেই তার মধ্য থেকে আত্মপ্রকাশ করল একখানি অতিপরিচিত মুখ।

—বন্দেগী সর্দারজী!

বশীর খাঁকে কেমন যে অপ্রতিভ মনে হয়।

মুসলমান ফকীর আর কেউ নয়, স্বয়ং সর্দার জয়ন্ত শেঠ। মৃদু রহস্যময় হেসে সে বলে—এ রকম মেক্‌আপ না করতে পারলে আর ব্যবসা চালাতে পারতাম না, বুঝলে খাঁ সাহেব?

বশীর খাঁ লজ্জিতভাবে বলে—আমার বোকামির জন্যে—

—না না, তোমার লজ্জার কারণ নেই বশীর খাঁ। আমারই বরং খুশি হওয়া উচিত এই ভেবে যে এতদিনে নির্ভুল মেক্‌আপ্ অন্তত করতে শিখেছি।

—তা ছাড়া আমরা ত আপনারই সাগরেদ সর্দারজী। আমাদের ত আপনার কাছে হেরে গিয়ে লজ্জা পাওয়াই উচিত নয়।

—হেরে গেলাম বশীর খাঁ। তোমার কথার প্যাঁচে একেবারে হেরে গেলাম আমি। জয়ন্ত শেঠ হাসতে হাসতে বলে—কিন্তু এধারের সব খবরাখবর কি?

—সব দেখাচ্ছি আপনাকে। বশীর খাঁ বলে—নতুন নতুন যা সব তৈরি করছি সর্দার, একেবারে নাম্বার ওয়ান!

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ। দেখুন না।

বশীর খাঁর ইঙ্গিতে একজন লোক গিয়ে কিশোরীকে ডেকে নিয়ে আসে।

—একি, কিশোরী যে!

—হ্যাঁ, সর্দার। নতুন দুটিকে যা তৈরি করেছি সর্দার, দেখেই একেবারে ঘাবড়ে যাবেন এ সম্বন্ধে আমি নিঃসন্দেহ।

একটু পরেই ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে দুজন লোক। একজনের চোখের মণিটা সম্পূর্ণ উল্টে দেওয়া হয়েছে, তাকে দেখলেই অন্ধ বলে বোঝা যায়। অন্যজন বোবা একটি বছর দশেকের ছেলে। বশীর খাঁর দিকে ইঙ্গিত করে ছেলেটি কিছু ভিক্ষা চাইল।

সর্দার ছেলেটিকে হাঁ করিয়ে দেখলে, তার মুখের মধ্যে জিভের বদলে একতাল মাংসপিণ্ড।

এবার কিশোরী ইঙ্গিত করতেই লোকট হঠাৎ চোখের মণিটা ঘুরিয়ে ফেলল। দেখা গেল তার চোখ ঠিক আছে। অন্যজনও হেসে কথা বলল। দেখা গেল তার জিভও ঠিক আছে। সবই মেক্আপ্-এর কায়দা।

জয়ন্ত শেঠ খুশি হয়ে দুজনকেই চার আনা করে বক্শিস দিল। সঙ্গে সঙ্গে দুজনেই সেলাম করে প্রস্থান করল।

জয়ন্ত শেঠ হেসে বলল—বলিহারী কিশোরী, তুহারী কাম্!

কিশোরী কোনও কথা বলল না। ধীরে ধীরে সে একজন লোককে কি যেন ইশারা করল।

সঙ্গে সঙ্গে আর একজন লোক ঘরেব মধ্যে প্রবেশ করল। পিঠের ওপর তার মস্ত একটা 'টিউমার'। দেহটা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। দুটো পায়েই পোড়া ঘা। বিষাক্ত ক্ষত দিয়ে পুঁজ গড়াচ্ছে। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে সে এসে একটা লাঠিতে ভর দিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকল।

লোকটাকে দেখে জয়ন্ত শেঠের মতো নৃশংস লোকের মনেও কেমন যেন অস্বস্তির সঞ্চার হলো। কি অসহ্য দুঃখ সহ্য করে যে ও বেঁচে আছে তা ভাবাই যায় না। কি অপরিসীম দুর্বিষহ জীবন!

এই লোকটাকে দেখে বশীর খাঁও অবাক হয়ে গিয়েছিল। এরকম লোক যে দলের মধ্যে আছে তা সে জানত না।

জয়ন্ত শেঠ কিশোরীর দিকে চেয়ে বলল—ওকে নিয়ে যাও এক্ষুণি এখান থেকে।

কিশোরী বলল—ভাল করে দেখুন না সর্দারজী।

কিশোরীর কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে লোকটা ধীরে ধীরে সোজা হয়ে দাঁড়াল। দেখা গেল তার পিঠের টিউমারটি একটি নকল মাংসপিণ্ড। পোড়া-ঘাগুলি রবার আর গাম্-এর সাহায্যে তৈরি করা নকল পোড়া-ঘা। রুগ্ণ বীভৎস লোকটি যখন স্বাভাবিক আকার ধারণ করে সর্দার জয়ন্ত শেঠকে নমস্কার জানাল তখন সে অবাক হয়ে শুধু ভাবতে লাগল—এও কি সম্ভব?

এমন সময় ভণ্ড সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে সজ্জিত একজন লোক ঘরের মধ্যে ঢুকল। তার

সঙ্গে একটি বছর সাতেকের ফুটফুটে সুন্দরী মেয়ে। মেয়েটি কাঁদছিল তার বাবা-মার কাছে ফিরে যাবার জন্যে।

কিশোরী বলল—এই লোকটি সন্ন্যাসীর মেক্‌আপ্ নিয়ে আড়কাঠির কাজ করে সর্দার। আজই এই মেয়েটিকে ও নিয়ে এসেছে। আপনি বলেছিলেন আপনার ওইরকম একটি মেয়ে চাই।

—হ্যাঁ, কয়েক বছর পরেই একে পুরো পাঁচ হাজার টাকায় বিক্রি করতে পারব। খুশিভরা কণ্ঠে বলল জয়ন্ত শেঠ।

কিন্তু কথা শেষ হলো না।

পেছন থেকে কে যেন নারীকণ্ঠে বলে উঠল—কিন্তু তা করতে হলে আমার সাহায্য তোমার অবশ্যই চাই, কি বল সর্দারজী?

সর্দার জয়ন্ত শেঠ পেছনে চেয়ে দেখে দ্বারপথে এসে দাঁড়িয়েছে একটি নারীমূর্তি। নারী আর কেউ নয়—ওই হচ্ছে রুক্‌মিণী, পুলিশের হাতে ধৃত বিরিজলালের স্ত্রী।

রুক্‌মিণী বলে চলল—তোমার আশায় ছাই পড়ল সর্দার। ওকে তৈরি করবার ভার আর আমি নিতে পারব না।

—তার মানে? ক্রুদ্ধকণ্ঠে জয়ন্ত শেঠ প্রশ্ন করে।

—মানে আর কিছুই নয়। এইভাবে নিরীহ মেয়েদের জীবনকে কলুষিত করে গড়ে তোলবার চেয়ে মৃত্যুও আমার ভাল। আমি আজই এ জায়গা ছেড়ে চলে যাচ্ছি সর্দার। আর কোনদিনই তোমাদের কাজের সহায়তা করে এভাবে কচি কচি মেয়েদের সর্বনাশ করতে পারব না আমি। এই তোমার কাছে আমার শেষ কথা।

—সে কি?

—হ্যাঁ, যার আকর্ষণে এতদিন এখানে ছিলাম সেই যখন পুলিশের হাতে ধরা পড়ল, তখন মিথ্যা এই নরকে আর একটি মুহূর্তও কাটাতে চাই না আমি।

—কার কথা বলছ তুমি রুক্‌মিণী? বিরিজলাল কি পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে?

—হ্যাঁ। তুমি না জানলেও আমি তোমাকে জানাচ্ছি। সে এখন কোন্ অন্ধকার কারাগারে একা বসে সময় কাটাচ্ছে তা কে জানে!

—বিরিজলাল বন্দী! সর্দার জয়ন্ত শেঠের চোখ দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে পড়ে।

তার ভঙ্গির দিকে চেয়ে কিশোরী কিংবা বশীর খাঁর মুখ দিয়ে কোনও কথাই বের হয় না।

ছয়

—বিরিজলালের উক্তি—

—এ তুমি কি বলছ রুক্‌মিণী? সত্যিই যদি বিরিজলাল বন্দী হতো পুলিশের হাতে তবে নিশ্চয়ই বশীর খাঁ এতক্ষণ তা আমাকে জানাত। নিশ্চয়ই সে বন্দী নয়। সে পলাতক! সে নিশ্চয়ই দল ছেড়ে পালিয়েছে। তাই নয় কি বশীর খাঁ?

—না সর্দার, আমরা এখনও ঠিক জানি না যে সে পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে, না পালিয়েছে। তবে যে সে অন্তর্হিত হয়েছে এ কথা সত্যি।

—মিথ্যা কথা! রুক্‌মিণী যেন গর্জে ওঠে দলিতা ফণিনীর মতো। বিরিজলাল ধরা পড়েছে সর্দার! আর তার মূলে কে আছে তাও আমি জানি।

—কে আছে এর মূলে?

—এতক্ষণ ধরে আপনি যার প্রশংসা করছিলেন সেই কিশোরীর চক্রান্তেই সে আজ পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে।

—মিথ্যা কথা! সজোরে বলে ওঠে বশীর খাঁ।

—ডাহা মিথ্যা সর্দার! কিশোরী বলে।

—তোমার কথার কোনও প্রমাণ আছে রুক্‌মিণী? জয়ন্ত শেঠ রুক্‌মিণীর দিকে চেয়ে প্রশ্ন করে।

—নিশ্চয়ই আছে। রুক্‌মিণী বলে। এক্ষুণি বড়বাজার থানায় কোনও লোক দিয়ে খোঁজ করালেই জানা যাবে যে সে পুলিশ হাজতে আছে কিনা।

—ঠিক কথা। জয়ন্ত শেঠ আপন মনেই বলে ওঠে। আমি আজই খোঁজ নেবার ব্যবস্থা করছি এক্ষুণি। কি কিশোরী, তোমার এতে কোনও আপত্তি আছে?

—অবশ্যই নয়। কিশোরী বলে ওঠে—সর্দার, সে পুলিশের হাতে ধরা পড়লেই কি এটা প্রমাণিত হচ্ছে যে আমিই তাকে ধরিয়ে দিয়েছি?

—তা অবশ্য নয়। আচ্ছা রুক্‌মিণী, বিরিজলালকে ধরিয়ে দিয়ে কিশোরীর কি লাভ?

—যথেষ্ট লাভ আছে সর্দার। ও চায় দলের সমস্ত কিছু স্থানীয় পরিচালনার দায়িত্ব ওর হাতে যায়। কিন্তু তা ত আর সম্ভব হচ্ছে না, যতক্ষণ বিরিজলাল আছে। কাজেই—

—কিন্তু শুধু সেইজন্যেই এভাবে সে—

—এ কথা বললে আমি বলব, তুমি কিশোরীর সঠিক পরিচয় এখনও জান না সর্দার। ওর মতো হীন, নীচ, জঘন্য চরিত্রের লোক—

—থাম! কিশোরী যেন গর্জন করে ওঠে।—তোমার অনর্গল বক্তৃতার স্রোত বন্ধ কর রুক্‌মিণী।

—কেন বন্ধ করব আমার কথা? তোমার হুকুমে নাকি? সর্দারের সামনে আমার কথা বন্ধ করবার কোন ক্ষমতা তোমার নেই কিশোরী!

রুক্‌মিণীর কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই কিশোরী যেন প্রচণ্ড বেগে একটা লাফ মেরে তার দিকে এগোতে যায়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই বশীর খাঁ তার হাত ধরে তাকে নিবৃত্ত করে বলে—এখন কলহ করে অযথা দলের দুর্দিনকে ডেকে আনা আমাদের উচিত নয়, কি বলেন সর্দার?

সর্দার জয়ন্ত শেঠ ধীরকণ্ঠে বলে—তোমরা সকলে মিথ্যা মাথা গরম করছ, রুক্‌মিণী আর কিশোরী। সব কিছু কাজের ব্যবস্থা করবার জন্যে আমি আছি। কিশোরী, তুমি যাও আর রুক্‌মিণী, তুমি দল ত্যাগ করে চলে যাবার সংকল্প আপাতত ত্যাগ কর। আগে দেখি সমস্ত ব্যাপারটা পর্যালোচনা করে...

মিঃ সিংহের জরুরী ফোন পেয়ে দীপক সোজা বড়বাজার থানায় চলে এলো রতনকে সঙ্গে নিয়ে।

মিঃ সিংহ দীপকের জন্যে উদ্‌গ্রীবভাবে অপেক্ষা করছিলেন এতক্ষণ।

—আসুন মিঃ চ্যাটার্জী! সাদরে দীপককে আমন্ত্রণ জানান তিনি।

—নমস্কার মিঃ সিংহ! এবার ওধারের ব্যাপারটা কি খুলে বলুন ত!

—ব্যাপারটা বলতে হলে আগে লোকটাকে আনাতে হবে। আপনি তাকে ক্রশ করলেই সব জানতে পারবেন।

—ধন্যবাদ মিঃ সিংহ।

মিঃ সিংহ হাঁকলেন—দরওয়াজা!

—জী হজৌর।

দরওয়াজা সশব্দে বুটজুতোটা মেঝেতে ঠুকে সেলাম জানিয়ে দণ্ডায়মান হলো।

—সাত নম্বর কয়েদীকে নিয়ে এস।

—জী হজৌর!

দরওয়াজার সশব্দ অভিবাদন ও প্রস্থান।

একটু পরেই দুজন সশস্ত্র প্রহরীর তত্ত্বাবধানে একজন কয়েদীকে ঘরের মধ্যে এনে দাঁড় করানো হলো।

দোহারা চেহারার লোকটি। পেশীবহুল দেহ। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। প্রথম দর্শনে একটু নিরীহ লোক বলেই মনে হয়। কিন্তু ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখলে বোঝা যায় লোকটি যথেষ্ট চতুর ও তীক্ষ্ণধী।

—তোমার নাম কি?

অত্যন্ত হালকাভাবে দীপক প্রশ্ন করে।

—বিরিজলাল, হুজুর।

—নিবাস?

উত্তর নেই।

—কাজ করতে কোথায়?

—হাওড়া।

—কি কাজ?

—মালগুদোমে চাকরী।

—গুদোম কোথায়?

—হাওড়া বেলগাছিয়ার কাছাকাছি।

হো হো করে হেসে উঠে দীপক বলল—মিথ্যা কথা বলে এভাবে ধরা পড়ার কোনও মানে হয় না বিরিজলাল। বেলগাছিয়াতে তেমন বড় মালগুদোম একটাও নেই। যা আছে তার মালিকরা সকলেই আমাকে চেনে। খোঁজ করলেই তোমার মিথ্যা কথা ধরা পড়ে যাবে। তা ছাড়া আমি যে দু-চারবার ওই অঞ্চলে গেছি, কোনওবারই ত তোমাকে সেখানে দেখিনি।

বিরিজলাল উত্তর দেয় না।

দীপক বলে—সত্যি কথা বল বিরিজলাল। তোমার বোধ হয় মনে নেই, আজ থেকে চার-পাঁচ বছর আগে তোমাকে আমি একটা ছেলেচুরির ব্যাপারে গ্রেপ্তার করেছিলাম। অবশ্য প্রমাণের অভাবে সেবার তুমি ছাড়া পেয়ে গিয়েছিলে, কিন্তু সেই থেকে তোমার প্রতি আমার আগাগোড়া একটা সন্দেহ ছিল। তাই তুমি যে কোথাও চাকরী কর না তা আমি বুঝতে

পারছি। তবে সত্যি কথা যদি তুমি বল, কিংবা যে দলে আছ তাদের ধরিয়ে দিতে সাহায্য কর, তবে আমি চেষ্টা করব যাতে তোমার বেশি সাজা না হয়। এমন কি তোমাকে রাজসাক্ষী করে নিয়ে যাতে তোমার কোনও ক্ষতি না হয় সে চেষ্টাও আমি করব। তুমি নিশ্চয়ই বিশ্বাস কর বিরিজলাল যে আমার কথার কখনও কোনও ব্যতিক্রম হয় না। আর কাকেও বিশ্বাস না করলেও অন্ততঃ আমাকে তুমি নিশ্চিন্তে বিশ্বাস করতে পার।

একটু থেমে বিরিজলাল বলে—সত্যি কথা বললে আমার প্রাণের দায়িত্ব নিতে রাজী আছেন আপনি?

—নিশ্চয়। তোমার কোনও ভয় নেই বিরিজলাল।

—বেশ, তা হলে শুনুন। কিন্তু মনে রাখবেন এ দল এমনিই একটি সংঘবদ্ধ দল যে আপনারা এতটুকু অসাবধান হলেই আমার প্রাণ যেতে পারে।

—বুঝেছি। তবুও আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি যতটা সম্ভব সাবধান হব আমরা।

—বেশ, তবে শুনুন।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মিনিটখানেক চিন্তা করে বিরিজলাল। তারপর ধীরে ধীরে সুরু করে—সারা ভারত জুড়ে আজ চলেছে যে চুরি, জোচ্চুরি আর ফোর টোয়েণ্টি তার ঠিক মাঝখানে বসে রয়েছে একটি মাত্র লোক। আর কল্পনা করুন বোম্বে, মাদ্রাজ, এলাহাবাদ, বেনারস, কোল্‌কাতা এই সব জায়গায় এদের দ্বারা নিযুক্ত হাজার হাজার ছেলে-মেয়ে ভিখিরী তৈরি হয়ে ভিক্ষে করে এদের পুঁজিকে ভারী করে তুলছে। এই যতো ভিখিরী দেখতে পাচ্ছেন আর যতো মেয়ে কেনাবেচার চোরাই কারবার—

গুড়ুম!

প্রচণ্ড একটা শব্দ ধ্বনিত হয়ে সকলকে সচকিত করে তোলে।

আঃ...

সকরুণ আর্তনাদ!

বিরিজলাল জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ে মেঝের ওপর। সঙ্গে সঙ্গে একটা অট্টহাসি কোথা থেকে ভেসে আসে।

সকলে ছুটে যায় জানালার কাছে।

একটি লোককে দেখা গেল জানালা থেকে লাফিয়ে পড়ে ছুটে গিয়ে একটি বাদামীরঙের মোটরগাড়িতে চড়ে বসতে।

ওই সেই অদৃশ্য আততায়ী! কিন্তু কে ও?

মিঃ সিংহ তাঁর হুইশ্‌লে ফুঁ দিলেন। কনস্টেবলরা দ্রুত ছোটাছুটি আরম্ভ করল। কতকগুলি কনেস্টবল গাড়িটাকে অনুসরণ করবার জন্যে ছুটল।

মিঃ সিংহ আর দীপক ছুটে এলো আহত বিরিজলালের কাছে।

সে তখন অন্তিম নিশ্বাস ফেলবার জন্যে আকুলিবিকুলি করছে। মৃত্যুর পাণ্ডুর ছায়া তার সারা চোখে-মুখে ছড়ানো।

ধীরে ধীরে সে শুধু বলল অনেক কষ্টে—হাওড়া...দু-নম্বর আড্ডা...জয়ন্ত শেঠ...

তার পরেই জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল সে।

সাত

—পরবর্তী প্রোগ্রাম—

মিঃ সিংহকে সঙ্গে নিয়ে দীপক বাইরে এলো। সেখানে ভিজা মাটির ওপরে দেখা গেল জুতোর ছাপ—অস্পষ্ট! জানালার গরাদে কোনও দাগ নেই। অথচ আততায়ী জানালা দিয়ে গুলি ছুঁড়েছিল।

দীপক বলল—নিশ্চয়ই লোকটার হাতে দস্তানা পরা ছিল মিঃ সিংহ।

মিঃ সিংহ বললেন—আমারও তাই মনে হয় মিঃ চ্যাটার্জী।

দুজনে ঘুরে ফিরে দেখে চলে যাচ্ছে, এমন সময় সেখানে দেখা গেল একটুকরো কাগজ পড়ে আছে।

দীপক বলল—বোধ হয় কাগজের টুকরোটা আততায়ীর কাছ থেকে পড়ে গেছে, অথবা সে ফেলে রেখে গেছে।

তাতে দেখা গেল সেটা একটা নির্দেশপত্র।

তাতে লেখা ঃ

প্রিয় কিশোরী,

তুমি সন্ধ্যার মধ্যে আউটরাম ঘাটে লুকিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করো। বিরিজলালকে শেষ করে ব্যবস্থা করতে হবে রুক্মিণীর ব্যাপারে। তা হলেই আর ভয় থাকবে না!

সেই ব্যবস্থাগুলো ওখানে করাই নিরাপদ। শেষ করতে না পারা গেলে ওকে কিড্‌ন্যাপ করে বিক্রি করে দিলেও চলবে। ইরানে চালান হয়ে যাবে। যা হোক, আজ মনে করে অবশ্যই আসবে। ইতি—

বশীর খাঁ।

চিঠিখানা আগাগোড়া পড়ে দেখে দীপক বলল—তা হলে বোঝা যাচ্ছে যে, এই কিশোরী বেশ বড় একটা পার্ট প্লে করছে। কিন্তু কোন্ ভূমিকায় ইনি অবতীর্ণ হয়েছেন জানি না। যাই হোক, অবিলম্বে ব্যবস্থা করতেই হবে।

মিঃ সিংহ বললেন—কিন্তু আপনি যেন স্যর খুব বেশি বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিয়ে—

দীপক বলল—এতবড়ো অ্যাড্‌ভেঞ্চার যার ভাল লাগে তাকেই পাঠানো হবে সেখানে।

—কে? মিঃ সিংহ প্রশ্ন করেন।

দীপক হেসে বলে—ওপরের ঘরে আমার সহকর্মী রতনলাল বসে আছে, ওকেই জিজ্ঞাসা করুন।

—ওঁকেই পাঠাচ্ছেন নাকি আপনি?

—তা ছাড়া উপায়? আমাকে ত আবার পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে এক্ষুণি দেখা করতে হবে।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ, বিশেষ কি একটা জরুরী কেসে উনি আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন।

—সে ভাল কথা। আপনার সহকর্মীর যোগ্যতার উপরেও আমাদের যথেষ্ট ভাল ধারণা আছে।

আনমনে দীপক বলে—অবশ্য খুব বেশি দূরে থাকলে আমার চলবে না। দেখা যাক।

মিঃ সিংহের সঙ্গে ঘরের ভেতরে ঢুকে দীপক বলে—তোর কথাই সত্যি হলো রতন। তুই সঙ্গে না এলে এতবড়ো একটা অ্যাড্‌ভেঞ্চার মাঠে মারা যেত।

—কি ব্যাপার?

দীপক চিঠিখানা রতনের দিকে এগিয়ে দেয়।

রতন আপনমনেই বলে—আউটরাম ঘাট। দেখা যাক কতদূর সাক্সেসফুল হতে পারি কেসে।

দীপক কোনও উত্তর দেয় না।

রতনকে ছেড়ে দিয়ে দীপক সোজা চলে যায় লালবাজার পুলিশ স্টেশনে। যাবার আগে রতনকে সেদিনের নৈশ অভিযানের জন্যে ভাল করে প্রস্তুত হতে উপদেশ দিয়ে যায়।

পুলিশ কমিশনার দীপককে দেখতে পেয়েই ডেপুটি কমিশনার মিঃ মরিসনকে ডেকে আনান।

মিঃ মরিসন এসে সমস্ত ফাইলপত্র দীপককে দেখিয়ে বলেন—আমি চাই এই বিষয়টা নিয়ে বেশ ভালভাবে তদন্ত হয়।

সবকিছু দেখে শুনে দীপক বলে—আরে, আমিও যে সম্প্রতি—মানে আজই এই রকম আর একটি কেসের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছি।

—তাই নাকি? আশ্চর্য যোগাযোগ ত। কেসটা কি ভাল করে খুলে বলুন ত!

দীপক তখন কেসটা ভাল করে খুলে বলে মিঃ মরিসনের কাছে। তিনি ও পুলিশ কমিশনার দুজনেই আগাগোড়া ব্যাপারটা মনোযোগ দিয়ে শুনে বলেন—স্ট্রেঞ্জ! আপনি ত তাহলে কতকটা এগিয়ে গেছেন বলতে পারা যায়।

দীপক হেসে বলে—তা অবশ্যই বলতে পারেন আপনারা। আপনারা তদন্তচক্রে আমাকে আনবার অনেক আগেই আমি অন্য একটা সূত্র ধরে এতটা এগিয়ে গেছি।

—তা হলে ত খুব ভালই হলো। মিঃ মরিসন বলেন—আই থিঙ্ক, দেয়ার ইজ নাউ দি সিওরেস্ট্ চান্স অব সাক্সেস। তবে আপনার সহকারীর ওপর এতটা দায়িত্ব—

দীপক হেসে বলে—ভয় নেই মিঃ মরিসন। আমিও দূর থেকে ওকে ফলো করব। এতবড়ো একটা কালপ্রিটের গ্যাটংকে অ্যারেস্ট্ না করে কিছুতেই নিশ্চিন্ত হতে পারছি না আমি।

মিঃ মরিসন দীপকের হাতে হাত রেখে বলেন—আই উইশ ইউ সাক্সেস। আমার মনে হয় এই ক্লু নিয়ে এগুলেই গোটা কেসটা আপনার হাতে এসে পড়বে। দেন্ ইট্ উইল্ বি ঈজি টু সল্ভ্ ইট্, আই থিঙ্ক।

আট

—জয়ন্ত শেঠের বিভ্রান্তি—

জয়ন্ত শেঠ কিশোরী আর বশীর খাঁকে সঙ্গে নিয়ে আড্ডা থেকে বের হয়ে সোজা চলে এলো বড়বাজারে।

বড়বাজার থানায় যে সব কনস্টেবল গার্ড থাকে তাদের মধ্যে একজন ছিল তাদেরই দলের গুপ্তচর। তাকে অত্যন্ত সহজেই খুঁজে পাওয়া গেল।

তাকে সঙ্গে নিয়ে জয়ন্ত শেঠ বেরিয়ে এলো থানা থেকে। সেখানে একখানা দোতলা বাড়ির আড়ালে দাঁড়িয়ে জয়ন্ত শেঠ ভরত সিংকে প্রশ্ন করল—একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে এলাম ভরত সিং। খুব জরুরী প্রয়োজনেই আসতে হলো আমাকে।

—কি কথা বলুন সর্দার।

দুখানা দশ টাকার নোট ভরত সিংয়ের হাতে গুঁজে দিয়ে জয়ন্ত শেঠ বলল—আমাদের বিরিজলাল নামে একজন লোককে কি তোমাদের এখানে আটক রাখা হয়েছে?

নোট দুটো পকেটে পুরে সহাস্যমুখে ভরত সিং বলল—আপনি ঠিকই বলেছেন সর্দারজী। তাকে দু'দিন হলো আটক রাখা হয়েছে।

—কি অপরাধে ধরা পড়েছে সে?

—সেটা ঠিক জানি না। বোধ হয় কোনও একটা লোককে 'চিট' করবার ব্যাপারে—

—কিন্তু বিরিজলাল ত তেমন লোক নয়।

—হয়ত ওকে অপরাধী সাজানো হয়েছে; ওর শত্রুপক্ষও ত অনেকে আছে।

—তা বটে। তা যদি হয় তবে আমার কিন্তু সন্দেহ হয়—

—কার ওপর?

—সে কথা এখানে আলোচনা করতে চাই না। যাক, আর একটা কথা।

—বলুন।

—ও কি এখন পর্যন্ত কোনও স্বীকারোক্তি দিয়েছে পুলিশের কাছে?

—যতদূর মনে হয় দেয়নি।

—খুব ভাল করে খেয়াল রেখেছ ত?

—আজ্ঞে হ্যাঁ সর্দার।

—বেশ, চলি তা হলে।

জয়ন্ত শেঠ এতক্ষণ খেয়াল করেনি যে সে কনস্টেবলটিকে নিয়ে আসার একটু পরেই বড় রাস্তার মোড় থেকে বশীর খাঁ আর কিশোরী অদৃশ্য হয়েছিল।

ওদের খুঁজে বের করবার জন্যে সে এগুলো বড় রাস্তা ধরে। কিন্তু ওদের কাউকেই দেখা গেল না কোথাও।

চিন্তিতমুখে জয়ন্ত শেঠ কি করবে ভাবছে এমন সময় শোনা গেল পর পর দু'বার বন্দুকের গর্জন।

প্রচণ্ড শব্দ।

জয়ন্ত শেঠ থানার দিকে এগুলো, কারণ বন্দুকের শব্দটা ওই দিক থেকেই ভেসে এসেছিল। কিন্তু থানার সাম্‌নে গিয়ে কাউকেই দেখতে পেল না। শুধু দেখা গেল পুলিশের চাঞ্চল্য ও ছোটাছুটি।

একটু সেখানে দাঁড়িয়ে সে শুনতে পেল দুজন অফিসার বলাবলি করছে—উঃ বিরিজলাল লোকটাকে একেবারে শেষ করে ফেলল!

—সত্যি বুকের পাটা আছে বটে! প্রকাশ্য থানার মধ্যে এভাবে আক্রমণ করে—

—আমার কিন্তু মনে একটা সন্দেহ হচ্ছে স্যর।

—কি সন্দেহ?

—নিশ্চয়ই থানার কোনও লোক এর সঙ্গে জড়িত আছে। তা না হলে এত নাড়ীনক্ষত্র জেনে এভাবে পলায়ন করা কি যার তার দ্বারা সম্ভব?

—কিন্তু—

—আই অ্যাম ডেফিনিট্। নিশ্চয়ই তাই।

জয়ন্ত শেঠ ধীরে ধীরে সেখান থেকে প্রস্থান করল। বার বার তার মাথায় শুধু একটা

প্রশ্নই জাগতে লাগল। এইভাবে প্রকাশ্যে বিরিজলালকে হত্যা করল কে? আর যেই হত্যা করুক, এর মধ্যে জড়িত আছে একটি বিরাট চক্রান্ত।

জয়ন্ত শেঠ দুশ্চিন্তিত হলো। যেভাবে দ্রুত তার দলের মধ্যে ভাঙ্গন ধরতে সুরু করেছে তাতে ভবিষ্যতে যে কি হবে তা আন্দাজ করা প্রায় অসম্ভব। যেমন করেই হোক এই চক্রান্তের অবসান ঘটিয়ে এ ভাঙ্গন রোধ করতে হবে।

জয়ন্ত শেঠ চিন্তিতমনে এগিয়ে চলল আড্ডার দিকে।

নয়

—আউটরাম ঘাট—

রাত তখন ক'টা বাজে ঠিক আন্দাজ করা যায় না। তবে বারোটার যে বেশি তা ঠিক।

আউটরাম ঘাট। জেটি। বড় বড় দুটো স্টীমারের বয়লার ধূমল দীর্ঘশ্বাস ছাড়ছে। কতকগুলি মাল-টানা ফ্ল্যাট আর কতকগুলি নৌকা বাঁধা।

ঠিক এমনি সময়ে দেখা গেল একজন লোককে মাতাল অবস্থায় ঘাটের দিকে এগিয়ে আসতে। যে রকম টলতে টলতে সে চলেছে আর যে প্রলাপের মতো ভঙ্গীতে হিন্দি গানের দু-একটা টুকরো গেয়ে চলেছে তাতে তাকে মাতাল বলে বুঝতে খুব বেশি অসুবিধে হয় না।

ঘাটের সাম্‌নে একজন বীটের কনেস্টবল পাহারা দিচ্ছিল। সে তাকে দেখতে পেয়েই গিয়ে চেপে ধরল। বলল—এই, এত্‌না রাত্‌মে হিঁয়াপর চিল্লাতা কাহে? তুম্‌কো থানামে যানে হোগা। জরুর।

লোকটি ঘাড় নাড়তে নাড়তে বলল—এইসি চাঁদনী রাত। ফুর্তি উড়াও ইয়ার। এইসি দিন নাহি রহেগা দোস্ত।

কথার শেষে সে একটা হিন্দি গানের কলি দু'বার গেয়ে ঘাড় নাড়তে লাগল।

কনেস্টবলটি বলল—কোই বাৎ মাৎ করো শয়তান! জরুর থানামে যানে হোগা।

—আরে কুছ রুপেয়া মাংতা কি নহি?—লোকটা বিরক্তিপূর্ণ স্বরে বলে—লিজিয়ে রুপেয়া। লেকিন্ আপ্‌কা মাফিক বেরসিক আদমী—

পুলিশ কনেস্টবল দেখল লোকটার হাতে ধরা রয়েছে একখানা দশ টাকার নোট।

কনেস্টবলটির মুখ আলোকোজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সে নোটখানা পকেটে পুরে মীরার ভজন গাইতে গাইতে আর খানিকটা খইনি টিপতে টিপতে প্রস্থান করে।

লোকটি এবার ধীরে ধীরে জেটির উপরে এগিয়ে আসে। সেখানে ইতিপূর্বেই আধো-অন্ধকারে বসে অপেক্ষা করছিল একজন লোক।

মাতাল লোকটিকে দেখতে পেয়ে পূর্বোক্ত লোকটি ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে তার সাম্‌নে দাঁড়াল।

মাতাল লোকটি এবার অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় বলে উঠল—উঃ, শেষে আবার একটা ঝামেলায় পড়ে মিছিমিছি খানিকটা দেরী হয়ে গেল।

—সে কি কথা?—পূর্বোক্ত লোকটি প্রশ্ন করে।

—হ্যাঁ, দশটা টাকা খোয়া গেল। যাক্, এবার বলো ত এভাবে ডেকে পাঠালে কেন?

—না পাঠিয়ে কি উপায় আছে! আর একটু হলে সর্দারের কাছে ফাঁস হয়ে যাচ্ছিল। শেষে আমাদের দুজনকেই হয়ত দল ছেড়ে পালাতে হতো। তা না হলে সর্দার যেমন লোক—

—তা জানি বশীর খাঁ। কিন্তু কিশোরীর যা দলবল আছে তাতে সে সর্দার জয়ন্ত শেঠকে ভয় করে না।

—তা না হয় হলো। কিন্তু হাজার হলেও খানিকটা গোলমাল পাকিয়ে তুলে লাভ নেই ত!

—তা বটে। কিন্তু এত ঘাবড়ে যাচ্ছ কেন?

—আমি ঘাবড়ে যাচ্ছি ওই রুক্‌মিণীটার জন্যে।

—সে আবার কি করবে?

—করবে নয় করতে পারে। সর্দার ওর কথায় যথেষ্ট বিশ্বাস করে তা দেখেছ ত?

—তা দেখছি। কিন্তু কেন বলো ত?

—বুঝতে পারছ না? সর্দারের ভিখিরীর পাল থেকে যা টাকা লাভ হয় তার চেয়ে অনেক বেশি হয় ওই মেয়ে বিক্রির ব্যাপারে।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ। আর সে ব্যাপারে রুক্‌মিণী হচ্ছে বিরাট একটা অর্থকরী কাজের কেন্দ্র।

—বুঝলাম। কিন্তু কি করা যায়?

—তা জানি না। কিন্তু কি করা যেতে পারে তা নিয়ে আলোচনা করবার জন্যেই তোমাকে ডেকে আনা।

একটু থেমে কিশোরী বলে—আচ্ছা, একটা কাজ করলে হয় না বশীর খাঁ?

—কি কাজ?

—আমরা যদি রুক্‌মিণীর চেয়ে বেশি কর্মক্ষম একটি মেয়ের জোগাড় করতে পারি?

—কিন্তু কোত্থেকে?

—সে রকম কাজের মেয়ে আমার হাতে আছে বটে, কিন্তু তাকে এখানে এনে ঢোকাই কেমন করে?

বশীর খাঁ একটু চিন্তা করে বলে—সর্দারের মনে রুক্‌মিণীর সম্বন্ধে সন্দেহ এনে দিলে কেমন হয়? সেই সুযোগে আমরা সেই নতুন মেয়েটিকে সর্দারের সামনে এনে ধরব। তারপর রুক্‌মিণীকে হটিয়ে—

—প্ল্যানটা অবশ্য মন্দ নয়। কিন্তু কি করে তাকে কাজে লাগানো যায় তাই ভাবছি।

কথাটা শুনে বশীর খাঁ কিশোরীর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিস্‌ফিস্ করে কি যেন বলল। সব শুনে আনন্দের আবেগে কিশোরী সজোরে বলে উঠল—ঠিক বাত্ হ্যায় ওস্তাদ!

কিন্তু এরা কেউ এতক্ষণ লক্ষ্য করেনি যে জেটি থেকে অদূরে একটি পাগল বসে আপনমনেই বিড় বিড় করে কি যেন সব কথা বলে চলেছিল।

এবার সে উঠে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল উল্টো দিকে।

লোকটার দিকে তাকিয়ে বশীর খাঁর কেমন যেন সন্দেহ হলো। সে দ্রুত এগিয়ে লোকটার পথরোধ করে দাঁড়িয়ে বলল—এই শয়তান, কে তুই? কেন এখানে লুকিয়ে আমাদের কথা শুনছিলি?

পাগলটা হো হো অট্টহাসি হেসে উঠল। তারপর বিড় বিড় করে আপনমনে আবার কি সব কথা বলে চলল।

এতক্ষণ ধরে কিশোরী লক্ষ্য করছিল বশীর খাঁর কার্যকলাপ। এবার সে বলে উঠল—শুধু শুধু কি পাগলামি করছ বশীর খাঁ! ও একজন পাগল ছাড়া আর কিছুই নয়।

—কি করে বুঝলে?

—এও কি চিন্তা করে বুঝতে হয় নাকি? ওকে দেখেই তা বেশ ভালমতো বোঝা যাচ্ছে।

—তার চেয়ে এক কাজ করলেই ত হয়!

—কি কাজ?

—ও যদি সত্যিই পাগল না হয়! তার চেয়ে ওকে একেবারে শেষ করে দিই না কেন?

—সে কি কথা?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, কাঁচা কাজ করতে বশীর খাঁ জানে না।

এই বলে বশীর খাঁ কি যেন করতে যাচ্ছিল। এমন সময় পাগলটা হঠাৎ প্রাণপণে বশীর খাঁর তলপেটে সজোরে একটা লাথি মারল।

লাথির প্রচণ্ড বেগ সহ্য করতে না পেরে ছিট্‌কে পড়ল বশীর খাঁ।

সঙ্গে সঙ্গে লোকটি ছুটতে ছুটতে জেটির সামনে গিয়ে একেবারে লাফিয়ে পড়ল গঙ্গার বুকে।

বশীর খাঁ উঠে দাঁড়িয়ে গঙ্গার দিকে ছুটে গিয়ে জলের মধ্যে গুলি করতে যাচ্ছিল, এমন সময় পেছন থেকে কে যেন সজোরে হেঁকে উঠল—সাবধান, বশীর খাঁ!

বশীর খাঁ অবাক বিস্ময়ে দেখে তার পাশে দাঁড়িয়ে কিশোরী তার দিকে একটা রিভলবার উঁচিয়ে রয়েছে।

—একি করছ তুমি কিশোরী?

কিশোরী অকস্মাৎ তার ছদ্মবেশটা একটানে খুলে ফেললে দেখা গেল সে আর কেউ নয়—স্বয়ং ডিটেকটিভ দীপক চ্যাটার্জী।

—একি, তুমি?

হেসে দীপক বলল—কেন, নিরাশ হলে নাকি? কিন্তু কি করব বল, কিশোরীকে—মানে আসল কিশোরীকে এর আগেই আমরা আট্‌কে ফেলেছি কিনা। সে এতক্ষণ থানায় বসে দুঃস্বপ্ন দেখছে। আর নকল কিশোরী মানে আমিই তোমার সঙ্গে এতক্ষণ কথা বলছিলাম। আর এই পাগলটিই হচ্ছে আমার সহকারী রতনলাল।

সাম্‌নে বাজ পড়লেও বশীর খাঁ এতটা অবাক হতো না। তার মুখ-চোখ নিষ্প্রভ আকার ধারণ করল।

দীপক বলল—আর মিথ্যা চিন্তা করে লাভ নেই বশীর খাঁ, এবার চুপচাপ আত্মসমর্পণ কর দেখি।

কিন্তু একটা মাত্র মুহূর্ত পর হঠাৎ দীপকের সামান্য অন্যমনস্কতার সুযোগ নিয়ে বশীর খাঁ সজোরে তার মাথায় আঘাত করল হাতের ডাণ্ডাটা দিয়ে।

দীপক সরে দাঁড়াল। সেটা তার মাথায় না লেগে লাগল তার কাঁধে।

দীপক প্রচণ্ড ব্যথায় বসে পড়ল। ওধারে সেই ফাঁকে বশীর খাঁ প্রাণপণে ছুটে পালিয়ে

গেল তার সাম্‌নে থেকে। ডান কাঁধে আঘাত লাগায় তার হাতখানা প্রায় অবশ হয়ে গিয়েছিল। অনেক কষ্টে হাত তুলে সে রিভলবারের ট্রিগারটা টিপল। কিন্তু গুলিটা গিয়ে অদূরবর্তী একটা কাঠের গুঁড়িতে বিদ্ধ হলো।

বশীর খাঁ ততক্ষণে বহুদূরে অদৃশ্য হয়েছে।

দশ

—পলায়ন—

আড্ডায় ফেরবার পর থেকেই অত্যন্ত অন্যমনস্ক ছিল জয়ন্ত শেঠ। আজ যেন রাজ্যের ভাবনা তার মাথার মধ্যে জট পাকাতে সুরু করে দিয়েছিল।

এতদিন ধরে তিল তিল করে যে দলকে সে গড়ে তুলল তা যে তার সামনেই এভাবে ধ্বংস হয়ে যেতে বসবে এ কথা সে কোনও দিন কল্পনাতেও স্থান দেয়নি। কিন্তু একি? সত্যিই আজ তাকে মারাত্মক এক বিপদের সাম্‌নে এসে দাঁড়াতে হয়েছে। তার দলের মধ্যে সুরু হয়েছে অযথা দলাদলি আর গোলমাল। দীর্ঘদিন এভাবে চললে যে কি হবে—

—একি, সর্দারজী! এত তাড়াতাড়ি ফিরে এলে যে? ওধারের কাজের কতদূর?

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে জয়ন্ত শেঠ বলল—বিরিজলাল মারা গেছে রুক্‌মিণী!

—মারা গেছে? রুক্‌মিণী যেন আর্তনাদ করে উঠল।

—হ্যাঁ, রুক্‌মিণী।

—কিন্তু কে সেই হত্যাকারী সর্দার? যে থানার ভিতরে গিয়েও তাকে গোপনে হত্যা করতে পারে?

রুক্‌মিণীর দু'চোখ যেন ক্ষুধার্ত বাঘের মতোই জ্বলতে থাকে।

—সে কথা আমিও জানি না রুক্‌মিণী।

—মিথ্যা কথা! রুক্‌মিণী যেন সজোরে চীৎকার করে ওঠে।

—তোমার কাছে মিথ্যা বলে আমার লাভ?

—যদি বলি তুমিই তাকে হত্যা করেছ? রুক্‌মিণী তীক্ষ্ণকণ্ঠে প্রত্যুত্তর দেয়।

—তা হলে তোমার বিরুদ্ধে বলবার মতো প্রমাণ আপাতত আমার হাতে নেই বটে, তবে বশীর খাঁ ফিরে এলেই জানতে পারবে।

—কিন্তু তোমার সঙ্গে বের হয়েও তারা দুজনে ফিরে এলো না কেন?

—তা এখনও বুঝতে পারছি না রুক্‌মিণী। তবে হঠাৎ পথের মোড় থেকে তারা যেভাবে সরে পড়ল তাতে—

—তাতে কি মনে হয় সর্দার? খুলেই বল না।

—বলবার মতো ভাষা আমার নেই রুক্‌মিণী। আমাকে একটু একা থাকতে দাও। ভাবতে দাও। আমি যেমন করে পারি খুঁজে বের করবই কে আততায়ী। কে এই সব গোলমাল আর চক্রান্তের মূলে থেকে আমাদের সমস্ত জিনিসকে এভাবে ধ্বংস করছে!

—তা কি এখনও জান না?

—ঠিক করে কিছু বলা কি করে আমার পক্ষে সম্ভব? সর্দারের কণ্ঠ এতক্ষণে কেমন যেন নিষ্প্রভ বলে মনে হয়।

সে হচ্ছে ওই কিশোরী। আমার কথায় বিশ্বাস কর সর্দার—যদি এখনো বাঁচতে চাও। রুক্‌মিণী সর্দারের মুখের ওপর স্থির দৃষ্টি স্থাপন করে অকম্পিতকণ্ঠে বলে ওঠে।

—দেখা যাক্‌ রুক্‌মিণী, কোথাকার জল কোথায় গড়ায়।

কয়েক ঘণ্টা পর।

ছুটতে ছুটতে আড্ডার মধ্যে প্রবেশ করল বশীর খাঁ। চোখে-মুখে কেমন যেন সচকিত একটা ভাব। শঙ্কিত।

বশীর খাঁকে দেখেই রুক্‌মিণী ছুটে আসে। বলে—কি হলো খাঁ সাহেব? এমন বেশে এভাবে প্রত্যাবর্তন?

জয়ন্ত শেঠও কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে আসে। গম্ভীরকণ্ঠে বলে—তোমাদের এ লুকোচুরির শেষ করতে চাই আমি বশীর খাঁ। এভাবে চললে আমাদের বিপদ—

—বিপদ সত্যিই বেড়ে গেছে শেঠজী। এক্ষুণি এ আড্ডা ছেড়ে আমাদের পালাতে হবে!

—তার মানে?

—কিশোরী ধরা পড়েছে।

—সে কি কথা?

—হ্যাঁ। আর আমাদের গুপ্ত খবর সব সে পুলিশের কাছে স্বীকার করেছে।

—কে স্বীকার করেছে? কিশোরী না তুমি? রুক্‌মিণী শ্লেষপূর্ণ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে।

—আমি?

জয়ন্ত শেঠ বাধা দিয়ে বলে—সে বিচার পরে করলেও চলবে রুক্‌মিণী।

—পরে কেন?

—আমাদের আগে এখান থেকে পালিয়ে আত্মরক্ষা করতে হবে। কিন্তু কি করে কিশোরী ধরা পড়ল বশীর খাঁ?

বশীর খাঁ বলল—ডিটেকটিভ দীপক চ্যাটার্জীর নাম শুনেছেন? বিখ্যাত গোয়েন্দা।

—হ্যাঁ হ্যাঁ।

—সেই কোন্‌ সূত্রে খবর পেয়ে তাকে এভাবে আটক করেছে বলে জানতে পারলাম।

—সে কি কথা? কিভাবে খবর পেলে সে?

—তা জানি না সর্দার। তবে তাড়াতাড়ি গা-ঢাকা দিতে না পারলে আমরাও নিরাপদ নই এই কথা মনে রাখবেন।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, এক্ষুণি পলায়নের বন্দোবস্ত কর তুমি। আর আড্ডার ভিখিরীদেরও—

—কিন্তু এত অল্প সময়ের মধ্যে কি করে তা সম্ভব হবে বলুন।

—যেমন করেই হোক আমাদের এক্ষুণি এখান থেকে পালাতে হবে। কোনও মতেই আমরা তাদের হাতে ধরা পড়তে পারি না।

সর্দার যেন প্রবল একটা উত্তেজনায় অধীর হয়ে ওঠে। ঘরের মধ্যে অস্থিরভাবে পায়চারী করতে থাকে।

এগারো

—অনুসরণ—

—কিন্তু এত অল্প সময়ের মধ্যে আমরা কি করে তৈরি হয়ে নেব মিঃ চ্যাটার্জী? দীপকের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করেন বড়বাজার থানার ও. সি. মিঃ সিংহ।—আমরা আগে থেকে এতটুকুও আভাস পাইনি। আর্মড্ ফোর্সদের আগে থেকে অর্ডার না দিলে তাদের তৈরি করতে বেশ কিছু সময় লাগবে।

দীপক বলল—যেমন করে হোক, অন্তত পনর থেকে কুড়ি জন আর্মড ফোর্স নিয়ে—

—বেশ, চেষ্টা আমি করছি। কিন্তু এত সত্বর কি হবে?

কথা বলে তিনি বাইরে বেরিয়ে গিয়ে কি যেন অর্ডার দিয়ে এলেন। তারপর ভেতরে প্রবেশ করে বললেন—কিন্তু কোন্ সূত্রে আপনি এতদূর এগুলেন তা ত বললেন না!

দীপক হেসে বলল—ওই আউটরাম ঘাটের সমস্ত ব্যাপার কি ইতিমধ্যেই ভুলে গেলেন নাকি? সেটাই তো সমস্ত মিস্ট্রির origin...তারপর কিভাবে ওদের ফলো করেছিলাম তা আপনি জানেন না! যাক, আজকের অভিযান সফল হলে সব আপনাকে বলব।

—আউটরাম ঘাটের ব্যাপারে কি আপনিও ছিলেন নাকি?

—আমি ছিলাম মানে! দীপক হো হো করে প্রাণখোলা হাসি হেসে উঠে বলল—রতন ত ভয়ে জলে লাফিয়ে পড়ল। আমিই ত আজকের অভিযানের হীরো। কিশোরীকে আগেই ধরে দুজন কনেস্টবলের জিম্মাতে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম জানেন ত?

—হ্যাঁ।

—তারপর আমি নকল কিশোরী সেজে ধীরে ধীরে বশীর খাঁর কাছ থেকে সমস্ত সিক্রেটগুলো একে একে বের করে ফেললাম।

—এবার বুঝেছি।

—কিন্তু আর এক মুহূর্তও দেরী নয় মিঃ সিংহ। আমার সন্দেহ হচ্ছে এতক্ষণ বশীর খাঁ ওদের আবার সাবধান করে না দেয়।

—কিন্তু তাকে ধরতে পারলেন না?

—প্রায় পেরেছিলাম। শেষ মুহূর্তে হাত ফসকে বেরিয়ে গেল। তবুও ওদের আড্ডার সন্ধান আমি পেয়েছি মিঃ সিংহ।

আজ সারা ভারত জুড়ে ওই যে চলছে ভিখিরী তৈরির ব্যবসা আর অপহৃতা নারী কেনাবেচা ওর চেয়ে জঘন্য অপরাধ বোধ হয় পৃথিবীতে আর কিছু হতে পারে না। আজকেই আমি সেই পরিচ্ছেদের উপরে যবনিকা টেনে দিতে চাই। বশীর খাঁ আর তার দলবল যে ধার দিয়েই পালাবার চেষ্টা করুক না কেন, আমার হাতে আজ তাদের ধরা পড়তেই হবে। যেমন করেই হোক আমি জানি ওদের লীলাখেলার অবসান ঘটাতে আজ আমি পারব।

দীপক উত্তেজনায় সোজা হয়ে দাঁড়ায়।

বারো

—পরিশেষ—

আড্ডায় হানা দিয়ে পুলিশবাহিনী দেখতে পেলে বিরাট আড্ডা-বাড়িখানা পোড়ো বাড়ির মতোই খাঁ খাঁ করছে।

কোণের তিন-চারটে ঘরে বন্দী করা ছিল দলে দলে ভিখিরীদের। একটা ঘরের তালা খুলতেই পাওয়া গেল প্রায় ত্রিশ জন ভিখিরীকে। দীপক তাদের মধ্যে বুদ্ধিমান গোছের একটি ছেলেকে ডেকে প্রশ্ন করল—এই, সর্দারেরা কোন্ দিকে গেছে রে?

ছোকরাটি বলল—তিন-চারটে মোটরে করে ওরা বড় রাস্তা ধরে গেছে। গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রাস্তা।

—তুই কি করে বুঝলি যে ওরা গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রাস্তা দিয়ে গেছে?

—আজ্ঞে, ওরা ওই সব কথাই বলাবলি করছিল ওদের মধ্যে।

—কতক্ষণ আগে ওরা গেছে এই আড্ডা ছেড়ে?

—তা প্রায় এক ঘণ্টা হবে।

—ওদের সঙ্গে ক'জন লোক আছে?

—চার পাঁচ জন হবে। ওরা বলেছে আর নাকি কোল্‌কাতায় আসবে না।

—বুঝেছি! আর বেশি কথা বলবার সময় দীপকের ছিল না। সে মিঃ সিংহের দিকে চেয়ে বলল—গেট্ রেডি! লেট্ আস্ ফলো!

তীব্রবেগে গাড়ি ছুটে চলেছে।

ছুটে চলেছে পুলিশের লরী আর জিপ। গতিসীমার প্রায় শেষ সীমায় পৌঁছেছে তাদের গাড়ির গতি।

দূরে দেখা যাচ্ছে পলায়নরত কয়েকখানা গাড়ির পেছনের দিকের আলো।

'জোরে—আরও জোরে। ব্যবধান ক্রমশই কমে আসছে।

—ফায়ার! মিঃ সিংহ আদেশ দেন। সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি পুলিশ রাইফেল একসঙ্গে গর্জে ওঠে।

রাইফেলের গুলি গিয়ে সাম্‌নের গাড়ির দুটি টায়ারে বিদ্ধ হয়। প্রচণ্ড শব্দে টায়ার ফেটে যায়।

দুটি গাড়িরই গতি রুদ্ধ হয়।

সমস্ত অপরাধী বন্দী হয় পুলিশের হাতে।

তাদের অ্যারেস্ট্ করে দুজন লোককে মিঃ সিংহের সাম্‌নে টেনে আনে দীপক। বলে—এরা দুজনই হচ্ছে জয়ন্ত শেঠ আর বশীর খাঁ। সারা ভারত জুড়ে এই যে নৃশংস ব্যবসা চলেছে তার নায়ক হচ্ছে এরা।

—কিন্তু এই সব ভিখিরীদের সম্বন্ধে এখন কি ব্যবস্থা করা যায়? মিঃ সিংহ প্রশ্ন করেন।

দীপক হেসে মিঃ সিংহের মুখের দিকে তাকিয়ে বলে—সে ব্যবস্থা করবেন সরকার। আমরা নই। আমাদের কাজ এদের পুলিশ কমিশনারের কাছে নিয়ে যাওয়া। তিনি খুবই আনন্দিত হবেন মিঃ সিংহ। এমন কি আপনার পদোন্নতিও হতে পারে!

মিঃ সিংহ কোনও উত্তর দেন না। তাঁর মন তখন দেশের এই অসংখ্য ভিখিরীদের

প্রতি বেদনায় ও সহানুভূতিতে ভরে উঠেছিল। কেমন যেন অসাড় হয়ে গিয়েছিল তাঁর সারা মন অপরিসীম ব্যথায়।

দীপক মিঃ সিংহের দিকে চেয়ে বলে—এদের গ্রেপ্তার করে কোল্‌কাতার ব্যবসাকেন্দ্র আমরা বন্ধ করে দিলাম বটে, কিন্তু সারা ভারত জুড়ে এদের যে ব্যবসা চলেছে তার অবসান ঘটাতে আমরা পারলাম না। আমার মনে হয় সে কাজ না করলে আমাদের সমস্ত চেষ্টাই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। কবে যে সে কাজে সফল হব জানি না।

মিঃ সিংহ বলেন—সে কাজ আমার নয়। আপনি বরং ওপরে রিপোর্ট করুন মিঃ চ্যাটার্জী। আমার মনে হয় তাতে কাজ হতে পারে।

দীপক এ কথার কোনও উত্তর দেয় না। তার সারা মনও কেমন যেন অপরিসীম ব্যথায় মুহ্যমান হয়ে পড়ে।

ধীরে ধীরে তার বুক ভেদ করে বেরিয়ে আসে ব্যথা-মেশানো দীর্ঘশ্বাস।

—শেষ—

মৃত্যুহীন প্রাণ

এক

—নারীহত্যা—

সেই পুরোনো একঘেয়ে কোল্‌কাতা।

কাজকর্মের তাড়া নেই। খাওয়া, ঘুরে বেড়ানো আর গল্প করা। বিশ্রী লাগছিল দীপকের। দীপককে চেনেন ত? অবশ্য আজকের বাংলাদেশে ডিটেকটিভ দীপক চ্যাটার্জীকে না চেনে কে?

সকালে উঠে খবরের কাগজের পাতা উল্টোয়। ভাবে, দেখা যাক্ যদি দু-একটা নতুন কেসের সন্ধান মেলে। কিন্তু বাংলাদেশের কোথাও যেন আর তেমন চিত্তাকর্ষক ঘটনা ঘটছে না।

সেদিন সন্ধ্যা।

বাইরে বর্ষা নেমেছে মুষলধারে। জল পড়ছে ঝম্ ঝম্ করে। ভিজে প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে দীপক চাকর ভজুয়াকে বলল—এই, যা ত, ভাল করে পাঁপড় ভেজে নিয়ে আয় দু' প্লেট। আর মুড়ি-কড়াইশুঁটি।

এমন লোভনীয় খাবারের গন্ধে রতনেরও জিভে জল এসেছিল। সে এবার উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল—সত্যি, দীপকের টেস্টের প্রশংসা করতে হয় বটে! কন্‌গ্রাচুলেশন্।

দীপক হেসে বলে—বর্ষার দিনে এরকম খাওয়া আমরা ছেলেবেলা থেকেই খেয়ে আসছি রে! তা আজকে হঠাৎ আমাকে কন্‌গ্রাচুলেট করবার কি প্রয়োজন ঘটল?

—তা নয়, তবে ঠিক সময়ে ঠিক কাজ তুই মনে করিস বলেই আমার ভারী আনন্দ হয়। তুই হচ্ছিস একটা জিনিয়াস!

—থাক থাক, দীপক বাধা দেয়, খবরের কাগজওয়ালারা শুনলে আবার মহামুস্কিল বাধিয়ে ফেলবে! এতটা প্রশংসা ভাল নয়!

—কিন্তু খবরের কাগজে কি তোর কথা আগে বেরোয়নি বলতে চাস্?

—তা বেরিয়েছে, কিন্তু খাদ্য স্পেশ্যালিস্ট হিসেবে নয়! সে কথা যাক্, খেয়েই ত আর সময় কাটে না, এখন কি করা যায় বল্ দেখি!

—হাতে যখন কোনও কাজ নেই তখন আয় দুজনে বসে একহাত দাবাবোড়ে খেলি! কি বল্?

—হ্যাঁ, এ যুক্তিটা মন্দ নয়।

সুখাদ্য সহযোগে সেদিনের সন্ধ্যার খেলার আসর যখন সবেমাত্র জমে উঠেছে, এমন সময় দীপকের চমক ভাঙল টেলিফোনের আর্তনাদে।

দীপক ছুটে গেল টেলিফোনের কাছে। রিসিভারটা তুলে নিয়ে প্রশ্ন করল—হ্যালো, কে?

রতন আপনমনেই বলল—যেই হোক, তার মতো বেরসিক লোক দুনিয়ায় আর দুজন নেই। এমন জমাটি খেলা...

ওধার থেকে উত্তর ভেসে এলো—আমি মহিমপুর স্টেট থেকে একটা কাজের জন্য আপনাকে নিযুক্ত করছি।

—মহিমপুর স্টেট? সে আবার কোথায়?

—হাওড়া জেলা। উলুবেড়িয়া থেকে তিন মাইল দক্ষিণে।

—সেখানে কি কোনও জটিল নতুন কেস...

—হ্যাঁ। আমি একটি নারীহত্যার তদন্তব্যাপারে নিযুক্ত করতে চাই আপনাকে।

—নারীহত্যা? কোথায়?

—আমাদের স্টেটেই।

—আপনাদের বাড়িতেই কি?

—হ্যাঁ।

—তাহলে ত সেখানে গিয়েই তদন্ত করতে হবে আমাকে।

—তা ত বটেই।

—আপনার নাম?

—অভিলাষ মুখার্জী আমার নাম। আমার দাদা মনোমোহন মুখার্জী এখন স্টেটের মালিক।

—বুঝেছি। কিন্তু কেসটা কি ধরণের বর্ণনা করুন।

—আমাদের বাড়ির একজন পুরোনো ঝিকে হঠাৎ কে বা কারা হত্যা করেছে। কিংবা আত্মহত্যাও হতে পারে।

—বুঝলাম। আমাকে কি আপনারা সেই কেসে অ্যাপয়েন্ট করতে চান?

—এক্জ্যাক্টলি! আপনার ফি-টা কি অগ্রিম দিতে হবে?

—না, পরে হলেও চলবে।

—ধন্যবাদ। কবে আসছেন?

—কাল সকালে।

—বেশ, আমরা তাহলে স্টেশনে লোক রাখবার ব্যবস্থা করব। কিংবা আপনারা নৌকো বা লঞ্চেও আসতে পারেন। তাহলে উলুবেড়িয়ার ঘাটে নেমে...

—সেটাই ভাল। আমরা বরং লঞ্চে যাব। আমার এক বন্ধুর একখানা লঞ্চ আছে।

—ধন্যবাদ।

—আর একটা কথা। পুলিশে খবরটা জানিয়েছেন কি?

—না। আপনি যদি ব্যাপারটার সুরাহা করতে না পারেন তখন বরং সে ব্যবস্থা করা যাবে।

—তা হয় না। আপনি পুলিশকে জানান। আমি তাদের ছাড়া পৃথক্ তদন্ত করব।

—বেশ, আপনি যখন বলছেন, তাই করা হবে। আমি আজই পুলিশে জানাচ্ছি ব্যাপারটা।

বেলা সাড়ে সাতটা।

নিঃসীম নির্মেঘ আকাশ। ঝিরঝিরে হাওয়া বইছে গঙ্গার বুকের ওপর দিয়ে।

জল কেটে, ফেনা ভেঙে ছুটে চলেছে মোটরলঞ্চ। কাছে-দূরে বহু নৌকা। জেলেডিঙি। স্টিমার। বয়া ভাসছে মাঝে মাঝে।

রতন বলে—কালকের রাতের বর্ষণক্লান্ত প্রকৃতিদেবী আজ সকালের হাওয়ায় যেন নিজেকে মেলে ধরেছেন, তাই না? জল ঝেড়ে ফেলে ভিজে চুলগুলো হাওয়ায় শুকিয়ে নিচ্ছেন।

দীপক হেসে বলে—তুই যে হঠাৎ কবি হয়ে উঠলি রে! এত কাব্য এত দিন ছিল কোথায়?

রতন হাত দুটো নেড়ে বলে—ঠিকমত সিচুয়েশন্ না পেলে ত আর কাব্যের বিকাশ হয় না।

দুজনে রেলিং-এর ধারে এসে দাঁড়ায়। দীপক বলে—সামনেই আসছে ব্ল্যাক্ মিস্ট্রি। এখন মনটাকে এত উড়ু-উড়ু করে রাখিস্ না, একটু গ্রেভ করে তোল্।

—মিসট্রি?

—নিশ্চয়ই। এটুকু ডিডাক্শানও করতে পারবি না, এমনটা আশা করিনি আমি।

—কি করে বুঝলি যে এর মধ্যে এত বড়...

—আচ্ছা, সামান্য একজন ঝিয়ের মৃত্যুতে কোন স্টেটের মালিকের ভাই হঠাৎ এত ফি দিয়ে আমাদের মতো ডিটেকটিভদের নিযুক্ত করছেন কেন? এটুকুও কি তোর মাথায় খেলল না?

—তা ত বটে! এ ব্যাপারটা অবশ্য...

—তা ছাড়া আরও দেখ্, প্রথমটা পুলিশে তাঁরা জানাননি। পরে আমি বলার পর...

—তা থেকে কি বোঝা গেল?

—বোঝা গেল এই যে এর সঙ্গে স্টেটের কোনও একটা বড় সিক্রেট হয়ত জড়িত আছে।

—আর কিছু নয়?

—আপাততঃ এইটুকুই থাক। পরে যথাসময়ে আমার পরবর্তী হিণ্ট্ পাবি।

—বেশ, যা বলিস্।

রতন দীর্ঘশ্বাস ফেলে। এতবড় পয়েন্টগুলোর হিণ্ট পেয়েও আগে সল্ভ্ করতে না পারার জন্যে তাকে বেশ একটু দুঃখিত বলেই মনে হয়।

দুই

—দু-একটা সূত্র—

যথাসময়ে লঞ্চ এসে থামল উলুবেড়িয়ার ঘাটে।

একটু খোঁজ করতেই একজন ভদ্রলোককে পাওয়া গেল। তিনি মহিমপুর থেকে এদের রিসিভ্ করতে এসেছেন। ভদ্রলোকে মহিমপুর স্টেটের একজন নায়েব।

দীর্ঘদেহ ভদ্রলোক। মাথার চুল ব্যাক্‌ব্রাশ করা। খাঁড়ার মতো উঁচু নাক। প্রথম দর্শনেই তীক্ষ্ণধী বলে মনে হয়।

দীপকদের লঞ্চটাকে ভিড়তে দেখেই ভদ্রলোক দুটি হাত জোড় করে নমস্কার জানিয়ে প্রশ্ন করলেন—আপনারাই কি কোল্‌কাতা থেকে আসছেন?

—হ্যাঁ।

—দীপক চ্যাটার্জী কার নাম?

—আমার নামই দীপক চ্যাটার্জী।

—আমাদের নির্দেশ তাহলে আপনি নিশ্চয়ই পেয়েছেন?

—হ্যাঁ, মহিমপুরের কেসটার ব্যাপারে...

—আমি ওখান থেকেই আসছি আপনাদের রিসিভ্ করতে।

—ধন্যবাদ। যাতায়াতের কি সুব্যবস্থা আছে?

—স্টেটের গাড়ি সঙ্গেই আছে। আসুন আপনারা।

—আপনি কি ওখানকারই কর্মচারী?

—হ্যাঁ, আমি ওখানকার একজন নায়েব।

—আপনার নাম?

—বিলাস সামন্ত।

কথা না বাড়িয়ে দীপক ও রতন লঞ্চকে অপেক্ষা করতে বলে ভদ্রলোকের অনুগমন করে।

আধঘণ্টা পর।

গাড়ি এসে থামে মহিমপুর স্টেটের প্রাসাদের বাইরে। ভেতরের ঘরে অপেক্ষা করছিলেন অভিলাষ মুখার্জী। বিলাস সামন্ত পরিচয় করিয়ে দিলেন তাঁর সঙ্গে।

ভদ্রলোকের বয়স ত্রিশের কাছাকাছি। পরনে তাঁতের সরু ধুতি ও সিল্কের পাঞ্জাবী। কোঁকড়ানো চুল। রিম্‌লেস্ চশমা। সৌখীন বলে বুঝতে পারা যায় প্রথম দর্শনেই।

ভদ্রলোক পরিচিত হয়ে অত্যন্ত অল্পসময়ের মধ্যেই ঘটনা খুলে বললেন। তাঁর দাদা সম্প্রতি দার্জিলিং-এ আছেন বৌদি সমেত। এর মধ্যে এই ধরণের ঘটনা বাড়িতে আলোড়ন এনেছে। দার্জিলিং-এ তার করে দেওয়া হয়েছে।

—পুলিশে জানিয়েছিলেন ত? দীপক প্রশ্ন করে।

—হ্যাঁ। তারা প্রাথমিক তদন্তও শেষ করে চলে গেছে।

—কি তাদের ধারণা?

—তারা বলে, এটা নাকি একটা সাধারণ আত্মহত্যার কেস।

দীপক কোনও মন্তব্য না করে বলে—চলুন, আমি একবার মৃতদেহটা দেখতে চাই। যেখানে মেয়েটি নিহত হয়েছে সেই ঘরের মধ্যেই আছে ত?

—হ্যাঁ। আর কোথাও সরানো হয়নি।

দীপক কথা না বাড়িয়ে অভিলাষবাবুর সঙ্গে অকুস্থলের দিকে পা বাড়ায়।

ছোট, স্যাঁৎসেঁতে একতলার একখানা ঘর। বাইরে থেকে তালাবন্ধ ছিল। অভিলাষবাবু তালাটা খুলে দিতে দিতে বললেন—কেবল আপনাদের দেখাবার জন্যেই এখনও মৃতদেহটা রাখবার অনুমতি পেয়েছি। এরপর পুলিশ থেকে ময়না তদন্তের জন্য নিয়ে যাওয়া হবে।

ঘরের মেঝের ওপর পড়েছিল একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের মৃতদেহ। বয়স পঞ্চাশের কিছু বেশি হবে। মাথার চুল অধিকাংশ পাকা। গলার ডানদিকে একটা গভীর ক্ষত। সেখান থেকে রক্তক্ষরণের ফলেই মৃত্যু হয়েছে বলে বোঝা যায়।

—ওর নাম কি?

—বিন্দুবাসিনী। আজ প্রায় পঁচিশ বছর ও এখানে কাজ করেছে। শেষ পর্যন্ত কর্তব্যনিষ্ঠায় কোনও ব্যতিক্রমের প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

দীপক আর কোনও কথা বলে না। ঘরের চারদিকে ভাল করে তার অনুসন্ধানী দৃষ্টিকে মেলে ধরে।

সাধারণ ঝি-চাকরদের ঘর। টিনের একটা তোরঙ্গ, খাট আর বিছানা ছাড়া বিশেষ কোনও আসবাবপত্রের বালাই নেই। মৃতদেহটি চিৎ হয়ে পড়েছিল। মুখে একটা আতঙ্কিত চাউনি। যেন মৃত্যুর আগে কিছু একটা দেখে খুব বেশি ভয় পেয়েছিল এমনি ভাব।

দীপকের হঠাৎ নজর পড়ে একটা হাতের দিকে। একটা হাতের মুঠি বন্ধ করা! তার ভেতরে কিছু ধরা আছে কিনা বোঝা যায় না।

দীপক চারদিকে নজর বুলিয়ে নিয়ে বলে—আর কিছু দেখবার নেই আপাততঃ।

ধীরে ধীরে সে একটা সিগারেটে অগ্নিসঞ্চার করে।

—বেশ, তবে চলুন যাওয়া যাক। অভিলাষবাবু বলেন—এ ঘরে দীর্ঘক্ষণ থাকলে কেমন যেন বিশ্রী লাগে!

দরজা বন্ধ করে তারা কিছুটা এগিয়েছে এমন সময় হঠাৎ দীপক বলে ওঠে—ওহো, আমার সিগারেট কেসটা বোধ হয় ওই ঘরে ফেলে রেখে এসেছি।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ। চলুন একবার ঘরটা খুলে...

—আপনিই বরং চাবিটা নিয়ে ঘুরে আসুন। বলেন অভিলাষ মুখার্জী। বার বার ওই ঘরে আমরা...

—বুঝেছি। দীপক অভিলাষবাবুর হাত থেকে চাবিটা নিয়ে ফিরে এসে ঘর খোলে। তারপর একটানে মৃতদেহের হাতটা খুলে দ্রুত হাতের জিনিসপত্রগুলি বের করে নেয়।

মৃতদেহের হাতের মধ্যে কিছু নেই—শুধু রয়েছে একটা সোনার বোতাম আর তার লকেটের সামান্য একটু অংশ। বোতামের ওপরে একটা শঙ্খ আঁকা।

শঙ্খ-আঁকা বোতাম! নিশ্চয়ই মৃত স্ত্রীলোকটি আততায়ীকে বাধা দিতে গিয়েছিল, আর সেই সময়েই আততায়ীর একটা বোতাম তার হাতে এসে পড়েছে।

বোতামটা পকেটে ফেলে দীপক ফিরে আসে। সেখানে অপেক্ষা করছিলেন অভিলাষবাবু, বিলাস সামন্ত আর রতন।

—সিগারেট কেসটা পেলেন ত? অভিলাষবাবু প্রশ্ন করেন।

—হ্যাঁ, এই ত! দীপক পকেট থেকে সিগারেট কেসটা বার করে সেটা তুলে ধরে তাঁদের দিকে।

তিন

—অপরিচিতের চিঠি—

আবার কোল্‌কাতা।

ড্রইংরুমে বসে কথা হচ্ছিল দীপক আর রতনের মধ্যে। আলোচনা হচ্ছিল মহিমপুর স্টেটের কেসটা নিয়েই।

রতন বলল—কেবল এই একটা সূত্র ছাড়া আর কোনও সূত্রই আমরা এখন পর্যন্ত পাইনি।

দীপক হেসে বলল—কিন্তু এ থেকে কতটা এগিয়েছি তাই ভেবে দেখ্ না। পুলিশের জনৈক দারোগা গম্ভীরভাবে ডিক্লেয়ার করে গেছেন যে এটা হচ্ছে একটা ক্লিন্ কেস্ অব্

স্যুইসাইড্। কিন্তু আমরা এ থেকে আন্দাজ করতে পারছি যে এটা হত্যার কেস। আর হত্যাকারী একজন পুরুষ।

—পুরুষ?

—হ্যাঁ, পুরুষ না হলে কি আর শঙ্খ-আঁকা সোনার বোতাম গলায় দেয় নাকি?

—তা বটে। চিন্তিতস্বরে রতন বলে—তা ছাড়া এটাও বোঝা যাচ্ছে আততায়ী একজন ধনী লোক। নিদেনপক্ষে হতদরিদ্র লোক নয়।

—তাও মানছি। দীপক বলে—এখন পরবর্তী আর কি ক্লু পাওয়া যায় সেদিকে মন দিতে হবে—কারণ বোতামের ওপর কোনও ফিংগার-প্রিন্ট্ আমরা পাইনি।

কথা শেষ হলো না। বাড়ির কড়াটা নড়ে উঠল সজোরে। নিচে থেকে শোনা গেল ডাকপিয়ন বললে—চিট্‌ঠি হ্যায় বাবুজী!

চাকর ভজুয়া একটু পরেই একখানা চিঠি নিয়ে প্রবেশ করে ঘরের মধ্যে।

দীপক দেখে সেখানা একখানা খামের চিঠি। খামের মুখটা ছিঁড়ে ফেলে দীপক চিঠিখানার মধ্যে মনঃসংযোগ করে।

বিচিত্র পত্র।

প্রিয় ডিটেকটিভ চ্যাটার্জী,

আমি বিশ্বস্তসূত্রে জানতে পারলাম যে আপনি মহিমপুরের কেসটার ব্যাপারে হাত দিয়েছেন। ভাল কথা। কিন্তু এ কেসটা সল্‌ভ করতে হলে এমন অনেক কিছু জানতে হবে যা আপনি হয়ত একেবারেই অবগত নন।

আমি মহিমপুরের রাজবাড়ির একজন মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। আমিই তাই আপনাকে জানাচ্ছি সে সব কথা।

মনোমোহন মুখার্জী বর্তমানে মহিমপুর স্টেটের স্বত্বাধিকারী। তিনিই স্বর্গত জমিদার রামমোহন মুখার্জীর একমাত্র পুত্র। অভিলাষ মুখার্জী রামমোহন মুখার্জীর খুল্লতাত ভ্রাতার পুত্র। অভিলাষ মুখার্জী ও মনোমোহন মুখার্জী তাই সহোদর ভাই নন।

সে কথা যাক্। স্বর্গত রামমোহন মুখার্জী তাঁর মৃত্যুর পূর্বে উইল করে রেখে যান যে তাঁর পুত্র মনোমোহন এই শর্তে স্টেটের মালিক হবে যে তার মৃত্যুর পর যদি কোনও পুত্রসন্তান থাকে তবে সেই হবে স্টেটের মালিক। আর তা না হয়ে মনোমোহনের যদি হয় কন্যাসন্তান তবে সেই কন্যা মাত্র অর্ধেক সম্পত্তির মালিক হবে। বাকী অর্ধেক পাবে খুল্লতাত ভ্রাতুষ্পুত্র আভিলাষ মুখার্জী।

আজ থেকে আঠার বছর আগে একটি রাতে মনোমোহন মুখার্জীর সত্যিই একটি পুত্রসন্তান হয়েছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় আঁতুড়ঘর থেকেই ঐ পুত্র চুরি যায়। আর তার পরিবর্তে সেখানে স্থান পেল একটি কন্যা। এইভাবে কে যে ওই সন্তান বদল করল সে কথা জানাতে পারছি না আপাততঃ। তবে এই পুত্রটি দীর্ঘদিন শ্রীরামপুরের একটি অনাথ আশ্রমে প্রতিপালিত হতে থাকে।

পাঁচ বছর—হ্যাঁ, মাত্র পাঁচটি বছর সেই পুত্র যে সেই অনাথ আশ্রমে ছিল এ সংবাদ আমি জানি। কিন্তু তারপর আশ্চর্যভাবে সেই শিশু সেখান থেকে অদৃশ্য হয়। আর তার নাম তখন পর্যন্ত ছিল মলয় মুখার্জী।

আমি আপনার সাহায্য চাইছি এই কারণে যে আপনি যদি সেই মলয় মুখার্জীর খোঁজ

আমাকে দিতে পারেন, তবে আমি উপযুক্ত পারিশ্রমিকে আপনাকে পুরস্কৃত করব। আর একটা কথা, সেই সঙ্গে মহিমপুর স্টেটের সমস্যারও সমাধান হবে অর্ধেকটা।

আপনি যদি এ কেস হাতে নিতে সম্মত হন, তাবে আজই রাতে আপনার ঘরে তিনবার পর পর আলো জ্বালবেন আর নেভাবেন। এ সংকেত পেলেই আমি বুঝব যে আপনি এ কেস গ্রহণ করতে সম্মত। আমি তবে অগ্রিম দু' হাজার টাকা আপনার 'ফিস' বাবদ পাঠাব। হ্যাঁ, বালকটির ডান কাঁধের ওপর একটি কালো জড়ুল চিহ্ন ছিল তার জন্মের সময়।

আমার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে পত্র শেষ করছি। ইতি—

অপরিচিত বন্ধু।

চিঠিখানা শেষ করে হো হো করে হেসে উঠে দীপক রতনের দিকে চেয়ে বলল—ভদ্রলোক কাজ করেছেন সত্যি পাকা। কিন্তু একটা স্থানে একটু কাঁচা কাজ করে ফেলেছেন।

—কি ব্যাপার রে? চিঠিখানা আগাগোড়া পড়ে শেষ করে রতন প্রশ্ন করে।

—তিনি যে মহিমপুর রাজপরিবারের শুধু হিতৈষী নন, তার সঙ্গে ওঁর যোগ যে অঙ্গাঙ্গী তা প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে। সে কথা যাক্, আমাদের আবার একটা মস্ত বড় খোরাক মিলল। দিনকতক কেসটা নিয়ে বেশ কাটবে। থ্রি চিয়ার্স্ ফর্ মহিমপুর!

—কিন্তু তুই কি আবার ওখানে যাবি নাকি?

—হ্যাঁ, এতবড় ইন্টারেস্টিং কেস যখন হাতে এসে পড়ল তখন অবশ্যই যেতে হবে। আর সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্যন্ত আরও যে কতবার যেতে হবে বা সেখানে থাকতে হবে তা কে জানে! তোকেও আজ যেতে হবে আমার সঙ্গে।

—আমিও যাব?

—নিশ্চয়ই। আমি যাব পেছনের দরজা দিয়ে, আর সাম্নে দিয়ে যাবি তুই।

—সে কি ব্যাপার রে?

—হ্যাঁ, আমি ছদ্মবেশের ব্যবস্থা করছি। কোথায় কিভাবে কাজ করব তা জানাব না। আর তোকে একটা ইন্ট্রোডাক্শন্ লেটার দিচ্ছি, সেটা নিয়ে তুই স্টেটে থাকবি প্রয়োজনমতো সাহায্য করবার জন্যে। বুঝেছিস্ ত?

—নিশ্চয়ই। বেশ তবে চল্ আজকেই মহিমপুরের দিকে যাত্রা করা যাক।

চার

—অভিনব স্বীকৃতি—

বেলা সাড়ে আটটা।

মহিমপুর স্টেটের মালিক মনোমোহন মুখার্জী তাঁর স্ত্রী হরমোহিনী দেবী ও কন্যা শীলাকে সঙ্গে নিয়ে দার্জিলিং থেকে ফিরে এসেছেন। অভিলাষের টেলিগ্রাম পেয়েই যে তিনি এত শীঘ্র দার্জিলিং ভ্রমণ শেষ করে ফিরে এসেছেন তা বোঝা যায়।

নায়েব বিলাস সামন্তের সঙ্গে তিনি বিগত ঘটনাগুলি নিয়েই আলোচনা করছিলেন এমন সময় একজন দোহারা চেহারার দীর্ঘদেহ লোক তাঁর ঘরের দরজায় এসে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলেন—মে আই কাম্ ইন্ স্যর?

—কে? ফিরে চাইলেন মনোমোহনবাবু।

—আমি। বলতে বলতে লোকটি ঘরের মধ্যে ঢুকে নমস্কার জানিয়ে আসন গ্রহণ করলেন। তারপর বললেন—বিশেষ কয়েকটি গোপনীয় কথা বলতে চাই আপনার সঙ্গে। তাই একটু নিরিবিলি হলে...

—কোত্থেকে এসেছেন আপনি?

—আমি সি. আই. ডি. ডিপার্টমেন্টের লোক। বিশেষ জরুরী দরকারেই আজ আপনাকে বিরক্ত করতে হচ্ছে মিঃ মুখার্জী...

মনোমোহন মুখার্জী এবার ভাল করে লোকটির দিকে চাইলেন। মুখের ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি আর লম্বা সুঁচোলো গোঁফ লোকটির সারা চেহারার মধ্যে কেমন যে একটা গাম্ভীর্য এনেছে। চোখে সান্ গগ্‌ল্‌স্। তার ফাঁক দিয়েও লোকটির তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এসে যেন গায়ে বিদ্ধ হয়। পরনে দামী স্যুট, মুখে টোব্যাকো পাইপ।

—আসুন, আপনি আমার প্রাইভেট চেম্বারে বসে কথা বলবেন। বললেন মনোমোহনবাবু।

—বেশ চলুন।

দুজনে উঠে গিয়ে ঘরের কোণের দিকের দরজা দিয়ে পাশের প্রাইভেট চেম্বারের দিকে গেলেন।

মনোমোহন মুখার্জী বললেন—বলুন এবার আপনার যা কিছু বলবার আছে। আমি মনোযোগ দিয়ে শুনছি।

লোকটি মৃদু হাসলেন। ধারাল, তীক্ষ্ণ, বিচিত্র একধরণের হাসি।

সারা ঘরের মধ্যে কেমন যেন একটা রহস্যময় স্বপ্নালু পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল। দরজা বন্ধ। কেবল বাঁ দিকের জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে, দূরের একটা দেবদারু গাছের পাতায় এলোমেলো বাতাসের হাল্‌কা খেলা।

—শুনুন, লোকটির স্বর যেন গাম্ভীর্যের প্রখরতায় থম্‌থম্ করতে থাকে।—মনে করুন আজ থেকে আঠারো বছর আগেকার একটি রাতের কাহিনী। সুদীর্ঘ আঠারোটি বছর আপনার মনকে পেছিয়ে দিন!

মনোমোহন মুখার্জী একটু চমকে ওঠেন। তারপর অনেক কষ্টে নিজেকে সংবরণ করে বলেন—এ আপনি কি বলছেন?

—বাধা দেবেন না। আপনি জানেন, আমি এমন একটা বিভাগে চাকরী করি যাদের অসাধ্য কাজ পৃথিবীতে কিছু নেই। তাই না? হ্যাঁ, শুনুন। আমি জানি আপনার অষ্টাদশী কন্যা শীলা আপনার মেয়ে নয়। আসলে আপনার সে পুত্রসন্তান কোথায় তা আমি জানি না। অবশ্য খুঁজলে হয়ত বের করতে পারব। কিন্তু কে বা কারা আপনার পুত্রের বদলে ওই কন্যাকে এখানে রেখে যায় তাও হয়ত আমরা জানি। কিন্তু সে তথ্যে প্রয়োজন নেই। আমি জানতে চাই আপনার সে পুত্র এখন কোথায়?

—থামুন! চুপ করুন! মনোমোহন মুখার্জী মনোবল হারিয়ে যেন ভেঙে পড়েন।—জানি না। যদি তাকে খুঁজে এনে দিতে পারেন আমি ও আমার স্ত্রী আজীবন আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকব।

—কিন্তু তার সম্বন্ধে কতদূর জানেন?

—জানি পাঁচ বছর সে ছিল একটি অনাথ আশ্রমে। শ্রীরামপুরের একটি অনাথ আশ্রমে। কিন্তু তারপর আমি জানি না। জানি না কেউ তাকে অপহরণ করে কোথাও নিয়ে গেছে কি না।

—কবে সে কথা জানলেন?

—সেই ছেলেটি অনাথ আশ্রম থেকে অপহৃত হবার অনেক—অ-নে-ক পরে।

—বুঝেছি। অনাথ আশ্রমে তার কি নাম ছিল?

—মলয় মুখার্জী নামে তাকে ভর্তি করা হয়েছিল।

—কিন্তু সে অপহৃত হবার পর তার সম্বন্ধে আর কোনও খবর জানবার চেষ্টা করেননি কেন? খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিলেও হয়ত সুবিধে হতো।

—দুটো কারণে। প্রথমটা, যদি সে বেঁচে থাকে তবে বিজ্ঞাপন দিলে তার জীবনের উপরে বিপদ ঘনিয়ে আসবে। আর দ্বিতীয়, আমার ভাই ও মেয়ে এরা জানতে পারবে।

—বুঝেছি। ভদ্রলোক একটু চিন্তা করে বললেন—বেশ, আমার যা জানবার তা জানা হয়ে গেছে। এর বেশি জিজ্ঞাসা করলে হয়ত পারিবারিক কোনও 'সিক্রেসী' ভাঙতে রাজি হবেন না আপনি—তাই আর কিছু জিজ্ঞাসা করব না আপাততঃ।

—আপনি যদি তার কোনও সন্ধান পান, দয়া করে আমাদের জানালে আমরা আপনাকে যথাসাধ্য পুরস্কৃত করব।

—কিন্তু, ভদ্রলোক স্বরটা গম্ভীর করে বলেন—ওই দরজার 'কী হোলে'র ফাঁক দিয়ে একফালি রোদ্দুর আসতে আসতে হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল কেন? লক্ষণ ভাল নয়।

পকেট থেকে একটা অটোমেটিক রিভলভার বের কবে ভদ্রলোক এগিয়ে গেলেন দরজার দিকে।

কিন্তু তার আগেই বারান্দায় পদশব্দ শোনা গেল।

দরজা খুলে দেখা গেল বারান্দায় কেউ নেই। আড়ি পেতে যে কথা শোনবার চেষ্টা করছিল সে দ্রুত অদৃশ্য হয়েছে।

সেদিনই বিকেলে একজন লোক একটা চিঠি নিয়ে দেখা করল মনোমোহন মুখার্জীর সঙ্গে। চিঠিটা পড়ে তিনি দেখলেন সেটা প্রখ্যাত ডিটেকটিভ দীপক চ্যাটার্জীর লেখা। মহিমপুর স্টেটের রাজবাড়িতে তার সহকারী রতনলাল কিছুদিন গোপনে থাকতে চায় মৃতা বিন্দুবাসিনীর হত্যার ব্যাপারে তদন্ত করবার জন্যে।

মনোমোহন মুখার্জী রতনলালের থাকবার সুব্যবস্থা করে দিলেন।

পাঁচ

—একটি ছেলের কথা—

বিডন স্ট্রীটের ওপর রায় সাহেব বিজয়প্রসাদ চৌধুরীর বিরাট বাড়িখানা। তিনি অপুত্রক। একটি মাত্র বিধবা কন্যা মায়া আর তার আঠারো বছরের ছেলে অজয়—এই নিয়ে তাঁর সংসার।

অজয়ই তাঁদের জীবনের একমাত্র অবলম্বন। অজয়কে ঘিরেই মায়া আর রায় সাহেবের জীবনের যতো কিছু স্বপ্ন। যতো কিছু কল্পনা। তাঁরা তাকে তাই নিজের ইচ্ছেমতোই বেড়ে ওঠবার অবকাশ দিয়েছেন।

অজয় স্কটিশ চার্চ কলেজে বি. এ. পড়ে। বরাবরই সে তীক্ষ্ণধী ও মেধাবী। কোনওদিনই সে পরীক্ষায় উঁচু আসন দখল না করে ছাড়ে না।

কিন্তু এটুকুই সব নয়।

বিচিত্র এক ধাতুতে তৈরী অজয়ের মন। দিনরাত চুপ করে বসে থাকতে ভালবাসে। দিবারাত্র সে কি যেন ভাবে। তার জীবনের কোথাও যেন একটা মস্ত বড় ব্যথা লুকানো আছে।

কিন্তু কি সে ব্যথা?

তা কেউই জানে না। এমন কি অজয় নিজেও বোধ হয় ভাল করে জানে না সে ব্যথার উৎস।

মায়া ছেলেকে প্রাণের চেয়েও ভালবাসে। প্রতিটি মুহূর্ত সে যাপন করে ছেলের মুখে কি করে একটুকরো হাসি ফুটিয়ে তোলা যায় এই চিন্তায়। রায় সাহেবও অজয়কে প্রাণের চেয়ে ভালবাসেন।

কিন্তু অদ্ভুত ছেলে অজয়। পৃথিবীর কোনও ভোগসুখের দিকে তার সামান্যমাত্র আকর্ষণ নেই। দামী জামা সে গায়ে দেয় না। দামী কাপড় বা দামী জুতোগুলোকে উপেক্ষা করে সাধারণ পোষাক পরে থাকতে ভালবাসে। অতি সাদাসিধে খাবারের দিকেই তার আকর্ষণ।

আর কথা বলে অত্যন্ত কম।

দিবারাত্র যেন কিসের চিন্তায় সে তন্ময়। সে বিভোর। তার মন যেন কোন্ সুদূরের ইশারায় তাকে ডাক দেয়। মন যেন চায় ছুটে যেতে কোন্ অনন্তের দিকে।

মায়া হয়ত অজয়ের সেই তন্ময়-মুহূর্তে তার সাম্‌নে এসে প্রশ্ন করে—হ্যাঁরে, তুই দিনরাত এম্‌নি করে কি ভাবিস্ বল্ ত?

ম্লান হেসে অজয় বলে—কিছু না। তুমি কেন যে এমন করে এই অপ্রাপ্য স্নেহ দিয়ে আমাকে ভরিয়ে তুলতে চাও জানি না মা!

—সে কি কথা রে? বিস্মিত মায়া প্রশ্ন করে।

—আমি সব জানি মা!

—সব জানিস্ মানে?

—জানি, দাদু কিভাবে তিল তিল করে অসহ্য পরিশ্রম করে সঞ্চয় করেছেন এই সব সম্পদ।

—তাতে তোর দুঃখ কি?

—দুঃখ এই যে তাঁর এত কষ্টে সঞ্চিত সম্পত্তি আমি তুচ্ছ বিলাসব্যসনে নষ্ট করতে পারব না।

—এ তুই কি বলছিস্ অজয়?

—ঠিকই বলছি মা। আমি চাই নিজের পায়ে দাঁড়াতে। নিজের চেষ্টায় আমি যা করব তার ওপরেই আমার সত্যিকারের অধিকার। আমার সত্যিকারের দাবী।

—এ সব বড় বড় কথা তোর মাথায় কে ঢোকাল বল্ ত!

—কেউ ঢোকায়নি মা। আমি নিজেই এ সব ভাবি। জীবনের প্রতি আমার যেন এক অন্য দৃষ্টি। আমি চাই নিজের চেষ্টায় জীবনে মস্ত বড় হতে। দেশবিদেশে আমার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়বে। আমি দেশবিদেশ ভ্রমণ করে করে অজস্র সুখ্যাতি বহন করে দেশে ফিরব! বাংলার মুখ উজ্জ্বল হবে আমার জন্যে!

—আর আমি বুঝি তোর কেউ নই? দরদভরা কণ্ঠে মায়া প্রশ্ন করে ছেলের দিকে তাকিয়ে।

—তুমি আমার আদরের মা-মণি। বিগলিত হেসে অজয় বলে—তাই ত তোমাকেও ভুলতে পারি না কিছুতেই।

এমন সময় হয়ত ঘরের মধ্যে প্রবেশ করেন রায় সাহেব। প্রশ্ন করেন—কি যুক্তি হচ্ছে তোমাদের মা-ছেলেতে?

—কিছু না। মায়া হাসতে হাসতে বলে—ও বলছে ও নাকি দাদুর এত কষ্টে জমানো টাকা বাবুগিরি করে খরচ করতে পারবে না। ও বলছে, ও নাকি জীবনে অনেক বড় হবে নিজের চেষ্টায়।

—তা যদি হতে পার দাদু, তবে আমার চেয়ে বেশি সুখী আর কেউ হবে না। আমি তোমাকে হৃদয়ের আন্তরিক আশীর্বাদ জানাচ্ছি। তোমার মত ছেলে বাংলার প্রতিটি ঘরে জন্মালে দেশমাতা ধন্যা হতেন। দেশ হতো আরো অনেক উন্নত। মহান্। প্রগতিশীল।

অজয়ের মুখে ফুটে ওঠে উজ্জ্বল হাসির ঝলক।

ছয়

—ছায়ামূর্তির কায়া—

রাত তখন বোধ হয় সাড়ে নটার কিছু বেশি।

মহিমপুর স্টেটের রাজবাড়ির পেছনে এই সময় একজন লোককে দেখা গেল শঙ্কিতভাবে পথ চলতে। তার সারা দেহ কালো রঙের পোষাকে ঢাকা। মুখে কালো কাপড়ের আবরণ।

ভালভাবে চারদিকে তাকিয়ে দেখে নিয়ে লোকটি রাজবাড়ির মধ্যে প্রবেশ করবার জন্যে পেছনের সুউচ্চ প্রাচীরটা পার হবার চেষ্টা করতে লাগল।

কিন্তু অনেক চেষ্টাতেও সে প্রাচীরের ওপর আরোহণ করতে পারল না।

ছায়ামূর্তি ফিরে চলল। প্রাচীর আরোহণ যে তার সাধ্যের বাইরে এটা বুঝতে তার কষ্ট হলো না। তার কারণ সুউচ্চ প্রাচীরের মাথার ওপর অসংখ্য ভাঙা কাঁচ সিমেন্টের সঙ্গে আটকানো আছে। যে কেউ ওখান দিয়ে উঠতে গেলে তাকেই ক্ষতবিক্ষত হতে হবে।

ছায়ামূর্তি বাধ্য হয়ে পাশের দোতলার বারান্দার নিচে এসে দাঁড়াল।

বারান্দাটার ধারে লাগানো লোহার রেলিং। ছায়ামূর্তি পকেট থেকে কতকগুলি 'হুক্' লাগানো সিল্কের কর্ড বের করে সেই রেলিং লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দিল।

একটা শব্দ। দুটো হুক্ বারান্দার রেলিং-এর সঙ্গে আটকে গেছে বোঝা গেল।

ছায়ামূর্তি আর কালবিলম্ব করল না। চারদিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখল কেউ তার গতিবিধি লক্ষ্য করছে কিনা। না, কেউ নেই। ছায়ামূর্তি দড়িতে ভর দিয়ে উঠে পড়ল। ঝুলতে ঝুলতে সে দোতলায় উঠে পড়ে রেলিংটা ধরে ফেলল।

এক মিনিট।

ছায়ামূর্তি এক মিনিট অপেক্ষা করে বুঝল চারধারে কেউ কোথাও নেই।

ধীরপদে ছায়ামূর্তি বারান্দা ধরে সোজা এগিয়ে চলল। দুখানা ঘর পেরিয়ে তৃতীয় ঘরের সামনে এসে ছায়ামূর্তি একটু থামল। এ ঘরখানাই হচ্ছে মনোমোহন মুখার্জীর। ছায়ামূর্তি দেখল

বাইরে থেকে দরজায় তালা ঝোলানো।

পকেট থেকে একটা চাবি বের করে সে তালাটাতে লাগিয়ে সেটা খুলে ফেলল। তা থেকে বোঝা যায় এই তালার উপযুক্ত চাবি সে আগেই সংগ্রহ করে এনেছিল। এ ঘরে কি ধরণের তালা লাগানো থাকে সে কথাও তার জানা।

ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে মিনিটখানেক একটা সেফের সামনে দাঁড়িয়ে কি যেন কতকগুলি জিনিসপত্র নিয়ে নাড়াচাড়া করল সে। তারপর যখন বাইরে বেরিয়ে এল, তখন দেখা গেল তার হাতে অনেকগুলি কাগজপত্র ধরা রয়েছে।

দ্রুত তালা বন্ধ করে সে এগোতে যাবে, এমন সময় হঠাৎ পেছন থেকে কে যেন সজোরে তার মাথায় আঘাত করল।

অস্ফুট শব্দ।

ছায়ামূর্তি জ্ঞান হারিয়ে সেখানেই লুটিয়ে পড়ল।

জমিদার মনোমোহন মুখার্জী চিন্তিতমনে স্টেটের গেস্ট হাউসের একটা ঘরের দিকে তখন গিয়েছিলেন কি একটা কারণে। এই ঘরখানাই তিনি রতনলালকে থাকবার জন্যে দিয়েছিলেন। ডিটেকটিভ দীপক চ্যাটার্জীর সহকারী রতনলাল যে এই বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল তা আগেই বলা হয়েছে।

কিন্তু আশ্চর্য!

রতনলালের ঘরখানা তালাবন্ধ।

মনোমোহন মুখার্জী আশ্চর্য হয়ে ভাবতে থাকেন, লোকটা গেল কোথায়? এত রাতে এভাবে অদৃশ্য হওয়া সত্যিই আশ্চর্যজনক বৈকি! লোকটা কোনও বিপদে পড়ল না ত?

চিন্তিতমনে বারকয়েক পদচারণা করে তিনি আবার নিজের ঘরের দিকে ফেরবার উদ্যোগ করেন।

মিনিট দুয়েকের মধ্যেই ছায়ামূর্তির জ্ঞান ফিরে এলো।

সে উঠে বসল। মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা।

কে হঠাৎ পেছন থেকে এভাবে আঘাত করল? আশ্চর্য ত!

ছায়ামূর্তি চারপাশে তাকাল তার হাতের কাগজপত্রগুলি খুঁজে দেখবার জন্যে। কিন্তু সেগুলির কোনও নিদর্শন পেল না সে। সমস্ত কাগজপত্র যেন ভোজবাজীর মতো আশ্চর্যভাবে অদৃশ্য হয়েছে।

এবার একটা কথা ছায়ামূর্তির মাথার মধ্য দিয়ে পাক খেয়ে গেল।

তবে কি অন্য কেউ কাগজপত্রগুলি নিয়ে যাবার চেষ্টাতে এদিকে আসছিল? তারপর তাকে দেখে সে আড়ালে অপেক্ষা করতে থাকে। অবশেষে সে যখন সেগুলি নিয়ে চলে যাবার চেষ্টা করছিল, তখন তাকে অজ্ঞান করে সেগুলি নিয়ে প্রস্থান করেছে।

তার চিন্তা বোধ হয় অমূলক নয়।

ছায়ামূর্তি উঠে দাঁড়াল। ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল সে।

সিঁড়িতে পদশব্দ শোনা যাচ্ছে।

ছায়ামূর্তি দ্রুত অদৃশ্য হলো।

সাত

—পুরোনো দিনের কথা—

দীর্ঘদিন আগের কথা।

বর্তমান পাতা থেকে আঠারো বছর আগের একটি রাতে টেনে নিয়ে যাচ্ছি পাঠকের মনকে।

দ্রুতপদে নিজের ঘরের মধ্যে পায়চারী করছিলেন জমিদার মনোমোহন মুখার্জী।

সারা মনে চিন্তার আলোড়ন। মুখের প্রতিটি রেখায় ফুটে উঠেছে উদ্বেগ আর দুশ্চিন্তা। কি একটা খবরের জন্যে তিনি ব্যাকুলভাবে প্রতীক্ষা করছেন।

রাত সাড়ে বারোটা।

প্রতিটি মুহূর্ত অসহ্য বলে মনে হচ্ছে মনোমোহনবাবুর কাছে। বার বার তিনি দরজার দিকে তাকাচ্ছেন।

তাঁর এই দুশ্চিন্তা হচ্ছে তাঁর ভাবী বংশধরকে কেন্দ্র করে। অথচ তিনি এতদিন এ দুশ্চিন্তা মোটেই করেননি।

দীর্ঘদিন তাঁর স্ত্রী হরমোহিনী দেবীর সন্তান হবার কোনও আশাই ছিল না। ছেলে হবার বয়স পেরিয়ে গিয়েও যখন ছেলে হলো না, তখন তিনি বুঝলেন, পুত্রভাগ্য তাঁর নেই। কিন্তু এত বড় বিশাল সম্পত্তির অধিকারী হবে কে?

এই চিন্তায় তাঁর দিনের অধিকাংশ সময় কাটত। তবে আপন ভাই না হলেও অভিলাষকে তিনি ভ্রাতৃবৎ স্নেহে পালন করেছিলেন। তাই তাঁর অন্য আশা ছিল অভিলাষকেই তিনি সমস্ত সম্পত্তি দিয়ে যাবেন। কেউ জিজ্ঞাসা করলেও তিনি বলতেন ওই কথাই। বলতেন—ও আমার নিজের ভাইয়ের মতোই । তাই ওকে আমি সবকিছু দিয়ে যাব বলে স্থির করেছি।

কিন্তু তবু কেমন যেন একটা অন্তর্দ্বন্দ্ব বাসা বাঁধে তার মনের মধ্যে! দিনের পর দিন কুসংসর্গে মিশে অভিলাষ কেমন যেন পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে। আজকাল তাঁর সঙ্গে মেশা ত দূরের কথা ভালভাবে দুটো কথা বলবার অবকাশও পান না তিনি। বছরের মধ্যে ছ' মাস তার কাটে কোল্‌কাতার বড় বড় হোটেলে। অখাদ্য ভক্ষণ আর অনাচার ওর জীবনের প্রধান সঙ্গী।

তা ছাড়া আর একটা কারণেও অভিলাষের ওপর তাঁর মন কিছুটা বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে। সেবার কি একটা মোকর্দমার তদারক করবার জন্যে তিনি তাকে কোল্‌কাতায় পাঠালেন। সঙ্গে দিলেন দু' হাজার টাকা মামলা খরচ।

কিন্তু সাত দিন পরে মুখ চুন করে অভিলাষ ফিরে এলো। খবর নিয়ে তিনি জানতে পারলেন যে অভিলাষ সেই টাকা নিয়ে উকীলের কাছে না গিয়ে রেসের মাঠে সব টাকা হেরে আসে। কাজেই তদারকের অভাবে সে মামলায় তাঁর হার হয়েছে।

এইভাবে ধীরে ধীরে ভাইয়ের প্রতি ভালবাসা ও আকর্ষণ তাঁর কমে আসছিল এম্‌নি সময়ে তাঁর স্ত্রী হলেন অন্তঃসত্ত্বা।

খবরটা সারা স্টেটের সমস্ত লোকজনকে আনন্দিত করে তুলল। কিন্তু আনন্দিত হলো না মাত্র কয়েকজন লোক। সেই কয়েকজনের মধ্যে হচ্ছে অভিলাষ আর তার বন্ধুরা।

সকলেই আশা করেছিল হরমোহিনী দেবীর ছেলে হবে। কিন্তু অভিলাষ কেবল লোকের কাছে বলে বেড়ায়—ছেলে হবে না ছাই! দেখো ওর নিশ্চয়ই মেয়ে হবে।

অভিলাষ জানত, মেয়ে হলে অর্ধেক সম্পত্তি উইল অনুযায়ী তার প্রাপ্য। আর তা না হলে সে সম্পূর্ণ সম্পত্তি থেকেই বঞ্চিত হবে।

আজ সেই বহু-আকাঙ্ক্ষিত রাত্রি। তাই চিন্তিত মন নিয়ে প্রহর গুণছেন জমিদার মনোমোহন মুখার্জী।

এমন সময়ে অন্তঃপুরে সোরগোল উঠল।

আঁতুড়ঘরে ছিল তাঁর পুরোনো আমলের ঝি বিন্দুবাসিনী। সেই-ই আঁতুড়ঘরের তদারক করছিল। মনোমোহনবাবু ছুটলেন তার কাছ থেকে খবরটা আনতে।

কিন্তু তাঁকে বেশিদূর যেতে হলো না। মাঝপথে দেখা হলো অভিলাষের সঙ্গে।

—কি খবর রে? তিনি জিজ্ঞাসা করেন—কি, ছেলে হয়েছে?

—মেয়ে হয়েছে দাদা। চমৎকার সুন্দর মেয়ে। আনন্দিত স্বরে অভিলাষ বলে।

কোনও উত্তর না দিয়ে মনোমোহনবাবু ফিরে চলেন।

আরও দু'ঘণ্টা পরে।

রাত তখন তিনটে। আঁতুড়ঘরে হরমোহিনী দেবী ঘুমিয়ে পড়েছেন। কেবল জেগে রয়েছে পুরোনো আমলের ঝি বিন্দুবাসিনী। জমিদারবাড়ির ধাত্রী মোটা টাকা পুরস্কার নিয়ে প্রস্থান করেছে।

জানালা দিয়ে আসছে মৃদুমন্দ বাতাস। প্রদীপের শিখা কাঁপছে মৃদু বাতাসের ছোঁয়ায়।

দরজায় মৃদু টোকা পড়ে। একবার, দু'বার, তিনবার।

—কে বিন্দুবাসিনী উঠে দরজার সাম্‌নে এগিয়ে যায়।

—আমি। দরজা খোলো।

বিন্দুবাসিনী দরজা খোলে। দরজায় দাঁড়িয়ে একটি ছায়ামূর্তি। হাতে তার সদ্যোজাত একটি মেয়ে।

—একে রেখে, ওকে ওখান থেকে এনে দাও। লোকটি দৃঢ়কণ্ঠে হুকুম করে।

বিন্দুবাসিনী বিনা বাক্যব্যয়ে সে হুকুম তামিল করে।

মেয়েটিকে দেখে সদ্যোজাত ছেলেটিকে নিয়ে ছায়ামূর্তি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়।

বিন্দুবাসিনী একবার দীর্ঘশ্বাস ফেলে শুধু।

হরমোহিনী দেবী এ সব ঘটনার বিন্দুমাত্রও জানতে পারেন না।

তারপরে সময়ের পাতা উল্টে চলে।

ছোট মেয়েটি ধীরে ধীরে বড় হয়ে ওঠে। অভিলাষ অনেক আদর করে ভাইঝির নাম রাখে শীলা।

অপূর্ব সুন্দরী মেয়েটি। জমিদারবাড়ির সকলেই তাকে অসীম আদরযত্নে মানুষ করে। সকলের নয়নের মণি শীলা।

শীলা বেড়ে ওঠে। স্কুলে ভর্তি হয়। প্রতিবছর ভাল রেজাল্ট করে সে।

স্কুল থেকে কলেজ। শীলা এখন বি. এ. পড়ে। কলেজে তার যথেষ্ট সুনাম। অধ্যাপকেরাও তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

শীলার এত প্রশংসা অবশ্য শুধু তার ভাল মেধার জন্যেই নয়। অত্যন্ত সুন্দর মিষ্টি এবং নম্র তার ব্যবহার। যে একবার তার সঙ্গে মেশে সে আজীবন আর তার কথা ভুলতে পারে না।

মনোমোহনবাবু ও হরমোহিনী দেবী শীলাকে যথেষ্ট স্নেহযত্ন করেন। শীলাও বাবা-মা বলতে অজ্ঞান।

আট

—বিজ্ঞাপনের জের—

শ্যামবাজারের মোহনলাল স্ট্রীটের ওপর একটা মেসবাড়ি। খালের কাছাকাছি যেখানে মোহনলাল স্ট্রীট এসে ক্যানাল ঈস্ট রোডের সঙ্গে মিশেছে ঠিক সেইখানেই মেসবাড়িটা।

হরেক রকম লোক বাস করে এখানে। মেডিক্যাল স্টুডেণ্ট, পাটের দালাল আর চাকুরে থেকে আরম্ভ করে বেকার নিষ্কর্মা পর্যন্ত কোনও ধরণের লোকই বাদ নেই।

দু-একটা ভদ্রবেশী গুণ্ডাপ্রকৃতির লোকও আশ্রয় নিয়েছে এই মেসবাড়িতে তাদের ভদ্রবেশের সুযোগ নিয়ে। তারা বেশির ভাগ সময়েই মেসে থাকে না। মাঝেমাঝে পুলিশ থেকে লোক এসে তাদের সম্বন্ধে খোঁজ-খবর নিয়ে যায়, এ ঘটনাও মেসের সকলের জানা আছে।

এই মেসের চারতলার একটি ঘরে কথা হচ্ছিল দুজন লোকের মধ্যে। এদের দুজনের সম্বন্ধে মেসের কোনও মেম্বারই ভাল ধারণা পোষণ করে না। একজনের নাম প্রফুল্ল কুণ্ডু আর একজন শিবপ্রসাদ ব্যানার্জী। মেসের সকলে এদের প্রফুল্ল আর শিবু বলে ডাকে।

এরা কোনও অফিসেই কাজকর্ম করে না। কোনও ব্যবসা-বাণিজ্যও নয়। অথচ মাসের শেষে নিয়মিতভাবে তারা মেসের পাওনা টাকা মিটিয়ে দেয়। মেসের সকলেই তাই এদের সম্বন্ধে কেমন যেন সন্দেহ পোষণ করে।

শিবু চারতলার ঘরটিতে প্রফুল্লর সঙ্গে থাকে। ছোট চিলেকুঠরীতে এরা দুজনে আছে আজ প্রায় ছ' বছর। অন্য মেম্বাররা ঘর পাল্টালেও ওরা দুজন দীর্ঘদিন এই একই ঘরে আছে।

বেলা সাড়ে আটটা কি নটা হবে। অন্য সকলে আপন আপন কর্মস্থলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করবার জন্যে ব্যস্ত।

কিন্তু শিবুকে দেখা গেল নিশ্চিন্তমনে খবরের কাগজ পড়তে। প্রফুল্ল শিবুর এই ধরণের নির্লিপ্ততার জন্যে বিরক্ত হয়ে ওঠে। বলে—কিরে, এত মনোযোগ দিয়ে কি পড়ছিস্ বল ত? তুই কি খবরের কাগজ পড়ে রাতারাতি রাজনীতিজ্ঞ হয়ে উঠতে চাস্ নাকি?

—না রে না।

—তবে?

—খবরের কাগজেই একটা কাজের খবর পেয়ে গেছি।

—কাজ? মানে কর্মখালি? তুই চাকরী করবি একথাও কি আমাকে বিশ্বাস করতে হবে শিবু?

—আরে চাকরী নয়!

—চাকরী নয় ত কি? খবরের কাগজে কি আর চুরি-ডাকাতির খবর লেখা থাকে নাকি?

—না রে না। এর মধ্যে একটা বিরাট দাঁওয়ের খবর লেখা আছে। যদি ঠিকমতো খেলিয়ে তুলতে পারা যায়...

—দাঁওয়ের খবর? প্রফুল্ল নড়েচড়ে বসে।

প্রফুল্লর দৃষ্টি খবরের কাগজের একটা নির্দিষ্ট অংশের দিকে আকৃষ্ট করে শিবু বলল—বুঝেছিস্ প্রফুল্ল, এই দাঁওটা মারতে পারলে বেশ মোটা টাকা হবে যা হোক্!

—মোটা দাঁও? কোথায় রে? উদ্‌গ্রীব হয়ে প্রফুল্ল ঝুঁকে পড়ল খবরের কাগজের ওপর।

—এই দেখ্! আমাদের জেলেপাড়ার পঞ্চাটাকে এখানে ভিড়িয়ে দিতে পারলে ঠিক মিলে যাবে। ওরই অম্‌নি একটা চিহ্ন আছে। আর বয়সও ত সতেরো-আঠারো হলো। কি বল্?

প্রফুল্ল খবরের কাগজটা পড়তে সুরু করল। তাতে ছাপা হয়েছিল একটা বিজ্ঞাপন।

হারানো-প্রাপ্তি-নিরুদ্দেশ

আজ থেকে তেরো বছর আগে একটি ছেলে অপহৃত হয়। বয়স তার তখন মাত্র পাঁচ বছর। বিরাট এক জমিদারবংশের ছেলে হয়েও সে তাই সমস্ত সম্পদ থেকে বঞ্চিত হলো।

দুর্ভাগ্যক্রমে ছেলেটি প্রতিপালিত হচ্ছিল শ্রীরামপুরের একটি অনাথ আশ্রমে। সেখান থেকে অপহৃত হয়েছিল সে। কে বা কারা যে তাকে এভাবে অপহরণ করেছিল তা আমরা জানি না।

অপহৃত হবার পূর্ব পর্যন্ত শ্রীরামপুর অনাথ আশ্রমের কর্তৃপক্ষ কোনও এক অজ্ঞাত স্থান থেকে মোটা টাকা পেয়ে আসছিলেন ছেলেটিকে মানুষ করবার জন্যে। কিন্তু কে যে এই টাকা পাঠাচ্ছিল তাও রহস্যাবৃত। তবে শ্রীরামপুর অনাথ আশ্রমে খোঁজ নিয়ে জানা গেল সেখানে তার নাম ছিল মলয় মুখার্জী। আর সে যে কি ভাবে অদৃশ্য হলো শ্রীরামপুর অনাথ আশ্রম কর্তৃপক্ষ তাও বলতে পারেন না।

ছেলেটির বিশেষ চিহ্ন হচ্ছে, তার ডান কাঁধের ওপরে ছিল একটি কালো জড়ুলচিহ্ন।

যে কেউ ছেলেটির খোঁজ এনে দিতে পারবেন আমরা তাঁকেই প্রচুর পুরস্কারে পুরস্কৃত করব। পুরস্কারের অঙ্ক পাঁচশো টাকা বা তার অনেক বেশি হবে। আমাদের নিশ্চিত ধারণা ছেলেটি আজও বেঁচে আছে।

ছেলেটির পিতামাতা তাঁর কাছে আজীবন কৃতজ্ঞ থাকবেন। আর ছেলেটিও তার হৃত পিতৃসম্পত্তি ফিরে পেয়ে মনের সুখে দিন কাটাতে পারবে।

সত্বর সংবাদদানে সুখী করুন। ইতি—

আর. বোস
১৩ নং চক্রবেড়িয়া রোড,
ভবানীপুর

—কিরে, আমাদের জেলেপাড়ার পকেটমার ছোঁড়াটার সঙ্গে এর চেহারার মিল পাওয়া যাচ্ছে না? শিবু বলে প্রফুল্লর দিকে চেয়ে।

—হ্যাঁ, তারও জড়ুলচিহ্ন একটা আছে বটে। আর তা ওই ডান কাঁধের ওপরেই।

—তবে আর ভাবনা কি! চল্ যাত্রা করা যাক্। পঞ্চার চেহারাও খুব খারাপ নয়। কোনও গবেট জমিদারের ছেলে বলে বেশ মানিয়ে যাবে নিশ্চয়ই!

—তা ত যাবে। কিন্তু—প্রফুল্ল যেন খুঁৎ খুঁৎ করে।

—অত ভাবছিস কি রে? শিবু বলে—পাঁচশো টাকা ত পাবই, তা ছাড়াও পঞ্চাকে ভাঙিয়ে মাঝে মাঝেই দু-পাঁচশো মিলবে। আর ও যদি সত্যি জমিদার হয়ে বসতে পারে, তবে আমরা এ মেস ছেড়ে একেবারে 'গ্র্যাণ্ডে' গিয়ে উঠব।

—অতটুকু ভেবেই প্রফুল্ল কুণ্ডুর কাজ চলে না। তার মাথা আরও পাকা, বুঝেছিস্ শিবু?

—তা পাকা মাথায় কি ভাবছিস্ শুনি?

—ভাবছি এই বিজ্ঞাপনদাতার কথা। যে লোক বিজ্ঞাপন দিয়েছে তার সম্বন্ধেই এতটা চিন্তিত হচ্ছি আমি! এ আর. বোস আর কেউ নয়, এ হচ্ছে রতনলাল বোস।

—কোন্ রতনলাল বোস্?

—ডিটেকটিভ দীপক চ্যাটার্জীর নাম শুনেছিস? বড় বড় জাঁদরেল ক্রিমিন্যালদের যে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরায়?

—শুনেছি মানে? আমাদের মতো মহাত্মা লোক যদি তার নাম না শোনে ত শুনবে কে?

—রতনলাল হচ্ছে তারই সহকর্মী। ওই একই বাড়িতে থাকে। ওই ঠিকানা থেকে সন্ধান পেলাম যে এর মধ্যে রয়েছে গভীর একটা রহস্যজনক ব্যাপার।

—তা থাক, তাই বলে এ দাঁও ত ছাড়া যাবে না। আপাততঃ টাকার বড়ই অভাব যাচ্ছে। এ মাসের 'সিট্রেণ্ট' এখনও দেওয়া হয়নি। মেসের টাকা ত দূরের কথা! কাজেই সত্বর ব্যবস্থা করা অবশ্যই প্রয়োজন।

—চল্, দেখি যদি পঞ্চা ছোঁড়াটাকে ম্যানেজ করতে পারি, তবে এ যাত্রা 'ম্যানিপুলেশন' চলবে। তবে খুব সাবধানে কাজ করতে হবে বন্ধু। ঠাঁই বড় শক্ত এ কথা ভুলে যেও না।

নয়

—আশ্রমের এক রাত—

সুদীর্ঘ তের বছর আগেকার একটি কথা।

শ্রীরামপুরের পুরসুন্দরী আশ্রমে আশ্রয় নিয়েছিল একটি ছেলে। সকলে জানত তার নাম মলয় মুখার্জী।

তার সাহায্যের জন্যে আশ্রমের কর্তৃপক্ষের কাছে কে যেন কোনও একটা অজ্ঞাত স্থান থেকে প্রতিমাসে দুশো করে টাকা পাঠাত।

আশ্রমের কর্তৃপক্ষের প্রতি অনুরোধ করা হয়েছিল, এই ছেলেটির প্রতি যেন বিশেষভাবে নজর রাখা হয়। আশ্রমের যিনি প্রতিষ্ঠাতা তিনিও আশ্রমের পরিচালককে সে বিষয়ে বিশেষ নির্দেশ দিয়েছিলেন।

কিন্তু আশ্রমের পরিচালক জানত, অনামা, অচেনা ছেলে ছাড়া কোনও বড় ঘরের ছেলে

এখানে থাকে না। যদি নেহাৎ কেউ দয়াপরবশ হয়ে টাকা পাঠায়, তবে সে টাকা কি সূত্রে ব্যয় হয় সে খবর কোন দিন কেউ জিজ্ঞাসা করবে না।

ছেলেটির জন্যে পরিচালক তাই এমন কোনও বিশেষ ব্যবস্থা করেনি। সে দুশো টাকার অধিকাংশই আত্মসাৎ করত। কেবল সামান্য একটু খাবার সুব্যবস্থা করেছিল, এই মাত্র।

মনের দুঃখে ছেলেটির দিন কাটত। তবে সে সব দুঃখ সে তেমন কিছু অনুভব করতে পারত না। অনুভব করবার মতো বয়সও তখন তার হয়নি।

সেদিন রাত বারোটা।

অন্যদিনের মতোই খাওয়া-দাওয়া শেষ করে মলয় তার বিছানায় এসে আশ্রয় নিয়েছিল। গভীর নিদ্রা এসে আচ্ছন্ন করেছিল তাকে। দোতলার কোণের ঘরটাতে সে থাকত।

ঠিক কাঁটায় কাঁটায় রাত বারোটা বাজবার সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল একটি মোটর এসে আশ্রমের সাম্‌নে থামল।

মোটরের ইঞ্জিনের মৃদু শব্দে আশ্রমবাসী কোনও লোকের নিদ্রার সামান্যতম ব্যাঘাতও ঘটল না। তারা সকলেই তখন গভীর নিদ্রার কোলে নিজেদের সঁপে দিয়েছিল।

গাড়ি থেকে নামল একটি ছায়ামূর্তি।

সারা দেহ তার ঘন কালো পোষাকে আবৃত। মুখে একটা আংশিক কালো আবরণ। মাথায় ফেল্ট হ্যাট্।

বিচিত্র ক্ষিপ্রগতি ছায়ামূর্তির।

গাড়ি থেকে নেমে সোজা সে এসে দাঁড়াল আশ্রমের কোণের দিকের ঘরখানার নিচে। তারপর জলের পাইপটা বেয়ে এমন দ্রুতগতিতে সে ওপরের দিকে উঠে চলল যাতে বোঝা যায়, এ কাজে সে রীতিমতো অভ্যস্ত।

ছাদের ওপর সে পৌছল অল্প সময়ের মধ্যেই। তারপর চারদিকে চেয়ে মিনিটখানেক সে কি যেন ভাবল।

চারদিকে গভীর নিস্তব্ধতা। নিথর কালো রাতের ভয়াল বীভৎসতা যেন চারদিক আচ্ছন্ন করে রেখেছে। অদ্ভুত একটা শান্তভাব। শোঁ শোঁ শব্দে নৈশ হাওয়া বয়ে চলেছে।

ছায়ামূর্তি ছাদ থেকে নেমে পড়ল। পায়ে পায়ে এগোল একটা নির্দিষ্ট ঘরের দিকে।

তিন মিনিট পর।

ছায়ামূর্তি দোতলার জানালার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে কি যেন দেখল। তারপর একটা সরু পেন্সিল টর্চ ফোকাস করল ঘরের মধ্যে।

দোতলার বারান্দায় তখন কোনও জেগে থাকা মানুষের স্পন্দন মেলে না।

জানালার দুটো গরাদ ধরে প্রাণপণে টানতে থাকে ছায়ামূর্তি। তার দেহের সমস্ত পেশী যেন ফুলে ফুলে ওঠে। প্রচণ্ড শক্তিতে চাপ দিতে থাকে। জোরে—আরও জোরে।

জীর্ণ গরাদ সে প্রচণ্ড চাপ কিছুতেই সহ্য করতে পারে না। ক্রমশঃ গরাদটা বেঁকে যেতে থাকে।

অস্পষ্ট একটা শব্দে মলয়ের ঘুম ভেঙে যায়।

—কে? উঠে বসে সজোরে চীৎকার করে সে। বয়স অল্প হলেও কোনও দিনই সে ভীরু নয়।

কোনও উত্তর নেই। শব্দ থেমে যায়।

এক মিনিট পর।

কে যেন পেছন থেকে মলয়ের মুখ চেপে ধরে।

চীৎকার করে ওঠবার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করে মলয়। আপ্রাণশক্তিতে অদৃশ্য শত্রুর হাত থেকে নিজেকে ছিনিয়ে নেবার জন্যে চেষ্টা করতে থাকে।

কিন্তু কিছুতেই সে সফল হয় না।

অদৃশ্য আক্রমণকারী তার মুখে একটা ভিজা রুমাল চেপে ধরে।

একটা কেমন যেন মিষ্টি গন্ধ ভেসে আসে মলয়ের নাকে। তার সারা অনুভূতিকে কেমন যেন অনড় করে তোলে।

ধীরে ধীরে জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ে মলয়। তারপর কোনও কথা আর তার মনে নেই।

মলয়ের জ্ঞান যখন ফিরে এলো তখন বেলা বোধ হয় সাড়ে নটা থেকে দশটা হবে।

ধীরে ধীরে উঠে বসে চোখ মেলে চাইল সে। কোন্ একটা অজ্ঞাত স্থানে সে শুয়ে আছে বলে মনে হলো। কে যে তাকে এখানে রেখে গেছে তাও সে জানে না।

কোল্‌কাতার গঙ্গার ঘাট।

সকাল থেকেই স্নানার্থীর ভিড় সুরু হয়েছিল ঘাটে। মলয় ধীরে ধীরে ঘাটের কাছে গিয়ে বসে পড়ল।

পরিচিত লোক কাউকেই চোখে পড়ে না। কেমন একটা নিঃসহায়তা এসে আচ্ছন্ন করে তার মনকে।

মলয় ধীরে ধীরে কাঁদতে সুরু করে ঘাটের ধারে বসে।

দু-একজন কৌতূহলী স্নানার্থী এসে ভিড় করে তার চারপাশে। বিভিন্ন লোক এসে বিভিন্ন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে থাকে। কোনও প্রশ্নের উত্তর দেবার মতো মনের অবস্থা মলয়ের থাকে না।

একজন প্রৌঢ়মতো ভদ্রলোক এগিয়ে আসেন। সৌম্যমূর্তি। মাথায় পাকাচুল। মিষ্টস্বরে মলয়কে জিজ্ঞাসা করেন—তোমার নাম কি খোকা?

—জানি না।

—বাড়ি কোথায়?

—জানি না।

—কে কে আছেন তোমার?

—মাস্টারমশাই।

—আর কেউ নেই? বাবা-মা?

—না।

—তুমি আসবে আমার সঙ্গে? আমার বাড়িতে যাবে তুমি?

মলয় সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়ে।

প্রৌঢ় ভদ্রলোক পরম স্নেহে তাকে কোলে তুলে নিয়ে ধীরে ধীরে গৃহের পথে এগিয়ে চলেন।

দশ

—অপহরণ—

ঘরের মধ্যে পায়চারী করছিলেন জমিদার মনোমোহন মুখার্জী।

চিন্তাক্লিষ্ট মুখ। গভীরভাবে বিষণ্ণ।

কিছুক্ষণ পায়চারী করে মনে মনে কি যেন একটা স্থির করে তিনি ডেকে পাঠালেন নায়েব বিলাস সামন্তকে।

একটু পরেই বিলাস সামন্ত এসে লম্বা সেলাম ঠুকে দাঁড়াল—নমস্কার বড়বাবু। ডেকে পাঠিয়েছিলেন আপনি?

—হ্যাঁ। বিন্দুবাসিনীর কেসটার শেষ পর্যন্ত কি হলো খবর পেয়েছেন কি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। পুলিশ থেকে বলেছে আত্মহত্যা।

—আহা, সে কথা শুনতে চাই না আমি। আমাদের যে প্রাইভেট ডিটেকটিভকে লাগানো হয়েছিল, তার কোনও খবর...

—এখন পর্যন্ত পাইনি।

—আচ্ছা, আপনার কি মনে হয়, উনি এ কেসের সঠিক সমাধান করতে পারবেন?

—নিশ্চয়ই! আজ পর্যন্ত কোন কেসে উনি ব্যর্থ হয়েছেন বলে জানা নেই আমার!

—আমরাও চাই, উনি সফল হন এ কেসে। বিন্দুবাসিনী যদিও সামান্য একটা ঝি, তবুও সে ছিল এ বাড়ির অনেক কিছু। এ বাড়ির প্রত্যেককে সে যেমন স্নেহ করত, সবাই তেমনি ভালবাসত তাকে। তাই এমন নির্দয়ভাবে যে তাকে হত্যা করেছে তার শাস্তি হওয়া বাঞ্ছনীয়।

—তা ত নিশ্চয়ই হুজুর...

—আপনি যান, বাইরের গেস্ট হাউসের ঘরে সেদিন যে ভদ্রলোকের থাকবার ব্যবস্থা করে দিলাম তাঁকে এখানে পাঠিয়ে দিন।

—যে আজ্ঞে হুজুর।

বিলাস সামন্তের সসম্ভ্রম সেলাম ও প্রস্থান।

মনোমোহনবাবু এসে দাঁড়ালেন ঘরের বাইরে। চারদিকে একবার খুব ভাল করে দৃষ্টিকে সঞ্চালিত করলেন।

কোনও লোকই যে তাঁর ঘরের ওপর নজর রাখছে না এ সম্বন্ধে স্থির নিশ্চয় হলেন তিনি।

ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে এসে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন মনোমোহনবাবু। জানালাগুলো ভাল করে পরীক্ষা করলেন।

কেউ নেই। কেউ আর তাঁর গতিবিধি জানতে পারছে না। ধীরে ধীরে সেফটা খুলে ফেললেন। একটা নির্দিষ্ট জায়গায় হাত দিলেন তিনি। কি একটা জিনিস খুঁজে বের করবার জন্যে চেষ্টা করলেন।

কিন্তু জিনিসগুলি সে জায়গায় নেই।

সেগুলি অপহৃত হয়েছে।

—আশ্চর্য! আপনমনেই বললেন তিনি—দলিলপত্রগুলি অপহৃত হয়েছে! কিন্তু কে নিতে পারে এগুলো?

আবার খুঁজে দেখলেন।

দলিলপত্রগুলির চিহ্নমাত্রও নেই।

বাইরের দরজায় কে যেন করাঘাত করল। তারপর সজোরে বলল—আমাকে ডেকেছেন নাকি স্যর?

মনোমোহনবাবু সেফটা বন্ধ করে দরজাটা খুলে ফেললেন।

সামনেই দাঁড়িয়ে রয়েছে রতনলাল। সঙ্গে তার একটি সতেরো-আঠারো বছরের ছেলে।

—কতদূর এগুলেন আপনারা?

—অনেকখানি। আপনার অপহৃত পুত্রকে খুঁজে পাওয়া গেছে।

—কোথায় সে?

—এই আপনার অপহৃত পুত্র। এই দেখুন এর ডান কাঁধের ওপর একটা জড়ুলচিহ্ন।

ছেলেটি মনোমোহনবাবুকে প্রণাম করল।

—কে একে এনে দিয়ে গেল?

—শ্যামবাজারের প্রফুল্ল কুণ্ডু নামে একজন ভদ্রলোক। তিনি নাকি একে চিনতেন।

—তুমি কোথায় থাকতে খোকা? সস্নেহে মনোমোহনবাবু প্রশ্ন করলেন।

—জেলেপাড়ার একটা কাঠের আড়তে চাকরী করতাম।

—কতদিন সেখানে আছ?

—ছেলেবেলা থেকেই।

—তোমার বাবা-মা কোথায়?

—জানি না।

—ছেলেবেলার কথা তোমার মনে নেই?

—কিচ্ছু না। জ্ঞান হবার পর থেকে আমি সেই কাঠের আড়তে আছি। তার মালিক আমাকে কুড়িয়ে পেয়ে মানুষ করেন। আমি ছেলেবেলা থেকেই সেখানে চাকরী করছি।

মনোমোহনবাবুর দু'চোখ অশ্রুপ্লাবিত হয়ে ওঠে। আপনমনেই তিনি বলেন—আহা, বাছা আমার!

একটু থেমে মনোমোহনবাবু বলে ওঠেন—আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে রতনবাবু। যে দলিলের জোরে আমি একে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করতে পারব সেগুলি অপহৃত হয়েছে।

—অপহৃত হয়েছে?

—হ্যাঁ। ধরা গলায় মনোমোহনবাবু বলেন—পরপর যে কি জটিল চক্রান্তজালের খেলা চলেছে তা কি বলব আমি! এইভাবে আর কতদিন...

কথা শেষ হয় না।

অভিলাষ সেইখান দিয়ে এগিয়ে আসছিল। সকলকে একসঙ্গে দেখতে পেয়ে বলে উঠল—এই ছেলেটি কে দাদা?

মনোমোহনবাবু বললেন—আমাদেরই ছেলে।

—তোমার কথার অর্থ দাদা? মাথা খারাপ হয়ে গেছে নাকি তোমার?

—ঠিকই বলছি আমি। শীলা আমার মেয়ে নয়। আমার ছেলে হয়েছিল। হবার দিনই কে একে অপহরণ করে তার বদলে শীলাকে রেখে যায়।

—এ মতলবটাকে বাদ দাও দাদা। তোমার অনেক অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য করেছি

আমি, কিন্তু এটা কিছুতেই সহ্য করতে পারব না। কেন, আমি কি তোমার এতই পর যে, আমাকে অর্ধেক সম্পত্তি দিতে হবে এই ভয়ে কোত্থেকে একজনকে টেনে আনছ? অভিলাষের কণ্ঠ থেকে যেন বিষ ঝরে পড়ে।

—তার মানে? এ কি কথা বলছিস্ তুই অভিলাষ? বিস্মিত মনোমোহনবাবু প্রশ্ন করেন।

—যা বলছি, তা তুমিও বুঝতে পারছ, আমিও পারছি! এখন এ সব বদ্ উদ্দেশ্য ত্যাগ করাই ভাল! আমাকে তুমি কচি খোকা পাওনি যে যা বোঝাবে তাই বুঝব!

মনোমোহনবাবু বিমূঢ়।

অভিলাষ আর একটি মুহূর্তও সেখানে অপেক্ষা না করে হন্ হন্ করে এগিয়ে চলে।

এগারো

—প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তি—

হরমোহিনী দেবী ছেলেটিকে পেয়ে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। চোখের জল ফেলে বললেন—আয় বাবা! সম্পত্তি দরকার নেই, তোকে যে ফিরে পেয়েছি এতেই আমার আনন্দ।

শীলা সেইদিকে আসছিল।

হরমোহিনী দেবী তার দিকে চেয়ে বললেন—শীলা, এ তোর নতুন ভাই। আজ থেকে একে ঠিক ভাইয়ের মতো দেখবি।

শীলা মনের আনন্দে ঘাড় নাড়ল।

ছেলেটি কিন্তু এতে মোটেই খুশি হলো না। সে কেমন যেন বিরক্ত বলে মনে হলো।

ছেলেটির এই পরিবর্তন শীলাকে দুঃখিত করে। সে অনেক আশা-আনন্দ নিয়েই তার সঙ্গে কথা বলতে এসেছিল। কিন্তু তার ভাবভঙ্গী দেখে সে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায় দ্রুতপায়ে।

একটা অপরিসীম বেদনা যেন তার সারা মনকে গভীর দুঃখে অসাড় করে ফেলে।

মনোমোহনবাবু চলে গেলে ছেলেটি হরমোহিনী দেবীর দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল—ও কে মা?

—তোমার বোন।

—কিন্তু আমার কোনও বোন আছে বলে ত শুনিনি। উঃ, অত বাবুগিরি দেখলে আমার গা জ্বলে! পরের ধনে পোদ্দারী...

ছেলেটির বাচালতায় হরমোহিনী দেবী অবাক্ হলেন। তিনি বললেন—ছি, ওকথা বলতে নেই বাবা। হাজার হলেও এতদিন এখানে মেয়ের মতো মানুষ হয়েছে। কাউকে কখনও দুঃখ দিতে নেই।

সেদিনই রাত দশটা।

ছেলেটি যে ঘরে শয়ন করে তার দরজায় কে যেন পর পর তিনবার টোকা মারল।

—কে? ছেলেটি উঠে গিয়ে প্রশ্ন করে।

—খোল্। আমি শিবু।

দরজা খুলে যায়।

—কত হল বল্ দিখি পঞ্চা?

—বেশি কিছু না। মায়ের বাক্স থেকে দুশো টাকা আর শীলার দুটো গয়না।

—টাকাটা রাখ্। গয়না দুটো আমাকে দে।

—না, একটা গয়না আমি রাখব।

—এই যা বলছি শুনে রাখ্, আমাদের কথা না শুনলে কিন্তু ভাল ফল হবে না বলে রাখছি!

—বেশ দিচ্ছি, কিন্তু এর পর থেকে সব ভাগ হবে আধাআধি।

ছেলেটির কথাবার্তা শুনে শিবুও কম অবাক হয় না। ও যে রাতারাতি কি করে এত চালাক হয়ে উঠল তা সে বুঝতে পারে না। কিন্তু, এখন বিবাদ করলে ভবিষ্যতে আর কোন আশাই থাকবে না। সে তাই বলে—আচ্ছা এখন দে, পরে দেখা যাবে।

ছেলেটি গয়না দুটো তুলে দেয় শিবুর হাতে।

* * *

বিডন স্ট্রীটের রায় সাহেব বিজয়প্রসাদ চৌধুরী আর তাঁর মেয়ে মায়ার মধ্যে কথা হচ্ছিল। অজয় কলেজে গেছে।

রায় সাহেব খবরের কাগজের একটা বিজ্ঞাপনের দিকে মায়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন—এটা পড়ে দেখ মা!

মায়া সেটা আগাগোড়া পড়ে বলল—তুমি কি ঠিক জান বাবা যে এই সেই মলয় মুখার্জী?

—আমি নিঃসন্দেহ! তোর বোধ হয় মনে আছে যে আমি ওকে কিভাবে গঙ্গার ঘাটে কুড়িয়ে পেয়েছিলাম?

—তা মনে আছে।

—এখন যাদের ছেলে তাদের কাছে ফিরিয়ে দিয়ে আসি।

—কিন্তু আমি তাহলে কি নিয়ে বাঁচব বাবা?

—তবু পরের জিনিস জেনে কি চুরি করে ওকে আট্‌কে রাখব? ভয় নেই রে, তোর স্নেহের টান ঠিক থাকলে ও তোরই থাকবে।

—কিন্তু সম্পদের প্রতি ওর ত কোন দিনই লোভ নেই বাবা। মায়া অশ্রুপূর্ণ কণ্ঠে বলে।

—অত বড় ঘরের ছেলে বলেই তা নেই। সম্পদ ও হয়ত চায় না, কিন্তু নিজের অধিকার থেকে আমি ওকে কিছুতেই বঞ্চিত করতে পারি না। তা ছাড়া যাদের চক্রান্তে ও এইভাবে ঘরছাড়া পথহারা, তাদের উপযুক্ত শাস্তি যাতে হয়, সে ব্যবস্থাও ত আমাদের করতে হবে।

—বেশ, তাই কর বাবা।

অশ্রুপূর্ণ চোখে মায়া বলে। একফোঁটা জল সবার অজান্তে গড়িয়ে পড়ে ভিজিয়ে তোলে তার গাল দুটি।

—এ তুই ঠিক্ জানিস্ মায়া, তোকে ও কোনও দিনই ভুলতে পারবে না। অন্তর ওর অনেক বড়। এ শুধু দু'দিনের জন্যে বিদেশ ঘুরে আসার মতো। রায় সাহেব সান্ত্বনা দেন।

মায়া কোনও কথা বলে না। শুধু সযত্নে রাখা একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করে।

বারো

—একটি গোপন আড্ডা—

রাত গভীর।

পৃথিবীর বুকে জেগে-থাকা কোনও মানুষের স্পন্দন মেলে না কোথাও।

চিৎপুর অঞ্চলের একটি নোংরা সরু গলি। এই অঞ্চলের এই সব গলি বিশেষ কতকগুলি কারণের জন্যে প্রসিদ্ধ। দাগী আসামীরা পলাতক হলে, পুলিশের লোকেরা এসে এই সব গলিগুলোতে প্রায়ই সন্ধান করে।

এই গলির মোড়েই মাঝে মাঝেই একটি দামী মোটরগাড়ি এসে দাঁড়াতে দেখা যায়। মহিমপুর নামে কোন্ একটা বিখ্যাত স্টেটের কোন্ এক জমিদার নাকি সেই মোটরে চড়ে আসেন।

গলির সামনে একজন ভিখিরীকে তারস্বরে ভিক্ষা চাইতে দেখা গেল। ইনিয়ে বিনিয়ে কেঁদে কেঁদে পথচারীদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করছে।

কিন্তু তার নজর আদৌ ভিক্ষার দিকে নেই। মাঝে মাঝেই সে যেন উৎসুক নয়নে কিসের জন্যে প্রতীক্ষা করছে।

ঘস্ ঘস্...

মোটরের ইঞ্জিনের শব্দ। মস্ত বড় একটা ঊনপঞ্চাশ মডেলের শেভ্রলে গাড়ি এসে দাঁড়াল গলির মোড়ে।

গাড়ি থেকে নেমে এলেন একজন বাবু। পরনে দামী তাঁতের ধুতি, সিল্কের পাঞ্জাবী আর চাদর, পায়ে দামী নিউকাট জুতো।

—দুটো পয়সা বাবু! ভিখিরীটা হাঁকল।

—ন্যাস্টি! মুখ বেঁকিয়ে বাবু গলির ভিতরে গিয়ে ঢুকলেন।

ভিখিরীটা যেন এতক্ষণ ওরই জন্যে প্রতীক্ষা করছিল। সে বেশ একটু দূরত্ব বজায় রেখে বাবুটিকে অনুসরণ করল।

ভাল করে লক্ষ্য করলে দেখা যেত যে তার পায়ের ঘা, মুখের দাড়ি আর পরণের পোষাক সবই মেকী। সবই তার মেক্আপ করবার কলাকৌশলের জন্যে সম্ভব হয়েছে।

'মেকআপ্'-এর আড়ালে যে লোকটি লুকিয়ে ছিল সে যে পাঠক-পাঠিকার অতি-পরিচিত একজন গোয়েন্দা তা বুঝতে বেগ পেতে হয় না আমাদের। কিন্তু সে অঞ্চলে এই লোকটি যখন ছদ্মবেশে কাজ করে চলেছিল, তখন তাকে কেউ বিন্দুমাত্রও সন্দেহ করতে পারেনি। এমন কি যে বাবুটিকে সে অনুসরণ করে চলেছিল, সেও নয়।

গলির প্রান্তের দোতলা বাড়িটাতে বাবু প্রবেশ করলেন। সোজা উঠে গেলেন দোতলার একটা ঘরে।

ভিখিরীর বেশভূষা দেখতে দেখতে পাল্টে গেল। সে সোজা ঢুকে গেল বাড়ির মধ্যে। লোকটি জানত যে এ বাড়িখানাতে সামাজিক পরিবেশের কোনও মানুষ বাস করে না। অসামাজিক পরিবেশের কোনও বাড়িতে একজন ফিট্ফাট্ চেহারার বাবু যে কি উদ্দেশ্যে প্রবেশ করতে পারে তাও লোকটির অজানা নয়।

এই বাড়িখানায় বাস করে অসামাজিক জীবনযাপনে অভ্যস্ত কয়েকটি মেয়ে। এ বাড়িতে

যে কার্য-উপলক্ষে সে লোকটি আগে আসেনি তা নয়। যে ধরণের কাজ সে করে, তাতে এই রকম বাড়িতে মাঝে মাঝেই তাকে হানা দিতে হয়।

বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করে লোকটি সিঁড়ি বেয়ে উঠতে থাকে।

সিঁড়ির মুখে একটা মেয়ের সঙ্গে দেখা। মেয়েটি হেসে বলল—কি খবর, টিকটিকি সাহেব যে আবার এখানে হানা দিল!

ভিখিরী একটা পাঁচ টাকার নোট তার হাতে গুঁজে দিয়ে বলল—বাবুটি কোন্ টোপে চার ফেলেছে?

—দোতলার কোণের ঘরে। মেয়েটি বলে।

—বেশ, দেখছি আমি।

ভিখিরীর এখন বাবুর মতো দামী বেশভূষা। সোজা সে দোতলায় উঠে যায়। সেখানে বাবুটির পাশে বসে আরও দুজন গুণ্ডা ও একটি নারী।

বাবুটি প্রশ্ন করে—কি খবর মতি, পারবে ত একে শেষ করতে?

—জরুর হুজুর।

—কাল রাত ঠিক বারোটায়। মনে থাকবে ত?

—নিশ্চয়ই।

—বেশ, এই নাও পঞ্চাশ আগাম।

—এত কম আগামে কি কাজ চলে বাবু?

—বেশ, একশোই নাও।

—কম্‌সে কম্ দুশো না হলে...

—তা দিচ্ছি ধরো না বাপু!

—বেশ দিন। আর বাকী চারশো?

—পরদিন ঠিক পাবে। বলি, টাকা নিয়ে কি কোনও গোলমাল হয়েছে এর আগে?

—না বাবু, অতি শত্তুরেও আপনার সে দুর্নাম দিতে পারবে না।

—আচ্ছা, চলি তাহলে আজকের মতো। চলো বীণা, আমরা পাশের ঘরে যাই।

লোকটি মেয়েটির সঙ্গে কথা বলতে বলতে উঠে যায়।

গুণ্ডা মতি একবার তার সঙ্গীকে বলে—লোকটা ভাল রে, বুঝলি রশীদ। খেলিয়ে চলতে পারলে বহুৎ টাকা মিলবে ওর দৌলতে।

রশীদ হাসে কুশ্রী একধরণের হাসি।

মতি বলে—সবই ত হলো। কিন্তু ন্যাড়া এখনও ফিরল না দেখছি। ও না হলে আবার...

রশীদ আক্ষেপ-উক্তি করে। তারপর একটু ভেবে বলে—একাজে আর ন্যাড়াকে ভাগ দিয়ে দরকার নেই সর্দার। বরং আমরা দুজনেই...

ভিখিরীর চেহারার পরিবর্তন হয়। ধীরপদে সে যখন ঘরের মধ্যে ঢোকে তখন তাকে মতি গুণ্ডার সহকর্মী ন্যাড়া ছাড়া অন্য কিছু বলে মনে হয় না।

—কি রে ন্যাড়া, ফিরতে এত রাত হলো যে?

—একটা মেরে এলাম সর্দার। টানা-টানা সুরে ন্যাড়া বলে—ঠিক দুশো মিলেছে। পুরো দুশো!

ন্যাড়া হাঁপাতে থাকে।

মতি গুণ্ডা বলে—এই শোন্, তোর সঙ্গে পরামর্শ আছে। বিশেষ জরুরী কথাবার্তা হবে। একটু মনোযোগ দিয়ে শোন্।

ন্যাড়া হাঁপাতে হাঁপাতে বলে—আরে তুই বল্ না, আমার মনোযোগ ঠিক আছে।

মৃদু হাসি ফুটে ওঠে তার মুখে। অতি-বড় সাহসীও বোধ হয় তার এ হাসি দেখলে ভয়ে শিউরে উঠবে।

তেরো

—আসল কে?—

পরদিন সকাল।

রতনলালের খোঁজ করতে এলো দুজন লোক চক্রবেড়িয়া রোডের ঠিকানায়।

রতন সেইদিনই মহিমপুর থেকে ফিরে এসেছিল। দীপক আর রতন এসে ওদের দুজনের সঙ্গে দেখা করে।

ওদের একজন হচ্ছেন রায় সাহেব বিজয়প্রসাদ চৌধুরী—অন্যজন অজয়।

—কোত্থেকে আসছেন আপনারা? দীপক প্রশ্ন করে।

—বিডন স্ট্রীটে আমার বাড়ি। আমার নাম রায় সাহেব বিজয়প্রসাদ চৌধুরী। আর এ হচ্ছে আমার নাতি অজয়। অবশ্য নাতি মানে, আমি ওকে আমার নাতির মতো পালন করেছি। আমার বিধবা মেয়ে ওকে পুত্রবৎ যত্নে পালন করেছে। আমি ওকে তেরো বছর আগে একদিন গঙ্গার ঘাটে কুড়িয়ে পেয়েছিলাম। সেদিন ও নিজের নাম বা পিতৃপরিচয় কিছুই বলতে পারেনি।

—যে চিহ্নের কথা বিজ্ঞাপনে ছিল তার সঙ্গে মিলছে ত?

—হ্যাঁ, তেমন চিহ্ন আছে ওর দেহে। তাই আমি বিজ্ঞাপন দেখে ওকে আপনাদের কাছে নিয়ে এসেছি।

—এখন উনি কি করেন? সম্ভ্রমসূচক ভঙ্গিতে দীপক প্রশ্ন করে।

—স্কটিশ চার্চ কলেজে বি. এ. পড়ে।

এক মিনিট চিন্তা করে দীপক বলে—আমার মনে হচ্ছে এই আসল মলয় মুখার্জী। বেশ, আপনার ঠিকানাটা রেখে যান। আমি আজই বিকেলে আপনাদের নিয়ে মহিমপুর যাব। সেখানকার জমিদার বংশেরই পুত্র ও।

ঠিকানার কার্ড রেখে হাসিমুখে রায় সাহেব উঠে দাঁড়ান।

রায় সাহেব উঠে চলে গেলে দীপকের দিকে চেয়ে রতন বলে—উঃ, আচ্ছা মুস্কিলে পড়া গেল দেখতে পাচ্ছি। এখন কে যে আসল আর কে যে নকল সে সমস্যার সমাধান করা প্রায় অসম্ভব!

—অসম্ভব কিছু নেই।

—কেন?

—আমরা ওকে মহিমপুরে নিয়ে গেলেই দেখতে পাবি।

—ব্যাপারটা খুলেই বল্ না।

—আগের ছেলেটি যদি আসল মলয় হয়, তবে তার ওপর আক্রমণ চলবে। সে আভাসও আমি পেয়ে এসেছি। আর এ যদি আসল মলয় হয় তবে আক্রমণটা হবে এর ওপর। আসল মলয় অক্ষত থাকতেই পারে না।

—তবে সে আক্রমণ প্রতিরোধ করবার মতো ব্যবস্থা নিশ্চয়ই আমাদের করতে হবে?

—অবশ্যই। এতটুকু ভুলত্রুটিও মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে এক্ষেত্রে। আর একটা কথা। এতদিন রহস্যের যবনিকার আড়াল থেকে যেসব ঘটনা ঘটেছে, এবারে আমি এমন ফাঁদ পেতে রাখব যে তার থেকে সব কিছু সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

—আসল যবনিকার আড়ালে এমন কি ঘটছে যাতে তুই এতটা ভয় পেয়ে গেলি?

—তুই যদি সব ব্যাপারটা অনুমান করতিস্ তবে বুঝতে পারতিস।

—কিন্তু...

—হ্যাঁ। এই যে নকল মলয়কে যারা খাড়া করেছে, তুই কি মনে করিস তাদের কোনও উদ্দেশ্য নেই?

—তা অবশ্য নিশ্চয়ই আছে।

—তারপর ভেবে দেখ্ মৃত ঝির রহস্য।

—দুটো ঘটনায় কি যোগ আছে?

—তা নেই। তবে সব সমস্যার সমাধান করতেও খুব বেশি বেগ পেতে হবে না আমাদের!

—তার মানে?

—অপরাধী আপনি এসে ধরা দেবে।

—কিন্তু সে ত তার চরকেও পাঠাতে পারে।

গম্ভীরস্বরে দীপক বলে—বাংলায় একটা প্রবাদ আছে জানিস্ ত? 'কান টানলে মাথা আসে'। আমি ঠিক সেই নীতি অনুযায়ী কাজ করতে চাই।

—বেশ, দেখা যাক্ তোর দৌড় কোথায় গিয়ে ঠেকে। হাসতে হাসতে রতন কথা শেষ করে।

চৌদ্দ

—আক্রমণ—

অজয়কে মনোমোহন চৌধুরীর পরিবারের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে দীপক। দুজনের মধ্যে আসল মলয় কে তা পরে সে স্থির করবে বলে জানিয়েছে।

তার সুন্দর ব্যবহারের জন্য অজয় বাড়ির সকলের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছে ইতিমধ্যেই।

সেদিন রাত দশটা।

অজয় শীলার পড়বার ঘরে বসে তার সঙ্গে পাঠ্যপুস্তকের কতকগুলি বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিল।

অজয়ের গভীর জ্ঞান ও তীক্ষ্ণধীর পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল শীলা। বার বার

তার মনে শুধু একটা কথাই উঁকি মারছিল। এ যদি সত্যিকারের মলয় হয়, তবে তার চেয়ে খুশি বোধ হয় আর কেউ হবে না। কিন্তু অন্য যে ছেলেটিকে সে দেখেছে তার বিশ্রী ব্যবহার ও অভদ্র রুচির পরিচয় পেয়ে সে এবং বাড়ির সকলেই অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে উঠেছে।

অজয় শীলাকে বোঝাচ্ছিল ব্রাউনিং-এর লেখা একটা কবিতা। একটি সামান্য শব্দের মধ্যেও কি অসীম গভীরতা থাকতে পারে এ কথাই সে তাকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করে বোঝাচ্ছিল।

কিন্তু তারা কেউ লক্ষ্য করেনি যে ঠিক তেমনি সময়ে তাদের ঘরের জানালায় একটি ছায়ামূর্তি দাঁড়িয়ে গভীর অভিনিবেশ সহকারে তাদের প্রতিটি কাজ লক্ষ্য করছিল।

ধীরে ধীরে ছায়ামূর্তি তার হাতের রিভলভারটা তুলল। তারপর ওদের দুজনদের দিকে লক্ষ্য ঠিক করে ট্রিগার টিপতে উদ্যত হলো।

কিন্তু...

একটা মুহূর্ত।

পেছন থেকে কে যেন অট্টহাসি হেসে উঠল।

চম্‌কে উঠল ছায়ামূর্তি। পেছন ফিরে চাইল সভয়ে।

পেছনের লোকটি বলে উঠল—মিথ্যা রিভলভারের ট্রিগার টিপে লাভ নেই বন্ধু। আমি তোমার ঘরে গিয়ে এর আগেই নিঃশব্দে কার্তুজের বদলে 'সেফ্‌টি ক্যাপ' পুরে রেখে এসেছিলাম। ওতে শুধু 'ব্ল্যাঙ্ক ফায়ার' হবে। ওতে কারও যে কোনও ক্ষতি হবে না এ সম্বন্ধে আমি নিঃসন্দেহ।

ছায়ামূর্তি পলায়নের চেষ্টা করছিল। কিন্তু সভয়ে দেখল ডিটেকটিভ দীপক চ্যাটার্জীর হাতে চক্‌চক্ করছে একটি অটোমেটিক রিভলভার।

—মাথার ওপর হাত তোল মতিলাল! দীপক চ্যাটার্জীর কণ্ঠস্বরে তীক্ষ্ণ আদেশ।

ছুটে আসেন জমিদার মনোমোহন মুখার্জী। ছুটে আসে আরও সকলে।

দীপক সকলের দিকে চেয়ে বলে—এরই সাহায্যে আপনার খুল্লতাত ভ্রাতা অভিলাষ মুখার্জী আসল মলয়কে শ্রীরামপুরের আশ্রম থেকে অপহরণ করেছিলেন মনোমোহনবাবু। আর এরই সাহায্যে আজ অজয় ওরফে মলয় আর শীলাকে হত্যা করবার চেষ্টা করেছিলেন অভিলাষবাবু।

—আর বিন্দুবাসিনী? মনোমোহনবাবু সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকান।

দীপক মৃদু হেসে সুরু করে—ওর হাতের মধ্যে পাওয়া গিয়েছিল একটা শঙ্খ-আঁকা সোনার বোতাম। আততায়ী যে জামা পরে ওকে খুন করেছিল তাতে এই বোতামটি আঁটা ছিল। আমি খোঁজ নিয়ে জানলাম, আপনি এই বোতামটি ব্যবহার করতেন।

ঘরের সকলে বিস্মিত। মনোমোহনবাবু বিস্মিতভাবে বললেন—আমি হত্যা করব বিন্দুবাসিনীকে!

—না, তা করেননি তাও আমি জানি। দীপক বলে চলে—সঠিক প্রমাণ পেয়েছি আপনি তখন দার্জিলিং-এ ছিলেন। তবে খুন যে করেছে সে আপনার বোতামটি গলায় পরে আপনার জামা পরে খুন করতে গিয়েছিল। কারণ আপনি এই জামাটি বোতাম সমেত এখানে রেখে গিয়েছিলেন—দার্জিলিং-এ নিয়ে যাননি।

দীপক দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে—অভিলাষবাবু কোথায়?

—তা ত জানি না। মনোমোহনবাবু বলেন—চলুন দেখা যাক্ সে কোথায় গেছে।

কিন্তু সারা বাড়ি তন্ন তন্ন করে খুঁজেও অভিলাষ মুখার্জীর কোনও সন্ধান পাওয়া যায় না। নকল মলয়কেও কোথাও পাওয়া যায় না আর।

দীপক বলে—এ আমি জানতাম মনোমোহনবাবু। আসল আসামীরা ঠিক ধরা পড়বার পূর্বমুহূর্তে এমনি করে গা-ঢাকা দেয়। তবে আপনারা যে এবার নির্বিঘ্নে বাস করতে পারবেন এই আমার সান্ত্বনা!

খোঁজ নিয়ে জানা গেল নকল মলয় মুখার্জী ওরফে শ্রীমান পঞ্চা যাবার পূর্বে হরমোহিনী দেবীর বাক্স থেকে তিনশো টাকা, দশ ভরি সোনার গয়না, নায়েব মশাইয়ের দেড়শো টাকা এবং আরও বহু দামী জিনিসপত্র নিয়ে গা-ঢাকা দিয়েছে।

হরমোহিনী দেবী দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন—জিনিসপত্র গেছে যাক্, কিন্তু ওরকম ছেলের হাত থেকে যে রক্ষা পেলাম, এই আমার সান্ত্বনা।

পনেরো

—সমাধান—

মনোমোহনবাবুর ঘরে সকলে সমবেত হয়েছে।

দীপক ধীরে ধীরে বলে চলে—এই রহস্যের সমাধান করতে হলে দীর্ঘদিন পূর্বের ঘটনাবলী থেকে সুরু করতে হবে আমাকে।

হরমোহিনী দেবীর পুত্রসন্তান হবার পূর্বে একদিন অভিলাষ একজন লোকের সঙ্গে কি একটা বিষয়ে যড়যন্ত্র আঁটছিল। এটা মৃতা বিন্দুবাসিনীর কানে যায়, এবং সে সেই খবরটা মনোমোহনবাবুকে এসে জানায়। মনোমোহনবাবু তাই স্থির করলেন এক অভিনব উপায়। ঠিক যেদিন তাঁর পুত্র হলো, সেদিনই তিনি নিজে সেই পুত্রকে স্থানান্তরিত করে তার স্থানে একটি কন্যাসন্তান রেখে দেন। একটি গরীব প্রতিবেশীর সদ্যোমাতৃহীনা কন্যাকে তিনি এ উদ্দেশ্যে সংগ্রহ করেন। সে কন্যাই শীলা।

এদিকে সেই পুত্রকে তিনি সযত্নে গোপনে মানুষ করেন। অভিলাষ যে তাঁর কারসাজি ধরতে পেরেছে এ খবরও তিনি পেলেন। তাই তিনি সেই ছেলেকে শ্রীরামপুরের অনাথ আশ্রমে ভর্তি করে অজ্ঞাত নামে টাকা পাঠাতে থাকেন।

কিন্তু সে খবরও গোপন থাকল না দীর্ঘদিন। অভিলাষ এ খবর জানতে পেরে মতি গুণ্ডার সাহায্যে আশ্রম থেকে মলয়কে চুরি করে। তারপর তাকে কোল্‌কাতার গঙ্গার ঘাটে শুইয়ে রেখে চলে যায়।

সেখান থেকে রায় সাহেব বিজয়প্রসাদ চৌধুরী তাকে কুড়িয়ে পান এবং নিজের পরিজনের মতোই মানুষ করতে থাকেন।

এধারে অভিলাষ জানতে পারে তার উদ্দেশ্যের পথে কণ্টক আছে দুটি। এক হচ্ছে বিন্দুবাসিনী আর দ্বিতীয় হচ্ছে কতকগুলি ফটোগ্রাফ। বিন্দুবাসিনী আর একজন ধাত্রী হরমোহিনী দেবীর পুত্র জন্মাবার প্রধান সাক্ষী। আর সেই ফটোগ্রাফের সাহায্যে মনোমোহনবাবু মলয়ের জন্ম রেকর্ড করে রেখেছিলেন।

বিন্দুবাসিনীকে তাই অভিলাষ নিজে হত্যা করে এবং পরে আমাকে নিয়োগ করে সেই কেসের তদন্তভার নেবার জন্যে। সেই ধাত্রীর সন্ধানও সে করেছিল, কিন্তু সফল হয়নি। আর তার স্টেট্‌মেণ্টের কপিও মনোমোহনবাবু গোপনে রক্ষা করেছিলেন ফটোগ্রাফ রেকর্ডের সঙ্গে। তাই না মনোমোহনবাবু?

—হ্যাঁ, মৃদু হেসে তিনি বলেন।

—তারপর অভিলাষ একদিন আপনার ঘরে ঢুকে সেগুলি চুরি করে নিয়ে পালাবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু পেছনে ঠিক তেমনি সময়ে আমার সহকারী রতনলাল এসে পড়ে। সে তাকে অজ্ঞান করে দলিলপত্রগুলি নিয়ে চলে যায়। সেগুলি আমার কাছেই আছে।

এত করেও অভিলাষ যখন পারল না, তখন সে শেষ চেষ্টা করল মতি গুণ্ডার সাহায্যে মলয় আর শীলাকে খুন করতে। কিন্তু তাতেও ব্যর্থ হয়ে সবার অলক্ষ্যে রাজবাড়ি ছেড়ে সে প্রস্থান করেছে কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিয়ে।

মনোমোহনবাবু সস্মিত হেসে বললেন—আপনাকে পারিশ্রমিক দিতে যাবার ধৃষ্টতা আমার নেই দীপকবাবু। তবে সামান্য এই পুরস্কার যদি কৃতজ্ঞতার স্মৃতি হিসাবে গ্রহণ করেন তবে বাধিত হবো।

দীপকের হাতে তিনি তুলে দেন একটি দশ হাজার টাকার চেক।

শীলা ভীতকণ্ঠে বলে—সেই গুণ্ডা ছেলেটা আবার আসবে না?

—কোন্ গুণ্ডা ছেলে রে? হরমোহিনী দেবী প্রশ্ন করেন।

—সেই যাকে তোমরা প্রথমে মলয়দা বলেছিলে...

দীপক হেসে বলে—না, সে বুঝেছে যে তার স্বরূপ ধরা পড়ে যেতে বেশি বিলম্ব নেই। যারা তাকে এখানে রেখেছিল তারাই তা বুঝতে পেরেছে। কাজেই তারা তাকে সরিয়ে দিয়েছে এখান থেকে। তাদের যতটুকু নেবার তা নিয়ে গেছে তারা।

—বাঁচা গেছে। শীলা সম্মতি হেসে বলে।

হরমোহিনী দেবীও আনন্দের নিশ্বাস ফেলেন।

—শেষ—

রক্তকমল

এক

—আসল ও নকল—

ট্রেন এসে থামল বর্ধমানে।

ডাউন দিল্লী এক্সপ্রেস। কোল্‌কাতার দিকে চলেছে।

একটা ফার্স্ট ক্লাস কম্পার্টমেণ্টের দরজা খুলে প্রবেশ করল একজন ভদ্রলোক। দীর্ঘদেহ। পরনে গ্যাবার্ডিনের দামী স্যুট। সারা শরীর ঢাকা সেই কালো স্যুটে। তার ওপর চাপানো একটা ভারী ওভারকোট। মাথায় ফেল্ট হ্যাট। গোঁফের সৌখীনতা চেহারার মধ্যে বেশ একটা পারিপাট্য এনে দিয়েছে।

চামড়ার স্যুটকেসটি রেখে হোল্ডঅল্‌টা বিছিয়ে নিয়ে কুলীর দিকে চেয়ে প্রশ্ন করে— কত দিতে হবে হে?

—চার আনা, বাবুজী।

নির্ব্বিবাদে একটা সিকি কুলীর হাতে গুঁজে দেয় সে। কুলী ধীরে ধীরে নেমে যায় একটা সেলাম ঠুকে।

ফাঁকা কম্পার্টমেণ্ট। উল্টো দিকের বার্থে আর একজন লোক বসে। সেদিকে ভদ্রলোকের আদৌ খেয়াল পড়ত না। কিন্তু একবার সেদিক চোখ পড়তেই চম্‌কে উঠল সে। লোকটির চেহারা হুবহু তার মতো। দুজনের চেহারায় পার্থক্য প্রায় নেই বললেই চলে। দুটি মানুষের চেহারায় যে এতটা মিল থাকতে পারে তা না দেখলে বিশ্বাস করাই কঠিন।

কম্পার্টমেণ্টে উপস্থিত অন্য লোকটিও চম্‌কে উঠেছিল। তার সহযাত্রীর চেহারা ঠিক তারই মতো এ কথাটা মনে হওয়ামাত্রই সে বেশ মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করছিল তাকে। আয়নায় সে বহুবার নিজের চেহারা দেখেছে। সেই চেহারা যেন হঠাৎ মূর্তি ধরে এসে উপস্থিত হয়েছে তার সাম্‌নে।

তবে দুজনের চেহারা হুবহু একধরণের হলেও আর্থিক অবস্থা যে এক নয়, তা বোঝা যায় বেশভূষার পার্থক্য থেকে। নবাগতদের বেশভূষার বর্ণনা আগেই করা হয়েছে। প্রথম দর্শনে তাকে ধনীর পর্যায়ে ফেলা চলে।

কিন্তু আগে থেকেই যে লোকটি সেখানে ছিল তার বেশভূষা থেকে তাকে অত্যন্ত গরীব বলে ধারণা করা বিচিত্র নয়। এমন কি এই ধরণের বেশভূষা পরিহিত লোক যে কি করে ফার্স্ট ক্লাসে ভ্রমণ করতে পারে তাও এক সমস্যার বিষয়। পরনে তার একটি ময়লা ধুতির ওপর আধময়লা একটি নীল রঙের ছিটের কোট।

—আশ্চর্য মিল কিন্তু আমাদের দুজনের চেহারায়। নীল ছিটের কোট হাসতে হাসতে কথা বলে।

—হ্যাঁ, মাঝে মাঝে প্রকৃতিদেবীর এমন খেয়ালও হয়। দামী স্যুট পরিহিত ভদ্রলোক উত্তর দেয়।

—আরও আশ্চর্যের বিষয় একই সময়ে আমাদের দুজনের সাক্ষাৎ হলো। আর তাও এই চলন্ত ট্রেনে।

—তার মধ্যে অবশ্য আশ্চর্যের কিছু নেই, দামী স্যুট উত্তর দেয়—সাক্ষাৎ একদিন যখন আমাদের ঘটল তখন তা সে এই চলন্ত ট্রেনেই হোক আর উড়ন্ত প্লেনেই হোক কোনও ক্ষতিবৃদ্ধি নেই।

—বয়সও বোধ হয় আমাদের প্রায় একই রকম হবে। আপনার কত? নীল ছিটের কোট কৌতূহলী হয়ে ওঠে।

—চৌত্রিশ।

—আমার অবশ্য একত্রিশ চলছে। কিন্তু দারিদ্র্যের পীড়নে আমার বয়স অকালেই বেশি দেখায়।

—আপনি কি সত্যিই খুব দরিদ্র?

—হ্যাঁ। চাকরীর জন্যে অনেক চেষ্টা করেছি, কিন্তু তেমন সুবিধেমতো কোনও কাজ পাইনি।

—তা হলে ফার্স্ট ক্লাস কম্পার্টমেণ্টে ভ্রমণ করছেন কি করে?

—তার মানেই অন্য কোন ও ক্লাসে যাবার মতো টাকা আমার নেই। বিনা টিকিটে গাড়িতে উঠলে ফার্স্ট ক্লাসই সবচেয়ে ভাল, কারণ এখানে চেকিং কম হয়।

—তা বটে। সত্যিই আপনার বড় অসুবিধে। দামী স্যুটের কণ্ঠে শোনা যায় সহানুভূতির সুর।

—কিন্তু কি করব! বিধাতার বিধান! তার ওপর ত আর করবার কিছু নেই। এই নিয়েই সন্তুষ্ট আছি। অথচ আপনার চেহারা আমার মতো হলেও আপনি কি প্রচুর অর্থের অধীশ্বর! তাই ভাবি—

কথা শেষ হয় না।

গাড়ি ছেড়ে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে একজন টিকেট-চেকার দরজা খুলে কামরার মধ্যে প্রবেশ করে।

—টিকেট প্লীজ্! দামী স্যুটের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করে সে। ভদ্রলোক পকেট থেকে টিকেটটি বের করে মেলে ধরে তার দিকে।

—আপনার স্যর!

কথাটা বলেই টিকেট-চেকারের হঠাৎ নজর পড়ে দুজনের চেহারার অদ্ভুত সাদৃশ্যের দিকে। দুজনের দিকেই আর একবার ভাল করে তাকায় সে।

—টিকেট নেই। নিস্পৃহকণ্ঠে লোকটি বলে।

—তার মানে? বিনা টিকেটেই ভ্রমণ করছেন নাকি?

—না করে উপায় কি! টিকেট কিনবার মতো পয়সা যদি না থাকে ত কি করব বলুন। অথচ আমাকে কোল্‌কাতায় পৌঁছুতেই হবে।

—দেখুন, কর্তব্যের খাতিরে আমার কাজ করতে আমি বাধ্য। পরবর্তী স্টেশনে ট্রেন থেকে আপনাকে নেমে যেতে হবে।

—বেশ, তাই হবে। নীল ছিটের কোট নিরুপায় ভঙ্গিতে ঠোঁট উল্‌টোয়।

এবার দামী স্যুট হঠাৎ টিকেট-চেকারের দিকে বাঁকা চোখে চেয়ে প্রশ্ন করে—ওঁর টিকেটের চার্জ কত?

একটু চিন্তা করে টিকেট-চেকার ধূসরকণ্ঠে উত্তর দেয়—বর্ধমান থেকে কোল্‌কাতা প্লাস্ এক্‌সেস ফেয়ার। মোট আঠারো টাকা দশ আনা।

—এই নিন।

দুখানা দশটাকার নোট বেরিয়ে আসে ভদ্রলোকের নোটকেস থেকে। শোনা যায় খস্ খস্ শব্দ। অন্ততঃ হাজার খানেক টাকা আছে নোটকেসে।

চেকার রসিদটা লিখে দিয়ে পরের স্টেশনেই নেমে যায়।

দামী স্যুটের কণ্ঠে সহানুভূতি ঝরে পড়ে—আমাদের চেহারার মিল থাকলেও নামের মধ্যে নিশ্চয়ই পার্থক্য আছে, কি বলেন?

—তা জানি না, নীল কোটের কণ্ঠ নিষ্প্রভ শোনায়—আমার নাম মৃগাঙ্ক রায়। আপনার?

—আমার নাম জলধর সেন।

—ও, আপনিই সেই বিখ্যাত লেখক জলধর সেন? মৃগাঙ্ক রায় গদ্‌গদ্ হয়ে ওঠে।—আমি আপনার লেখা দু-একখানা বই পড়েছি।

—ঠিক ধরেছেন। তবে লেখা আমার প্রোফেশন নয়। আমি বিরাট পৈতৃক জমিদারী উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছি। লেখাটা আমার নেশা। আরও একটা নেশা আছে আমার। আর তা হচ্ছে দেশবিদেশে ঘুরে বেড়ানো।

—আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে সত্যিই খুব আনন্দিত হলাম আমি। নীল কোটের আন্তরিক আনন্দ ফুটে ওঠে তার সারা মুখে।

—কিন্তু দুঃখের বিষয় আমি আপনার কোনও উপকারেই আসছি না। যদি কিছু মনে না করেন ত একটা কথা বলি।

—বলুন। নীল কোট কৌতূহলী হয়ে ওঠে।

—আমি আপনার জন্যে একটু চেষ্টা করলেই হয়ত একটা কাজের বন্দোবস্ত করে দিতে পারি। যদি আপনার ঠিকানাটা আমাকে জানান তবে—দামী স্যুট অসমাপ্ত রেখেই কথা শেষ করে।

—নিশ্চয়ই। আমি কোল্‌কাতায় আমার এক বন্ধুর মেসে আপাততঃ আছি। লিখুন : কেয়ার অব্ যতীন্দ্র মিশ্র, তেরো নম্বর আরপুলী লেন, কোল্‌কাতা।

ঠিকানা লিখে নিয়ে দামী স্যুট বলে—যদি কাজের সন্ধান পাই, আমি এই ঠিকানায় জানাব। আপনি ইতিমধ্যে কাজ না পেলে আমার সঙ্গে দেখা করে নতুন কাজ নেবেন।

—ধন্যবাদ।

নীল কোট মৃদু হেসে ধন্যবাদের আন্তরিকতা জ্ঞাপন করে।

গাড়ি ছুটে চলে কোল্‌কাতার দিকে।

দুই

—নতুন চাকরি—

মৃগাঙ্ককে দেখেই তার বন্ধু যতীন সহাস্যে প্রশ্ন করে—কি খবর রে, চাকরীর কিছু ব্যবস্থা হলো নাকি?

—না। দুঃখিতভাবে মৃগাঙ্ক উত্তর দেয়—এমন কি ট্রেন ফেয়ারটাও নষ্ট হলো। ওরা

জানাল 'ভ্যাকেন্সি' আগেই 'ফিল আপ' হয়ে গেছে। যদি নিজের বোকামির জন্যে আগে চিঠি না লিখে যাই, তবে তার জন্যে ওরা নিশ্চয়ই দায়ী নয়।

—তা ত বটেই। তবে ফিরে আসার টাকাটা পেলি কোথায়?

—সে এক মজার ব্যাপার। রাস্তায় একটা বন্ধু জুটে গেল। ঠিক আমার মতোই চেহারা। একেবারে হুবহু এক। এমন কি গোঁফ পর্যন্ত আমার মতো করে ছাঁটা।

—বেশ মজা ত! আচ্ছা চল্, আমি এখন যাব ইণ্ডিয়া হোটেলে। ওখানে একটি মেয়ের সঙ্গে একটা ব্যবসায়সংক্রান্ত ব্যাপারে এন্‌গেজমেণ্ট আছে। যেতে যেতেই তোর গল্পটা শোনা যাবে। চল্ তোর সঙ্গেও তার পরিচয় করিয়ে দিই। কাজে লাগতে পারে ভবিষ্যতে। বেশ ধনী লোকের স্ত্রী। যথেষ্ট প্রতিপত্তিও আছে।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ। ভদ্রলোক আগে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পোস্টে ছিলেন। এখন রাইটার্স বিল্ডিং-এ ভাল পোস্টে কাজ করেন। বাড়ির অবস্থাও খুব ভাল।

—ভদ্রমহিলার সঙ্গে আলাপ হলো কি করে?

—সেটা পরে জানাব। ভদ্রমহিলাও একজন প্রখ্যাত মহিলা ছিলেন। ইতিপূর্বে দুটি ফিল্মে অভিনয়ও করেছেন। অনিন্দ্য চেহারা। ভদ্রলোকের সঙ্গে 'লাভ্-ম্যারেজ' হয়েছিল বলে শুনেছি।

—ভদ্রলোকের নাম? মৃগাঙ্ক ভ্রূকুটি করে।

—শশধর ব্যানার্জী। যতীনের কণ্ঠ অমলিন।

—যাক্, যদি 'ব্যাকিং'-এর জোরে একটা চাকরী-টাকরী মিলে যায় তবে ভাগ্য ভালই বলতে হবে। চল্ তবে। মৃগাঙ্কের মুখে আশার ছায়া।

দুজনে বেরিয়ে এসে একটা ট্যাক্সিতে চেপে বসে। ট্যাক্সি আধ-ঘণ্টার মধ্যেই ইণ্ডিয়া হোটেলের সামনে এসে থামে।

সবে পৃথিবীর বুকে সন্ধ্যা নেমেছে। রাঙা আকাশ হয়ে উঠেছে ধূসর।

ইণ্ডিয়া হোটেলে বেশ জনসমাগম হয়েছে আজ। এককোণে রেডিওতে ক্ষীণ বাজনা চলেছে। বিলিতি অর্কেস্ট্রা। বয়-বেয়ারারা ছুটোছুটি করছে। ঘন ঘন আদেশধ্বনি ভেসে যাচ্ছে—বোয়, জল্‌দি!

কোণের টেবিলে অপূর্ব সুন্দরী একটি যুবতীকে বসে থাকতে দেখা গেল।

সুন্দরী কথাটা এতদিন মৃগাঙ্ক শুধু শুনে এসেছে। আজ এই নারীকে দেখে মনে হলো, সত্যি সুন্দরী বললে এঁকেই বলতে হয়। দামী বেশভূষা আর অলঙ্কারের প্রাচুর্য থেকে তাঁকে নিঃসন্দেহে ধনী বলে বোঝা যায়।

যতীন এগোতে এগোতে বলে—উনিই প্রমীলা দেবী।

—বুঝেছি! মৃগাঙ্কের চোখ উজ্জ্বল।

দুজনে এগোয়। যতীন নমস্কার করে। ভদ্রমহিলা ধীরে ধীরে ঘাড়টা নেড়ে প্রতিনমস্কার জানান। যতীন মৃগাঙ্কের সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দেয়।

প্রমীলা দেবী খুশি হয়ে পরিচয়ের আন্তরিকতা জ্ঞাপন করেন।

যতীন শুরু করে—আপনার সঙ্গে অত্যন্ত স্বল্প পরিচয়। কিন্তু এর মধ্যেই আমি আপনার কাছে ব্যবসায়সংক্রান্ত সুবিধের জন্যে দাবী জানিয়েছি। আর একটা কথা, আমর এই বন্ধুটিও বড় অসুবিধেয় আছে। যদি একটা চাকরীর ব্যবস্থা করে দেন ত ও চিরদিন বাধিত থাকবে আপনার কাছে।

—বুঝলাম। প্রমীলা দেবী বলেন—কিন্তু গভর্নমেন্টের কাজ ত আর চট্ করে হয় না। দরখাস্ত করে অপেক্ষা করতে হবে। মৃগাঙ্কের দিকে তির্যক চেয়ে প্রমীলা দেবী কথা শেষ করেন।

—তা বটে। আপনার সাহায্য চাইলাম এই জন্যে যে, আপনি একটু সাহায্য করলে যতটা সহজ হবে, অন্যভাবে তত সহজে হবে না। যতীন কৈফিয়ৎ দেবার চেষ্টা করে।

প্রমীলা দেবী মৃদু হেসে কিছু খাবারের অর্ডার দেন।

সেদিন মেসে ফিরে এসেই মৃগাঙ্ক একটি পত্র পেল।

যতীনের ঠিকানাতেই চিঠিখানা লেখা। দুই বন্ধুই চিঠিটা পেয়ে আনন্দিত হয়। হয়ত কোনও শুভ সংবাদ।

চিঠিখানা খুলে লাইনগুলোর ওপর চোখ বুলিয়েই মৃগাঙ্ক আনন্দে প্রায় লাফিয়ে ওঠে। সহায়সম্বলহীন অবস্থায় যে নিদারুণ দুর্দশার মধ্যে দিয়ে তার প্রতিটি মুহূর্ত কাটছিল, তাতে এ যেন একটি পরম আশীর্বাদ!

ছোট চিঠি ঃ

প্রিয় মৃগাঙ্কবাবু,

যদি ইতিমধ্যে কোনও কাজের যোগাড় করতে না পেয়ে থাকেন, তবে একটা কাজ দিয়ে আপনাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত আছি আমি। ভাল অর্থই আপনি এ থেকে উপার্জন করতে পারবেন। যদি আপনি এ কাজটি পেতে চান তবে কাল সকাল সাড়ে আটটায় দেশবন্ধু পার্কের দক্ষিণ কোণে আমার সঙ্গে দেখা করুন। আশা করি আপনি নিশ্চয়ই আসবেন। শারীরিক ও মানসিক কুশলের প্রত্যাশা রাখি। প্রীতি ও শুভেচ্ছা নেবেন। হ্যাঁ, ঠিক সাড়ে আটটাতেই আসবেন কিন্তু! না হলে দেখা পাবেন না। ইতি—

ভবদীয়

জলধর সেন।

চিঠিখানা আগাগোড়া পড়ে শেষ করে মৃগাঙ্ক বলল—উঃ, ভাগ্যিস্ সেদিন ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হয়েছিল! চাকরী না পেলেও আমার বর্ধমান যাওয়া বৃথা হয়নি। সত্যিকারের ভাল কাজ একটা পাব বলে আশা রাখি। তার কণ্ঠে অমলিন আনন্দের আভাস।

যতীনও বন্ধুর সৌভাগ্যে যথেষ্ট আনন্দ প্রকাশ করে।

পরদিন বেলা ঠিক সাড়ে আটটার সময় দেখা যায় মৃগাঙ্ক দেশবন্ধু পার্কের দক্ষিণ কোণে পায়চারী করছে।

একটু পরেই দেখা গেল ভদ্রলোককে। আজও তার পরনে দামী স্যুট—তবে নতুন রঙের। নিত্য নতুন দামী স্যুট যার পরনে দেখা যায় তার আর্থিক সচ্ছলতা সম্বন্ধে নিশ্চিত ধারণা মনে বাসা বাঁধে।

—নমস্কার স্যর! মৃগাঙ্ক আজ প্রথম থেকেই কিছুটা বিনয়নম্র।

—নমস্কার! সংক্ষেপে বক্তব্য শেষ করছি। বেশি সময় হাতে নেই। শুনুন, আপনার কাজ হচ্ছে আজ সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় একটি প্রখ্যাতা অভিনেত্রীর সঙ্গে বসে কিছুক্ষণ কথা বলতে হবে। আপনাকে যে টাকা দিচ্ছি তা নিয়ে কোনও ভাল দোকান থেকে ঠিক আমার মতো এক সেট স্যুট কিনে ফেলুন। তারপর সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার আগে 'হোটেল রয়্যালে' গিয়ে বসবেন। মনে করুন আপনার নামই জলধর সেন। আমার সঙ্গে আপনার চেহারার

যা মিল তাতে আমার নাম করে আপনি এন্‌গেজমেণ্ট রক্ষা করলে কোনও অসুবিধে হবে না। এক নিঃশ্বাসে ভদ্রলোক বক্তব্য শেষ করে ফেলতে চায়।

—কিন্তু আপনি দেখা করলেই ত পারেন স্যর! মৃগাঙ্কের কণ্ঠ নিষ্প্রভ।

—তা হয় না। আমি ঠিক সময়ে দক্ষিণেশ্বরে একটি ফিল্ম স্টুডিওতে ব্যস্ত থাকব। আমাকে সেখানে যেতেই হবে। যদি না যাই, তবে অবশ্য আপনাকে ওখান থেকে সরিয়ে দিয়ে তাঁর সঙ্গে গিয়ে কথা বলতে পারব।

—কিন্তু আমার কথাবার্তা যদি আপনার মতো না হয়? মৃগাঙ্ক আশঙ্কিত হয়।

—সে ভয় নেই, আমি ওঁর সঙ্গে বিশেষ কথাবার্তা বলবার সুযোগ পাইনি এর আগে। আপনি এন্‌গেজমেণ্ট রক্ষা করে পরবর্তী এন্‌গেজমেণ্ট করবেন শুক্রবার রাত নটার পর। আপনার ওই কাজের জন্য একশো টাকা দিচ্ছি আপাততঃ। বাকী একশো টাকা কাজ শেষ হলে পাবেন। আর মাঝে মাঝে এই ধরণের 'প্রক্সি' দেবার প্রয়োজন হলে প্রতিবারেই উপযুক্ত অর্থ পাবেন আপনি।

ভদ্রলোকের হাত থেকে একতাড়া নোট নিয়ে পকেটে রাখতে রাখতে মৃগাঙ্ক প্রশ্ন করে—কিন্তু ওঁকে চিনব কি করে?

—উনি 'ওমর খৈয়াম' ছবিতে নায়িকার ভূমিকায় নেমেছেন। নাম ঊর্মিলা দেবী। যে কোনও সিনেমা হলে গিয়ে ওঁর ফটোর 'স্টিল্' দেখে ঠিক চিনে রাখবেন। হোটেলে ওঁকে দেখলেই চিনতে পারবেন আপনি।

আর কথা না বলে জলধর সেন ধীরপদে এগিয়ে চলে। মৃগাঙ্ক অবাক হয়ে ভাবতে থাকে, পৃথিবীতে এমন অদ্ভুত কাজ কেউ কখনও করেছে বলে মনে হয় না।

তিন

—নরহত্যার সংবাদ—

উত্তর কোল্‌কাতার সম্ভ্রান্ত হোটেলগুলির মধ্যে সবার আগেই মনে পড়ে 'হোটেল রয়্যাল'-এর নাম।

অভিজাত হোটেল। দেশী-বিদেশী অজস্র লোকের ভিড়ে দিন-রাত হোটেল সরগরম থাকে। তবে রাতের দিকেই সাধারণতঃ ভিড়টা হয় বেশি। তার কারণও অবশ্য আছে। হোটেলের সংলগ্ন 'বার' আর সেই সঙ্গে অর্কেস্ট্রার ব্যবস্থা থাকতে অনেকে পানীয়ের উদ্দেশ্যেও হোটেলে এসে সমবেত হয়। তবে সাধারণ খদ্দেরর সংখ্যাও কম নয়। আর 'বার' সাধারণ হোটেলের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক্ একটি অংশে।

সেদিন সন্ধ্যা সাতটায় মৃগাঙ্ক রায়কে দেখা গেল হোটেলের একটি টেবিলের সাম্‌নে বসে উদ্বিগ্নভাবে কারও জন্যে প্রতীক্ষা করতে। তার কারণও অবশ্য আছে। একটু আগে না গেলে যদি কিছু পূর্বেই ঊর্মিলা দেবী এসে ঘুরে চলে যান, তবে তার সমস্ত এন্‌গেজমেণ্টটাই সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে যাবে।

ইতিপূর্বেই সে একটি ছবিঘরে গিয়ে ঊর্মিলা দেবীর বিশেষ কতকগুলি ভঙ্গিমার অনেকগুলো ছবি দেখে এসেছে। ফলে তাঁকে দেখলে তার চিনতে আদৌ কষ্ট হবে না।

পোষাক-পরিচ্ছদের মধ্যেও তখন তার যথেষ্ট পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। পরনে দামী

স্যুট। গায়ে ওভারকোট। ঠিক এই ধরণের স্যুট আর ওভারকোট জলধর সেনের পরনে সে দেখেছে।

একটা প্রন্ কাট্‌লেটের অর্ডার দিয়ে সে ঘন ঘন হাতঘড়ির দিকে তাকাতে থাকে। তার বন্ধু যতীনের হাতঘড়িটা সে ধার করে এনেছিল। তার ভাবভঙ্গি যথেষ্ট আদবকায়দাদুরস্ত বলেই মনে হয়। তা ছাড়া তার চেহারার মধ্যেও বেশ একটা আভিজাত্য ছিল। ভাল বেশভূষায় তাকে যথেষ্ট অভিজাত বলে যে কোনও লোক মনে করতে পারে।

বয় খাবার দিয়ে যায়। খেতে খেতে মৃগাঙ্ক লক্ষ্য করে ঘড়িতে কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে সাতটা।

কিন্তু তবু উর্মিলা দেবীকে কোথাও দেখা যায় না।

আরও পনের মিনিট কাটল।

হোটেলের দরজা দিয়ে একটি নারীমূর্তিকে প্রবেশ করতে দেখা গেল। অপূর্ব সুন্দরী। আনন্দিতভাবে উঠে দাঁড়ায় মৃগাঙ্ক। ধীরে ধীরে উঠে ভদ্রমহিলার সাম্‌নে গিয়ে দাঁড়ায়। হাসিমুখে বলে—নমস্কার, উর্মিলা দেবী।

উর্মিলা দেবী চারদিকে তাকিয়ে কারও খোঁজ করছিলেন। এবার সাম্‌নে মৃগাঙ্ককে দেখে তিনি হাসিমুখে বলে ওঠেন—নমস্কার! আপনি ত—

—হ্যাঁ, আমিই জলধর সেন।

—আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে সত্যিই খুব খুশি হলাম। চলুন ওধারে গিয়ে বসা যাক।

—চলুন। আমি বহুক্ষণ হলো আপনার জন্যে অপেক্ষা করছি।

—আই অ্যাম্ সো স্যরি। বড্ড দেরী হয়ে গেছে। মিনিট কুড়ি ত বটেই।

মণিবন্ধের ওপর আঁটা ছোট্ট হাতঘড়িটার দিকে তাকিয়ে উর্মিলা দেবী কথা শেষ করেন।

দুজনে এসে বসে আগের ছেড়ে-আসা টেবিলটাতেই। আবার নতুন খাদ্যের অর্ডার দিয়ে মৃগাঙ্ক উর্মিলা দেবীর দিকে বেশ ভালভাবে দৃষ্টিকে স্থাপন করে। তিনি যে যথেষ্ট সুন্দরী এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। ছবিতে সে যা দেখেছে তার চেয়ে এঁর দৈহিক লাবণ্য আরও অনেক বেশি। কিন্তু একটা কথা বার বার ঘুরে বেড়ায় মৃগাঙ্কের মনে। সেদিন তার বন্ধু যতীন যে প্রমীলা দেবীর সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল, তাঁর চেহারার সঙ্গে এঁর যেন সামান্য একটু মিল আছে। বিশেষ করে মুখের অনেকটা সাদৃশ্য প্রথম দর্শনেই চোখে পড়ে।

মৃগাঙ্ক ভাবে, এর মধ্যে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। তার সঙ্গে জলধর সেনের ত একেবারে হুবহু মিল। সামান্য সাদৃশ্যের মধ্যে নিশ্চয় আশ্চর্য হবার মতো এমন কিছু নেই।

—আপনি কি ভাবছেন? উর্মিলা দেবীই প্রথম প্রশ্ন করেন।

মৃগাঙ্ক সচকিত হয়। তার মনে পড়ে যে সে একজনের পরিবর্তে অভিনয় করছে, তাই তাকে আরও সাবধান হতে হবে।

—এমন কিছু নয়, মৃগাঙ্ক বলে—একটা গল্পের শেষটুকু মিলাতে পারছি না। তাই বারবার সেই চিন্তাটাই মাথার মধ্যে ঘুরছে।

যথেষ্ট সচেতন থাকা সত্ত্বেও তার কথাটা কেমন যেন অপ্রতিভ শোনায়।

—হ্যাঁ, অখিলবাবুই প্রথমে আমাকে বলেন আপনার কথা। এন্‌গেজমেন্টের কথাও আমাকে তিনিই জানিয়েছেন। কাজেই আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। তিনি বলেছেন, আপনার নতুন-লেখা একটা বই নাকি অল্পদিনের মধ্যেই চিত্রে রূপান্তরিত হচ্ছে।

মৃগাঙ্ক ঘাড় নেড়ে বলল—হ্যাঁ। আমি অখিলকে সে কথাটা আগেই বলেছিলাম।

—আমাকে কিন্তু সে বইতে একটা চান্স করে দিতে হবে! আদুরে ভঙ্গিতে বলেন ঊর্মিলা দেবী।

—আপনার জন্যে চেষ্টা করব আমি। বেশ দরদের ভঙ্গিতেই মৃগাঙ্ক বলে—আমার মনে হয়, ও পার্টটা আপনাকে খুব সুন্দর মানাবে।

—আপনার লেখা ভাল কি কি বই সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে?

মৃগাঙ্ক জলধর সেনের লেখা বিভিন্ন বই পড়ত। সে তাই জানত, সম্প্রতি তাঁর লেখা ভাল দুখানা বই প্রকাশিত হয়েছে। একখানার নাম 'অন্তরাগ', অন্যখানা একটা ছোট গল্প-সংকলন—নাম 'ক্ষণবসন্ত'। তাই চিন্তা না করে সে বই দুখানার নাম গড় গড় করে বলে ফেলে।

—সত্যিই আপনার ছোটগল্পগুলো কিন্তু আপনার উপন্যাসের চেয়েও আমার বেশি ভাল লাগে। দুখানা 'কম্‌প্লিমেণ্টারী কপি' পাব নিশ্চয়ই?

—হ্যাঁ, তার জন্যে আর অসুবিধের কি আছে! আমাদের পরবর্তী এন্‌গেজমেণ্ট হচ্ছে শুক্রবার রাত নটায়। এই হোটেলেই দেখা হবে আপনার সঙ্গে। বই দুখানা সেদিন নিয়ে আসব। সেদিন আমি খবরটাও জানাব। মনে হয় আমার বইতে সুযোগ পাবেন আপনি।

বয় খাবার দিয়ে যায়।

খেতে খেতে আরও বিভিন্ন কথাবার্তা চলতে থাকে। মৃগাঙ্ক নিজেই অবাক হয়ে ভাবতে থাকে, সে যে এত সুন্দরভাবে 'প্রক্সি' দিতে পারবে তা ছিল সম্পূর্ণ তার ধারণার বাইরে।

আধঘণ্টার মধ্যেই কথাবার্তা প্রায় শেষ হয়। খাওয়া শেষ হয়ে এসেছিল। মৃগাঙ্ক তার পকেট থেকে একখানা দশটাকার নোট বের করে বিলটা চুকিয়ে দেয়। দুজনে হোটেল ছেড়ে বেরিয়ে যাবার উপক্রম করছে এমন সময় হঠাৎ হোটেলের ম্যানেজারকে তাদের দিকে দ্রুত আসতে দেখা গেল।

ম্যানেজার তাদের সাম্‌নে এসে ঊর্মিলা দেবীর দিকে চেয়ে প্রশ্ন করেন—কিছু মনে করবেন না, আপনার নামই ত ঊর্মিলা দেবী?

ঊর্মিলা দেবী পাংশুমুখে বলেন—হ্যাঁ, কিন্তু কেন বলুন ত? আমি তো আপনাকে একেবারেই চিনি না।

ম্যানেজার একটু সম্ভ্রমসূচক ভঙ্গিতে বলেন—আমি কিন্তু আপনার নাম শুনেছি। আপনার অভিনয়ও দেখেছি আমি সম্প্রতি—তাই আপনাকে দেখেই চিনতে পেরেছি। টেলিফোনে কে যেন আপনাকে ডাকছেন বলে মনে হলো।

—টেলিফোনে? ঊর্মিলা দেবীর মুখে একরাশ বিস্ময়।

—হ্যাঁ। আপনি যে এখন 'হোটেল রয়্যালে' আসবেন তা কি কাউকে আগে জানিয়েছিলেন? ম্যানেজারের মুখ সপ্রশ্ন।

—হ্যাঁ, বাড়িতে বলে এসেছিলাম। যাক্, চলুন দেখি টেলিফোন আবার কি বার্তা বহন করে আনছে।

দুজনেই উঠে দাঁড়ায়। পাশেই ম্যানেজারের ঘরে টেলিফোন। রিসিভারটা পাশে নামানো ছিল। ঊর্মিলা দেবী রিসিভারটা তুলে নিয়ে প্রশ্ন করেন—হ্যালো কোত্থেকে কথা বলছেন?

ওধার থেকে উত্তর ভেসে এলো—আমি প্রমীলা।

—কে, দিদি? উৎসুককণ্ঠে ঊর্মিলা দেবী প্রশ্ন করেন—হঠাৎ হোটেলেই ফোন করলে কেন? কি ব্যাপার তা ত বুঝতে পারছি না—

প্রমীলা দেবীর গলা কেমন যেন কাঁপা-কাঁপা শোনায়—আমি বাড়িতে ফিরে এসে দেখি ওঁকে কে যেন গুলি করে হত্যা করেছে! পাশেই একটা রিভলভার পড়ে থাকতে দেখা গেছে। এইমাত্র পুলিশে জানালাম। তুই এক্ষুণি চলে আয় বাড়িতে। আমার বড্ড ভয় করছে!

উর্মিলা দেবী ধীরকণ্ঠে বলেন—ভয় পেয়ো না দিদি। আমি এক্ষুণি আসছি। কিন্তু কি অদ্ভুত ধরণের ঘটনা। আমি যে কল্পনাতেও আনতে পারছি না।

উর্মিলা দেবী দিদিকে সাহসের কথা বললেও তাঁর ভাব দেখে বোঝা যায় যে তিনি নিজেও যথেষ্ট ভয় পেয়েছেন। এ ধরণের আকস্মিক দুর্ঘটনা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত তাঁর কাছে।

টেলিফোনের রিসিভারটা নামিয়ে রেখে উর্মিলা দেবী বলেন—চলি জলধরবাবু। অল্পদিনের মধ্যেই দেখা হবে। শুক্রবার রাত নটায়। জরুরী কাজে আমাকে চলে যেতে হচ্ছে। মারাত্মক একটা দুর্ঘটনা—উর্মিলা দেবীর ফ্যাকাশে মুখ থেকে কথাটা শেষ হয় না।

মৃগাঙ্ক প্রশ্ন করে—যদি কিছু মনে না করেন ত একটা কথা জিজ্ঞাসা করি আপনাকে।

—বলুন।

—প্রমীলা দেবী আপনার কে হন?

—দিদি। আপনি ওঁকে চেনেন নাকি?

—হ্যাঁ। শশধরবাবুর স্ত্রী ত?

—ঠিকই ধরেছেন। কিন্তু এইমাত্র দিদির ফোন পেলাম, কে বা কারা জামাইবাবুকে গুলি করে হত্যা করেছে! আমার মাথার মধ্যে কেমন যেন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে জলধরবাবু। এমন দিনে আপনার সঙ্গে পরিচয় হলো যে—উর্মিলাকে বড় বেশি অপ্রতিভ দেখায়।

—না না, তার জন্যে আমি কিছু মনে করছি না উর্মিলা দেবী। মানুষের জীবনে যে কোনও সময়ে যে কোনও বিপদ আসতে পারে। আমার বরং উচিত সম্ভব হলে আপনাকে সাহায্য করা।

—না, আমি এ সময়ে আপনাকে সেখানে নিয়ে গিয়ে বিরক্ত করতে চাই না। কত অসুবিধা এসে পড়তে পারে এ সময়ে।

—তবে ভবিষ্যতে প্রয়োজন হলে আমার সাহায্য নিতে ভুলবেন না। মৃগাঙ্ক আপনমনেই কথাগুলো বলে। বোধ হয় মুহূর্তের জন্যে সে ভুলে যায় যে, সে আসল জলধর সেন নয়।

উর্মিলা দেবী নমস্কার জানিয়ে হোটেল থেকে বেরিয়ে গিয়ে একটা ট্যাক্সিতে চেপে বসেন।

হাতঘড়ির দিকে চেয়ে মৃগাঙ্ক দেখে রাত সাড়ে আটটা।

চার

—বিচিত্র যোগাযোগ—

উর্মিলা দেবীকে বিদায় দিয়ে মৃগাঙ্ক আধঘণ্টার ওপর হোটেলে অপেক্ষা করল। সে আশা করেছিল, জলধর সেন স্টুডিওর কাজকর্ম শেষ করে রাত নটার মধ্যে নিশ্চয়ই ফিরে আসবে।

কিন্তু দুঃখের বিষয় রাত সওয়া নটা পর্যন্ত অপেক্ষা করেও সে কাউকে দেখতে পেল না। অগত্যা বাধ্য হয়েই উঠে হোটেল থেকে বাইরে বেরিয়ে আসে সে।

হোটেল থেকে বেরিয়ে বড় রাস্তার মোড়ে এসে সে বাসের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে।

বাস আসতে তখনও বেশ কিছুটা দেরী ছিল। আনমনে দাঁড়িয়ে নানা কথা ভাবতে থাকে মৃগাঙ্ক। তার চারদিকে কি অদ্ভুত ঘটনা-সংঘাতের সৃষ্টি হচ্ছে, এটাই ছিল তার প্রধান ভাবনা।

এমন সময় দেখা যায় দীর্ঘদেহ, স্বাস্থ্যবান একজন ভদ্রলোককে তার দিকে এগিয়ে আসতে।

—নমস্কার! মৃগাঙ্কের দিকে চেয়ে আগন্তুক ভদ্রলোক এমনভাবে কথা বলেন যেন তিনি তাঁর বহু পরিচিত বন্ধু।

মৃগাঙ্ক প্রতিনমস্কার জানিয়ে বলে—আপনাকে কিন্তু আমি একেবারেই চিনতে পারছি না স্যার!

ভদ্রলোক বলেন—চিনবেন কি করে? আমাকে নিশ্চয়ই এর আগে কখনও দেখেননি। আমার এক বন্ধু আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান। তিনি পাশের রেস্টুরেণ্টে আপনার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে অপেক্ষা করছেন।

মৃগাঙ্ক ভদ্রলোকের সঙ্গে এগিয়ে চলে পাশের রেস্টুরেণ্টের দিকে। সেখানে গিয়ে একটা কেবিনের মধ্যে প্রবেশ করে দুজনে।

সেখানে বসেছিল জলধর সেন। ঠিক একই রঙের স্যুট আর ওভারকোট তার পরনে। অত্যন্ত পরিচিত কোনও লোক ছাড়া তাদের দুজনকে যে পৃথক্‌ভাবে চিনতে পারবে না এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে।

মৃগাঙ্ককে কেবিনে পৌঁছে দিয়ে অপরিচিত ভদ্রলোক বিদায় নেন।

জলধর সেন মৃগাঙ্কের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করে—আপনি ঠিকমতো কথাবার্তা বলতে পেরেছিলেন ত?

—হ্যাঁ, কিন্তু ওধারে ওঁর বাড়িতে একটা মারাত্মক অ্যাক্সিডেণ্ট ঘটে গেছে।

মৃগাঙ্কের স্বর শুনে বোঝা যায় যে ঊর্মিলা দেবীর বাড়ির দুর্ঘটনা তার মনেও যথেষ্ট রেখাপাত করেছে।

—তাই নাকি? আচ্ছা সে ব্যাপারটার সম্বন্ধে আমি পরে খবর নেব। জলধর সেনের কণ্ঠস্বরে নিস্পৃহতা ফুটে ওঠে, বলে—আপনার প্রাপ্য টাকাটা নিন। আর যদি আজকেই কোল্‌কাতা ত্যাগ করে আপনি বাইরে যেতে প্রস্তুত থাকেন তবে আরও একশো টাকা আপনাকে দিতে রাজী আছি আমি।

—কিন্তু কোল্‌কাতার বাইরে যেতে হবে কেন? মৃগাঙ্ক যথেষ্ট বিস্মিত হয় কথাটা শুনে।

—যদি আপনার আপত্তি না থাকে—জলধর সেন আল্‌তোভাবে সিগারেটে টান দিয়ে বলে।

—আপত্তি নয়, বিশেষ প্রয়োজনেই কোল্‌কাতায় থাকতে হবে আমাকে। দু-একটা ভাল কাজের খোঁজও পাচ্ছি আমি। মৃগাঙ্কের কণ্ঠে আপত্তির সুর সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

—বেশ, তবে আপনার টাকাটা নিন। ভবিষ্যতে ঠিকানা পরিবর্তন যদি করেন ত 'বিশ্ববার্তা' পত্রিকার ব্যক্তিগত কলমে বিজ্ঞাপন দেবেন। তা হলেই আমি তা জানতে পারব।

—ধন্যাবাদ।

টাকাটা পকেটে রেখে মৃগাঙ্ক যখন পথে পা দেয় তখন রাত সাড়ে নটার কম নয়।

পরদিন সকাল।

মৃগাঙ্ক মেস থেকে বেরিয়েই কিনে ফেলে সেদিনের একখানা 'বিশ্ববার্তা'। প্রথম পৃষ্ঠায় বড় বড় হরফে ছাপা হয়েছিল ঃ

সরকারী কর্মচারী রহস্যজনকভাবে নিহত !

মৃতদেহের কাছে একটি রিভলভার প্রাপ্ত।

পর পর দুটি গুলি দেহে বিদ্ধ। হত্যা বলিয়া পুলিশের দৃঢ় ধারণা।

এ পর্যন্ত কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

এ খবরটা মৃগাঙ্কের ইতিপূর্বেই জানা ছিল। তবু সে মনোযোগ সহকারে সমস্ত অংশটা পড়তে লাগল।

তাতে হত্যাকাণ্ডের বিস্তৃত বর্ণনাও ছাপা হয়েছিল ঃ

'মৃত সরকারী কর্মচারী শশধরবাবুর স্ত্রী প্রমীলা দেবী ও তাঁর সহোদরা প্রখ্যাতা অভিনেত্রী ঊর্মিলা দেবী সেদিন বিশেষ কাজে বাড়ির বাইরে ছিলেন। প্রমীলা দেবীই সকলের আগে বাড়ি ফিরে আসেন। তিনি এসে দোতলার ঘরে ঢুকেই দেখতে পান তাঁর স্বামীর দেহ খাটের উপরে লম্বালম্বিভাব পড়ে আছে। রক্তে বিছানা ভেসে যাচ্ছে। হাতের কাছে একটা রিভলভার পড়ে থাকতে দেখা গেছে।

অবশ্য পুলিশের মতে এটা আত্মহত্যা নয়। পর পর দু'বার নিজ বুকে গুলি করে আত্মহত্যা করা কোনও লোকের পক্ষে সম্ভব নয়—এই তাঁদের অভিমত।

কিন্তু এই বিচিত্র হত্যাকাণ্ডের কোনও কিনারাই এখনও পর্যন্ত হয়নি। কোনও লোককে এখনও পর্যন্ত গ্রেপ্তার করা হয়নি বলে জানা গেছে।'

মৃগাঙ্ক খবরটুকু পড়া শেষ করে হঠাৎ 'বিশ্ববার্তা'র 'ব্যক্তিগত' বিভাগীয় বিজ্ঞাপনের দিকে দৃষ্টিকে সঞ্চালিত করল। সাধারণতঃ সে কখনও এই সব বিজ্ঞাপনের দিকে মনোযোগ দেয় না। কিন্তু জলধর সেনের কথাগুলিই তার মনকে সেদিকে আকর্ষণ করল।

কিন্তু আর একদিকে চোখ পড়তেই চমকে উঠল সে। ছোট্ট একটা বিজ্ঞাপনই তার এই বিস্ময়ের উৎস।

বিজ্ঞাপন বের হয়েছিল ঃ

হরিহর রায়ের পুত্র মৃগাঙ্ক রায় যদি আমাদের সঙ্গে অবিলম্বে সাক্ষাৎ করেন, তবে তিনি বিশেষভাবে উপকৃত হবেন। জরুরী একটা বিষয়ে আমরা তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাই। তাঁর ব্যক্তিগত উপকারের জন্যেই আমাদের তরফ থেকে এই বিজ্ঞাপন দেওয়া হচ্ছে।

মুখার্জী, পালিত অ্যাণ্ড কোং
অ্যাটর্নী অফিস
১৭ নং এসপ্ল্যানেড ঈস্ট, কোল্‌কাতা।

ভাল করে আগাগোড়া বিজ্ঞাপনটার ওপর আর একবার দৃষ্টি সঞ্চালন করে মৃগাঙ্ক বিস্মিত হলো। একটি অজ্ঞাত অ্যাটর্নী অফিস হঠাৎ কি কারনে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চায়? আর তার নামই বা তারা জানল কি করে? এ কী বিচিত্র যোগাযোগ!

মৃগাঙ্ক তক্ষুণি ঠিকানাটা ভাল করে দেখে নিয়ে একখানি চলন্ত বাসে উঠে বসল।

পাঁচ

—ঘটনার সূত্র—

পুলিশের পক্ষে অত্যন্ত জটিল যে সমস্ত কেসের সমাধান করা সহজসাধ্য হয় না, সেখানে প্রায় প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ডাক পড়ে প্রখ্যাত প্রাইভেট ডিটেকটিভ দীপক চ্যাটার্জীর। কোল্‌কাতা

পুলিশের সি. আই. ডি. বিভাগের কর্মকর্তারা অনেকবার দীপককে চাকরীতে যোগ দেবার জন্যে অনুরোধও করেছেন কিন্তু দীপক কোনওবারেই সে অনুরোধ রক্ষা করেনি।

সে বলে—স্বাধীনভাবে যে কোনও ব্যাপারে যখন খুশি হাত দেওয়া যায়, কিন্তু অন্যের ইচ্ছায় নিজের তদন্তপথ ও পদ্ধতিকে পরিচালিত করতে আমি পারব না। তা ছাড়া পুলিশের যখনই আমার কাছ থেকে যে সাহায্যের প্রয়োজন হবে, আমি সানন্দে সে সাহায্য করতে প্রস্তুত।

তাই জটিল কোনও কেসে যখন পুলিশ বিভাগ কোনও হদিস ঠিক করতে না পারে তখনই দীপককে সেখানে আমন্ত্রণের ব্যবস্থা হয়। শশধর ব্যানার্জীর হত্যাব্যাপারেও তাই দীপককেই আমন্ত্রণ জানানো হলো।

সেদিন বিকেলে দীপক ও ইন্স্পেক্টর বাসুকে দেখা গেল শশধর ব্যানার্জীর বাড়িতে।

দীপক আগেই পুলিশ ইন্ভেস্টিগেশনের রিপোর্টটা পড়েছিল। তাতে এই ব্যাপারটা যে আত্মহত্যা নয়—খুন, এই কথাটার ওপর বেশি জোর দেওয়া হয়েছে। শরীরের এমন মারাত্মক জায়গায় পর পর দু'বার নিজ হাতে বন্দুক দিয়ে আঘাত করা কোনও মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়!

এ ছাড়া তাতে আরও পাওয়া গেল, বন্দুকটা ছোঁড়া হয়েছিল অন্ততঃ দু' হাত দূর থেকে। ক্ষতচিহ্নগুলি থেকে মর্গের মেডিক্যাল অফিসার এই রিপোর্ট দিয়েছিলেন।

দীপক বলল—আমাদের তবে আর মৃতদেহের ব্যাপারে মাথা না ঘামিয়ে পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্যপ্রমাণ বা সূত্রগুলির ওপরে জোর দেওয়া উচিত।

—কিন্তু সূত্র কোথায় মিলবে বলুন দেখি। মৃতদেহ ত এখন এখানে নেই। তাই আমরা যা পেয়েছি তা ছাড়া আর আপাততঃ কিছু পাওয়া সম্ভব নয়।

দীপক বলে—বাড়িতে ঘটনার দিন যাঁরা ছিলেন, কিংবা যাঁদের কাছ থেকে কোনও সূত্র পাওয়া সম্ভব এমন লোকদের 'ক্রস্-একজামিন' করলে সূত্র যে অবশ্যই মিলতে পারে, এ সম্বন্ধে আমি নিঃসন্দেহ।

ইন্স্পেক্টর বাসু বললেন—কিন্তু পুলিশের তরফ থেকে একবার ক্রস্-একজামিনেশন হয়ে গেছে মিঃ চ্যাটার্জী। তাতে কোনও প্রয়োজনীয় কথাই প্রকাশ পায়নি।

—তা জানি, দীপক বলে—তবে আমাকে কেন এর মধ্যে টেনে আনলেন? আমি যদি বিশেষ কিছু করতে না পারি, তবে এ কেসে হাত দিয়ে লাভ কি?

মিঃ বাসু বলেন—তা বটে। আপনার তদন্তপথে এগিয়ে চলুন আপনি। আমি দেখি আপনাকে কতটা সাহায্য করতে পারা যায়।

দীপক বলে—প্রথমে প্রমীলা দেবীকে গোটাকতক প্রশ্ন করতে চাই। উনিই প্রথম মৃতদেহটা আবিষ্কার করেছিলেন।

মিঃ বাসু শশধরবাবুর বাড়ির একজন চাকরকে ডেকে বললেন যে একজন প্রখ্যাত ডিটেকটিভ প্রমীলা দেবীর স্বামীর হত্যাকাণ্ডের তদন্ত ব্যাপারে হাত দিয়েছেন। তিনি একবার প্রমীলা দেবীর সঙ্গে দেখা করতে চান। তাই তিনি যদি দয়া করে একবার বাইরের ঘরে আসেন।

ভৃত্য বাড়ির মধ্যে অদৃশ্য হয়।

মিনিট পনেরোর মধ্যেই প্রমীলা দেবীকে বাইরে হলঘরে এসে দাঁড়াতে দেখা যায়। শোকাচ্ছন্ন চেহারা। কেমন যেন শুক্নো। বিগত ঘটনাবলী তাঁর মনের ওপর কি নিদারুণ আঘাত হেনেছে তা তাঁকে দেখেই অনুমান করা যায়।

—ইনিই খ্যাতনামা প্রাইভেট ডিটেকটিভ দীপক চ্যাটার্জী, মিঃ বাসু পরিচয় করিয়ে দেন—আমরা শশধরবাবুর কেসটার ভার এঁর হাতে দিচ্ছি। ইনি যে অত্যন্ত সহজে হত্যাকারীকে গ্রেপ্তার করতে পারবেন এ বিশ্বাস আমাদের আছে।

দু' হাত তুলে প্রমীলা দেবী নমস্কার জানান।

দীপক বলে—এ কেসটার বিষয়ে গোটাকয়েক প্রশ্ন করতে চাই আপনাকে। আশা করি আমার প্রশ্নের সদুত্তর দিয়ে আমাকে সাহায্য করবেন আপনি।

প্রমীলা দেবী একটা চেয়ারের ওপর বসে পড়ে ধীরকণ্ঠে বলেন—আমি চাই আমার স্বামীর হত্যাকারী ধরা পড়ুক। তাঁর মতো একজন নির্বিরোধ পরোপকারী মানুষ যে এভাবে—

ভাবের প্রাবল্যে প্রমীলা দেবীর কথা থেমে যায়।

দীপক সান্ত্বনা দেবার জন্যে বলে—আমার দৃঢ় ধারণা এই যে অপরাধী বিশেষ কোনও একটা উদ্দেশ্য নিয়েই এইভাবে হত্যা করেছে শশধরবাবুকে। কিন্তু তার জন্যে দুঃখ করে লাভ নেই প্রমীলা দেবী। আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে, যেমন করে হোক অপরাধীর শাস্তিবিধান করা।

প্রমীলা দেবী কোনও কথা বলেন না। দীপক বলে—এবার আমি আমার প্রয়োজনীয় তথ্যগুলো জানতে চাই আপনার কাছ থেকে।

—বলুন। প্রমীলা দেবী নিষ্কম্পকণ্ঠে বলেন।

—আপনি হত্যাকাণ্ডের দিন কতক্ষণের জন্যে বাইরে ছিলেন?

—সন্ধ্যা ছটার কিছু আগে আমি বাড়ি থেকে বের হয়েছিলাম। তারপর ফিরে এসেছিলাম প্রায় আটটার সময়।

—ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই তা হলে ঘটেছিল এ ব্যাপারটা?

—ঠিক তাই।

—ওই দিন ঠিক ওই সময়ে কোনও লোকের আসবার কথা ছিল কি? কিংবা কোনও লোক আসতে পারে বলে মনে হয় আপনার?

—সে সম্বন্ধে সঠিক কিছু জানা ছিল না আমার।

—আচ্ছা, আপনাদের বাড়িতে আপনি আর শশধরবাবু ছাড়া আর কোনও লোকই কি থাকত না?

—হ্যাঁ, একজন ঝি ছিল ঘরের কাজকর্ম, রান্না ইত্যাদি করবার জন্যে। কিন্তু গত পনর দিন ধরে সে অনুপস্থিত।

—আচ্ছা, এই হত্যাব্যাপারে কি কোনও লোককে বিশেষভাবে সন্দেহ হয় আপনার?

—না, তেমন বিশেষ সন্দেহ কারও উপরেই হয় না।

—আচ্ছা, আর একটা কথা। এই ফ্ল্যাটে ঘটে যাওয়া কোনও ঘটনা বা এখানে কোনও লোক প্রবেশ করলে সে সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ জানা যেতে পারে এমন লোক কি কেউ আছে?

—হ্যাঁ, একতলায় একটা দর্জির দোকান আছে। তার মালিক হয়ত বাড়ির মধ্যে কোন্ সময়ে কোন্ লোক প্রবেশ করেছে এ খবর রাখতে পারে।

দীপক কথাটা শুনে মিনিটখানেক চুপ করে থাকে। তারপর বলে—আর কোনও কথা আমার জানবার নেই। ভবিষ্যতে আর কোনও বিষয় জানবার থাকলে এসে জেনে যাব।

হঠাৎ এভাবে মাঝপথে কথা থামিয়ে দীপক যে উঠে যাবে এ কথাটা ইন্স্পেক্টর বাসু অথবা প্রমীলা দেবী কেউই ধারণা করতে পারেননি। প্রমীলা দেবী কিছুটা বিস্মিত হলেন। ইন্স্পেক্টর বাসু দীপকের অনুগমন করেন।

ছয়

—আকস্মিক প্রাপ্তি—

এস্প্লানেড ঈস্ট-এর একটি বিরাট বাড়ির দোতলার ওপর মুখার্জী, পালিত অ্যাণ্ড কোম্পানীর বিরাট অ্যাটর্নী অফিস।

বাড়িখানার চেহারা এবং অফিসের অভিজাত সাজসজ্জা মৃগাঙ্কের মনে কেমন যেন একটা বাধার সৃষ্টি করছিল। ভেতরে যাবার প্রচুর ইচ্ছে থাকলেও কেমন যেন একটা আড়ষ্টতা এসে গ্রাস করছিল তাকে।

কিছুক্ষণ ধরে মনস্থির করে একসময়ে সে সোজা ভেতরে প্রবেশ করল।

একজন কেরাণীশ্রেণীর লোক সাম্নেই একটা টেবিলের সামনে বসে কি যেন লিখছিল। তাকে দেখে প্রশ্ন করল—কাকে চান স্যর?

মৃগাঙ্ক বিজ্ঞাপনখানা দেখিয়ে বলল—আপনাদের বিজ্ঞাপনখানা দেখে আমি এসেছি এখানে।

কেরাণী মৃগাঙ্কের চেহারার ওপর একবার আগাগোড়া তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিক্ষেপ করে বেশ একটু সম্ভ্রমের সঙ্গেই বলে ওঠে—আসুন আমার সঙ্গে।

কেরাণীকে অনুসরণ করে মৃগাঙ্ক পাশের ছোট একটা চেম্বারে গিয়ে উপস্থিত হলো। সেখানে বসেছিলেন একজন মাঝারী বয়সের স্থূলকায় ভদ্রলোক।

পরনে দামী স্যুট। মুখে পাইপ। মাথায় টাক। চেহারার মধ্যে বেশ একটা আভিজাত্য আছে!

—নমস্কার! মৃগাঙ্কই প্রথমে কথা বলে।

—কোথেকে আসছেন আপনি? প্রতিনমস্কার জানিয়ে ভদ্রলোক প্রশ্ন করেন। তাঁর চোখদুটি দেখে মনে হয়, তিনি যেন তীক্ষ্ণভাবে মৃগাঙ্কের আপাদমস্তক তাঁর চোখের কষ্টিপাথরে যাচাই করে নিচ্ছেন।

—উনি এসেছেন আমাদের বিজ্ঞাপনটা দেখে। কেরাণীশ্রেণীর লোকটি বলে।

—ও, আচ্ছা বসুন। কেরাণীটিকে বিদায় করে দিয়ে ভদ্রলোক বলেন—আমার নাম শ্রীমনোহর পালিত। মুখার্জী, পালিত অ্যাণ্ড কোম্পানীর অর্ধেক অংশ আমার। বিশেষ কারণেই এই বিজ্ঞাপনটা দিতে হয়েছে আমাদের। অবশ্য আপনার সঠিক পরিচয় না পাওয়া পর্যন্ত সেটা বলতে পারছি না।

ভদ্রলোকের কণ্ঠস্বর বিজ্ঞজনোচিত শোনায়।

মৃগাঙ্ক কোনও কথা বলে না। একটু থেমে ভদ্রলোক আবার সুরু করেন—আপনিই যে মৃগাঙ্ক রায় এ কথাটা প্রমাণ করতে পারবেন ত? মানে, হরিহর রায়ের পুত্র?

—কারণটা কি তা আগে খুলে বলুন না। ভয় নেই, আমার পরিচয় সম্বন্ধে আমি নিঃসন্দেহ। মৃগাঙ্কের স্বর কৌতূহলী শোনায়।

—কারণ অবশ্যই আছে, এবং সেটা আপনার পক্ষে শুভ।

—হ্যাঁ, আমি যে মৃগাঙ্ক রায় এবং হরিহর রায়ের পুত্র তা প্রমাণ করতে পারব। আমার মায়ের নাম বিনতা দেবী। আমার বাবা গুজরাটের একটি মার্কেণ্টাইল ফার্মের সামান্য মাইনের কেরাণী ছিলেন। বাবার দারিদ্র্যের জন্য আমি লেখাপড়ার তেমন সুযোগ পাইনি। আমি একজন ম্যাট্রিকুলেট—তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্টিফিকেটও আমার আছে।

—কিন্তু গত তিন মাস আমরা একই কাগজে বিজ্ঞাপন দিচ্ছি, অথচ আপনি তা জানতে পারেননি কেন?

—সে কথাই ত বলছি। বাবা মারা গেছেন আজ প্রায় এক বছর। মা তার কিছু আগে। আমি তাঁদের একমাত্র সন্তান। কিন্তু তবুও কোনওদিকে কোনও সুবিধে করতে না পারার জন্যে বাধ্য হয়ে আমাকে আবার বাংলাদেশে ফিরে আসতে হয়েছে। গুজরাটের মতো জায়গায় থাকার যে কি পরিমাণ খরচ তা বোধ হয় আপনার অজানা নয়। তা ছাড়া দু-একটা কাজের খোঁজ পেয়েই আমি কোল্‌কাতায় এসেছিলাম। আছি আমার এক বন্ধুর মেসে। বাবা সামান্য মাইনের কেরাণী ছিলেন, তিনি বিশেষ কিছু রেখে যেতে পারেননি। যে সামান্য টাকা উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলাম তার ওপর ভরসা করেই সুদুর বাংলার পথে পাড়ি দিয়েছিলাম। কিন্তু এখানে এসে সে কাজ না পেয়ে নিদারুণ দুর্দশার মধ্যে পড়তে হয়েছে আমাকে। নিয়মিত খবরের কাগজ কিনে যে পড়ব এ পরিমাণ পয়সা আমার নেই। মাঝে মাঝে হকারদের হাত থেকে নিয়ে দু-একটা হেড্‌-লাইনের ওপর নজর দিই বটে, কিন্তু এটা বোধ হয় বোঝেন যে অত্যন্ত খুঁটিয়ে কাগজ না পড়লে ব্যক্তিগত কলমের দিকে সাধারণতঃ চোখ পড়ে না।

—বুঝেছি। মিঃ পালিত হাসতে হাসতে বললেন—আপনার কথায় আমি বিশ্বাস করছি। এর আগে দু-একজন বাজে লোক এই বিজ্ঞাপনটা দেখে নাম ভাঁড়িয়ে এসেছে বটে, কিন্তু তারা কেউ সঠিক মায়ের নাম বলতে পারেনি। আপনিই সেটা ঠিক বলেছেন। তা ছাড়া যে দু-একটা চিহ্নের কথা দলিলে লেখা আছে তাও অবশ্য মিলিয়ে দেখব আমরা। আর সার্টিফিকেটখানাও—

—সেটা আমার কাছেই আছে। মৃগাঙ্ক বাধা দিয়ে বলে—যদি কখনও কোনও কাজ পাই, এই আশায় সার্টিফিকেটখানা সব সময় কাছে কাছেই রাখি আমি।

পকেট থেকে একটা ভাঁজ করা কাগজ বের করে মৃগাঙ্ক তুলে দেয় মিঃ পালিতের হাতে।

মিঃ পালিত দেখেন, সেটা বোম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার সার্টিফিকেট। তাতে মৃগাঙ্ক রায়ের স্পষ্টাক্ষরে লেখা আছে।

মিঃ পালিত বলেন—আমার আর খুব বেশি সন্দেহ নেই আপনার কথায়। এবার শুনুন কেন আমরা এই ধরণের বিজ্ঞাপন দিচ্ছি। আপনার মা বিনতা দেবীর সম্পর্কিত এক দাদার নাম ভূদেব ভট্টাচার্য। অবশ্য আপনার তা ঠিক মনে আছে কি না জানি না—

—হ্যাঁ, মনে পড়ছে বটে। ছেলেবেলায় দুবার কোল্‌কাতায় মামার বাড়িতে এসেছিলাম।

—তিনি মারা গেছেন আজ প্রায় ছ' মাস হলো। তাঁর কোনও আত্মীয়স্বজন ছিল না। তাই মৃত্যুর আগে তিনি আমাদের কোম্পানীর মাধ্যমে উইল করে গেছেন যে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর প্রায় দেড় লক্ষ টাকার সম্পত্তির মালিক হবে তাঁর বোন বিনতা দেবীর একমাত্র ছেলে মৃগাঙ্ক রায়।

—তা হলে আমিই এখন সেই সমস্ত সম্পত্তির মালিক? মৃগাঙ্ক হর্ষ-উৎফুল্ল কণ্ঠে প্রশ্ন করে।

—ঠিক তাই। অবশ্য দলিলে আপনার দেহের যে সব বিশেষ চিহ্নের কথা লেখা আছে, যদি আপনার দেহে সেগুলি দেখা যায়, তবে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হবে যে আপনিই প্রকৃত লোক। মিঃ পালিতের কণ্ঠস্বরে দৃঢ়তার আভাস।

তারপর একটা লোহার সেফ্‌ খুলে একটা দলিল বের করে ভাল করে কিছুক্ষণ মনোযোগ দিয়ে দেখে বলেন—আপনার বাঁ কাঁধের ওপর একটা বড় কালো তিল আছে?

জামাটা খুলে মৃগাঙ্ক দেখায়—হ্যাঁ, এই দেখুন।

—আপনার ওপরের ঠোঁটে একটা কাটা দাগ আছে? মিঃ পালিত তির্যকভাবে চেয়ে ভ্রু কোঁচকান।

—হ্যাঁ, ঠিক সেইজন্যেই এই ধরণের সৌখীন গোঁফ রেখে আমি সেই কাটা দাগটিকে গোপন করবার চেষ্টা করেছি। মৃগাঙ্কের মুখে হাসির রেখা ফুটে উঠে মিলিয়ে যায়।

আলোর সামনে উঠে গিয়ে বেশ ভাল করে দাগটা পরীক্ষা করে মিঃ পালিত বলেন—আর কোনও সন্দেহ নেই আমার। আপনি যাতে অবিলম্বে সমস্ত সম্পত্তির দখল পান সে ব্যবস্থা করছি। আর ব্যাঙ্কে যে পরিমাণ নগদ অর্থ আছে তাও আপনার নামে ট্রান্সফার করবার ব্যবস্থা করছি। আপাততঃ কিছু টাকা কাছে রাখলে বোধ হয় আপনার সুবিধে হয়?

—ধন্যবাদ। সম্প্রতি একটা কাজে কিছু টাকা উপার্জন করেছি আমি। আপাততঃ তা থেকেই আমার চলবে। সপ্তাহ দুয়েকের মধে ওদিকের ব্যবস্থা যদি করে ফেলতে পারেন—এই অপ্রত্যাশিত আকস্মিক প্রাপ্তিতে মৃগাঙ্ক উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে যেন।

—নিশ্চয়ই। তার আগেই যাতে সবকিছু আপনার দখলে আসে সে ব্যবস্থা করছি। আশা করি পূর্ব্ববৎ আপনার এই বিষয়সম্পত্তির যা কিছু দেখাশুনা করবার ভার সব আমাদের কোম্পানীর হাতেই থাকবে? মিঃ পালিত এবার মৃগাঙ্কের সঠিক পরিচয় পেয়ে যথেষ্ট আনন্দিত হন।

মৃগাঙ্ক বলে—আপনাদের প্রতিষ্ঠানের সততা দেখে আমি যথেষ্ট আনন্দিত হয়েছি মিঃ পালিত। সত্যি কথা বলতে গেলে, ভারতে এত সৎ প্রতিষ্ঠান কটা আছে তা আমার জানা নেই।

মিঃ পালিত বলেন—মক্কেলদের বিশ্বাস রক্ষা করাই আমাদের ফার্মের বিশেষত্ব। সে জন্যে যতটুকু ট্রাবল্ আমাদের নিতে হয় তার জন্যে আমরা সর্বদাই প্রস্তুত।

ধন্যবাদ জানিয়ে মৃগাঙ্ক উঠে দাঁড়ায়।

তাকে এগিয়ে দিতে দিতে মিঃ পালিত বলেন—থ্যাঙ্ক্ ইউ ফর্ ইওর গুড লাক্!

সাত

—আততায়ী কে?—

প্রমীলা দেবীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দীপক সোজা নেমে এলো একতলায়।

বাড়িখানার একতলায় একটা দর্জির দোকান। সাম্‌নেই সাইনবোর্ডে বড় বড় হরফে লেখা 'অঙ্গাবরণী'।

দীপক ভেতরে প্রবেশ করে ইন্‌স্পেক্টর বাসুর সঙ্গে। পুলিশ ইন্‌স্পেক্টরকে দেখেই দোকানের মালিক ছুটে এলো।

মালিকের নাম হরিচরণ প্রামাণিক। প্রৌঢ় লোক। মাথার চুল কাঁচাপাকা। পরনে একটা ঢিলা পায়জামার ওপর হাফশার্ট। নাকের আগায় একটা বাঁকা নিকেলের ফ্রেমের পুরু লেন্সের চশমা। ডান দিকের গালের ওপর মস্ত বড় একটা কালো আঁচিল।

দীপকই প্রথমে কথা সুরু করে—নমস্কার! গোটাকয়েক কথা জিজ্ঞাসা করতে এলাম আপনার কাছে।

—কথা? লোকটি যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। দীপক বুঝতে পারে পুলিশ দেখেই যে শ্রেণীর

লোক অত্যন্ত ঘাবড়ে যায় এ লোকটিও সেই দলে। এদের দেখেই লোকটি ভেবেছিল বোধ হয় কোনও ব্যাপারে তাকে গ্রেপ্তার করবার জন্যেই পুলিশের আগমন হয়েছে। এখন তা নয় বুঝতে পেরে একটু যেন সাহস ফিরে আসে তার মনে। বলে—কি কথা জিজ্ঞাসা করবেন স্যর? আমার জানা থাকলে নিশ্চয়ই বলব আপনাকে।

লোকটির অতিরিক্ত বিনয়নম্রতা দেখে দীপকের কেমন যেন হাসি পায়।

—প্রথম কথা হচ্ছে, এখানে আপনার দোকান কতদিন ধরে আছে? কণ্ঠস্বরকে যথেষ্ট গম্ভীর রেখে দীপক কথা সুরু করে।

—তা প্রায় তের-চৌদ্দ বছর হবে। এ পাড়ায় আমার মতো পুরোনো দর্জি আর নেই হুজুর। তাই লোকে বলে—ভাল জামা কাটাতে হলে প্রামাণিক দর্জির কাছে যাও। আর সত্যি হুজুর, জামা কাটতে আমি শিখেছিলাম ধরমতলায় মুসলমান ওস্তাদের কাছে। ভাল কাটিং হবে না কেন? লোকটি যেন উল্টোপাল্টা কথা বলে সময় কাটাতে পারলেই বাঁচে।

তার উৎসাহে বাধা দিয়ে দীপক দৃঢ়স্বরে বলে—আমি জামা কাটাতে আসিনি, তাই সেই কথা শুনে লাভ নেই আমার। আমার প্রশ্ন হচ্ছে এই বাড়ির বাড়িওয়ালা সম্বন্ধে।

—তা সে প্রশ্ন করে কি হবে স্যর? তিনি ত আর ইহলোকে নেই!—প্রামাণিক দর্জির কণ্ঠে বিষণ্ণতার সুর।

—ইহলোকে নেই বলেই ত আমাদের এ ঝঞ্ঝাট পোয়াতে হচ্ছে। তিনি বেঁচে থাকলে কি আর খুনের তদন্তে আসতাম? দীপক কথাটাকে হাল্‌কা করবার চেষ্টা করে।

—তা ত ঠিক কথা স্যর! ফোক্‌লা মুখে সরল হাসি হেসে বলে হরিচরণ।

—তা হলে গোটাকয়েক কথা জিজ্ঞাসা করি আপনাকে। কি বলেন?

হরিচরণ কোনও উত্তর দেয় না।

দীপক প্রশ্ন করে—বাড়িওয়ালা শশধরবাবু কেমন লোক ছিলেন বলে মনে হয় আপনার?

—ও, তিনি অত্যন্ত অমায়িক লোক ছিলেন স্যর। পৃথিবীতে কোনও লোক তাঁর শত্রু ছিল একথা ভাবতেই পারি না আমি! প্রামাণিক দর্জি যেন প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত।

—ভাল কথা, প্রমীলা দেবীর সম্বন্ধে আপনার মতামত কি?

একটু থেমে হরিচরণ বলে—তিনি খুব ভাল লোক, কিন্তু কেমন যেন বিবিয়ানা ধরণ! বাঙালী ঘরের সাধারণ বৌয়ের মতো তিনি নন। যখন-তখন ভ্যানিটি ব্যাগ হাতে ঝুলিয়ে একা বাড়ি থেকে বের হন। যেখানে সেখানে ইচ্ছামত চলাফেরা করেন। আর ওঁর ছোট বোনটিও ঠিক একই রকম। দুই বোনে কোনও তফাৎ নেই।

দীপক বলে—তার মধ্যে আশ্চর্যের কিছু নেই হরিচরণ। ওঁরা ত আর সেকেলে গেঁয়ো ধরণের অশিক্ষিতা নারী নন। ওঁরা হচ্ছেন বর্তমান যুগের সুশিক্ষিতা, অভিজাত, আলট্রা-মডার্ন নারী! তাই এটা এমন কিছু দোষের নয়। দীপক যেন হরিচরণের পেটের কথা টেনে বের করবার জন্যেই কথা বাড়িয়ে চলে।

হরিচরণ খুঁৎ খুঁৎ করে। বলে—কেন বাবা, শশধরবাবুর এমন কিছু টাকার অভাব ছিল না ঊর্মিলা দেবীর ফিল্মে অভিনয় করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। ওসব হচ্ছে একেলীয়ানা ধরণ। হরিচরণের ভাব দেখে মনে হয় আধুনিকতা সে একেবারেই পছন্দ করে না।

সাধারণ একজন দর্জির বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা দেখে দীপক অবাক হয়ে যায়। একটু চিন্তা করে বলে—সে কথা না হয় মানলাম, কিন্তু তার সঙ্গে শশধরবাবুর হত্যার নিশ্চয়ই কোনও সম্বন্ধ নেই? কথাটা বলেই দীপক তার দু'চোখের দৃষ্টিকে দর্জির মুখের উপর স্থির করে।

হরিচরণ বলে—তা কি করে বলব স্যর! আমরা ত আর পুলিশের লোক নই! তবে শশধরবাবু এমন কোনও লোকের সঙ্গে মিশতেন না যে ওঁকে হত্যা করতে পারে। কিন্তু প্রমীলা দেবী অথবা ওঁর বোনের যে কত লোকের সঙ্গে পরিচয় ছিল তা আর কি বলব! কিন্তু নির্বিরোধ শশধরবাবু ওঁদের কারও কোনও কাজে বাধা দিতেন না। শশধরবাবু নির্বুদ্ধিতার জন্যে যেন প্রামাণিককে অনুতপ্ত মনে হয়।

দীপক বলে—এবার আপনাকে একটা খুব কঠিন প্রশ্ন করব। খুব ভেবে গভীরভাবে চিন্তা করে উত্তর দেবেন। দীপকের কণ্ঠস্বর সপ্রতিভ।

—বলুন। হরিচণের ভাবভঙ্গী দেখে তাকে এতটুকুও চিন্তিত বা ভীত বলে মনে হয় না দীপকের।

—যেদিন শশধরবাবু নিহত হন সেদিন বিকেল ছটা থেকে আটটার মধ্যে আপনি কোনও রিভলভার বা বন্দুকের শব্দ শুনতে পেয়েছিলেন কি? দৃঢ়কণ্ঠে প্রশ্নটা বেরিয়ে আসে দীপকের মুখ থেকে।

—না। হরিচরণ সুস্পষ্ট উত্তর দেয়।

—বেশ ভাল করে চিন্তা করে বলুন। দীপক হরিচরণকে আর একবার ভেবে দেখার সুযোগ দিতে চায়।

—খুব ভাল করে চিন্তা করেই বলছি। যখন শুনলাম শশধরবাবুর শরীরের দু জায়গায় গুলি লাগার ফলেই তিনি নিহত হন, তখন আমি সত্যিই অবাক হয়ে গিয়েছিলাম।

দীপক ইন্‌স্পেক্টর বাসুর দিকে চেয়ে বলে—তা হলে বুঝতে পারা যাচ্ছে যে শশধরবাবু যে রিভলভারের গুলিতে নিহত হন তাতে সাইলেন্সার লাগানো ছিল। দীপকের সারা মুখে যেন ফুটে ওঠে কেমন একটা চিন্তার ভ্রূকুটি। চোখের দৃষ্টি চক্‌চকে দেখায়।

ইন্‌স্পেক্টর বাসু বলেন—অনেকটা আন্দাজ করা যাচ্ছে বটে! দীপকের কথার উপর কোনও কথা বলবার মতো মনের বল যেন হারিয়ে ফেলেছেন তিনি।

—কিন্তু যে রিভলভারটা পুলিশ তাঁর দেহের কাছে কুড়িয়ে পায় তাতে আদৌ সাইলেন্সার লাগানো ছিল না। কাজেই এটা যে মার্ডার এতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই। দীপক বিশ্লেষণ করে।

হরিচরণ বলে—আচ্ছা স্যর, আপনারা কি খুনীকে গ্রেপ্তার করবার আশা রাখেন?

—নিশ্চয়ই! দীপক বলে—আচ্ছা, মনে করুন ত সেদিন বিকেল চারটে থেকে ছটার মধ্যে কোনও লোক এধার দিয়ে শশধরবাবুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল কিনা!

—ঠিক সেই কথাটাই আমি আপনাদের বলব বলে ভাবছিলাম। দুঃখের বিষয় এ পর্যন্ত কেউ আমার কাছে এসে কিছু জিজ্ঞাসা করেনি। আমি ভেবেছিলাম বোধ হয় আসল অপরাধী ধরা পড়েছে তাই—

—যাক্‌, কথাটা খুলে বলুন আপনি। বাধা দিয়ে দীপক বলে।

—হ্যাঁ, যেদিন শশধরবাবু নিহত হন, সেদিন সন্ধ্যা প্রায় সাতটার সময় একজন লোককে আমি দোতলায় যেতে দেখেছিলাম এট পথটা দিয়ে। প্রামাণিক দর্জি কথাটা বলে যেন নিশ্চিন্ততার নিঃশ্বাস ফেলে।

—তাকে আগে কখনও এ বাড়িতে দেখেছিলেন কি? দীপক আরও অনেক কথা জানবার চেষ্টা করে।

—না, সেই প্রথম। প্রামাণিক একটু থেমে উত্তর দেয়।

—তার চেহারা কি এখনও আপনার মনে আছে?

—হ্যাঁ, তাকে হুবহু মনে আছে আমার। আবার তাকে দেখলে চিনতে পারব আমি। কিন্তু আশ্চর্য, তাকে বাড়ির মধ্যে ঢুকতে দেখেছিলাম বটে কিন্তু বের হতে দেখিনি। যেন সে হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। সে যে কোথায় গেল জানি না। তার কিছুক্ষণ পরেই প্রমীলা দেবী ফিরে এসেছিলেন। তিনিই মৃতদেহ আবিষ্কার করেন। প্রামাণিক দর্জিকে এতক্ষণে যথেষ্ট সপ্রতিভ ও উৎফুল্ল দেখায়।

—আচ্ছা, যদি আমরা কোনও লোককে এই হত্যাব্যাপারে গ্রেপ্তার করি, আপনার সাহায্য আমরা অবশ্যই নেব। আশা করি অপরাধীকে সনাক্ত করতে আপনি পারবেন।

দীপক ও মিঃ বাসু আর কথা বাড়াতে চান না।

—আচ্ছা, স্যর। প্রামাণিক যেন এতক্ষণে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। তারপর মুখ ফিরিয়ে বলে—নমস্কার স্যর!

দীপক ও ইন্‌স্পেক্টর বাসু দোকান থেকে বেরিয়ে মোটরে চড়ে বসেন।

আট

—অদৃশ্য ইঙ্গিত—

সেদিন যতীনের মেসে ফিরে গিয়ে মৃগাঙ্ক সমস্ত কথাই খুলে বলল তাকে। সব শুনে যতীন আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে তাকে প্রায় জড়িয়ে ধরল।

মৃগাঙ্ক বলল—মানুষের ভাগ্য যে মানুষকে নিয়ে এরকম খেলা করে তা আমি আগে বিশ্বাসই করতাম না।

যতীন বলে—তা ত করেই। মানুষ ভাগ্যের হাতের পুতুল। কিন্তু কথা হচ্ছে এই যে এবার নিশ্চয়ই আমাদের কথা ভুলে যাবি তুই! যতীনের কণ্ঠে প্রচ্ছন্ন ব্যথার সুর।

—ভুলে যাব? মৃগাঙ্ক গভীরভাবে বলে—জীবনে তোর সাহায্য যে কতো বড় তা যদি ভুলি, তবে আমার মতো অকৃতজ্ঞ পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় কেউ নেই! পুরোনো দিনের স্মৃতিতে মৃগাঙ্কের মন ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে।

যতীন উত্তর দেয় না।

মৃগাঙ্ক একটু থেমে যতীনের মুখের উপর দৃষ্টি স্থাপন করে সপ্রশ্নভাবে বলে—এবার আমি 'হোটেল রয়্যালে' একটা স্যুট ভাড়া নিয়ে আপাততঃ সেইখানেই থাকব। কি বলিস?

—সেই ভাল, যতীন বলে—এখন লক্ষ লক্ষ টাকার মালিকের এই এঁদো মেসে পড়ে থাকা নিশ্চয়ই শোভা পায় না।

মৃগাঙ্ক বলে—হ্যাঁ, জিনিসপত্রগুলো গুছিয়ে নিই। আর একটা কথা, সেদিন যে ভদ্রলোক আমাকে ট্রেনের টিকিটের টাকাটা দিয়েছেন তাঁর সঙ্গে দেখা হলে টাকাটা তাঁকে ফিরিয়ে দিতাম। কিন্তু তাঁর ঠিকানা ত জানি না!

—সেকি রে! যতীন বলে—তুই তাঁর কাজ করলি আর ঠিকানাটাই লিখে রাখতে ভুলে গেছিস!

—সত্যি, এটা একটা মারাত্মক ভুল হয়ে গেছে। যাক্, এবার দেখা হলেই ওঁর টাকাটা শোধ করে দেব। দু' সপ্তাহের মধ্যেই ত সব আমার হাতে এসে পড়ছে। আর বর্তমানে যে টাকাটা পেয়েছি তাতে দু' সপ্তাহ হেসে খেলে কেটে যাবে।

যতীন বলে—চল্ তোর জিনিসপত্রগুলো গুছিয়ে দিই। আর মাঝে মাঝে যদি সময় পাস, দেখা করতে আসবি। কেমন?

—নিশ্চয়ই! মনে করিস্ না যে কিছু টাকা হাতে পেয়েই হঠাৎ পুরোনো বন্ধুত্ব আর সহৃদয়তা ভুলে যাব। মৃগাঙ্ক ধীরকণ্ঠে কথা শেষ করে।

জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে মৃগাঙ্ক একটা ট্যাক্সিতে উঠে বসে।

'হোটেল রয়্যালে' মৃগাঙ্ক এর আগে দু-একবার গেছে। কিন্তু সেখানকারই একটা স্যুট ভাড়া নিয়ে থাকবার মতো টাকা সে যে কোনও দিন সংগ্রহ করতে পারবে এটা ছিল তার ধারণার বাইরে।

ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করে স্যুট ভাড়া নিয়ে ম্যানেজারকে সে সর্ব-প্রথমে পঞ্চাশ টাকা অ্যাড্ভান্স করল। ঘরের মধ্যে জিনিসপত্র রেখে এলো হোটেলেরই একটা বয়।

কিন্তু এর পর চাই ভাল আর এক সেট পোশাক। এর আগে উর্মিলা দেবীর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে সেদিন যে পোশাক সে কিনেছিল সেটা রেডিমেড্। খুব ভাল 'ফিট্' করে না—মোটামুটি চলনসই গোছের।

মৃগাঙ্ক ঠিক করল, এবার আর এক সেট স্যুট আর একটা শার্ট একটা ভাল দর্জির দোকান থেকে তৈরী করাবে।

ম্যানেজারের দিকে চেয়ে মৃগাঙ্ক প্রশ্ন করল—আচ্ছা, এই অঞ্চলে ভাল দর্জির দোকান কোথায় বলতে পারেন? আধুনিক ডিজাইনের ভাল স্যুট আর শার্ট যে খুব ভাল কাটতে পারবে এমন দর্জিই আমার প্রয়োজন।

—হ্যাঁ, ম্যানেজার বললেন—এই অঞ্চলে সবচেয়ে ভাল দোকান হচ্ছে ওই 'অঙ্গাবরণী'। দোকানের মালিকের নাম হরিচরণ প্রামাণিক। অনেকদিন হলো এই কাজ করছে। খুব ভাল কাটে স্যর—আর দামও মোটেই বেশি নয়।

—কোথায় দোকানটা? মৃগাঙ্ক হাল্কা টানে কথা শেষ করে।

—এই রাস্তা ধরে সোজা গিয়ে বাঁ দিকে যে বড় রাস্তাটা পাবেন সেটা ধরে চলবেন। তিন-চারটে বাড়ি পেরিয়ে ডান দিকেই দোকানটা। ম্যানেজারের কথাবার্তার মধ্যে সম্ভ্রমের সুর স্পষ্ট।

—ধন্যবাদ।

মৃগাঙ্ক নিজের ঘরে ফিরে আসে।

তারপর জিনিসপত্র সব গুছিয়ে রেখে বের হলো কিছু খুচরো জিনিসপত্র কেনা আর পোশাকের অর্ডার দেবার জন্যে।

বাড়ি ফিরে এসে বিগত ঘটনাগুলি দীপকের মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল।

রতনলাল কি একটা কাজ সেরে ফিরল। দীপককে বাইরের হলঘরে বসে থাকতে দেখে কাছে এসে প্রশ্ন করে—কিরে, বাইরের ঘরে কারও জন্যে অপেক্ষা করছিস্ নাকি?

—না, আপাততঃ বিশ্রাম। শশধরবাবুর হত্যাব্যাপারটার তদন্ত শেষ করে এইমাত্র ফিরছি কিনা। দীপক রতনের কথার জের টেনে বলে—আবার কখন যে বেরোতে হবে ঠিক নেই!

—বুঝেছি। তা, ক্লু কিছু পাওয়া গেছে? রতনকে ব্যাপারটাতে যথেষ্ট ইন্টারেস্টেড্ মনে হয়।

—বিশেষ কিছু না। সকলের মুখে শুধু এক কথা, অমন নির্বিরোধ, অমায়িক ভাল লোককে মারতে যাবে কে? দীপক মুখে হাসি টেনে এনে কথা শেষ করে।

—তা হলে হদিস কিছুই মেলেনি? রতন দীপকের মুখের দিকে তির্যক ভাবে তাকায়।

—সামান্য মিলেছে। তবে তা মরুভূমিতে শিশিরবিন্দুর মতো ক্ষণস্থায়ী। যদি কোনও দিন সে খুনীকে অ্যারেস্ট করা যায়, তবে আইডেণ্টিফাই করবার মতো একজন লোকের সন্ধান মিলেছে। তবে শীগ্‌গিরই আরো এগোবার আশা রাখি আমি। দীপকের কণ্ঠে আশার সুর স্পষ্ট।

রতন হাসতে হাসতে বলে—তা হলে সত্যিই মরুভূমিতে বারি-বিন্দু! যদি আসল খুনী ধরা পড়ে, তবে ত ওই লোকটির আইডেন্টিফিকেশন কাজে লাগবে! রতনের কথার মধ্যে যেন কিছুটা যুক্তির আভাস পাওয়া যায়।

কথা শেষ হয় না।

চাকর ভজুয়া লেটার-বক্স থেকে চিঠিপত্রগুলি বের করে এনে রাখে দীপকের সাম্‌নে।

দীপক চিঠিগুলি উল্টেপাল্টে দেখে।

হঠাৎ একটা জিনিস দেখে একটু অবাক্ হয়। সাদা খামের মধ্যে ভাঁজ করে রাখা একটা কাগজ। পোস্ট অফিসেব টিকিট বা ছাপ কিছুই নেই। কেউ হাতে ফেলে দিয়ে গেছে। কিন্তু কে হঠাৎ বিনা কারণে তার চিঠির বাক্সেব মধ্যে এভাবে একটা কাগজ ফেলে রেখে গেল?

দীপক ভাঁজ-করা কাগজটাকে বের করে দেখে সেটা একটা চিঠি ঃ—

ডিটেকটিভ দীপক চ্যাটার্জী

সমীপেষু।

যদি আপনি সত্যই শশধরবাবুর হত্যার জন্যে দায়ী অপরাধীকে ধরতে চান, তবে এক্ষুণি চলে যান তেরো নম্বর আরপুলী লেনে। ওখানে মৃগাঙ্ক রায় নামে যে লোকটিকে পাবেন, সেই শশধরবাবুকে হত্যা করেছে।

হ্যাঁ, প্রমাণেরও অসুবিধে হবে না আপনার। দর্জি হরিচরণ প্রামাণিকই তাকে সনাক্ত করতে পারবে।

ভাল কথা, আমি কে এ কথাটা জানাতে চাই না বিশেষ কারণে। তবে জেনে রাখুন আমি আপনার এবং শশধরবাবুর পরিবারের একজন হিতাকাঙ্ক্ষী।

আশা করি আজই হত্যাকারীর সন্ধানে ওখানে যাবেন। ইতি—

জনৈক শুভানুধ্যায়ী।

চিঠিখানা আগাগোড়া আরেকবার পড়ল দীপক। বাংলা টাইপরাইটারে চিঠিখানা আগাগোড়া টাইপ করা। হাতের লেখা গোপন করবার জন্যই যে তা করা হয়েছে এটা সহজেই বোঝা যায়।

কিন্তু কে এই পত্রপ্রেরক? দীপক কিছুক্ষণ চিন্তা করে চিঠিখানা তুলে দেয় রতনের হাতে। আর হত্যাকারীকে গ্রেপ্তার করিয়ে তার স্বার্থই বা কি?

রতনও চিঠিখানা আগাগোড়া পড়ে। তারপর বলে—এর মধ্যে কিন্তু আমি কিছুটা রহস্যের গন্ধ পাচ্ছি যেন! জানি না প্রকৃত ব্যাপার কি!

দীপক কোনও উত্তর দেয় না।

চিন্তার কোন্ অতলে বুঝি তলিয়ে যায় তার মন।

নয়

—গ্রেপ্তার—

হোটেল থেকে বেরিয়ে কতকগুলি প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনে মৃগাঙ্ক এসে সোজা উপস্থিত হলো দর্জির দোকানে।

বাইরের বড় বড় হরফে লেখা 'অঙ্গাবরণী'। ভেতরে ঢুকে মালিকের খোঁজ করতেই হরিচরণ প্রামাণিক এগিয়ে এসে প্রশ্ন করে—কি চাই স্যর?

তারপর মৃগাঙ্কের মুখের ওপর চোখ পড়তেই সে ভ্রূদুটো কুঁচকে বেশ ভাল করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল তাকে।

মৃগাঙ্ক বলল—আমার একটা শার্ট আর একটা স্যুট তৈরী করাব বলে এসেছি আপনার এখানে। এ অঞ্চলে আপনার দর্জি হিসাবে বেশ সুযশ আছে বলে শুনলাম।

হরিচরণ গম্ভীরভাবে বলে—বেশ, মাপটা দিয়ে দিন।

জামা আর স্যুটের মাপ দিয়ে ভাল কাপড় পছন্দ করে একখানা দশ টাকার নোট অ্যাড্‌ভান্স করে মৃগাঙ্ক। তারপর দোকান থেকে বেরিয়ে যাবার উপক্রম করতেই হরিচরণ প্রশ্ন করে—আপনার জিনিসগুলো কোন্‌ ঠিকানায় পাঠাতে হবে স্যর?

মৃগাঙ্ক মুখ ফিরিয়ে উত্তর দেয়—হোটেল রয়্যাল। পাঁচ নম্বর স্যুটে আমি আছি।

হরিচরণ ঘাড় নেড়ে বলল—আচ্ছা স্যর!

মৃগাঙ্ক দোকান থেকে বেরিয়ে গেলে হরিচরণ ধীরে ধীরে বেরিয়ে এসে মোড়ের মাথায় একটা পাবলিক টেলিফোনের সামনে দাঁড়ায়। তারপর একটা দু'আনি ফেলে দিয়ে 'কী'টা টিপে রিসিভারটা তুলে নিয়ে বলল—হ্যালো, পুট্‌ মি টু দি লোকাল পুলিশ স্টেশন...

একটু পরেই থানা থেকে ইন্‌স্পেক্টর বাসু ফোন তুলে প্রশ্ন করেন—হ্যালো, কোত্থেকে কথা বলছেন?

—আমি হরিচরণ প্রামাণিক কথা বলছি। 'অঙ্গাবরণী' টেলারিং শপ্‌ থেকে...

—বুঝেছি। কি ব্যাপার বলুন ত! ইন্‌স্পেক্টর বাসু চিন্তিতভাবে বলেন।

—শশধরবাবুর হত্যাকারীকে যদি গ্রেপ্তার করতে চান, এক্ষুণি চলে আসুন আমার এখানে। হরিচরণ প্রামাণিকের কণ্ঠস্বর থেকে তাকে যথেষ্ট উত্তেজিত বলে মনে হয়।

—কি ব্যাপার বলুন ত! সবটুকু শুনে আমি উপযুক্ত স্টেপ্‌ নেবার ব্যবস্থা করছি।

—আজ সে আমার এখানে এসেছিল একটা স্যুটের অর্ডার দিতে। ভেবেছিল আমি তাকে চিনতে পারব না। কিন্তু আমি তাকে ঠিকই চিনতে পেরেছি স্যর। সে থাকে 'হোটেল রয়্যাল'-এর পাঁচ নম্বর স্যুটে। তার ঠিকানা দিয়ে সেখানে স্যুটগুলো পৌছে দিতে বলেছে সে।

—ঠিক আছে। এক্ষুণি আসছি আমি।

রিসিভারটা নামিয়ে রেখে হরিচরণ দোকানের দিকে ফিরে আসে।

বেলা সাড়ে এগারোটা।

দীপক বাড়ি থেকে বেরিয়ে সোজা চলে তেরো নম্বর আরপুলী লেনের ঠিকানায়।

বাড়িটা হচ্ছে একটা মেসবাড়ি। এক-একটা ঘরে দু-তিনজন করে লোক। মৃগাঙ্ক রায়ের খোঁজ করে দীপক—কিন্তু কোনও লোকই তার কথা কিছু বলতে পারে না।

অবশেষে একজন কেরাণী ভদ্রলোক বলেন—আপনি তিনতলায় যতীনবাবুর সঙ্গে দেখা করুন।

তিনতলার ঘরে গিয়ে দীপক যতীন মিশ্রের সঙ্গে দেখা করে।

অমায়িক ভদ্রলোক। কোনও লোককে সামান্যমাত্র সন্দেহ করতেও জানেন না তিনি।

দীপক নমস্কার জানিয়ে প্রশ্ন করে—মৃগাঙ্ক রায় নামে কোনও ভদ্রলোক আপনার এখানে ছিলেন? তাঁর সঙ্গে দেখা করা আমার বিশেষ প্রয়োজন।

—হ্যাঁ, কিছুদিন সে আমার এখানে কাটিয়েছিল বটে। তবে সম্প্রতি সে প্রচুর টাকার মালিক হয়ে হোটেল রয়্যালে গিয়ে উঠেছে। যতীন মিশ্র যেন কিছুটা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে।

—হোটেল রয়্যাল? সেখানকার কত নম্বর স্যুটে তিনি থাকেন?

—তা ঠিক জানি না। তবে যাবার সময় বলে গেছে হোটেল রয়্যালে সে গিয়ে উঠবে। আপনি খোঁজ করলেই পাবেন।

—ধন্যবাদ। আশা করি তাঁর দেখা আমি সেখানেই পাব। একটা জরুরী প্রয়োজনেই তাঁকে আমার প্রয়োজন।

নমস্কার জানিয়ে দীপক মেস থেকে বেরিয়ে পথে পা দেয়।

হোটেল রয়্যালের ঠিকানায় পৌঁছেই অবাক্ হয়ে যায় দীপক। ঠিক হোটেলের সামনেই দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায় ইন্‌স্পেক্টর বাসু আর দর্জি হরিচরণ প্রামাণিককে।

দীপক অবাক হয়ে প্রশ্ন করে—আপনারা এখানে?

ইন্‌স্পেক্টর বাসু বলেন—হত্যাকারীর সন্ধানে। আসল হত্যাকারী এঁর দোকানে আজই এসেছিল একটা স্যুটের অর্ডার দিতে। ভেবেছিল, চিনতে পারবে না। তা ছাড়া ইনি যে খুব ভাল করে তার ওপর নজর রেখেছেন তাই বা কে জানত! কিন্তু সুখের বিষয়, ইনি তাকে দেখেই চিনতে পেরেছেন। সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের ফোন করে জানিয়েছেন। আশা করি বিনা গোলযোগেই এ ব্যাপারটার নিষ্পত্তি ঘটবে।

—কোথায় থাকে সে? দীপক প্রশ্ন করে।

—এই হোটেলের পাঁচ নম্বব স্যুট ভাড়া নিয়ে থাকে সে। কিন্তু আপনি এদিকে এসেছেন কি ব্যাপারে?

মিঃ বাসু যেন ঠিক এসময়ে দীপককে এখানে আশা করতে পারেননি।

—একই ব্যাপারে। আমি অন্য একটা সূত্রে খবরটা জানতে পেরেছি। আর সেই সূত্র ধরে মৃগাঙ্ক রায়ের খোঁজ নিতে এসে যে আপনাদের এখানে দেখব তা আশা করিনি।

সকলে হোটেলের মধ্যে প্রবেশ করে। পাঁচ নম্বর স্যুটের খোঁজ করে মৃগাঙ্ক যে ঘরে ছিল সেটাতে গিয়ে উপস্থিত হয় ওরা।

ওদের সকলকে দেখে মৃগাঙ্ক অবাক্ হয়ে প্রশ্ন করে—আপনারা এখানে কাকে চান?

ইন্‌স্পেক্টর বাসু হরিচরণের দিকে তাকান। হরিচরণ সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়ে।

তখন তিনি কোমরের বেল্ট থেকে রিভলভার বের করে তার দিকে সেটা উঁচিয়ে ধরেন। কঠোর স্বরে বলে ওঠেন—শশধরবাবুকে হত্যার অপরাধে আমি আপনাকে গ্রেপ্তার করছি। আপনার বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট আছে। আমাদের কাজে বাধা দেবার মিথ্যা চেষ্টা করবেন না।

—সে কি কথা! অবাক্ বিস্ময়ে মৃগাঙ্ক প্রশ্ন করে।—আমি আজ পর্যন্ত শশধরবাবুর নাম শোনা ছাড়া, তাঁকে কখনও স্বচক্ষে দেখিনি। আর আমি কেনই বা তাঁকে খুন করতে যাব?

—তা অবশ্য আমরা জানি না। তবে ইনি হত্যাকাণ্ড যেদিন সংঘটিত হয় সেদিন আপনাকে শশধরবাবুর বাড়িতে ঢুকতে দেখেছিলেন। এ কথাটাও কি আপনি অস্বীকার করতে পারেন?

মৃগাঙ্ক অবাক্ হয়ে বলে—আশ্চর্য, আমি সেদিন বিকেলে উর্মিলা দেবী নামে একজন অভিনেত্রীর সঙ্গে এন্‌গেজ্‌মেণ্ট রক্ষা করতে গিয়েছিলাম। প্রমীলা দেবীই যে তাঁর বড় বোন এ কথাটা আমি আগে জানতাম না। পরে উর্মিলা দেবী যখন প্রমীলা দেবীর ফোন পেলেন তখনই আমি জানতে পারলাম শশধরবাবুর হত্যার বিষয়ে। মৃগাঙ্কের কণ্ঠস্বরে বিস্ময়ের সুস্পষ্ট সুর ধ্বনিত হয়ে ওঠে।

—উর্মিলা দেবীর সঙ্গে আপনার পরিচয় কোন্ সূত্রে? মিঃ বাসু ভ্রূকুটি করে প্রশ্ন করেন।

—সেটাই ত আসল মিস্ট্রি। জলধর সেন নামে একজন সাহিত্যিকের কাছে আমি একটা কাজ পাই। বর্তমানে আমি মামার প্রচুর সম্পত্তি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি। কিন্তু তখন তা ছিল না। অর্থাভাবে অত্যন্ত কষ্টে আমার দিন কাটছিল। সে সময় জলধরবাবু আমাকে একটা কাজ দেন। তাঁর চেহারা অনেকটা আমার মতো তাই তিনি তাঁর হয়ে একটা এন্‌গেজমেণ্ট রক্ষা করবার কাজে আমাকে নিযুক্ত করেন।

ইন্‌স্পেক্টর বাসু হেসে বলেন—গল্পটা বেশ তৈরী করেছেন যা হোক! বোঝা যায় তিনি আদৌ কথাটা বিশ্বাস করেননি।

—তার মানে? মৃগাঙ্ক প্রশ্ন করে—আপনি কি বলতে চান আমি সমস্ত কথা সাজিয়ে বলছি?

—বেশ, সে কথা পরেই প্রমাণিত হবে। আপনার কথা 'ভেরিফাই' করে দেখব আমরা।

ইন্‌স্পেক্টর বাসু মৃগাঙ্ককে গ্রেপ্তার করে থানার উদ্দেশে রওনা হন।

দীপক কিন্তু আগাগোড়া ব্যাপারটাতেই সম্পূর্ণ নীরব থাকে।

নয়

—চক্রান্তজাল—

থানায় এসে দীপক বলে—মিঃ বাসু, আপনি ওঁকে ক্রশ-একজামিন করুন। আমি ততক্ষণে সাহিত্যিক শ্রীজলধর সেনকে এখানে নিয়ে আসি।

—বেশ। মিঃ বাসু বলেন—আর কিছু না হলেও ওঁর কথাগুলি সত্যি কি না তা একবার যাচাই করে দেখা উচিত।

—তা ত বটেই।

দীপক গাড়ি করে বেরিয়ে যায়। জলধর সেন একজন প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও নাট্যকার। তাঁর ঠিকানা দীপকের জানা ছিল।

আধঘণ্টার মধ্যেই জলধরবাবুর বাড়ির সামনে এসে থামে তার গাড়ি। জলধরবাবুর সঙ্গে দেখা করে দীপক বলে—একটা জরুরী প্রয়োজনে আমি এসেছি আপনার কাছে। দয়া করে যদি আমার সঙ্গে থানায় আসেন তবে খুব সুবিধে হয়। একটা জটিল কেসের ভেরিফিকেশন ব্যাপারে আপনাকে প্রয়োজন।

জলধর সেন দীপকের নাম জানতেন। তিনি বললেন—যদি আপনার সুবিধে হয়, তবে আমি নিশ্চয়ই আপনার সাহায্যের জন্যে যেতে প্রস্তুত। কিন্তু ব্যাপারটাতে আমি সত্যিই কৌতূহলী হয়ে উঠেছি। খুলে বলুন ত কি ব্যাপার!

—একটা মার্ডার কেসে একজন লোককে সন্দেহক্রমে অ্যারেস্ট্ করা হয়েছে। সে বলছে,

ঘটনার দিন আপনি নাকি তাকে একটি অভিনেত্রীর সঙ্গে এন্‌গেজ্‌মেণ্ট রক্ষা করবার জন্যে পাঠিয়েছিলেন।

—আশ্চর্য! ভদ্রলোকের নামটা কি বলতে পারেন? জলধর সেন যেন আকাশ থেকে পড়েন।

—নিশ্চয়ই! তাঁর নাম মৃগাঙ্ক রায়। দীপক তাঁর মুখের দিকে সোজা চেয়ে থাকে।

—সো স্ট্রেঞ্জ! আমি তাঁর নাম পর্যন্ত কখনো শুনিনি। জলধর সেনের চোখেমুখে অকৃত্রিমতার আভাস।

—তবুও সম্পূর্ণ কন্‌ভিন্‌স্‌ড হওয়ার জন্যে আমি আপনাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চাই। দীপক কথা বাড়াতে চায় না।

—বেশ, চলুন।

দীপকের সঙ্গে জলধর সেন গাড়িতে এসে উঠলেন। গাড়ি থানার সাম্‌নে এসে দাঁড়াল আধঘণ্টার মধ্যে।

দীপকের সঙ্গে জলধর সেন ঢুকলেন থানার মধ্যে। দীপক মৃগাঙ্কের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করে—আপনি এঁকে চিনতে পারছেন কি?

মৃগাঙ্ক অবাক হয়ে বলে—না, ওঁকে ত চিনতে পারছি না!

দীপক বলে—ইনিই হচ্ছেন সাহিত্যিক জলধর সেন। আপনি তবে কার কথা বলছেন?

মৃগাঙ্ক বলে—আশ্চর্য! তবে আমার চেহারার সঙ্গে যার হুবহু মিল সেই লোকটি কে? সে নিজেকে জলধর সেন বলে পরিচয় দিয়েছিল। তবে কি মিথ্যা পরিচয় দিয়েছিল সে? মৃগাঙ্কের কথার মধ্য থেকে যেন আরও বেশি জটিলতা ফুটে ওঠে।

ইন্‌স্পেক্টর বাসু বলেন—আপনার কোনো কথায় আমি এতটুকু বিশ্বাস স্থাপন করতে পারি না। সবকিছু মিলে আপনি যেন একটা বিরাট ধাঁধার সৃষ্টি করেছেন বলে আমাদের মনে হচ্ছে।

মৃগাঙ্ক বলে—কিন্তু একটা কথা স্যার! আপনি ঊর্মিলা দেবীর কাছ থেকে জানতে পারেন যেদিন সন্ধ্যায় এই ঘটনাগুলো ঘটেছিল, সেদিন আমি সন্ধ্যার সময় দীর্ঘক্ষণ তাঁর সঙ্গে এন্‌গেজ্‌ড ছিলাম। খুনের খবর তিনি যখন পান, তখন পর্যন্ত আমি ছিলাম তাঁর সঙ্গে।

দীপক বলে—বেশ আমি প্রমীলা দেবীর বাড়িতে তাঁর সঙ্গে দেখা করছি। ঊর্মিলা দেবীর সঙ্গেও কথা বলব। আমার মনে হচ্ছে, কোথায় যেন একটা গলদ রয়ে গেছে মিঃ বাসু। আসল কালপ্রিট যে কে তা আমি এখনও ঠিক বুঝতে পারছি না। দীপকের কথা শুনে মনে হয় যে সে মৃগাঙ্ককে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস করেনি। কিন্তু কোথায় যে আসল গলদ লুকিয়ে আছে সেটা নিয়েই চিন্তা করছে সে। সবটুকু মিস্‌ট্রি যেন এখনও সল্‌ভ্‌ হয়নি বলে তার ধারণা।

মৃগাঙ্ক বলে—যে লোককে আপনারা সন্দেহ করেছেন, সে জলধর সেন বলে আমার কাছে পরিচয় দিয়েছিল। এখন দেখছি সে পরিচয় সম্পূর্ণ মিথ্যা। তবে তার চেহারা যে হুবহু আমার মতো এ সম্বন্ধে আমি নিঃসন্দেহ।

দীপক বলে—আপনার কথায় বিশ্বাস করে আমি অন্যভাবে কিছুটা চেষ্টা করব। অবশ্য যদি দেখি তাতে কোনও ফল না হয়, তবে অবশ্য আপনার উপরেই সন্দেহ এসে পড়তে বাধ্য।

মিঃ বাসু কোনও কথা বলেন না।

দীপক জলধরবাবুর সঙ্গে বাইরে এসে গাড়িতে চেপে বসে।

এগারো

—অপহৃতা—

সন্ধ্যা সাড়ে আটটা।

দীপকের গাড়ি এসে থামে শশধরবাবুর বাড়ির সাম্‌নে। বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করবার মুখেই দীপক কেমন যেন অবাক্ হয়ে যায়। সারা বাড়ি অন্ধকারাচ্ছন্ন। বাড়িতে কেউ আছে বলে মনে হয় না।

দরজার সাম্‌নে এসে দীপক দেখে সেটা বাইরে থেকে তালাবন্ধ। সোজা একতলায় নেমে এসে সে দর্জির দোকানের হরিচরণ প্রামাণিককে ডেকে প্রশ্ন করে—উপরতলায় কাউকে দেখলাম না কেন বলুন ত?

হরিচরণ বলে—কাল দুপুরের পর থেকে উর্মিলা দেবীর কোনও খবর পাওয়া যাচ্ছে না। বাড়ি থেকে তিনি স্টুডিওতে যাচ্ছেন বলে বেরিয়ে যান—কিন্তু আজ বিকেল পর্যন্ত তিনি ফিরে আসেননি। স্টুডিওতে ফোন করে প্রমীলা দেবী জানতে পেরেছেন তিনি সেখানেও যাননি।

—প্রমীলা দেবী কোথায়?

—তিনি থানায় গেছেন আজ বিকেলে।

আশ্চর্য হয় দীপক। ঘটনার গতি যে আবার সম্পূর্ণ একটা নতুন দিকে মোড় ফিরবে এটা সে আদৌ কল্পনা করতে পারেনি। চিন্তিতমনে সে ধীরে ধীরে পথে পা দেয়।

মোটামুটি ঘটনা থেকে সে যতটুকু আন্দাজ করেছিল, উর্মিলার আকস্মিক অন্তর্ধানে যেন তার সবটুকু হিসেবে গরমিল হয়ে যাচ্ছে। দীপক সোজা গাড়িতে উঠে বসে স্টার্ট দেয়। গাড়ির গতির সঙ্গে সঙ্গে যেন ছুটে চলে তার মনের গতিও কোন্ অনির্দিষ্ট এক পথ ধরে।

স্টুডিওতে সেদিন উর্মিলার বইয়ের স্যুটিং ছিল। আগে থেকে সময় এন্‌গেজ করে রাখত সে সাধারণতঃ। স্টুডিও থেকে গাড়ি এসে তাকে নিয়ে যেত।

কিন্তু সেদিন কি কারণে স্টুডিও থেকে গাড়ি আসেনি। স্টুডিও থেকে ডিরেক্টরের সই করা একটা চিঠি নিয়ে এসেছিল একজন দারোয়ান শ্রেণীর লোক।

উর্মিলার সঙ্গে দেখা করে লোকটি বলল—আপ্‌কা চিঠি মাইজী।

উর্মিলা দেখল চিঠিতে লেখা আছে ঃ

প্রিয় উর্মিলা দেবী,

আজকে আপনার স্যুটিং-এর দিন পড়েছে। কিন্তু আমাদের কোম্পানীর গাড়ি বিশেষভাবে এন্‌গেজ থাকায় যেতে পারল না আজ। তাই এই লোকটির সঙ্গে একটি ট্যাক্সি পাঠালাম আপনার কাছে। আপনি এর সঙ্গে ট্যাক্সিতে চড়েই আসবেন। প্রীতি ও শুভেচ্ছান্তে—

ভবদীয়
প্রশান্ত চৌধুরী,
পরিচালক।

চিঠিখানা পড়ে উর্মিলা ওপর থেকে নীচে নেমে আসে। দেখে নীচেই একটি ট্যাক্সি ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছে। সে নিশ্চিন্তমনে লোকটির সঙ্গে ট্যাক্সিতে চড়ে বসে।

গাড়ি ছুটে চলে মহানগরীর পথ ধরে।

গাড়ি এগিয়ে চলে টালিগঞ্জের দিকে। চৌরঙ্গী রোড ধরে গাড়ি যখন ছুটে চলেছে,

তখন হঠাৎ উর্মিলার নাকের ওপর সজোরে একটা রুমাল চেপে ধরে গাড়ির মধ্যে বসে থাকা অন্য লোকটি।

উর্মিলা বাধা দেবার চেষ্টা করে। কিন্তু একটা অদ্ভুত মিষ্টি গন্ধ তার নাকের মধ্যে প্রবেশ করে তাকে অসাড় করে ফেলে। কেমন যেন একটা আমেজ! ধীরে ধীরে ঘুমের কোলে ঢলে পড়ে উর্মিলা।

তারপর আর তার কিছুই মনে নেই।

ঘণ্টা দুয়েক পরে ধীরে ধীরে উর্মিলার জ্ঞান ফিরে এলো।

চোখ মেলল উর্মিলা। মাথার মধ্যে তখনও কেমন যেন ঝিম্‌ঝিম্‌ করছে। সব কিছুই কেমন যেন অস্পষ্ট বলে মনে হলো।

এগিয়ে আসে একজন দীর্ঘাকার লোক। বিড় বিড় করে বলে—জ্ঞান ফিরে আসছে দেখছি।

উর্মিলা বুঝতে পারে যে সে একটা কৌচে শোয়ানো আছে। তার দেহ কৌচের সঙ্গে বাঁধা।

উর্মিলা ক্ষীণকণ্ঠে বলে—জল!

লোকটি বেরিয়ে যায়। একটু পরেই আর একজন লোককে সঙ্গে নিয়ে ঘরের মধ্যে ফিরে আসে।

দীর্ঘাকার লোকটি ধীরে ধীরে উর্মিলাকে জল খেতে দেয়। জল পান করে উর্মিলা তৃপ্তির নিশ্বাস ছাড়ে—আঃ! তারপর ভাল করে চারদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে।

হঠাৎ নতুন আগন্তুকের দিকে চোখ পড়তেই উর্মিলা বলে উঠে—আপনি! জলধরবাবু, আপনি এখানে?

—আমি কোনও দিনই জলধরবাবু নই। আর যে নকল জলধরকে আপনি দেখেছেন সেও আমি নই! বেচারার অপরাধ, তার চেহারাও ঠিক আমার মতো! তাই ফাঁসির দড়ি গলায় পরে অকালে তাকে মৃত্যুবরণ করতে হবে।

—কিন্তু আপনি কে? উত্তেজিত উর্মিলা প্রশ্ন করে।

হো হো করে লোকটি হেসে ওঠে প্রচণ্ড অট্টহাসি।

উর্মিলার মাথার মধ্যে কেমন যেন গুলিয়ে আসে।

ধীরে ধীরে জ্ঞান হারিয়ে আবার সে সেখানেই লুটিয়ে পড়ে।

বারো

—প্রমীলার স্বীকৃতি—

সেদিনই বিকেলে প্রমীলা দেবী যে স্বয়ং থানায় এসে উপস্থিত হবেন মিঃ বাসু তা একেবারেই ধারণা করতে পারেননি।

মিঃ বাসুর প্রশ্নের উত্তরে প্রমীলা দেবী জানালেন যে তাঁর বোন উর্মিলা স্টুডিও যাবার নাম করে বাড়ি থেকে বের হয়েছে, তারপর আর ফিরে আসেনি। স্টুডিওতে খবর নিয়ে জানা গেছে যে সে সেখানে যায়নি। এমন কি স্টুডিওর পরিচালকের যে চিঠিটা পেয়ে সে বেরিয়ে যায় সেটাও সম্পূর্ণ জাল!

এমন সময় দীপক থানায় এসে উপস্থিত হলো। প্রমীলা দেবী যে থানায় এসেছেন এ খবর সে তাঁর বাড়িতে গিয়েই শুনে এসেছিল।

দীপক ইন্‌স্পেক্টর বাসুর দিকে চেয়ে বলে—আচ্ছা, যে মৃগাঙ্কবাবুকে সন্দেহক্রমে গ্রেপ্তার করেছেন তাঁকে এখানে নিয়ে আসুন ত! দেখা যাক্, প্রমীলা দেবী ওঁকে চিনতে পারে কিনা।

ইন্‌স্পেক্টর বাসু দীপকের কথামতো আসামী মৃগাঙ্ককে ঘরের মধ্যে হাজির করবার অর্ডার দিলেন।

মৃগাঙ্ককে ঘরের মধ্যে আনা হলো। প্রমীলা দেবী তার মুখের দিকে চেয়েই হঠাৎ যেন চম্‌কে উঠলেন। তারপর দীর্ঘক্ষণ তার মুখের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে থেকেই বলে উঠলেন—আশ্চর্য! আমি এমন একজন লোককে চিনি যার চেহারার সঙ্গে এঁর চেহারার হুবহু মিল আছে।

দীপক বলল—বেশ, আমরা শুনছি আপনার কথা।

মৃগাঙ্কের দিকে চেয়ে প্রমীলা দেবী বলেন—এঁর সঙ্গেও আমার পরিচয় হয়েছিল একদিন। তবে কথাবার্তা বিশেষ হয়নি। কিন্তু আজ এঁকে হত্যার ব্যাপারে জড়িত দেখে বলতে বাধ্য হচ্ছি, আমি যে লোকের সঙ্গে কথা বলছি, তার সঙ্গে এঁর চেহারার অদ্ভুত মিল আছে। আর ঊর্মিলার আকস্মিক অদৃশ্য হবার ব্যাপারে আমি তাকেই সন্দেহ করছি।

দীপকের কথায় মৃগাঙ্ককে ভেতরে নিয়ে যাওয়া হলো। প্রমীলা দেবী ধীরে ধীরে বলতে সুরু করেন ঃ আমার কাহিনী বলতে গেলে বিয়ের আগের একটি ঘটনায় যেতে হবে আমাকে। আমি তখন পর পর দুখানা বইতে অভিনয় করে বেশ কিছুটা সুনাম অর্জন করেছি।

ইন্‌স্পেক্টর বাসু কৌতূহলী হয়ে ওঠেন। প্রশ্ন করেন—তারপর?

প্রমীলা দেবী বলেন—সেই সময় আমার অভিনয়ে আকৃষ্ট হয়ে একজন ভদ্রলোক একদিন আমার সঙ্গে দেখা করেন। আমাকে তিনি একটা দামী নেকলেস উপহার দিয়েছিলেন সেদিন। ধীরে ধীরে আমাদের মধ্যে পরিচয় নিবিড়তর হয়। কিন্তু পরে একদিন জানতে পারলাম সেই লোকটি একজন স্মাগ্‌লার, ব্ল্যাকমেলার এবং প্রতারণা করাই তার পেশা। এ ঘটনা জানবার পর থেকেই তার সঙ্গে মেলামেশা সম্পূর্ণ বন্ধ করি আমি। তখন তার নাম ছিল বিনায়ক। তবে আরও চার-পাঁচটা নামে সে নিজের পরিচয় দিত সুবিধেমতো।

দীপক চিন্তিতস্বরে বলল—ও, বিনায়ক শর্মা। আমি তার নামটা শুনেছি আগে কি একটা কেসে।

প্রমীলা দেবী বলে চলেন—তারপর আমার স্বামীর সঙ্গে যখন আমার বিয়ের সবকিছু ঠিক হয়ে গেল, তখন সেই লোকটি একদিন দেখা করল আমার সঙ্গে। আমার কাছে সে প্রস্তাব করে—আমি যদি তার সঙ্গে মিলিত হবার জন্যে মনস্থির না করি, তবে যেন আমার ছোট বোন ঊর্মিলার সঙ্গে তার বিয়ের ব্যবস্থা করি।

এই সব কথায় আমি ক্রুদ্ধ হয়ে উঠি। তার ঘাড় ধরে তাকে বাড়ি থেকে বার করে দিতে দিতে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে উঠি—ভবিষ্যতে আর কখনও আপনি আমার সঙ্গে দেখা করবেন না। কিভাবে একজন ভদ্রমহিলার সঙ্গে ব্যবহার করতে হয় তাও বোধ হয় জানা নেই আপনার!

এর পর ভদ্রলোক আমার স্বামীর সঙ্গে দেখা করে বলে যে বিয়ের আগে আমার সঙ্গে তার অবৈধ ভালবাসা ছিল। আমার স্বামী বলেন—তাতে কিছু যায় আসে না, এরকম পরিচয় অনেকের সঙ্গেই থাকতে পারে! তখন সে ঊর্মিলার সঙ্গে তার বিয়ের প্রস্তাব করলে আমার স্বামী প্রত্যাখ্যান করেন। লোকটি তখন আমার স্বামীকে ভয় দেখিয়ে চলে যায়। সে বলে, তিন মাসের মধ্যে তার সঙ্গে ঊর্মিলার বিয়ে না দিলে সে জোর করে ব্যবস্থা করবে।

এসব ঘটনাকে আমার স্বামী অবহেলা করেছিলেন। সব ব্যাপারটাকেই তিনি হেসে উড়িয়ে

দিয়েছিলেন। আমরাও প্রায় সবকিছুই ভুলে গিয়েছিলাম। কিন্তু দীর্ঘদিন পরে তাঁর হত্যা এবং ঊর্মিলা অপহৃতা হয়েছে দেখে সেই ঘটনাটা আমার মনে পড়ল। তা ছাড়া সন্দেহক্রমে ধৃত মৃগাঙ্কবাবুর চেহারাব সঙ্গে তার চেহারার হুবহু মিল আছে। আমার মনে হয়, কোনও রকমে মৃগাঙ্কবাবুকে সে এই ঘটনার সঙ্গে জড়িয়েছে।

দীপক প্রশ্ন করে—তার কোনও আবাসস্থলের সন্ধান জানেন কি?

প্রমীলা দেবী বলেন—ওর স্মাগ্‌লিং দলের একটি আস্তানা ছিল পঞ্চান্ন নম্বর আপার চিৎপুর রোডের দোতলায়। এখনও সেখানে আড্ডাটি আছে কিনা জানি না।

দীপক উত্তর দেয় না। বলে—বেশ, এই সূত্র ধরে এগিয়ে দেখা যাক্, ঘটনার গতি কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়।

ইন্‌স্পেক্টর বাসুকে সঙ্গে নিয়ে দীপক বেরিয়ে পড়ে থানা থেকে।

তেরো

—পরিশেষে—

ঊর্মিলার দিকে চেয়ে লোকটি বলে উঠল—এবার সমস্ত কথা আমি তোমাকে খুলে বলছি। বিশেষ কারণে বাধ্য হয়েই আমি তোমাকে এখানে এনেছি।

ঊর্মিলা কোনও কথা বলে না।

লোকটি বলে—আমার নাম বিনায়ক শর্মা। আজ পর্যন্ত কোল্‌কাতা শহরে যে কোনও ক্রিমিন্যাল আমার নাম শুনলে মনে মনে শ্রদ্ধা করে। ক্রাইমের ইতিহাসে আমার সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এই যে, আজ পর্যন্ত আমি কোনও কাজে ধরা পড়িনি। কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি এ পর্যন্ত আমার বিরুদ্ধে।

হ্যাঁ, তোমার দিদির সঙ্গে দীর্ঘদিন আগে আমার পরিচয় ছিল। এমন কি শশধরবাবুর সঙ্গে তাঁর বিবাহ স্থির হবার আগে আমার সঙ্গেই তাঁর মেলামেশাটা ছিল সবচেয়ে বেশি।

ঊর্মিলা বিরক্ত হয়ে উঠে বলে—এসব বাজে কথা শুনে আমার লাভ কি?

বিনায়ক বলে—লাভ কিছু নয়, তোমাকে কেন এখানে আট্‌কে রেখেছি তা জানতে পারবে। আর তুমি এখান থেকে জীবনে কোনও দিন ফিরে যেতে পারবে না—কাজেই তোমার কাছে সে কথা খুলে বলতে কোনও আপত্তি নেই আমার।

কথা হচ্ছিল তোমার দিদির বিষয়ে। তোমার দিদির সঙ্গে শশধরবাবুর বিয়ের কথা যখন সম্পূর্ণ স্থির হয়ে যায় তখন একদিন তাঁর সঙ্গে দেখা করি। আমি তাঁকে বলি যে, আমি তোমাকেই বিয়ে করব বলে স্থির করেছি। প্রমীলা দেবীকেও সে কথা আমি বলেছিলাম ইতিপূর্বে।

শশধরবাবু ও প্রমীলা দেবী দুজনেই আমার কথা হেসে উড়িয়ে দেন। তাই প্রতিশোধ নিয়েছি আমি।

—কিন্তু আপনার মতো চেহারার যাকে দেখেছিলাম ইতিপূর্বে—যিনি জলধর সেন বলে পরিচয় দিয়েছিলেন তিনি কে?

—সে আমারই প্রেরিত লোক। আমার কাছ থেকে টাকা নিয়ে সে এই ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছিল। শেষে তার ওপরে খুনের দোষ চাপিয়ে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত আছি। তোমাকে পাওয়ার জন্যেই ত সবকিছু করেছি আমি। তোমার মত পেলেই তোমার সঙ্গে রেজিস্ট্রি অফিসে—

বাধা দিয়ে উর্মিলা বলে ওঠে—না না, আপনার কোনও কথা শুনতে চাই না আমি! আমি মরে গেলেও আপনার মতো লোককে—

হো হো করে হেসে ওঠে বিনায়ক শর্মা। বলে—কি করে তোমার মতো মেয়েদের বশ করতে হয়, তা আমার ভালই জানা আছে! প্রয়োজন হলে তোমার ওপর বলপ্রয়োগ করতেও যে কুণ্ঠিত হব না আমি, এ কথা মনে রেখো।

কথা শেষ হয় না।

বাইরে শোনা যায় পায়ের শব্দ।

ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে দীপক আর ইন্‌স্পেক্টর বাসু। দুজনের হাতেই ঝক্‌ঝকে দুটি রিভলভার। পেছনে পুলিশের হাতে বন্দী বিনায়কের চিৎপুর রোডের আড্ডার চারজন লোক।

দীপক বলে—বলপ্রয়োগ করবার অনেক পূর্বেই যে তোমার ওপরেই আমরা বলপ্রয়োগ করতে বাধ্য হব, এটা বোধ হয় আমাদেরও ধারণার বাইরে ছিল। কিন্তু দুঃখিত। ইউ আর আণ্ডার অ্যারেস্ট।

বিনায়ক তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলে—অপরাধের প্রমাণ?

দীপক হেসে বলে—মিঃ বাসু, ওকে আগে অ্যারেস্ট করুন। কথার জাল বুনে যাতে পালাবার সুযোগ না পায়।

মিঃ বাসু তার হাতে হাতকড়া পরিয়ে দেন।

দীপক বলে—এবার শোন, তোমার বিরুদ্ধে কি কি প্রমাণ আছে। উর্মিলা দেবীই তোমার বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় প্রমাণ। ইনি যখন মৃগাঙ্কবাবুর সঙ্গে হোটেলে 'এন্‌গেজ্‌ড্‌' ছিলেন, সেই সময়েই তুমি শশধরবাবুর বাড়িতে গিয়ে তাঁকে হত্যা করেছিলে। মৃগাঙ্ক রায় যে নির্দোষ উর্মিলা দেবীই তার প্রমাণ। আর তোমার দোষ প্রমাণ করবেন প্রমীলা দেবী আর দর্জি হরিচরণ প্রামাণিক।

বিনায়ক কোনও উত্তর দেয় না।

উর্মিলাকে মুক্ত করা হলো। দীপক আর মিঃ বাসুর সঙ্গে মোটরে উঠতে উঠতে সে বলে—আপনাদের কাছে আমি চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকব!

তার মুখে ফুটে ওঠে কৃতজ্ঞতার আলো।

দীপক কোনও উত্তর দেয় না।

—শেষ—

নূতন অতিথি

এক

—আলো-আঁধার—

ভোরবেলায় বেড়াতে বের হওয়াটা অনেকের একটা জন্মাবধি শখের মতো হয়ে দাঁড়ায়। শীত-গ্রীষ্ম ভেদ নেই, ভোর সাড়ে পাঁচটা কি ছটায় তাঁরা পথে বের হয়ে পড়েন।

পুলিস ইন্‌স্পেক্টর বঙ্কিমবাবুও ছিলেন এমনি ধরনের লোক। তিনি একটু বেশি মোটা—তাই ডাক্তার উপদেশ দিয়েছিলেন তাঁকে ভোরে উঠে একটু বেড়াবার জন্যে। ওতে শরীরের রক্ত চলাচল হয়—শরীরের গ্লানিটাও দূর হয়। আজ প্রায় ছ'সাত বছর আগের কথা এটা।

এখন অবশ্য বঙ্কিমবাবুর শরীরের মেদ যথেষ্ট কমে গেছে কিন্তু তাঁর সেই পুরোনো শখটা যায়নি। প্রখ্যাত গোয়েন্দা দীপক চ্যাটার্জীর সঙ্গে তাঁর বহুদিনের বন্ধুত্ব। তিনি তাই সম্প্রতি দীপক আর রতনকে তাঁর ভোরবেলার বেড়াবার সঙ্গী করে নিয়েছেন।

দীপকের অবশ্য বঙ্কিমবাবুর মতো অতটা হেঁটে বেড়াবার শখ নেই। সে তাই ভোরে উঠে বঙ্কিমবাবু আর রতনকে নিয়ে সোজা চলে যায় গড়ের মাঠে। সেখানে সে আর রতন একটা বেঞ্চে বসে গল্প করে। বঙ্কিমবাবু সেই ফাঁকে গড়ের মাঠের বুকের ওপর সদম্ভ পদক্ষেপে তাঁর প্রাত্যহিক ভ্রমণপর্বটা সেরে নেন।

সম্প্রতি দীপক আর রতনের মতো সঙ্গী পেয়ে বঙ্কিমবাবুও খুব উৎফুল্ল হয়ে উঠেছেন। তিনি তাই খুব ভোরে উঠেই দীপকদের বাড়িতে হানা দেন। তারপর সকলে একসঙ্গে এসে নামে গড়ের মাঠে।

সেদিনও সকাল ছটায় সকলে এসে নামল গড়ের মাঠে। দীপক আর রতন একটা বেঞ্চে বসে পড়ল। বঙ্কিমবাবু হনহন করে হেঁটে চললেন দ্রুতপায়ে।

ওঁর অপসৃয়মাণ দেহটার দিকে চেয়ে রতন বলল—ভদ্রলোকের বয়স ত এখনও তেমন বেশি হয়নি—বড় জোর পঁয়ত্রিশ। এই বয়সেই এত ভ্রমণ-ব্যাধি কেন বল ত!

রতনের কথায় হাসতে হাসতে দীপক বলে—আর যাই হোক, রোজ ওঁর সঙ্গে দেখা হওয়ায় আমাদের কিন্তু একটা সুবিধেই হয়।

—সুবিধে?

—হ্যাঁ, শহরের বুকে নতুন কোনও ঘটনা ঘটলেই আমরা তা সর্বাগ্রে জানতে পারি। উনি হচ্ছেন এখন আমাদের খবরের গেজেট!

—কথাটা মন্দ বলিসনি কিন্তু।

হো হো করে হেসে ওঠে রতন।—কিন্তু ওকি! উনি যে দেখছি ভ্রমণ-পর্ব শেষ না করেই এই দিকে ফিরে আসছেন!

—কই?

—ওই ত! যেভাবে দ্রুত আমাদের দিকে আসছেন, তাতে মনে হচ্ছে, যেন কোনও একটা জরুরী কথা মনে পড়েছে! তাই সেটা বলবার জন্যে—

—হয়ত তাই হবে।

একটু পরেই বঙ্কিমবাবু দ্রুতপদে সেখানে ফিরে আসেন। দীপকের দিকে চেয়ে বলেন—উঃ, আপনাদের সঙ্গে নিয়েই আমার ভুল হয়েছে। আমি আজ ছ'বছর সকালে উঠে ময়দানে বেড়াতে আসি—অথচ এতদিন কোনও ঘটনা ঘটল না। কিন্তু যেই আপনাদের সঙ্গে নিয়ে চলতে শুরু করলাম, অমনি দেখি নানা ধরনের বিদ্‌ঘুটে কাণ্ড! সকালে উঠেই কিনা একেবারে মৃতের মুখ-দর্শন!

—সে কি কথা বঙ্কিমবাবু? দীপক অবাক বিস্ময়ে প্রশ্ন করে—এত ভোরে মৃত কোত্থেকে এলো?

—কোত্থেকে এলো দেখতে চান? তবে আসুন আমার সঙ্গে। আপনাকে দেখাব বলেই ত এলাম। নাঃ, আপনাকে সঙ্গে নেওয়াই ভুল হয়েছিল!

—যা ঘটে গেছে তার ত আর কোনও চারা নেই। এখন বলুন দেখি কোথায় দেখলেন মৃতদেহটা।

—ওই মনুমেণ্টের ঠিক পাশে। একটা লোক উপুড় হয়ে পড়ে আছে। ডেকে কোনও সাড়াশব্দ পেলুম না। গায়ে হাত দিয়ে দেখি গা বরফের মতোই কনকনে ঠাণ্ডা।

—কি আশ্চর্য! ময়দানে মৃতদেহ! আর প্রথম আবিষ্কারক আপনি! এ যে দেখছি অদ্ভুত যোগাযোগ!

—যা বলেন মশাই, ক্ষতি নেই। আগে দেখুন সত্যি কিনা, তারপর ঠাট্টা করবেন।

—ঠাট্টা করব কেন? চলুন না দেখে আসি। এতবড়ো একটা ইন্‌টারেস্টিং ঘটনা। উঃ, আজকের ভোরটাই একটা স্মরণীয় দিন।

—আপনাদের কাছে স্মরণীয় হতে পারে, কিন্তু আমার কাছে একটা বাড়তি ঝামেলা ছাড়া আর কিছু নয়। ছিঃ, আগে জানলে কি আর—

—বেশ, চলুন দেখি কি ব্যাপার!

সকলে পায়ে পায়ে এগোয় মনুমেণ্টের দিকে।

ঠিক মনুমেণ্টের পুবদিক ঘেঁষে এরা এসে থমকে দাঁড়ায়। একটা লোক উপুড় হয়ে পড়ে আছে। শরীরে কিছু কিছু কাদা লেগে আছে। গত রাতে বৃষ্টি হয়েছিল, তাই মাঠে মাঝে মাঝে এখনও কাদা ও জল জমে আছে।

দীপক মৃতদেহটার দিকে মনোযোগ না দিয়ে মাটির ওপর উবু হয়ে বসে পড়ে। তারপর মাটির ওপর মনোযোগ দিয়ে কি যেন লক্ষ্য করতে থাকে।

বঙ্কিমবাবু বলেন—মৃতদেহটা না দেখে ওদিকে কি দেখছেন মশাই? শেষে কি আপনার মাথা খারাপ হলো নাকি?

দীপক হেসে বলেন—না। মৃতদেহটা দেখবে পোস্ট মর্টেম বিভাগ। আমি দেখব মাটির ওপর ওই পায়ের ছাপগুলো। দেখছেন না, নরম মাটির ওপর এই পায়ের দাগগুলো কেমন স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে।

—তা ত দেখছি।

—এগুলো হচ্ছে আপনার পায়ের ছাপ। আপনি এর আগে একবার এসেছিলেন। আর এই দু' জোড়া অন্য লোকের পায়ের ছাপ। একজন খুব লম্বা আর চওড়া বলে মনে হয়। দেহের ওজনও যথেষ্ট। অন্যজন একটু বেঁটেখাটো। তার একটা পা বোধ হয় একটু ছোট, তাই খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলে।

—আশ্চর্য, এত কথা কি করে জানলেন?

—আপনি দেখুন না। লম্বা-চওড়া লোকটির পা মাটির মধ্যে গভীরভাবে বসে গেছে। আর এ লোকটার তা যায়নি। কিন্তু এর একটা পায়ের ছাপ একটু বেশি হলেও অন্যটা তা নয়। তবে দুজনেই যে এই মৃতদেহটা ধরাধরি করে এখানে এনে ফেলে রেখে গেছে তা বোঝা যায়।

—কেমন করে?

—একটা মানুষকে ধরে বয়ে আনলে তার ভারে পায়ের ছাপ একটু বেশি গভীর হয়। দেখুন দুজনের গভীরতাই আমাদের ছাপের চেয়ে বেশি।

—কিন্তু এটা জেনে লাভ কি হলো?

—লাভ হলো এই যে, আমরা বুঝতে পারছি খুনটা এখানে হয়নি। অন্য কোথাও খুন করে তাকে এনে এখানে ফেলে দেওয়া হয়েছে। এখন আমাদের জানতে হবে—কোথেকে ওদের আসা হয়েছে, বা মৃত ব্যক্তিটি কে?

কথা শেষ করে দীপক পায়ের ছাপগুলি অনুসরণ করে ধীরপদে এগোতে থাকে। নরম মাটির ওপর বহুদূর পর্যন্ত দেখা যায় দাগগুলি স্পষ্ট হয়ে ফুটে আছে।

ঠিক যেখানে দাগগুলি শেষ হয়েছে সেখানে দেখা যায় একটি মোটরের চাকার দাগ। চাকার দাগ বড়রাস্তার দিকে এগিয়ে গেছে।

দীপক বলে—তাহলে এতক্ষণে বোঝা গেল, মোটরে করে লোকটিকে এনে ধরাধরি করে এখানে ফেলে রেখে যাওয়া হয়েছে। যাক, আমার দ্বারা যতটা সম্ভব সাহায্য করলাম বঙ্কিমবাবু। এখন মৃতদেহটাকে পোস্ট মর্টেমে পাঠিয়ে দিন। আর দেখুন, যদি মৃতদেহের একটা ফটো তুলতে পারেন, তবে পত্রিকায় আইডেণ্টিফিকেশনের জন্যে একটা ছবি ছাপিয়ে দিন। আর যদি কেউ এসে স্বীকার করে ত খুবই ভাল হয়। আমাদের যা দেখবার তা দেখা হয়ে গেছে। চল রতন, আমরা এবার মানে মানে পথ দেখি!

বঙ্কিমবাবু একজন বীটের কনস্টেবলকে ডেকে এনে মৃতদেহটা তার পাহারায় রেখে থানার দিকে এগোলেন।

দীপক আর রতন বাড়ির দিকে গাড়ি চালায়।

দীপকের সারা মন জুড়ে একটা চিন্তা শুধু খেলা করতে থাকে। তা হচ্ছে—কি করে এমন একটা অদ্ভুত ঘটনা সম্ভবপর হলো।

রতনলাল নিশ্চুপ। কোন কথা বের হয় না তার মুখ দিয়ে।

দুই

—মৃত কে?—

বেলা আটটা।

দীপক তার বাড়ির ব্যালকনিতে একটা বেতের চেয়ারে বসে ধীরে ধীরে সিগারেট টানছিল চোখ বুজে। সেটাতে শেষ টান দিয়ে সোজা হয়ে উঠে বসে সে। সামনের দিকে মেলে ধরে দৃষ্টিকে।

শীত-শেষের প্রসন্ন আকাশ। হিম-ঝরা, কুয়াশা-মোড়া সকাল নয়—বাতাসে পাওয়া যায় বাসন্তী আমেজ।

ভেসে আসছে পাখির কলকাকলি। হালকা হাওয়া বয়ে নিয়ে আসছে ফোটা ফুলের মিঠে সৌরভ।

রতন এসে দাঁড়ায়। দীপকের আনমনা ভাবটা লক্ষ্য করে বলে—কি ভাবছিস এত?

রহস্যময় হাসি ফুটে ওঠে দীপকের ঠোঁটে। ধীরকণ্ঠে বলে—ভাবছি অনেক কিছু। অ—নে—ক দূরে চলে গেছিল আমার মন। তুই বলতে পারিস রতন, কেন আমি এই ছোট কেসটার মধ্যে বিরাট একটা রহস্যের ইঙ্গিত পাচ্ছি? এ শুধু খুন নয়—এ যেন অনেক কিছু।

রতন বলে—মাত্র ঘণ্টাখানেক আগে ব্যাপারটা আমাদের চোখে পড়েছে—এর মধ্যেই আবার রহস্য কোত্থেকে এলো?

দীপক ধীরকণ্ঠে বলে—এর মধ্যে রহস্য আসেনি, রহস্য ছিল প্রথম থেকেই। যা দেখলাম আর যা কল্পনা করছি তা থেকেই বলছি বিরাট একটা মিসট্রি যেন অক্টোপাসের মতো জড়িয়ে আছে ঘটনাটার চারপাশে।

—একটু প্রাঞ্জল করে না বললে ত আমার চিন্তার দৌড়কে আর প্রসারিত করতে পারছি না।

—বেশ, শোন তবে। ভেবে দেখ আগাগোড়া। একটি লোককে হত্যা করা হলো। ধর, তুই আর আমি মিলে একটা লোককে খুন করলাম। আমাদের মোটরগাড়ি একখানা আছে। আমরা একজন লোককে হত্যা করলে কোথাও তাকে সরাবার চেষ্টা নিশ্চয়ই করব—কিন্তু তা নিয়ে নিশ্চয়ই ময়দানে ছুটব না। কাছাকাছি কোথাও—ধর ভবানীপুরের মোড়ে তাকে রেখে আসব।

রতন বলে—হয়ত ময়দানের কাছাকাছি কোথাও সংঘটিত হয়েছে এই ব্যাপারটা।

—কিন্তু সেখানে ত বেশির ভাগ বিদেশীদের বাস। চীনা, অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান কিংবা মুসলমান কেউ নিহত হলে এটা স্বাভাবিক হতো, কেননা ওই অঞ্চলে ওই ধরনের লোকেরাই থাকে। কিন্তু নিহত ব্যক্তিকে দেখে এবং তার বেশভূষা থেকে তাকে বাঙালী বলে বুঝতে তোকে নিশ্চয়ই বেগ পেতে হয়নি।

—তা অবশ্য সত্যি।

—আমার মনে হচ্ছে ময়দানে মনুমেণ্টের ঠিক নীচে এভাবে ফেলে রাখা হয়েছে ব্যাপারটা সকলকে জানাবার জন্যে। হত্যাকারীরা চায়, যে লোকটি মৃত তার মৃত্যুর খবর জনসমাজে প্রচারিত হোক।

—কিন্তু কেন?

—তা ঠিক জানি না। অবশ্য কিছুটা আন্দাজ করলেও বলব না। আমার অনুমান যে অভ্রান্ত এমন কোনও প্রমাণ নেই যখন।

কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই একটা গাড়িকে বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াতে দেখা গেল। গাড়ি থেকে নামলেন ইন্‌স্পেক্টর বঙ্কিমবাবু। দ্রুত পদক্ষেপে তিনি ওপরের দিকে পা বাড়ালেন।

সিঁড়িতে পদশব্দ শোনা যেতেই দীপক বলল—আমরা এতক্ষণ যা আলোচনা করছিলাম তা যেন ওঁর কানে না যায় রতন!

—বেশ, তাই হবে।

—গুড্ মর্নিং বঙ্কিমবাবু! দীপক শুরু করে।

—গুড্ মর্নিং দীপকবাবু! কিন্তু বলুন ত, সেই পর্বতপ্রমাণ বিপদের মধ্যে আমাকে ফেলে রেখে আপনারা কেটে পড়লেন কেন?

—আমরা বিপদ থেকে আপনাকে উদ্ধার করব বলে!

—তার মানে?

—মানে বুঝলেন না? আমরা আপনাকে সেখানে রেখে বাড়ি চলে এলাম। বাড়ি এসেই চিন্তা করতে শুরু করলাম। এখনও চিন্তা করছি সেই ব্যাপারটা নিয়েই। চিন্তা করে আর তদন্ত করে ব্যাপারটা নিশ্চয়ই সল্‌ভ্ হবে। আর সল্‌ভ্ হলে ত আপনারই সুবিধে।

—তা অবশ্য ঠিক কথাই বলেছেন এক হিসেবে! হো হো করে তিনি এমনভাবে হেসে ওঠেন যেন বিরাট একটা রসিকতা রয়েছে দীপকের কথাগুলোর মধ্যে।

—তারপর, কিছু খবর নিশ্চয়ই বহন করে এনেছেন বঙ্কিমবাবু?

— কি করে বুঝলেন সে কথা?

—খবর না থাকলে এত সত্বর আপনার পদধূলি পড়ত না। যাক, এবার চটপট খবরগুলো বলে ফেলে মনটাকে হাল্‌কা করুন।

—প্রথম খবর, নিহত লোকটি প্রথম জীবনে একটি গুপ্ত রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ওঁর নাম বিভূতিভূষণ চাকলাদার। বাড়ি মানিকতলার কাছাকাছি।

—তারপর?

—দীর্ঘদিন উনি বাংলার বাইরে ছিলেন। এদেশে এসেছিলেন সম্প্রতি। ওঁর মানিকতলার বাড়িটা এতদিন ভাড়া দেওয়া ছিল। এতদিন বাদে তিনি স্ত্রী ও একমাত্র পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে এসে বাস করছিলেন।

—ওঁকে আইডেন্টিফাই করল কে?

—ওঁর স্ত্রী।

—তিনি কি করে থানায় এলেন? এত তাড়াতাড়ি খবর পাওয়া অবশ্যই সম্ভব নয়!

—না, তিনি নাকি পরশু থেকে আর বাড়িতে ফিরে যাননি। বাধ্য হয়ে ওঁর স্ত্রী হাসপাতালগুলিতে খোঁজ নেন। কিন্তু কোথাও না পেয়ে অবশেষে থানায়—

—বুঝেছি। ওঁর বাড়ির ঠিকানাটা—

—তেইশ নম্বর, বলাই প্রামাণিক লেন, মানিকতলা।

ঠিকানাটা লিখে নিয়ে দীপক বলে—আচ্ছা, এদিককার খবর ত শুনলাম, অন্য কোনও খবর আছে এ ছাড়া?

—আর কোনও খবর অবশ্য নেই। তবে আজ বিকেলেই জানাব আর একটা খবর।

—বুঝেছি, দীপক বলে—পোস্ট মর্টেম রিপোর্টের কথা বলছেন বোধ হয়?

—ঠিক তাই। কিভাবে মিঃ চাকলাদারের মৃত্যু হয়েছে সেটা তখন অবশ্যই জানা যাবে। এ ছাড়া আর কোনও খবর আপাতত পাইনি।

—ধন্যবাদ বঙ্কিমবাবু! আপাতত এটুকু খবরই আমার কাছে যথেষ্ট মূল্যবান। এই খবরগুলির বিনিময়েই আমি আপনাকে চা ও প্রচুর জলখাবার দিয়ে আপ্যায়িত করতে প্রস্তুত।

দীপকের রসিকতায় আবার সশব্দে হেসে ওঠেন বঙ্কিমবাবু।

সেদিনই বিকেল পাঁচটা।

টেলিফোনের শব্দে আকৃষ্ট হয়ে রিসিভারটা তুলে দীপক প্রশ্ন করে—হ্যালো, কে কথা বলছেন?

—আমি বঙ্কিমবাবু।

—ও, পোস্ট মর্টেম রিপোর্ট নিশ্চয়ই?

—হ্যাঁ, ভদ্রলোকের মৃত্যু হয়েছে শ্বাসরোধে। 'Suffocated to death'—এই হচ্ছে পোস্ট মর্টেম রিপোর্ট। দড়ির মতো কোনও জিনিস দিয়ে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়েছে। আর এই হত্যার সঙ্গে একাধিক লোক জড়িত বলে রিপোর্ট দিয়েছে।

—বুঝেছি। আচ্ছা আর একটা কথা। মৃত্যুর আগে তিনি কি বাধা দেননি?

—ওহো, সে কথাটাও বলতে ভুলে গেছি। ক্লোরোফর্মের সাহায্যে অজ্ঞান করা হয়েছিল এমন প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। মনে হয় অজ্ঞান অবস্থায় দম বন্ধ করে...

—এ রকম মনে হবার কারণ?

—কারণ শরীরের কোথাও কোনও 'স্ট্র্যাঙ্গুলেশন'-এর চিহ্ন পাওয়া যায়নি, তা থেকে মনে হয় কারও সঙ্গেই ওঁর কোনও ধস্তাধস্তি হয়নি। তা ছাড়া নাকে-মুখে পাওয়া গেছে ক্লোরোফর্মের গন্ধ...

—ঠিক আছে। আর কিছু জানবার প্রয়োজন নেই আমার। বঙ্কিমবাবু, একদিকের ব্যাপারটা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে আমার কাছে। তবে বাকীটা—

দীপক রিসিভারটা নামিয়ে রাখে।

তিন

—তদন্তের ধারা—

সন্ধ্যা হতে খুব বেশি দেরি নেই।

অপরাহ্নের কুয়াশা-ঘন বাতাসে শীত-শেষের হিমেলা সংকেত। পাতা-ঝরার দিন শেষ হতে চলেছে। তবে এখনও শীতলতার কিছুটা অবশেষ মনে জাগিয়ে দেয় বিগত শীতের স্মৃতি।

দীপকের মোটর ছুটে চলেছে মানিকতলার দিকে।

দীপকের সারা মুখে একটা সংকল্পের স্থিরতা। দৃঢ়তা-মাখানো মুখে একটা শান্ত স্থৈর্য। কিছুটা চিন্তার ছায়া তাতে মেশানো।

সার্কুলার রোড।

ফাঁকা রাস্তা। গাড়ির জটলা কিছু কম। দীপক গাড়ির গতি বাড়িয়ে দেয়। স্পীডোমিটারে কাঁটাটা ঘুরতে থাকে। সেদিকে মনোযোগ দেবার মতো মনের অবস্থা দীপকের নয়। বঙ্কিমবাবুর কথাগুলো তাকে যেন অদ্ভুত ভাবে ভাবিয়ে তুলেছে।

মানিকতলা।

স্টিয়ারিংটা সজোরে চেপে ধরে বাঁ দিকে গাড়িখানা ঘুরিয়ে নেয় দীপক। একটা রাস্তা পেরিয়ে সামনেই বলাই প্রামাণিক লেন।

তেইশ নম্বরের বাড়িটা খুঁজে বের করতে খুব বেশি বেগ পেতে হয় না।

মোড়ের গ্যাসের আলোটা বাড়িখানার বাইরের অংশটাকে বিশেষ আলোকিত করতে পারছে না। বাড়ির একতলায় আলোর চিহ্নমাত্র নেই। সারা বাড়িটা প্রথম দর্শনেই কেমন যেন রহস্যময় বোধ হয়।

দীপক সজোরে কড়া নাড়ে।

একটু পরেই একতলার আলোটা জ্বলে ওঠে। একটি ছেলে দরজা খুলে সামনে এসে দাঁড়ায়। বয়স সতের-আঠারর বেশি নয়

—কাকে চান স্যর?

—মিসেস্ চাকলাদার বাড়িতে আছেন?

—হ্যাঁ, মা ওপরে আছেন। কোত্থেকে আসছেন আপনি?

—ভবানীপুর। আমার নাম দীপক চ্যাটার্জী। ডিটেকটিভ। ওঁকে বলো, তোমার বাবার মৃত্যুর তদন্তব্যাপারে আমি ওঁকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই।

ছেলেটি কথা না বাড়িয়ে ভেতরে অদৃশ্য হয়। ফিরে আসে ঠিক তিন মিনিট পরে।

—আসুন। মা আপনার সঙ্গে দেখা করতে সম্মত।

ছেলেটিকে অনুসরণ করে দীপক দোতলায় উঠে যায়। মাঝারি আকারের দু'খানা ঘর পাশাপাশি। সামনে বারান্দা।

দীপককে বসতে অনুরোধ করে মিসেস্ চাকলাদার বলে—আপনি যে আমার স্বামীর হত্যা-তদন্তে হাত দিয়েছেন এজন্যে আমি অনুগৃহীত হয়েছি মিঃ চ্যাটার্জী। আপনার মতো খ্যাতনামা ডিটেকটিভ—

বাধা দিয়ে দীপক বলে—কিন্তু সফলতাব জন্যে আপনাদের সাহায্য আমার পক্ষে অপরিহার্য।

—জানি তা। তাই যতোটা সম্ভব সাহায্য করতে প্রস্তুত আমি। আপনি কি জানতে চান বলুন।

দীপক অবাক্ হয়ে যায়। কেমন যেন একটা পরস্পরবিরোধী চিন্তা এসে পাক খায় তার মনে।

মিসেস্ চাকলাদারকে দেখে মোটেই দুঃখিত বলে বোঝা যাচ্ছে না। যেটুকু দুশ্চিন্তার ছায়া দেখা যাচ্ছে তাঁর মুখে তার মধ্যে ততটা শোকের প্রাবল্য নেই। কিন্তু কেন? তবে কি স্বামীর সঙ্গে তাঁর সদ্ভাব ছিল না? কিংবা উনি এত চাপা যে ওঁর মনের ভাবটা মুখে ফুটে ওঠে না?

দীপক বলে—যতদূর মনে হয়, মিঃ চাকলাদারের এই অভাবনীয় মৃত্যু ঠিক আজকের ঘটনা নয়। এর পেছনে যেন একটা জটিল চক্রান্ত—

—চক্রান্ত? একটু যেন অবাক্ হয়ে যান মিসেস্ চাকলাদার।

—হ্যাঁ। কিন্তু সে কথা থাক। আপনি কি জানেন, গত কয়েকটি মাস মিঃ চাকলাদার কি রকম মনোভাব নিয়ে দিন কাটাচ্ছিলেন?

—সবদিক থেকে সাধারণ। তবে মাঝে মাঝে ওঁকে কেমন যেন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত বলে মনে হতো।

—আর কিছু?

—দুশ্চিন্তার অন্য কোনও কারণ ছিল না। তাই মাঝে মাঝে আমি তাঁকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করতাম।

—তিনি কিছু বলেছিলেন?

—হ্যাঁ, একবার তিনি বলেছিলেন বটে একটা কথা। কিন্তু সে কথায় তখন ততটা আমল দিইনি।

—কি কথা?

—একদিন প্রশ্ন করায় তিনি বলেছিলেন, আমি যদি হঠাৎ মারা যাই মিনু, তুমি কি অজয়কে নিয়ে জীবনের পথে এগিয়ে যেতে পারবে?

—অজয় কে?

—আমার ছেলে।

—বুঝেছি। তারপর?

—তারপর আমি তাঁকে ওই সব দুর্ভাবনা ত্যাগ করতে বললে তিনি হেসে বলেছিলেন, এ সবই তাঁর অলীক কল্পনা।

—আচ্ছা, তিনি যেদিন আকস্মিকভাবে নিরুদ্দিষ্ট হলেন, তার আগে কিছু বলে গিয়েছিলেন কি? কিংবা এমন কোনও সম্ভাবনা তাঁর কথায়—

—কিছুমাত্র না।

—ঠিক আছে। আমার আর কিছু জানবার নেই। আমি শুধু একবার মিঃ চাকলাদারের ঘরটা বেশ ভাল করে সার্চ করতে চাই।

—বেশ, আসুন পাশের ঘরে।

মিসেস্ চাকলাদার, অজয় আর দীপক পাশের ঘরে প্রবেশ করে। দীপক ওদের দিকে চেয়ে বলে—আমি ঘরখানা সার্চ করতে চাই একটু গোপনে—সিক্রেট্লি। আপনারা আশা করি ওপাশের ঘরেই বসবেন। অবশ্য যদি আপত্তি না থাকে—

—না না, এ ঘরে এমন কোনও মূল্যবান্ জিনিস নেই যে আমাদের আপত্তি থাকবে। আপনি স্বচ্ছন্দে একা ঘরখানি খুঁজে দেখতে পারেন।

অজয়কে নিয়ে মিসেস্ চাকলাদার বেরিয়ে যান।

তন্ন তন্ন করে ঘরখানি সার্চ করে দীপক। প্রত্যেকটি জিনিস উল্‌টেপাল্‌টে দেখে। টেবিল, চেয়ার, ড্রয়ার, আলমারি—

আলমারিতে সাজানো কতকগুলি বই। একখানা বই টেনে বের করতেই একটা ছোট কৌটো হাতে ঠেকে।

আশ্চর্য, এখানে কৌটো এলো কোত্থেকে? দীপক কৌতূহলী হয়ে সেটা টেনে বের করে খুলে ফেলে।

ভেতরে একখানা সিল্কের রুমাল আর কতকগুলি কাগজ। রুমালটির রং টকটকে লাল। তার ওপরে নীল রঙে লেখা একটি অঙ্ক—'১৭'...

রুমালটা ময়লা হয়ে এসেছে। রংও যেন অনেকটা ম্লান। অন্ততঃ আট-দশ বছর ধরে এটা এখানে আছে বলে বোঝা যায়।

রুমালটা পকেটে রেখে কাগজগুলি বের করে দেখে দীপক। কতকগুলি লেখা। সাংকেতিক ভাষায় এমনভাবে লেখা যে কিচ্ছু বোঝা যায় না। দীপক সময় নষ্ট না করে সেগুলি সযত্নে পকেটে রেখে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসে।

মিসেস্ চাকলাদারের দিকে চেয়ে দীপক প্রশ্ন করে—এই রুমালটা কি আপনি চিনতে পারছেন?

—না।

—কখনও এটা দেখেননি এর আগে?

মৃদু ঘাড় নেড়ে মিসেস্ চাকলাদার উত্তর দেন—কখনো না!

দীপক তারপর অজয়কে প্রশ্ন করে। কিন্তু অজয়ের কাছ থেকেও মেলে না একটা উত্তর।

দীপক তখন মিসেস্ চাকলাদারের পুরোনো জীবন নিয়ে কয়েকটা প্রশ্ন করে। কিন্তু তা থেকেও এমন কোনও 'হিন্ট্' মেলে না, যা থেকে সব কিছু বোঝা যেতে পারে।

দীপক ম্লান হেসে বলে—এর চেয়েও অনেক বেশি কিছু জানতে পারব, এ আশা আমার ছিল মিসেস্ চাকলাদার। যাকগে, একটা শেষ প্রশ্ন করছি, আশা করি সদুত্তর পাব।

—বলুন।

—সম্প্রতি কি কোনও কারণে ওঁকে বিশেষ উত্তেজিত বলে মনে হতো?

—না, তেমন কিছু নয়, তবে গত দিন দশ-পনের হলো ওঁকে একটু উন্মনা লক্ষ্য করেছিলাম।

—ঠিক আছে। দীপক মৃদু হেসে বলে—এটুকু আমার কাজে লাগবে।

দীপক সোজা উঠে দাঁড়ায়।

চার

—চিঠি ও চুরি—

গোয়েন্দা দীপক চ্যাটার্জী

সমীপেষু—

বিশেষ কারণে বাধ্য হয়েই আপনাকে লিখছি এ চিঠি। আপনার পক্ষে এ চিঠি হয়তো অপ্রয়োজনীয় হতে পারে, কিন্তু আমার কাছে এর বিরাট মূল্য। অত্যন্ত serious হয়ে, সুস্থ মস্তিষ্ক নিয়েই এ চিঠি লিখছি।

আমি জানি আপনি মিঃ চাকলাদারের হত্যারহস্যটা নিয়ে যথেষ্ট ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। আপনি আপনার তীক্ষ্ণধী ও ক্ষুরধার বিচারশক্তি নিয়ে এ কেসে যে অত্যন্ত সহজেই সফল হতে পারেন, এ বিশ্বাস আমার আছে। কিন্তু আমি চাই না আপনার মতো একজন লোক এই ব্যাপারটা নিয়ে তার মূল্যবান্ সময় নষ্ট করে।

এবার আসছে কার্যকারণ সম্বন্ধ। যাকে আমি হত্যা করেছি সে সত্যিকারের আইনের চোখে একজন দোষী লোক না হলেও, মানুষের সমাজের ও জাতির ইতিহাসে সে একজন ক্রিমিন্যাল। তার এই পাপের শাস্তি অবশ্যই পাওয়া উচিত।

আপনি বলবেন, আমি কে?

আমি তার উত্তরে বলছি আমি আজ আর সাধারণ একজন মানুষ নই—আমি আজ একজন বিচারকের ভূমিকায় অংশগ্রহণ করতে চলেছি। সুদীর্ঘ দশ বছর আগে এই লোকটি যে অপরাধ করেছিল এই দীর্ঘদিন পরে সে তার ফলভোগ করল।

আমার একান্ত অনুরোধ, এ কেস থেকে আপনি দূরে থাকুন। এ ব্যাপারটা নিয়ে আপনি আর অগ্রসর হবেন না। আমি এর জন্যে আপনার কাছে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ থাকব।

কিন্তু যদি আমার কথামতো কাজ না করেন, তবে আমি আমার ন্যায়দণ্ডে আপনার বিচার করতে কুণ্ঠিত হব না। আপনার মতো দেশের একজন মূল্যবান্ সম্পদ্ হয়ত অকালে প্রাণ হারাবে। দেশ বিরাট একটি মস্তিষ্ক থেকে বঞ্চিত হবে।

আশা করি, ভেবে কর্তব্যনির্ধারণ করবেন।

আমার আন্তরিক সহানুভূতি জানাবেন। ইতি—

বিচারক।

সকালের ডাকে-আসা চিঠিখানার ওপরে আগাগোড়া দু'বার চোখ বুলিয়ে যায় দীপক। মনোযোগ দিয়ে লেখাটা পরীক্ষা করে।

ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে রতন।

—কি রে, অত মনোযোগ দিয়ে কি দেখছিস্ দীপক? রতনের ঠোঁটে প্রশ্ন ফুটে ওঠে।

—এই দ্যাখ্ না!

রতনের দিকে চিঠিখানা এগিয়ে দিয়ে দীপক বলে।

রতন চিঠিখানা আগাগোড়া পড়ে বলে—ব্যাপারটা রহস্যজনক মনে হচ্ছে।

—শুধু রহস্যজনকই নয় বন্ধু, এটা বেশ স্পষ্ট যে অর্থের বা সম্পত্তির লোভে এ খুন হয়নি।

—তবে হয়েছে কেন?

—সেটাও স্পষ্ট। বিচারকের বিচারেই একে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে বলে মনে হচ্ছে।

—কিন্তু কে এই বিচারক—আর কিসের বিচার?

—তা জানি না। তবে এই যে সিল্কের রুমালটা সেদিন পেলাম—যার ওপর '১৭' অঙ্কটা লেখা আছে, এটা যে এই রহস্যের মধ্যে বেশ একটা বড় অংশ অভিনয় করছে, এটা ঠিক।

—তোর কথাগুলো কেমন যেন হেঁয়ালীর মতো মনে হচ্ছে দীপক?

—হেঁয়ালী নয় বন্ধু, যথাসময়েই টের পাবে।

—বেশ। আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষাই করা যাক্।

দীপক রহস্যপূর্ণ কণ্ঠে বলে—দেখা যাক, এর মধ্যে যদি আর কোনও ঘটনা—

রাত গভীর।

জ্যোৎস্নামাখা পৃথিবী। শুক্লা চতুর্দশী। আকাশ থেকে ভেসে-আসা আলোর বন্যা পৃথিবীর পরিবেশকেও স্বপ্নময় করে তুলেছে।

চাঁদ ঢলে পড়েছে পশ্চিম-আকাশে।

রাত বোধ হয় তিনটের কম নয়।

ঘুময়ে পড়েছে পৃথিবী। ঘুমিয়ে পড়েছে পশু-পক্ষী জীবজন্তু। ভেসে আসছে ভোরে-ফোটা ফুলের হালকা সৌরভ। বাতাসে শীতের রেশ থাকলেও কিছুটা যেন বসন্তের ছোঁওয়াও পাওয়া যায়।

বিছানায় শুয়ে থাকলেও দীপকের চোখে ঘুম নেই। কোন এক জাদুর স্পর্শে যেন বহুদূরে চলে গেছেন নিদ্রাদেবী। কে জানে কার প্রতীক্ষায় দীপকের কাটছে এমনি কতকগুলো জাগর প্রহর!

খোলা জানালা। জানালার ফাঁক দিয়ে চাঁদের আলো ঘরের মধ্যে এসে পড়েছে। ঘরের পরিবেশকেও কেমন যেন স্বপ্ন-মাখানো করে তুলেছে।

আলোর পরিবর্তে ফুটে উঠল একটা ছায়া। কে একজন অপরিচিত লোক জানালায় এসে দাঁড়িয়েছে।

দীপক কোনও সাড়াশব্দ করে না। আগন্তুক প্রাণপণ শক্তিতে জানালার গরাদ দুটোতে টান দেয়।

এক মিনিট...দু' মিনিট। গরাদটা বেঁকে যায়। সে ফাঁক দিয়ে লোকটা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে।

দীপক চুপ করে শুয়ে থাকে। লোকটা দীপকের মাথার সামনে এসে দাঁড়ায়। দীপকের জামার পকেটে কি যেন খুঁজতে থাকে।

সেখানে না পেয়ে ঘরের কোণের টেবিলটার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। টেবিলের ড্রয়ারটা ধরে সবে টান দিয়েছে, এমন সময় পেছন থেকে বজ্রগম্ভীর কণ্ঠ ভেসে আসে—হ্যাণ্ডস্ আপ্।

মূর্তি পেছন ফেরে। দুজনে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। দীপকের হাতে রিভলভার। দীপক যেন যন্ত্রদানবের মতো নিষ্করুণ।

একটি মিনিট।

মূর্তিটি হঠাৎ প্রাণপণে দীপকের হাত লক্ষ্য করে একটা লাথি মারে।

এ ধরনের আঘাতের জন্য দীপক প্রস্তুত ছিল না। হাত থেকে পিস্তলটা মেঝের ওপর ছিটকে পড়ে। একটা গুলি গিয়ে প্রচণ্ড শব্দে দেওয়ালে বিদ্ধ হয়।

একটি মুহূর্তের অবকাশ!

আগন্তুক দরজা দিয়ে দ্রুতবেগে অন্তর্হিত হয়ে যায়।

রতন ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে মিনিট দুয়েক পরে।

—কি ব্যাপার রে, মাঝরাতে পিস্তলের শব্দ?

দীপক কপালের চুলগলো ঠিক করতে করতে বলে—উঃ, একটু দেরি হলে তুই এসে এতক্ষণে আগন্তুকের মুখোমুখি দাঁড়াতে পারতিস।

—কিন্তু কে সে?

—তা ত জানি না। তার মুখখানা দেখবার সৌভাগ্য ত হয়নি বন্ধু। সেটা আগাগোড়াই যে ছিল আবরণের আড়ালে। তবে সে মূর্তিটি আমি ভুলব না। এ নিশ্চয়ই সেই লোক যে মৃতদেহটা টানতে টানতে ময়দানে ফেলে রেখে এসেছিল। আর ওর সহকারী ছিল সেই বেঁটে খোঁড়া লোকটা। বিচারককে চিনলাম—কিন্তু তার সহকারী যে কে—

* * *

দীপকের কথা বলা শেষ হয় না।

টেলিফোনটা ঘন ঘন বেজে উঠে তার কথার মধ্যে বাধার সৃষ্টি করে।

রিসিভারটা তুলে নিয়ে দীপক ধীরকণ্ঠে প্রশ্ন করে—হ্যালো, কে কথা বলছেন?

—আমি। ধীর কণ্ঠ ভেসে আসে।

—কে তুমি? দীপকের কণ্ঠে প্রশ্ন।

—বিচারক।

—কি চাও তুমি? কেন আমাকে এই মাঝরাতে—

—আমার কর্মপদ্ধতির একটু ইশারা শুধু তুমি পেয়েছ। এর পরে তুমি জানবে আমার ক্ষমতা কতো অসীম! কতো বিশাল!

দীপক এ কথার কোনও উত্তর দেয় না। টেলিফোনের রিসিভারটা নামিয়ে রাখতে রাখতে আপনমনেই বলে—ভবিষ্যতে যখন আবার দেখা হবে, তখন দেখব কার ক্ষমতা বেশি আর কার কম।

দীপকের থমথমে মুখের দিকে চেয়ে রতন কোনও কথা বলে না।

পাঁচ

—আর একটি—

পরদিন সকাল।

দীপক আর রতন আলোচনা করছিল বিগত রাতের ঘটনাগুলো নিয়ে।

রতন প্রশ্ন করে—তোর সবকিছুর মধ্যেই কেমন যেন একটা রহস্যের গন্ধ পাই দীপক। কি করে তুই বুঝলি যে কাল রাতেই এই ধরনের অভিযান ঘটতে পারে?

দীপক হেসে বলে—বোঝা নয়—আন্দাজ। কিছুটা কল্পনাও বলতে পারিস। কল্পনা জিনিসটা কেবল কবি বা সাহিত্যিকেরই একচেটিয়া জিনিস নয়—ডিটেকটিভেরও কিছুটা থাকা উচিত। পরস্পর কিছুটা সংবদ্ধ বা অসংবদ্ধ ঘটনা দাঁড় করিয়ে তা থেকে মনে মনে সারা কেসটা সম্বন্ধে একটা ধারণা গড়ে নিতে হয়।

—সে কি কথা? এর মধ্যে আবার সংবদ্ধ ঘটনা কোত্থেকে এলো?

—হ্যাঁ। খুন, রুমাল আর বিচারকের চিঠি তিনটে মিলিয়ে একটা ধারণা আমার মনে বাসা বাঁধে। ঠিক তার ওপর ভিত্তি করেই—

—বুঝেছি। যাক, যে লোকটা কাল রাতে এসেছিল সেই যে বিচারক ছদ্মনামে চিঠি দিয়েছে এ ধারণা তোর হলো কি করে?

—সেটা হওয়া এমন কিছু কঠিন নয়। প্রথমে ভেবে দেখ দুজন লোকের অস্তিত্ব আমরা জানতে পেরেছিলাম ময়দানের পায়ের ছাপ থেকে। একজন দীর্ঘ, স্বাস্থ্যবান লোক, অন্যজন বেঁটে, রোগা আর খোঁড়া মতো লোক। কিন্তু আমার ধারণা বাসা বাঁধল এই ভিত্তির ওপর যে, সুদীর্ঘ দশ বছর আগের কোনও একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে যে কোনও লোকের বিচার করবার জন্যে রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হতে পারে, সে আর যাই হোক, বেঁটে, রোগা, খোঁড়া লোক নয়। কাজেই সে হয়ত সহকারী। অন্য যে লোকটির বিবরণ আমরা জানতে পারছি, তার সঙ্গে গত রাতের লোকটির যথেষ্ট মিল পাওয়া যাচ্ছে! কাজেই—

কথা শেষ হয় না। টেলিফোন ঘন ঘন সশব্দ আহ্বান জানায়।

দীপক উঠে গিয়ে রিসিভারটা কানে লাগিয়ে প্রশ্ন করে—হ্যালো, কে?

—আমি বঙ্কিমবাবু কথা বলছি।

—সুপ্রভাত! তারপর ব্যাপার কি বলুন ত বঙ্কিমবাবু! এত ভোরে যখন আহ্বান তখন নিশ্চয়ই কোনও সংবাদ—

—ঠিকই ধরেছেন। আর একটি হত্যাকাণ্ডের সংবাদ আপনাকে জানাচ্ছি। কাল বিকেলে রায় বাহাদুর সমীরণ মুখার্জীকে তাঁর ঘরে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে। মৃত্যুর কারণ এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি—তবে বিষপ্রয়োগের ফলেই যে তাঁর মৃত্যু হয়েছে এ সম্বন্ধে আমরা সুনিশ্চিত। তবে কি বিষ কিভাবে প্রয়োগ করে যে তাঁকে হত্যা করা হয়েছে তা জানি না। দেহটা পোস্ট মর্টেমে পাঠানো হয়েছে।

—বুঝলাম, কিন্তু ওর সঙ্গে আবার আমাকে জড়ানো—

—না না, আপনাকে আসতেই হবে। আমি কোনও আপত্তি শুনব না।

—কিন্তু তবে ত এখনই আমাকে ঘটনাস্থলে যেতে হয়—

—তাই ত বলছি। আমিও যাচ্ছি এখন সেখানে। পঁয়ত্রিশ নম্বর রসা রোডে রায় বাহাদুর সমীরণ মুখার্জীর বাড়ি।

—আচ্ছা আমি আর রতন এক্ষুণি সেখানে যাচ্ছি। আপনিও সেখানে গেলে দেখা হবে—

—হ্যাঁ, আমিও যাচ্ছি। ওহো, আর একটা কথা। মৃতদেহের কাছে একখানা চিঠি পাওয়া গিয়েছিল। তাতে লেখা ছিল ঃ পুরোনো পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্যে এঁকে জীবন দিতে হলো—বিচারক।

—বিচারক? দীপক যেন লাফিয়ে ওঠে।

—কেন, তাকে চেনেন নাকি?

—চিনি না। তবে কাল রাতে কোনও একটা জিনিস আমার কাছ থেকে নেবার জন্যে সে আমার বাড়িতে হানা দিয়েছিল। মুখোমুখি দেখা—কিন্তু তার বড় ভাগ্য যে এযাত্রা বেঁচে গেল। কিন্তু, তবু প্রমাণ ত আর নষ্ট হচ্ছে না। আচ্ছা, আর একটা কথা। চিঠি বা অন্য কোথাও কি তার কোনও হাতের ছাপ পাওয়া গেছে? কোনও ফিংগার-প্রিন্ট?

—কিচ্ছু না। বোধ হয় দস্তানা পরে কাজ সেরেছে। লোকটা কিন্তু খুব বুদ্ধিমান সন্দেহ নেই।

ছয়

—বিচিত্র হত্যাকাহিনী—

রসা রোডের ওপর আধুনিক কায়দায় সুসজ্জিত বিরাট বাড়িখানা দাঁড়িয়ে—মুখার্জী লজ।

সামনে একফালি ফুলের বাগান। রঙবেরঙের মরসুমী ফুলগুলো চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। মাঝে মাঝে পাতাবাহারের গাছ। নানাধরনের অর্কিড। রজনীগন্ধার ঝাড়। রায় বাহাদুর সমীরণ মুখার্জী যে শৌখিন লোক ছিলেন তা একনিশ্বাসে বলা চলে।

দীপক আর রতন বাড়ির ভেতরে এগোয় ধীরপদে। সরু পায়ে-চলার সুরকি-বিছানো রাস্তা পথ—তারই দু'পাশে ফুলের গাছগুলি। সামনেই বাড়িখানা দাঁড়িয়ে। শৌখিন আধুনিকতায় তৈরী বাড়িখানার মধ্যে যথেষ্ট রুচির পরিচয় পাওয়া যায়।

দীপক ও রতন বারান্দার সামনে এসে দাঁড়াতেই একজন ভদ্রলোক এগিয়ে এসে প্রশ্ন করেন—আপনারা বোধ করি দারোগাসাহেবের কাছ থেকে খবর পেয়ে এসেছেন?

—হ্যাঁ। দীপক ধীরকণ্ঠে বলে।

—তিনিও বোধ করি আসবেন, তাই না?

—হয়ত আসতে পারেন। তিনি এলে অবশ্য অল্পক্ষণের মধ্যেই আসবেন। কিন্তু আপনাকে ত চিনতে পারলাম না!

—আমার নাম বোধ করি শুনেছেন। দারোগাসাহেব বোধ করি—

—দারোগাসাহেব নন, উনি হচ্ছেন পুলিস ইন্‌স্পেক্টর বঙ্কিমবাবু। তাঁর কাছে আপনার সম্বন্ধে কোনও খবরই পাইনি।

—আমার নাম বিনয়েন্দ্র শীল। বোধ করি—

বাধা দিয়ে দীপক বলে—আপনি কি এঁদের বাড়িতে চাকরি করেন?

—ঠিক ধরেছেন ত! বোধ করি আন্দাজ করেছিলেন?

—তা না করাই কঠিন নয় কি? আপনার মতো লোক এ বাড়িতে চাকরি না করলে রায় বাহাদুর নিহত হবেন কেন?

—তার মানে? আপনি বোধ করি আমাকে অপমান করছেন? শীল মহাশয়ের কণ্ঠ উগ্র বলে মনে হয়।

দীপক হাসতে হাসতে বলে—আপনার এই 'বোধ করি'র চোটে আমি অস্থির হয়ে উঠছি বিনয়েন্দ্রবাবু। এবার দয়া করে আমাকে যে ঘরে রায় বাহাদুর খুন হয়েছিলেন সেখানে নিয়ে চলুন।

—তা যাচ্ছি। কিন্তু আপনি বোধ করি জানেন না যে ইন্‌স্পেক্টরবাবু নির্দেশ দিয়ে গেছেন তিনি হুকুম না দিলে কেউ ও ঘরে ঢুকতে পারবে না। আপনি বরং একটু অপেক্ষা করুন। তিনি বোধ করি অল্পক্ষণের মধ্যেই—

কথা শেষ হয় না।

বাইরে মোটরের শব্দ শোনা গেল। গাড়ি থেকে নেমে বাড়িতে প্রবেশ করলেন ইন্‌স্পেক্টর বঙ্কিমবাবু।

—আসুন ইন্‌স্পেক্টরবাবু, নমস্কার! আপনি বোধ করি এঁকে এখানে আসতে বলেছিলেন?

—হ্যাঁ। আমি এ কেসে ওঁর সাহায্য চাই।

—সে কথা ত আগেই আমাকে বলেছিলেন। আপনি বোধ করি তা ভুলে গেছেন।

—না, তা ভুলিনি! কিন্তু আপনি এঁকে ভিতরে নিয়ে যাননি কেন?

—উনি কিন্তু লোক বড় ভাল নন। আপনি বোধ করি তা জানেন। উঃ, প্রথমে এসেই বলেছেন, আমার জন্যেই নাকি রায় বাহাদুর নিহত হয়েছেন।

—তাই নাকি দীপকবাবু?

—হ্যাঁ, সে কথা ত আমি সেভাবে বলিনি। আমি বলেছিলাম যে এঁর মস্তিষ্কের ক্ষমতাটা এমন কিছু বেশি নয় বলেই অপরাধীরা হয়ত রায় বাহাদুরের ওপর এভাবে আক্রমণ চালিয়ে সফল হয়েছিল। এ ধরনের মস্তিষ্কের স্বল্পক্ষমতাযুক্ত লোক যেখানে চাকরি করেন—

বাধা দিয়ে মিঃ শীল বলেন—আপনি পর পর আমাকে আক্রমণ করে এভাবে কথা চালালে—

—এ আক্রমণ স্বেচ্ছায় নয় মিঃ শীল। আপনি আপনার কথা ও ব্যবহারের মধ্য দিয়ে নিজেকেই এ আক্রমণের শিকার করে তুলেছেন কিনা, তাই—

—যাক, চলুন মিঃ শীল, এখন এ তর্কের অবসান ঘটিয়ে আমরা ঘটনাস্থলটা একবার দীপকবাবুকে দেখিয়ে দিই।

দোতলার কোণের দিকের ছোট লাইব্রেরী ঘর। এই ঘরের মধ্যেই মৃত অবস্থায় রায় বাহাদুরকে পাওয়া গিয়েছিল।

দীপক বঙ্কিমবাবুর দিকে চেয়ে প্রশ্ন করে—সর্বপ্রথমে কে রায় বাহাদুরকে মৃত অবস্থায় আবিষ্কার করেছিলেন?

বঙ্কিমবাবু বলেন—ঘরের দরজা বন্ধ দেখে ওঁর মেয়ে সুনীলা মুখার্জী এসে বন্ধ দরজায় ধাক্কা দিয়েছিলেন অনেকবার। কিন্তু কোনও উত্তর না পেয়ে উনি বাধ্য হয়ে মিসেস্ মুখার্জীকে ডেকে আনেন। শীল মহাশয়কেও ডাকা হয়। বাড়ির অন্যান্য কর্মচারীরাও এসে জড়ো হয়। অবশেষে সকলে মিলে দরজা ভেঙে ফেলেন।

—আচ্ছা মিঃ শীল, উনি কি অবস্থায় ছিলেন মৃত্যুর পর?

—ওই চেয়ারে বসে ছিলেন। দেহটা চেয়ারে হেলানো। হাতে একখানা বই ধরা ছিল।

—কি বই?

—সে বইখানাও জমা দেওয়া হয়েছে মর্গে। বঙ্কিমবাবু বললেন।

—ঘরের দরজা-জানালা সব বন্ধ ছিল?

—হ্যাঁ, দরজাটা প্রথমে আমরাই খুলি। মিঃ শীল বলেন।

ভাল করে দীপক ঘরের চারদিকে চেয়ে দেখে। খুব মনোযোগ দিয়ে সবকিছু পরীক্ষা করে সে আলমারির সামনে এগিয়ে যায়। একখানা বড় বই টেনে বার করে। মোটা বইখানার এক কোণে সামান্য উই ধরেছে।

দীপক মনোযোগ দিয়ে সেটা দেখে বলে—ওঁকে কোনও এক ধরনের বিষাক্ত গ্যাস দিয়ে হত্যা করেছে বলেই মনে হয় আমার।

—আপনি কি অন্তর্যামী? মিঃ শীল বিদ্রূপপূর্ণ কণ্ঠে বলেন—কি করে আন্দাজ করলেন যে গ্যাস দিয়ে—

—তেমন প্রমাণ পেয়েছি মিঃ শীল। অনর্থক আপনি উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন।

—কি প্রমাণ?

—এই দেখুন, মেঝের ওপরে মৃত ওই টিকটিকিটা পড়ে আছে—ওধারে কয়েকটা মাকড়সা। বইয়ের ভেতর দেখলাম দু'চারটা পোকাও মারা গেছে। তার মানে সারা ঘরের বাতাসটাকেই বিষাক্ত করা হয়েছিল। সেই সূত্রে ভাবলে বোঝা যায় সবার অলক্ষ্যে বন্ধ লাইব্রেরী ঘরের মধ্যে বিষাক্ত গ্যাস দিয়ে কেউ এঁকে হত্যা করেছে। উনি জানতেও পারেননি—বুঝতে পারেননি কিভাবে আততায়ী তাঁকে তিলে তিলে হত্যা করেছে। ধীরে ধীরে ঢলে পড়েছেন অনন্ত নিদ্রার কোলে।

ঘরের মধ্যে নির বিচ্ছিন্ন নিস্তব্ধতা।

—আপনি ঠিকই বলেছেন, মিঃ চ্যাটার্জী! আমিও এই ধারণাই করেছিলাম যে আমার বাবাকে নিশ্চয়ই কেউ এভাবে হত্যা করেছে।

পেছন থেকে নারীকণ্ঠে কথাটা ভেসে এলো। সকলে সেদিকে চেয়ে দেখে—সবার অলক্ষ্যে গোপনে এসে দাঁড়িয়েছে সুনীলা মুখার্জী। তার সারা মুখে উত্তেজনা। মুখখানা থমথমে। সৌন্দর্য আর লাবণ্যের সঙ্গে কেমন যেন একটা সংকল্পের দৃঢ়তা এসে মিশেছে।

ঘরের মধ্যে বাজ পড়লেও বোধ হয় সকলে এতটা চমকে উঠত কিনা সন্দেহ।

দীপক পূর্ণদৃষ্টিতে তার মুখের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করে—যদি আমি বলি যে আপনি জানেন, আপনার বাবার হত্যাকারী কে!

—না! সুনীলা মুখার্জী দৃঢ়তার সঙ্গে কাঁধে ঝাঁকানি দিয়ে উত্তর দেয়।

—অন্ততঃ, আপনার বাবার হত্যাপরাধীর সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা হয়ত আপনার কাছে।

—তাও না। হয়ত কিছুটা...

দীপক দৃঢ় ভঙ্গীতে বলে—তাহলে কি আপনি কি চান না যে আপনার বাবার হত্যাকারী ধরা পড়ুক?

সুনীলা মুখার্জী ভ্রূদুটো কুঁচকে দীপকের মুখের দিকে তাকায়। তার মুখে যেন বিচিত্র এক ভাব খেলা করতে থাকে।

দীপক কোন কথা বলে না।

সে যেন সুনীলা মুখার্জীর মুখের দিকে চেয়ে 'থট্-রীডিং' করতে ব্যস্ত থাকে।

সাত

—রহস্যময়ী—

—সত্যি দীপকবাবু, আমি চাই বাবার এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের জন্যে যে দায়ী সে শাস্তি পাক। আমি চাই এমনি আরও অনেক নিরপরাধ ব্যক্তিকে হত্যা করবার ষড়যন্ত্র করেছে যে উন্মাদ লোকটি তাকে আপনি খুঁজে বের করে আদালতের সামনে উপস্থাপিত করুন!

—কিন্তু, এর জন্যে আপনারা যদি সর্বতোভাবে আমাকে সাহায্য করবার প্রতিশ্রুতি না দেন তবে আমি কি করে সফল হব—

—আমি কিছুটা আপনাকে বলব দীপকবাবু। একটি সামান্য বিষয়ে আমি আপনাকে enlighten করব। কিন্তু মুশকিল কি জানেন? আমি সবকিছু বলতে পারব না। কেন, তা এখন না জানলেও পরে হয়ত জানতে পারবেন। আপনি রহস্যানুসন্ধী। আপনি তীক্ষ্ণধী। আপনার প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা আমার আছে। মনে হয়, সামান্য আলোকপাত করলেই সমস্তটা খুঁজে বের করবার মতো ক্ষমতা আপনার আছে।

—বেশ, বলুন আপনার কাহিনী।

—কিন্তু কথা দিন, আমি যেটুকু বলব, তার বেশি আমার কাছ থেকে বের করবার জন্যে অযথা প্রশ্ন করবেন না।

—বেশ, কথা দিচ্ছি।

—শুনুন তবে।

সুনীলা মুখার্জী ধীরে ধীরে তার কাহিনী বলতে শুরু করে।

আজ থেকে ঠিক দশটি বছর আগে বাংলাদেশের কুড়িটি বিদ্রোহী ছেলে দেশকে স্বাধীন করবার পণ নিয়ে গঠন করে একটি বিপ্লবী-সংঘ। এ দেশের বন্ধন মোচন করে, ইংরেজ-শাসনের নাগপাশ থেকে দেশমাতাকে উদ্ধার করবার ব্রত নিয়ে তারা ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। তারা প্রত্যেকেই ছিল সাহসী, দৃঢ়চেতা, নির্ভীক। আর এই কুড়িটি ছেলের একত্র প্রচেষ্টায় সে সময় দেশের বুকে পর পর অনেকগুলি বিপ্লবপূর্ণ কার্যও সংঘটিত হয়েছিল।

কিন্তু তারা পরস্পরকে চিনে ফেললে যদি একজন পুলিসের হাতে ধরা পড়ে তবে অন্য সকলেরও ধরা পড়বার আশঙ্কা থাকে—এইজন্যে কেবল দলপতি ভিন্ন কেউ কাউকে চিনত না। দলপতির সাহস, উদারতা ও দৃঢ়চিত্ততা ছিল অসম্ভব। সে নিজের চেষ্টায় প্রতিটি উপযুক্ত ছেলে যোগাড় করে তাদের নিয়ে গঠন করে ওই বিপ্লবী-সংঘ।

—কিন্তু তারা কি কখনও সমবেত হতো না? দীপক প্রশ্ন করে।

—হ্যাঁ, হতো। কিন্তু সে সময় তারা তাদের মুখকে একটি রুমাল দিয়ে ঢেকে রাখত। প্রত্যেকের রুমালের ওপর লেখা থাকত নির্দিষ্ট সাংকেতিক নম্বর। '১' থেকে '২০' পর্যন্ত নম্বর ছিল তাদের। কিন্তু দলপতির কোনও নম্বর ছিল না। তার মুখখানা ঢাকা থাকত শুধু একটি কালো রুমালে।

এমনি করেই কাজ এগিয়ে চলেছিল। কিন্তু বিধাতার অমোঘ বিধান...একদিন দলের মধ্যে ভাঙন শুরু হয়ে গেল। হলো ওলোটপালোট। বিশৃঙ্খলা। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই এমন কতকগুলি ঘটনা ঘটল যার জের চলেছে আজ অবধি। যার জের টেনে চলেছিল কতকগুলি মানুষ—যাদের রক্তপাত আজ ঘটছে। কিন্তু বিচারক ভুল করেছে। অন্ধ জিঘাংসার বশবর্তী হয়ে সে যা করেছে তা যে কতবড় অন্যায় তা কয়েকজন ছাড়া আর কেউ ভাল করে বুঝতে পারবে না বোধ হয়।

একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে সুনীলার নিস্পন্দ বুক ভেদ করে। ধীরকণ্ঠে শুরু করে ঃ শীতার্ত একটি রাত। হিমেলা বাতাস বয়ে চলেছে শনশন শব্দে। কুয়াশার সঘন যবনিকা ভেদ করে এগিয়ে চলেছে তারা। সারা ভারতের বিভিন্ন অংশ থেকে বিপ্লবী-সংঘের সকলে এসে জড়ো হয়েছিল মেদিনীপুর জেলার একটি গ্রামে।

দলপতির বিশেষ নির্দেশে মেদিনীপুরে এসে সমবেত হয়েছিল তারা। জরুরী একটি বৈঠক বসবে। এ মিটিং-এ সকলের উপস্থিত থাকা একান্ত প্রয়োজনীয়, এই নির্দেশই প্রত্যেকে পেয়েছিল।

বৈঠক শুরু হলো রাত দশটার পর।

সকলে এসে জড়ো হয়েছে। এক নম্বর থেকে কুড়ি নম্বর পর্যন্ত প্রত্যেকে আপন আপন রুমাল দিয়ে মুখ আবৃত করে বসে আছে। এক কোণে বসে আছে দলপতি।

কাজ শুরু হলো। দলপতি অন্যান্য কথাবার্তার পর তীব্রকণ্ঠে বলে উঠল—আজ আপনাদের সাধারণভাবে আহ্বান জানাইনি। আগেই জানিয়েছি বিশেষ প্রয়োজনীয় কারণে আজ এ বৈঠক। শুনুন, আমি জানতে পেরেছি আমাদের এই দলের মধ্যে এক বা একাধিক লোক হচ্ছে পুলিসের গুপ্তচর। সে বা তারা আমাদের জরুরী খবরগুলো পুলিসের কাছে ইন্‌ফর্ম করে থাকে। মীরজাফরের প্রায়শ্চিত্ত আজও শেষ হয়নি। বন্ধুগণ, তাই আজ আপনাদের কাছে আমারও জরুরী আহ্বান।

যে বা যারা এই বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তাদের ক্ষমা করতে আমি প্রস্তুত। হয়ত ক্ষুধার তাড়নায় বা অবস্থার বিপাকে বাধ্য হয়ে তাকে অর্থ উপার্জনের জন্যে এই হীন পথ বেছে নিতে হয়েছে। কিন্তু একটা কথা—যদি সে বা তারা অপরাধ স্বীকার করে এই মুহূর্তে সংঘ ত্যাগ করে চলে যায়, তবে আমি কোনও শাস্তি দেব না। তারা নির্বিচারে মুক্তি পাবে—অবশ্য আর কখনও সংঘে স্থান পাবে না।

কিন্তু যদি স্বীকার না করে, তবে যেমন করে হোক তাকে খুঁজে বের করে সবচেয়ে কঠিন শাস্তি তাকে দেব। তার রক্তে পৃথিবীর মাটি সিক্ত হয়ে উঠবে। তাই বন্ধুগণ, এখনও স্বীকার করুন, কে সেই গুপ্তচর!

কালো আবরণের মধ্য থেকে দলপতির চোখদুটো যেন দপদপ করে জ্বলতে থাকে।

ঘরের মধ্যে নিঃসীম স্তব্ধতা। সকলে নিরুত্তর।

কোনও শব্দ নেই। নিশ্বাসপতনের শব্দও যেন সুস্পষ্ট শোনা যায়।

দলপতি আবার সজোরে বলে ওঠে—এখনও স্বীকার করুন সত্যিকারের অপরাধী কে?

কিন্তু তবু কেউ কোনও উত্তর দেয় না। অবশেষে দলপতি বজ্রকণ্ঠে হেঁকে ওঠে—আপনারা সকলে আপনাদের পিস্তলগুলো একে একে আমার সামনে রেখে দিন। এই আমি রাখলাম—

দলপতি পিস্তলটা সামনে নামিয়ে রাখে। তার দেখাদেখি অন্য সকলে একে একে তাদের পিস্তলগুলো নামিয়ে রাখে সেখানে। কিন্তু তিনটি বিপ্লবী তাদের পিস্তল নামিয়ে রাখেনি। তার মধ্যে একটি বিপ্লবী নারী। সেই উত্তরে বলে ওঠে—অপরাধী ধরবার ক্ষমতা যদি না থাকে আপনার, আমাদের ওপর সে ভার দিন। কিন্তু দেশমাতার নামে প্রতিজ্ঞা করে যে অস্ত্র হাতে তুলেছি তা নামাতে পারি না।

হ্যাঁ, দলের মধ্যে একজন যে নারী ছিল তা সকলে জানত। কিন্তু কেউ জানত না কে এই রহস্যময়ী।

ওদের তিনজনের কথা শুনে দলপতি গর্জে উঠল—Traitor! বিশ্বাসঘাতক! তোমাদের মধ্যেই নিশ্চয় একজন সেই গুপ্তচর! আমার ইচ্ছে হচ্ছে—

কিন্তু কথা শেষ হয় না।

বাইরে শোনা গেল সশস্ত্র পুলিসের সবুট পায়ের শব্দ। তারা পূর্বাহ্ণেই আজকের এই বৈঠকের খবর পেয়ে সশস্ত্রভাবে এসেছিল বিপ্লবীদের গ্রেপ্তার করতে।

দলপতি হুকুম দেয়—বন্ধুগণ, তোমরা ধরা পড়বে না। মৃত্যুকে ভয় করো না। জন্মগ্রহণ করলে একদিন মৃত্যুকে অবশ্যই বরণ করতে হবে।

কথা শেষ হলো না।

সকলে অস্ত্র তুলে নিয়ে এগিয়ে যায়। যে তিনজন অস্ত্র নামায়নি তাদের নম্বর ছিল '৫', '১১' আর '১৭'—তারাও প্রস্তুত হয়ে পুলিসের দিকে এগিয়ে যায়। অবশ্য যুদ্ধ করতে, না আত্মসমর্পণ করতে তা বোঝা যায় না।

সে যুদ্ধে ছ'জন প্রাণ হারায়। কিন্তু দলপতি স্বয়ং আর ৫, ১১ ও ১৭ নম্বর যে মারা যায়নি একথা সুনিশ্চিত। হ্যাঁ, সেই নারী বিপ্লবীর নম্বর ছিল '১১'...

তারপর আজ দশটি বছর পরে ঘটনার যবনিকা উঠল। আমি জানি 'বিচারক' হচ্ছে কোনও একটি বিপ্লবীর বিপথগামী উন্মাদ প্রতিহিংসাপরায়ণ মনের বিকার মাত্র।

এতগুলি কথা বলে সুনীলা মুখার্জী কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর ধীরকণ্ঠে বলে—এগুলো সব আমি শুনেছি আমার বাবার কাছে। আর কোনও প্রশ্নের উত্তর আমি আপাতত দিতে পারব না দীপকবাবু।

দীর্ঘক্ষণ পরে দীপক কথা বলে—আমার কাছে যে কথাগুলি বললেন তা যেন আর কারও কাছে প্রকাশ করবেন না সুনীলা দেবী! আর সেইজন্যেই সমস্ত লোক চলে গেলে আমি পৃথক্‌ভাবে আপনাকে ডেকে এনে এ বিষয়ে আলোচনা শুরু করেছি।

কথা শেষ করে দীপক উঠে দাঁড়ায়। তারা কয়েক পা এগিয়েছে এমন সময় পেছন থেকে শীল মহাশয়কে এগিয়ে আসতে দেখা যায়। তিনি তাঁর স্বাভাবিক বিনয়পূর্ণ কণ্ঠে বলেন—বোধ করি, দীর্ঘক্ষণ হয়ে গেছে দীপকবাবু। এবার যদি আদেশ করেন ত এক কাপ চায়ের ব্যবস্থা হতে পারে বোধ করি।

দীপক বলে—না, চায়ের এখন প্রয়োজন নেই। সে বরং দিন দুয়েক পরেই হবে'খন। কি বলেন শীলবাবু?

বিনয়েন্দ্র শীল অবাক্ হয়ে দীপকের দিকে চেয়ে বলেন—আবার তাহলে আসছেন?

—হ্যাঁ, মৃদু হেসে দীপক বলে—আমি আজই যে এ বাড়িতে শেষবারের মতো পা দিচ্ছি, এমন প্রমাণ নিশ্চয়ই পাননি?

—না না, বোধ করি অন্য দিন এ বাড়িতে আসবেনই। ছি ছি, আমি কি তা বলেছি? বোধ করি—

বাধা দিয়ে দীপক বলে—আর কিছু বোধ করে কাজ নেই। আমি শুধু যাবার আগে সুনীলা দেবীকে আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই।

—বলুন। সুনীলা ধীরকণ্ঠে বলে।

—আপনার মা, মানে মিসেস্ মুখার্জী, মারা গেছেন শুনেছি। কিন্তু তা কতদিন আগে?

একটু চিন্তা করে সুনীলা বলে—তা প্রায় পাঁচ বছর হলো। কিন্তু কেন বলুন ত!

দীপক হেসে বলে—একটা ছোট সমস্যার সমাধানের জন্যে এটুকুর প্রয়োজন ছিল। যাক এবার আমার কাজ শেষ। চলি সুনীলা দেবী। চলি মিঃ শীল।

রায় বাহাদুর সমীরণ মুখার্জীর বাড়ি থেকে বের হয়ে দীপক একটা ট্যাক্সিকে আহ্বান জানায়।

এমন সময় পথের ওপর একটা মুচি তার দিকে চেয়ে প্রশ্ন করে—জুতা সাফ করনে হোগা বাবুজী?

দীপক ভাল করে সেদিকে তাকিয়ে বুঝতে পারে মুচিটি রতনলাল ছাড়া আর কেউ নয়!

রতনলাল যে তার নির্দেশমতো চমৎকার মেক্-আপ্ নিয়ে ঠিক জায়গায় এসে বসে আছে তা দেখে দীপক খুব আনন্দিত হয়।

দীপক জুতা সাফ করবার অছিলায় রতনের খুব কাছে এসে দাঁড়ায়। তারপর বিড়বিড় করে প্রশ্ন করে—সকাল থেকে ক'জন?

রতন ঘাড় নেড়ে উত্তর দেয়—চার-পাঁচজন হবে।

—সন্দেহজনক কেউ ছিল?

—একজন।

—কি রকম চেহারা?

—দোহারা লম্বা। পরনে স্যুট।

দীপক ঘাড় নেড়ে বলে—ঠিক আছে।

একটি আনি রতনের দিকে ছুঁড়ে দেয়। আড়চোখে তাকিয়ে দেখে উলটো দিকের ফুটপাথে একজন লোক দাঁড়িয়ে তাদের দিকে লক্ষ্য করছে।

দীপক সজোরে বলে—এই মুচি, দু' আনা বলছ কেন? সকলে চার পয়সায় জুতো বুরুশ করে।

রতনও জোরে জোরে বলে—আচ্ছা বাবু, চার পয়সাই দিন।

দীপক হনহন করে পথ চলতে থাকে। কিন্তু উলটো দিকের ফুটপাথে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটির মধ্যে কোনও চাঞ্চল্য দেখা যায় না।

সে তখনও আপনমনে চুপচাপ দাঁড়িয়ে।

আট

—মিসেস্ চাকলাদার—

সেদিন বিকেলবেলা দীপকের বাড়িতে দেখা গেল ইন্‌স্পেক্টর বঙ্কিমবাবুকে।

—গুড্ ইভ্‌নিং, বঙ্কিমবাবু!

—গুড্ ইভ্‌নিং। তারপর আমার ব্যাপারটার কতটা সল্‌ভ্ করলেন দীপকবাবু?

—কিছুটা এগিয়েছে।

—কিছুটা? কিন্তু পর পর এমনি সব ঘটনা ঘটায় ওপর থেকে চাপের পর চাপ আসছে। দয়া করে যদি একটু তাড়াতাড়ি—

—যতটা তাড়াতাড়ি করা সম্ভব বলে মনে করছেন, তত শীঘ্র সম্ভব নয়। দেয়ার ইজ্ এ হিউজ্ মিস্টিরিয়াস্ সার্ক্‌ল বিহাইণ্ড ইট্! এর পেছনে রয়েছে একটা মস্ত বড় রহস্যময় জটিলতা।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ, দশ বছর আগের এরূপ কতকগুলি ঘটনার সঙ্গে আজকের এই সব ঘটনাগুলি জড়িয়ে আছে যে যত সহজে এটা সল্‌ভ্ করা সম্ভব বলে মনে করছেন, ততটা নয়। আর সে জটিলতাও সাধারণ নয়—একটু বাঁকা পথে এগিয়েছে ঘটনার গতি।

—সত্যিই কি তাই? আপনি কি মনে করেন 'বিচারক' লোকটি খুব উঁচুদরের একজন সত্যধর্মী, ন্যায়নিষ্ঠ লোক?

—আমি কি ভাবি তা আপাতত আপনাকে বলতে পারব না বঙ্কিমবাবু। তবে সমস্ত রহস্য একদিনেই জানতে পারবেন। ইন্ দি ফাইন্যাল স্টেজ।

—বেশ। আমি তাহলে উঠি আজকের মতো! আপনার কাজে অযথা বিঘ্ন ঘটাতে চাই না!

—কিন্তু প্রয়োজনের সময় যেন আপনাকে ঠিকমতো পাই বঙ্কিমবাবু। আমার মনে হয় সে দিনেরও আর খুব বেশি দেরি নেই। I know the culprit...কিন্তু প্রমাণ না পেলে ত আর তাকে গ্রেপ্তার করে হাস্যাস্পদ হওয়া যায় না।

—এতদূর এগিয়েছেন!

—ভগবানের দয়া বঙ্কিমবাবু। তা না হলে আমরাও চোখ মাত্র দুটো—আর মাথাও একটা।

হো হো করে হেসে ওঠেন বঙ্কিমবাবু দীপকের এ ধরনের রসিকতা শুনে।

মৃত মিঃ চাকলাদারের বাড়িতে সেদিন বিকেলে দেখা যায় দীপককে। সে তখন মিসেস্ চাকলাদারের সঙ্গে কতকগুলি বিষয়ে আলোচনা করছিল।

আগের দিনের চেয়ে আজ মিসেস্ চাকলাদার অনেকটা সুস্থ ও স্বাভাবিক ছিলেন বলে বোঝা যায়। দীপক এসেছে শুনতে পেয়ে তিনি আগ্রহান্বিত হয়ে দেখা করতে আসেন।

—নমস্কার মিঃ চ্যাটার্জী!

—নমস্কার মিসেস্ চাকলাদার! আমি কয়েকটি অত্যন্ত জরুরী বিষয়ে আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই। আশা করি সে সময় কেউ আসবে না এ ঘরে বিরক্ত করতে!

—না। আমি সে কথা বাইরে জানিয়ে আসছি।

তিনি বাইরে বেরিয়ে যান। মিনিট দুয়েক পরে ফিরে আসেন ধীরপদে। সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে বলেন—এবার আপনি আপনার প্রশ্ন শুরু করতে পারেন মিঃ চ্যাটার্জী।

দীপক ভাল করে তাকায় মিসেস্ চাকলাদারের দিকে। বয়স তাঁর পঁয়ত্রিশের কাছাকাছি। বার্ধক্যের ছাপ তাঁর দেহের ওপর ছায়া ফেললেও এখনো বোঝা যায় যৌবনে তিনি সুন্দরী ছিলেন। তাঁর চেহারাকে ঘিরে রেখেছে একটা সুকঠোর ব্যক্তিত্ব। অনমনীয় দৃঢ়তা।

—প্রশ্নগুলো আমার পক্ষে না করলেও চলত, যদি সব কিছু, মানে যা কিছু আপনি জানেন সব খুলে বলেন। দীপকের স্বরটা গম্ভীর।

মিসেস্ চাকলাদার সোজা হয়ে বসেন। একটি মুহূর্ত কি যেন চিন্তা করে বলেন—আমি এমন কিছু জানি না যে তা নিয়ে আপনার এতটা মূল্যবান্ সময় নষ্ট করা চলে।

—পৃথিবীতে মূল্য জিনিসটা relative, মিসেস্ চাকলাদার—মানে আপেক্ষিক। আমার কাছে যা পরম মূল্যবান্, আপনার কাছে তা মূল্যহীন হতে পারে, আবার আমার কাছে যার যথেষ্ট

আদর, আপনি তা হেলায় তুচ্ছ করতে পারেন। তবে এটা ঠিক, আপনার কথা থেকেই প্রমাণ হচ্ছে, আপনি আগের দিন আমাকে মিথ্যা কথা বলেছিলেন!

দীপকের স্বর বজ্রের মতো কঠোর।

—মিথ্যা কথা! মিসেস্ চাকলাদার যেন চমকে ওঠেন।

—হ্যাঁ, সেদিন আপনি বলেছিলেন যে আপনার স্বামীর এ হত্যা সম্বন্ধে বিশেষ কোনও কারণ আপনার অজ্ঞাত। কিন্তু আমি জানি, বেশ ভালভাবেই জানি, আপনি জানতেন কেন আপনার স্বামী নিহত হয়েছেন। কিন্তু কোনও একজনকে বাঁচাতে গিয়ে আপনি সত্য গোপন করেছেন—আর—

মিসেস্ চাকলাদার উত্তেজিত হয়ে উঠেন—এ আপনি কি বলছেন মিঃ চ্যাটার্জী? আমি জানি না—যা জানি তা এত সামান্য—

কথা শেষ হয় না। মিসেস্ চাকলাদারের ধৈর্য ও সংযম স্রোতস্বিনীর বুকে বালির বাঁধের মতোই মুহূর্তে কোথায় অদৃশ্য হয়ে যা। দু'হাতে মুখ ঢেকে তিনি সোফার বুকে এলিয়ে পড়েন। প্রাণপণ চেষ্টাতেও তিনি কান্নার বেগ রোধ করতে পারেন না।

দীপক কোনও কথা বলে না। ধীরে ধীরে একটা সিগারেট ধরিয়ে তাতে মৃদু টান দেয়।

মিনিট দুয়েক কেটে যায়। মিসেস্ চাকলাদার সোজা হয়ে বসেন। একটু থেমে বলেন—মনকে আমি সত্যই দৃঢ় করেছি মিঃ চ্যাটার্জী। আমি বলতে রাজী আছি, যা আমি জানি। কিন্তু যতোটুকু বলব তার বেশি আমার কাছ থেকে জানতে চাইবেন না।

—বেশ। তবে যা বলবেন তা যেমন আমি জানব, যা না বলবেন, তাও আমার তীক্ষ্ণদৃষ্টি ও পর্যবেক্ষণ ক্ষমতাকে এড়িয়ে যেতে পারবে না। তবে কথা হচ্ছে, তাতে একটু বেশি সময়ক্ষেপ হবে, এইমাত্র। আপনি নিশ্চয়ই চান, আপনার স্বামীর হত্যাকারী ধরা পড়ুক।

—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই চাই। আমার জীবনকে অকালে ধ্বংসের পথে টেনে আনার জন্যে যে দায়ী সে উপযুক্ত শাস্তি পাক, এই আমি চাই...এই আমি চাই—অনেক সহ্য করেছি মিঃ চ্যাটার্জী, কিন্তু আর নয়—

—বেশ, আপনি বাথরুম থেকে মুখ-হাত ধুয়ে প্রস্তুত হয়ে আসুন। মনকে দৃঢ় করে তুলুন। মাথা ঠাণ্ডা রেখে একে একে বলবেন সমস্ত ইতিহাস—

—ঠিকই বলেছেন আপনি।

মিসেস্ চাকলাদার ধীরপদে অদৃশ্য হয়ে যান।

নয়

সিগারেটে আর একটা টান দিয়ে দীপক চিন্তাধারাকে প্রসারিত করে। নিজের মনে খুব ভালভাবে বিচার করে সে প্রতিটি ঘটনার সম্মুখীন হয়েছে। আজ পর্যন্ত আর কোনও কেসে তার এতটা mental exercise করতে হয়েছে কিনা সন্দেহ।

এতগুলি মানুষের মনস্তত্ত্বের খুঁটিনাটি নিয়ে তাকে বেশ ভাল করে পরীক্ষা করতে হয়েছে। 'সাইকোলজিক্যাল অ্যানালিসিস' ছাড়া এ কেস সলভ্ করা প্রায় অসম্ভব ছিল। বর্তমানের চেয়েও অতীত এখানে বড়। অতীতের জের টেনে বেড়ে উঠেছে বর্তমানের জটিলতা।

'৫', '১১' আর '১৭'—এই তিনটি নম্বর দলপতির চোখে বিশ্বাসঘাতক বলে পরিগণিত হয়েছিল। '১৭' নং নিহত তা সে জানে। সেই লোকটিই হচ্ছে মিঃ চাকলাদার—তার ঘরে রুমালটি কুড়িয়ে পেয়ে সে তা জানতে পেরেছে। বিভূতি চাকলাদার হচ্ছে '১৭'। সুনীলার মুখে সে শুনেছে '১১' নং একটি নারী—যে প্রতিবাদ জানিয়েছিল দলপতির সামনে রিভলভার ত্যাগ করবে না বলে। আর '৫' নং নিশ্চয়ই নিহত সমীরণ মুখার্জী—এটুকু সে কল্পনার ভিত্তির ওপর নির্ভর করেই এগোতে পেরেছিল। কিন্তু কে সেই '১১' নং—কে সেই রহস্যময়ী নারী?

দীপক ভাবছিল। সহজে একটি নারী বিশ্বাসঘাতকতা করে পুলিসের গুপ্তচর হতে পারে না। তবে কেন সে দলপতির বিরুদ্ধে গেল? হয়ত একটা অন্য ধরনের ইতিহাস জড়িত আছে তার পেছনে। কিন্তু কি সে ইতিহাস? Love affairs? হয়ত তাই!

কিন্তু সমীরণ মুখার্জীর স্ত্রী মৃতা। সুদীর্ঘ পাঁচ বছর আগেই তিনি একটি মেয়ে রেখে দেহত্যাগ করেছেন। কে তবে সেই রহস্যময়ী? চাকলাদারের পরিবারের কেউ নয় ত? সন্দেহের বশেই দীপক আজ মিসেস্ চাকলাদারকে এভাবে চার্জ করেছিল। কিন্তু এভাবে যে সে সফল হবে তা পূর্বমুহূর্তেও কল্পনা করতে পারেনি।

ঘরের মধ্যে প্রবেশ করেন মিসেস্ চাকলাদার। এখন তাঁকে অনেকটা সুস্থ বলে মনে হয়।

ধীরে ধীরে সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে তিনি শুরু করেন :

আমি যে স্বীকৃতি দিতে চলেছি, আমার এবং আরও অনেকের জীবনে এটার গুরুতর দায়িত্ব আছে দীপকবাবু। তাই আমি চাই না, অন্য কেউ এ সম্বন্ধে সামান্য মাত্র অবহিত হোক।

—বেশ, আমি সিক্রেসী বজায় রাখবার গ্যারাণ্টি দিচ্ছি। অন্যান্য জরুরী প্রয়োজন ছাড়া এ সিক্রেসী ভঙ্গ করব না।

—ধন্যবাদ। এবার শুনুন দীর্ঘদিন পূর্বের একটি কাহিনী। আমি আমার নিজের নামই বলে যাচ্ছি। আমার নাম হচ্ছে রমলা। বিয়ের আগের নাম। বিয়ের অনেক আগেই এ কাহিনীর শুরু। আজ থেকে ঠিক দশ বছর আগে।

আমি তখন কলেজে পড়ি। সেকেণ্ড ইয়ারের ছাত্রী। আমার চেয়ে দু' বছরের সিনিয়ার একটি ছাত্রকে আমি মনেপ্রাণে ভালবাসতাম। আর সে ভালবাসা স্বীকার করতেও আমার অসুবিধে নেই, কারণ, যাঁকে আমি ভালবাসতাম, তিনিই আমার স্বামী মিঃ চাকলাদার!

দিনের পর দিন আমাদের ভালবাসা নিবিড় হয়ে উঠেছিল। একদিন আমাদের এই ভালবাসাকে চিরসাথিত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করব এই ছিল আমাদের স্বপ্ন। কতো কল্পনার জাল বুনেছিলাম। কতো কিছু সাধ-আকাঙ্ক্ষা সে সময়ে হৃদয়ে কুঁড়ি মেলতে শুরু করেছিল।

তারপর একদিন এলো কালবৈশাখীর ঝড়। সেদিন তাকে ঠিক এই রূপে চিনতে না পারলেও আজ পারছি। আজ বুঝতে পারছি কি কুক্ষণেই না ঘটেছিল সে ঘটনাগুলি!

কলেজ থেকে একদিন ফেরবার পথে লাইব্রেরীতে গেলাম একখানা বই নেবার জন্যে। বইখানা নেবার সময় আমি রীডিং-রুমে আমার বইগুলো রেখে এসেছিলাম। ফিরে এসে সেগুলো নিয়ে বাড়ি ফিরে এলাম। কিন্তু তখনও জানতাম না, আমার বইগুলোর মধ্যে কি একটা বার্তা সংগোপনে রক্ষিত ছিল।

রাতে আমার বইগুলো খুলে যখন সেদিকে মনোযোগ দিতে গেলাম, দেখতে পেলাম তার মধ্যে একখানি পত্র সংগোপনে রাখা ছিল। আমি যে সময় লাইব্রেরীতে গিয়েছিলাম, সেই সময়েই রীডিং-রুমে আমার বইগুলোর মধ্যে কেউ সেখানা রেখে গেছে।

আমি কৌতূহলভরে চিঠিখানা খুলে ফেললাম। দেখলাম তাতে লেখা আছে :

রমলা দেবী,

ইংরেজের কালো শাসনের অক্টোপাসে আবদ্ধ রয়েছে আমাদের দেশজননী। মায়ের করুণ কান্না আজ প্রতিটি ভারতবাসীর বুকের পাঁজরকে কি একটা অপরিসীম ব্যথা-বেদনায় ভরিয়ে তুলেছে। আপনিও নিশ্চয়ই এটা অন্য কারোর চেয়ে কম অনুভব করেন না!

আপনি শিক্ষিতা—বুদ্ধিমতী। আপনার কাছে এবিষয়ে সুদীর্ঘ কিছু লিখে বোঝাবার ধৃষ্টতা আমার নেই। বিলাস-ব্যসন, অথবা অলস কল্পনায় নষ্ট করবার মতো সময় আমাদের নেই।

আমরা চাই অবিলম্বে এ দুঃখনিশার অবসান হোক। এ লৌহশৃঙ্খল থেকে মুক্তি পেতে দেশজননী ফেলুক শান্তির নিশ্বাস। দেশ এগিয়ে যাক উন্নতি ও সমৃদ্ধির পথে।

কিন্তু এ দায়িত্ব বাংলার প্রতিটি যুবক-যুবতীর। এই উদ্দেশ্যে অনেকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছে। আপনিও যদি আমাদের দলে যোগ দিয়ে আমাদের এ বিপ্লব-আন্দোলনকে সফল করে তুলতে চান তবে আমাদের সঙ্গে মিলিত হোন। আপনার যদি এ ইচ্ছা থাকে, তবে কাল লাল রঙের শাড়ি পড়ে কলেজে আসবেন। এ ইঙ্গিত থেকেই আমরা বুঝতে পারব, আপনি আমাদের দলে যোগ দিতে ইচ্ছুক।

অবশ্য যদি আপনি অনিচ্ছুক হোন, তবে অন্য কোনও কর্মী আমরা বেছে নেব। আপনাকে সে জন্য কোনও অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে না।

ইতি—

দলপতি, 'বিপ্লবী-সংঘ'

এ ধরনের চিঠি কোনও লোকের মনের ওপর কি পরিবর্তন আনত জানি না, তবে আমি চিঠিখানা পেয়েই একটা নতুন ধরনের উন্মাদনা অনুভব করলাম সারা দেহে-মনে। পরদিন নির্দেশমতোই লাল রঙের শাড়ি পরে আমি কলেজে গেলাম।

কিন্তু আর কোনও সাড়াশব্দ পেলাম না ও তরফ থেকে। এমনি করে ঠিক সাতটা দিন কেটে গেল।

আট দিনের দিন আমি সন্ধ্যার পর একটু বেড়িয়ে বাড়ি ফিরছি, এমন সময় গেটের সামনে কে যেন এসে আমার কাছে দাঁড়াল। তার মুখে কালো কাপড়ের আবরণ। দীর্ঘ পেশীবহুল দেহ। আমি তাকে দেখে চীৎকার করতে উদ্যত হতেই, সে ইঙ্গিতে আমায় নিরস্ত করে আমাকে ডেকে নিয়ে গেল বাগানে। সংক্ষেপে জানাল, আমার এই যোগদানে সে খুব খুশি হয়েছে। সেই এই বিপ্লবী-সংঘের দলপতি। একটি রুমাল আর একটি পিস্তল সে তুলে দিল আমার হাতে। বলল, আপনার মতো দৃঢ়চেতা মেয়ে দেশমায়ের গৌরব। আপনার হলো ১১ নম্বর। কুড়িজনকে নিয়ে আমাদের এ সংঘ প্রতিষ্ঠিত হবে। যখন প্রয়োজন, সাড়া পেলেই যেন আপনি যোগ দেন। আর সংঘের বৈঠকে আপনি পুরুষের বেশভূষা পরে যাবেন। রুমাল আর পিস্তলটি দিয়ে, নিজের হাতের আঙুল চিরে আমার কপালে একটি রক্তটিকা এঁকে দিয়ে সে প্রস্থান করল।

এর পর থেকেই আমার জীবনে পরিবর্তন শুরু হলো। সর্বদা আমি মনে-প্রাণে অনুভব করতে লাগলাম, সাধারণ একটি মেয়ে নই আমি। আমার মধ্যে রয়েছে বিরাট একটি সত্তা। সাধারণ মেয়ের মতো গৃহসংসার করবার জন্যে আমি জন্মগ্রহণ করিনি।

আমার এ পরিবর্তন মিঃ চাকলাদার লক্ষ্য করেছিল। সে দিবারাত্র আমার একটা উন্মনা ভাব দেখে একদিন আমাকে প্রশ্ন করল—তোমার মধ্যে যেন একটা বিরাট পরিবর্তন লক্ষ্য করছি রমলা—কিন্তু জানি না কেন এ পরিবর্তন।

আমিও কিন্তু তার মধ্যে একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করেছিলাম কিছুদিন যাবৎ। কিন্তু সে কথা বলতে পারিনি। কোনও কিছু জিজ্ঞাসা করতে সাহস হয়নি আমার।

আজ সময় বুঝে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম—তোমার মধ্যেও যেন কিছুদিন ধরে একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করছি।

সে বলল—হ্যাঁ, আমি জানি যে তুমি সেটা লক্ষ্য করবে। কিন্তু স্পষ্ট ভাষায় সব কিছু স্বীকার করাই ভাল নয় কি? আমি একজন বিপ্লবী কর্মী। আজ আর আমি সামান্য একজন কেউ নই। তুমি যদি আমার সঙ্গে মিলতে চাও, তবে তা পূর্বাহ্নে জেনে রাখ। যে কোন মুহূর্তে আমার জীবন ধ্বংস হয়ে যেতে পারে! আমার মনে হয় তুমি—

বাধা দিয়ে বললাম—ঠিকই ধরেছ। আমিও একজন বিপ্লবী।

ধীরে ধীরে কথাবার্তা চলল। আমি সব খুলে বললাম। সে হেসে বলল—এ ত খুব ভাল কথা রমলা। দুজনে এক পথের পথিক হওয়াই ভাল নয় কি? যদি কেউ বিপদে পড়ে, অন্যের আর দুঃখ করবার কিছু থাকবে না।

এইভাবে সমস্ত কিছু সুস্পষ্ট হওয়াতে দুজনেই অনেকটা নিশ্চিন্ত হলাম। কিন্তু সেদিন একটা ভুল করলাম আমি। আমি ভাবলাম, সে যখন সব কিছু পূর্বাহ্নেই বলল, তখন সে নিশ্চয়ই সব কিছু জানত। তাই সে অন্য কেউ নয়, সেই বোধ হয় কালো-মুখোশ পরা দলপতি।

কিন্তু আমি তাকে কোনওদিন ও প্রশ্ন করিনি, সেও কিছু বলেনি। আমরা ভেবেছিলাম যে কোনও সময়ে আমরা বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হব। দলের কাউকে সে কথা জানাবার প্রয়োজন নেই। তা ছাড়া দলের কেউ কাউকেই ত চেনে না।

বিপ্লবী দলের দলপতি আমার ভাবী স্বামী। এ কথা ভাবতেই আমার বুক গর্বে ভরে উঠত। দিনের পর দিন তার প্রতি আমার ভালবাসা নিবিড় হয়ে উঠতে থাকে। কিন্তু তখন জানি না, কি ভুলই না করেছিলাম সেদিন—

তারপর এলো একদিন ঝড়। প্রকাশিত হয়ে পড়ল যে আমাদের দলের মধ্যে কেউ একজন বিপ্লবীদলের শত্রু।

বাধা দিয়ে দীপক বলে—সে ইতিহাস আমি জানি। তার পরেরটা বলুন!

—জানেন আপনি? রমলা দেবী কম্পিত গলায় বললেন—যাক, তারপর আমাদের দুজনের দেখা হলো। হ্যাঁ, এখানে একটা কথা। সেই দিনে, অর্থাৎ যেদিন পুলিস আক্রমণ করেছিল, সেদিন আমি আর সে কেউই রিভলভার ফেলিনি, তা জানেন। এর কারণ, আমরা সেদিনই সংঘ থেকে বিদায় নেবার উদ্দেশ্য করেছিলাম। আরও একটা কারণ ছিল। সংঘের যা কিছু টাকাকড়ি সব থাকত আমার স্বামী আর সমীরণ মুখার্জী, এই দুজনের জিম্মায়। মানে '১৭'

নং আর '৫' নং-এর দায়িত্ব ছিল সেই ব্যাপারে। এদের দুজনের কাছে নাকি কতকগুলো সাংকেতিক লিপি ছিল। সে দুটো লিপি একত্রে জোড়া দিয়ে যে ম্যাপটা তৈরী হবে তা হচ্ছে সেই গুপ্ত সম্পদের নিশানা। অবশ্য এ সব সম্পদই ডাকাতি করে আমাদের দলের লোকেরাই উপার্জন করেছিল।

—কিন্তু সেই লিপিগুলো যে আপনাদের দুজনের কাছে ছিল, তা অন্য কেউ জানত?

—হ্যাঁ, জানত দলপতি আর '৬' নং লোকটি। কিন্তু সে যে কে তা আমরা কেউ আজও জানি না।

—বুঝলাম। তাহলে আপনি রিভলভার ত্যাগ করেননি এই কারণে—আর ওরা দুজন, মানে '৫' নং সমীরণ মুখার্জী আর '১৭' নং আপনার স্বামী ত্যাগ করেননি নিজেদের দায়িত্ব বুঝতে পেরে?

—ঠিক তাই। কিন্তু দলপতির বিশ্বাস হলো, আমাদের মধ্যেই কেউ একজন বিশ্বাসঘাতক।

—তারপর বর্তমানের ঘটনা বলুন।

—বিবাহের পর জানতে পারলাম আমার স্বামীই ছিলেন '১৭' নং—তিনি দলপতি নন। তাতে আমার মনে আঘাত লাগল। আমি যাকে দলপতি ভেবে পরম শ্রদ্ধায় পূজা করে এসেছি, সে অন্য লোক। আমার সারা মন যেন বিদ্রোহ ঘোষণা করতে চাইল। কিন্তু অনেক কষ্টে মনকে দমন করে সংসারযাত্রা নির্বাহ করে চললাম।

দীপক হেসে বলল—তারপর যেদিন আপনার স্বামী নিহত হন, তার আগে, অর্থাৎ সুদীর্ঘ দশ বছর পরে জানতে পারলেন সেই দলপতি ফিরে এসেছে, 'বিচারকের' ভূমিকা নিয়ে। তাই না?

—আশ্চর্য! কি করে জানলেন?

—দলপতির প্রতি কিছুটা শ্রদ্ধা ছিল বলেই, আপনি আজও স্বীকার করতে পারছেন না যে তিনিই আপনার স্বামীর হত্যাকাণ্ডে জড়িত! কিন্তু আপনার মনের এই দুর্বলতা বিরাট একটা বিপদ ডেকে আনবার উদ্যোগ করেছিল। মনে রাখবেন রমলা দেবী, কালো কাপড়ের আবরণে সেদিনের দলপতি আর কালো কাপড়ের আবরণে আজকের বিচারক এক লোক নয়।

—তার মানে?

—মানে অতি সহজ। বিচারক এমন একজন লোক হতে পারে যে পুরোনো দলপতিকে বেশ ভাল করে চিনত। তাই সুযোগ বুঝে সেই প্রাচীন ছদ্মবেশে সে হয়ত আজ দেখা দিয়েছে।

—এ কি সত্য?

—নিশ্চয়ই অসম্ভব নয়।

—কিন্তু এ তবে কোন্ লোক?

—পরেই জানতে পারবেন। চলি আজকের মতো।

মিসেস্ চাকলাদারকে আর কথা বলার সুযোগমাত্র না দিয়ে দীপক আকস্মিকভাবে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়।

তিনি অবাক্ হয়ে শুধু ভাবতে থাকেন, লোকটা মানুষ, না মায়াবী?

দশ

—যোগসূত্র—

দীপকের নির্দেশমতো রতন রায় বাহাদুর সমীরণ মুখার্জীর বাড়ির সামনে অপেক্ষা করতে থাকে। মাঝে মাঝে দু-একজন লোক এসে হয়ত জুতাটা এগিয়ে দেয় তার দিকে। রতন ধীরে ধীরে ব্রাশ চালাতে চালাতে আড়চোখে তাকায় মুখার্জী লজের দিকে। প্রতিটি মানুষের যাতায়াত বেশ ভালভাবে লক্ষ্য করতে থাকে।

বেলা পড়ে আসে। সন্ধ্যা হয়ে যায়। ধীরে ধীরে রাতের আঁধার গাঢ়তর হয়ে আসে।

কিন্তু সন্দেহজনক কাউকেই দেখা যায় না বাড়ির আশেপাশে।

রাত নটা বেজে গেল। রতন উঠবে কিনা ভাবছে, এমন সময় রহস্যজনক একটা দৃশ্য তার মনোযোগ আকর্ষণ করল।

বাড়ির ঠিক সামনে একজন খোঁড়া ভিখিরীশ্রেণীর লোককে এসে দাঁড়াতে দেখা গেল। হাতে তার একটা টর্চ। মুখার্জী লজের দোতলায় বারান্দা লক্ষ্য করে সে পর পর দু'বার টর্চ 'ফোকাস' করল।

তারপর ওকি?

একজন দীর্ঘকায় লোক বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে পথে নামল। মুখে তার একটি কৃষ্ণবর্ণ রুমালের আবরণ।

দুজনে এগিয়ে গিয়ে একটা গাড়িতে চড়ে বসল। রতন ধারণাই করতে পারেনি, কখন ওখানে একটা মোটরগাড়ি এসে দাঁড়িয়েছিল।

রতন স্বপ্ন দেখছে না তো!

সমস্ত জিনিসপত্র ফেলে রতন বড় রাস্তা ধরে মোড়ে এসে উপস্থিত হলো। একজন ট্যাক্সি-ড্রাইভারকে 'আইডেন্টিটি কার্ড' দেখিয়ে ডবল ভাড়া দিতে রাজী হলে সে অবশেষে বহুদূরবর্তী গাড়িখানাকে অনুসরণ করতে রাজী হলো।

এ ধরনের ঘটনাবলীর জন্যে রতন আদৌ প্রস্তুত ছিল না। আর এ সব ঘটনার সঙ্গে আসল হত্যাকাণ্ডের যোগসূত্র কি থাকতে পারে তাও সে কল্পনা করতে পারে না।

দূরবর্তী গাড়ির দূরত্ব ক্রমশঃ কমে আসে। অনেকটা ব্যবধান রেখেই রতনের গাড়ি এগিয়ে চলে।

কতক্ষণ যে এভাবে দুটি গাড়ি চলেছিল তার ঠিক নেই। চলেছে ত চলেছেই! পথের যেন আর শেষ নেই।

অবশেষে দীর্ঘক্ষণ পরে অগ্রবর্তী গাড়িটা মানিকতলায় যে বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়াল সেটা রতনের পরিচিত। এটাই হচ্ছে মিঃ চাকলাদেরর বাড়ি। ক'দিন আগেই এ বাড়িতে তিনি নিহত হয়েছেন।

রতন দূরে গাড়িখানা দাঁড় করিয়ে সোজা এগিয়ে যায় পাশের একটি ডাক্তারখানার দিকে। সেখানে টেলিফোন ছিল। রতন একটা সিকি ভদ্রলোকের হাতে দিয়ে বলে—জরুরী একটা ব্যাপারে ফোন করতে হবে স্যর! যদি কিছু মনে না করেন—'

—না না, আপনি ফোন করলে আমাদের আপত্তি কি থাকতে পারে?

রতন সঙ্গে সঙ্গে মানিকতলা থানার সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে ইন্‌স্পেক্টর বঙ্কিমবাবুকে আহ্বান জানায়।

বঙ্কিমবাবু অবাক্ হয়ে প্রশ্ন করেন—হ্যালো, কে কথা বলছেন?

—আমি রতনলাল কথা বলছি।

—কি ব্যাপার বলুন ত !

—অপরাধীকে ধরতে চান যদি, এক্ষুণি সশস্ত্র পুলিস নিয়ে চলে আসুন মিঃ চাকলাদারের বাড়িতে।

—ধন্যবাদ। এক্ষুণি আসছি।

রিসিভারটা নামিয়ে রেখে বাড়ির পেছন দিকের জলের পাইপটা বেয়ে রতন তরতর করে উঠে যায় দোতলার দিকে।

* * *

মানিকতলা থানায় ভীষণ হইচই শুরু হয়ে গেল। এ ধরনের ঘটনার জন্যে সেখানে কেউ তৈরী ছিল না। তা ছাড়া রতনের কথাকেও বঙ্কিমবাবু অবজ্ঞা করতে সাহস পেলেন না।

লালবাজারে সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাটা জানানো হলো। সর্বত্র ভীষণ তোড়জোড় শুরু হয়ে যায়।

দলে দলে আর্মড্ পুলিস লরীতে উঠে বসে। পুলিস লরী সদলবলে ছুটে চলে নির্দিষ্ট লক্ষ্যের উদ্দেশ্যে।

এগারো

—সাংকেতিক লিপির সন্ধানে—

মিসেস্ চাকলাদার (রমলা দেবী; তাঁর ড্রইং-রুমে বসে আপনমনেই কি একটা চিন্তায় বিভোর ছিলেন। বিগত ঘটনাবলী একে একে এসে তাঁর মনের ওপর বিরাট একটা প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। তিনি ভাবছিলেন, কি করে সেদিনের বিপ্লবীদলের সেই দলপতি আজ একজন নিষ্ঠুর হত্যাকারীতে পরিণত হতে পারে!

পেছনে পদশব্দ।

ঘাড় ফিরিয়ে চেয়ে দেখেন রমলা দেবী। পেছনে দাঁড়িয়ে দুজন লোক। একজনের মুখে কালো আবরণ, অন্যজন বেঁটেখাটো, খোঁড়া একজন লোক।

—কি চাও এখানে? রমলা দেবী যেন গর্জে ওঠেন।

—আস্তে রমলা দেবী। আপনার স্বামী সেই সাংকেতিক লিপির অংশটা কোথায় রেখেছিলেন তা জানবার জন্যেই আমি এসেছি।

—সে কি? কিন্তু তা ত আমি জানি না!

—মিথ্যা কথা! আবরণধারী গর্জে ওঠে—আপনাকে বলতেই হবে। আমরা তার একটা অংশ পেয়েছি সমীরণ মুখার্জীর ঘরে। কিন্তু তার অন্য অংশটা এখনও পাইনি। আর সেটা আছে আপনার কাছেই।

—আমি জানি না।

—মিথ্যাই আপনার প্রাণকে বিপন্ন করে তুলছেন। স্বেচ্ছায় না বললে আপনার হাত পা মুখ বেঁধে আপনার দেহের ওপর অত্যাচার করতে বাধ্য হব। সেজন্যে এই চাবুকই যথেষ্ট—

কথা শেষ হয় না।

পেছন থেকে কে যেন বলে ওঠে—তার প্রয়োজন হবে না। আপাতত আপনারাই বেশি নড়াচড়া করলে বিপদে পড়বেন। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলে বাধিত হব আমি।

সকলে দরজার দিকে তাকায়।

দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে দীপক চ্যাটার্জী স্বয়ং। হাতে তার চকচক করছে একটি রিভলভার। দীপক হেঁকে ওঠে—তোমরা যা খুঁজছ, তা আছে আমার কাছে বন্ধু। সেদিন আমার ঘরে হানা দিয়েও তা খুঁজে পাওনি—কারণ আমি এখান থেকে সেটি নিয়ে গিয়ে আমার বাড়ির একটি গুপ্ত জায়গায় রেখেছিলাম। কিন্তু, তোমরা যতই চেষ্টা কর না কেন, তোমাদের উদ্দেশ্যটাকে গোপন রাখতে পারিনি। তাই আন্দাজে নির্ভর করে আমি প্রতীক্ষা করছিলাম বটে, কিন্তু তা ব্যর্থ হয়নি।

কালো আবরণধারী পায়ে পায়ে জানালার কাছে সরে গিয়েছিল। কিন্তু দেখা গেল জানালার বাইরে রিভলভার হাতে দাঁড়িয়ে আছে রতনলাল। রতন হাঁকল—এদিক দিয়ে পালাবার চেষ্টা মিথ্যা হবে বন্ধু।

দীপক এগিয়ে গিয়ে দুজনকেই বেঁধে ফেলে। রতন ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে।

দীপক প্রশ্ন করে—তুই এখানে?

—হ্যাঁ, বাছাধনদের আমি রসা রোড থেকেই 'ফলো' করছিলাম। তারপর এখানে এসে দেখি এই ব্যাপার। বঙ্কিমবাবুকেও ফোন করেছি। তিনি এসে পড়লেন বলে।

ইন্‌স্পেক্টর বঙ্কিমবাবু সদলে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করেন।

রমলা দেবীর ছেলে অজয় কোথায় বের হয়েছিল। বাড়ি ফিরে এসে এইসব ব্যাপার দেখে সেও হতভম্ব হয়ে যায়।

চেয়ারের ওপর মুখোশধারী এবং তার সহকারীকে বসিয়ে রাখা হয়েছিল। দীপক বঙ্কিমবাবুর দিকে চেয়ে বলে—সব কিছু খুলে ওঁর মুখোশ উন্মোচন করবার আগে একবার সুনীলা মুখার্জীকে ফোন করুন!

—কেন?

—তিনি এঁকে ভাল করেই চিনতে পারবেন বলে।

—তার মানে?

—যথাসময়েই জানতে পারবেন।

বঙ্কিমবাবু কথামতো উঠে গিয়ে টেলিফোনে সংযোগ স্থাপন করেন।

—হ্যালো, কে?

—আমি ইন্‌স্পেক্টর বঙ্কিমবাবু কথা বলছি। আপনি ত সুনীলা মুখার্জী?

—হ্যাঁ।

—এক্ষুণি মানিকতলায় মিঃ চাকলাদারের বাড়িতে চলে আসুন; আপনার বাবার হত্যাকারী ধরা পড়েছে।

—তাই নাকি? কে সে?

—তা এখনও জানি না। দীপকবাবু তাকে গ্রেপ্তার করেছেন। তার মুখে মুখোশ আঁটা আছে। আপনি না এলে তার মুখোশ খোলা হবে না।

—আশ্চর্য ত! আচ্ছা আমি এক্ষুণি আসছি।

—ধন্যবাদ!

বারো

—উন্মোচন—

ঘরের মধ্যে অখণ্ড স্তব্ধতা বিরাজ করছে।

দীপক বলতে থাকে ঃ মুখোশ উন্মোচন করবার আগে আমি পূর্বাপর সমস্ত ঘটনার বিশ্লেষণ করতে চাই।

দীর্ঘদিন আগে যে বিপ্লবী-সংঘের সঙ্গে এই ব্যাপারের নিবিড় যোগসূত্র রয়েছে তা আপনারা সকলেই জানেন। কিন্তু সেই মহান্ ত্যাগী দলপতির সঙ্গে আজকের এই 'বিচারক' নামধারী শয়তানকে আপনারা এক বলে ভাবছিলেন তা ঠিক নয়।

—সে কি কথা? সকলে একযোগে বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বলে ওঠেন।

—হ্যাঁ, ঠিক তাই। সেদিনের বিপ্লবী দলপতি আজ বেঁচে আছেন কিনা জানি না, তবে থাকলেও তিনি কোথায় কিভাবে আছেন তার জের টেনে কাহিনী ভারাক্রান্ত করতে চাই না। কিন্তু এই বিচারক একটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে অযথা ব্যাপারটাকে ঘোরালো করে তুলছিল।

এই লোকটিও ছিল সেদিনের বিপ্লবীদলে। এই হচ্ছে '৬' নং লোক, দলপতি ছাড়া যে জানত বিপ্লবীদের সঞ্চিত অর্থ কোথায় কিভাবে আছে কিন্তু এতদিন সময় ও সুযোগের অভাবে সে এ কাজে সফল হতে পারেনি।

তারপর এলো বর্তমান ঘটনা। সে এতদিন পরে ফিরে এলো কোনও গুপ্তস্থান থেকে। সে এসে দুজনের কাছ থেকেই চাইল সেই মানচিত্রের আর লিপির অংশগুলো সংগ্রহ করে সমস্ত সঞ্চিত গুপ্ত অর্থের অধীশ্বর হতে। একে একে 'বিচারক' নাম নিয়ে সে দুজনকে হত্যা করল। একজনের লিপি সংগ্রহ করল—কিন্তু তার দুর্ভাগ্য অন্যের অংশটা এসে পড়ল আমার হাতে। তাই সে সফল ত হলোই না—উলটে আজ তাকে এভাবে পুলিসের হাতে ধরা পড়তে হলো। সে ভেবেছিল কালো আবরণ আর 'বিচারক' নাম প্রমাণ করবে যে সেদিনের দলপতি প্রতিহিংসা নেবার জন্যেই আজকে এসে একের পর এক বিশ্বাসঘাতককে খুন করছে।

কিন্তু এর আকর্ষণ অন্য কোথাও নয়—এর আকর্ষণ বিপ্লবীদের সঞ্চিত সেই লক্ষাধিক টাকা—যা কোনও একটি গুপ্তস্থানে আজও সংগোপনে রক্ষিত আছে।

আর একটা কথা—পুরোনো বিপ্লবী দলপতির ওপর অনেকের একটা সহানুভূতি ছিল—সেজন্যে তাঁরা সত্যি কথা স্বীকার করতে চাইছিলেন না সহজে। কিন্তু তাঁদের স্বীকৃতি না পেলে আমার আজকের কেসে সফল হবার আশা হতো সুদূরপরাহত।

—আমি জানি না।

—মিথ্যাই আপনার প্রাণকে বিপন্ন করে তুলছেন। স্বেচ্ছায় না বললে আপনার হাত পা মুখ বেঁধে আপনার দেহের ওপর অত্যাচার করতে বাধ্য হব। সেজন্যে এই চাবুকই যথেষ্ট—

কথা শেষ হয় না।

পেছন থেকে কে যেন বলে ওঠে—তার প্রয়োজন হবে না। আপাতত আপনারাই বেশি নড়াচড়া করলে বিপদে পড়বেন। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলে বাধিত হব আমি।

সকলে দরজার দিকে তাকায়।

দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে দীপক চ্যাটার্জী স্বয়ং। হাতে তার চকচক করছে একটি রিভলভার। দীপক হেঁকে ওঠে—তোমরা যা খুঁজছ, তা আছে আমার কাছে বন্ধু। সেদিন আমার ঘরে হানা দিয়েও তা খুঁজে পাওনি—কারণ আমি এখান থেকে সেটি নিয়ে গিয়ে আমার বাড়ির একটি গুপ্ত জায়গায় রেখেছিলাম। কিন্তু, তোমরা যতই চেষ্টা কর না কেন, তোমাদের উদ্দেশ্যটাকে গোপন রাখতে পারিনি। তাই আন্দাজে নির্ভর করে আমি প্রতীক্ষা করছিলাম বটে, কিন্তু তা ব্যর্থ হয়নি।

কালো আবরণধারী পায়ে পায়ে জানালার কাছে সরে গিয়েছিল। কিন্তু দেখা গেল জানালার বাইরে রিভলভার হাতে দাঁড়িয়ে আছে রতনলাল। রতন হাঁকল—এদিক দিয়ে পালাবার চেষ্টা মিথ্যা হবে বন্ধু।

দীপক এগিয়ে গিয়ে দুজনকেই বেঁধে ফেলে। রতন ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে।

দীপক প্রশ্ন করে—তুই এখানে?

—হ্যাঁ, বাছাধনদের আমি রসা রোড থেকেই 'ফলো' করছিলাম। তারপর এখানে এসে দেখি এই ব্যাপার। বঙ্কিমবাবুকেও ফোন করেছি। তিনি এসে পড়লেন বলে।

ইন্‌স্পেক্টর বঙ্কিমবাবু সদলে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করেন।

রমলা দেবীর ছেলে অজয় কোথায় বের হয়েছিল। বাড়ি ফিরে এসে এইসব ব্যাপার দেখে সেও হতভম্ব হয়ে যায়।

চেয়ারের ওপর মুখোশধারী এবং তার সহকারীকে বসিয়ে রাখা হয়েছিল। দীপক বঙ্কিমবাবুর দিকে চেয়ে বলে—সব কিছু খুলে ওঁর মুখোশ উন্মোচন করবার আগে একবার সুনীলা মুখার্জীকে ফোন করুন!

—কেন?

—তিনি এঁকে ভাল করেই চিনতে পারবেন বলে।

—তার মানে?

—যথাসময়েই জানতে পারবেন।

বঙ্কিমবাবু কথামতো উঠে গিয়ে টেলিফোনে সংযোগ স্থাপন করেন।

—হ্যালো, কে?

—আমি ইন্‌স্পেক্টর বঙ্কিমবাবু কথা বলছি। আপনি ত সুনীলা মুখার্জী?

—হ্যাঁ।

—এক্ষুণি মানিকতলায় মিঃ চাকলাদারের বাড়িতে চলে আসুন; আপনার বাবার হত্যাকারী ধরা পড়েছে।

—তাই নাকি? কে সে?

—তা এখনও জানি না। দীপকবাবু তাকে গ্রেপ্তার করেছেন। তার মুখে মুখোশ আঁটা আছে। আপনি না এলে তার মুখোশ খোলা হবে না।

—আশ্চর্য ত! আচ্ছা আমি এক্ষুণি আসছি।

—ধন্যবাদ!

বারো

—উন্মোচন—

ঘরের মধ্যে অখণ্ড স্তব্ধতা বিরাজ করছে।

দীপক বলতে থাকে : মুখোশ উন্মোচন করবার আগে আমি পূর্বাপর সমস্ত ঘটনার বিশ্লেষণ করতে চাই।

দীর্ঘদিন আগে যে বিপ্লবী-সংঘের সঙ্গে এই ব্যাপারের নিবিড় যোগসূত্র রয়েছে তা আপনারা সকলেই জানেন। কিন্তু সেই মহান্ ত্যাগী দলপতির সঙ্গে আজকের এই 'বিচারক' নামধারী শয়তানকে আপনারা এক বলে ভাবছিলেন তা ঠিক নয়।

—সে কি কথা? সকলে একযোগে বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বলে ওঠেন।

—হ্যাঁ, ঠিক তাই। সেদিনের বিপ্লবী দলপতি আজ বেঁচে আছেন কিনা জানি না, তবে থাকলেও তিনি কোথায় কিভাবে আছেন তার জের টেনে কাহিনী ভারাক্রান্ত করতে চাই না। কিন্তু এই বিচারক একটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে অযথা ব্যাপারটাকে ঘোরালো করে তুলছিল। এই লোকটিও ছিল সেদিনের বিপ্লবীদলে। এই হচ্ছে '৬' নং লোক, দলপতি ছাড়া যে জানত বিপ্লবীদের সঞ্চিত অর্থ কোথায় কিভাবে আছে কিন্তু এতদিন সময় ও সুযোগের অভাবে সে এ কাজে সফল হতে পারেনি।

তারপর এলো বর্তমান ঘটনা। সে এতদিন পরে ফিরে এলো কোনও গুপ্তস্থান থেকে। সে এসে দুজনের কাছ থেকেই চাইল সেই মানচিত্রের আর লিপির অংশগুলো সংগ্রহ করে সমস্ত সঞ্চিত গুপ্ত অর্থের অধীশ্বর হতে। একে একে 'বিচারক' নাম নিয়ে সে দুজনকে হত্যা করল। একজনের লিপি সংগ্রহ করল—কিন্তু তার দুর্ভাগ্য অন্যের অংশটা এসে পড়ল আমার হাতে। তাই সে সফল ত হলোই না—উলটে আজ তাকে এভাবে পুলিসের হাতে ধরা পড়তে হলো। সে ভেবেছিল কালো আবরণ আর 'বিচারক' নাম প্রমাণ করবে যে সেদিনের দলপতি প্রতিহিংসা নেবার জন্যেই আজকে এসে একের পর এক বিশ্বাসঘাতককে খুন করছে।

কিন্তু এর আকর্ষণ অন্য কোথাও নয়—এর আকর্ষণ বিপ্লবীদের সঞ্চিত সেই লক্ষাধিক টাকা—যা কোনও একটি গুপ্তস্থানে আজও সংগোপনে রক্ষিত আছে।

আর একটা কথা—পুরোনো বিপ্লবী দলপতির ওপর অনেকের একটা সহানুভূতি ছিল—সেজন্যে তাঁরা সত্যি কথা স্বীকার করতে চাইছিলেন না সহজে। কিন্তু তাঁদের স্বীকৃতি না পেলে আমার আজকের কেসে সফল হবার আশা হতো সুদূরপরাহত।

কথা শেষ করে দীপক বলে—এবার সেদিনের '৬' নং বিপ্লবী ওরফে মিঃ 'বিনয়েন্দ্র শীলের' মুখের আবরণ উন্মোচন করুন বঙ্কিমবাবু।

—বিনয়েন্দ্র শীল।

মুখের আররণ খুলতেই সকলে চমকে ওঠেন।

—হ্যাঁ, দীপক বলে, বোধ করি উনি আর কোনদিনও এভাবে ভীষণ চক্রান্ত করে ওঁর তীক্ষ্ণ ধ্বংসাত্মক বুদ্ধির পরিচয় দেবার প্রয়োজন বোধ করবেন না।

দীপক ঠাট্টার সুরে বলে।

সুনীলা মুখার্জী অবাক্ হয়ে বলে—কিন্তু উনি কি করে এ সব চক্রান্ত করে এভাবে—

বাধা দিয়ে দীপক বলে—সেই উদ্দেশ্যেই উনি আপনার বাবার কাছে চাকরি নিয়েছিলেন সুনীলা দেবী। আগাগোড়াই ওঁর উদ্দেশ্য ছিল দুই টুকরো লিপি সংগ্রহ করা। প্রথম অংশে সফলও হয়েছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় অংশেই—

রতন বলে—বোধ করি দেরি না করে ওঁকে ভ্যানে তুলে দেওয়াই সমীচীন হবে বঙ্কিমবাবু!

কিন্তু সকলে বিদ্রূপ করলেও বিনয়েন্দ্র শীলের মুখ দিয়ে আর একবারও 'বোধ করি' কথাটা উচ্চারিত হয় না।

—শেষ—

পৃথিবী থেকে দূরে

এক

—বর্মা সীমান্তে—

অমাবস্যা রাত।

প্রগাঢ় অন্ধকার যেন বিরাট একটা দৈত্যের মতো দিক্‌বিদিক্‌ আচ্ছন্ন করে বসে আছে। মাথার ওপর তারায়-ছাওয়া আকাশের অসীম ব্যাপ্তি। নীচে নিস্তব্ধ, শান্ত, ঘুমন্ত পৃথিবী যেন নীরবে প্রহর গুণছে!

ইরাবতীর তীরে মৌলমেন। বর্মার একটি খ্যাতনামা শহর মৌলমেন। নিরন্ধ্র আঁধারে ঢাকা মৌলমেন, যেন চুপ করে বসে ইরাবতীর বয়ে-যাওয়া স্রোতের কলগান শুনছে।

নগরের আলোগুলো একে একে সবই নিভে গেছে। নৈশ আঁধারকে উজ্জ্বলতায় ভরিয়ে তোলবার জন্যে একটি আলোকরেখাও জেগে নেই। তার ওপর যে কোনও মুহূর্তে জাপানী বোমা পড়বার ভয়ে নগরবাসী সকলেই সন্ত্রস্ত। কেউ ভয়ে ঘরে আলো জ্বালতেও সাহস পাচ্ছে না।

ধীরে ধীরে নদীর ওপরে ভেসে চলেছে নৌকাখানা।

ইরাবতীর একটানা সংগীতের মধ্যে সে যেন মিথ্যা একটা বাধার সৃষ্টি করছে।

ছপ্‌ ছপ্‌ করে দাঁড় টানার শব্দ হচ্ছে অবিরাম। মাঝে মাঝে ভেসে আসছে নৈশ বাতাসের নাকী কান্না। সব কিছু মিলে সমস্ত পরিবেশের মধ্যে যেন একটা বিচিত্র ভয়াবহতা ফুটে উঠেছে। কেমন যেন রহস্যময়। মিস্‌টিরিয়াস্‌!

নৌকায় বসে মাত্র একটি লোক।

নির্ভুল দাঁড়ের প্রতিটি চালনায় ঢেউগুলো ভেঙে পড়ছে দু'ধারে। মাঝখান দিয়ে ভেসে চলেছে নৌকাটা। লোকটি যে নৌকাচালনায় যথেষ্ট পটু তা বেশ ভাল করেই বোঝা যায়।

নৌকাটিতে কিন্তু একটাও আলো নেই। নিজের অস্তিত্বকে কারও সামনে প্রকট করে তুলতে আদৌ রাজী নয় সে। নিঃশব্দে শহরে এসে পৌঁছুতেই সে বেশি পরিমাণে ব্যস্ত।

ধীরে ধীরে নৌকাটা এসে শহরের কাছাকাছি দাঁড়াল।

লোকটা একটা লগিতে ভর দিয়ে লাফ মেরে ডাঙায় পড়ল। ভেসে-যাওয়া নৌকাটার দিকে একবারও ফিরে চাইল না সে। এ সব সামান্য ব্যাপারের দিকে মনোযোগ দেবার মতো সময় যেন তার নেই।

নৌকাটা ভেসে চলল আপন মনে। ঢেউয়ের দোলায় দুলতে দুলতে সে কোথায় গিয়ে পড়বে তা কে জানে!

লোকটি ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল। গতি তার খুব দ্রুত নয়—কিন্তু প্রতিটি পদক্ষেপ নির্ভুল। পৃথিবীর কাউকে সে যেন সামান্যতম গ্রাহ্যের মধ্যেই আনতে চায় না এমনি তার চলনভঙ্গি।

ধীরপায়ে সে নদীর পাড় ছেড়ে উঠে এলো পথে।

লাল রঙের সুরকি-বিছানো আঁকাবাঁকা পথটা চলে গেছে নদীর ধার ঘেঁষে। দু'পাশে ছোট বড় মাঝারি নানা আকারের গাছের সারি। নদী থেকে বয়ে আসা বাতাসের দোলায় গাছের মাথাগুলো ঈষৎ দুলছে।

লোকটির পরনে কালো রঙের স্যুট। কোট-প্যাণ্ট-টাই থেকে পায়ের জুতো পর্যন্ত সবকিছু কালো। মাথার হ্যাটটা একটু নীচে নামানো। কোটের কলারটা ওপরের দিকে তোলা। চোখের ওপর লাগানো একটা সূক্ষ্ম কালো আবরণ—যার জন্যে তার পরিচয় পৃথিবীর মানুষের কাছে চিরদিনই গোপন থাকবে।

নদীর ধারের পথটা ধরে কিছুটা এগোনোর পর হঠাৎ উলটো দিক থেকে আর একজন লোককে আসতে দেখা গেল।

এ লোকটা ঢ্যাঙা। শরীরের রঙ কালো। দেহে যথেষ্ট শক্তি আছে তা তার দিকে চাইলেই বোঝা যায়। কালো স্যুট পরা লোকটির সামনে এসে ঢ্যাঙা লোকটা থমকে দাঁড়াল। তারপর হাঁটুটা মুড়ে দু'হাত বুকের ওপর আড়াআড়ি ভাবে রেখে বিচিত্র ভঙ্গিতে সে কালো স্যুট পরা লোকটিকে অভিনন্দন জানাল।

কালো স্যুট পরা লোকটি বলল—পিয়ারী, সব তৈরী ত?

—হ্যাঁ, কর্তা।

অবশ্য তাদের কথা হলো বার্মিজ ভাষায়। আমরা তার বাংলা তর্জমা শোনালাম আপনাদের কাছে।

—ভেতরে যাও। আমি আসছি।

—আজ্ঞে, আমি চললাম। ওদের তৈরী হতে বলি।

—বেশ যাও।

পিয়ারী ধীরপদে চলে গেল ডান দিকের পথটা দিয়ে। বাঁ দিকের পথটা ধরে লোকটা এগিয়ে চলল।

বাঁ দিকের পথটা এঁকেবেঁকে চলে গেছে নদীর ধার ঘেঁষে। তারপর সেটা গিয়ে পড়েছে একটা আরও সরু পথে। সেই পথ ধরে চলে অজস্র গলিঘুঁপচির গোলকধাঁধা পার হয়ে যে একটা বড় আধভাঙা একতলা বাড়ির সামনে এসে কালো স্যুট পরা লোকটা দাঁড়াল, সেটা বাইরে থেকে তালাবন্ধ।

লোকটা আর একবার ভাল করে বাড়িটার দিকে চেয়ে দেখল। না, সে ঠিক জায়গাতেই এসে পৌঁছেচে তাহলে!

পকেট থেকে একটা চাবি বের করে সে তালাটাতে লাগিয়ে দিল। একটা পাক দিতেই খুলে গেল সেটা।

ভেতরে প্রবেশ করে ভেতর থেকে দরজাটা বন্ধ করে দিল কালো স্যুট পরা লোকটি। তারপর ধীরপায়ে সে দুটি ঘর ও একটি বারান্দা পার হয়ে কোণের একখানা ছোট ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল। ভেতর থেকে এ ঘরের দরজাটাও বন্ধ করে দিল সে। তারপর ঘরের কোণে দাঁড়িয়ে থাকা একটা ভেনাসের স্ট্যাচুর সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

মাঝারি আকারের একটা ভেনাসের স্ট্যাচু। ধবধবে সাদা রঙ। ভেনাসের দুটি চোখে যেন বিশ্বের অনাগত ভবিষ্যতের রঙিন ছবি।

লোকটি তার সামনে দাঁড়িয়ে হঠাৎ ভেনাসের স্ট্যাচুটিকে নির্মমভাবে ধাক্কা দিল।

কিন্তু আশ্চর্য! সে ধাক্কাতে স্ট্যাচুটার আদৌ কোনও ক্ষতি হলো না। মাঝারি আকারের

স্ট্যাচুটা যে এত শক্ত তা প্রথম দর্শনে বোঝা যায় না। শুধু সেটা ইঞ্চি দুয়েক ডান দিকে সরে গেল মাত্র। আর আশ্চর্য, সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল একটা অস্পষ্ট ঘড়ঘড় শব্দ।

ধীরে ধীরে ডান দিকের দেওয়াল একটু ফাঁক হয়ে গেল। সেখানে দেখা গেল একটা সুড়ঙ্গপথ।

লোকটা যেন এ পথের অস্তিত্ব আগে থেকেই জানত। সে তাই ধীরে ধীরে নীচু হয়ে সেই সুড়ঙ্গপথ ধরে এগিয়ে চলল। একটু পরে সে যেখানে এসে দাঁড়াল তাকে ভূগর্ভস্থ একটি ছোট কক্ষ বলা যেতে পারে।

সেখানে একটা মস্ত বড় যন্ত্রের সামনে গিয়ে সে দাঁড়াল। তারপর যন্ত্রের মধ্যে সামান্য নাড়াচাড়া করতেই কয়েকটা আলো জ্বলে উঠল। একটু ভাল করে দেখলে বোঝা যেত সেটা একটা ট্রান্সমিটার সেট।

কিন্তু পৃথিবীর আলো-বাতাস থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে লোকটা হঠাৎ কেন বিনা কারণে এই ভূগর্ভস্থ কক্ষে এসে আশ্রয় নিল! তা জানতে হলে আমাদের আর একটি দৃশ্যের যবনিকা উত্তোলন করতে হবে।

ঢ্যাঙা পিয়ারীকে নিশ্চয় মনে আছে আপনাদের।

মৌলমেনের যে বস্তিটার মধ্যে সে গিয়ে ঢুকল সেটার খুব বেশি সুখ্যাতি নেই ও অঞ্চলে।

বস্তির শেষে একটা একতলা মাঠকোঠা। সেখানে বসে ছিল একজন মাঝারি আকারের লোক।

পিয়ারী এসে দাঁড়িয়ে হাঁকল—মীরজা!

—কে?

—পিয়ারী।

—কি খবর?

—ওরা কোথায়?

—পাশের ঘরে সকলে তাসের জুয়ো খেলা নিয়ে ব্যস্ত। চণ্ডু খেয়ে সকলে খেলায় মেতে উঠেছে।

—কিন্তু আমাদের চুপ করে বসে থাকা চলবে না। কর্তা এসে পৌছেচে।

—তাই নাকি? কোথায়?

—তিনি তাঁর জায়গায় গেছেন। এস আমরা গিয়ে বসি ওধারের চক্রে।

মীরজা আর পিয়ারী ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে। সেখানে বসে আরও তিনজন।

—এই, কর্তা এসে গেছে! মীরজা সজোরে বলে।

—তাই নাকি, কোথায়?

—তিনি ত দেখা দেবেন না। তাঁর কথা আমাদের শুনতে হবে।

—বেশ চল্। এমন মজার খেলাটা ভেঙে দিলি ত!

—খেলা ভাঙলাম বটে, তবে এবার যে খেলায় আমরা নামব বন্ধু, তার দাম যে পৃথিবীতে কতো বড় তা দেখতেই পাবে। অন্ততঃ কর্তার ওপর আমার এটুকু বিশ্বাস আছে যে, তিনি কখনও বিনা কাজে আমাদের এভাবে তলব করেন না।

—কারণটা কি তা জানিস্ নাকি?

—না জানলেও একটা বিরাট খেলা যে এবার শুরু হবে এ বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহ নেই।

—তবে চল্, আমরা এবার আমাদের চক্রে বসি।

—হ্যাঁ, সেইজন্যেই ত এখানে আসা। এতদিন ধরে যে খাটুনি আমরা খাটলাম এবার তার ফল পাবার সময় এসেছে।

—অন্ততঃ আশা ত করছি, এখন দেখা যাক্—বাজিটা নির্ভর করছে ভাগ্যের ওপর!

—কিন্তু এমন সুন্দর সময় একটু মৌতাত না হলে কি চলে ভাই!

—চুপ কর, কর্তা ওসব কথা শুনলে আর আমাদের আস্ত রাখবেন না!

—হ্যাঁ, বাবা, আমাকে আর এসব মনে করিয়ে দিতে হবে না। এখন চুপ করে কাজে বস্ দিকি!

তারা উঠে দাঁড়ায়।

দুই

—আদেশ-নির্দেশ—

মীরজা, পিয়ারী আর তার সঙ্গী তিনজন একটা ছোট ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে একে একে।

খুপরির মতো ঘর।

কোণে জ্বলছে টিমটিমে একটা হ্যারিকেন লণ্ঠন। তার ম্লান আলোয় আঁধার খুব বেশি দূর হচ্ছে বলে মনে হয় না।

মীরজা, পিয়ারী আর অন্য তিনজনে একটা রিসিভিং সেটের ওপর একে একে চাপ দেয়।

পাঁচটি আঙুলের স্পর্শে রিসিভিং সেটের মধ্যে একটা আলো জ্বলে ওঠে। তারপর যেন ধীরে ধীরে ভেসে আসে কোন্ একটা অদৃশ্য কণ্ঠস্বর।

প্রথমে সেটা শোনা যায় ভাঙা ভাঙা। অস্পষ্ট। তারপর সেটা সুস্পষ্ট ফুটে ওঠে ঃ

বন্ধুগণ,

আবার বহুদিন পরে আমি তোমাদের ডাক দিয়েছি। জানি আমার আদেশে তোমরা পৃথিবীর যে কোনও অঞ্চলেই থাক না কেন, ঠিক ছুটে আসবে। আমার আদেশ পালন করবার জন্যে জীবন পর্যন্ত ত্যাগ করতে কুণ্ঠিত হবে না তোমরা।

শোন, আজ সারা ভারত, বর্মা, ইন্দোচীন জুড়ে আমার যে প্রতাপ অক্ষুণ্ণ আছে তার মূলে কিন্তু তোমরা পাঁচজন। বহুদিন আমি কর্মহীন জীবন যাপন করেছিলাম বলেই তোমাদের আহ্বান করবার সুযোগ পাইনি।

কিন্তু আজ আমি আবার বিরাট একটা আন্তর্জাতিক চক্রে অংশ গ্রহণ করতে চলেছি।

শোন, বর্তমানে চীন, জাপান আর ব্রিটিশ শক্তি পরস্পরের মধ্যে বিবাদে রত। জার্মান আক্রমণে ইংলণ্ড পর্যুদস্ত। তাই ভারতকে রক্ষা করবার ক্ষমতা তার নেই।

সেই সুযোগে সম্পূর্ণ নতুন একটা কার্যপদ্ধতি নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে আমাদের।

ভারতের বিখ্যাত একজন বৈজ্ঞানিক বহুদিনের চেষ্টায় নতুন একধরনের মারণাস্ত্র নির্মাণ

করতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি যদিও সেটা কার্যে পরিণত করতে পারেননি, তবুও তাঁকে যেমন করে হোক জব্দ করে ফর্মুলাটা আমরা হাত করেছি। ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট প্রাণপণে চেষ্টা করেও তাতে বাধা দিতে পারেননি।

এবার শোন সে যন্ত্রের কথা।

এমন শক্ত একটা alloy দিয়ে এই যন্ত্রটি তৈরী হবে যে বন্দুকের গুলি বা কামানের গোলার সাধ্য নেই সে যন্ত্রটিকে ধ্বংস করবার। এক একজন মানুষের চেয়ে সহস্রগুণ শক্তিশালী এক একটি যন্ত্র।

সেই যন্ত্রের মাথার কাছে থাকবে তাপনিক্ষেপকারী একধরনের যন্ত্র। সেই তাপনিক্ষেপকারী যন্ত্রের মধ্য থেকে প্রচণ্ড তাপ বেরিয়ে যে কোনও জিনিসকে ভস্ম করে দিতে পারবে।

এই ত গেল যন্ত্রের কথা।

এবার আমার কার্যপদ্ধতি শোন তোমরা।

আমি চাই মৌলমেন থেকে আট মাইল দূরে মহিম হালদার নামে একজন বাঙালীর যে একটা জমি আছে যে কোনও অর্থের বিনিময়ে সেটা ক্রয় করতে। এতে শুধু যে ওখানে ফ্যাক্টরী বসিয়ে আমাদের কাজকর্মেরই সুবিধা হবে তা নয়, এই জমির মধ্যে এমন একটা জিনিস আছে যার সাহায্যে আমরা অত্যন্ত সহজে আমাদের কাজে এগিয়ে যেতে পারি।

শোন মীরজা, তোমার ওপর আমি এ কাজের ভার দিতে চাই। ট্রান্সমিটারের এই ঘোষণা শোনবার পর তুমি সোজা ঘর থেকে বেরিয়ে তোমাদের বাড়ির দশ হাত সামনে যে বড় গাছটা দেখবে, সেখানে মাটির তলায় একটি ঘড়া পোঁতা আছে দেখতে পাবে। সেই পিতলের ঘড়াতে যে মোহর আছে তার দাম অন্ততঃ পাঁচ হাজার টাকা।

তুমি ওই টাকা নিয়ে জমিটা কিনতে যাবে। আমার মনে হয় মহিম হালদার বোধ হয় দু' হাজারেই রাজী হবে।

যদি সে রাজী না হয়, তবে যেমন করে হোক তাকে রাজী করাতে হবে। মনে রেখো, এ হচ্ছে বজ্রভৈরবের হুকুম। যেমন করেই হোক না কেন, এ হুকুম তোমাদের তামিল করতেই হবে।

আমাদের এ কাজ যদি সাফল্যমণ্ডিত হয়, তবে সারা বর্মা, ভারত একদিন আসবে বজ্রভৈরবদের হাতে। আন্তর্জাতিক বিভেদ আর কলহে বিভিন্ন দেশ যখন মত্ত, তখন আমি এই নতুন ধরনের যন্ত্রগুলির সাহায্যে হব সে পৃথিবীর অধীশ্বর।

যদি সত্যই আমি সফল হই, তবে আজকের পৃথিবী আমাদের থেকে অনেক পিছনে পড়ে থাকবে। আমরা বিজ্ঞানের সাহায্যে এগিয়ে গিয়ে হাজার হাজার যন্ত্র তৈরি করে সারা পৃথিবী দখল করে নিতে পারব।

অবশ্য সারা পৃথিবী আমার লক্ষ্য নয়, আমার লক্ষ্য হচ্ছে জাপানকে পরাস্ত করা। আমার লক্ষ্য হচ্ছে ব্রিটিশকে তাড়িয়ে ভারতকে করায়ত্ত করা।

আমরা যে এ বিষয়ে সফল হব, এ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ। তোমাদের প্রত্যেকের কাজের উপযুক্ত পারিশ্রমিক তোমরা পাবে। কিন্তু শুনে রাখ, তোমরা কেউ যদি বিশ্বাসঘাতকতা কর তবে তার একমাত্র শাস্তি হচ্ছে মৃত্যু!

মৃত্যু ছাড়া বিশ্বাসঘাতককে আমি কোনও শাস্তি দিই না।

* * *

বাড়ি থেকে বেরিয়ে সোজা দশ হাত সামনে এগিয়ে একটা মস্ত বড় সেগুন গাছ।

রাতের আঁধারে আর তার পাতার মৃদু কাঁপনে কেমন যেন অদ্ভুত এক রহস্যময়তার সৃষ্টি করে।

রাতের আঁধারে গা-ঢাকা দিয়ে একজন লোক ধীরপায়ে এগিয়ে যায় গাছটির দিকে। ঠিক গাছের নীচে দাঁড়িয়ে একটা শাবল দিয়ে খুঁড়তে থাকে গাছের নীচের অংশটা।

একটা বড় পাথর সরিয়ে দেখা গেল মস্ত বড় একটা গর্ত। তার মধ্যে কিছুটা খুঁজেই পাওয়া গেল একটা ছোট পিতলের ঘড়া।

ঘড়াটা তুলে নেয় লোকটা।

একি, বাদশাহী আমলের কতকগুলো মোহর এটার মধ্যে! ঘড়াটা নিয়ে লোকটা কিছুদূরে এগিয়ে একটা থলির মধ্যে মোহরগুলি রেখে দেয়।

এই লোকটিই হচ্ছে মীরজা। পিয়ারীর সঙ্গে দেখা হয় তার একটু পরে।

পিয়ারী প্রশ্ন করে—কি পেলি রে ওখানে?

—বাদশাহী মোহর। দাম সবগুলোর অন্ততঃ পাঁচ হাজারের মতো হবে।

—পাঁচ হাজার! পিয়ারী অবাক হয়ে যায়। মীরজা মৃদু হাসিমুখে বলে—কর্তার কথা কখনও মিথ্যা হতে পারে না।

তিন

—কয়েক বিঘা জমি—

মৌলমেন থেকে আট মাইল দূরে মস্ত বড় একটা ফাঁকা জমির প্রান্তে একখানা গোলাবাড়ি।

জমির মালিক মহিম হালদার বাঙালী। বহুদিন আগে সে লেখাপড়া শিখে স্কুলমাস্টারী করত। তারপর মামার মৃত্যুর সময় জমিটা পেয়ে সে মাস্টারী ছেড়ে দিল। জমির চাষবাসেই মন দিল সে।

মামা মৃত্যুর সময় বলে যান—তোকে কিছু না দিয়ে গেলেও এই যে সামান্য জমিটা দিচ্ছি, এতে সারা জীবন তোকে ভাবতে হবে না। সত্যিই জমিটা খুব উর্বর। এই জমির ফসলেই মহিম হালদারের দিন চলে। মোটামুটি বেশ ভালভাবেই কাটে তার দিন। অবস্থা খুবি বেশি সচ্ছল না হলেও নেহাত অচল নয়।

মহিম হালদার ছেলেবেলা থেকেই একটু একগুঁয়ে প্রকৃতির। যা সে ভাল বুঝবে, তা করবেই। পৃথিবীর কারও সাধ্য নেই সে কাজ থেকে তাকে সরাতে পারে।

দিন কয়েক আগে জাপান আক্রমণ করেছে বর্মা।

ব্রিটিশের সঙ্গে জাপানের শুরু হয়ে গেছে মুখোমুখি সংগ্রাম। যে কোনও মুহূর্তে জাপান বর্মাকে দখল করে নিতে পারে।

ক'দিন আগেও জাপানী প্লেন এসে এ অঞ্চলের ওপর বোমা বর্ষণ করে গেছে। ব্রিটিশের তরফ থেকে জাপানকে বাধা দেবার আপ্রাণ চেষ্টা করা হয়েছে। দলে দলে লোক বর্মা ত্যাগ করে চলে যাচ্ছে ভারতের দিকে।

দলে দলে লোক পলায়ন করলেও মহিম হালদার কিন্তু তার মামার জমি ছেড়ে পালায়নি।

জমির শেষ প্রান্তে যে গোলাবাড়িটা করেছে সেখানেই দিন কাটায়। সঙ্গে আছে তার বোন সুনীতি। সেও বর্মায় আছে আট-দশ বছর ধরে। তার আগে ছিল কোলকাতায়।

সুনীতির বিয়ের জন্যে মহিম অনেক চেষ্টা করেছে—কিন্তু তেমন ভাল পাত্র পায়নি এ অঞ্চলে। অবশেষে স্থির করেছে—সুযোগমতো ভারতে গিয়ে উপযুক্ত পাত্র খুঁজে তার বিয়ে দেবে। মহিম কিন্তু বিয়ে করেনি আজ অবধি। তার ইচ্ছা, সে চিরকুমার থাকবে। কিন্তু সুনীতির ইচ্ছা তার দাদা বিয়ে করে।

এমনি ভাবেই দিন কাটছিল।

দুজন মাত্র লোক নিয়ে মহিম এই আট বিঘা জমিতে শস্য ফলাত। যথেষ্ট পরিশ্রম করতে পারত সে—তাই কোনও দিন তাদের খাওয়া-পরার অভাব হয়নি আজ অবধি।

ছেলেবেলায় মহিম তার মামার কাছে একবার শুনেছিল যে এ জমিটার কোন্ জায়গায় নাকি এক বার্মিজ জমিদারের প্রচুর গুপ্তধন লুকানো আছে। কিন্তু কয়েকবার চেষ্টা করেও সে তার সন্ধান পায়নি। তাই এর পর সে ওটাকে একটা কাল্পনিক গল্প বলেই মনে করেছে। তাছাড়া খাওয়া-পরার অভাব যখন তার নেই, তখন গুপ্তধনেই বা তার প্রয়োজন কিসের?

সেদিন তখন বেলা বারোটা।

সকাল থেকে অজস্র কাজকর্মের শেষে কিছুটা বিশ্রাম নেবার আশায় মহিম হালদার সবেমাত্র ক্ষেত থেকে ফিরেছে এমন সময় বাইরে থেকে কে একজন এলো তার সঙ্গে দেখা করতে।

মহিম বাইরে বেরিয়ে আসে।

লোকটা ভারতীয়। বোধ হয় মুসলমান। চেহারার মধ্যে বেশ একটা রুক্ষতা প্রথম দর্শনেই চোখে পড়ে। তবে দামী পোশাকে সেটা ঢাকবার জন্যে প্রচুর চেষ্টা করা হয়েছে।

—কাকে চান? মহিম হালদার ভ্রূ কোঁচকায়।

—আপনাকেই।

—আমাকে?

—হ্যাঁ।

—কিন্তু কি প্রয়োজন?

—আপনার এই জমিটা আমি কিনতে চাই। দলে দলে লোক যখন বর্মা থেকে চলে যাচ্ছে, তখন নিশ্চয়ই আপনিও চলে যাবেন বলে আশা করা যায়।

—না। আমি এদেশেই চিরদিন থাকতে চাই।

—কেন?

—সে কথা আপনাকে বলে লাভ কি?

—আচ্ছা, সাধারণ হিসাবে এই আট বিঘে জমির দাম কত হতে পারে মহিমবাবু?

—প্রায় হাজার দুই।

—আমি যদি আপনাকে চার হাজার টাকা দিই এ জমিটার মূল্য বাবদ?

—এ জমি নিয়ে আপনি কি করবেন?

—ফ্যাক্টরী বসাব।

—কিন্তু এই জমিই আমার প্রাণ। এই জমিই আমাকে খেতে-পরতে দিচ্ছে।

—তা জানি। কিন্তু এ টাকায় আপনি ভারতে গিয়ে প্রচুর জমি কিনতে পারেন।

একটু থেমে মহিম বলে—না মশাই, এ জমি আমি বিক্রি করতে পারব না।

—যদি পাঁচ হাজার দিই?

—আমাকে টাকার লোভ দেখাবেন না মিঃ—। গরীব হতে পারি, কিন্তু তাই বলে টাকার লোভে জমি আমি বিক্রি করব না। আমাকে ভাবতে সময় দিন, এক মাস পরে জানাব।

—কিন্তু জমিটা যে আমাদের এক্ষুণি চাই। লোকটির কণ্ঠস্বর দৃঢ়।

—তাহলে কোনও দিনই এটা পাবেন না। মহিমও প্রতিবাদ জানায়।

—এই আপনার শেষ কথা?

—হ্যাঁ।

—কিন্তু এটা দিয়ে দিলেই ভাল করতেন। এতে আপনার ভাল হবে না মহিমবাবু!

—আপনি আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন?

—যদি বলি তাই?

নিজের পেশীবহুল দেহের দিকে একবার আড়চোখে চেয়ে নিয়ে মহিম বলল—মহিম হালদার ভীরু হলে এতদিন বর্মা মুলুকে বেঁচে থাকতে পারত না। জানেন ত, এটাকে বলে মগের মুলুক।

—জানি। কিন্তু আপনিও শুনে রাখুন আমার নাম মীরজা। ভারতজোড়া যার নাম সেই ক্রিমিন্যাল বজ্রভৈরবের সহকর্মী আমি।

দৃঢ়স্বরে মহিম বলে—আপনি যেই হোন, যদি এক্ষুণি বেরিয়ে না যান তবে অনুশোচনা করতে হবে!

—কি বললেন? মীরজা হুঙ্কার দিয়ে ওঠে।

—ঠিকই বলেছি আমি। এক্ষুণি বেরিয়ে যান এখান থেকে। আমাকে ভয় দেখাতে এসেছ শয়তান!

—তুমি মুখ সামলে কথা বলো বাঙালী কুত্তা। বলেই মীরজা অতর্কিতে মহিমের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

মহিম একপাশে সরে দাঁড়ায়। মীরজা তার কাঁধ ধরে ঝাঁকানি দেয়। মহিমও প্রাণপণে তাকে ধাক্কা মারে। মীরজা সামনে ছিটকে পড়ে।

মহিম সঙ্গে সঙ্গে গোলাবাড়ির দালানে টাঙানো তার চাবুকটা তুলে নিয়ে সপাসপ দুটো ঘা মারে লোকটার পিঠে।

বেত্রাহত কুকুরের মতো মীরজা দ্রুতপায়ে এগিয়ে চলে। তবে যাবার সময় মুখ ফিরিয়ে সে বলে ওঠে—মনে রেখো মহিম, তোমার এ কাজের শাস্তি তুমি নিশ্চয়ই পাবে!

মহিম দৃঢ়ভঙ্গিতে ঘাড় নেড়ে বলে—আজ পর্যন্ত ও-রকম ভয় কত লোক আমাকে দেখাল! তুমি ত সামান্য মানুষ!

—সামান্য মানুষ আমি হতে পারি, মহিম, কিন্তু বজ্রভৈরব যে সামান্য নয় সে পরিচয় তুমি শীগ্‌গিরই পাবে।

—তার মানে?

—মানে তোমার ভাগ্যে যে অনেক দুঃখ আছে তা বেশ আন্দাজ করতে পারছি। এ নিয়ে আর মিথ্যা কথা বাড়াতে আমি চাই না। শীগ্‌গিরই দেখতে পাবে তোমার এই অন্যায় অহংকারের ফল কি দাঁড়ায়!

কথাটা বলেই মীরজা হনহন করে অদৃশ্য হয়।

চার

—গভীর রাতে—

সুনীতি আড়াল থেকে সব দেখেছিল।

মহিম ফিরে এলে সে বলল—দাদা, তুমি শুধু শুধু লোকটাকে এভাবে মারলে কেন?

মহিম হাঁপাতে হাঁপাতে বলল—মারব না? কি বলছিস তুই? আজ এত বছর এখানে আছি। কারও সাহস হলো না, আমার মুখের ওপর মুখ তুলে কথা বলে। আর শয়তান লোকটা কিনা—

সুনীতি বলে—যাই বলো, লোকটাকে কিন্তু আদৌ ভাল বলে মনে হলো না আমার!

—ভাল ত নয়ই। কিন্তু এখানে ঠগ বাছতে গেলে গাঁ উজোড় হয়ে যাবে জানিস্! ভাল লোক মগের মুলুকে কোত্থেকে মিলবে?

—তবে, তুমি একটু সাবধানে থেকো দাদা। সবতাতেই ত তোমার এমনি বদরাগ!

মহিম নিজের পেশীবহুল হাত দুখানা দেখিয়ে বলল—এর জোরেই খেয়ে-পরে বেঁচে আছি জানিস্! শয়তানের কি ক্ষমতা আমাকে ভয় দেখায়! তা ছাড়া মামার বন্দুকটা এখনও আছে। সেটা যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ ভয় কি! আমি আজই ভাল করে ওটাতে তেল দিয়ে রাখব দেখিস্!

সুনীতি বলে—যাক্, আর বেশি কিছু বলতে হবে না দাদা। তুমি গিয়ে এবার স্নান করে এসো। খাবার তৈরী আছে—এতক্ষণ বোধহয় ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

মহিম দ্রুতপায়ে স্নানের ঘরের দিকে এগোয়।

কাজকর্ম শেষ করে গোলাবাড়িতে ফিরতে মহিমের বেশ একটু রাত হয়। অন্ততঃ সাড়ে আটটা থেকে নটা।

সেদিন সে অন্য দিনের মতো বিকেলে বেরিয়ে গেছে। সুনীতি একা তার ঘরে বসে। হঠাৎ যেন সুনীতির মনে হলো বাইরে পায়ের শব্দ। কে যেন ঘরের সামনে দিয়ে চলে গেল।

সুনীতি মনে করল বোধ হয় মহিম। কিন্তু ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে কাউকে দেখা গেল না। ভয় পেয়ে সে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে চুপ করে বসল।

সকালের ঘটনার পর সবকিছু মিলে তার মনে যেন অহেতুক একটা ভয়ের সঞ্চার হচ্ছিল। কে এভাবে এত রাতে তার ঘরের আশেপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে! সে যেই হোক্, তার উদ্দেশ্যটা যে মোটেই ভাল নয়, এ বিষয়ে সুনীতি নিঃসন্দেহ।

অজস্র চিন্তা সুনীতির মাথার মধ্যে জট পাকাতে থাকে।

রাত সাড়ে আটটায় মহিম ফিরে আসে।

বাড়ির প্রবেশ-মুখে অন্ধকার। নিরন্ধ্র আঁধার যেন গায়ে গায়ে জড়াজড়ি করে দৃশ্যমান সবকিছুকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। সীমাহীন অতলান্ত আঁধারের নিশ্ছিদ্রতা।

মহিম বারান্দায় এসে দাঁড়ায়।

কোণের ঘরে আলো জ্বলছে। ওটা সুনীতির ঘর। মহিম এগিয়ে যায়। হঠাৎ তার সামনে আঁধার যেন নড়ে ওঠে।

ও কি? ও কে?

ও যেন অন্ধকারের সীমাহীন বহিঃপ্রকাশ। কি জন্যে ও এখানে এসে ঘোরাঘুরি করছে! লোকটা যেই হোক তার উদ্দেশ্য সাধু নয়!

মহিম ভীষণ রেগে ওঠে। তারপর দেওয়ালে ঝুলানো বন্দুকটা তুলে নেয়।

অন্ধকার যেন দ্রুত এগিয়ে যায়। লোকটা বোধ হয় পালাচ্ছে।

মহিম ভীষণ রেগে গেছে। সে সেফ্‌টি ক্যাচটা অন্ করে ফায়ার করে। প্রচণ্ড আঘাত! ভীষণ শব্দ! মাথার মধ্যে সবকিছুই যেন কেমন গোলমাল হয়ে যায়!

মহিমের অলক্ষ্যে কে এসে বন্দুকের নলে মাটি পুরে রেখেছিল। ফায়ার করার সঙ্গে সঙ্গে নলটি ফেটে গেল। মহিমের মাথায় লাগে প্রচণ্ড আঘাত।

সবকিছু কেমন যেন অস্পষ্ট!

মহিম জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ে।

দূর থেকে সুনীতি চীৎকার করে ওঠে—দাদা, দাদা...

সুনীতি দ্রুত ছুটে আসতে থাকে। অজানা একটা আতঙ্কে যেন তার সারা শরীর কাঁপতে থাকে।

কিন্তু মহিমের তরফ থেকে কোনও সাড়া মেলে না। কে তবে বন্দুক ছুঁড়ল?

সুনীতি আবার চীৎকার করে ওঠে—দাদা, দাদা...

কে একজন একটা রুমাল চেপে ধরে তার নাকে।

তীব্র গন্ধ। মিষ্টি আমেজ।

গন্ধটা যেন নাকের মধ্য দিয়ে গিয়ে তার মস্তিষ্ককে অসাড় করে দিচ্ছে।

সুনীতি প্রাণপণে নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করে কিন্তু পারে না।

ধীরে ধীরে জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ে সুনীতি।

পাঁচ

—নীল আলো—

দিন কয়েক পরের কথা।

কোলকাতা শহরের প্রখ্যাত গোয়েন্দা দীপক চ্যাটার্জী আর রতনলাল তাদের বাড়িতে বসে নিজেদের মধ্যে কি একটা কথা নিয়ে আলোচনা করছিল।

দীপক বলল—যাই বল রতন, মিঃ চৌধুরীর অদৃশ্য হওয়াটা কিন্তু সত্যিই আশ্চর্যের ব্যাপার।

রতন বলল—ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট থেকে তাঁকে বিশেষভাবে সুরক্ষিত করে রাখবার ব্যবস্থা হয়েছিল। অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই যে শুধু তাঁর ফর্মুলাই চুরি হলো না, সেই সঙ্গে তিনি নিজেও অদৃশ্য হলেন।

দীপক বলল—আমার কিন্তু মনে হয় তাঁকে অপহরণ করা হয়নি।

—তবে তিনি গেলেন কোথায়?

—তিনি হয়ত স্বেচ্ছায় গা-ঢাকা দিয়েছেন।

—স্বার্থ?

—ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের কাছ থেকে তিনি তাঁর আবিষ্কারের জন্যে যে টাকা পেতেন তার চেয়ে বোধ হয় তাঁর লোভ ছিল আরও বেশি। তাই তিনি এভাবে ইচ্ছা করেই আত্মগোপন করলেন। সুরক্ষিত অবস্থা থেকে ফর্মুলা চুরি করা সম্ভব। কিন্তু একটা গোটা মানুষকে চুরি করা অসম্ভব!

—তাহলে তিনি গেলেন কি করে?

—স্বেচ্ছায় তিনি গিয়েছেন। ছদ্মবেশে।

—বজ্রভৈরবের চিঠির কথা কিন্তু তোর মনে আছে ত?

—সত্যি, আশ্চর্য! কে এই বজ্রভৈরব? আর কি উদ্দেশ্যই বা সে একটা চিঠি লিখে রেখে বৈজ্ঞানিক মিঃ চৌধুরীকে নিয়ে অদৃশ্য হলো?

—আমার কি মনে হয় জানিস?

—কি?

—হয়ত বজ্রভৈরবের চিঠিটা শুধু লোক-দেখানো ধোঁকা। বৈজ্ঞানিক মিঃ চৌধুরী স্বেচ্ছায় বজ্রভৈরবের সঙ্গে গেছেন। আর লোককে ধোঁকা দেবার জন্যে বজ্রভৈরব চিঠি লিখে গেছে যে মিঃ চৌধুরীকে বিশেষ কারণে সে ধরে নিয়ে যাচ্ছে।

কথা, শেষ হয় না।

ঘরের মধ্যে প্রবেশ করেন কোলকাতা পুলিসের ডিটেকটিভ ডিপার্টমেণ্টের প্রখ্যাত অফিসিয়্যাল মিঃ মরিসন।

—গুড় মর্নিং মিঃ মরিসন! তারপর হঠাৎ এত সকালে এ অধমের কুটিরে পদার্পণ?

—বিশেষ কারণ আছে মিঃ চ্যাটার্জী। বৈজ্ঞানিক মিঃ চৌধুরীর আকস্মিক অন্তর্ধানে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট ভয় পেয়ে গেছেন। এখন ঘরে-বাইরে কেবল শত্রু। এসময়ে এমন একজন লোকের অদৃশ্য হওয়ার ব্যাপারে ভয় পেয়ে আমার ওপর শুধু চাপ দেওয়া হচ্ছে।

—কেন?

—আর কেন? শুধু এক কথা, যেখান থেকে পার বৈজ্ঞানিক মিঃ চৌধুরীকে খুঁজে বের করো। আমি তাই এ ব্যাপারে আপনার সাহায্য চাই মিঃ চ্যাটার্জী।

—বেশ, চেষ্টা আমি করতে পারি। কিন্তু আমার ধারণা তিনি এখন এদেশে নেই।

—তবে কোথায়?

—যেখানেই হোক, বজ্রভৈরব তাঁকে নিয়ে অন্ততঃ বাংলাদেশ থেকে যে গা-ঢাকা দেবে এ সম্বন্ধে আমি নিঃসন্দেহ। তবে যতোটা পারব আমি চেষ্টা করব মিঃ মরিসন। যতক্ষণ কোনও ক্লু না পাই, ততক্ষণ চুপ করে বসে থাকা ছাড়া উপায় নেই।

মিঃ মরিসনের দীর্ঘশ্বাস শুধু অশুভ একটা করুণতা নিয়ে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে।

তারপর প্রকৃতির রং পালটে যায়।

সীমাহীন আকাশ নীল রং হারিয়ে সন্ধ্যার ছায়ায় হয়ে ওঠে ধূসর। অস্তোন্মুখ সূর্যের রাঙা আবীর শেষ পরশ বুলোয় বিবর্ণ পৃথিবীর ক্লান্ত দেহের ওপর।

দিনের শেষে ব্যালকনিতে বসে ছিল দীপক। বেতের চেয়ারে বসে আপন-মনে সে খবরের কাগজটা পড়ছিল। সকালের দিকে বড় বড় সব হেডিং ছাড়া আর কিছু দেখবার সময় থাকে না। তাই বিকেলে যেটুকু সময় সে হাতে পায় খবরের কাগজটা বেশ মনোযোগ দিয়ে পড়ে নেয়।

চীন-জাপান যুদ্ধ, জাপানী বোমারু বিমানের আক্রমণ আর অ্যাডল্‌ফ্ হিটলারের বেতার বক্তৃতা

ইত্যাদি বড় বড় খবরের আড়ালে এক কোণে ছোট ছোট হরফে যে খবরটা ছাপা হয়েছিল সেটা এমন কিছু মারাত্মক নয়। কিন্তু তার মধ্যে একটা অদ্ভুত বৈচিত্র্য ছিল।

খবরটা হচ্ছে এই রকম ঃ

মৌলমেনের নির্জন কোণে নীল আলো!

জাপানী গুপ্তচর সন্দেহে তিনজন গ্রেপ্তার!

মৌলমেনের গোলাবাড়ি হইতে একজন পুরুষ ও একটি নারী উধাও! ভূতের উপদ্রবে স্থানীয় পল্লীবাসীদের গ্রামত্যাগ!

ইরাবতীর তীরে ব্রহ্মদেশের মৌলমেন শহর। সেস্থান হইতে প্রায় আট মাইল দূরে এক গ্রামাঞ্চলে মহিম হালদার নামক একজন বাঙালীর আট বিঘা জমি ও একটি গোলাবাড়ি ছিল। সে ও তাহার বোন সুনীতি সেখানে বাস করিত।

মহিম হালদারের জমি ও গোলাবাড়ির কাছাকাছি আর কোনও বাড়ি নাই। একদিন দূরবর্তী গ্রামের লোকেরা গভীর রাতে আচমকা বন্দুকের শব্দ শুনিতে পায়। তার পরদিন হইতে মহিম হালদার বা তাহার বোনের কোনও খোঁজ পাওয়া যায় নাই। লোকের ধারণা জাপানী বোমার ভয়ে তাহারা পলায়ন করিয়াছে।

মহিম হালদারের আকস্মিক অদৃশ্য হইবার পর হইতে গোলাবাড়ি এবং জমির আশেপাশে মাঝে মাঝে অদ্ভুত একধরনের নীল আলো জ্বলিতে দেখা যায়।

দূর পল্লীর লোকেরা ভূতের ভয়ে ওই অঞ্চলে যাতায়াত বন্ধ করিয়া দিয়াছে। মাঝে মাঝে গভীর রাতে নাকি ওখানে দুই-একজন অদ্ভুত লোকের আনাগোনা লক্ষ্য করা গিয়াছে। দলে দলে পল্লীবাসী জাপানী বোমা ও ভূতের ভয়ে গ্রাম ত্যাগ করিয়াছে। বর্তমানে তাহারা শহরে আসিয়া বাস করিতেছে।

জাপানী গুপ্তচর সন্দেহে ওই অঞ্চল হইতে দুই-তিনজন লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। কিন্তু পরে তাহারা নিরপরাধ প্রমাণিত হইয়াছে। তবে তাহাদের এখনও মুক্তি দেওয়া হয় নাই।

কিন্তু গ্রামবাসীরা ওটাকে ভূতের উপদ্রব বলিয়া ভয় করিলেও আমরা ওটাকে ভূতের কীর্তি বলিয়া উপহাস করিব না। ইহার অন্য কারণও আছে।

আমরা খবর পাইয়াছি, সুসভ্য লোকও মাঝে মাঝে ওই অঞ্চল দিয়া গভীর রাত্রে যাতায়াত করিবার সময় হঠাৎ নীল আলো জ্বলিতে দেখিয়া বিভ্রান্ত ও ভীত হইয়া পড়িয়াছে।

বিষয়টি এখনও রহস্যাবৃত।

ছয়

—রহস্যের আলোছায়া—

খবরের কাগজের পাতা থেকে মুখ তুলল দীপক।

প্রতিটি লাইন যেন তার মাথার মধ্যে ঘুরে ফিরে কেমন একটা অদ্ভুত অনুভূতিতে তাকে আচ্ছন্ন করছে।

কিসের এই আলো?

কোন্ অজানা রহস্যের চাবিকাঠি লুকিয়ে আছে মৌলমেন থেকে আট মাইল দূরবর্তী সেই গ্রামের বুকে জ্বলন্ত নীল আলোর শিখায়?

কেন মহিম হালদার আর সুনীতি আকস্মিকভাবে অদৃশ্য হলো? কে তাদের এই অদৃশ্য হবার জন্যে দায়ী?

পায়ের শব্দ।

রতনলাল এসে দাঁড়ায় ব্যালকনিতে। দীপকের সহকর্মী ও বন্ধু রতন। দীপকের দিকে চেয়ে সে বলে ওঠে—কি ব্যাপার রে? অত মনোযোগ দিয়ে কি পড়ছিস?

দীপক হেসে বলে—ওয়াণ্ডারফুল! আশ্চর্য!

রতন অবাক হয়ে দীপকের দিকে তাকায়। তারপর প্রশ্ন করে—কি আশ্চর্য? কোথায় আশ্চর্য? আমি ত কিছুই বুঝতে পারছি না!

—আশ্চর্য খবর লুকিয়ে আছে কাগজের পাতায়!

—খবরের কাগজে?

—হ্যাঁ।

—কি আবার আজব খবর বের হলো? সব ত সেই একঘেয়ে কথা! জার্মান সৈন্যের দেড় গজ পশ্চাদপসরণ! জাপানী বোমা বর্ষণ! হিটলারের বক্তৃতা! চার্চিলের আশ্বাসবাণী! এ ছাড়া ত এমন কিছু নতুন খবর পড়েছি বলে মনে পড়ছে না!

—নিশ্চয়ই আছে। আর সেই দামী খবরটা লুকিয়ে আছে অনাদৃত এক নিরালা কোণে।

—বেশ, দেখাবি আমাকে?

—হ্যাঁ, দেখ না। এই জায়গাটা বেশ ভাল করে আগাগোড়া পড়ে ফেললেই বুঝতে পারবি সব।

কাগজের পাতায় মনোযোগ অর্পণ করে রতনলাল। সব খবরটা বেশ ভাল করে পড়ে ফেলে সে। তারপর বলে—এর মধ্যে আর এমন আশ্চর্য হবার কি আছে? কোথায় বর্মার গ্রামে নীল আলো জ্বলল, কি ভূতে ভয় দেখাল, তাতে আমাদের কি সুবিধে?

—এর মধ্যে আমি একটা অজানা রহস্যের গন্ধ পাচ্ছি!

—কি রকম?

—আমার মনে হচ্ছে, নিশ্চয়ই এর সঙ্গে কোনও একটা গোপন ও গূঢ় রহস্য জড়িয়ে আছে। হয়ত ওরা ধরাও পড়তে পারে!

—কিন্তু তা পড়বে কেমন করে! রতন বলে। একে জাপানী আক্রমণে মৌলমেনে এখন অরাজকতা চলছে। তার ওপর সারা শহরের কোথাও নয়—সুদূর এক জনহীন গ্রামে কি মাঠে কি ঘটল তা নিয়ে মাথা ঘামাবার মতো অবসর এ সময় সেখানকার পুলিসের নেই।

—তা আমিও বুঝতে পারছি। আর এই সুযোগ পাবে বলেই হয়ত ওরা ওখানে আড্ডা নিয়েছে।

—ওরা মানে কারা?

—সেটাও কি এখনই শুনতে হবে? আমি শুধু আন্দাজের পাখায় ভর দিয়ে একটু শূন্যে হাওয়া খাচ্ছি মাত্র।

রতন কোনও কথা বলে না।

দীপকও চিন্তার অতলে ডুব দেয়।

* * *

গভীর রাতে একবার নিজস্ব এলাকাটা বেশ ভাল করে ঘুরে টহল দেওয়া পুলিস সাব্ ইন্‌স্পেক্টর মিঃ বাসুর বহুদিনের অভ্যাস।

মিঃ বাসু টালিগঞ্জ থানার পুলিস সাব্ ইন্‌স্পেক্টর। মাঝারি বয়সের ভদ্রলোক। বিরাট রাশভারী চেহারা। বুদ্ধিও খুব তীক্ষ্ণ। সেইজন্যই তিনি এত অল্প বয়সে এতদূর প্রমোশন পেয়েছেন।

সেদিন মিঃ বাসু সমস্ত অঞ্চলটা একবার ঘুরে-ফিরে দেখে নেবার জন্যে পায়ে হেঁটে বের হয়েছিলেন। মোড়ে মোড়ে বীটের পুলিস পাহারা দিচ্ছে। মিঃ বাসুর পরনে পুলিসী খাকীর পোশাক। রিভলভারটা কোমরের সঙ্গে সংলগ্ন।

রাত তখন দুটো কিংবা তার কাছাকাছি।

বোমার ভয়ে ব্ল্যাকআউটে চারদিক আচ্ছন্ন। রাস্তার মোড়ে মোড়ে ব্যাফল্‌ওয়াল। নিকষকালো আঁধারের আবরণে পৃথিবী আচ্ছন্ন।

মিঃ বাসু পথ দিয়ে ধীরপায়ে এগিয়ে চলেছেন। পুলিসী ভঙ্গিতে জোরে জোরে পা ফেলে এ সময় চলেন না তিনি। তাহলে তাঁর এ নৈশ অভিযানের অর্থই নিরর্থক প্রমাণিত হবে।

তিনি চলেন ধীরপায়ে। মন্থর গতিতে। আকস্মিকভাবে কোনও ক্রিমিন্যাল তাঁর সামনে এসে পড়তে পারে এই উদ্দেশ্যেই তাঁর এ নৈশ ভ্রমণ।

ঢং ঢং...

দূরের কোন্ একটা পেটা-ঘড়ি জানিয়ে দিল রাত দুটো।

মিঃ বাসু রসা রোড সাউথ আর প্রিন্স আনোয়ার শাহ্ রোডের কাটিংয়ের কাছাকাছি এসে পড়েছেন, এমন সময় একটা দৃশ্য হঠাৎ তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করল।

দৃশ্যটা সত্যিই অভাবনীয়। অস্বাভাবিক। একটা বড় তিনতলা বাড়ির দোতলার জানালায় একটা টর্চের আলো দুলছে।

মিঃ বাসু মনোযোগ দিলেন সেদিকে। এটা স্বাভাবিক আলোর দোলা নয়—এর মধ্যে রয়েছে সংকেতকারীর অদৃশ্য হাতের নির্ভুল ইশারা। কে যেন সংকেতে অন্য কাউকে কি একটা গোপন বার্তা প্রেরণ করছে বলে মনে হলো তাঁর।

তবে কি বাড়িটাতে কোনও জাপানী গুপ্তচর থাকে? কিন্তু সে কি করে এই বাড়িটাতে থাকবার অধিকার পেলো?

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে মিঃ বাসুর। মনে পড়ে বাড়িটা হচ্ছে একটা হোটেল। এই হোটেলটাতে দেশী-বিদেশী বহু লোকই ঘর ভাড়া নিয়ে থাকে। হোটেলটার নাম শান্তিনিবাস।

কিন্তু এত রাতে শান্তিনিবাসের দোতলার ঘরে কে জেগে বসে আছে! কে বসে বসে এভাবে টর্চের আলোর সংকেত পাঠাচ্ছে!

ঘস্ ঘস্—

একটা মোটর ইঞ্জিনের শব্দ শোনা যায়। বোধ হয় একটা মোটর গাড়ি আসছে এই দিকেই।

মিঃ বাসু চট্ করে সরে গিয়ে উলটো দিকের একটা বাড়ির দালান ঘেঁষে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন। এদিকে কি ব্যাপার ঘটে তা বেশ ভাল করে দেখতে হবে তাঁকে।

একটা মোটর গাড়ি ধীরগতিতে পথ দিয়ে এগিয়ে এলো। মাঝারি আকারের একটা মোটর গাড়ি। গাড়িখানা এসে দাঁড়াল ঠিক বাড়িটার সামনে। এভাবে আচমকা যে গাড়িটা এখানে ব্রেক কষবে মিঃ বাসু তা ভাবতে পারেননি।

মিঃ বাসু মোটরের নম্বরটি টুকে নিলেন তাঁর ডায়েরী বুকে। কিন্তু মনে মনে বুঝতে পারলেন ঠিকানাটা লিখে রেখে তাঁর কোনও লাভ হবে না। এত বড় একটা কাজ যারা করছে তারা নিশ্চয়ই গাড়ির নম্বরটা আগে থেকে পালটে রেখেছে।

ঠিক বাড়িটার পাশে গাড়িটা এসে চুপচাপ দাঁড়িয়ে পড়ে।

দোতলার জানালার টর্চের আলো একটু আগেই নিভে গিয়েছিল। এবার দেখা গেল দোতলা থেকে পাইপ বেয়ে একটা কালো ছায়া নিচে নেমে আসছে।

মিঃ বাসু চিন্তিত হলেন।

ওদের বাধা দেবেন?

কিন্তু তাতে ফল হবে উলটো। গাড়িতে অন্ততঃ দুই-তিনজন বসে আছে। আর ওরা নিশ্চয়ই নিরস্ত্র নয়। সেক্ষেত্রে তাঁর জীবন বিপন্ন হতে পারে। তার চেয়ে দেখা যাক ওরা কি করে।

লোকটা পাইপ বেয়ে নিচে নেমে মোটরটাতে চড়ে বসল। আর সঙ্গে সঙ্গে মোটরটাও খানিকটা ধোঁয়া ছেড়ে হুস করে ছুটে চলল দ্রুতগতিতে।

মিঃ বাসু এগিয়ে যান।

মোড়ের মাথায় বীটের কনস্টেবল লছমন সিং পাহারা দিচ্ছে।

—লছমন সিং! মিঃ বাসু বলেন।

—জী হুজৌর! চট্ করে লছমন সিং সেলাম করে।

—হুঁশিয়ারসে খাড়া রহো!

—কেয়া হুয়া সাব?

—ওই যে গাড়িটা চলে গেল, ওটাতে করে একদল বদমাশ পালিয়ে গেল। এই অঞ্চলে যখন বদমাশদের আনাগোনা শুরু হয়েছে তখন একটু সাবধান থাকা ভাল।

মিঃ বাসু এগিয়ে যান।

বয়ে যাওয়া নৈশ বাতাসের কান্নায় যেন কোন একটা অশুভ ঘটনার সংকেত ভেসে আসে।

সাত

—অপমৃত্যু—

পরদিন সকালে যে বিশেষ খবরটা কোলকাতার প্রত্যেকটি লোকের মনোযোগের আকর্ষণ করল তা হচ্ছে ঃ

প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক ভেনকটাচারী আয়েঙ্গারের অপমৃত্যু!

টালিগঞ্জের হোটেলে মৃতদেহ প্রাপ্তি!

সারা দেহ মারাত্মকভাবে ক্ষতবিক্ষত!

মৃত্যুর কারণ এখনও অজ্ঞাত! হত্যাকারী সন্দেহে কোনও ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয় নাই!

টালিগঞ্জের শান্তিনিবাস হোটেলে প্রখ্যাত মাদ্রাজী বৈজ্ঞানিক ভেনকটাচারী আয়েঙ্গারের মৃতদেহ পুলিস সনাক্ত করিয়াছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, আগের দিন রাত্রে টালিগঞ্জ থানার পুলিস অফিসার মিঃ বাসু যখন যথারীতি তাঁহার এলাকা ঘুরিয়া ঘুরিয়া পরিদর্শন করিতেছিলেন তখন শান্তিনিবাসের সামনে গভীর রাতে একটি মোটরকে দাঁড়াইতে দেখেন। একটু পরে একজন লোক মোটরগাড়িতে আসিয়া উঠে। তারপর সেটি দ্রুত অদৃশ্য হয়।

এই ঘটনার পরের দিন সকালে হোটেলের ম্যানেজার অনেক বেলা পর্যন্ত মিঃ আয়েঙ্গারের ঘুম না ভাঙার জন্য ভীত হন। চাকরের মুখে সংবাদ পাইয়া তিনি পুলিসে জানান।

পুলিস আসিয়া দরজা ভাঙিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে। ঘরের মধ্যে মিঃ আয়েঙ্গারের মৃতদেহ সনাক্ত হয়। কেহ যে ধারাল অস্ত্রের দ্বারা পর পর কয়েকবার আঘাত করিয়া মিঃ আয়েঙ্গারকে হত্যা করিয়াছে এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই!

অতঃপর পুলিস একটি ডায়েরী বই হইতে তাঁহার পরিচয় জানিতে পারে। মিঃ আয়েঙ্গার একরাত্রি থাকিবার জন্যই হোটেলের এই ঘরটি ভাড়া লইয়াছিলেন। মৃতদেহ পোস্ট মর্টেমে পাঠানো হইয়াছে। কেন মিঃ আয়েঙ্গার একজন অপরিচিত হত্যাকারীর হাতে প্রাণ হারাইলেন তাহা এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই।

আর একখানি পত্রিকায় লিখেছে ঃ

বৈজ্ঞানিক মিঃ আয়েঙ্গারের উদ্দেশ্যে কোন্ একজন অপরিচিত হত্যাকারীর লেখা একখানা কার্ড পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে লেখা ছিল ঃ

প্রিয় মিঃ আয়েঙ্গার,

তুমি যে কেন মিথ্যা আমাদের আদেশ অমান্য করবার চেষ্টা করলে জানি না। আমাদের কথামতো চললে তোমার মতো একজন প্রতিভাবান লোককে হয়ত এভাবে অকালে মৃত্যুবরণ করতে হতো না।

তোমার এই আকস্মিক অপমৃত্যুর জন্যে আমরা সত্যিই খুব দুঃখিত। প্রার্থনা করি স্বর্গে গিয়ে তোমার আত্মা পরম সুখে ও শান্তিতে থাকুক।

ইতি—

হিতৈষী বন্ধু।

হত্যাকারীর হত্যাকাণ্ড যেমন আকস্মিক, এই অদ্ভুত চিঠিও তার চেয়েও কম আকস্মিক নয়।

আমরা জানি না, কেন মিঃ আয়েঙ্গারের মতো প্রসিদ্ধ একজন বৈজ্ঞানিক টালিগঞ্জের এমন একটা সাধারণ হোটেলে ঘর ভাড়া লইয়া বাস করিয়াছিলেন। সে যাহা হউক, আমরা চাই পুলিসের তরফ হইতে যত সত্বর সম্ভব এ হত্যাকাণ্ডের মীমাংসা হউক।

* * *

খবরের কাগজের পাতার এই বিচিত্র হত্যাকাণ্ডের খবর দীপকেরও নজর এড়িয়ে যায়নি।

দীপক আর রতন এই হত্যাকাণ্ড নিয়েই আলোচনা করছিল।

দীপক বলল—দিনে দিনে কোলকাতা শহরটাতেও যে অরাজকতা শুরু হয়ে গেল দেখতে পাচ্ছি। কেউ আর কাউকে মানতে চায় না। ক'দিন আগে মিঃ চৌধুরী অদৃশ্য হলেন। ফর্মুলা হলো অপহৃত। এবার বৈজ্ঞানিক মিঃ আয়েঙ্গারের অপমৃত্যু হলো। বৈজ্ঞানিকদের ওপর যেন লোকের আক্রোশ শুরু হয়ে গেছে।

রতন হেসে বলে—যাই বল, এ দুটো কেসের মধ্যে নিশ্চয়ই কোনও লিঙ্ক নেই।

—তা কি করে বলব। দীপক আপত্তি জানায়। কোন কেস সল্‌ভ্ না হওয়া পর্যন্ত কিছুই বলা যায় না। কোত্থেকে কেসের লিঙ্ক বেরিয়ে পড়ে তা বলবার ক্ষমতা নেই কারও।

রতন কি একটা কথা বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই টেলিফোনটা ঘন ঘন বেজে উঠে তাদের কথায় আবার বাধার সৃষ্টি করল।

দীপক উঠে গিয়ে রিসিভারটা তুলে নিল ঃ হ্যালো, কে...

—আমি, মিঃ মরিসন কথা বলছি।

—সুপ্রভাত মিঃ মরিসন। তারপর কি ব্যাপার বলুন ত! এত সকালে?

—ও কেসটার বিষয়ে আর কিছু চিন্তা করেছেন কি?

—করেছি। কিন্তু বজ্রভৈরব সম্বন্ধে আর কিছু জানতে পারিনি।

—আপনার অনুমানই ঠিক। বজ্রভৈরব এখন এখানে নেই।

—সে তবে কোথায়?

—বর্মায়।

—কি করে জানলেন?

—দু-একটা ক্লু পেয়েছি বলেই বলছি। আর একটা গোপনীয় কথা আছে।

—কি বিষয়ে?

—বৈজ্ঞানিক মিঃ আয়েঙ্গারের মৃত্যুর খবরটা নিশ্চয়ই পেয়েছেন?

—হ্যাঁ।

—তিনি কেন মৃত্যুবরণ করলেন জানেন?

—না।

—তাঁর বিষয়ে এমন দু-একটা সূত্র পেয়েছি যা খুব ইন্টারেস্টিং। তাঁর লেখা একখানা ডায়েরী পেয়েছি। সেটা খুব দামী জিনিস। আমি অবশ্য সব বুঝতে পারিনি।

—কেন?

—ডয়েরীটা মাদ্রাজী ভাষায় লেখা। অবশ্য তাঁর ইংরেজী তর্জমা করিয়েছি আমি। তবু সব বুঝতে পারিনি। আপনি একবার লালবাজারে আসুন না।

—কখন এলে ভাল হয়?

—আজ বিকেলেই আসুন না।

—আচ্ছা তাহলে এখন ছেড়ে দিচ্ছি।

দীপক রিসিভারটা নামিয়ে রাখে।

আট

—আর এক দৃশ্য—

বোঁ-ও-ও-ও...

মাথার ওপর শোনা যায় জাপানী প্লেনের গর্জন।

সুতীব্র অন্ধকারকে সার্চলাইটের তীব্র আলোয় ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে আকাশের গায়ে ফুটে ওঠে জাপানী প্লেনগুলো।

চক্রাকারে ঘুরছে সেগুলো।

বুম্ বুম্ বুম্...

একটু পরেই একে একে বোমা পড়তে লাগল। হিস্ হিস্ শব্দ করতে করতে পড়ছে আরও অনেকগুলো বোমা।

কট্ কট্ কট্...

গর্জে ওঠে সাজানো সব অ্যান্টি-এয়ারক্রাফট্ গান আর মেশিনগান। একটি প্লেন গোলাবিদ্ধ হয়। জ্বলে ওঠে এরোপ্লেনের সামনের অংশ। ঘুরতে ঘুরতে প্লেনটা পড়তে থাকে নিচের দিকে।

আবার কয়েকটা বোমা বর্ষণ করে এরোপ্লেনগুলো।

মেশিনগানগুলো তখন সশব্দে গুলিবর্ষণ করে চলেছে।

একটু পরেই প্লেনগুলো বিদায় নেয়। অন্ধকারকে আলোর ফুলকি দিয়ে চিরে চিরে যেন ছুটে যায় মেশিনগানের গুলিগুলো।

মৃত মানুষ আর আহত মুমূর্ষুতে সেই অঞ্চলটি ভরে ওঠে। কিন্তু তাদের দিকে নজর দেবার মতো সময় থাকে না কারও। সময় থাকে না জ্বলন্ত সব কাঠ আর টিনের বাড়িগুলোর দিকে চাইবার।

সকলেই শুধু এ অঞ্চল ছেড়ে পলায়ন করতে পারলেই বাঁচে! সকলেই চায় যেমন করে হোক এ অঞ্চল ছেড়ে চলে যেতে!

দলে দলে লোক পায়ে হেঁটে চলে ভারতের দিকে। ব্রিটিশ আর ভারতীয় সৈন্য এবং জাপানী সৈন্যেরা তখন শুধু যুদ্ধের নেশাতেই উন্মাদ!

একটি ছোট ঘরের মধ্যে ওরা দুজন বন্দী।

মহিম আর সুনীতি।

তাদের জমির নিচে যে গোপনে এত বড় একটা ভূগর্ভস্থ কক্ষ বেরিয়ে আসতে পারে তা কে জানত?

প্রথম যেদিন অজ্ঞান অবস্থায় তাদের ওখানে নিয়ে যাওয়া হলো তখন তারাই চমকে উঠেছিল।

বিরাট একটা সুড়ঙ্গপথ দিয়ে তাদের নিচে নামানো হলো। দু-তিনজন লোক ধরাধরি করে তাদের সেখানে নামাল। মহিম তা বুঝতে না পারলেও সুনীতি ঠিকই বুঝেছিল। মোটামুটি সব কিছুরই একটা অস্পষ্ট অনুভূতি দানা বেঁধে আছে তার মনে।

কিন্তু সুনীতি নড়াচড়া করেনি। মহিম ত তখন অজ্ঞান। দুজনকে এনে রাখা হলো মাটির নিচে একটি ছোট কক্ষে।

সুনীতি দেখেছে সেখানে পাশাপাশি রয়েছে সাত-আটটা কক্ষ। শোনা যায় বহুদিন আগে বার্মিজ রাজারা এমনি ভূগর্ভস্থ কক্ষে বাস করতেন। এমন কি তাঁদের ধনসম্পদও এই সব জায়গাতেই থাকত। কিন্তু তাঁরা ছাড়া অন্য কেউ তা জানতেও পারত না।

কিন্তু সুনীতিদের নিজের জমির নিচেই যে একটা এত বড় ভূগর্ভস্থ বাড়ি আছে তা সুনীতি আদৌ কল্পনা করতে পারেনি কোনও দিন।

সুনীতি ভাবে, নিশ্চয়ই এখানে কোনও গুপ্তসম্পদও লুকিয়ে থাকতে পারে। তবে তারা যে প্রবাদবাক্য শুনেছিল তা নিশ্চয়ই মিথ্যা নয়।

একটা কক্ষে সুনীতি আর মহিমকে রেখে লোকগুলো চলে যায়। একটু পরেই সুনীতি আবার জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। তার মাথার মধ্যে ঝিমঝিম করে ওঠে। সবকিছু কেমন অস্পষ্ট মনে হতে থাকে।

বিকালের কাছাকাছি সুনীতির জ্ঞান ফিরে আসে।

ভাল করে চেয়ে দেখে তার দাদা মহিমও তার পাশে শুয়ে।

সুনীতি হাত-পা নাড়াতে চেষ্টা করে কিন্তু পারে না। হাত-পা শক্ত দড়ি দিয়ে বাঁধা। মহিমের দিকে চেয়ে দেখে তার হাত-পাও ঠিক অমনি করে দৃঢ়ভাবে বাঁধা।

মৃদু আলো জ্বলছে ঘরে।

সেই আলোয় সুনীতি দেখতে পায় একজন লোক তাদের থেকে কিছু দূরে দাঁড়িয়ে। পরনে কালো স্যুট। কালো ক্যাপ। সবকিছুই কালো। মুখে কালো আবরণ।

সে বলে, তোমাকে অনেক সুযোগ আমি দিয়েছিলাম মহিম। কিন্তু তুমি তা গ্রাহ্য করোনি। তাই তোমাকে এ শাস্তি পেতে হচ্ছে।

তুমি বলেছিলে পাঁচ হাজার টাকাতেও জমি বিক্রি করবে না। কিন্তু বর্তমানে এ অরাজকতার সময়ে তোমাকে মুক্ত করতে সচেষ্ট হবে না কেউ। কেউ তা নিয়ে মাথাও ঘামাবে না।

দুজন লোককে পুলিস নাকি আটকেছে। কিন্তু আমার লোককে তারা সন্দেহ করতে পারেনি। পারবেও না কোনও দিন। মাটির নিচে এই গোপন কক্ষেই হবে আমার অস্ত্রচর্চা। আর বৈজ্ঞানিক মিঃ চৌধুরীও তাঁর প্রয়োজনমতো সবকিছু এখানে আনিয়ে নেবেন।

দিনের পর দিন তোমারই পূর্বপুরুষ-সঞ্চিত টাকায় আমি কাজ করে যাব। কিন্তু তোমাকে তার জন্যে এক পয়সাও দিতে হবে না।

কাজেই এখন নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ বজ্রভৈরবের কতোটা ক্ষমতা। মূর্খ তুমি তাই পাঁচ হাজার টাকা হাতে পেয়েও হারালে!

মহিম এ কথার কোনও উত্তর দেয় না। নিষ্ফল আক্রোশে যেন ফুলতে থাকে সে! তার দিকে চেয়ে বজ্রভৈরব বলে ওঠে—যাও, এদের বন্দীশালায় নিয়ে গিয়ে আটকে রাখো।

নয়

—ডায়েরী-রহস্য—

সোজা লালাবাজারে গিয়ে মিঃ মরিসনের সঙ্গে দেখা করে দীপক।

মিঃ মরিসন দীপককে পেয়ে খুবই খুশি হন। তিনি বলেন—আপনি আসাতে সত্যিই আমার খুব সুবিধা হলো মিঃ চ্যাটার্জী!

—কেন বলুন ত? দীপক প্রশ্ন করে।

—আমরা মিঃ আয়েঙ্গারের ঘরে যে ডায়েরীটা পেয়েছি তা মোটামুটি মাদ্রাজী ভাষায় লেখা। আমরা তার ইংরেজী করিয়েছি। কিন্তু কিছুই বুঝতে পারিনি।

—তাতে কি অদ্ভুত কিছু লেখা আছে?

—না, অদ্ভুত হয়ত নয়। কিন্তু তার মধ্য থেকে এমন কোনও লিঙ্ক পাচ্ছি না, যা থেকে বোঝা যায় আসল ব্যাপারটা কি!

—বেশ, আপনি ওটা আমাকে দিন দেখি।

মিঃ মরিসন ডায়েরী ও তার ইংরেজী তর্জমা এগিয়ে দেন দীপকের দিকে। দীপক মনোযোগ সহকারে সেগুলি দেখতে থাকে।

কয়েকখানা পাতা শুধু দৈনন্দিন রুটিনে ভরা। তারপর আসে একে একে লেখাগুলি। দীপক পড়তে থাকে সে লেখা ঃ

১৭ই সেপ্টেম্বর ঃ

আজ সত্যিই দেখলাম মিঃ চৌধুরীর আবিষ্কার। সত্যই অদ্ভুত। তাঁর তৈরী ডিম্বাকৃতি যন্ত্রদানবগুলো যেন জীবন্ত মানুষের চেয়েও অনেক বেশি ভয়ানক। তিনটি পায়ে ভর দিয়ে তারা যে গতিতে এগিয়ে যায় আর ইচ্ছামতো তাপরশ্মি বিক্ষেপ করতে পারে তা সত্যি অদ্ভুত!

২০শে সেপ্টেম্বর ঃ

একি আশ্চর্য কথা! মিঃ চৌধুরী আর বজ্রভৈরব একসঙ্গে কাজ করে চলেছে। বেআইনী উপায়ে তারা মৌলমেনের জমিটা দখল করে ওখানে আণ্ডারগ্রাউণ্ড ফ্যাক্টরী বসাবে। তাহলে কি সত্যিই ওরা সভ্য সমাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবে? আমি যে এটা বিশ্বাস করতেই পারছি না।

২১শে সেপ্টেম্বর ঃ

মাত্র একটি যন্ত্র ওরা তৈরী করেছে। কিন্তু বলছে এক হাজার ওরকম যন্ত্র তৈরী করবে তারা। পৃথিবীর সভ্য মানুষকে ত তাহলে ওরা গ্রাহ্যই করবে না! যন্ত্র দ্বারা মানুষকে বশীভূত করবে।

আমাকে ওরা ওদের দলে যোগ দিতে বলেছিল। আমি ভাববার জন্যে একদিন সময় নিয়েছি।

২২শে সেপ্টেম্বর ঃ

না, ওদের দলে আমি যোগ দেব না। ওদের ভয়ে ভীত হব না আমি। আজও ওরা আমাকে ভয় দেখিয়েছে। আমাকে তাই এ অঞ্চল ছেড়ে পালাতে হবে। আজই আমি এখান থেকে চলে যাব। আর যে ঘন ঘন জাপানী বোমা পড়ছে, এ অঞ্চলে থাকা নিরাপদ নয়। ওদের আর কি! দিব্যি আরামে মাটির নিচের ঘরে বসে বসে কাজ করছে!

২৩শে সেপ্টেম্বর ঃ

আজ মৌলমেন ছাড়লাম। যাচ্ছি ভারতের দিকে।

২৬শে সেপ্টেম্বর ঃ

আসামের গভর্নরকে সব কথা খুলে বললাম। তিনি আমাকে পাগল বলে উপহাস করলেন। তিনি এসবকে নাকি গ্রাহ্যও করেন না। তাঁর ভয় জাপানকে। কিন্তু তিনি বুঝলেন না, কেন গভর্নমেণ্ট থেকে মিঃ চৌধুরীকে সুরক্ষিত করে রেখেছিল।

আমি দেখতে পাচ্ছি সভ্য জগৎ ক্রমে ধ্বংসের দিকে চলেছে।

২৭শে সেপ্টেম্বর ঃ

মনে হচ্ছে আমার পেছনে ওরা লোক লাগিয়েছে। হ্যাঁ, আজ দেখলাম ঢ্যাঙা লোকটা পথ চলতে চলতে বার বার আমার দিকে তাকাচ্ছিল। ওর উদ্দেশ্য কি তা ভগবানই জানেন!

হয়ত ওরা ভেবেছে সভ্য জগতের কাছে আমি খুলে বলব ওদের ইতিহাস। তাই আমার পলায়নকে ওরা সন্দেহের চোখে দেখেছে। কিন্তু আমি জীবনেও ওদের পক্ষে যোগ দিতে পারব না। আর আমাকে যেমন করে হোক সব খবর ভারতের গভর্নর-জেনারেলকে জানাতে হবে।

তারপর কতকগুলি পাতায় কিছু লেখা নেই। অবশেষে একখানা পাতায় লেখা শুধু কতকগুলি দিন ও হোটেলের নাম।

২৯শে সেপ্টেম্বর—হোটেল পিকাডিলি, ধুবড়ি।

৩০শে সেপ্টেম্বর—হোটেল এলফিন্‌স্টোন, জলপাইগুড়ি।

১লা অক্টোবর—আদর্শ হোটেল, কাটিহার।

২রা অক্টোবর—বিমলা নিবাস, রানাঘাট।

৩রা অক্টোবর—হোটেল ডি বেঙ্গল, কোলকাতা।

৪ঠা অক্টোবর—পান্থপাদপ, বরানগর।

৫ই অক্টোবর—শান্তিনিবাস, টালিগঞ্জ।

৬ই অক্টোবর—মিলন হোটেল, কোলকাতা।

৭ই অক্টোবর—আর্ট হোটেল, কোলকাতা।

৮ই অক্টোবর—প্রিয়ধাম, বর্ধমান।

৯ই অক্টোবর—সুনাম সদন, বর্ধমান।

১০ই অক্টোবর—প্রিয় নিবাস, আসানসোল।

বিরাট তালিকাটির দিকে চেয়ে মিঃ মরিসন বলেন—কি ব্যাপার মিঃ চ্যাটার্জী? আপনি কি এটার কোনও অর্থ করতে পারেন?

দীপক হেসে বলে—কেন, এর কোনও অর্থ কি আপনার বোধগম্য হচ্ছে না?

—না, এতগুলো জায়গা, হোটেল আর তারিখের তালিকা দেখে কি বোঝা যায় বলুন?

—অর্থ একটা নিশ্চয়ই আছে। আর সে অর্থের গুরুত্বও যে নেহাত কম নয়, এ কথা নিশ্চয় করে বলতে পারি।

—কিন্তু কি অর্থ?

—দেখুন, পাঁচই অক্টোবর টালিগঞ্জের শান্তিনিবাসে মিঃ আয়েঙ্গার নিহত হয়েছিলেন। তালিকাতেও লেখা আছে, ৫ই অক্টোবর, শান্তিনিবাস, টালিগঞ্জ। তার আগে যে তারিখে যে হোটেলে উনি ছিলেন সেই লিস্ট হচ্ছে এটা। এমন কি পরে কোন্ কোন্ হোটেলে উনি থাকবেন তাও আগেই স্থির করে ফেলেছিলেন।

—কিন্তু এক এক দিন এক এক জায়গায় এভাবে থাকতেন কেন?

—উনি বোধ হয় আগেই জানতে পেরেছিলেন যে ওঁর জীবন বিপদাপন্ন। তাই উনি কখনও এক জায়গায় বা এক হোটেলে বেশিদিন থাকতেন না। এমন কি এক হোটেলে একদিনের বেশি কাটাতেন না।

এছাড়া আরও একটা পয়েন্ট আমরা পাচ্ছি। তা হচ্ছে আসাম থেকে জলপাইগুড়ি, কাটিহার, রানাঘাট হয়ে উনি কোলকাতায় এসেছেন। আর এরপর ওঁর বর্ধমান, আসানসোল ইত্যাদি জায়গায় যাবার ইচ্ছা ছিল।

মিঃ মরিসন বলেন—বজ্রভৈরবের সঙ্গে ওঁর কি সম্পর্ক ছিল?

দীপক চিন্তিতস্বরে বলে—বোধ হয় মিঃ চৌধুরী আর বজ্রভৈরব একসঙ্গে কাজ করছে। ওরা বোধ হয় আছে বর্মার মৌলমেনে। ওরা সেই যন্ত্র তৈরী করতে সফল হয়েছে বলেই মনে হয়। মিঃ আয়েঙ্গারকে ওরা সেই দলে যোগ দিতে বলেছিল। কিন্তু তিনি তাতে রাজী না হয়ে সভ্য জগৎকে এ বিষয়ে সতর্ক করবার জন্যে পালিয়ে আসেন। তাই ওদের প্রেরিত চর শেষ পর্যন্ত তাঁকে হত্যা করে চিরদিনের মতো তাঁর মুখ বন্ধ করে দিল।

—কিন্তু একটা কথা মিঃ চ্যাটার্জী। মুখ বন্ধ করে দিলেও, ডায়রীর মাধ্যমে কিছুই জানতে বাকী নেই আমাদের। কাজেই ওরা যে খুব বেশি লাভবান হয়েছে তা মনে হয় না।

—ওরা কেবল মিঃ আয়েঙ্গারের ওপরেই দৃষ্টি রেখেছিল। এই ডায়েরীটার কথা ওরা ভাবতেও পারেনি।

—কিন্তু এখন আমাদের কি কর্তব্য বলুন ত?

—পুলিস কমিশনারের মাধ্যমে গভর্নরকে সব জানিয়ে আমাদের এক্ষুণি স্টেপ নেওয়া উচিত নয় কি?

—নিশ্চয়ই। সে বিষয়ে এতটুকু সন্দেহ নেই আমার। অবিলম্বে বর্মা সীমান্তে খবর পাঠিয়ে সবকিছু বন্ধ করা উচিত। দরকার হলে আমরাও প্লেনে করে ওখানে যাব, ওদের কাজে বাধা দিতে।

—আমার মনে হয় এই দলের বিরুদ্ধে অগ্রসর হতে গভর্নমেণ্ট আমাদের সাহায্য করবে।

—তা যদি করে, তবে এই সব ঘটনার শেষ সমাধান হবে মৌলমেন থেকে আট মাইল দূরে সেই জনহীন জমির ভূগর্ভস্থ কক্ষে।

—সত্যি, মিঃ মরিসন, এ ডায়েরীটা কিন্তু আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করেছে। মিঃ আয়েঙ্গার মরে গেলেও, তিনি যা করেছেন, মানুষের আগামী দিনের ইতিহাসে তাঁর এ ত্যাগের কথা চিরদিন লেখা থাকবে।

মিঃ মরিসন বলেন—আপনি একটু বসুন মিঃ চ্যাটার্জী। আমি এ ডায়েরীর তর্জমা আর সম্পূর্ণ রিপোর্টটা লিখে ফেলি। টালিগঞ্জ থানার অফিসার মিঃ বাসুর রিপোর্টটাও এই সঙ্গে attach করে দিতে হবে। আমার মনে হয়, সব ঘটনা শুনলে গভর্নর হয়ত এক্ষুণি আমাদের বর্মায় পাঠাবার ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু এই অবস্থায়....

দীপক হেসে বলে—মন্দ কি! এই সুযোগে যুদ্ধক্ষেত্রের একটা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হবে। সেটাও কি একটা কম লাভ নাকি!

মিঃ মরিসন এ কথার কোনও উত্তর দেন না।

দশ

—জাল পুলিস—

ডায়েরীর পাতার মধ্যে তলিয়ে গিয়েছিল দীপক ও মিঃ মরিসন। চমক ভাঙল একসঙ্গে কয়েকটি পদশব্দে।

দুজনে চেয়ে দেখে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করছে তিনজন সাধারণ পুলিস কনস্টেবল।

অবাক হয়ে সেদিকে চেয়ে মিঃ মরিসন বলেন—তোমাদের ত এখানে ডাকা হয়নি। তবে এভাবে হঠাৎ এখানে এসেছ কেন?

তিনজন একসঙ্গে দীপক ও মিঃ মরিসনের দিকে পিস্তল উঁচিয়ে ধরল। ওরা দুজনে হতভম্ব হয়ে মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল।

মিঃ মরিসন হাঁকলেন—সিপাহী!

কোনও উত্তর নেই। দরজার বাইরে পাহারারত পুলিসটি যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে।

আগন্তুক পুলিস তিনজনের একজন বলল—ওদের আটকে রেখে পথ সম্পূর্ণ নিষ্কণ্টক করেই আমরা এসেছি স্যর!

—কিন্তু তোমরা কি চাও?

—বিশেষ কিছু না—ওই ডায়েরীখানা।

কথার সঙ্গে সঙ্গেই টেবিলের ওপর থেকে ডায়েরীখানা তুলে নিল। তারপর দ্রুতপায়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

প্রশস্ত রাজপথের ধারে পুলিসের ছদ্মবেশে থানার ভেতরে প্রবেশ করে তাঁর প্রাইভেট চেম্বার থেকে যে কেউ ডায়েরীখানা নিয়ে পালাতে পারে এ ধারণা মিঃ মরিসনের ছিল না। তিনি অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন ওদের গমনপথের দিকে।

কিন্তু দীপক একলাফে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলো ওদের পেছনে পেছনে। ওরা তিনজনে হনহন করে বাইরে বেরিয়ে এলো। থানার ঠিক বাইরেই একখানা প্রাইভেট কার অপেক্ষা করছিল। সেদিকে ছুটে গিয়ে ওরা গাড়িতে উঠে বসল। গাড়িখানাও খানিকটা ধোঁয়া ছেড়ে তীব্রবেগে চলল প্রশস্ত রাজপথের ওপর দিয়ে।

ইন্‌স্পেক্টর মরিসনও দীপকের পেছনে পেছনে সেখানে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি শুধু বললেন—আশ্চর্য! তারপর হঠাৎ কি খেয়াল হতেই তিনি অপসৃয়মান গাড়িখানার নম্বরটা লিখে নিতে যাচ্ছিলেন। দীপক তাঁকে বাধা দিয়ে বলল—কোনও লাভ নেই মিঃ মরিসন। ওটা যে জাল নম্বর সে সম্বন্ধে আমি নিঃসন্দেহ।

গাড়ি চলে গেলে ওরা দুজন থানার দিকে চেয়ে দেখে সেখানে একজন পুলিস কনস্টেবলেরও নামগন্ধ নেই। অবাক হয়ে মিঃ মরিসন বললেন—ওরা সব গেল কোথায় মিঃ চ্যাটার্জী?

দীপক বলল—আশেপাশেই হয়ত আছে স্যর। আসুন একটু খোঁজ করা যাক।

খানিকটা খোঁজ করতেই থানার পেছনে একটা ঝোপের মধ্যে পাওয়া গেল তিনজন কনস্টেবলের দেহ। অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে তারা। কারো দেহেই পুলিসের পোশাক নেই।

অতিকষ্টে তাদের জ্ঞান সঞ্চার করা হলো। জ্ঞান ফিরে এলে তারা বলল যে, মিঃ মরিসন চ্যাটার্জী সাহেবকে নিয়ে ঘরে প্রবেশ করবার পর তারা চারজনে থানার সামনে বসে গল্পগুজব করছিল। সাব্‌-ইন্‌স্পেক্টর বসু ত বিকেলেই একটা তদন্তে বেরিয়ে গেছেন।

মিনিট কুড়ি পরে থানার সামনে একটি গাড়ি এসে দাঁড়ায়।

তার মধ্য থেকে একজন লোক নেমে আসে। সে বলে যে, সে নাকি বিশেষ জরুরী কারণে মিঃ মরিসনের সঙ্গে দেখা করতে চায়। মিঃ মরিসনের দেখা পাওয়া সম্ভব নয় জানতে পেরে সে বলে যে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে সে প্রস্তুত।

এদিকে তারা একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল।

এমন সময় লোকটি আচমকা পিস্তলের মতো একটা জিনিস তাদের দিকে উঁচিয়ে ধরে ট্রিগারটা টিপে দেয়।

কিন্তু গুলির বদলে তার মধ্য থেকে বেরোল শুধু খানিকটা ধোঁয়া। ধোঁয়াটা নাকে লাগার সঙ্গে সঙ্গে তারা চারজনেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে। তারপর কখন যে তাদের পোশাক পরিধান করে ওরা ছদ্মবেশে মিঃ মরিসনের ঘরে হানা দিয়েছে, তা তারা জানে না।

দীপক সব শুনে হেসে বলে—মিঃ মরিসন, আর যাই হোক, এটা থেকে অন্তত প্রমাণ হলো যে, ডায়েরীতে যা লেখা আছে তা অক্ষরে অক্ষরে সত্য।

—আপনার এ অনুমানের কারণ?

—তা না হলে কি আর ওরা এতটা বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিয়ে এভাবে ডায়েরীটা আমাদের হাত থেকে নিয়ে যাবার জন্যে সচেষ্ট হয়ে উঠত?

—এখন আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মপদ্ধতি নিশ্চয়ই ঠিক করবার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

—ভবিষ্যৎ আমাদের নিহিত আছে সে ই মৌলমেন অঞ্চলে। আপনি সম্পূর্ণ বিষয়টা এবং ডায়েরীর যে ইংরেজী তর্জমা আছে সেটা উপরওয়ালার কাছে জানাতে পারেন। তারপর গভর্নমেণ্ট যদি এই কথা মেনে নিয়ে সেখানকার ব্যাপারে মাথা ঘামায় তবেই আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মপদ্ধতি নির্ধারিত হবে।

—কিন্তু এ তদন্তের ব্যাপারে আমরা কি করব?

—আমরা এখন সেখানে যাবার ব্যবস্থা করব। তা না হলে এ রহস্যের মীমাংসা হওয়ার আশা দুরাশা।

—এ ছাড়া অন্য কোনও পথ নেই?

—না। কারণ জায়গাটা নেহাত কাছে নয় যে অন্য কোনও ভাবে ব্যবস্থা করা যাবে।

—কিন্তু যাদের বিরুদ্ধে আমরা অগ্রসর হচ্ছি, তারা ত সাধারণ শ্রেণীর লোক নয়। তাদের সুগঠিত শক্তি যে কতো বড় তা বোঝা যাচ্ছে মিঃ আয়েঙ্গারের মৃত্যুতে।

—কেন?

—কারণ সেই সুদূর অঞ্চল থেকে এইখানে এতগুলি হোটেলে অনুসরণ করে শেষ পর্যন্ত তাঁকে হত্যা করা যার তার কর্ম নয়। তারা যে বেশ সুসংবদ্ধ ও কর্মক্ষম তা এ থেকেই প্রমাণিত হয়।

—সে ত নিশ্চয়ই।

—আর তারা যে একজন লোক নয়—বেশ বড় একটা দল, তাও বোঝা যাচ্ছে। ওদের দলের কাজ বেশ নিয়মিতভাবেই এগিয়ে চলেছে।

—আর সে কাজে বাধা দেবার জন্যে ঘটবে আমাদের আবির্ভাব।

—হ্যাঁ, এবার আমাদের মৌলমেন অভিযান পর্ব শুরু হবে। বী রেডি!

এগারো

—যন্ত্রদানব-কবলে—

সামনে, পেছনে, ওপরে শুধু সীমাহীন অফুরন্ত নীলিমার মেলা। মাথার ওপরে মেঘের সারি, দু'পাশে মেঘ, পায়ের নিচে মেঘ। প্রপেলারের ক্ষীণ গর্জনের সঙ্গে সঙ্গে প্লেনখানা আকাশের বুকে উড়ে চলেছে।

প্লেনের মধ্যে বসে রতনলাল, দীপক আর মিঃ মরিসন।

দীপক বলে—ওখানে পৌঁছেই রেঙ্গুন থেকে আমরা যথেষ্ট অ্যালার্ট হয়ে যাব। কি বলেন মিঃ মরিসন?

মিঃ মরিসন বলেন—গভর্নরের কাছ থেকে যে চিঠি আমরা পেয়েছি তাতে রেঙ্গুনের পুলিস কমিশনারের কাছ থেকে যথেষ্ট সাহায্য আমরা পাব বলেই মনে হয়!

—কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা এই যে মিঃ আয়েঙ্গারের কথায় ওঁরা বিশ্বাস করেননি!

—তার কারণ অত্যন্ত সহজ। এখন যুদ্ধের ব্যাপারে সকলেই ব্যস্ত। সকলের মন ওদিকে এমনভাবে নিয়োজিত যে এসব গাঁজাখুরি কথা ভাববার সময় ওঁদের নেই। তা ছাড়া নেহাত প্রমাণ না পেলে, এমন কথা কে বিশ্বাস করে বলুন!

—সে কথা অবশ্য সত্যি।

কয়েকটা মুহূর্ত নিশ্চিন্তে কেটে যায়। একটু পরে দীপক বলে—আচ্ছা, আর এক ঘণ্টার মধ্যেই আমরা রেঙ্গুন পৌঁছাব, তাই না?

—হ্যাঁ।

—ভালই হলো, ওদের কোনও লোক আমাদের এখন ফলো করতে পারবে না। রেঙ্গুন থেকে

উপযুক্ত লোক সঙ্গে নিয়ে আমরা সোজা যাব মৌলমেন। সেখানে গোপনে লোকজন রেখে আমরা তিনজনে গোপন জায়গাটা সারভে করে আসব।

—সেই ভাল। কারণ আগে বেশি লোক দেখলে ওরা সাবধান হয়ে যাবে।

—কিন্তু একটা কথা মিঃ মরিসন। ওরা যদি একবার সেই যন্ত্রদানবের সাহায্যে আমাদের বিরুদ্ধে revolt করে, তবে ওদের আধুনিক বিজ্ঞানের কাছে আমরা হার মানতে বাধ্য।

—সে ত নিশ্চয়ই! তাহলে কিভাবে অগ্রসর হব আমরা?

—সেই জন্যেই ত গোপনে যাচ্ছি। পেছন থেকে আচমকা ওদের আক্রমণ করে আটক করতে হবে। চেষ্টা করতে হবে যাতে এতটুকু খবরও 'লীক্ আউট্' না করে!

—ঠিক বলেছেন আপনি! আমাদের গোপনীয়তার উপরেই নির্ভর করছে আমাদের সাফল্য।

তারপর প্লেন এসে ঘুরতে ঘুরতে নামল রেঙ্গুনের এরোড্রামে। প্লেন থেকে নামল দীপক আর রতন। নামলেন মিঃ মরিসন। সকলে গেলেন রেঙ্গুন পুলিস হেডকোয়ার্টার্সে।

সেখানে দেখা হলো মিঃ কার্টারের সঙ্গে। রেঙ্গুন পুলিস চীফ এবং মিলিটারী এরিয়ার সমস্ত দায়িত্বসম্পন্ন অফিসার মিঃ কার্টার। কোলকাতার পুলিস কমিশনার আর গভর্নরের লেখা চিঠি দুখানা তাঁর হাতে তুলে দেন মিঃ মরিসন।

ঘটনার গুরুত্ব উপলব্ধি করে তিনি বলেন—আপনি একটু বসুন মিঃ মরিসন। আমি এক্ষুণি সমস্ত যোগাযোগ স্থাপন করছি।

দীপক বলল—কিন্তু একটা কথা স্যর!

—বলুন।

—আমাদের এখানে আসার কথা সম্পূর্ণ গোপনীয় থাকবে। সমস্ত খবরটাই গোপন রাখতে হবে। না হলে আমরা হয়ত মারাত্মক বিপদের সামনে গিয়ে পড়ব!

মিঃ কার্টার হেসে বলেন—নিশ্চয়ই। স্পেশাল ট্রেনে আপনারা যাবেন এখান থেকে। আর আমাদের সমস্ত correspondence-ও হবে পুলিস কোডে।

—তবে অবশ্য ভয়ের কিছু নেই। কিন্তু আমাদের ভুললে চলবে না শত্রুপক্ষ কত শক্তিশালী!

—সেজন্যে চিন্তার কিছু নেই মিঃ চ্যাটার্জী। মৌলমেনের পুলিস আর মিলিটারীর সাহায্যে তিন দিনের মধ্যে ওদের সব লোককে অ্যারেস্ট করতে পারবেন।

মিঃ কার্টার টেলিফোনের রিসিভারটা তুলে নেন।

মৌলমেন থেকে আট মাইল দূরে অবজ্ঞাত, অখ্যাত বিরাট ভূমিখণ্ড। পাশাপাশি মাঠের পর মাঠ।

রাত্রির অখণ্ড মৌনতা যেন বিরাট অক্টোপাসের মতো তার বাহুর বেষ্টনীতে সমস্ত অঞ্চলটাকে একটা রহস্য কুহেলিতে ঘিরে রেখেছে।

পৃথিবীর যা কিছু আলো, আনন্দ, কোলাহল সব যেন এই অঞ্চলটার বাইরে এসে বিরাট একটা বাধা পেয়ে থমকে দাঁড়িয়েছে।

দু'দিকে সরু সরু উঁচু নিচু রাস্তা। এমনি একটি রাস্তা ধরে এগিয়ে চলেছিল এরা তিনজনে—দীপক, রতন আর মিঃ মরিসন। রাতের গোপন আঁধারে গা-ঢাকা দিয়ে চলেছে ওদের এই নৈশ অভিসার।

আকাশের অগণন তারা যেন তাদের এই দুঃসাহসিক অভিযান দেখে মুখ টিপে টিপে

হাসছে। আজ তাদের সাফল্যের ওপরেই নির্ভর করছে সভ্য জগতের জীবন-মৃত্যু। সভ্য দুনিয়ার ধ্বংস অথবা অগ্রগতি।

ওরা নিঃশব্দে এগিয়ে চলে।

আঁকাবাঁকা পথ পেরিয়ে উঁচুনিচু রুক্ষতার বাধা পেরিয়ে নিঃশব্দে এগিয়ে চলে ওরা তিনজন। সভ্য পৃথিবীর তিনজন দুঃসাহসী সৈনিকের মৌলমেন অভিযান।

ঝম্ ঝম্ ঝম্...

বহুদূর থেকে কিসের শব্দ ভেসে আসে।

দীপক দূরবীন দিয়ে ভাল করে চেয়ে দেখে। রতনলালও বাইনোকুলার চোখে লাগিয়ে দেখে। কিন্তু এমন কিছু চোখে পড়ে না, যা দেখে সত্যিকারের কোনও ধারণা মনে বাসা বাঁধে।

—হল্ট্! মিঃ মরিসন বলে ওঠেন।

তিনজনেই থমকে দাঁড়ায়। কান পেতে শুনতে চেষ্টা করে ওই অদেখা অচেনা শব্দ। কি ওর উৎস? কোত্থেকে আসছে ওই অদ্ভুত আওয়াজ?

ঝম্ ঝম্ ঝম্...

কাছে—আরও কাছে। পৃথিবী কাঁপছে যেন সেই শব্দে। ভয় পেয়ে কম্পমান হয়ে উঠেছে আকাশের তারারা।

—কে ওরা? হু আর দে? মিঃ মরিসন যেন গর্জন করে ওঠেন।

কিন্তু তাঁর কথায় মনোযোগ দেয় না কেউ। এগিয়ে আসে বিশালকায় একটি লৌহনির্মিত যন্ত্র। তার সারা দেহ লোহার তৈরী। শুধু মাঝখানে একটি অংশে একটা নীল আলো জ্বলছে।

—ফায়ার! মিঃ মরিসন বলে ওঠেন।

সঙ্গে সঙ্গে তিনটি পিস্তল একসঙ্গে গর্জন করে ওঠে। একসঙ্গে কতকগুলি গুলি ছুটে যায় লৌহযন্ত্রদানবটির দিক।

কিন্তু তাতে ওর কোনও ক্ষতি হয় না। বিরাট একঝলক আলোয় সারা অঞ্চলটা যেন দিনের মতো স্পষ্ট হয়ে যায়।

আবার গুলি ছোড়ে এরা তিনজন।

যন্ত্রদানবটি এগিয়ে আসে ওদের দিকে। কাছে—আরও কাছে। তিনজনে প্রাণপণে পালাবার চেষ্টা করছে। কিন্তু যন্ত্রদানবের মধ্যে থেকে একটি লম্বা টিউব বেরিয়ে আসে। একটির পরে একটি গাঁটের মতো সাজানো যেন।

সবার প্রথমে মিঃ মরিসনকে চেপে ধরে শূন্যে তুলে নেয়। মিঃ মরিসন জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়েন।

বারো

—বৈজ্ঞানিক মিঃ চৌধুরী—

মৌলমেন থেকে আট মাইল দূরে ভূগর্ভস্থ এক আলো-অন্ধকার-ঘেরা কক্ষের মধ্যে ধীরে ধীরে জ্ঞান ফিরে পেল দীপক, রতন আর মিঃ মরিসন। ভাল করে চেয়ে দেখল সে কক্ষের মধ্যে তারা পাঁচজন। মহিম আর সুনীতিও বন্দী অবস্থায় সে কক্ষের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে।

প্রত্যেকের হাত দৃঢ়ভাবে বাঁধা।

দরজায় পাহারা দিচ্ছে বিরাট একটা যন্ত্রদানব। দীপক ভাল করে তাকিয়েও তার দেহের সবটুকু দেখতে পেল না। কেমন যেন একটা অজানা রহস্যময়তায় ঘেরা তার সারা দেহ।

—সুপ্রভাত, এতক্ষণে তাহলে জ্ঞান ফিরেছে আপনাদের!

অজানা কণ্ঠস্বরে তারা চমকে উঠল। ভাল করে তাকিয়ে দেখে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করেছেন দীর্ঘদেহ এক ভদ্রলোক। প্রৌঢ়, সারা মুখে একটা অজানা ভয়ের সংকেত লুকানো যেন।

—মিঃ চৌধুরী! আপনি এখানে? মিঃ মরিসন বলে ওঠেন।

—হ্যাঁ। নতুন দিনের প্রত্যাশাতেই আমি অপেক্ষা করছি। চলছে আমার সাধনা। এক হাজার যন্ত্রদানব তৈরীর সাধনা। সেদিন মাত্র তিনটে আপনারা দেখেছেন। ওই রকম এক হাজারটি তৈরী কববার জন্যে আমার কাজকর্ম চলেছে দিনের পর দিন। ওই শুনুন, দূর থেকে ফ্যাক্টরীর আওয়াজ ভেসে আসছে।

—কতগুলি আজ পর্যন্ত তৈরী করেছেন আপনি? দীপক প্রশ্ন করে।

—পাঁচশো আজ পর্যন্ত আমি তৈরী করেছি।

—তারা সব কোথায়?

—তাদের সব অংশগুলো খুলে স্টোর-রুমে রাখা আছে। মাত্র তিনটি ফিট্ করে কাজ চালাচ্ছি। প্রয়োজনের সময় সবগুলি যন্ত্রদানব ব্যবহার করতে পারব।

—এক হাজার যন্ত্রদানব তৈরী করতে কতদিন সময় লাগবে আপনার?

—বড় জোর আর তিন-চার সপ্তাহ। আর শুধু যন্ত্রদানবই নয়, যে মারণরশ্মি আমি সৃষ্টি করেছি তার আলোয় পাঁচ মাইলের মধ্যে যা-কিছু থাকবে সব পুড়ে ভস্মসাৎ হয়ে যাবে। এই দুটি বৈজ্ঞানিক অবদানের সাহায্যে আমি হব পৃথিবীর অধীশ্বর!

—কিন্তু আপনার এ আবিষ্কারের কথা সভ্যজগৎকে জানান না কেন?

—সভ্যজগৎ? সভ্য বলতে আপনি কি বোঝেন?

—শিক্ষা-দীক্ষা জ্ঞানে যারা অগ্রণী।

—আজকের দুনিয়ায় কার মধ্যে রয়েছে শিক্ষার আলো? কার মধ্যে রয়েছে প্রকৃত সভ্যতা? ও কথাটা শুধু বিরাট একটা ধাপ্পা। চালবাজি। সভ্যতার নামে চলেছে গোপনে পৃথিবী-জোড়া হিংসা-যজ্ঞের প্রস্তুতি। কিন্তু আমি তা হতে দেব না! আমি বৈজ্ঞানিক চৌধুরী বলছি, দিস্ ইজ্ মাই ডিক্লেয়ারেশন টু দি ওয়ার্লড্...হিংসা-যজ্ঞের জন্যে যে দু' পক্ষ অস্ত্র শানাচ্ছে তারা দু' পক্ষই এসে নতজানু হয়ে আমার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করবে।

আমার তৈরী যন্ত্রদানবকে আপনারা দেখেছেন। বন্দুকের গুলি তাদের কোনও ক্ষতি করতে পারে না। কামান, মেশিনগান তার কাছে খেলনা। এরোপ্লেনের বোমা তার কাছে তুচ্ছ। তারা অজর, অমর, অক্ষয়। মারণরশ্মি নিয়ে আমার তৈরী যন্ত্রদানবেরা যখন দিক থেকে দিগন্তরে ছুটে যাবে তখন কারও ক্ষমতা থাকবে না আমার কাজে বাধা দেয়।

—আমরা শুনেছিলাম আপনি মারা গেছেন মিঃ চৌধুরী। কিন্তু ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের কাছ থেকে পালিয়ে এখানে এসে এক দস্যুর সঙ্গে মিতালি করেছেন কেন?

—কারণ সে দস্যুর দলের দশ-বারোজন লোক আর আমার পাঁচ-সাতজন অনুচর মিলে চলবে আমাদের কার্যপদ্ধতি। আমি একা এক হাজার যন্ত্রদানবকে রেগুলেট করতে পারব না। নতুন দিনে, সুসভ্য পৃথিবীতে যেদিন শান্তিস্থাপনের সময় আসবে সেদিনও আমাকে সাহায্য করবে ওরা। তাই ওদের সাহায্য আমার অবশ্য প্রয়োজনীয়। তোমাদের জাপান আর ইংরেজ, জার্মানী আর ফ্রান্স, আমেরিকা আর সোভিয়েট যে যতই শক্তিশালী হোক না কেন তাদের

প্রত্যেককেই অনাগত দিনে surrender করতে হবে আমার বৈজ্ঞানিক শক্তির কাছে। আমার অপ্রতিহত গতির কাছে। সেদিন সারা দুনিয়ায় শান্তি স্থাপন করা অবশ্য কর্তব্য হয়ে উঠবে।

দীপক কোনও কথা বলে না। মিঃ মরিসন নিশ্চুপ।

মিঃ চৌধুরী বলেন—তাহলে চলি ব্রাদার্স। তোমরা বিশ্রাম কর কিছুক্ষণের জন্যে যতদিন না আমার বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাজ শেষ হয়!

মিঃ চৌধুরী কিছু বলবার আগেই ঘরের সামনে এসে ঝম্ ঝম্ করতে থাকে একটি যন্ত্রদানব। একটি বিরাট ট্রে নামিয়ে রাখে। তার ওপর পাশাপাশি সাজানো পাঁচ থালা খাবার।

...তোমরা তাহলে খাওয়াদাওয়া শেষ কর। আমি যাই।

মিঃ চৌধুরী ঘর থেকে বেরিয়ে যান।

* * *

অশান্ত যান্ত্রিক শব্দে কারখানা চলেছে। শব্দ হচ্ছে ঝম্ ঝম্...ঘস্ ঘস্...শোঁ শোঁ...প্রতিটি মুহূর্তে বর্তমান সভ্যজগৎ যেন কোন্ একটা অশুভ ধ্বংসের দিকে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে।

ঘরের মধ্যে বন্দী ওরা পাঁচটি প্রাণী। ওরা পাঁচজন শুধু এই বিরাট ধ্বংসের আসন্ন যজ্ঞের একমাত্র সাক্ষী। সীমাহীন আবেগ ওদের বুকে ফেনিয়ে ওঠে। কিন্তু কিছু করবার ক্ষমতা নেই। ওরা ক্ষমতাহীন। শ্রান্ত। পর্যুদস্ত।

দিনের পর রাত নামে। বাতের পর দিন। সেকেণ্ড মিনিট ঘণ্টা করে সময় এগিয়ে চলে দ্রুতগতিতে। সৃষ্টি বুঝি দ্রুত ছুটে চলে আসন্ন বিরাট ধ্বংসের দিকে।

ঘরের মধ্যে শোনা যায় অস্ফুট পদশব্দ।

মুখ তুলে তাকায় ওরা পাঁচজন। ঘরের মধ্যে প্রবেশ করেছে দীর্ঘদেহ একজন লোক। পরনে কালো পোশাক। মুখে কালো আবরণ।

—কে? কে তুমি? দীপক প্রশ্ন করে।

—আমি বজ্রভৈরব। আমাকে তোমরা নিশ্চয়ই ভুলে যাওনি বন্ধু?

—কি চাও তুমি? মিঃ মরিসন গর্জে ওঠেন।

—কিচ্ছু না। শুধু তোমাদের সঙ্গে আমার পুরোনো বন্ধুত্ব স্মরণ করেই আসতে হলো আমাকে। যে বজ্রভৈরবকে একদিন তোমরা শয়তান দস্যু বলে উপহাস করেছ, ঘৃণা করেছ, করেছ অবহেলা, সে-ই হতে চলেছে আগামী পৃথিবীর একমাত্র পরিচালক। আগামী দিনের দুনিয়ার আজ্ঞাকারী একচ্ছত্র সম্রাট্।

ওই যে মেশিনের শব্দ শুনতে পাচ্ছ ওতে তৈরী হচ্ছে বিরাট সব যন্ত্রদানবের শরীরের এক একটি অংশ। আমার ধ্বংসযজ্ঞ হবে ওদের সাহায্যে। তারপরে আসন্ন পৃথিবীর সম্রাট্ হবে যে লোকটি সে তোমাদের সামনে দাঁড়িয়ে।

সেদিন আর মিঃ মরিসন কিংবা দীপক সৈন্যদল নিয়ে আমাকে আক্রমণ করতে আসবে না। সেদিন আমার হুকুমমতোই কাজ করবে সমস্ত পৃথিবীর লোক।

দীপক বাধা দিয়ে বলে ওঠে—কিন্তু এসব ত করছেন বৈজ্ঞানিক মিঃ চৌধুরী, তুমি ত তাঁর আজ্ঞাবাহক মাত্র।

বজ্রভৈরব হো হো করে হেসে বলে ওঠে—ভুল বন্ধু, ভুল! যতদিন আমার কাজ শেষ না হচ্ছে, যতদিন যন্ত্রদানবের সহায়তায় দুনিয়া জয়ের গৌরব অর্জন করতে না পারছি ততদিন আমি থাকব মিঃ চৌধুরীর আজ্ঞাবাহক হয়ে। কিন্তু তারপর? বৈজ্ঞানিক আর বিশ্বাসঘাতক মিঃ আয়েঙ্গারকে নিশ্চয়ই ভুলে যাওনি তোমরা। তেমনি করেই আমি আমার সম্মুখ থেকে বাধা সরিয়ে দিতে জানি।

যেদিন সারা পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে পড়বে আমাদের একচ্ছত্র প্রভাব সেদিন কি করে মিঃ চৌধুরী আর তাঁর পাঁচজন অনুচরকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে হয় তা আমার জানা আছে। এত কষ্টে ওদের বন্দী করে, গুপ্তধন সংগ্রহ করে, আমার সমস্ত সঞ্চিত অর্থ ব্যয় করে এই যে বিরাট কাজ নিয়ে এগোচ্ছি এর ফল ভোগ করবে শুধু একজন। একজনকে বেঁচে থাকতে হবে সেদিন। আর একজনকে সরে যেতে হবে পথ ছেড়ে। কিন্তু যতদিন বৈজ্ঞানিক গবেষণা চলবে ততদিন মিঃ চৌধুরীকে আমার প্রয়োজন!

—মিঃ চৌধুরীকে কি তুমি বোকা বলে মনে কর? দীপক প্রশ্ন করে।

—নিশ্চয়ই! এ পৃথিবীতে হচ্ছে 'সারভাইভ্যাল অব্ দি ফিটেস্ট', যে উপযুক্ত সেই বেঁচে থাকবে। বুদ্ধিতে আমি শ্রেষ্ঠ তাই...

—না বন্ধু, বুদ্ধি তোমার একচেটে সম্পত্তি নয়—আমার ঘটেও বুদ্ধি কিছু আছে। তোমার প্যাঁচ আমি আগেই বুঝতে পেরেছিলাম। শুধু অপেক্ষা করছিলাম সুযোগের জন্যে।

বজ্রভৈরব মুখ তুলে দেখে দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে বৈজ্ঞানিক মিঃ চৌধুরী। তিনি বলেন—তোমার ষড়যন্ত্র বুঝতে পেরেই তোমার ওপর নজর রেখেছিলাম আমি। বজ্রভৈরব, তোমার আজ রক্ষা নাই।

বজ্রভৈরব এক লাফে বাইরে বেরিয়ে আসে। কিন্তু তার আগে মিঃ চৌধুরী সামনের যন্ত্রদানবের কি একটা সুইচ টিপে দেন। যন্ত্রদানব ধেয়ে যায় বজ্রভৈরবের দিকে।

বজ্রভৈরব হো হো করে হেসে ওঠে প্রচণ্ড অট্টহাসি। তারপর কোমর থেকে রিভলভার বের করে সে যন্ত্রদানবের দেহের মাঝামাঝি যে জায়গা থেকে নীল আলো বের হচ্ছিল, সেখানে গুলি করে।

ঝন্ ঝন্...

যন্ত্রদানব বিকল হয়ে পড়ে যায়। বজ্রভৈরব বলে ওঠে—আমি জানি মিঃ চৌধুরী, তোমার যন্ত্রদানবের দুর্বল অংশ হচ্ছে ওখানে। ঠিক ওই যে অংশ কাচ দ্বারা আবৃত তার নিচেই রয়েছে 'মেন্ স্প্রিং'। কাজেই পৃথিবীজয়ী তোমার যন্ত্রদানব আমার কোনও ক্ষতিই করতে পারবে না।

ক্রোধে ফুলতে ফুলতে মিঃ চৌধুরী বজ্রভৈরবকে একখানা ছোরা ছুড়ে মারেন।

ছোরাটা এসে পড়ে ঘরের মধ্যে। বজ্রভৈরব একপাশে সরে দাঁড়ায়। তারপর সে মিঃ চৌধুরীর দিকে গুলি করবার জন্যে রিভলভার তোলে। কিন্তু মিঃ চৌধুরী তার আগেই এক লাফে দূরে গিয়ে পড়েন।

বজ্রভৈরব তাঁকে অনুসরণ করবার জন্যে সেইদিকেই ছুটে যায়। ভেসে আসে অস্ফুট কোলাহল।

তেরো

—অবশেষে—

বাইরে অশান্ত কোলাহল। হট্টগোল। চীৎকার।

দু' পক্ষে তুমুল লড়াই শুরু হয়েছে।

ভেতরে ওরা পাঁচজন। মিঃ চৌধুরীর ছুড়ে দেওয়া ছোরাটা দিয়ে বাঁধন কাটতে ওরা ব্যস্ত।

একে একে বাঁধন কেটে চলে দীপক। সবার আগে নিজের। তারপর রতন, মিঃ মরিসন, সুনীতি, মহিম।

বাইরে তখন ঘন ঘন পিস্তলের শব্দ শোনা যাচ্ছে। মিঃ চৌধুরী চীৎকার করে ওঠেন—আমার এ স্থান আমি ধ্বংস করছি। আগুন লাগিয়ে দিয়েছি চারদিকে। আই উইল ডেস্ট্রয় এভ্‌রিথিং। কোনও শয়তানের হাতে এসব যেতে দেব না।

গুড়ুম্, গুড়ুম্...

ঘন ঘন পিস্তলের শব্দ।

—ফায়ার! মিঃ চৌধুরী গর্জে ওঠেন।

আবার পিস্তলের শব্দ ভেসে আসে।

দেখতে দেখতে জ্বলে ওঠে আগুনের লেলিহান শিখা। ভয়াবহ আগুনে ভূগর্ভস্থ কক্ষ জ্বলে ওঠে। যুগ যুগ ধরে যা-কিছু সঞ্চিত ছিল এখানে সব যেন আজ ধ্বংস হতে চলেছে।

ওরা পাঁচজন বাইরে বেরিয়ে আসে।

মিঃ চৌধুরী সাংঘাতিক আহত। মুমূর্ষু। তাঁর পাঁচজন সঙ্গী ও বজ্রভৈরবের সঙ্গীরাও আহত। কিন্তু আসল বজ্রভৈরবকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না।

নিশ্চল, স্থির যন্ত্রদানব পড়ে আছে। তিনটি। পাশাপাশি। সেদিকে চেয়ে মিঃ মরিসন বলেন—এতদিনে আতঙ্কের অবসান হলো। চলুন আমরা বাইরে যাই মিঃ চ্যাটার্জী। বজ্রভৈরবকে এক্ষুণি ধরতে হবে। আর আগুন যেমন বেগে জ্বলে উঠছে, তাতে একমুহূর্তও দাঁড়ানো নিরাপদ নয়।

দীপক বলে—কিন্তু মিঃ চৌধুরীকে এখান থেকে নিয়ে যাওয়া উচিত।

—কেন?

—হাজার হলেও তিনি প্রতিভাবান। শয়তান হলেও তাঁর মধ্যে ছিল ব্যক্তিত্ব। প্রতিভা। তাঁকে সম্মান দেখানো আমাদের কর্তব্য।

মিঃ চৌধুরীর মৃতদেহটা নিয়ে ওরা পাঁচজনে ধীরে ধীরে সুড়ঙ্গপথ বেয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে।

মহিম বলে—এতদিনে বোঝা গেল ভগবান সত্যিই দয়াময়। পৃথিবীব্যাপী শয়তানের রাজত্ব তিনি কোনমতেই সহ্য করতে পারেন না।

বজ্রভৈরবকে খুঁজে পাওয়া গেল না।

দীপক মিঃ চৌধুরীর দেহটা মাটিতে পুঁতে ওপরে একটা পাথরের ফলক লাগিয়ে দিল। তাতে লেখা ঃ

এখানে শুয়ে আছেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক। কিন্তু প্রতিভার অপচয়ের জন্যে ভগবানের বিচারে ওঁকে অপঘাত-মৃত্যু বরণ করতে হয়েছে। আগামী দিনের পৃথিবীর মানুষ যেন ওঁর উদ্দেশ্যে সহানুভূতির অশ্রু ফেলে।

তারপর অজস্র সুখ্যাতি আর বিজয় অভিযানের সফলতার আনন্দের মধ্য দিয়ে ওরা তিনজন রওনা হলো পরবর্তী প্লেনে ভারতের দিকে। মহিম আর সুনীতি কিন্তু বর্মাতেই রইল। তাদের এত সাধের জমি ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে তারা প্রস্তুত নয়।

—শেষ—

হারানো ডায়েরী

এক

—রতনের ডায়েরী—

আমার বন্ধু প্রখ্যাত গোয়েন্দা দীপক চ্যাটার্জীর জীবনের অনেক বিচিত্র রহস্যপূর্ণ ও জটিল ঘটনাবলীর অত্যন্ত চমৎকার ও রোমাঞ্চকর সমাধানের খবর আপনারা পড়েছেন সংবাদপত্রে। আজ আমি আমার বন্ধুর অনুরোধে অত্যন্ত রহস্যপূর্ণ ও নতুন ধরনের কয়েকটি কেসের সুসমাধানের চমকপ্রদ ইতিহাস আপনাদের শোনাচ্ছি।

এই সব কেসের ইতিহাস আমার ডায়েরীতে লেখা থাকে। ডায়েরীর ভাষায় হুবহু আমি সে সব ঘটনাগুলি তুলে ধরছি আপনাদের সাম্‌নে।

১৩ই আগস্ট, ১৯৫১।

উজ্জ্বল শুভ্র প্রভাত। শারদ-দিবার অকলঙ্ক হাসি মানুষের মনকে খুশির আমেজে ভরিয়ে তোলে।

এমনি সুন্দর সকালকে চা আর সিঙাড়া সহযোগে আমরা আরও মধুময় করে তোলবার আয়োজন করেছিলাম। দোতলার ব্যালকনিতে বসে আমরা খাবারের প্লেট আর ধূমায়মান চা সহযোগে আমাদের আনন্দটিকে চিরস্থায়ী করে তোলবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলাম।

দীপকের হাতে ছিল সেদিনের সংবাদপত্র।

সে সংবাদপত্রের প্রতিটি লাইন চা-পানের রসে সিক্ত করে করে উপভোগ করছিল। সেদিক থেকে দীপককে সংবাদপত্র পাঠ-বিলাসী বলা যেতে পারে অনায়াসেই।

অকস্মাৎ খবরের কাগজের ওপর থেকে মুখখানা তুলে দীপক বলে উঠল—চমৎকার! এক্‌সেলেণ্ট, আমি তোমাকে অভিনন্দন জানাই ডাঃ সিন্‌হা—তোমাকে আমি জানাচ্ছি আমার অন্তরের শুভেচ্ছা।

অবাক বিস্ময়ে আমি প্রশ্ন করি—কে ডাঃ সিন্‌হা? কোথায় ডাঃ সিন্‌হা?

দীপক ঠাট্টার সুরে বলে—এই খবরের কাগজের পাতায়। তোদের আগেই বলেছি যে, আমার খবরের কাগজ পড়ার পদ্ধতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। তোরা যে ভাবে খবরের কাগজ পড়িস, আমি আসলে সেই সব খবরগুলিই এড়িয়ে যাই। আমার নজর থাকে ভিন্ন ধরনের খবরের দিকেই!

—আমি ত তোর নাম দিয়েছি তাই নিউজপেপার ডাইজেস্ট, আমি হাসতে হাসতে বলি—এখন দেখি খবরের কাগজের পাতায় ডাঃ সিন্‌হা সম্বন্ধে কি খবর বের হয়েছে।

আমি এগিয়ে গিয়ে খবরের কাগজের পাতায় মনঃসংযোগ করি।

সেদিনের কাগজে একটা বিজ্ঞাপন বের হয়েছিল। দীপক সেদিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

আমি বেশ ভাল করে সেদিকে চেয়ে বিজ্ঞাপনের প্রতিটি লাইন বেশ মনোযোগ দিয়ে পড়ে ফেলি। ক্লাসিফায়েড বিজ্ঞাপনের কলমে বের হয়েছিল বিজ্ঞাপনখানা ঃ

দীর্ঘদিনের চেষ্টায় ও যত্নে আমি যে একটি সম্পূর্ণ নতুন ধরনের অস্ত্রোপচারবিদ্যায় সফলতা লাভ করেছি, তা সাধারণ মানুষের ধারণার সম্পূর্ণ বাইরে। 'সার্জারী' বিদ্যা আজ যেন এক যুগ এগিয়ে গেছে। সেই বিদ্যার ওপর নির্ভর করে আমি 'এক্সপেরিমেণ্ট' করে চলেছিলাম দিনের পর দিন। সৌভাগ্যের বিষয় আজ আমি আমার পরীক্ষায় সফলতা অর্জন করেছি।

যদি কোনও মানুষের চোখ অল্পদিনের মধ্যে হঠাৎ কোনও কারণে অন্ধ হয়ে যায়, তবে আমি সদ্য-মৃত কোনও লোকের চোখ তাঁর চোখে অপারেশনের সাহায্যে সংযুক্ত করে তাঁর দৃষ্টি ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হবো। চোখের প্রধান অপ্‌টিক্ নার্ভ এবং আইবল্ অন্যান্য নার্ভ এবং শিরা সমেত অপারেশন করে বের করে এনে অন্ধ লোকের চোখে বসিয়ে তাঁর দৃষ্টি ফিরিয়ে আনব বলে মনে করি। যদি কোনও অন্ধ ব্যক্তি তাঁর দৃষ্টি ফিরে পেতে চান, আমার সাহায্য গ্রহণ করতে পারেন। অবশ্য আমি দৃষ্টি ফিরে পাওয়ার গ্যারাণ্টি দিতে পারি না। তবে তাঁদের দৃষ্টি ফিরে পাবার যথেষ্ট সম্ভাবনা যে রয়েছে এ কথা নিশ্চিত।

সার্জারী যে এতটা এগিয়ে গেছে এটা যাঁরা বিশ্বাস করতে চান না, তাঁরা আমার সঙ্গে দেখা করলেই বুঝবেন, এটাকে আমি কতটা সম্ভব করে তুলেছি। আমেরিকান জার্ণালে 'আই গ্রাফ্‌টিং' সম্বন্ধে আর্টিক্‌ল হয়ত অনেকেই পড়েছেন, কিন্তু আমি যে এ বিষয়ে এতটা এগিয়ে গেছি তা হয়ত অনেকেই জানেন না। তাঁদের বিশ্বাসের জন্যে আমি জানাচ্ছি যে, আমি এ বিষয়ে অনেক বেশি অগ্রসর হয়েছি। এখন সাফল্য নির্ভর করছে আমার অপারেশনের ওপর।

আশা করি জনসাধারণ উপযুক্ত সুযোগদান থেকে আমাকে বঞ্চিত করবেন না।

সুদীর্ঘ এই বিজ্ঞাপনখানা আগাগোড়া পড়ে আমি দীপকের দিকে চেয়ে বললাম—কিরে এতটা কি সত্যিই সম্ভব?

দীপক গম্ভীরকণ্ঠে বলে—আমি এটাকে মোটেই অসম্ভব বলে মনে করি না। এই ডাঃ সিন্‌হাকে আমি চিনতাম। সত্যি কথা বলতে গেলে উনি ছিলেন একজন নীরব সাধক। ছিলেন সলেম্ ওয়ার্কার। আজীবন তাঁর কেটেছে কঠোর বিজ্ঞানের সাধনায়।

বিলেতে তিনি বিপুল সমাদর পেয়েছিলেন তাঁর তীক্ষ্ণবুদ্ধির জন্যে—তাঁর বিচারবুদ্ধির প্রখরতা ও দৃষ্টিশক্তির তীক্ষ্ণতার জন্যে। সেখান থেকে তিনি ফিরে এলেন এদেশে সেখানকার সার্জারীর সর্বোচ্চ ডিগ্রী লাভ করে।

কিন্তু এখানে ফিরে এসে তিনি তাঁর বিদ্যাকে সাধারণ অস্ত্রোপচারচর্চার পেছনে ব্যয়িত না করে সুরু করলেন নীরব সাধনা। কঠোর সাধনার মধ্য দিয়ে কাটতে থাকে তাঁর প্রতিটি মুহূর্ত। আর আমি জানতাম তাঁর চর্চার বিষয় ছিল অফ্‌থ্যাল্‌মোলজী—চক্ষুবিষয়ক অস্ত্রচিকিৎসা।

অসংখ্য পশুর চোখ নিয়ে তিনি এই চর্চা করতে সুরু করেন। তাঁর থিয়োরীও ছিল বড় চমৎকার। কোনও মানুষের মৃত্যুর পর কয়েক ঘণ্টা তার চোখের বিভিন্ন কোষগুলো জীবন্ত থাকে। তাই মৃত্যুর পর অল্পসময়ের মধ্যে যদি সেই চোখটি অপারেশনের সাহায্যে বের করে নিয়ে জীবন্ত অন্ধ লোকের চোখের পরিবর্তে বসানো যায়, তবে সে দৃষ্টি ফিরে পাবে। ইতিপূর্বে ইনি কুকুর, বানর, ছাগল ইত্যাদি বিভিন্ন জন্তুর উপরে এই পরীক্ষা চালাচ্ছিলেন। আজ তিনি যে সফল হয়েছেন তা বুঝতে পারছি এই বিজ্ঞাপন দেখে। যদি এখন তিনি সত্যিই কোনও অন্ধ মানুষকে এভাবে সারিয়ে তুলে তাঁর পরীক্ষাকে সফল করে তুলতে পারেন তবে এটা হবে বিজ্ঞানের একটা মস্তো বড় দান, সে সম্বন্ধে আমি নিঃসন্দেহ।

কথাশেষে দীপকের কণ্ঠস্বর অত্যন্ত গম্ভীর শোনায়। তারা সারা মুখে যেন ফুটে ওঠে আনন্দের আলো।

দীপকের কথা শুনে আমি বুঝতে পারি যে এ ধরনের অপারেশন সম্বন্ধে দীপকের কৌতূহলও নেহাৎ কম নয়। তার জ্ঞানের গভীরতা সত্যিই আমাকে যথেষ্ট অভিভূত করে। কিন্তু কে জানত এই ঘটনাই নূতনতর ঘটনা-সংঘাতের দিকে আমাদের এগিয়ে নিয়ে যাবে?

দুই

—মৃতের চোখ—

পৃথিবীতে এমন অনেক কিছুই ঘটে যা সাধারণ মানুষ পূর্বাহ্নে ধারণা পর্যন্ত করতে পারে না।

ঠিক এমনি ঘটনা ঘটেছিল ডাঃ সিন্‌হার জীবনেও। মস্তো বড়ো একজন সার্জন তিনি। বিলেতে থাকতে প্রচুর সুনাম তিনি অর্জন করেছিলেন। চোখের বিষয়ে তিনি চিরদিনই ছিলেন আগ্রহশীল—কত বিনিদ্র রাত যে তাঁর অক্ষিগোলক, রেটিনা, চোখের ধমনী আর অপ্‌টিক নার্ভ-এর সম্বন্ধে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে গবেষণায় কেটেছে তা সাধারণ মানুষ ধারণা করতেও পারবে না।

বিলেত থেকে যেদিন তিনি সসম্মানে ফিরে এলেন অনেকগুলো ডিগ্রীর সম্মান বহন করে, সেদিন এ দেশের লোকেরা ভেবেছিল যে তিনি বোধ হয় কোনও হাসপাতালে যোগদান করে আজীবন চোখ অপারেশনের আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত পন্থাগুলি সাধারণ মানুষের ওপর এক্সপেরিমেণ্ট করবেন এবং তাতে দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হবে।

কিন্তু ডাঃ সিন্‌হা ছিলেন অন্য প্রকৃতির মানুষ।

সাধারণ গতানুগতিক আই-সার্জারীর বিভিন্ন পদ্ধতিগুলো ত সকলেই জানে!

তিনি চাইলেন এগিয়ে যেতে। আরও উন্নতি করতে। আরও নানা কর্মপদ্ধতির মাধ্যমে সার্জারীতে এমন কিছু দান করতে যা ইতিপূর্বে কখনও সম্ভব হয়নি।

তিনি যখন তাঁর নতুন থিয়োরী নিয়ে গবেষণা করবেন বলে স্থির করে ফেললেন, তখন সাধারণ মানুষ তাঁর এই অদ্ভুত পাগলামি নিয়ে নানা মন্তব্য করতে লাগল।

মৃত মানুষের চোখ আবার জ্যান্ত হয়ে ওঠে নাকি!

অন্ধ আবার দেখতে পাবে কি করে!

প্রকৃতির নিয়মের বিরুদ্ধে যেতে মানুষ কোনও দিন পারে না!

বন্ধুবান্ধবেরা এই ভাবে তাঁর সম্বন্ধে নানা মন্তব্য প্রকাশ করতে সুরু করলেন।

দু-একজন ডাক্তার বন্ধুকেও তিনি তাঁর জীবনের এই আদর্শের কথা খুলে বললেন।

তাঁরা শুনে বললেন—এতটা সম্ভব হয়ত কল্পনায় হতে পারে, বাস্তবে নয়!

ডাঃ সিন্‌হা প্রশ্ন করেন—কেন?

ডাক্তার বন্ধুরা বলেন—যে সমস্ত স্নায়ু চোখের পেশীকে supply করছে তাদের ঠিকমতো এতে মুখে মুখে জুড়ে দিতে হবে। তারপর অজস্র ধমনী আর শিরা—অবশেষে পেশী—এতগুলো ঠিকমতো মুখে মুখে জুড়ে দিয়ে সম্পূর্ণ অপারেশন সফল করে তোলা প্রায় অসম্ভব বলা যেতে পারে। তারপর আর একটা কথা। মৃত চোখটিকে জীবিত রাখতে হবে দীর্ঘক্ষণ।

সেজন্যে সেই রকম টিসু নিউট্রিশন্ মিডিয়াম-এর সৃষ্টি করতে হবে এবং উপযুক্ত তাপে সেই টিসুকে জীবন্ত রাখতে হবে।

ডাঃ সিন্‌হা হেসে বললেন—মানুষই ত যুগে যুগে অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলেছে। বিজ্ঞানের সীমান্তরেখা দিনের পর দিন বেড়ে চলেছে—যতো বিজ্ঞান এগিয়ে যায়, তার সীমাও ততো এগিয়ে চলে। বৈজ্ঞানিকরাই যুগে যুগে সেই নব নব সীমান্তিক। তাঁরাই এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে অগ্রদূত হয়ে জন্মান!

ডাক্তার বন্ধুরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করেন—লোকটা একটা হাম্‌বাগ! বিলেত থেকে বড়ো বড়ো কয়েকটা ডিগ্রী নিয়ে ফিরে এসে যেন ধরাকে সরা জ্ঞান করছে।

—কিন্তু যাই বলো, ওর এ চেষ্টাকে নিশ্চয়ই সমর্থন করা উচিত। কোন বন্ধু হয়ত বলেন।

—নিশ্চয়ই নয়। অন্যজন ফোড়ন কাটেন—বরং কোন হাসাপাতালে যোগদান করলে জাতি ওর কাছ থেকে কিছু উপকার পেত!

এইভাবে দিনের পর দিন যখন ডাঃ সিন্‌হার বিরুদ্ধে নানা মন্তব্যে তাঁর বন্ধুবান্ধবেরা মুখর হয়ে ওঠেন, তখন একজন লোক কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে বিরাট উচ্চ ধারণা পোষণ করতে থাকেন।

তিনি হচ্ছেন ডাঃ সিন্‌হার আবাল্য বন্ধু, বিরাট ধনী জমিদার হরশঙ্কর মিশ্র।

দুজনের বন্ধুত্ব আবাল্য। ডাঃ সিন্‌হার ইচ্ছা শুনে একথাও তিনি তাঁকে উৎসাহ দিয়ে বলেন—তুমি ত রিসার্চ চালাও। যদি কখনও সফল হতে পার, তোমার নামে সারা পৃথিবী শ্রদ্ধায় মাথা নত করবে। তোমার এ রিসার্চ চালাতে যা খরচ হবে সে সম্পূর্ণ টাকা আমি তোমাকে দেব। আমার কাছে টাকা চাইতে তুমি কোন দিনই কুণ্ঠিত হয়ো না।

আজ ডাঃ সিন্‌হার জীবনে তাঁর বন্ধু হরশঙ্কর মিশ্র যেন একটি জ্বলন্ত প্রদীপ। আশার ধ্রুবতারা। নতুন আশায় একমাত্র তিনিই সেদিন ডাঃ সিন্‌হার হৃদয়কে সঞ্জীবিত করে তুলেছিলেন।

সে আজ আঠারো বছর আগেকার ঘটনা।

তারপর দিনের পর দিন কেটে গেছে।

মাসের পর মাস।

বছরের পর বছর।

ডাঃ সিন্‌হা তাঁর একনিষ্ঠ সাধনা থেকে এতটুকুও বিচ্যুত হননি। সারাদিন তাঁর কাটে ল্যাবরেটারী রুমে। দিনের শেষে দু' ঘণ্টা বিশ্রাম।—তারপর আবার নতুন এক্সপেরিমেণ্টের জন্যে তিনি তাঁর ল্যাবরেটারীর দিকে এগিয়ে যান।

আঠারো বছরে পৃথিবীর বুকে কত কিছু পরিবর্তন ঘটে।

কতো মানুষ জন্মায়—কতো লোক মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। তাঁর এবং তাঁর বন্ধু হরশঙ্কর মিশ্রেরও বয়স অনেক এগিয়ে যায়। তাঁরা প্রৌঢ়ত্বের প্রান্তসীমায় এসে দাঁড়ান।

কিন্তু এত কিছু পরিবর্তন সত্ত্বেও তিনি একাগ্রভাবে সাধনা করে গেছেন বলেই হয়ত এতদিন বাদে ভাগ্যলক্ষ্মী তাঁর দিকে মুখ তুলে চেয়েছেন।

সর্বপ্রথম একটি মৃত কুকুরের চোখ একটি জ্যান্ত কুকুরের অক্ষিগোলকের পরিবর্তে স্থাপন করে তিনি তার দৃষ্টি ফিরিয়ে দিতে সক্ষম হলেন।

ডাঃ সিন্‌হা উচ্ছ্বসিত আনন্দে তাঁর ল্যাবরেটারী রুম থেকে বাইরে বেরিয়ে এলেন। তাঁর সারা মনে-প্রাণে আজ যেন এক অনাস্বাদিত আনন্দের প্রবাহ। নতুন এক ভাবের প্লাবন।

তিনি ছুটে এলেন তাঁর বন্ধু হরশঙ্কর মিশ্রের কাছে। যে হরশঙ্কর আজীবন প্রচুর অর্থ ও হৃদয়ের সমস্ত আন্তরিকতা দিয়ে তাঁকে সাহায্য না করলে তিনি কোনও দিনই তাঁর এ সাধনায় সফল হতে পারতেন না।

কিন্তু আশ্চর্য!

তাঁর এ সাফল্যের সংবাদ শুনে এতটুকু আনন্দ ফুটে উঠল না হরশঙ্করের চোখে-মুখে।

কম্পিতকণ্ঠে তিনি শুধু বললেন—তোমার অন্ধ কুকুর যেদিন তার দৃষ্টি ফিরে পেল, ঠিক সেইদিনই আমার একমাত্র ছেলের জীবনে নেমে এলো নিশ্ছিদ্র সীমাহীন অন্ধকার।

—তার মানে? ডাঃ সিন্‌হা উদ্বেলিত মনে প্রশ্ন করেন।

—গতকাল একটি দুর্ঘটনা ঘটে গেছে সিন্‌হা! আমার মলয়ের দুটি চোখই আজ অন্ধ।

—ইজ্ মলয় ব্লাইণ্ড? ডাঃ সিন্‌হা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ান। না না, এ কি করে সম্ভব?

—এ হচ্ছে বিধাতার পরিহাস ডাঃ সিন্‌হা। বিধাতার নিয়মকানুন ত এত সহজে পরিবর্তিত হতে পারে না।

—কিন্তু কি করে তা সম্ভব হলো শুধু এইটুকুই জানতে চাই আমি।

—ভুল করে চোখের মধ্যে সে বোরিক লোশন-এর পরিবর্তে তীব্র নাইট্রিক অ্যাসিড ঢেলে দিয়েছিল!

—ঠিক আছে—ডাঃ সিন্‌হার মুখে হাসি ফুটে ওঠে। এতে আর আজ ভয়ের কিছু নেই—বিধাতার নিয়মকানুনকে ব্যর্থ করে মানুষের সক্ষমতা প্রমাণ করব আমি। আমি অন্ধকে দৃষ্টিদান করব! আই উইল্ অলটার দি ওয়েজ্ অব গড! আই উইল্ গিভ্ আই টু দি ব্লাইণ্ড!

—পারবে? তুমি পারবে ডাঃ সিন্‌হা? হরশঙ্কর উচ্ছ্বসিত আবেগে প্রাণের চেয়েও প্রিয় বন্ধুকে জড়িয়ে ধরেন।

—পারব বন্ধু! আমি নিশ্চয়ই পারব। আমাকে এই সুযোগটিকে অবশ্যই সফল করে তুলতে হবে। I must do it for you. মলয়কে দিয়েই সুরু হবে আমার জীবনে মানুষের ওপর প্রথম এক্সপেরিমেণ্ট...

হরশঙ্কর মিশ্রের মুখ দিয়ে কোন কথাই বের হয় না। তাঁর দু'চোখে শুধু দেখা যায় অনুপম আলোর বন্যা।

তিন

—দুর্ঘটনা—

মলয় একজন শিল্পী।

হরশঙ্কর মিশ্রের একমাত্র ছেলে মলয়। বিরাট ধনীর একমাত্র পুত্র। আর্ট স্কুল থেকে বেশ ভাল ফলাফল করে সে এখন সেই দিকেই নিজের জীবনকে ব্যাপৃত রেখেছে।

তবে কমার্শিয়াল আর্ট তার ভাল লাগে না। ফাইন আর্ট-এর দিকেই তার আবাল্য ঝোঁক। ভারতীয় আর্ট থেকে সুরু করে গ্রীসিয়ান আর্ট, রোম্যান আর্ট, ইংলিশ আর্ট ইত্যাদি সব কিছুরই কমবেশি চর্চা করে চলে।

দিনের মধ্যে দশ ঘণ্টাই সে নিজের স্টুডিওতে কাটায়।

এই অল্পদিনের মধ্যেই শিল্পী হিসাবে সে বেশ কিছুটা সুনাম অর্জন করেছে। কয়েকটি

একজিবিশনে তার ছবি প্রথম পুরস্কার পেয়ে দর্শকদের অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভে ধন্য হয়েছে। কিন্তু তার এই সুখ্যাতি ধীরে ধীরে একটি নারীকে তার প্রতি যে অত্যন্ত বেশি আকৃষ্ট করে তুলেছে তা সে জানত না।

তারই এক আর্টিস্ট বন্ধু প্রিয়ব্রতর একমাত্র বোন অনসূয়া।

প্রিয়ব্রত একজন কমার্শিয়াল আর্টিস্ট। প্রচুর অর্থও সে উপার্জন করে থাকে। কিন্তু তার শিল্পবোধ মলয়ের মতো এতটা উঁচুধরনের নয়। তাই সবার অলক্ষ্যে ধীরে ধীরে অনসূয়ার মনের কোন্ গোপন কোণে মলয়ের প্রতি একটা ভালবাসা দানা বেঁধে উঠেছিল।

ধীরে ধীরে মলয় একদিন সে কথা জানতে পারল।

অবশ্য অনসূয়াকে দেখেও যে মলয়ের ভাল লাগেনি এমন নয়। কাজেই ধীরে ধীরে দুজনের ভালবাসা অব্যাহত গতিতে এগিয়ে চলে।

কিন্তু একজনের চোখে ওদের দুজনের এই নিবিড়তা খানিকটা বিসদৃশ বলে মনে হয়েছিল।

সে হচ্ছে মলয়ের বন্ধু অবিনাশ ঘোষাল।

অবিনাশের সঙ্গে অনসূয়ার পূর্ব-পরিচয় ছিল। অবিনাশও অনসূয়াকে মনে-প্রাণে কামনা করত। কিন্তু অনসূয়ার মনে অবিনাশ সামান্যতম রেখাপাতও করতে পারেনি। তার জীবনে অবিনাশ একেবারে অপ্রয়োজনীয়।

কিন্তু অবিনাশ আশা রাখত, একদিন-না-একদিন অনসূয়া তার প্রতি আকৃষ্ট হবেই। এই আশা নিয়েই সে দিন কাটাচ্ছিল।

ঠিক এমনি সময়ে অনসূয়ার জীবনে এলো মলয়।

মলয়কে দেখেই অনসূয়ার জীবনে আমূল পরিবর্তন ঘটল।

সে যেন তার জীবনে দেখতে পেলো এক নতুন আলো। নতুন আশা আর উদ্দীপনা।

মলয়ও যে তাকে অপছন্দ করে না তা সে বুঝতে পারল।

তাই দুজনের মনের মধ্যে সবার অলক্ষ্যে গড়ে উঠল একটা মিলন-সেতু।

আর তার স্থিতিটাই শুধু স্পষ্ট নয়—ব্যাপ্তিটাও গভীর ও দীর্ঘস্থায়ী।

অবিনাশ তাই মনে মনে কেমন যেন বিরক্ত হয়ে ওঠে।

ঠিক এমনি সময়ে ঘটল এক দুর্ঘটনা।

সেই দুর্ঘটনা অবিনাশের মনের হৃত আশাকে পুনরুজ্জীবিত করে তুলল।

সে ভাবল, এবার নিশ্চয়ই অনসূয়া অন্ধ মলয়কে ভালবাসবে না। ভালবাসতে পারে না।

অনসূয়া ভালবেসেছিল শিল্পী মলয়কে। শিল্পী মলয়ের দিকেই একান্তভাবে আকৃষ্ট হয়েছিল তার মন।

তাই অবিনাশ ভাবল, অন্ধ মলয়কে সে নিশ্চয়ই ভালবাসবে না।

অন্ধ মলয়কে আদৌ ভালবাসতে পারে না। অন্ধ মলয় ত আর জীবনেও ছবি আঁকতে পারবে না। সেটা তার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব।

কিন্তু সে দুর্ঘটনাটা সম্বন্ধেই মলয়ের মনে কেমন যেন একটা চিন্তা উঁকি মারে। কি করে যে এটা সম্ভব হলো তা সে আজও সত্যিই বুঝতে পারে না।

স্টুডিওতে ছবি আঁকা শেষ করে বের হবার সময় সে বোরিক লোশন দিয়ে রোজ

তার চোখ দুটোকে পরিষ্কার করত। এতে চক্ষুর ক্ষমতা দীর্ঘস্থায়ী হয়। তার বাবার বন্ধু ডাঃ সিন্‌হাই তাকে বলেছিলেন এ কথা।

অন্য দিনের মতো সেদিনও মলয় স্টুডিওর কাজ শেষ করে চোখ দুটো পরিষ্কার করছিল।

কিন্তু দু'চোখে দু'ফোঁটা লোশন দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যেন অসহ্য যন্ত্রণায় তার সারা শরীর ঝিম্‌ঝিম্‌ করে উঠল।

দুটি চোখেই সে অনুভব করল অসহ্য যন্ত্রণা। তার হাত থেকে শিশি ঝন্‌ঝন্‌ শব্দে ছিট্‌কে গিয়ে পড়ল মেঝের ওপর।

সঙ্গে সঙ্গে সে উপযুক্ত চিকিৎসকের সাহায্য নিতে কসুর করল না—কিন্তু তবু সে আর চোখ দুটো ফিরে পেল না। আজীবনের মতো সে অন্ধ হয়ে গেল।

পৃথিবীর সবটুকু আলো-আনন্দ যেন তার জীবন থেকে মুহূর্তের মধ্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

এই ঘটনা ঘটবার কারণও অবশ্য ছিল।

যে ডাক্তার তার চিকিৎসা করলেন, তিনি মতামত দিলেন যে তীব্র ইন্‌অর্গানিক অ্যাসিড পড়েই তার চোখ দুটো নষ্ট হয়েছে। শিশিতে বোরিক লোশন-এর বদলে রাখা ছিল তীব্র ইন্‌অর্গানিক অ্যাসিড—তাতেই এত দ্রুত তার চোখ দুটো নষ্ট করেছে।

অবশ্য স্টুডিওর বিভিন্ন কাজের জন্যে কয়েকটি অ্যাসিড সে সেখানে রাখত। পরে খোঁজ নিয়ে জানা গেল, বোরিক লোশন-এর শিশিটাকে কে পরিবর্তন করে অন্য জায়গায় রেখে ইন্‌অর্গানিক অ্যাসিড-এর শিশিটাকে সেই জায়গায় রেখে দিয়েছে—তাই সে এভাবে ভুল করে চোখ দুটো নষ্ট করল।

কিন্তু কে সেই ব্যক্তি?

সে কি নিজেই ভুল করে শিশিটা সেখানে রেখেছিল?

কিন্তু সে কথা কিছুতেই তার স্মরণে আসে না।

মলয় চিন্তিত হয়ে পড়ে। এটা যদি সত্যিই দুর্ঘটনা হয়, তবে তার জন্যে তার ক্ষোভ নেই—কিন্তু এটা যদি কোনও অদৃশ্য হস্তের কাজ হয়ে থাকে, তবে সে অপরাধী অবশ্যই যাতে শাস্তি পায় সে ব্যবস্থা সে করবে।

ঠিক এমনি সময়ে তার বাবা তাকে সংবাদ দিলেন যে, ডাঃ সিন্‌হা অপারেশন করে তার চোখের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে আনবেন।

কথাটা তিনি যখন প্রকাশ করলেন, অবিনাশ আর অনসূয়া তখন অন্ধ মলয়ের পাশে বসে তাকে সান্ত্বনা জানাচ্ছিল।

মলয়ের বাবা হরশঙ্করবাবুও এ ব্যাপারে কম আনন্দিত হননি। তিনি উৎফুল্লকণ্ঠে বললেন—যেদিন ডাঃ সিন্‌হা বিলেত থেকে ঘুরে এসে এই আই সার্জারী নিয়ে গবেষণা করতে সুরু করেছিল, সেদিন সকলেই তাকে বলেছিল পাগল। একমাত্র আমিই তাকে দিয়েছিলাম আশা। সকলে চেয়েছিল যে সে বিলেত-ফেরত হয়ে বড়ো চাকরী করবে। সে যখন 'আই গ্র্যাফটিং' নিয়ে রিসার্চ সুরু করে তখন আমিই অর্থ দিয়ে সামর্থ্য দিয়ে তাকে সাহায্য করেছিলাম সর্বতোভাবে।

আর আজ? আজ সে অন্ধ কুকুরের চোখ অপারেশন করে তাকে দৃষ্টি ফিরিয়ে দিয়েছে। তার হাত যেমন নিখুঁত তাতে মানুষের ওপরেও যে সে সফল হবে এ বিশ্বাস আমার আছে।

এই কথাটা অনসূয়ার মুখে ফুটিয়ে তোলে অপরূপ একটা আনন্দের দ্যুতি। সে উচ্ছ্বসিত

কণ্ঠে বলে—সত্যিই যদি তিনি এটা পারেন, তবে তাঁর এই প্রথম অপারেশনই বিশ্বের বুকে তাঁর নামকে চিরস্মরণীয় করে রাখবে।

অবিনাশও হেসে তার মনের আনন্দ জ্ঞাপন করে।

মলয় কোনও উত্তর দেয় না। তবে ডাঃ সিন্‌হার ওপরে তার যে যথেষ্ট বিশ্বাস আছে এ কথাটা তার মুখের দিকে চাইলেই বোঝা যায়।

চার

—হাতবোমা ঃ চিঠি—

ডাঃ সিন্‌হা তাঁর অপারেশন রুমে বসে।

সমস্ত ইন্‌স্ট্রুমেন্টগুলো সাজিয়ে-গুছিয়ে ঠিক করে রাখতেই তিনি ব্যস্ত ছিলেন।

তাঁর সঙ্গে তাঁর দুজন অ্যাসিস্ট্যান্ট। দুজনেই নতুন পাশ করা ডাক্তার। সার্জারীতে তাদের দুজনেরই যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি আছে।

দু-তিন দিনের মধ্যেই তিনি অপারেশন করবেন। দিন তখনও স্থির হয়নি। উপযুক্ত চোখের সন্ধান না পাওয়া পর্যন্ত ত আর কাজ করা চলবে না।

কিন্তু মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে মৃত ব্যক্তির চোখ কি করে সংগ্রহ করা যেতে পারে!

হাসপাতালে মৃত্যুর পর চব্বিশ ঘণ্টা না কেটে যাওয়া পর্যন্ত কোনও মৃতদেহকে আনক্লেম্‌ড্ বলে ঘোষণা করা হয় না। কাজেই সেখান থেকেও উপযুক্ত চোখের সন্ধান পাওয়া যাবে না।

সেদিন কাজকর্মের শেষে এই বিষয় নিয়েই তাঁর অ্যাসিস্ট্যান্টদের সঙ্গে আলোচনা করছিলেন তিনি।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে।

পথের মোড়ে মোড়ে গ্যাস্‌পোস্টগুলোতে আলো জ্বলে উঠছে! আলো আর আঁধারের আধো ছায়ায় পৃথিবী ম্লান।

নিচে পথ দিয়ে চলেছে গাড়িগুলো। যানবাহনের জটলা একঘেয়ে যান্ত্রিক শব্দের সৃষ্টি করেছে।

কিন্তু ওসব দিকে ডাঃ সিন্‌হার মন নেই। তিনি অ্যাসিস্ট্যান্টদের কথা শুনে নীরবে চিন্তা করতে থাকেন।

হঠাৎ একটা চিন্তা যেন তাঁর মাথার মধ্যে ঝিলিক দিয়ে ওঠে। তিনি সজোরে বলে ওঠেন—আমাকে এটা করতেই হবে, I must do it...

—কি করবেন স্যর? একজন প্রশ্ন করে।

—গভীর রাতে কোনও কবরখানায় আমরা অপেক্ষা করব। মৃত্যুর অল্পক্ষণের মধ্যে যদি কোনও টাট্‌কা মৃতদেহ সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়, কৌশলে তা হাত করব আমরা।

—কিন্তু তা কি সম্ভব হবে?

—একদিনে না হয়, কয়েকদিন ধরেই অপেক্ষা করব আমরা। একদিন-না-একদিন তেমন সুযোগ নিশ্চয়ই আসবে।

—বেশ। আমরা আপনার সঙ্গে সঙ্গে সর্বক্ষণ থাকতে প্রস্তুত আছি স্যর।

মৃদু হেসে ডাঃ সিন্‌হা বলেন—যদি অপারেশন শেষ করে সমস্ত স্নায়ু ও ধমনী সমেত চোখটা বের করে আনতে পারি, তবে উপযুক্ত টিসু নিউট্রিশান মিডিয়ামে সেটা রেখে দেবার ব্যবস্থা আমি করতে পারব। উপযুক্ত মিডিয়ামে রাখতে পারলে মৃত্যুর পর বহুদিন পর্যন্ত টিসুকে জীবন্ত রাখা সম্ভব।*

—কিন্তু কথা হচ্ছে আমরা যদি সেরকম কোনও সুযোগ পাই...

কথা শেষ হয় না।

ঝন্ ঝন্ করে জানালার শার্সিটা ভেঙে পড়ে।

একটা হাতবোমা এসে পড়ে ঘরের মধ্যে।

শব্দ শুনেই ডাঃ সিন্‌হা একপাশে সরে গিয়েছিলেন।

এবার প্রচণ্ড শব্দে বোমাটা বার্স্ট করে। তুমুল শব্দে আর ধোঁয়ায় চারদিক আচ্ছন্ন হয়ে যায়।

ঘরের বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ভেঙে-চুরে তছ্‌নছ্ হয়ে যায়। চারদিকে কাঁচের টুকরো আর বারুদের গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে।

সৌভাগ্যের বিষয় ডাঃ সিন্‌হা এতটুকুও আহত হননি। তাঁর একজন অ্যাসিস্ট্যান্টের হাতে সামান্যমাত্র আঘাত লেগেছিল।

সকলে দোতলা থেকে একতলায় নেমে আসেন।

কিন্তু সেখানে কোনও লোককে দেখা যায় না। একটা মোটর গাড়ি শুধু খানিকটা ধোঁয়া ছেড়ে বহুদূরে অদৃশ্য হয়ে যায়।

শুধু দেখা যায় সদর গেটের ঠিক সাম্‌নে পড়ে রয়েছে ভাঁজকরা একখানা কাগজ।

ডাঃ সিন্‌হা কাগজটা তুলে নেন। ভাঁজ খুলে দেখতে পান সেটা একখানা চিঠি। কে বা কারা যে চিঠিটা লিখেছে তা তিনি বুঝতে পারেন না।

চিঠিতে লেখা ঃ

প্রিয় ডাঃ সিন্‌হা,

আপনার এই অন্ধ লোকের চোখ অপারেশন করে তাকে সুস্থ করে তোলা শুধু একটা পাগলামি মাত্র। আপনি যে কোনও দিনই এতে সফল হবেন না, তা আমরা জানি।

যদি জিজ্ঞাসা করেন আমাদের এ ধারণার কারণ কি, আমরা বলব, বিধাতার ওপরে কোনও দিনই মানুষের ক্ষমতা যেতে পারে না। তা কিছুতেই সম্ভব নয়।

তাই আপনি যে এতে সফল হবেন না, তা একটা সামান্য শিশুও বলে দিতে পারে।

আমাদের ধারণা, একটি শিশুর যে বুদ্ধি ও বিদ্যা আছে, আপনার তাও নেই। সাধারণ মানুষ যে আপনাকে পাগল বলে, তাতে এতটুকুও অত্যুক্তি নেই।

তাই আপনার এ পাগলামি আর যেই বরদাস্ত করুক আমরা করব না। যদি আপনি আপনার এ পাগলামি খেয়াল ত্যাগ না করেন তবে আমরা আপনার ওপর অযথা বলপ্রয়োগ করতে বাধ্য হব।

আমাদের শক্তি যে কতটা তা ত আপনি দেখলেন। এখন আপনার খুশিমতো আপনি মনস্থির করতে পারেন। ইতি—

আপনার কোন হিতৈষী।

* U. S. A. Medical Journal থেকে এ theory সংগৃহীত হয়েছে।

ডাঃ সিন্‌হা যখন চিঠিখানা পড়ছিলেন, তখন তাঁর একজন অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ছুটে গিয়েছিল কাছে। ফোনের রিসিভারটা তুলে নিয়ে সে সঙ্গে সঙ্গে ভবানীপুর থানায় ব্যাপারটা ফোন করে জানাল।

থানা অফিসার শ্রীবনওয়ারীলাল ওঝা জানালেন, তিনি এক্ষুণি আসবেন ডাঃ সিন্‌হার রসা রোডের বাড়িতে। তাঁর মতো মহৎ লোকের ওপর এতটুকুও অত্যাচার হয়, এটা তিনি কিছুতেই সহ্য করবেন না।

সমস্ত খবর শুনে মৃদু হেসে ডাঃ সিন্‌হা বললেন—যাক, পুলিশ বিভাগের কর্তব্যনিষ্ঠার পরিচয় পেয়ে সত্যই আনন্দিত হলাম। কিন্তু তবুও আমি নিশ্চিত হতে পারছি না। আমাকে এক্ষুণি একবার দীপকের কাছে ফোন করতে হবে।

—দীপক কে? অ্যাসিস্ট্যাণ্টটি প্রশ্ন করে।

—আমার বন্ধু প্রখ্যাত ডিটেকটিভ দীপক চ্যাটার্জী। আমি আজই তাকে ফোন করে দিচ্ছি। তার সাহায্য আমার অত্যন্ত প্রয়োজন।

ডাঃ সিন্‌হার শান্ত মুখখানা কেমন যেন বিরক্তি ও তিক্তভাবে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে বলে মনে হয়।

পাঁচ

—কবরখানা—

সেদিন সন্ধ্যার মুখোমুখি কাজকর্মের শেষে দীপক বেরিয়েছিল ভবানীপুরের দিকে একটা প্লেজার ট্রিপে। মোটর থামিয়ে সে ভবানীপুর থানার ও. সি. বনওয়ারীলাল ওঝার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল।

তাঁর সঙ্গে সে যখন বিভিন্ন কতকগুলি ইন্‌টারেস্টিং কেস নিয়ে কথা বলছিল তখন হঠাৎ টেলিফোনটা বেজে উঠল ঝন্‌ঝন্‌ করে।

মিঃ ওঝা দীর্ঘক্ষণ কথা বলে টেলিফোনটা নামিয়ে রেখে বললেন—উঃ, এই সব টেরোরিস্টদের অত্যাচারে এমন বিব্রত করে তোলে...

—কি ব্যাপার মিঃ ওঝা?

—আর বলেন কেন? বিখ্যাত আই স্পেশ্যালিস্ট ডাঃ সিন্‌হার অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ফোন করেছিলেন আমার কাছে।

—ডাঃ সিন্‌হা? তাঁকে ভালভাবেই আমি চিনি। সম্প্রতি তিনি সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন যে দীর্ঘদিন ধরে তিনি যে বিষয় নিয়ে গবেষণা করছিলেন তাতে সফল হয়েছেন।

—তাই নাকি? তিনি তা হলে সত্যিই অন্ধ লোকের চোখকে...

—অসম্ভব নয় মিঃ ওঝা। ডাঃ সিন্‌হার ওপরে ততটা বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা আমার আছে।

—সত্যি কথাই। ওঁর অপারেশন সাকসেস্‌ফুল হলে উনি একটা অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলবেন বলা যেতে পারে!

—কিন্তু ওঁর সঙ্গে টেরোরিস্টদের কি সম্পর্ক মিঃ ওঝা?

—সেই কথাই ত বলছি। এইমাত্র টেলিফোন পেলাম যে ওঁর বাড়িতে কে যেন হাতবোমা ফেলেছে!

—হাতবোমা?

—হ্যাঁ, অবশ্য সৌভাগ্যের বিষয়, ডাঃ সিন্‌হার একজন অ্যাসিস্ট্যাণ্টের হাতে সামান্য একটু আঘাত লাগা ছাড়া আর কেউই জখম হয়নি। মনে হয় ভয় দেখাবার জন্যেই বোমা ফেলা হয়েছে।

—কিন্তু ওঁকে ভয় দেখানোর উদ্দেশ্য?

—যারা হাতবোমা ফেলেছে তারা চায় না উনি এ কেসে হাত দেন। এমন কি তারা নাকি একথাও জানিয়েছে যে, উনি যদি এ লাইন ত্যাগ না করেন, তবে ওঁর জীবন পর্যন্ত বিপন্ন হবে।

—আশ্চর্য ত! আচ্ছা, ডাঃ সিন্‌হা কি কারও চোখ অপারেশনও করতে রাজী হয়েছিলেন নাকি?

—হ্যাঁ, ওঁর বন্ধুর একমাত্র পুত্র আর্টিস্ট মলয় মিশ্রের চোখ...

—সে কি কথা? আর্টিস্ট মলয় মিশ্রের চোখে আবার কি হলো যে তাকে অপারেশন করাতে হবে?

—তা জানেন না বুঝি? ওঁর বন্ধু হরশঙ্কর মিশ্রের ছেলে মলয় মিশ্রের চোখ হঠাৎ অন্ধ হয়ে গেছে একটা দুর্ঘটনায়। আচ্ছা সে ঘটনাটা আমি বলছি...

—তার চেয়ে চলুন ডাঃ সিন্‌হার বাড়িতে যাই। ওঁর কাছেই সব ঘটনা আমি শুনব।

ঢং ঢং।

রাত দুটো বেজে গেল।

নিস্তব্ধ রাত্রির শ্রান্ত প্রহর গড়িয়ে চলেছে একটানা।

গ্যাস্‌পোস্টগুলির স্তিমিত আলোয় রাজপথ আলো-আঁধারে মিলিয়ে কেমন যেন ছায়াম্লান।

আকাশের বুকে অজস্র তারার সমারোহ। তাদের পাণ্ডুর চোখ যেন পৃথিবীর সব কিছু ঘটনাবলীর নীরব প্রহরী।

পার্কসার্কাসের কবরখানায় দেখা গেল তিনজন লোককে নীরবে অপেক্ষা করতে।

মাঝে মাঝে বহুদূর থেকে কুকুরের ডাক ভেসে আসছে। হিমেল বাতাসের কুয়াশাঘন কান্না।

অখণ্ড আঁধারে আচ্ছন্ন কবরখানায় মাত্র ওঁরা তিনজন। ডাঃ সিন্‌হা আর তাঁর দুজন সহকারী—অমল আর বিভাস।

নিশ্ছিদ্র আঁধার। দূরে রাস্তাগুলোতে আলো জ্বলছে, কিন্তু কবরখানায় একটিও আলো জ্বলছে না। জনপ্রাণীর সাড়া নেই কোথাও।

সময় কেটে চলে।

মিনিট—সেকেণ্ড—ঘণ্টা।

নিস্তব্ধ শীতার্ত রাতকে উপেক্ষা করে তিনটি প্রাণী নীরবে অপেক্ষা করে চলে।

রাত গভীর হয়।

দূর থেকে কয়েকজন লোকের কলকোলাহল ভেসে আসে। তারা যেন এগিয়ে আসছে কবরখানার দিকেই।

কয়েকজন লোক ধরাধরি করে একটি মৃতদেহ এনে কবরখানায় রাখে। তারপর নিজেরা বাইরের রাজপথে গিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে। একটু পরে সকাল হয়ে গেলেই তারা মৃতদেহটিকে সমাহিত করবে।

এমন একটি মূল্যবান সুযোগ যে এত সত্বর তাঁদের আয়ত্তে আসতে পারে এ ধারণা ডাঃ সিন্‌হার ছিল না।

লোকগুলি একে একে রাজপথের ওপর গিয়ে একটা গ্যাস্‌পোস্টের নিচে বসে বিশ্রাম করতে থাকে। ধীরে ধীরে তারা একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।

ওঁরা তিনজনে সার্জিক্যাল ইন্‌স্ট্রুমেণ্ট দিয়ে দ্রুতহাতে অপারেশন করতে থাকেন। দুটি চোখকেই অপারেশন করে বের করতে এক ঘণ্টার বেশি সময় লাগে না।

সঙ্গেই রাখা ছিল শরীরের সমান উত্তাপযুক্ত নিউট্রিটিভ্‌ মিডিয়াম। ওঁরা তার মধ্যে চোখ দুটি রেখে দ্রুতপায়ে কবরখানা থেকে বাইরের দিকে পা বাড়ান।

ধীরে ধীরে পুব আকাশ ফর্সা হয়ে আসছে। এক্ষুণি হয়ত রাঙা আকাশের বুককে উদ্ভাসিত করে সূর্য উঠবে।

আসন্ন দিনের প্রারম্ভে নতুন আশা, আনন্দ ও উদ্দীপনায় ভরে যায় ডাঃ সিন্‌হার সারা মন।

আজকের নতুন দিনে বিধাতা তাঁর ওপরে ন্যস্ত করেছেন নতুন এক সুকঠোর কর্মধারা। আর সে কাজ যদি তিনি সাফল্যের সঙ্গে করতে পারেন, তবে মানুষের ইতিহাসে চিরদিন সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে তাঁর নাম।

কবরখানার বাইরে এসে দাঁড়ান তাঁরা।

একটু দূরেই একটি ট্যাক্সি অপেক্ষা করছিল। গাড়িতে উঠে ডাঃ সিন্‌হা আদেশ করেন—জল্‌দি চালাও—ভবানীপুর।

কিন্তু তিনি ধারণা করতেও পারেননি যে এই ট্যাক্সিচালক স্বয়ং ডিটেকটিভ দীপক চ্যাটার্জী ছাড়া আর কেউ নয়।

দ্রুত ট্যাক্সি এসে থামে ডাঃ সিন্‌হার বাড়ির সাম্‌নে।

গাড়ি থেকে নেমে দ্রুতপদে তিনি বাড়ির ভেতরে এগিয়ে যেতে উদ্যত হয়েছেন, এমন সময় ট্যাক্সিচালক বলে ওঠে—আমার ফেয়ারটা স্যর?

—তাই ত! আমার মনেই ছিল না।

ডাঃ সিন্‌হা পকেটে হাত ভরে একখানা দশটাকার নোট এগিয়ে দেন ট্যাক্সিচালকের হাতে।

কিন্তু একি!

ট্যাক্সিচালকের মুখের দিকে চাইতেই ডাঃ সিন্‌হা অবাক্‌ হয়ে যান। প্রশ্ন করেন—একি, আপনি মিঃ চ্যাটার্জী না?

দীপক হেসে বলে—ভাড়াটা পরে দিলেও চলবে। আপাততঃ আপনার কাছে সমস্ত ইতিহাসটা শোনা যাক।

—বেশ, আসুন আমার সঙ্গে ভেতরে। আমি আপনার সাহায্য নেব বলে ভেবেছিলাম কিন্তু আপনিই যে স্বেচ্ছায়...

—যেদিন আপনি ভবানীপুর থানায় ফোন করলেন, সেদিন আমি সেখানেই ছিলাম ডাঃ সিন্‌হা। সমস্ত ঘটনা সেখান থেকেই জানতে পেরে আমি আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম। এমন সময় দেখলাম আপনারা রাতের আঁধারে গা ঢাকা দিয়ে চলেছেন কবরখানার দিকে। আমি তাই ট্যাক্সিচালকের ছদ্মবেশে একখানা গাড়ি ভাড়া নিয়ে আপনাদের অনুসরণ করলাম যাতে আপনারা বিপদে না পড়েন।

—আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ মিঃ চ্যাটার্জী—সারা জীবনেও বোধ হয় আপনার এ ঋণ শোধ করতে পারব না। প্রতিপদে যে রকম বিপদের মধ্য দিয়ে আমাদের এগোতে হচ্ছে তাতে আপনার সাহায্য যে আমার কতটা প্রয়োজন তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। কিন্তু কারা যে অলক্ষ্যে থেকে আমাকে এভাবে বাধা দিচ্ছে তা বুঝতে পারছি না কিছুতেই।

—যাক, ভেতরে চলুন। সমস্ত ঘটনা আপনার কাছ থেকে শোনা যাবে।

—সেই ভাল দীপকবাবু, ভেতরে আসুন আপনি। সব ঘটনা একে একে আপনাকে বলছি।

দীপক ডাঃ সিন্‌হার অনুগমন করে নীরবে।

ছয়

—অসাফল্য—

কোল্‌কাতা শহরের প্রতিটি খ্যাত-অখ্যাত সংবাদপত্রে যে খবরটি সেদিন বেশ বড় বড় হরফে বের হয়েছিল তা হচ্ছে ঃ

বিখ্যাত সার্জন ডাঃ সিন্‌হার নতুন ধরনের অপারেশন।
অন্ধ লোকের চক্ষু অপারেশনের দ্বারা দৃষ্টি
ফিরাইয়া দিবার প্রতিশ্রুতি।
জমিদার হরশঙ্কর মিশ্রের একমাত্র পুত্র
আর্টিস্ট মলয় মিশ্রের দেহের উপর এক্সপেরিমেন্ট।
বৈজ্ঞানিক মহলে চাঞ্চল্য।

খবরটা শুধু যে বৈজ্ঞানিক মহলকেই চঞ্চল করে তুলেছিল তা নয়, সাধারণ মানুষও অধীর আগ্রহে চঞ্চল হয়ে উঠেছিল সংবাদপত্রের খবরটি পড়ে।

কোল্‌কাতার অন্য দুজন বিখ্যাত সার্জনও ডাঃ সিন্‌হাকে এই অপারেশনের বিষয়ে সাহায্য করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

মেডিক্যাল কলেজের সার্জারীর প্রধান অধ্যক্ষ ডাঃ রায়চৌধুরী তাঁদের অপারেশন থিয়েটারে ডাঃ সিন্‌হাকে কাজ করবার অনুমতি দিয়েছিলেন।

সেদিন বেলা দশটা।

সাড়ে দশটায় অপারেশন সুরু হবে।

দুজন 'এনাস্‌থেটিস্ট' মলয়কে অজ্ঞান করবার কাজে ব্যস্ত ছিল। পাশের ঘরে ডাঃ সিন্‌হা বেশ পরিবর্তন করছিলেন।

তিনি অপারেশন গাউনটা শরীরের ওপর চাপাবার জন্যে সেটা হাতে নিতেই তার মধ্য থেকে একটুকরো কাগজ পড়ল মেঝের ওপর।

ডাঃ সিন্‌হা বিস্মিত হলেন। তিনি কাগজের টুকরোটা কুড়িয়ে নিয়ে তুলে ধরলেন নিজের চোখের সামনে।

আশ্চর্য, নিজের চোখকেও তিনি যেন বিশ্বাস করতে পারছিলেন না কাগজের লেখাগুলো পড়ে। তাতে লেখা ঃ

এখনও সাবধান! এভাবে পাগলামি খেয়াল চালালে আপনার জীবন বিপন্ন হয়ে উঠবে একথা নিশ্চয়ই ভুলে যাননি।

—আপনার জনৈক হিতৈষী বন্ধু।

কাগজের টুকরোটা পকেটে রেখে তিনি গাউনটা পরে ফেলেন। তারপর নিশ্চিন্ত মনে এগিয়ে যান অপারেশন থিয়েটারের দিকে।

অপারেশন রুমের বাইরে উদগ্র কৌতূহল নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন মলয়ের বাবা হরশঙ্কর মিশ্র, অনসূয়া, অবিনাশ এবং আরও কয়েকজন লোক।

অপারেশন রুমে কয়েকজন মেডিক্যাল ছাত্রের সঙ্গে দীপকও ছদ্মবেশে অপেক্ষা করছিল, যাতে কোনও অঘটন না ঘটে সেই দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে।

সময় কাটে।

মিনিট—সেকেণ্ড—ঘণ্টা। সমস্ত মানুষ উদগ্র কৌতূহলে অপেক্ষা করে।

উপস্থিত সার্জনরাও ডাঃ সিন্‌হার নিপুণ অস্ত্রোপচারের ক্ষমতা দেখে অবাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকেন।

এত পারফেক্ট্ অপারেশনের ক্ষমতা না থাকলে তিনি নিশ্চয়ই এ ধরনের জটিল অপারেশনে হাত দিতেন না। তাঁদের মনও আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বে দুলতে থাকে।

পুরোপুরি চার ঘণ্টা সময় লাগে অপারেশন শেষ করতে। সমস্ত কাজ শেষ করে অপারেশন থিয়েটার থেকে ডাঃ সিন্‌হা যখন বেরিয়ে আসেন, তখন নিদারুণ ক্লান্তিতে তাঁর সারা শরীর যেন অবসন্ন হয়ে আসে।

দীপকও বেরিয়ে এসে ডাঃ সিন্‌হার সঙ্গে গাড়িতে বসে।

মিঃ মিশ্র, অনসূয়া ইত্যাদির দিকে চেয়ে ডাঃ সিন্‌হা বলেন—কোনও ভয় নেই আপনাদের। যতোটা মনে হয় ওর দৃষ্টিশক্তি আবার ফিরে আসবে।

ওদের সকলের মুখেই ফুটে ওঠে আনন্দের আলো।

গাড়ি ছুটে চলে।

ডাঃ সিন্‌হা অপারেশনের আগে পাওয়া চিঠিখানা বের করে তুলে দেন দীপকের হাতে। বলেন—আপনার ওপরে বিশ্বাস আছে বলেই এটা আপনাকে দেখাচ্ছি মিঃ চ্যাটার্জী। পুলিশের ওপর আমার ততটা...

দীপক হেসে বলে—সে কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু আমি জানি মিঃ ওঝা একজন বুদ্ধিমান পুলিশ অফিসার। যাক, এই কাগজটা দেখে মনে হচ্ছে, আগের চিঠির সঙ্গে এটার হাতের লেখার কোনও প্রভেদ নেই। একজন লোকই পর পর এই চিঠিগুলো লিখে ভয় দেখাচ্ছে। আমি শুধু বুঝতে পারছি না কি ওদের উদ্দেশ্য!

দীপকের মুখে ফুটে ওঠে গভীর চিন্তার রেখা।

ঠিক এক মাস পরের ঘটনা।

ডাঃ সিন্‌হা এই দীর্ঘদিন প্রতিটি মুহূর্ত কাটিয়েছেন পরম উদ্বেগে।

হরশঙ্করবাবু, অনসূয়া এসে মাঝে মাঝে মলয়ের সঙ্গে নানা বিষয়ে কথাবার্তা বলে তার মনকে সজীব করে রেখেছে।

নির্দিষ্ট নিয়মে চিকিৎসা চলেছে এই এক মাস ধরে।

ঠিক এক মাস পরে আজ মলয়ের চোখের ব্যাণ্ডেজ খুলে ফেলা হবে। আজকেই প্রমাণিত হবে ডাঃ সিন্‌হার সম্পূর্ণ নতুন এক্সপেরিমেণ্ট সফল হয়েছে কি না।

সকলে উদ্বেগ-পরিপূর্ণ মন নিয়ে ডাঃ সিন্‌হার সঙ্গে অপারেশন থিয়েটারে আসেন।

রোগীর বেড্ থেকে মলয়কে অপারেশন রুমে আনা হয়।

বহু লোকের ভিড় হয়েছে সেখানে। অপারেশন রুমের বাইরেও দলে দলে লোক অপেক্ষা করতে থাকে। শুধুমাত্র সাধারণ মানুষই নয়, বড় বড় ডাক্তার এবং সার্জনরা এসে ভিড় করেছেন এই নতুন অপারেশনের ফলাফল জানতে। বিভিন্ন সংবাদপত্র থেকে এসেছেন রিপোর্টাররা। আজ যদি ডাঃ সিন্‌হা সফল হন, তবে শুধু সারা ভারত নয়, সারা পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে পড়বে তাঁর নাম, তাঁর খ্যাতি। তিনি হবেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ আবিষ্কারকদের মধ্যে একজন।

অবিনাশ, হরশঙ্করবাবু, অনসূয়া উদ্বেগ-পরিপূর্ণ মন নিয়ে এসে অপারেশন রুমের বাইরে অপেক্ষা করতে থাকে।

বেলা ঠিক সাড়ে দশটা।

আজ থেকে পুরো এক মাস আগে ঠিক সাড়ে দশটার সময়েই অপারেশন করা হয়েছিল।

ডাঃ সিন্‌হা পরম যত্নে ধীরে ধীরে মলয়ের চোখের ব্যাণ্ডেজ খুলে ফেললেন। দুটি চোখই সম্পূর্ণ উন্মুক্ত করা হলো।

ডাঃ সিন্‌হার একজন অ্যাসিস্ট্যাণ্ট মলয়ের দিকে চেয়ে বলল—এবার ধীরে ধীরে চোখের পাতা খুলে ফেলুন। সাম্‌নের দিকে তাকান আপনি।

মলয় চোখ মেলে তাকায়।

কিন্তু একি! তার চোখ যেন পাথরের চোখের মতো স্থির। অবিচল। নিষ্প্রভ। সে যেন মৃতেব চোখ। পাথরের তৈরী যেন।

—কাণ্ট ইউ সি মাই বয়—তুমি দেখতে পাচ্ছ না?

ডাঃ সিন্‌হা উদ্বেগপূর্ণ কণ্ঠে প্রশ্ন করেন।

নিষ্প্রভ স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে মলয় বলে—না, কিছুই দেখতে পাচ্ছি না আমি। কিছুমাত্র না।

সারা ঘরের মধ্যে অখণ্ড নীরবতা। অসীম স্তব্ধতা বিরাজ করতে থাকে চারদিকে। সকলেই যেন একসঙ্গে মলয়ের কথা শুনে কেমন নিরাশ হয়ে পড়ে।

দলে দলে লোক একে একে নিজেদের গন্তব্যপথে প্রস্থান করে। তারাও যেন ডাঃ সিন্‌হার অসাফল্যে যথেষ্ট দুঃখিত হয়েছে বলে মনে হয়। এ যেন ডাঃ সিন্‌হার পরাজয় নয়, সারা দেশের পরাজয়—একটা বিরাট ক্ষমতার অপব্যবহার।

ডাঃ সিন্‌হাই কেবল তখনও আশা হারাননি। হয়ত কোথাও রয়েছে সামান্য ত্রুটি যা তাঁর নজরে পড়েনি। সেটা ঠিক করতে পারলেই বোধ হয় মলয় আবার দৃষ্টি ফিরে পাবে। তা ছাড়া অপারেশন যখন সফল হয়েছে, থিয়োরীতে যখন কোনও ভুল নেই, তখন বাস্তবে তা ব্যর্থ হবে কেন? গভীর মনোযোগ সহকারে মলয়ের চোখ দুটো পরীক্ষা করতে থাকেন ডাঃ সিন্‌হা।

সাত

—আত্মদান—

হরশঙ্করবাবু যেন স্বকর্ণে শুনেও খবরটা বিশ্বাস করতে পারেন না।

আজীবন ডাঃ সিন্‌হার ওপর তাঁর ছিল গভীর বিশ্বাস। তা ছাড়া অপারেশন সফল হওয়াতে তাঁর আশা আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল। তাই তিনি অবিনাশ, অনসূয়া এবং আরও কয়েকজন আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে এসে অপারেশন রুমের পাশেই অপেক্ষা করছিলেন।

কিন্তু এই নিদারুণ ব্যর্থতার সংবাদ তাঁর মনকে কেমন যেন বিচলিত করে তোলে। এ কি করে সম্ভব? ডাঃ সিন্‌হা শেষ পর্যন্ত কি তবে ব্যর্থ হলেন?

সকলে অপারেশন রুমের মধ্যে প্রবেশ করে।

সেখানে ডাঃ সিন্‌হা তখন একটা টর্চ 'ফোকাস' করে গভীর মনোযোগ দিয়ে মলয়ের চোখ দুটি পরীক্ষা করছিলেন।

বৃদ্ধ হরশঙ্করবাবু ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে কম্পিতকণ্ঠে প্রশ্ন করেন—তা হলে কি ওর চোখ দুটো ভাল হবার আর কোনও আশা নেই?

ডাঃ সিন্‌হা চিন্তিতকণ্ঠে বলেন—সত্যই কেন যে এমন হলো আমি বুঝতে পারছি না। এটা কি করে সম্ভব? যদি আমার থিয়োরী সত্য হয়, যদি আমার আগের এক্সপেরিমেণ্টগুলো মিথ্যা না হয়, তবে সে নিশ্চয়ই দেখতে পাবে—কিন্তু...

গভীর আবেগে ডাঃ সিন্‌হার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে আসে।

ডাঃ সিন্‌হার অ্যাসিস্ট্যাণ্ট অমল বলল—কিন্তু, সত্যি আমরা বুঝতে পারছি না কেন উনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেলেন না!

ডাঃ সিন্‌হা চিন্তিতস্বরে বললেন—হয়ত কোনও টিসু সম্পূর্ণ মরে গিয়েছিল। কিংবা কোথাও হয়ত কোনও ক্রেনিয়্যাল নার্ভ ঠিকমতো যোগ করা হয়নি। হয়ত অপ্‌টিক নার্ভের ফাইবারগুলো এখনও জোড়া লাগেনি। অনেক কিছুই হতে পারে অমল। এমন কি রেটিনার ডিস্‌প্লেস্‌মেণ্টের জন্যেও এটা সম্ভব। কিন্তু তবু আমি এখনও সম্পূর্ণ নিরাশ নই। কিছু আশা এখনও আছে—যদি...

—কিন্তু সেটা কি ডাঃ সিন্‌হা? ব্যাকুলকণ্ঠে হরশঙ্করবাবু প্রশ্ন করেন—সেই বিরাট 'যদি'টা কি?

নিষ্প্রভ হাসি হেসে ডাঃ সিন্‌হা বলেন—এখনও আমি সম্পূর্ণ নিরাশ নই মিঃ মিশ্র। যদি কোনও একটা জীবন্ত চোখ আমি পাই, আমি আশা পোষণ করি যে তার একটি চোখ অন্ততঃ ভাল হয়ে উঠবে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, এভাবে নিজের চোখ স্যাক্রিফাইস্ করতে কেউ রাজী হবে কি না।

ঘরের মধ্যে নিঃসীম নীরবতা।

সে নীরবতা ভেদ করে একসময় অনসূয়া বলে ওঠে—যদি সত্যই কোনও একটা জীবন্ত চোখ পেলে ওঁর একটি চোখ ভাল হয় তবে আমি আমার একটি চোখ বিসর্জন দিতে প্রস্তুত আছি ডাঃ সিন্‌হা।

ঠিক এ ধরনের পরিস্থিতির জন্যে ডাঃ সিন্‌হা প্রস্তুত ছিলেন না। কয়েকটি মুহূর্ত গভীরভাবে চিন্তা করে তিনি বললেন—তা হয় না মা! তোমার জীবনে এখনও রয়েছে অনেক আশা-ভরসা। সামনে পড়ে রয়েছে বিস্তীর্ণ জীবন। তোমার এই বয়সে তোমার চোখটি নষ্ট করা কিছুতেই চলতে পারে না। তা ছাড়া আমি যখন সম্পূর্ণ গ্যারাণ্টি দিতে পারছি না যে...

ডাঃ সিন্‌হার কথায় বাধা দিয়ে মিঃ মিশ্র বলে ওঠেন—কিন্তু আমি যদি আমার প্রাণের চেয়েও প্রিয় একমাত্র ছেলের জন্যে আমার একটি চোখ বিসর্জন দিতে প্রস্তুত থাকি ডাঃ সিন্‌হা। তা ছাড়া আমার বয়স এখন পঞ্চান্ন বছর চলেছে—বাকী জীবন আমার একটি চোখ নিয়েই কাটিয়ে দিতে পারব।

গভীর আবেগ তাঁর কণ্ঠে।

সারা ঘরের পরিবেশ যেন বৃদ্ধের গম্ভীর কণ্ঠের সুস্পষ্ট ভাষণে রণ্ রণ্ করে ওঠে।

কয়েকটি মুহূর্তের অখণ্ড নীরবতা।

ডাঃ সিন্‌হা বলেন—বেশ। আমার কোনও আপত্তি নেই...

কিন্তু তাঁর কথায় বাধা দিয়ে মলয় বলে—না না, ডাঃ সিন্‌হা, আমাকে সুস্থ করে তোলবার জন্যে কোনও স্যাক্রিফাইসের প্রয়োজন নেই। আমার ভাগ্যে দৃষ্টিলাভ থাকলে নিশ্চয়ই অপারেশন সাফল্যপূর্ণ হতো। কাজেই...

ডাঃ সিন্‌হা বলেন—বেশ, আমাকে কয়েক দিন ভাবতে দিন। তারপর যা হয় ব্যবস্থা করব। মলয় এখনও কয়েকদিন হাসপাতালেই থাকবে। তা ছাড়া ইতিমধ্যে সবদিক থেকে তৈরী না হয়ে আবার নতুন অপারেশনে হাত দেওয়া যুক্তিযুক্ত নয়।

মলয়ও এ কথায় সায় দেয়।

কথা শেষ হবার পর তাঁরা একে একে দুঃখিত মনে সে ঘর ত্যাগ করে চলে যান। ডাঃ সিন্‌হা আর একবার মনোযোগ দিয়ে মলয়ের চোখ দুটো পরীক্ষা করতে থাকেন।

সকলে ধীরে ধীরে প্রস্থান করে।

কিন্তু একজন লোক তখনও নীরবে ঘরের মধ্যে অপেক্ষা করছিল। সে হচ্ছে ডিটেকটিভ দীপক চ্যাটার্জী।

দীপক ডাঃ সিন্‌হার দিকে চেয়ে বলে—আমার কথায় কিছু মনে করবেন না ডাঃ সিন্‌হা—আমি শুধু একটা এক্সপেরিমেণ্ট...

দীপক নিজের টর্চটা বের করে অকস্মাৎ মলয়েব দিকে ফোকাস্ করে। মলয় চোখ দুটো ঈষৎ কুঁচকে নেয় ওই তীব্র আলোর ঝলক চোখে এসে লাগায়।

দীপক কোনও কথা না বলে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়।

আট

—নরহত্যা—

বাড়ি ফিরে এসে দীপকের সঙ্গে সেদিন এই সব ঘটনাগুলো নিয়ে রতনলালের আলোচনা হচ্ছিল।

দীপকের দিকে চেয়ে রতন প্রশ্ন করে—ডাঃ সিন্‌হার ঘটনা নিয়ে কতটা এগোলি দীপক?

দীপক বলে—সমস্ত জিনিসটা এখন নির্ভর করছে মাত্র একটি pivot-এর ওপর।

—কি সেটা?

—হাতের লেখা।

—ও, সে চিঠিগুলোর হ্যাণ্ডরাইটিং ত?

—ঠিক তাই। কিন্তু আমি বিষয়টা নিয়ে এখনও ততটা মাথা ঘামাচ্ছি না, কারণ ডাঃ সিন্‌হার আপাততঃ আর কোনও বিপদ ঘটবে না। অপারেশন সফল হলে হয়ত...

—কিন্তু আমি বুঝতেই পারছি না, কেন অপারেশন ঠিকমতো হবার পরও মলয়বাবু দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেলেন না!

রহস্যময় হাসি হেসে দীপক বলে—এর পেছনে রয়েছে বিরাট একটা মিস্ট্রি।—আমি যদি সেই রহস্য ভেদ করতে পারি...

রতন অবাক হয়ে বলে—কিন্তু সে রহস্য সম্বন্ধে কি এতটুকু হিন্ট্ও আমি পেতে পারি না?

—না, দীপক বলে—কথাটা এতটুকু প্রকাশ হয়ে পড়লে হয়ত অনেক ক'জন লোকের জীবন পর্যন্ত বিপন্ন হয়ে উঠতে পারে।

—কিন্তু এ পর্যন্ত ত কারও জীবনের ওপর attempt হয়নি দীপক!

—হয়নি বলেই যে হতে পারে না এমন কথা নেই। তা ছাড়া যে হাতবোমা এর আগে অজ্ঞাত আততায়ীরা ব্যবহার করেছিল তাতেও ত দু-একজন লোকের মৃত্যু হতে পারত।

—তা ত বটেই। কিন্তু আমি ভাবছি আমাদের গোপন কথাবার্তা বাইরে প্রকাশ পাবে কোন্ পথে?

—বিশ্বাস এখন কোন কিছুকেই করা চলে না ভাই। দেওয়ালেরও কান আছে বলে এখন মনে করতে হবে। তবে যা ঘটবে তা ত দেখতেই পাবি তুই!

—তা ত বটেই—রতন মাথা নাড়ে।

কথা শেষ হয় না।

বাইরে পাওয়া যায় পায়ের শব্দ। ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে মলয়ের বন্ধু অবিনাশ।

—নমস্কার মিঃ চ্যাটার্জী। বিশেষ কয়েকটি পরামর্শের জন্যেই আপনার সঙ্গে দেখা করতে এলাম।

—বসুন মিঃ ঘোষাল। আপনার সঙ্গে আলোচনা করবার সুযোগ পেলে আনন্দিত হব আমি।

—ধন্যবাদ। এবার কথাটা সুরু করবার আগে শুধু একটা প্রশ্ন করতে চাই আপনাকে।

—বলুন।

—আপনার কি সত্যিই মনে হয় যে ডাঃ সিন্‌হা এখনও মলয়বাবুর চোখকে সারিয়ে তুলতে পারেন?

—নিশ্চয়ই মনে করি। তাঁর ওপর যথেষ্ট বিশ্বাস আমার সত্যিই আছে মিঃ ঘোষাল।

—কিন্তু তিনি মলয়বাবুর অপারেশনে সফল হলেন না কেন?

—কারণ আর কিছুই নয়। আমার ধারণা, যে মৃত ব্যক্তির চোখ দুটো অপারেশন করে আনা হয়েছিল তার টিসুগুলো হয়ত আগেই মরে গিয়েছিল। বোধ হয় নিউট্রিশন মিডিয়ামটা ঠিকমতো তৈরী হয়নি। কিন্তু তা থেকেই ডাঃ সিন্‌হার অসাফল্য প্রমাণিত হয় না।

—কিন্তু জীবন্ত মানুষের চোখ পেলে কি তিনি সত্যিই...

—হ্যাঁ, আমার তাই ধারণা।

অবিনাশ ঘোষাল মিনিটখানেক কি যেন চিন্তা করে। তারপর বলে—সত্যিই যদি মলয় একটা চোখ অন্ততঃ ফিরে পায় তবে আমি খুবই আনন্দিত হবো। কিন্তু একজন লোকের একটা চোখ নষ্ট করেও যদি সে চোখ ফিরে না পায় তবে তার চেয়ে আফশোসের বোধ হয় আর কিছুই থাকবে না।

গভীর দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে অবিনাশ ঘোষালের বুক ভেদ করে।

দীপক বলে—সেটা অবশ্য আমার জানবার কথা নয়—আর যদি কেউ স্বেচ্ছায় একটা চোখ বিসর্জন দিতে চায় তাতে তাকে বাধা দেওয়া চলে না।

অবিনাশ বলে—কিন্তু চোখের সাম্‌নে যে নৃশংস ব্যাপার ঘটবে অথচ আমরা তাতে বাধা দিতেও পারব না...

দীপক বলে—কিন্তু এ ব্যাপারের মধ্যে আমাদের কি করবার থাকতে পারে মিঃ ঘোষাল?

অবিনাশ বলে—যাক সে কথা। আমি আপনার কাছে ডাঃ সিন্‌হার বিষয়ে খোঁজ করতে এলাম। সমস্ত কিছু মিলে এমন একটা কম্‌প্লিকেটেড্ ব্যাপারের সৃষ্টি হয়েছে যে...

—এমন কিছু সাংঘাতিক ব্যাপার এটা নয় মিঃ ঘোষাল যে তার জন্যে আমাকে আমার মূল্যবান সময় নষ্ট করতে হবে। ভীতিপূর্ণ চিঠি ছাড়া ডাঃ সিন্‌হার ওপর এমন কোনও মারাত্মক আক্রমণ হয়নি যে...

—আর সেই হাতবোমা?

—ওটা ভয় দেখাবার জন্যেই। নইলে রাস্তা থেকে হাতবোমা ছুঁড়ে যে দোতলার ঘরে বসে থাকা ডাঃ সিন্‌হার কোনও ক্ষতি করা যাবে না, তা যে কোনও লোকই বুঝতে পারে।

—তা বটে, তা বটে। অবিনাশ ঘোষালকে খানিকটা অপ্রস্তুত মনে হয়। একটু থেমে সে বলে—সত্যি ডাঃ সিন্‌হার জন্যে আমার ততটা চিন্তা নয় মিঃ চ্যাটার্জী, আমার চিন্তা শুধু মলয়ের জন্যে। মলয়ের চোখ ডাঃ সিন্‌হার ওপর নির্ভর করছে বলেই আমার সমস্ত চিন্তা। আচ্ছা, তা হলে উঠি আজকের মতো...

দীপক বলে—এক মিনিট অপেক্ষা করুন মিঃ ঘোষাল। চা আনতে বলেছি আপনার জন্যে। চা-টা খেয়ে আপনি...

গভীর রাত্রি।

নৈশ আহার শেষ করে মিঃ মিশ্র কিছুক্ষণ তাঁর লাইব্রেরী ঘরে বসে পড়াশুনা করেন। তারপর শয়নঘরের দিকে এগিয়ে যান রাত প্রায় সাড়ে দশটার সময়।

এটা তাঁর দীর্ঘদিনের অভ্যাস। আজীবন তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁর এই অভ্যাসটি সযত্নে পালন করেছেন। এমন কি এত বড়ো একটা দুর্ঘটনা তাঁর মনের ওপর গভীর রেখাপাত করলেও তিনি তাঁর এ অভ্যাসটি ত্যাগ করতে পারেননি।

সেদিনও তিনি দৈনিক তালিকা অনুযায়ী রাত সাড়ে দশটার সময় লাইব্রেরী থেকে শয়নকক্ষের দিকে আসছিলেন।

ঠিক দরজার সামনে তিনি এসে পৌঁছেচেন এমন সময় পেছনে পায়ের শব্দ শুনতে পেয়ে তিনি চম্‌কে সেদিকে তাকালেন।

একটি ছায়ামূর্তি।

আপাদমস্তক এমন এক ধরনের পোশাকে আবৃত যে তাকে ঠিক চেনা যায় না।

—কে? কঠিন স্বরে মিঃ মিশ্র প্রশ্ন করেন।

কোনও উত্তর নেই।

ছায়ামূর্তি একলাফে মিঃ মিশ্রের সাম্‌নে এসে দাঁড়ায়। সজোরে তার হাতের লাঠি দিয়ে প্রচণ্ড আঘাত হানে মিঃ মিশ্রের মাথায়।

মিঃ মিশ্র সঙ্গে সঙ্গেই মেঝেতে লুটিয়ে পড়েন।

পর পর তিনবার হাতের মোটা লাঠিটা দিয়ে লোকটা আঘাত হানে মিঃ মিশ্রের দেহে।

মিঃ মিশ্রের মুখ দিয়ে শুধু বের হয় একটা অস্ফুট কাতরোক্তি। তারপর সব চুপ।

একলাফে ছায়ামূর্তি জানালা দিয়ে বাইরে অদৃশ্য হয়।

মিঃ মিশ্রের শব্দ শুনে কয়েকটি কর্মচারী ছুটে আসে দোতলার ঘরের দিকে। কিন্তু মিঃ মিশ্রকে সাহায্য করবার মতো কিছুই আর অবশিষ্ট ছিল না। মিঃ মিশ্রের দেহ পড়ে আছে নিথর, নিষ্কম্প।

সারা বাড়ির বুক জুড়ে ততক্ষণে প্রচণ্ড হট্টগোল সুরু হয়ে গেছে।

নয়

—পোস্টমর্টেম—

পরদিন প্রত্যেকটি সংবাদপত্রে মিঃ মিশ্রের আকস্মিক মৃত্যুর খবরটা বেশ বড় বড় হরফে বের হয়েছিল ঃ

বিচিত্র নরহত্যা!

জমিদার শ্রীহরশঙ্কর মিশ্রকে তাঁর শয়নকক্ষে মৃত অবস্থায় প্রাপ্ত!

আততায়ী এখনও পর্যন্ত অজ্ঞাত।

পুলিশ কর্তৃক রহস্যভেদের জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা!

খবরটি দীপককেও কেমন যেন অভিভূত করে তোলে। যে ঘটনাগুলোতে সে বেশি গুরুত্ব অর্পণ করেনি তা যে এমন মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে তা ছিল তার ধারণার বাইরে।

সে মিঃ মিশ্রের বাড়ির উদ্দেশ্যে তৎক্ষণাৎ যাত্রা করে। তার মন তখন চিন্তায় ও দুঃখে অধীর হয়ে উঠেছে। হয়ত পূর্বাহ্ণে সাবধান হলে এমন একটা দুর্ঘটনা ঘটত না, এই চিন্তাই তার মনে এতটা ব্যথা দেয়।

মিঃ মিশ্রের বাড়িতে পৌঁছে দীপক ও রতন দেখতে পায় ভবানীপুর থানার ও.সি. মিঃ ওঝা পূর্বাহ্ণেই সেখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন।

দীপককে দেখতে পেয়ে মিঃ ওঝা বলেন—গুড্ মর্ণিং মিঃ চ্যাটার্জী। আপনি এসে খুবই ভাল হয়েছে। ভালভাবে কেসটা ইন্ভেস্টিগেট্ করা চলবে। সত্যিই আপনি পাশে থাকলে মনে যেন একটা সাহসের সঞ্চার হয়।

দীপক বলে—সে কথা যাক, আমি সত্যিই মনের মধ্যে কেমন যেন একটা অস্বস্তি অনুভব করছি মিঃ ওঝা। আমি যদি একটু আগে সাবধান হতাম, তবে নিশ্চয়ই এত বড়ো একটা মারাত্মক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হতে পারত না। কিন্তু তখন আমি বিন্দুমাত্র সন্দেহ করতে পারিনি যে কেসটা এই ধরনের পরিণতির দিকে এগিয়ে যাবে।

মিঃ ওঝা বলেন—যাক, যা হবার তা হয়ে গেছে। সেজন্যে ক্ষোভ করে কোনও লাভ নেই মিঃ চ্যাটার্জী। কিন্তু আমি চাই আসল 'কালপ্রিট্'কে গ্রেপ্তার করতে।

কথা বলতে বলতে দুজনে এগিয়ে যান মিঃ মিশ্রের শয়নকক্ষের দিকে।

সেখানে নিহত মিঃ মিশ্রের দেহ তখনও যথারীতি রাখা ছিল। দীর্ঘক্ষণ দীপক মৃতদেহটা পরীক্ষা করে বলে—আমার মনে হয় মাথায় পর পর আঘাত পেয়ে...

বাধা দিয়ে মিঃ ওঝা বলেন—মৃতদেহ এক্ষুণি পোস্টমর্টেমে পাঠাবার ব্যবস্থা করছি মিঃ চ্যাটার্জী।

—সেটাই ভাল। তবুও আমি মৃতদেহটা দেখে যতটা আন্দাজ করছি তাই বলছিলাম আপনাকে।

খুব ভাল করে মৃতদেহটা দেখে মিঃ ওঝা বলেন—উঃ, হরিবল্! এ দৃশ্য আর চোখে দেখা যায় না। আমি বাইরে দাঁড়াচ্ছি মিঃ চ্যাটার্জী...

—বেশ বেশ। আমি দেখি যদি অন্য কোনও ভাল সূত্রের সন্ধান মেলে...

দীপক মনোযোগ সহকারে ঘরের চারিদিকে দৃষ্টি বুলোতে থাকে। হঠাৎ ঘরের কোণে কি একটা জিনিস তার মনোযোগ আকর্ষণ কবে।

দীপক সেটা হাতে তুলে নেয়। সেটা একটা স্ক্রুর সঙ্গে ফিট্ করবার উপযোগী লোহার 'নাট্'।

দীপক সেটা পকেটে রেখে দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে আসে।

মিঃ ওঝা প্রশ্ন করেন—কই, কিছু পেলেন নাকি?

দীপক গম্ভীরকণ্ঠে শুধু বলে—বিশেষ কিছুই না। যাক, চলুন এখন এদিককার প্রারম্ভিক তদন্তের কাজগুলো শেষ করা যাক।

—বেশ, তাই চলুন।

দুজনে ভেতরের দিকে এগিয়ে যায়।

দিন তিনেক পরের ঘটনা।

দীপক তার ড্রইংরুমে বসে ছিল, এমন সময় টেলিফোনটা সশব্দে বেজে উঠল।

—হ্যালো, কে? দীপক প্রশ্ন করে রিসিভারটা তুলে নিয়ে।

—আমি মিঃ ওঝা কথা বলছি।

—কি খবর মিঃ ওঝা? এত সকালে...

—পোস্টমর্টেম রিপোর্ট পাওয়া গেছে।

—কি সংবাদ?

—জানা গেল পর পর কয়েকবার কোনও মোটা নব্‌যুক্ত লাঠি বা ওই ধরনের কোনও ব্লাণ্ট ওয়েপন্-এর সাহায্যে আঘাতজনিত রক্তপাতের ফলেই মিঃ মিশ্রের মৃত্যু ঘটেছে।

—স্কাল্ কি ফ্রাক্চার হয়েছিল নাকি?

—হাঁ, দু' জায়গায় স্কাল্ ভেঙে বসে গিয়েছিল।

—আমি ওইরকমই সন্দেহ করেছিলাম। দীপক বলে—যাক, আপনার রিপোর্টটা আমার তদন্তের যথেষ্ট সহায়তা করবে।

দীপক রিসিভারটা নামিয়ে রাখে।

দশ

—হারানো ডায়েরী—

রাত তখন দেড়টা।

শ্যামবাজার স্ট্রীট ধরে ঠিক এসময়ে একজন নিরীহ গোবেচারা শ্রেণীর লোককে পথ চলতে দেখা গেল।

মোড়ের মাথায় একজন পুলিশ কনস্টেবল তার দিকে এগিয়ে এসে দৃঢ়কণ্ঠে প্রশ্ন করে—এই, কৌন্ হো তুম্?

লোকটি কনস্টেবলটির সাম্‌নে এগিয়ে এসে পকেট থেকে একখানা কি জিনিস বের করে তার সাম্‌নে ধরে।

কনস্টেবলটি তার দিকে চেয়ে দেখে বেশ ভাল করে। তারপর বলে—লেকিন এত্‌না রাত্‌মে...

মৃদু হেসে লোকটি বলে—উস্‌মে কেয়া হ্যায় ভাই। তুম দো-চার রুপিয়া ভি লেনে সেক্‌তা! লেকিন বাত্ ইয়ে হ্যায়...

বাধা দিয়ে কনস্টেবলটি বলে—বাত্ নেহি ভাই, লেকিন আগাড়ি কুছ্ পানিউনি খানেকে লিয়ে...

কথা শেষ হয় না। লোকটি পকেট থেকে একখানা পাঁচটাকার নোট বের করে কনস্টেবলটির হাতে গুঁজে দেয়।

সে হেসে বলে—এহি হ্যায় ঠিক বাত্!

কনস্টেবলটি অতঃপর গুন্ গুন্ করে একখানা গানের কলি ভাঁজতে ভাঁজতে উল্টো দিকে প্রস্থান করে। তার গানের শব্দ ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায়—রঘুপতি রাঘব রাজা রাম...

লোকটি এবার বাঁ দিকের একটা সরু রাস্তার মধ্যে প্রবেশ করে। এঁকেবেঁকে পথটা চলে গেছে দক্ষিণ দিকে।

পথটা ধরে মিনিট কুড়ি এগিয়ে ডান দিকের একটা বড় বাড়ির সাম্‌নে এসে সোজা হয়ে দাঁড়ায় সে। এই বাড়িখানাই হচ্ছে আমাদের পূর্বপরিচিত অবিনাশ ঘোষালের বাড়ি।

লোকটি বাড়ির দিকে বেশ ভাল করে তাকিয়ে সামনের নম্বর-প্লেটটি বেশ ভাল করে নিরীক্ষণ করে। তারপর সে নিঃসন্দেহ হয় যে ঠিক বাড়িখানার সাম্‌নে এসেই পৌছে গেছে সে।

এবার সে উপরের দিকে তাকিয়ে বাড়িতে কেউ জেগে আছে কিনা ভাল করে দেখে নেয়। না, বাড়ির মধ্যে জনপ্রাণীর জেগে-থাকার কোন চিহ্নমাত্রও পাওয়া যাচ্ছে না বাইরে থেকে।

সকল ঘরগুলিই নিঃসীম আঁধারের মধ্যে ডুবে আছে। বাড়িতে যদি কোনও লোক থাকে তবে সেও নিশ্চয়ই জেগে বসে নেই—বহুক্ষণ আগেই ঢলে পড়েছে নিথর নিদ্রার কোলে।

লোকটি এবার পাশের সরু গলিপথটা ধরে বাড়িখানার পেছনের দিকে এগিয়ে যায়।

তার গতিভঙ্গি দেখে এ কথা বেশ স্পষ্টই বোঝা যায় যে, বিনা উদ্দেশ্যে সে নিশ্চয়ই এখানে আসেনি। কিন্তু তার উদ্দেশ্যটা যে কি তা ভাল করে বুঝতে পারা যায় না।

সময় কেটে চলে।

লোকটি চুপ করে নিচে দাঁড়িয়ে উপরের দিকে চেয়ে অপেক্ষা করতে থাকে।

আধঘণ্টা পর।

দোতলার কোণের ঘরটাতে পর পর দু'বার টর্চের আলো জ্বলে উঠেই দপ্ দপ্ করে নিভে যায়।

লোকটি যেন এতক্ষণ ঠিক এ জন্যেই অপেক্ষা করছিল। এবার সে সুযোগ বুঝে বাড়ির পেছনদিকের জলের পাইপটা বেয়ে ওপরের দিকে উঠতে থাকে। তার ওঠবার ভঙ্গি দেখে এ কথা বেশ স্পষ্ট বোঝা যায় সে এসব কাজে রীতিমতো অভিজ্ঞ।

দোতলার ছাদে উঠেই সে পাশের ঘরখানার দিকে এগিয়ে যায়। এই ঘরের মধ্যেই কিছুক্ষণ আগে আলো জ্বলতে দেখা গিয়েছিল।

ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে লোকটি এবার পর পর দু'বার তার টর্চটা 'ফোকাস্' করে। সঙ্গে সঙ্গে একজন ভৃত্যশ্রেণীর লোক ঘরের মধ্যে এসে প্রশ্ন করে—কে ওখানে?

লোকটি এগিয়ে গিয়ে বলে ওঠে—আমি রে। আমি দীপক।

ভৃত্যবেশী লোকটি বলে—তুই এসেছিস্ তা হলে? আমাকে ত চাকরের ছদ্মবেশে এ বাড়িতে ঢুকিয়ে তুই মনের আনন্দে আছিস্। এদিকে আমি গত কয়েকদিন ধরে প্রচুর খোঁজ করেও আসল জিনিসটার সন্ধান কিছুতেই পাচ্ছিলাম না।

ভৃত্যশ্রেণীর লোকটির গলার স্বর শুনে বোঝা যায় সে রতনলাল ছাড়া অন্য কেউ নয়।

—যাক্, এবার সে জিনিসটার খোঁজ পেয়েছিস্ ত?

—হ্যাঁ, ওই ঘরের ড্রয়ারের মধ্যেই আছে।

—যাক্, বাড়ির লোকজন সব গেল কোথায় বল্ ত?

—তা ঠিক জানি না। তবে সন্ধ্যাবেলা আবিনাশ বলল, কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে আজকের মতো কোল্‌কাতার বাইরে বেড়াতে যাচ্ছে।

—ঠিক আছে। এবার চল, জিনিসটা নিয়ে আমরা সরে পড়ি।

—তাই ভাল।

টেবিলের ড্রয়ার থেকে কি একটা জিনিস নিয়ে ওরা দুজনে পথে বেরিয়ে পড়ে। বাড়ির অন্য ভৃত্যেরা এ সম্বন্ধে বিন্দুমাত্রও জানতে পারে না।

পরদিন বিকেলে শ্যামপুকুর থানার পুলিশ অফিসার মিঃ এন্ দে একটা ফোন রিসিভ করলেন।

—হ্যালো, কে কথা বলছেন?

—আমি তেরো নম্বর হরিতলা লেন থেকে বলছি স্যার! কাল আমার বাড়িতে একটা চুরি হয়ে গেছে!

—A case of theft?

—হ্যাঁ স্যার।

—কি কি জিনিস চুরি গেছে?

—কতকগুলি কাগজ, কিছু টাকা আর একখানা ডায়েরী। অবশ্য অন্য জিনিসগুলির তেমন

গুরুত্ব নেই—ডায়েরীখানাই বড় গুরুত্বপূর্ণ ছিল আমার কাছে। এর মধ্যে এমন কতকগুলি জিনিস লেখা ছিল যা আমার পক্ষে খুবই প্রয়োজনীয়।

—কোনও লোককে কি সন্দেহ হয় আপনার?

—হ্যাঁ, যেদিন আমার ডায়েরীটা চুরি যায় সেদিন আমি বাড়িতে ছিলাম না। বিশেষ কাজে কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে একটু বাইরে গিয়েছিলাম। কাল আমি ফিরে এসে দেখি জিনিসগুলি চুরি ত গেছেই, সেই সঙ্গে একজন নবনিযুক্ত ভৃত্যেরও কোনও পাত্তা পাচ্ছি না।

—তার নাম কি?

—হরিচরণ।

—লোকটাকে কেমন মনে হয়?

—ভালই ত মনে হয়েছিল আমার! কিন্তু এখন দেখছি ওর পেটে পেটে এত বুদ্ধি ছিল!

—বেশ, আমি এক্ষুণি আসছি আপনার বাড়িতে—আমার মনে হয় কালপ্রিট্ নিশ্চয়ই ধরা পড়বে।

—ধন্যবাদ মিঃ দে। আমি অবশ্যই আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকব।

অবিনাশ ঘোষাল তার ফোনের রিসিভারটা নামিয়ে রাখে।

এগারো

—তদন্তের সূত্র—

শিল্পী মলয়ের মনে বিগত দিনের ঘটনাগুলো যেন অদ্ভুত একটা আলোড়ন তুলেছিল। তার সারা মন ভরে উঠেছিল কেমন যেন একটা বেদনা ও ম্রিয়মাণতায়।

মাঝে মাঝে অনেকে তার সঙ্গে দেখা করতে আসে। অনসূয়া, অবিনাশ, দীপক, ইন্‌স্পেক্টর ওঝা, ডাঃ সিন্‌হা ইত্যাদি। কিন্তু মলয়ের মোটেই ভাল লাগে না এসব। তার মন দিবারাত্র বাড়িতে ফিরে যাবার ইচ্ছায় ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

অবশেষে একদিন দীপক ও ডাঃ সিন্‌হার সঙ্গে বিশেষ পরামর্শ করে মলয় বাড়িতে ফিরে এলো।

সেদিন সন্ধ্যা।

মলয় বাড়ির দোতলার ব্যাল্‌কনিতে বসে আপন মনেই কি যেন চিন্তা করছিল।

পেছনে পদশব্দ। দীপক ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে।

মলয় ঘাড় ফিরিয়ে সেদিকে তাকায়। কিন্তু দীপকের দিকে চেয়ে কিছু সে দেখতে পেয়েছে বলে মনে হয় না।

—নমস্কার মলয়বাবু! দীপক বলে।

—নমস্কার মিঃ চ্যাটার্জী! দীপকের কণ্ঠস্বর থেকে মলয় তাকে ঠিকই চিনতে পেরেছিল।—তারপর, এ কেসটা নিয়ে কতদূর এগোলেন আপনি? আমি চাই আমার বাবার হত্যাকারী অবশ্যই ধরা পড়ুক।

—তা আমিও চাই। আর চাই বলেই আমি তাতে সফলও হয়েছি মিঃ মিশ্র।

—সফল হয়েছেন আপনি?

—হ্যাঁ, সত্যিই সফল হয়েছি। হত্যাকারী সত্যিই চালাক। সে যে কৌশলে কাজ করেছিল তাতে সত্যিই তাকে চিনতে পারা সহজ ছিল না। সে মেধাবী হতে পারে, কিন্তু আমিও দীপক চ্যাটার্জী। ধরা তাকে তাই পড়তেই হলো। অবশ্য ধরা এখনও পড়েনি, তবে সত্বর যে পড়বে তা বোঝা যায়।

—কিন্তু ডাঃ সিন্‌হাকে যে পর পর দুখানা চিঠি লিখেছিল এবং তাঁর ওপর বোমা নিক্ষেপ করেছিল সেই কি হত্যাকারী?

—হ্যাঁ, সেই আসল হত্যাকারী। সে চায় না আপনার চোখ দুটো ভাল হয়ে উঠুক। তাই সে নিরুপায় হয়ে আপনার পিতাকে হত্যা করেছে। এর কারণ হচ্ছে এই যে, হত্যা করলে আপনার পিতার জ্যান্ত চোখটি তিনি আর আপনার জন্যে sacrifice করতে পারবেন না—আপনার চোখটিরও আর আরোগ্যের আশা থাকে না।

—এতদূর mean লোক সে?

—ঠিক তাই। তা ছাড়া সেই-ই স্বেচ্ছায় বোরিক লোশন-এর শিশির পরিবর্তে আপনার ঘরে তীব্র অ্যাসিডের শিশি রেখেছিল যাতে দুর্ঘটনায় আপনার চোখটি নষ্ট হয়।

—আমি তা আগেই আন্দাজ করেছিলাম মিঃ চ্যাটার্জী। এবং আসল আসামী যাতে ধরা পড়ে সেজন্যে...

—এখন ও কথা থাক মিঃ মিশ্র। আমি এ ব্যাপারে আপনার সাহায্য চাই...

—আমার পক্ষে যতোটা সম্ভব আপনাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত আছি।

—বেশ, তা হলে শুনুন আমার কথা। এই যে 'নাট'টা আপনাকে দিচ্ছি এটাই হচ্ছে আমার সমস্ত তদন্তের মূলসূত্র।

দীপক তার পকেট থেকে 'নাট্'টা বের করে তুলে দেয় মলয়ের হাতে।

মলয় সেটা হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে।

দীপক বলে—আপনার পিতাকে যে লাঠির আঘাতে হত্যা করা হয়, তার ঠিক মাথার সঙ্গে 'ফিট' করা ছিল একটা বড় নব্—আমার ধারণা সেটা সেই লাঠির সঙ্গে একটা স্ক্রু দিয়ে আটকানো ছিল। আর সেই স্ক্রুটা লাগানো ছিল এই 'নাট্'টির সাহায্যে। 'নাট্'টি বোধ হয় পর পর আঘাত করবার জন্যে আকস্মিকভাবে খুলে পড়ে গেছে। আমি এটা আপনার পিতার শয়নকক্ষে কুড়িয়ে পেয়েছি।

মলয় কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলে—আমি কি করে এই সূত্রটা কাজে লাগাব তা ত বুঝতে পারছি না মিঃ চ্যাটার্জী।

দীপক বলে—সেটা এমন কিছুই কঠিন নয় মিঃ মিশ্র। আপনি এমন একটি লাঠির খোঁজ করুন যার সঙ্গে এই স্ক্রুটি ঠিক 'ফিট্' করে। এ কাজ আপনি যতোটা ভাল পারবেন, আমি ততোটা পারব না, তা নিশ্চয়ই অস্বীকার করেন না আপনি!

—তা ত বটেই। সেটুকু সাহায্য আমি আপনাকে অবশ্যই করতে পারব মিঃ চ্যাটার্জী।

—তারপর আপনার কাজ হবে ঠিকমতো অপরাধীকে খুঁজে বের করেই আপনি আমাদের টেলিফোনে জানাবেন। তারপর কি কি কাজ করতে হবে তা আমি আপনাকে এখন বলে দিচ্ছি।

—বেশ, আমি আপনার কথা অনুসারে চলতে আপ্রাণ চেষ্টা করব।

—তা হলে আসল অপরাধীকে গ্রেপ্তার করবার আর কোনও বাধা-বিপত্তিই যে থাকবে না সে সম্বন্ধে আপনাকে আমি গ্যারাণ্টি দিতে পারি মিঃ মিশ্র।

—বেশ, এবার বলুন আমি কি ভাবে অগ্রসর হবো?

—শুনুন আমার সেই বিচিত্র প্ল্যান...

বারো

—আলোচনা ঃ আহ্বান—

পরদিন বেলা দশটা।

মলয়ের বন্ধু অবিনাশ ঘোষাল তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল।

মলয় অবিনাশের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করে—আপনি হঠাৎ কয়েকটি দিন পরে এসেছেন। এ ক'দিন আসেননি কেন?

অবিনাশ বলে—কতকগুলি কারণে আমাকে বিশেষ ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল মলয়বাবু। তাই...

—সে কারণগুলি জানবার জন্যে আমার কৌতূহল হচ্ছে। অবশ্য যদি আপনার কোনও আপত্তি না থাকে তবে...

—না না, আপত্তির কি আছে! তা ছাড়া সেটা এমন কিছু প্রাইভেট অ্যাণ্ড কন্‌ফিডেন্‌সিয়্যাল ব্যাপারও নয়! আমার বাড়ি থেকে হঠাৎ সেদিন কতকগুলি জিনিসপত্র চুরি গেছে।

—চুরি গেছে?

—হ্যাঁ। আমি সেদিন বাইরে গিয়েছিলাম আমার কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে। ফিরে এসে দেখি আমার জিনিসগুলি চুরি গেছে—আমার নবনিযুক্ত চাকরটিও একেবারে অদৃশ্য।

—এটা বোধ হয় তারই কাজ, তাই না?

—অবশ্যই। কিন্তু আশ্চর্য, লোকটিকে দেখে প্রথম দর্শনে আমার কিন্তু এতটুকুও সন্দেহ হয়নি।

—সত্যি, কার মনের মধ্যে যে কি থাকে তা দেবতারাও বুঝতে পারেন না। তাই মানুষকে বাইরে থেকে দেখে আজ আর এতটুকুও বিশ্বাস করা চলে না।

—কিন্তু আমার একটা চাকরকে দেখেই ত আর একটা ডিডাকশনে পৌছানো যায় না!

অবিনাশ যেন মলয়ের একথাটাকে অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেবার চেষ্টা করতে থাকে। মলয়ের কথার তীক্ষ্ণতা যেন তার একটু বিসদৃশ মনে হয়।

মলয় অবিনাশের হাতের লাঠিটা নিজের হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কি যেন দেখছিল। এবার প্রশ্ন করে—এমন কিছু মূল্যবান্ জিনিস নিশ্চয়ই হারায়নি, কি বলেন আপনি?

অবিনাশ একটু ইতস্ততঃ করে বলে—একটা জিনিস অবশ্য খুবই মূল্যবান্ ছিল। কিন্তু আমি তখন তা ঠিক বুঝতে পারিনি বলে সেটা খুব বেশি সাবধানে রাখিনি। এখন বুঝতে পারছি...

—সেটা কি খুবই মূল্যবান্?

—মূল্যবান্ বটে, তবে চোর সেটা চুরি করেও যে খুব বেশি লাভবান হবে তা মনে হয় না!

মলয় কোনও কথা বলে না। ধীরে ধীরে অবিনাশের লাঠিখানা তার হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বলে—আচ্ছা, অনসূয়ার কোনও খবর রাখেন নাকি?

—তেমন খবর আর কি? অবিনাশ বলে—মোটামুটি সে ভালই আছে। অবশ্য হঠাৎ আপনার চোখ দুটি চিরদিনের জন্য অন্ধ হয়ে যাওয়াতে বেচারা বড়ই shock পেয়েছে। আর সে আপনাকে অত্যন্ত ভালবাসত কিন্তু...

—কিন্তুর কথা পরে চিন্তা করলেও চলবে অবিনাশবাবু। যাক্, আজ সন্ধ্যায় আমার বাড়িতে একটা টি-পার্টির ব্যবস্থা করেছি আমি। আশা করি সে পার্টিতে আপনি অবশ্যই আসবেন।

—আমি নিশ্চয়ই আসতে চেষ্টা করব—কিন্তু কি উপলক্ষ করে পার্টিটা হচ্ছে মলয়বাবু?

—আমি অন্ধ হলেও, আমার জন্মদিনটাকে স্মরণীয় করে রাখার মধ্যে নিশ্চয়ই আপনার আপত্তি নেই?

মলয়ের স্বরটা যেন আবেগকম্পিত বলে মনে হয়।

—ও, আজই আপনার জন্মদিন? আমি অত্যন্ত দুঃখিত মলয়বাবু, আপনার মনে অযথা ব্যথা দিয়েছি বলে আমি দুঃখিত। আমি নিশ্চয়ই আসব আজ সন্ধ্যায়!

—ধন্যবাদ।

—আচ্ছা, এবেলার মতো আসি মিঃ মিশ্র। ওবেলা আবার আসছি আপনার জন্মদিন উৎসবে। অন্য বন্ধুবান্ধবদেরও নিশ্চয়ই আপনি আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

—হ্যাঁ, আমার নিকটতম যতো বন্ধুবান্ধব আছে সকলকেই আমন্ত্রণ জানিয়েছি আমি। আশা করি তাঁরা সকলেই আজ সন্ধ্যায় আসবেন।

নমস্কার জানিয়ে অবিনাশ ঘোষাল প্রস্থান করে।

আধঘণ্টা পরের কথা।

দীপকের টেলিফোনটা ঘন ঘন বাজতে থাকে।

রিসিভারটা তুলে নিয়ে দীপক প্রশ্ন করে—হ্যালো, কে কথা বলছেন?

—আমি মলয়।

—নমস্কার মিঃ মিশ্র! তারপর খবর কি?

—আজ সন্ধ্যা সাতটায় আমার বাড়িতে আপনার নিমন্ত্রণ রইল।

—কি আশ্চর্য! এদিকের খবর কি বলুন?

—Everything successful মিঃ চ্যাটার্জী...

—ধন্যবাদ। এবার অন্য কাজগুলোও...

—নিশ্চয়ই।

দীপক রিসিভারটা নামিয়ে রাখে।

পনর মিনিটের মধ্যে মলয়ের টেলিফোন রিসিভ্ করেন ডাঃ সিন্‌হা, পুলিশ ও. সি. মিঃ ওঝা ও অনসূয়া।

সকলকেই মলয় সেদিন সন্ধ্যা সাতটায় তার বাড়িতে টি-পার্টি উপলক্ষে আমন্ত্রণ জানায়।

সকলেই সম্মতি জানিয়ে বলেন যে তাঁরা আসতে প্রস্তুত।

মলয় রিসিভারটা নামিয়ে রেখে গভীরভাবে কি যেন চিন্তা করতে থাকে।

তেরো

—পরিশেষ—

সেদিনই সন্ধ্যা সাতটা।

সবেমাত্র শীত বিদায় নিচ্ছে। বসন্ত এখনও পুরোপুরি নামেনি. পৃথিবীর বুকে।

শীত আর বসন্তের মাঝামাঝি একটা জায়গায় এসে ঋতুচক্র যেন থম্‌কে দাঁড়িয়েছে। হিমেলা হাওয়ায় কিছুটা বাসন্তী আমেজের সন্ধান পাওয়া যায়।

মিঃ ওঝা, দীপক, অনসূয়া ও ডাঃ সিন্‌হা আগেই পৌঁছে গেছেন। তাঁদের সকলকে কোণের একটা ঘরে টি-টেবিলের সাম্‌নে বসিয়ে রেখে মলয় নিজে বসেছে পাশের ঘরে।

অবশ্য সে যে কেন পাশের ঘরে গিয়ে বসল তা একমাত্র দীপক ছাড়া আর কেউ জানে না।

ঢং—

ঘড়ির শব্দ ঘোষণা করল সাড়ে সাতটা।

একটা গাড়ি দাঁড়াবার শব্দ শোনা গেল। অবিনাশ গাড়ি থেকে নেমে ভেতরে প্রবেশ করে।

সামনের ঘরেই মলয়কে দেখতে পেয়ে ভেতরে প্রবেশ করে অবিনাশ প্রশ্ন করে—একি, আপনি যে একা বসে আছেন? অন্য সব নিমন্ত্রিত লোকেরা...

মলয় বলে—আপনি বসুন না। চা খেতে খেতে অন্য সকলে নিশ্চয় এসে পড়বেন!

একজন খানসামা এসে চা আর খাবার দিয়ে যায়।

অবিনাশ খেতে সুরু করলে মলয় ধীরে ধীরে সুরু করে—আজকে আপনাকে একটা গল্প শোনাব মিঃ ঘোষাল!

—গল্প?

অবাক বিস্ময়ে অবিনাশ প্রশ্ন করে।

—হ্যাঁ, শুনুন। গল্পটা শুনতে আপনার নিশ্চয় ভাল লাগবে অবিনাশবাবু।

—গল্প শুনতে আমার আর আপত্তির কি আছে? কিন্তু নিমন্ত্রিত অন্য সকলে কোথায় গেলেন?

—তাঁরা পাশের ঘরে আছেন।

—তা হলে গল্প কি শুধু আমাকে শোনাতে চান?

—হ্যাঁ, তাঁরা খেতে বসে গেছেন। তাঁদের খাওয়াদাওয়া শেষ হলে আপনার জন্যে special ব্যবস্থা করব।

—না না, আমার জন্যে আপনার এতটা কষ্ট স্বীকার করবার কোনও প্রয়োজন ছিল না।

—তা কি হয়? আপনাকে আমার গল্প শোনাতেই হবে। তা ছাড়া আপনার মতো সমঝদার লোক এখানে আর কে আছে?

অবিনাশ চুপ করে বসে থাকে। তা ছাড়া অন্ধ মলয়ের কথায় বাধা দিয়ে তার মনে অযথা দুঃখ দিতে চায় না সে। সে তাই বলে—বেশ, সুরু করুন আপনার কাহিনী, মলয়বাবু।

মলয় সুরু করে—এক ধনী জমিদারের একমাত্র ছেলে ছিল শিল্পী। সে একজন প্রখ্যাত শিল্পী বলে খ্যাতিও অর্জন করেছিল। একটি নারীর প্রতি সে কিছুটা আকৃষ্ট হয়—মেয়েটিও তাকে মনেপ্রাণে ভালবাসত। কিন্তু শিল্পীর একজন বন্ধুও মেয়েটিকে কামনা করত। কিন্তু মেয়েটি তার প্রতি আদৌ আকৃষ্ট হয়নি।

তার পরে ঘটল এক বিপর্যয়। শিল্পীর সেই বন্ধু কোনও একটি কৌশলে দুর্ঘটনা ঘটিয়ে শিল্পীর চোখ দুটিকে চিরদিনের জন্যে অন্ধ করে দিল।

—সো স্ট্রেঞ্জ! আপনার জীবনের সঙ্গে ঘটনাটির খানিকটা মিল আছে দেখছি!

—হ্যাঁ, তারপর শুনুন। শিল্পীর বাবার একজন বন্ধু ছিলেন বিখ্যাত সার্জন। তিনি অপারেশনের সাহায্যে শিল্পীর চোখ দুটিকে ভাল করে তুলতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তাতে তিনি ব্যর্থ হয়েছেন বলে বুঝতে পেরে তার বাবার একটি জ্যান্ত চোখ দিয়ে অপারেশন করবেন বলে ঠিক করলেন।

কিন্তু এবারেও ঘটল বিপর্যয়। একদিন গভীর রাতে শিল্পীর বাবা সেই বন্ধুটির হাতেই প্রাণ হারালেন। অবশ্য বন্ধুটি ছদ্মবেশে এসেছিলেন বলেই মনে হয়।

—আপনি এসব কি বলছেন? অবিনাশ তীক্ষ্ণকণ্ঠে প্রশ্ন করে।

—ঠিকই বলছি। এই দেখুন..

অবিনাশের লাঠিটা তার হাত থেকে টেনে নিয়ে মলয় তার একটি স্ক্রুতে তার পকেটের নাট্‌টি ফিট্ করে বলে—এই দেখুন। এই নাট্‌টি আমার বাবার শয়নকক্ষে পাওয়া গিয়েছিল।

কথা বলে মলয় লাঠিটা অবিনাশের হাতে ফিরিয়ে দেয়। অবিনাশ যেন এই সুযোগের জন্যেই অপেক্ষা করছিল এতক্ষণ। সে লাঠিটা তুলে নিয়ে প্রাণপণে আঘাত হানে মলয়ের মাথায়।

কিন্তু আশ্চর্য!

মলয় একলাফে পাশে সরে দাঁড়ায়। লাঠিটা গিয়ে লাগে টেবিলের ওপর।

অবিনাশ অবাক বিস্ময়ে চেয়ে দেখে মলয়ের হাতে চক্‌চক্ করছে একটা রিভলভার।

বিহ্বলকণ্ঠে অবিনাশ বলে—আপনি কি তবে চোখে দেখতে পান? মানে আমি কিছুই বুঝতে...

হো হো করে হেসে উঠে মলয় বলে—ডাঃ সিন্‌হার হাতের গুণে আমি আমার চোখ ঠিকই ফিরে পেয়েছিলাম। কিন্তু এতদিন অন্ধের অভিনয় করেছি কেবলমাত্র অপরাধীকে গ্রেপ্তার করবার জন্যে।

ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে দীপক, রতন, মিঃ ওঝা, ডাঃ সিন্‌হা ও অনসূয়া।

মিঃ ওঝা বলেন—আপনার বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ আপনার হাতের লেখা এ

ডায়েরীটা দীপকবাবুই চুরি করে এনেছিলেন। এটাই আপনার বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ। আপনার বাড়িতে চাকর সেজে কাজ করেছিলেন ইনিই—দীপকবাবুর সহকারী রতনবাবু। এঁদের যে কি বলে ধন্যবাদ জানাব...

ডাঃ সিন্‌হার কিন্তু এ সব কথায় মন ছিল না। তিনি চীৎকার করে উঠলেন—আমার অপারেশন সফল হয়েছে মিঃ চ্যাটার্জী! ভগবানকে ধন্যবাদ, বর্তমান সার্জারীতে একটা নতুন জিনিস দান করতে সক্ষম হয়েছি আমি!

অনসূয়ার মুখে ফুটে উঠে আনন্দের আলো। অপূর্ব একটা উজ্জ্বলতায় যেন উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে তার মুখ।

রতনের ডায়েরী

বিশ্বচক্রের পাঠক-পাঠিকার জন্যে আমি আমার এই পুরোনো ডায়েরীটা দিয়েছিলাম আমাদের বন্ধু সাহিত্যিক শ্রীস্বপনকুমারের হাতে।

তিনি এটা দেখে বললেন, সবই ঠিক আছে, কেবল ভাষার কিছু পরিবর্তন করলেই এ থেকে একটা চমৎকার উপন্যাস হতে পারে।

ডায়েরীটা বহুদিন বাদে খুঁজে পেয়েছিলাম বলেই তিনি এটি গল্প আকারে তুলে ধরলেন আপনাদের সাম্‌নে। আশা করি আমাদের এই হারানো ডায়েরীর কাহিনী শুনতে আপনাদের নিশ্চয়ই খুব ভাল লাগবে।

এমনি আমাদের জীবনের আরও বহু রোমাঞ্চকর ঘটনাপূর্ণ জটিল কেসগুলির কাহিনী আপনাদের শোনাব।

আপনাদের সকলকে আমার ও আমার বন্ধু দীপকের স্নেহ, প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে ডায়েরী শেষ করছি।

নমস্কার।

—শেষ—

বিকেল ছ'টার শো'তে

এক

—পূর্বপ্রান্তে—

এটা শহরের দরিদ্র অঞ্চল—প্রাচীন বনেদিয়ানার গন্ধ আছে কিন্তু অর্থের জৌলুস নেই। ক্ষয়াক্রান্ত মুমূর্ষু রোগীর মতো হাঁপাতে হাঁপাতে নদীর ধার দিয়ে যে খোয়া আর নুড়ি-ওঠা পথটা এঁকেবেঁকে এগিয়ে চলেছে, এটাই এ অঞ্চলের সবচেয়ে বড় রাস্তা।

এটাই হচ্ছে ছোট্ট মফঃস্বল শহরটার পূর্বপ্রান্তের ব্রড্‌ওয়ে। জীর্ণ, তালিদেওয়া পাঞ্জাবী বা শার্টের ওপর ময়লা প্যান্ট আর বিবর্ণ কোট চাপিয়ে এই অঞ্চলের যে উকিলরা শহরে অপর প্রান্তের হাকিমদের দরবারে সওয়াল করতে যান, তাঁরাই হচ্ছেন এই 'ঈস্ট এণ্ড'-এর আধুনিকতম ব্যক্তি।

দাঁত-বের-করা বাড়িগুলো থেকে চুন-বালির আস্তরণ খসে পড়ে হতভাগার করুণ দীর্ঘশ্বাসের মতো। ছোট-বড়-মাঝারি নানা আকারের বাড়িগুলোয় সব শ্রেণীর বাসিন্দাদের জীবনতন্ত্রীই যেন একসুরে বাঁধা। শিক্ষার আলো সোজা পথে এখানে প্রবেশ করতে পারেনি—করেছে একটা বিশেষ খোলসের বাঁকা পথে। স্পষ্টবাদিতা তাই এখানে পাপ নয়—অন্যায়।

হোটেল-রেস্টুরেন্টের যুগে 'ঈস্ট এণ্ড'-এর পবিত্র হিন্দু হোটেলগুলি নিশ্চয়ই আজকের অগ্রগমনশীল পৃথিবীর যে কোনও রুচিজ্ঞানসম্পন্ন যুবকের নাসিকাকে কুঞ্চিত করে অকারণে। করোগেট্ টিনের তৈরী ডাস্টবিনে নেড়ি কুকুরের কুণ্ডলী। কাকেদের সরব জটলা।

এই অঞ্চলের যে সব বাড়িতে সামান্য নারী-শিক্ষার আলো ঢুকেছে, তাদের মেয়েরাও পায়ে হেঁটে পথ চলে না। স্কুলের বাসের দরজার ফাঁকে তাদের পাণ্ডুর ভয়ার্ত মুখগুলো লুকিয়ে তারা বাড়ি থেকে স্কুলের দরজায় গিয়ে উপস্থিত হয়।

প্রাচীন 'ঈস্ট এণ্ড'-এর বুকের ওপর যখন এই বাসগুলো ধুলো উড়িয়ে ছুটে চলে, তখন আশেপাশের দু-একটা রক্ থেকে টুকরো গানের কলি ভেসে আসে। নীরব কামনার নিষ্ফল অন্ধ বহিঃপ্রকাশ।

কিন্তু এর ঠিক উল্টো হচ্ছে অন্য প্রান্ত—মানে ওয়েস্ট এণ্ড।

সুবিশাল পিচ্-ঢালা মসৃণ পথ। প্রত্যেকটি বাড়ি নিজ নিজ গর্বে উদ্ধত হয়ে পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেমেছে যেন। বাড়ির বাসিন্দারা ছোট-বড় নানা গভর্নমেণ্ট পোস্ট অলঙ্কৃত করে ছোট এই শহরটিতে বাস করে যেন শহরের গৌরব বৃদ্ধি করছেন। এঁদের মধ্যে অনেকেই বিলেত-ফেরত। বিলেতের রঙীন স্বপ্ন এখনও তাঁদের চোখে জড়ানো। কোল্‌কাতার সঙ্গে তাঁদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। তাঁদের উগ্র সাহেবীয়ানা বোধ হয় আসল সাহেবকেও লজ্জা দেবে।

এ বর্ণনা হচ্ছে ১৯৪৩ সালের জুন মাসের। দেশ তখনও স্বাধীন হয়নি। খদ্দর পরাটাকে তখন সাধারণ মানুষ গর্বের চোখে দেখত না—বরং সরকারী কর্মচারীর ছেলের গায়ে খদ্দর উঠলে বাবা-মা আতঙ্কে শিউরে উঠতেন। স্বাধীনতা-আন্দোলন তখন শহরের 'ওয়েস্ট এণ্ড-

এর লোকেদের চোখে কয়েকটি বড়লোকের ছেলের অহেতুক পাগলামি বলে পরিগণিত হতো। বিলেত ছিল তাদের চোখে অবাস্তব কল্পনায় গড়া আদর্শ এক দেশ।

'ওয়েস্ট এণ্ড'-এর বড় বড় বাড়িগুলো থেকে নির্দিষ্ট সময়ে ছেলে-মেয়েরা সার বেঁধে বেরিয়ে আসে। বাবা অফিসে যাবার পথে হয়ত নতুন মডেলের গাড়িতে করে তাদের মাঝে মাঝে স্কুলে বা কলেজে পৌঁছে দিয়ে যান।

বাবাদের দেখাদেখি ছেলেরাও অকালে স্যুট ধরেছে। আর যারা নেহাৎ আদর্শবাদী কলেজে-পড়া তরুণ তাদের পরনে দামী সিল্কের পাঞ্জাবী ফাইন মিলের ধুতির ওপর শোভা পায়। শহরের 'ঈস্ট এণ্ড'-এর ছেলেরা এদের অনর্থক 'বাবুয়ানি'কে ঘৃণার চোখে দেখতে অভ্যস্ত— আর 'ঈস্ট এণ্ড'দের ওরা সুরেন্দ্র ব্যানার্জীর সমগোত্রীয় ছাড়া বেশি অ্যাড্ভান্সড্ বলে ভাবতে পারে না।

দাঁতের ফাঁকে চিবিয়ে চিবিয়ে 'ওয়েস্ট এণ্ড'-এর ছেলেরা যখন প্রফেসারের নতুন কোনও লেকচারের ব্যাখ্যা নিয়ে ব্যস্ত থাকে তখন 'ঈস্ট এণ্ড'-এর স্বল্পসংখ্যক ছাত্রেরা 'তরুণী-চর্চা'র হাসিতে মুখর হয়ে ওঠে। এরা তখন জি. বি. এস., বার্ট্রাণ্ড রাসেল অথবা 'হেগেল্' আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে 'হেক্সাগন' ফ্রেমের চশমার বেষ্টনীতে আবদ্ধ চোখদুটো ওদের দিকে তুলে ধরে অনুকম্পার সুরে বলে ওঠে—'ন্যাস্টি'।

কিন্তু 'ঈস্ট এণ্ড'-এর সঙ্গে 'ওয়েস্ট এণ্ড'-এর এই পর্বতপ্রমাণ পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও দুইয়ের মিলনেই চলছে শহরের জীবনপ্রবাহ। একজনকে ছাড়া অন্যের জীবন অচল।

পূর্বপ্রান্তের পেস্কারকে না হলে পশ্চিমপ্রান্তের হাকিমদের চলে না। পশ্চিমপ্রান্তের হাকিমদের কৃপাকটাক্ষের আশায় পূর্বপ্রান্তের উকিলেরা তৎপর। পূর্বপ্রান্তের 'হরিধাম' অথবা ধর্মসভার সভাপতি পশ্চিমপ্রান্তের কোনও এক নাস্তিক মোটা-মাইনের অফিসার। পূর্বপ্রান্তের কেন্দ্রে অবস্থিত মার্কেটে পশ্চিমপ্রান্তের সাহেবদের আরদালীর প্রত্যহ সকালে উঠেই পদধূলি দিতে হয়।

সম্বন্ধ যেখানে নিবিড় সেখানে শত বাধা সত্ত্বেও মৌখিক ভদ্রতা বজায় রেখে চলতে হবে। তাই পূর্ব আর পশ্চিম মনে মনে না মিললেও দেখা হলে উভয়েই হাসি আর ভদ্রতার বাঁধা বুলি বজায় রাখতে ব্যস্ত।

এমনি ভাবেই হয়ত জীবন চলত।

পুবের গাঁদাফুলের চারা আর পশ্চিমের পাতাবাহার বা আইভিলতার মিলন হয়ত কোনও কালেই ঘটত না। এর মাঝে হঠাৎ বাধার সৃষ্টি করল পূর্বপ্রান্তের একটি ছেলে আর পশ্চিমপ্রান্তের একটি মেয়ে। তাদের কথা নিয়েই এবার গল্পের গতির মোড় ফিরছে।

কলেজের কি একটা ফাংশান ছিল সেদিন।

মফঃস্বলের একমাত্র কলেজ। পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তের মিলনকেন্দ্র। এখানে কো-এডুকেশন প্রথা চালু আছে আজও।

অবশ্য সম্ভ্রান্ত ঘরের ছেলে-মেয়েরা যারা ইউনিভার্সিটিকে চম্‌কে দিয়ে গোল্ড মেডেল পাওয়ার স্বপ্ন দেখে তারা কোল্‌কাতায় পড়তে যায়।

সে কথা যাক। ফাংশান শেষ হতে বেশ একটু রাত হলো। সাড়ে দশটা।

বাড়ি ফিরবে মনে করছিল পরিমল। পরিমল সেন ওর পুরো নাম। 'ঈস্ট এণ্ড'-এর কোন্ এক সাবেকী উকিলের ছেলে হলেও স্মার্টনেসের জন্যে ও কলেজে বিখ্যাত।

পরীক্ষায় বরাবর ভাল রেজাল্ট করেছে ও। ফোর্থ ইয়ারে পড়ে। ভাল 'ফিজিক্'। ডন-বৈঠক-করা চেহারা। সত্য ও ন্যায়নিষ্ঠার জন্যে কলেজে ওর নাম আছে। প্রফেসরমহলের অধিকাংশই ওকে স্নেহ করেন। 'ঈস্ট এণ্ড'-এর ছেলেদের গৌরব।

কলেজ ফাংশানের শেষে বাড়ি ফিরবে ভেবে সে বেরিয়ে এসেছে প্যাণ্ডেল থেকে, এমন সময় আহ্বান এলো অকস্মাৎ।

একটি স্বল্পপরিচিতা মেয়ে পরিমলের কাছে এসে আহ্বান জানাল—অনেক রাত হয়েছে, আমাকে বাড়ি পৌঁছে দেবেন দয়া করে?

পরিমল ফিরে চায় তার দিকে।

সমুদ্রের মতো অতলান্ত নীল দুটি চোখের দিকে তাকিয়ে যেন তার ভাষা হারিয়ে যায়। ধীরে ধীরে বলে—চলুন। কোথায় পৌঁছে দিতে হবে আপনাকে?

—অফিসার পাড়া। ছোট্ট উত্তর আসে। কিন্তু কথাব স্বল্পতার মধ্যেও যেন কোন্ একটা স্বপ্নের সুর ভেসে আসে।

—বেশ চলুন। 'ওয়েস্ট এণ্ড'-এর একটি মেয়ের সঙ্গে আমাকে দেখলে ওরা অবশ্য অনেক কিছু বলাবলি করবে। কিন্তু এসব গায়ে মাখি না আমি।

স্বচ্ছ, দৃঢ় উত্তর।

মেয়েটি অবাক হয়ে আর একবার তাকায় পরিমলের দিকে। মনে মনে বোধ হয় ভাবে, সে উপযুক্ত লোকের কাছেই approach করেছে।

এগিয়ে চলে দুজনে। পাশাপাশি। কাছাকাছি। মৃদু সৌরভ এসে লাগে পরিমলের নাকে। মিঠে গন্ধ। আচ্ছন্ন হয়ে যায় পরিমলের চেতনা। ঝাপ্‌সা হয়ে ওঠে তার মন।

জনবিরল প্রশস্ত পথ। প্রকাণ্ড পরিবেশ। পাশাপাশি এগিয়ে চলে দুজনে।

ঘন লাল রঙের শাড়িটা লেপ্‌টে থাকে মেয়েটির সর্বাঙ্গে। তার দেহের প্রতিটি রেখায় যেন ফুটে ওঠে একটা উদ্ধত সৌন্দর্য। যেন আগুনের শিখার মতো একরাশ পুঞ্জীভূত সৌন্দর্যের দৃপ্ততা।

—আজকের ফাংশান কেমন লাগল আপনার? পরিমল প্রশ্ন করে।

—ভাল। আমাকেও গান গাইবার জন্যে পীড়াপীড়ি করছিল, কিন্তু আগে থেকে তৈরী হয়ে আসিনি বলে—

—আপনিও বুঝি গান গাইতে পারেন?

—চেষ্টা করি। তবে কেমন উৎরোয় বলতে পারি না।

—কোন্ ইয়ার পড়েন আপনি?

—ফার্স্ট ইয়ার। আপনি ত ফোর্থ ইয়ার স্টুডেন্ট?

—হ্যাঁ, এইটে পরীক্ষার বছর।

—পড়াশুনা বোধ হয় সব তৈরী! তা না হলে এত রাত পর্যন্ত কি আর ঘুরে বেড়ান!

—কিছু তৈরী বটে—তবে জানেন ত, পরীক্ষার পড়া যতো তৈরীই হোক, মন স্যাটিস্‌ফায়েড্ হয় না!

—তা বটে।

—আপনার নামটা কিন্তু এখনো জিজ্ঞেস করা হয়নি। পরিমল দ্বিধাগ্রস্ত সুরে প্রশ্ন করে।

—লীনা দাশগুপ্ত। ওই ছোট লাল বাড়িটা আমাদের। চলি—অবশ্য বিদায় নিচ্ছি না। কারণ আপনাকে আমার প্রয়োজন হতে পারে।

—কেন?

—পরে জানাব। যদি কিছু মনে না করেন, কাল বিকেল ছ'টার শো'তে আপনাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। 'দীপালী'তে কাল আসবেন ত?

—বেশ। আপনার আমন্ত্রণকে অস্বীকার করবার মতো নিষ্ঠুর মন আমার নয় লীনা দেবী।

দ্রুত বাড়ির মধ্যে অদৃশ্য হয় লীনা। শেষবারের মতো সে একবার তাকায় পরিমলের দিকে। তার নীলাভ চোখদুটি যেন ভীরুতায় কম্পমান। সে কাঁপন যেন পরিমলের বুকেও তরঙ্গের আলোড়ন তোলে।

পরিমলের মনে হয় মেয়েটি যেন কোনও একটা বিপদে পড়েছে। কেমন যেন একটা অন্তহীন ভয় তার মনকে দোলা দিচ্ছে। পরিমলের কাছে সে যেন বলতে চেয়েছিল অনেক কিছু। কিন্তু মনের ভয় তার মুখকে বন্ধ রেখেছে।

বাড়ির দিকে পা বাড়ায় পরিমল।

পিচ্-ঢালা মসৃণ পথ ধরে এগিয়ে চলে।

পাশের বাড়ি থেকে রজনীগন্ধার উপ্চে-ওঠা গন্ধ ভেসে আসে বয়ে-যাওয়া বাতাসে। সীজন্ ফ্লাওয়ার আর ঝাউয়ের কুঞ্জে বাতাসের দোলায় অস্ফুট মর্মর জাগে।

এগিয়ে চলে পরিমল।

তার সারা মন জুড়ে আজ শুধু জাগছে একটি নারীর ছবি। একটি ভয়ার্ত মেয়ের দুটি চোখের ভীত চাউনি—আর্তা বনহরিণীর দৃষ্টি যেন!

এই সামান্য কয়েকটি মুহূর্তের পরিচয়ে লীনা যেন তার সমস্ত সত্তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

সে বুঝতে পারে যে লীনার প্রতি একটা অহেতুক আকর্ষণ এসে দানা বেঁধেছে তার মনে।

সমুদ্রের মতো নিতল নীল চোখ। ঝক্‌ঝকে ঝিনুকের মতো হাসি। অসমতল দেহে অফুরন্ত যৌবন। পিঠের ওপর লুটিয়ে পড়া রেশমী চুলের গুচ্ছ। 'ক্যালিফোর্ণিয়া পপি'র মিঠে সৌরভ।

সব কিছু মিলে লীনাকে তার ভাল লেগেছে।

একটা অস্পষ্ট, অস্বচ্ছ অনুভূতি এসে আচ্ছন্ন করেছে তার সারা মন।

পরিমলের জীবনে এ অনুভূতি এই প্রথম। পরিমল ভাবতে থাকে। একেই কি বিভিন্ন কবিরা বর্ণনা করেছেন বিভিন্ন ভাষায়? এই কি মানুষের হৃদয়ের চিরন্তন, শাশ্বত ভাল-লাগার অনুভূতি?

পরিমল যেন স্বপ্নের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলে।

দুই

—সাইকেল-আরোহী—

পরিমলের স্বপ্ন টুটে যায়।

পশ্চিমপ্রান্তের নির্জনতা আর সৌন্দর্যের অবকাশে যে স্বপ্ন তার মনে দানা বেঁধে উঠছিল মুহূর্তের মধ্যে তা ছিন্ন হয়ে গেল ঘন ঘন সাইকেলের হর্নের শব্দে।

পরিমল পেছন ফিরে তাকায়।

একজন দীর্ঘদেহী লোক সাইকেলের আরোহী। পরিমল তার দিকে চাইতেই সে হঠাৎ সাইকেলটা থামিয়ে কি একটা গোল জিনিস তার দিকে ছুঁড়ে দেয়।

হিস্ হিস্ অস্পষ্ট শব্দ। ধোঁয়ার কুণ্ডলী। পরিমলের মাথার মধ্যে কেমন যেন ঝিম্‌ঝিম্ করতে থাকে। সব চিন্তা গুলিয়ে যায় ধীরে ধীরে।

সাইকেল অদৃশ্য হয় আরোহীকে বুকে নিয়ে।

দূরে শব্দ মিলিয়ে যায়। বহুদূরে।

জ্ঞানহীন পরিমল সেনের সেদিকে দৃষ্টি দেবার অবকাশ থাকে না তখন। শত্রু কে তা নিশ্চিতরূপে জানবার আগেই তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবার মতো শক্তি হারিয়ে ফেলে সে।

জ্ঞান যখন ফিরে আসে তখন ধীরে ধীরে পূর্বাশার প্রান্তে নবারুণ চোখ মেলে চাইছে মিটিমিটি।

পরিমল সোজা হয়ে উঠে বসে।

মাথার মধ্যে অস্পষ্টতা। সারা শরীরে অসহ্য ব্যথা। কেমন যেন একটা বেদনা প্রতিটি অঙ্গে!

উঠে বসে চারদিকে ভাল করে তাকায় পরিমল।

জনমানবের সাড়াশব্দ নেই কোথাও। নিদ্রিত শহরের ঘুম ভাঙ্গতে এখনও কিছু দেরী আছে।

বিগত ঘটনাগুলো একে একে তার মনে পড়ে। মনে পড়ে মিস্ লীনা দাশগুপ্তের ভীত চাউনি। মনে পড়ে দীর্ঘদেহী সাইকেল-আরোহীর কথা। ধীরে ধীরে সোজা হয়ে বসে পরিমল।

একটুকরো কাগজ পড়ে ছিল তার সাম্‌নে। পরিমল সেটা হাতে তুলে নেয়। পড়তে চেষ্টা করে লেখাটা।

পরিমল বুঝতে পারে সেটা একখানা চিঠি। তাকে উদ্দেশ্য করেই লেখা হয়েছে সেখানা।

প্রিয় পরিমলবাবু,

আশা করি ভবিষ্যতে এরকম যেদিকে-সেদিকে ইচ্ছামতো নজর দেবেন না। আর দিলে এরকম বিপদেই পড়তে হবে আপনাকে।

লীনার বিষয়ে মাথা ঘামালে বা তার সঙ্গে বেশি মিশলে আমরা তা যে কিছুতেই বরদাস্ত করব না তা জানিয়ে রাখছি।

আশা করি এ কথা ভবিষ্যতেও স্মরণ থাকবে আপনার। আজকের অবস্থা স্মরণ করে ভবিষ্যৎ পরিণামের কথা চিন্তা করবেন। এই আমাদের শেষ 'ওয়ার্নিং'। এরপর এরকম করলে আরও কঠিন শাস্তির জন্যে যে প্রস্তুত থাকতে হবে আপনাকে তাও আজ বলে গেলাম। ইতি—

ভবদীয়

রত্নাকর।

অদ্ভুত রহস্যময় চিঠিখানা। পরিমল দু'বার আগাগোড়া চিঠিখানা পড়ে দেখল। এরকমভাবে তাকে হঠাৎ অজ্ঞান করা বা এমনি চিঠি দেওয়ার অর্থ কি? লীনার ভীত-চকিত দৃষ্টির সঙ্গে এ চিঠির কোনও সম্বন্ধ আছে কি? আর এই রত্নাকরই বা কে?

পরিমলের মাথায় অজস্র চিন্তা জট পাকায়।

পুরাণে আছে মহর্ষি বাল্মীকি প্রথম জীবনে ছিলেন দস্যু রত্নাকর—কিন্তু তাঁর সঙ্গে এই রত্নাকরের নিশ্চয়ই কোনও সম্বন্ধ নেই।

স্পষ্টই বোঝা যায় এই ছদ্মনামের আড়ালে রয়েছে কোন্ এক শয়তানের গুপ্ত-চক্র। কিন্তু কি প্রয়োজনে তারা তার পেছনে অনুসরণ করেছিল? আর লীনা দেবীর সঙ্গে পরিচিত হয়ে সে অপরাধই বা কি করেছে?

পরিমল অনেক কষ্টে উঠে বসে বাড়ির দিকে পা বাড়ায়।

পা ফেলে ফেলে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলে সে। পশ্চিমপ্রান্ত পার হয়ে পূর্বপ্রান্তের দিকে এগিয়ে চলে পরিমল।

—একি! গুড বয় যে! এত ভোরে এদিকে কি উদ্দেশ্যে?

পেছন থেকে প্রশ্ন ভেসে আসে। পরিমল পেছনে তাকিয়ে দেখে তারই কলেজ-ফ্রেণ্ড বিকাশ।

ভোরে বেড়ানো বিকাশের বহুদিনের অভ্যাস। প্রাতর্ভ্রমণ না করলে সারা দিনটাই নাকি ওর খারাপ যায়। দেহে শক্তিও আছে যথেষ্ট। পরিমলের মতো তারও শারীরিক গঠন ভাল। দৈনিক ব্যায়াম আর প্রাতর্ভ্রমণ ওর কাছে নাকি লেখাপড়ার চেয়েও প্রয়োজনীয় জিনিস।

—আমার অবশ্য তোর মতো সকালে বেড়াবার নেশা নেই, কিন্তু একটা ঘটনাচক্রে পড়ে রাতের ভ্রমণটাই সকাল পর্যন্ত 'কন্‌টিনিউ' করেছে। পরিমল হাসতে হাসতে বলে।

—কি ব্যাপার রে?

—ব্যাপার বড় জটিল। অবশ্য সংক্ষেপে তোর কাছে সব কথা খুলে বলতে আমার কোনও আপত্তি নেই।

—বেশ, শোনা যাক। সত্যি, আমি অত্যন্ত কৌতূহলী হয়ে উঠেছি—

পনর মিনিটের মধ্যে পরিমল সব ঘটনাগুলো বিকাশের কাছে খুলে বলে। চিঠিটাও বিকাশকে দেখায়।

বিকাশ উৎফুল্লস্বরে বলে—কুছ পরোয়া নেই। সব সময়েই আমার সাহায্য তুই পাবি—এমন কি দরকার হলে প্রখ্যাত ডিটেকটিভ দীপক চ্যাটার্জীর শরণাপন্ন হবো আমরা, তব সরে দাঁড়াব না।

—সে কি কথা রে? প্রখ্যাত গোয়েন্দা দীপক চ্যাটার্জীর সঙ্গে তোর পরিচয় হলো কি করে?

আমার সঙ্গে নয়—আমার এক মেসোমশাই থাকেন কোল্‌কাতায়। তিনি দীপকবাবুর বহুদিনের বন্ধু।

—কিন্তু তিনি কি আমাদের কথায় এরকম একটা কেসে হাত দেবেন?

—নিশ্চয়ই! বিপন্নকে উদ্ধার করাই তাঁর ব্রত। তা ছাড়া এ রকম একটা ব্যাপার শুনলে তিনি নিশ্চয়ই বিমুখ করবেন না আমাদের। মেসোমশাইয়ের সাহায্যে তাঁর কাছে অ্যাপ্রোচ্ করা যাবে। তবে মনে হয় আপাততঃ সে প্রয়োজন হবে না।

—আমারও তাই মনে হয়।

—সব সময়ই আমার সাহায্য তুই পাবি। আর একটা কথা, সকলকেই জানাতে হবে যে আমরা কোনও দিনই ভীরু নই।

—তা ত বটেই। পরিমলের স্বরে দৃঢ়তা প্রকাশ পায়।

তিন

—ডাঃ অনিরুদ্ধ—

পশ্চিম আর পূর্বের মিলনকেন্দ্রে নদীর ধারের বাংলো প্যাটার্নের বাড়িখানা হচ্ছে ডাঃ আনরুদ্ধের।

বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক মহলে ডাঃ অনিরুদ্ধের যথেষ্ট সুনাম আছে। বিজ্ঞানকে তিনি তাঁর জীবনের একটি সাধনার বস্তু হিসাবে গ্রহণ করেছেন এ কথাই জানে সকলে।

দীর্ঘ তেরোটি শীত আর তেরোটি গ্রীষ্ম তাঁর কেটেছে এই ছোট মফঃস্বল শহরের একটি প্রান্তে।

লোকে জানে বিজ্ঞান-সাধনা তিনি করেন। বিজ্ঞানকে তিনি ভালবাসেন। বিজ্ঞানের চিন্তায় উদ্‌যাপিত হয়েছে তাঁর জীবনের অধিকাংশ প্রহর।

কিন্তু কি তাঁর সাধনার বিষয় তা সাধারণের অজ্ঞাত। যেমন অজ্ঞাত ডাঃ অনিরুদ্ধের অতীত জীবনের ইতিহাস।

মাত্র তেরোটি বছরের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে আছে ডাঃ অনিরুদ্ধের নাম। তার আগে তিনি কোথায় ছিলেন এবং পরেই বা কোথায় যাবেন তা নিয়ে সাধারণ মানুষ মাথা ঘামায় না।

তবে মাঝে মাঝে লোকের মুখে মুখে অনেক কথাই শোনা যায় ডাঃ অনিরুদ্ধ সম্পর্কে।

শোনা যায় বিলেত-ফেরত ডাক্তার তিনি। ওদেশে অজস্র সুখ্যাতির মধ্যেই তাঁর জীবনের প্রথম অংশ কেটেছে।

বিরাট বড়লোকের ছেলে নাকি তিনি। নিজের টাকায় এই বাড়িখানা কিনেছেন—এখানে বৈজ্ঞানিক গবেষণা চালাচ্ছেন। সে গবেষণায় যদি তিনি সফল হন তবে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে তাঁর নাম।

তবে ডাঃ অনিরুদ্ধ সাধারণ লোকের সঙ্গে মেশেন না। তাদের বিষয়ে মাথা ঘামানো যেন নিরর্থক মনে করেন তিনি।

সাধারণ লোকেও তাই ডাঃ অনিরুদ্ধের বিষয়ে চিন্তা করে না। ওতে কোনও লাভ আছে বলে মনে করে না তারা:

অবশ্য তাদের এই অনাকর্ষণের অন্য কারণও ছিল। সে কারণ হচ্ছে ডাঃ অনিরুদ্ধের বিরাটকায় একটি কুকুর হুইস্কি, আর তাঁর পুরোনো দিনের ভৃত্য রোজা।

হুইস্কি জাতে টেরিয়ার। রোজার পরিচয়, সে অ্যাংলো-চাইনিজ। মাঝারি আকারের চেহারা হলেও রোজার সুবিশাল পেশীবহুল দেহে, কপালের বিরাট একটা কাটা দাগে আর একটা দৃষ্টিহীন চোখের নীরব, অবাস্তব উপস্থিতির মধ্যে যে একটা ভাব লুকানো থাকত তার সঙ্গে তার মুখের দৃঢ় 'এক্‌স্‌প্রেশন্‌' মিলিয়ে সাধারণের মনে এমন একটা ভাব ফুটিয়ে তুলত, যার অর্থ হচ্ছে, আর যাই হোক, রোজাকে ঠিক ভালভাবে গ্রহণ করা যায় না।

হুইস্কির ব্যাপারেও প্রায় তাই। রোজা আর ডাঃ অনিরুদ্ধ ছাড়া পৃথিবীর আর কোনও তৃতীয় ব্যক্তিকে সে চেনে না—জানে না। তাদের উপস্থিতি তার মনে ক্রোধ ছাড়া আর কোনও ভাবের উদ্রেক করতে পারে না।

ডাঃ অনিরুদ্ধের আদেশে হুইস্কি সারাদিন লোহার চেনে বাঁধা থাকে। সাধারণ কোনও

তৃতীয় ব্যক্তিকে দেখলে যে দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে সে চীৎকার করে, তার অর্থ হচ্ছে—কাছে পেলে তোমাকে নিস্তার পেতে হতো না।

রাতের বেলায় অবশ্য হুইস্কিকে ছেড়ে রাখা হয়। কিন্তু আশ্চর্য, বাড়ির গণ্ডি ছাড়া হুইস্কি আর কোথাও যেন যেতে জানে না। আর যে কোনও মানুষ জানে, ঐ সময় ডাঃ অনিরুদ্ধের বাড়ির উদ্দেশ্যে যাত্রা করা আর জীবন্ত মৃত্যুর সাম্‌নে দাঁড়ানো একই কথা।

এমনি করেই চলেছিল ডাঃ অনিরুদ্ধের শান্ত জীবন-প্রবাহ।

দিনের অফুরন্ত ক্লান্তির শেষে রাত নামে।

রাতের কালো ডানা ধীরে ধীরে বিবশ পৃথিবীর বুকের ওপর ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

আকাশের বুকে তারারা একে একে চোখ মেলে।

রাত গভীর হতে থাকে।

পূর্বপ্রান্তের উঁচু-নীচু এব্‌ড়ো-খেব্‌ড়ো পথগুলোর ওপর ঝক্কর গাড়িগুলোর সশব্দ চলা বন্ধ হতে থাকে। পশ্চিমপ্রান্তের বাড়িগুলোর ঝাউবীথি আর পাতাবাহারের ঝাড়ে বাতাসের একঘেয়ে কান্না বেড়ে চলে।

রাতের প্রহর গড়িয়ে চলে।

সে নিঃশব্দে প্রহরগুলোকে বোবা কান্নায় ভরিয়ে তুলে ধীরে ধীরে দূর থেকে দূরান্তরে ভেসে যায় একটি সকরুণ সংগীতমূর্ছনা।

সুপ্ত শহরবাসী শোনে সে শব্দ। সে করুণ কান্না তাদের বুকেও ব্যথার আলোড়ন তোলে।

বাংলোর এক কোণে বসে ডাঃ অনিরুদ্ধ তাঁর ভায়োলিনের সূক্ষ্ম তারের ওপর ছড়ের আঘাত করে চলেন। ধীরে ধীরে আঘাতের পর আঘাত পড়তে থাকে। একের পর এক। টেনে টেনে। মেপে মেপে।

ধীরে ধীরে, কেঁপে কেঁপে, পাক খেয়ে খেয়ে শরাহত পাখির অন্তিম করুণতার মতো সে সুর ছড়িয়ে পড়ে। বিরহিণীর দীর্ঘশ্বাসের মতো সে শব্দ নৈশ বাতাসকে কোন্ এক গোপন ব্যথায় ভারী করে তোলে।

সারারাত ধরে চলে ভায়োলিনের কান্না।

ডাঃ অনিরুদ্ধের অতীত জীবনের কোন্ একটা না-বলা ব্যথা যেন ভাষার মধ্যে প্রকাশ খুঁজে পায়।

পুবের আকাশে কোন্ এক সময়ে শুকতারাটা চোখ মেলে। দ্যুতিময় চোখে পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে সে যেন ডাঃ অনিরুদ্ধের প্রকাশহীন বেদনায় গোপন, নীরব সহানুভূতি জানায়।

ধীরে ধীরে ভায়োলিনের বাজনা থেমে যায়।

ডাঃ অনিরুদ্ধের শান্ত, সৌম্য চেহারার মধ্যে একটা অদ্ভুত পরিবর্তনের চিহ্ন ফুটে ওঠে।

দ্রুতপদে পায়চারী করতে থাকেন ডাঃ অনিরুদ্ধ। আপন মনেই বিড় বিড় করে কি সব কথা বলতে থাকেন। কে জানে তাঁর সে সব কথার অর্থ কি!

ধীরে ধীরে শয়নকক্ষের দিকে মাঝে মাঝে পা বাড়ান তিনি। কখনও বা বাগানের দিকে। কিংবা পথ দিয়ে বেরিয়ে পড়েন উদ্দেশ্যহীন পথে ভ্রমণের উদ্দেশ্যে। কোথায় কেন তাঁর এ যাত্রা তা কেউ জানে না।

তবে সকলে জানে ঠিক বেলা দশটায় শয্যা ত্যাগ করে ডাঃ অনিরুদ্ধ তাঁর বাড়ির একতলার

বারান্দার বেতের চেয়ারটাতে এসে বসে আড়মোড়া ভাঙেন। ভৃত্য রোজার পরিবেশিত ব্রেকফাস্ট শেষ করতে তাঁর প্রায় সাড়ে দশটা বেজে যায়। মাঝে মাঝে দু-চারটে খাবারের টুকরো অদূরে শৃঙ্খলাবদ্ধ হুইস্কির দিকে ছুঁড়ে দেন।

মাত্র তেরোটি বছরের ইতিহাসের রহস্যময় কুহেলিকা-ঘেরা এই ডাঃ অনিরুদ্ধ আজও দু-একজন শহরবাসীর গবেষণার বস্তু। বিশেষ করে প্রাচীনপন্থী পূর্বপ্রান্তের লোকেরা তাঁকে বিশেষ একটা ভীতিপূর্ণ সম্ভ্রমের চোখেই দেখতে অভ্যস্ত।

চার

—অপরিচিতের উপদেশ—

বেলা সাড়ে দশটা।

পরিমলের বাড়িতে বিকাশ বসে কথা বলছিল। আলোচনা করছিল সেদিন বিকেলের ব্যাপারটা নিয়ে।

বিকাশ প্রশ্ন করে—তা হলে তুই কি স্থির করেই ফেলেছিস্, আজকে বিকেল ছ'টার শোতে লীনার সঙ্গে 'দীপালী'তে সিনেমা দেখতে যাবি?

—হ্যাঁ। আমাকে যেতেই হবে বিকাশ। সামান্য চিঠি ত দূরের কথা, পর্বতপ্রমাণ বাধা পেলেও আমি—

—বুঝেছি। ঠাট্টার সুরে বিকাশ বলে—এর মধ্যেই ওষুধ ধরে গেছে দেখতে পাচ্ছি।

—ওষুধ?

—হ্যাঁ, মানে অনুরাগ—

—কি যে ঠাট্টা করিস তুই! এ রকম একটা সিরিয়াস ব্যাপার নিয়ে—

—থাক্, ঠাট্টা বন্ধ করলাম। তা হলে এই স্থির থাকল। তুই অবশ্যই যাবি আজ বিকেলে' আর আমি কিছুটা distance-এ থাকব। অবশ্য তোদের টিকেট কাটা হলে আমিও আর একটা টিকেট নিয়ে পাশেই একটা seat দখল করে তোদের ওপর নজর রাখবার চেষ্টা করব।

—খুবই ভাল হয় তা হলে।

—বেশ, তাই ঠিক থাকল। অনর্থক ভয় পেলে চলবে না বন্ধু—আমি যতটা সম্ভব তোমায় সাহায্য করব। আর একটা কথা—

—কি বল।

—আমি বরং ডিটেকটিভ দীপক চ্যাটার্জীর কাছে আমার পরিচয়ের সূত্র ধরে অ্যাপ্রোচ্ করে দেখি। যদি তিনি সময় পেয়ে থাকেন—

—কিন্তু তিনি কি সত্যিই আসবেন?

—অবকাশ থাকলে নিশ্চয়ই আসবেন। রহস্যভেদই তাঁর প্রফেশন। তাঁর নেশা।

—কিন্তু তাঁর অবকাশ থাকার ওপরেই আমাদের ভাগ্য নির্ভর করছে। দেখা যাক্।

—ঠিক বলেছিস্! আচ্ছা চলি এখন। উইশ ইউ গুড্ লাক্।

দ্রুতপদে বিকাশ ঘর ছেড়ে প্রস্থান করে।

গভীর চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে যায় পরিমলের সারা মন। কোন্ দিক দিয়ে যে সময় কেটে যায় সেদিকে নজর দেবার অবকাশও থাকে না তার।

—সুপ্রভাত! নারীকণ্ঠের সুমিষ্ট স্বরে পরিমলের চিন্তাসূত্র কেটে যায়।

মুখ তুলে তাকায় পরিমল। কিন্তু চিনতে পারে না। তার সাম্‌নে উপস্থিত এই নারীকে কোনও দিন দেখেছে বলে মনে করতে পারল না।

—আপনি? প্রশ্ন ফুটে ওঠে পরিমলের কথায়।

—শুভ্রা আমার নাম। আপনার সঙ্গে পরিচয় আমার নেই। কোনও দিনই ছিল না। তবে বিশেষ কারণেই বাধ্য হয়ে একটা কথা বলতে এসেছিলাম আপনাকে।

—আমাকে আপনি চেনেন?

—নিশ্চয়ই।

—আমার বাড়ির কেউ আপনাকে এভাবে দেখলে অবশ্য এমন কিছু ভাবতে পারে যা আপনার পক্ষে প্রীতিপ্রদ নয়।

—আপনার বাড়িতে যে এখন কেউ নেই তাও বলে দিতে পারি। আপনার বাবা গেছেন অফিসে। ভাই স্কুলে। বেলা বারোটা নাগাদ আপনারও ক্লাশ আছে, কিন্তু আপনি যাবেন না—মানে আজ ক্লাশ অ্যাটেণ্ড করবেন না নিশ্চয়ই।

—সে কি কথা?

—ঠিকই বলছি। কলেজ অ্যাটেণ্ড করার ইচ্ছা আজ অবশ্যই আপনার নেই। একটা উত্তেজনা আপনার মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

—আপনি এত জানলেন কেমন করে?

—যিনি আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন তিনিই জানেন।

—কে তিনি?

—ডাঃ অনিরুদ্ধ তাঁর নাম। এই শহরেই তিনি থাকেন। আমি তাঁর দূরসম্পর্কিয় আত্মীয়া। সম্প্রতি তাঁর কাছে বেড়াতে এসেছি। তিনি কোনও ভাবে খবর পেয়েছেন যে আপনি বিপন্ন। কিংবা আপনাদের ঘিরে একটা ষড়যন্ত্র গড়ে উঠছে।

—কিন্তু তিনি কি করে এত কথা জানবেন?

—সেটা আমি জানি না। পৃথিবীতে অনেক সময়েই আপাতদৃষ্টিতে যা অসম্ভব মনে হয় বাস্তবে তা সম্ভব বলে প্রমাণিত হয় পরিমলবাবু।

—কিন্তু আমি যাব শুভ্রা দেবী। যেতে আমাকে হবেই। আমি কিছুতেই তা বন্ধ করতে পারি না। কিছুতেই না।

—বেশ, যাবেন আপনি। আমাদের কর্তব্যটুকু আমরা পালন করলাম। আপনি আমাদের হিতৈষী বন্ধু বলেই জানবেন। আর লীনা দেবীকে ঘিরে যে চক্রান্ত গড়ে উঠেছে তা ভেদ করবার মতো তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও ক্ষমতা আপনার নেই পরিমলবাবু। মিথ্যা অতটা দুঃসাহসিকতা—

—সেটা আমিই ভাল বুঝব শুভ্রা দেবী।

—বেশ, বুঝুন। আমার কাজ শেষ করে চললাম আমি। গুড্-বাই—একঝলক হাল্‌কা হাওয়ার মতো ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায় শুভ্রা।

শুভ্রা বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই একরাশ চিন্তা এসে আচ্ছন্ন করে পরিমলের মনকে। সত্যিই কি লীনাকে সাহায্য করতে গেলে সে বিপদে পড়বে?

হয়ত তাই। অন্ততঃ শুভ্রাকে দেখে মনে হয় না যে সে মিথ্যা কথা বলতে পারে। কিন্তু কেন? লীনাকে ভালবেসে সে নিশ্চয়ই কোনও অপরাধ করেনি। আর তার সঙ্গে ওই অপরিচিতা মেয়েটির আর ডাঃ অনিরুদ্ধের সম্বন্ধ কি? অন্ততঃ ওর ভয়-দেখানো কথা থেকে ত ওর সম্বন্ধে বিরূপ ধারণাই মনে এসে বাসা বাঁধে।

অজস্র চিন্তা এসে পরিমলের মাথায় জট পাকাতে থাকে।

পাঁচ

—বিকেল ছ'টার শো'তে—

পশ্চিমপ্রান্ত অন্য সবদিক থেকে অনেকটা এগিয়ে গেলেও 'দীপালী' সিনেমা হলটা শহরের পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত। বোধ হয় পূর্বপ্রান্তে জমির দাম অনেকটা সস্তা বলেই প্রসিদ্ধ বুদ্ধিমান বিহারী ক্যাপিটালিস্ট বনওয়ারীলাল ওঝা শহরের পূর্ব অংশেই এই সিনেমা হলটা তৈরী করেছিলেন।

এত বড় শহরে মাত্র একটি সিনেমা হল। তাই ভিড়ও হয় এখানে একটু বেশি। মাঝে মাঝে ভাল বইয়ের realising date-এ এত ভিড় হয় যে টিকেট পাওয়াই প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।

বিকেল পাঁচটায় দেখা গেল একটা সাইকেল-রিক্সা এসে থামল 'দীপালী'র সামনে। রিক্সা থেকে যে মেয়েটি নামল, সে আর কেউ নয়, আমাদের পূর্বপরিচিতা লীনা দাশগুপ্ত।

পরিমাল লীনার জন্যে প্রস্তুত হয়েই অপেক্ষা করছিল। লীনাকে দেখে সে নমস্কার করে এগিয়ে গেল তার দিকে।

লীনাও মিষ্টি হেসে প্রতি-নমস্কার জানায়। তারপর প্রশ্ন করে—টিকেট কাটা কি হয়ে গেছে নাকি?

—হ্যাঁ।

—কোন্ ক্লাশ?

—অত্যন্ত ভিড়, তাই ব্যালকনির টিকেট কাটতে হয়েছে। দু' টাকা চার আনা করে টিকেট।

—উঃ, এত দামী টিকেট! শুধু শুধু আপনার কতকগুলি টাকা অনর্থক খরচ হয়ে গেল।

—তা হোক—আমি ভাবছি অন্য কথা। ব্যালকনির টিকেট পেয়ে ভালই হয়েছে। নিরিবিলি। সমস্ত ইতিহাস বেশ ভাল করে শুনতে পারব।

চারদিকে একবার ভীতচকিত দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে লীনা বলে—তা না হয় বুঝলাম। কিন্তু এখানে আর অপেক্ষা করা উচিত নয়। চলুন আমরা একটু আগেই ভিতরে প্রবেশ করি।

—বেশ, চলুন।

পরিমল চকিতদৃষ্টিতে পথের ওপাশে দৃষ্টিনিক্ষেপ করে দেখল বিকাশ চুপচাপ সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। সেও ইতিপূর্বে একখানা টিকেট কেটে তৈরী হয়ে আছে। যদি কোনও অঘটন ঘটে তা থেকে তাকে রক্ষা করবার উদ্দেশ্যেই তার এই প্রচেষ্টা।

কোনও চিন্তা না করে পরিমল লীনার সঙ্গে হলের ভেতরে অদৃশ্য হলো।

শো আরম্ভ হতে আর বেশি দেরী নেই।

ক্রিং ক্রিং করে বেজে উঠল ওয়ার্নিং বেল। হলের আলোগুলো ক্রমেই স্তিমিত হয়ে আসছে।

হঠাৎ দূরে ব্যালকনির ওপর নজর পড়ল পরিমলের। ও কে বসে দর্শকদের আসনে? ডাঃ অনিরুদ্ধ না?

ডাঃ অনিরুদ্ধ আজ এসেছেন দীপালী সিনেমায়? এ যে তার কাছে সম্পূর্ণ অচিন্ত্যপূর্ব একটি ঘটনা।

পরিমল ভাল করে সেদিকে মনোযোগ দেবার আগেই হঠাৎ দপ্ করে হলের আলোগুলো নিভে গেল একসঙ্গে।

সীমাহীন আঁধার। ধীরে ধীরে পর্দার বুকে সিনেমার ছবি প্রতিফলিত হয়ে উঠল। প্রতিফলিত আলোয় হলের অখণ্ড আঁধার যেন খানিকটা স্বচ্ছ হয়ে এলো।

ছবি চলেছে। দর্শকদের একাগ্র দৃষ্টি পর্দার দিকে নিবদ্ধ। চলেছে ঘটনা-সংঘাত। দ্রুত এগিয়ে চলেছে ঘটনার গতি।

লীনার দৃষ্টি পর্দার দিকে নিবদ্ধ। পরিমলও চেয়ে ছিল পর্দার দিকে। লীনা যে কথা তার কাছে বলতে চেয়েছিল সেগুলি শোনবার অবকাশ তার এখনও হয়নি। সিনেমার শো শেষ হয়ে গেলে দুজনে একটা রেস্টুরেন্টে বসে সে কথাগুলো আলোচনা করবে বলে ঠিক করেছিল সে।

হঠাৎ ডাঃ অনিরুদ্ধের কথা আবার পরিমলের মনের মধ্যে ঝিলিক দিয়ে উঠল। যেখানে ডাঃ অনিরুদ্ধ বসেছিলেন সেদিকে তাকাল আব একবার। কিন্তু নিশ্ছিদ্র আঁধার ভেদ করে বিশেষ কিছুই তার নজরে পড়ল না।

পরিমলের ডানদিকে বসেছিল লীনা। তার ওপাশে দু-তিনজন লোকের পরে বসেছিল বিকাশ। বাঁ দিকে বসেছিল একজন দোহারা চেহারার ভদ্রলোক।

পরিমলের দিকে চেয়ে ভদ্রলোক হঠাৎ ধীরকণ্ঠে প্রশ্ন করে—মশাই, একটা ম্যাচ্ দিতে পারেন? সিগারেট ধরাবার জন্যে—

—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই—

পরিমল পকেট থেকে ম্যাচটা বের করে তুলে দেয় লোকটির হাতে।

লোকটি ধন্যবাদ জানিয়ে সেটা হাতে নেয়। পকেট থেকে একটা সিগারেট কেস বের করে একটা নিজে নেয়—অন্যটা পরিমলকে offer করে।

পরিমল আপত্তি না করে সেটা ঠোঁটের ওপর রাখে। লোকটি নিজের সিগারেটটা ধরিয়ে পরিমলের সিগারেটেও অগ্নিসঞ্চার করে।

সিগারেটটাতে মৃদু টান দেয় পরিমল।

কিন্তু একি!

সিগারেট টানার সঙ্গে সঙ্গেই তার মাথার মধ্যে সবকিছু কেমন যেন গোলমাল হয়ে যায়। ধীরে ধীরে যেন সব চিন্তা গুলিয়ে আসতে থাকে।

পরিমল প্রাণপণে বসে থাকবার চেষ্টা করে, কিন্তু পারে না। ধীরে ধীরে জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ে সে চেয়ারের ওপর।

লীনা আতঙ্কে শিউরে উঠে।

ওপাশ থেকে বিকাশও এগিয়ে আসে। সিগারেট অফার করেছিল যে লোকটি সে দ্রুতপদে ভিড়ের মধ্যে অদৃশ্য হয়। বক্স-অফিস জুড়ে সুরু হয়ে যায় তুমুল গোলমাল।

দেখতে দেখতে হলের আলোগুলো সব দপ্ করে জ্বলে ওঠে। ম্যানেজার এবং লোকজন সকলে ছুটে আসতে থাকে। কিন্তু সেই লোকটার আর কোনও খোঁজ পাওয়া যায় না।

পরিমলের জ্ঞান ফিরিয়ে আনবার জন্যে চেষ্টা করতে থাকে সকলে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই পরিমলের জ্ঞান ফিরে আসে।

চারদিকে চেয়ে সে অবাক বিস্ময়ে বলে—কি আশ্চর্য, সেই সিগারেটটা খাবার সঙ্গে সঙ্গেই আমার মাথার মধ্যে সব কেমন যেন গোলমাল হয়ে গিয়েছিল।

ম্যানেজার সারা সিনেমা হলটা ঘুরে সেই লোকটিকে খুঁজে বের করবার চেষ্টা করে।

কিন্তু আশ্চর্য, তাকে আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। সে যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। চোখের সাম্‌নে দিয়ে সে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল। এতটুকু সূত্রও সে রেখে যায়নি তার অপরাধের।

কে সেই অজ্ঞাত লোক?

ছয়

—মহেশ পাগ্‌লা—

পরিমল জ্ঞান ফিরে পেয়ে উঠে বসে ম্যানেজার এবং অন্যান্য লোকদের সঙ্গে কথা বলছিল। কিন্তু বিকাশ সেখানে ছিল না। একটু পরে সে সেখানে এসে উপস্থিত হলো দ্রুতপদে।

পরিমল তার দিকে চেয়ে প্রশ্ন করে—তুই কোথায় ছিলি রে?

বিকাশ বলে—খুঁজে দেখছিলাম যদি কোনও ক্লু পাওয়া যায়! যাক্, সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়নি।

—কি পেয়েছিস্ তুই?

—এই দ্যাখ্! বিকাশ একটা কাগজ তুলে ধরে সকলের দিকে।

সকলেরই দৃষ্টি কাগজটার দিকে আকৃষ্ট হয়। ভাল করে লক্ষ্য করে দেখা গেল ওটা হচ্ছে একখানা চিঠি। তাতে লেখা ঃ

আমার সাবধানবাণী মেনে না চললে এ রকম প্রতিফলই পেতে হয়। কথাটা ভাল করে মনে করিয়ে দিয়ে গেলাম। এখনও সময় আছে, সাবধান না হলে আরও মারাত্মক বিপদ আসতে পারে। ইতি—

ভবদীয়

রত্নাকর।

রত্নাকর! কে এই রত্নাকর? সকলের মুখে মুখে বিস্ময়ের গুঞ্জন সুরু হয়ে যায়।

পরিমল ধীরকণ্ঠে বলে—বন্ধুর সঙ্গে আমার আগেই পরিচয় ঘটেছে—তবে তার কথামতো না চলার জন্যেই এই ফল ভোগ করতে হলো। তা হোক, আমি যে মোটেই পিছিয়ে পড়বার ছেলে নই, তা ওদের সমঝে দিতে হবে।

বিকাশ বলে—কিন্তু একটা কথা। আমার ইচ্ছা আজই কোল্‌কাতায় গিয়ে ডিটেকটিভ মিঃ চ্যাটার্জীর সাহায্য—

পরিমল লীনার দিকে চেয়ে প্রশ্ন করে—আপনার এতে কি মত লীনা দেবী?

ভীরু লীনার পাণ্ডুর মুখ থেকে কোনও উত্তর বের হয় না। তবে বেশ স্পষ্টই বোঝা যায় রত্নাকরের আকস্মিক আবির্ভাবে সেও অত্যন্ত ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে।

পরিমল আর বিকাশ যখন কোল্‌কাতা থেকে প্রাইভেট ডিটেকটিভ দীপককে আনিয়ে তার সাহায্যে এই জটিল রহস্যভেদের চেষ্টায় ব্যস্ত, সেই অবসরে ঘটনার গতি যে অন্য আর একটি নতুন প্রবাহে পাক খেয়ে এগিয়ে চলল, সে দৃশ্যগুলিও আপনাদের সাম্‌নে উদ্‌ঘাটন করছি।

সেদিন রাত সাড়ে দশটা।

ডাঃ অনিরুদ্ধের ভায়োলিনের বাজনা থেমে গেছে।

কেন যে আজ এত শীঘ্রই তাঁর বাড়ি থেকে ছড়িয়ে-পড়া ভায়োলিনের সুরমূর্ছনা হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল সে বিষয়ে যদি আপনাদের কৌতূহল থাকে, তবে আর এক নতুন দৃশ্যের যবনিকা উত্তোলন করছি আপনাদের সাম্‌নে।

ডাঃ অনিরুদ্ধ তাঁর শয়নকক্ষে পায়চারী করছিলেন অস্থিরভাবে। কি একটা দুশ্চিন্তা আচ্ছন্ন করে রেখেছিল তাঁরা সারা মনকে। তাঁর সমস্ত সত্তা যেন সেই দুশ্চিন্তার আবর্তে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল।

—রোজা! ডাঃ অনিরুদ্ধ সজোরে আহ্বান জানান।

—মাস্টার! রোজা পাশের ঘর থেকে দ্রুতপদে বেরিয়ে আসে।

—দিদিমণিকে একবার ডেকে আন এখানে।

—আচ্ছা মহাশয়—

রোজা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়।

মিনিট দশেক পরে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে অনিন্দ্যসুন্দরী একটি নারী। সে নারী আমাদের পূর্বপরিচিতা শুভ্রা।

—আপনি আমায় ডেকেছেন কাকাবাবু? ঘরের মধ্যে পা দিয়ে শুভ্রা প্রশ্ন করে।

—হ্যাঁ মা। গোটাকয়েক কথা—

—বুঝেছি। আপনি নিশ্চয়ই মহেশ পাগ্‌লার সম্বন্ধে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করতে চান—

—হ্যাঁ হ্যাঁ! তুমি যে কথাটা কাল বললে, সেটা সত্যিই আমাকে যথেষ্ট চিন্তিত করে তুলেছে।

—চিন্তিত?

—নিশ্চয়ই। মহেশ পাগ্‌লা যদি সত্যিই সেই বিনয়েন্দ্রকুমার হয়, তা হলে সেটা যে আমার পক্ষে কত বড় দুশ্চিন্তার বিষয় তা কি জান না তুমি?

—তা জানি কাকাবাবু। তবে—

—তবে কি? তোমার মনে কি কোনও সন্দেহ আছে?

—না, সন্দেহ কিছু নেই। মহেশ পাগ্‌লাই যে বিনয়েন্দ্র সে বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহ সত্যিই নেই। কিন্তু তাতে আমাদের চিন্তার কি থাকতে পারে কাকাবাবু! সে যাই হোক, আসলে সে আজ পাগল!

—সত্যিই কি সে পাগল?

—নিশ্চয়ই! সে প্রমাণও আমি পেয়েছি।

—যদি সে সত্যিই পাগল হয়, তবে আমার বাড়ির আশেপাশে এভাবে ঘুরে বেড়ায় কেন? কিসের আশায় সে—

কথায় বাধা পড়ে অকস্মাৎ।

বহুদূর থেকে যেন ভেসে আসে একটা প্রবল অট্টহাসির শব্দ। আকস্মিক ভয়াল অট্টহাসি। কেঁপে কেঁপে, পাক খেয়ে খেয়ে, বাতাসের বুকে তরঙ্গের সৃষ্টি করে সে শব্দ দূর থেকে দূরান্তরে ভেসে যায়।

একটু পরে সে হাসি থেমে যায়।

নৈশ অন্ধকার অখণ্ড স্তব্ধতায় মূক হয়ে নীরব প্রহর গুণতে থাকে।

তার পরেই ভেসে আসে গানের শব্দ। গম্ভীর গলায় টেনে টেনে গাইতে থাকে—

শ্মশানে জাগিছে শ্যামা,
অন্তিমে সন্তানে নিতে কোলে।
সন্তানে দিতে কোল,
ত্যজি সুখ-কৈলাস
দয়াময়ী মা আমার
শ্মশানে করেন বাস।

দূরে বহুদূরে দেখা যায় ঘন জঙ্গলাকীর্ণ নদীর ধার দিয়ে একজন লোক হেঁটে চলেছে। ধীরপদে। ক্রমে মূর্তি দূরে মিলিয়ে যায়। আর একটা গানের কলি ভেসে আসে—

আমায় নিয়ে যাবি কে রে
দিনের শেষের শেষ খেয়ায়?
ওরে আয়, ওরে আয়।

তার পরেই ভেসে এলো প্রচণ্ড একঝলক অট্টহাসি। বাতাস-কাঁপানো সে হাসির দোলা যেন নিষ্কম্প রাত্রির বুকে জাগল শব্দস্পন্দন।

—মহেশ পাগ্‌লা! ওই সেই মহেশ পাগ্‌লা! ডাঃ অনিরুদ্ধ তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলে ওঠেন।

—আশ্চর্য! কে আজ ভাবতে পারে যে সুপ্রসিদ্ধ একটি বংশের একমাত্র সন্তান আজ পাগল হয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়ায়।

শুভ্রার স্বরে করুণতা ধ্বনিত হয়ে ওঠে।

—আমি কিন্তু আশ্চর্য হইনি শুভ্রা। শুধু আশ্চর্য হয়েই ক্ষান্ত হলে চলবে না। আমার ইচ্ছা, সেই বিরাট চক্রান্তজাল থেকে একটি মেয়েকে মুক্ত করতে হবে। আর এ সবের জন্যে যে দায়ী—

—কিন্তু একটা কথা কাকাবাবু—

—কি কথা মা?

—মহেশ পাগ্‌লা নামটা ওকে কে দিল? আর কি করেই বা ও চিনে চিনে আবার এই শহরের বুকেই ফিরে এলো?

—এ নিয়ে আমিও চিন্তা করেছি মা। আর একটা সমাধানেও অবশ্য পৌঁছেচি আমি।

—কি সমাধান?

—পাগল হলেও ওর অবচেতন মনের কোথাও এমন একটা জ্ঞান আছে যা ওকে কিছুটা

পুরোনো দিনের অতৃপ্ত ইচ্ছার পথে নিজের অজ্ঞাতেই চালিত করে। আমার মনে হয়, সেই ইচ্ছাটাই ওকে আজ এখানে টেনে নিয়ে এসেছে। কিন্তু—

বাধা দিয়ে শুভ্রা বলে—আপনার কি ধারণা ওর পাগল হওয়ার পেছনে কোনও একটা চক্রান্ত আছে?

—নিশ্চয়ই! শুধু ধারণা নয়, দৃঢ়ভাবে আমি এটা বিশ্বাস করি।

ডাঃ অনিরুদ্ধের কথাটা যেন সারা ঘরের মধ্যে রণ্ রণ্ করতে থাকে।

একটু থেমে শুভ্রা বলে—কিন্তু আপনি কি ওকে চেনেন নাকি?

—না, তবে হয়ত চেষ্টা করলে ওর পরিচয়টা বের করতে পারি। আর একটা কথা—

ডাঃ অনিরুদ্ধ চোখদুটোতে একটা অদ্ভুত তীক্ষ্ণতা ফুটিয়ে তুলে বলেন—আমার কি মনে হয় জান মা?

—কি মনে হয় আপনার? শুভ্রার স্বরের মধ্যে যেন অপরিসীম কৌতূহল ফুটে ওঠে।

—আমার মনে হয়, ওর পুরোনো কোনও ইতিহাসের সঙ্গে হয়ত এ শহরটা জড়িয়ে ছিল। তাই ত মহেশ পাগ্‌লা এ শহর ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে পারে না।

—হয়ত তাই!

কথাটা শুভ্রার মুখ দিয়ে আচম্‌কা বেরিয়ে আসে।

তারা সাবা মন যেন কোন্ এক অপরিসীম ব্যথায় টন্ টন্ করতে থাকে।

সাত

—আমন্ত্রণ ঃ হত্যা—

পরিমল আর বিকাশ যখন লীনার সম্বন্ধে চিন্তান্বিত হয়েছিল, ঠিক সেই সময়ে একটি নতুন ঘটনা শহরের বুকে আলোড়ন তুলল। ঘটনাটি নতুন ঘটলেও অনেকটা অভাবনীয় এবং আকস্মিক। তাই শহরের সকলেই এই ঘটনাটিকে উপলক্ষ করে চিন্তিত হলো।

আর সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, ঘটনাস্থলের কাছেই পাওয়া গেল একখানা কার্ড—তাতে লেখা ছিল শুধু একটি কথা—'রত্নাকর'।

ঘটনাটিকে সম্পূর্ণ তুলে ধরবার আগে ঘটনাটির পটভূমিকার কিছু বর্ণনা দেওয়া উচিত।

বিকাশ আর পরিমলের তরফ থেকে যখন এই জটিল ও রহস্যপূর্ণ কেসের সুসমাধানের জন্যে আমন্ত্রণলিপি দীপকের কাছে এসে পৌঁছল, ঠিক সেই সময়েই আর একটি আমন্ত্রণও সে পেল সেই একই স্থান থেকে। সেটা হচ্ছে ডাঃ অনিরুদ্ধের আমন্ত্রণ।

বৈজ্ঞানিক মহলে ডাঃ অনিরুদ্ধের সুনাম আছে। এমন কি কোল্‌কাতার বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকেরাও ডাঃ অনিরুদ্ধের খ্যাতিকে স্বীকার না করে পারেন না।

বহুদিন পূর্বে একটি বৈজ্ঞানিক conference-এ ডাঃ অনিরুদ্ধের সঙ্গে দীপকের পরিচয় ঘটেছিল।

সে অবশ্য দীর্ঘদিন পূর্বের কথা।

তার পরেই তাঁর কাছ থেকে এলো একটা অভাবনীয় নিমন্ত্রণপত্র। তিনি তাঁর জন্মদিন

উপলক্ষে একটা বিশেষ ফাংশান করেছেন। সেই ফাংশানে শহরের অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি নিমন্ত্রিত হয়েছেন। সেই সঙ্গে কোল্‌কাতারও বহু লোককে নিমন্ত্রণ করে আনা হয়েছে। তার মধ্যে অনেক বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকও যে রয়েছেন, তা বলাই বাহুল্য।

এ বছরে তাঁর জন্মদিনে এই বিশেষ ফাংশানটির একটি কারণও আছে। ডাঃ অনিরুদ্ধ এতদিন গোপনে যে বিষয়ে নিয়ে গবেষণা করে এসেছেন, এই নির্দিষ্ট দিনটিতে তিনি সেই সমস্ত গবেষণার ফলাফল ঘোষণা করবেন বৈজ্ঞানিকগোষ্ঠীর কাছে। তাই এই function-টির অন্য একটা গুরুত্বও আছে।

প্রথম পত্রটি পেয়ে যদিও দীপকের কিছুটা দ্বিধা ছিল, ডাঃ অনিরুদ্ধের চিঠি পেয়ে সে স্থির সংকল্প করল, সে অবশ্য ডাঃ অনিরুদ্ধের জন্মদিনের এই অনুষ্ঠানে যোগদান করবে।

আর ঠিক সেই দিনেই ঘটল এই দুর্ঘটনা। দুর্ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ঘটনাটির গুরুত্বও যেন অনেকটা বেড়ে গেল।

এবার তাই সেই ঘটনাসংস্থানের ঠিক মুখোমুখি এসে উপস্থাপিত করছি আপনাকে। ডিটেক্‌টিভ দীপক চ্যাটার্জীও এই বিচিত্র নরহত্যার অদ্ভুত কৌশল দেখে বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে পড়েছিল। আপনি ভেবে দেখুন ত, এই বিচিত্র ঘটনাবলীর রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে পারেন কিনা!

আঠারোই ডিসেম্বর। সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টা।

ডাঃ অনিরুদ্ধের বাড়ির বিরাট লনে অতিথিদের বসবার খুব সুন্দর বন্দোবস্ত করা হয়েছিল।

সবুজ ঘাসের আস্তরণে বিরাট লনের কোণের দিকে সারি সারি পাতাবাহারেব গাছগুলি শোভা পাচ্ছে। মাঝে মাঝে দু-একটা সুন্দর আইভিলতা আর মরসুমী ফুলের চারা।

মাঝখানে সুসজ্জিত টেবিলকে ঘিরে সার সার চেয়ারে অতিথিরা উপবিষ্ট।

মৃদু সান্ধ্য বাতাস বয়ে চলেছিল। ভেসে-আসা ফুলের সুগন্ধ পরিবেশকে যেন স্বপ্নময় করে তুলেছে।

উপস্থিত অতিথিদের মধ্যে ছিলেন কোল্‌কাতা থেকে আগত দুজন বিশিষ্ট ও প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক, শহরের গণ্যমান্য কয়েকজন ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা। ভদ্রলোকদের মধ্যে প্রখ্যাত জমিদার হরপ্রসন্ন দাশগুপ্তের ছেলে হেমেন্দ্র, রমেন্দ্র ও রণেন্দ্রকুমার দাশগুপ্তকেও দেখা গেল। হরপ্রসন্নবাবু দীর্ঘদিন পূর্বে চারটি ছেলে আর বিরাট সম্পত্তি রেখে পরলোকগমন করেছেন।

হরপ্রসন্নবাবুর মেজো ছেলে বিনয়েন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত পিতার মৃত্যুর পরের বছরেই কোথায় যেন অন্তর্হিত হয়েছিলেন—তারপর আজ অবধি তাঁর কোনও সংবাদ পাওয়া যায়নি। লোকের মুখে শোনা যায় তিনি নাকি পাগল হয়ে গেছেন। তাঁরই একমাত্র কন্যা লীনা দাশগুপ্ত—সে অবশ্য কাকাদের কাছেই মানুষ।

হরপ্রসন্ন দাশগুপ্তের একমাত্র সহোদর বড় ভাই বিনয়প্রসন্ন দাশগুপ্তও বাল্যকালে বর্মায় গিয়েছিলেন ব্যবসা করতে। তিনি সেখানেই একটি ছেলে রেখে মারা যান। সে ছেলেরও আর কোনও সন্ধান পাওয়া যায়নি আজ পর্যন্ত।

হরপ্রসন্নবাবুর উইল ছিল, তাঁর সম্পত্তি চার ভাইয়ের মধ্যে সমান অংশে ভাগ করে দেওয়া হবে। কেউ অপুত্রক মারা গেলে অবশ্য ভাইয়েরা তার অংশের অধিকারী হবে—আর কোনও ভাই না থাকলে তার সম্পত্তি চন্দ্রমোহিনী দাতব্য হাসপাতালে দান করা হবে।

এই হাসপাতালও অবশ্য তাঁর সৃষ্টি। এর জন্যেও তিনি বিশ হাজার টাকা বরাদ্দ করে রেখে যান তাঁর উইলে। এই হাসপাতালের ভার দেওয়া হয় তাঁর বন্ধু ডাঃ স্যানিয়েলের ওপর।

ডাঃ স্যানিয়েলও অবশ্য আজকের ফাংশানে নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন।

আর এসেছিলেন প্রফেসর বিধায়ক সেন আর তাঁর তরুণী মেয়ে উষা। উষা কলেজে বি. এ. পড়ে। হরপ্রসন্ন দাশগুপ্তের ছোট ছেলে রণেন্দ্রকুমার দাশগুপ্তের সঙ্গে উষার নিবিড় বন্ধুত্বের কথা শহরের সকলেই জানে। দুজনে অল্পদিনের মধ্যে যে বিবাহিত হবে এ কথাও কারও অজানা নেই।

লীনা দাশগুপ্ত, পরিমল, বিকাশ ইত্যাদিও আজকের দিনটিতে ডাঃ অনিরুদ্ধের বাড়িতে নিমন্ত্রিত হয়েছে।

ডাঃ অনিরুদ্ধ সকলের সঙ্গে দীপকের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। দীপকও তাদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে যথেষ্ট আনন্দিত হয়েছে। কিন্তু এই দিনটিতে যে তার জীবনে আর একটি নতুন জটিল কেসের সূচনা ঘটতে পারে এ ধারণা তার ছিল না।

বিভিন্ন গল্পসল্পের মধ্য দিয়ে খাওয়া শেষ হলো।

কথায় কথায় ডাঃ অনিরুদ্ধ তাঁর গবেষণার বিষয় কিছুটা জানালেন সকলের কাছে।

দীপকও নিজে ছিল বিজ্ঞানের ছাত্র। ডাঃ অনিরুদ্ধের কথা সম্পূর্ণ শুনে সে স্বীকার করল যে, সত্যি এ ধরণের গবেষণার মধ্যে নতুনত্ব আছে। এতে সফল হতে পারলে ডাঃ অনিরুদ্ধের নাম নিশ্চয়ই সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে।

খাওয়ার পালা শেষ হলে ডাঃ অনিরুদ্ধের ভৃত্য রোজা একটি ট্রে হাতে নিয়ে প্রবেশ করে। সার সার কফির পেয়ালা ট্রের ওপর সাজানো।

ডাঃ অনিরুদ্ধ বললেন—এবার আপনাদের এক কাপ করে কফি পান করতে নিশ্চয়ই আপত্তি হবে না?

নিঃসীম নীরবতা।

বোঝা যায় কফিপানে কারও আপত্তি নেই। ডাঃ অনিরুদ্ধের আদেশে রোজা অতিথিদের সাম্‌নে একে একে কফির কাপগুলি রেখে চলে যায়। ডাঃ অনিরুদ্ধের সাম্‌নেও সে একটি কাপ রাখে। ডাঃ অনিরুদ্ধ বলেন—আমি কিছুদিন ধরে এপেণ্ডিসাইটিসে ভুগছি। আমি কফি খাব না, রোজা।

ঘাড় নেড়ে রোজা এগিয়ে যায় কফির কাপটা তুলে নিয়ে।

কথাবার্তা ও হাসির মধ্য দিয়ে খাওয়া এগিয়ে চলে। সকলেই কফির কাপে চুমুক দেন একে একে। ডাঃ স্যানিয়েল অতিথিদের প্রত্যেককে একটি করে সিগারেট 'অফার' করেন।

সকলেই ধন্যবাদ জানিয়ে সিগারেটটা গ্রহণ করে তাতে অগ্নিসঞ্চার করেন। ডাঃ অনিরুদ্ধ তাঁর বিরাট ঘটনাবহুল জীবনের অনেক গল্প করে অতিথিদের পরিতুষ্ট করেন।

খাওয়া চলতে চলতেই হঠাৎ ডাঃ অনিরুদ্ধ শুভ্রার দিকে চেয়ে বলেন—তুমি ত খুব ভাল গাইতে পার মা। এঁদের একটা গান শুনিয়ে দাও না তুমি।

শুভ্রা কিছুটা আপত্তি করে—কিন্তু অতিথিরা সকলেই শুভ্রার নতুন এই 'কোয়ালিফিকেশনের' সন্ধান পেয়ে তাকে চেপে ধরেন—না, আপনাকে গাইতেই হবে শুভ্রা দেবী। আপনার কোনও ওজর-আপত্তি শুনব না আমরা।

অগত্যা শুভ্রা রোজাকে আদেশ দেয় হারমোনিয়ামটা আনবার জন্যে।

একটু পরেই শুভ্রার মিষ্ট কণ্ঠে গাওয়া গানের কলি পরিবেশক আরও মধুরতায় ভরিয়ে তোলে।

শুভ্রা গেয়ে চলে :

ফাল্‌গুনে আমি ফুলবনে বসে
গেঁথেছিনু যতো ফুলহার—
সে নহে তোমার উপহার।

চমৎকার কণ্ঠ শুভ্রার। অতিথিরা সকলেই অত্যন্ত আনন্দিত হন শুভ্রার গান শুনে। অনেকে আর একখানা গানের জন্যে অনুরোধ করতে থাকেন।

কিন্তু—

হেমেন্দ্রবাবু হঠাৎ চোখ বুঁজে রুদ্ধস্বরে বলে ওঠেন—উঃ, শরীরের ভেতরটা যেন কেমন করছে। মাথাটা ঘুরছে। আর এক মুহূর্তও বসে থাকতে পারছি না আমি।

সকলে অবাক বিস্ময়ে মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে থাকেন।

অতিথিদের মধ্যে অস্ফুট কলগুঞ্জন সুরু হয়।

কিন্তু সে শুধু একটা মিনিট। তার পরেই একটা বেদনার্ত চীৎকার করে হেমেন্দ্রবাবু চেয়ারের ওপর লুটিয়ে পড়েন।

অনেকে দ্রুত ছুটে আসেন হেমেন্দ্রবাবুর দিকে। কিন্তু দীপক তাঁদের কাজে বাধা দেয়। দীপক তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলে ওঠে—আপনারা কেউ অনর্থক ছোটাছুটি করবেন না। কোনও কিছুতে হাত দেবেন না। এটা আমার অনুরোধ নয়—এটা আমার আদেশ বলেই মনে করবেন আপনারা।

ডাঃ অনিরুদ্ধও কেমন যেন হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলেন এ ব্যাপারে। দীপক বলে—কফির পেয়ালার মধ্যে কোনও কিছু মিশিয়ে দেওয়া কি কারও পক্ষে সম্ভব ডাঃ অনিরুদ্ধ?

ডাঃ অনিরুদ্ধ ঘাড় নেড়ে বলেন—আমি বুঝতে পারছি না দীপকবাবু। এটা সম্পূর্ণই আমার কল্পনার বাইরে।

দীপক ডাঃ স্যানিয়েলের দিকে চেয়ে বলে ওঠে—আপনি ওঁর 'পাল্‌স্‌টা' দেখুন ত ডাঃ স্যানিয়েল।

ডাঃ স্যানিয়েল উঠে গিয়ে হেমেন্দ্রবাবুর 'পাল্‌স্‌টা' ধরে মনোযোগ দিয়ে দেখে বলেন—অত্যন্ত 'ফীব্‌ল্‌ পাল্‌স্‌'। বেশিক্ষণ বাঁচবেন বলে মনে হয় না। আপনি হাসপাতালে লোক পাঠাবার ব্যবস্থা করুন দীপকবাবু। মনে হয় 'স্টোম্যাক্‌ ওয়াশ' করলে এখনও বাঁচবার আশা আছে।

—হ্যাঁ, আপনি এক্ষুণি হাসপাতালে খবর পাঠান ডাঃ অনিরুদ্ধ। আর থানাতেও খবর পাঠান। মনে হয় কফির পেয়ালাতেই বিষটা ছিল। এটা একটা প্রত্যক্ষ নরহত্যা—এ সম্বন্ধে আমার বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই। কফির পেয়ালাটাও কেমিক্যালি এক্‌জামিন করতে হবে।

ডাঃ অনিরুদ্ধ দ্রুতপদে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যান।

অতিথিদের সকলে উৎকণ্ঠিত হয়ে সোজা হয়ে বসলেন। সকলের চোখে-মুখে আতঙ্কের ছায়া।

লীনা দাশগুপ্ত দু'হাতের মধ্যে মুখ গুঁজে কান্নার আবেগে ভেঙ্গে পড়ে। রমেন্দ্র আর রণেন্দ্র দাশগুপ্ত প্রচণ্ড বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে পড়েছিল। তাদের মুখ থেকে কোন কথা বের হয় না।

এমন সময় টেবিলের ঠিক নীচে একটি কার্ডের দিকে দীপকের নজর আকৃষ্ট হয়।

দীপক নিচু হয়ে কার্ডটা তুলে নেয়। অতিথিদের সকলের নজর আকৃষ্ট হয় কার্ডটির দিকে। সকলে দেখেন কার্ডটির ওপর বড় বড় হরফে লেখা শুধু একটি কথা—'রত্নাকর'।

প্রচণ্ড বিস্ময়ের আবেগে পরিমল আর বিকাশের মুখ ফ্যাকাশে আকার ধারণ করে।

পরিমল বলে—আমিও ঠিক রত্নাকর নামধারী কোনও একজন লোকের এম্‌নি চিঠি পেয়েছিলাম দীপকবাবু। সে সমস্ত ঘটনা আমি আপনাকে জানাতে পারি।

দীপক বলে—সে সমস্ত কাহিনী আমি শুনব পরিমলবাবু। I must solve this riddle—

কথা শেষ হয় না।

দূর থেকে ভেসে আসে একঝলক প্রচণ্ড অট্টহাসি। ভয়াল হাসির প্রবাহে স্থানটি যেন বিষাক্ত হয়ে ওঠে।

তারপরেই কে যেন টেনে টেনে গাইতে থাকে ঃ

যে ফুল না ফুটিতে
পড়েছে ধরণীতে,
যে নদী মরুপথে হারাল ধারা,
জানি হে জানি তাও হয়নি হারা।

—কে ও? নিজের অজ্ঞাতেই যেন দীপকের মুখ দিয়ে প্রশ্নটা বেরিয়ে আসে।

—ও মহেশ পাগ্‌লা। শুভ্রা উত্তর দেয়—ও এ শহরে গত কয়েক মাস থেকেই আছে।

দীপক কোনও উত্তর দেয় না।

সে যেন কোন্ এক অজ্ঞাত কারণে নির্বাক হয়ে থাকে। তার সারা ভাবভঙ্গীর মধ্যে ফুটে ওঠে চিন্তার রেখা।

শুভ্রা প্রশ্ন করে—আপনি কি যেন ভাবছেন বলে মনে হচ্ছে মিঃ চ্যাটার্জী?

দীপক মৃদু হেসে বলে—হ্যাঁ, সত্যিই ভাবছি আমি, শুভ্রা দেবী। ভাবছি মহেশ পাগ্‌লা কি সত্যিই পাগল?

—তা আমিও ভাবি মাঝে মাঝে।

মাথার একটা ঝাঁকানি দিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায় শুভ্রা।

দীপক আপন মনেই বিড় বিড় করে অস্ফুট স্বরে কি যেন বলে ওঠে।

বাইরে শোনা যায় একঝলক দমকা হাওয়ার অট্টহাসি। যেন দুনিয়ার সবকিছুকে বিদ্রূপ করছে সে।

আট

—ব্যোমকেশ বকসী—

অল্পক্ষণের মধ্যেই ডাঃ অনিরুদ্ধ ফিরে এলেন।

ডাঃ অনিরুদ্ধের সঙ্গে এলেন হাসপাতালের সাহেব ডাক্তার স্যামুয়েল জোন্‌স্ আর স্থানীয় থানার দারোগা ব্যোমকেশ বকসী।

কিন্তু ডাক্তার সাহেবের আর বিশেষ কিছু করবার ছিল না। ডাঃ স্যানিয়েল বললেন—ইতিমধ্যেই তাঁর মৃত্যু ঘটেছে। এক্‌স্‌পায়ারড্।

মিঃ জোন্‌স্‌ও 'পাল্‌স্‌টা' 'ফীল্‌' করে গম্ভীরমুখে মাথা নেড়ে বললেন—I have got nothing to do Sir—He is dead...

মিঃ জোন্‌স্‌ যন্ত্রপাতি সঙ্গে নিয়ে ফিরে গেলেন।

দীপক মিঃ বকসীর দিকে ফিরে চাইল এবার। বিরাট চেহারা। মোটা। চেহারার মধ্যে লাবণ্যের নামগন্ধও নেই। অতিরিক্ত মেদবহুলতা কেমন যেন বিশ্রী একটা ভাব ফুটিয়ে তুলেছে তাঁর চেহারায়।

—ইনি হচ্ছেন স্থানীয় থানার দারোগা ব্যোমকেশ বকসী। ডাঃ অনিরুদ্ধ পরিচয় করিয়ে দেন—আর ইনি হচ্ছেন কোল্‌কাতার বিখ্যাত প্রাইভেট ডিটেকটিভ দীপক চ্যাটার্জী।

—ও! মিঃ বকসীর চোখদুটি দীপকের দিকে নিবদ্ধ হয়। বলেন—আপনার কথা এর আগে অনেক শুনেছি। কিন্তু এ ব্যাপারে আপনার বিশেষ কিছু করবার আছে বলে মনে হয় না আমার।

—কারণ? নিস্পৃহকণ্ঠে দীপক প্রশ্ন করে।

—কারণ আপনারা সাধারণতঃ জটিল কেসের রহস্যভেদ করে থাকেন। কিন্তু এটা অত্যন্ত সাধারণ কেস।

—সাধারণ কেস? দীপকের মুখে সপ্রশ্ন দৃষ্টি ফুটে ওঠে। এটা যে অত্যন্ত সহজ কেস আপনারই বা এ ধারণা হলো কেন?

—কারণ আর কিছুই নয়—অপরাধী চোখের সাম্‌নেই রয়েছে। এটা বেশ স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে কফির সঙ্গে বিষ মিশিয়ে হেমেন্দ্রবাবুকে হত্যা করা হয়েছে—

—আমি সে বিষয়ে এখনও নিঃসন্দেহ নই।

—নিঃসন্দেহ না হবারই বা কি আছে? এটা হচ্ছে একটা স্পষ্ট কাল্‌পেব্‌ল্‌ নরহত্যার কেস। আর কফির পেয়ালা যখন পরিবেশন করেছিল রোজা তখন সে নিশ্চয়ই বলতে পারে কে কফিতে বিষ মিশিয়েছিল।

—কফিটা 'কেমিক্যাল অ্যানালিসিস্‌' করে দেখতে হবে ত!

—তা নিশ্চয়ই হবে। কিন্তু তার আগে যাদের প্রতি সন্দেহ হচ্ছে তাদের আমি কিছুতেই মুক্ত রাখতে পারি না।

—কার প্রতি সন্দেহ হচ্ছে আপনার? দীপক শান্তকণ্ঠে প্রশ্নটা করলেও বোঝা যায় মিঃ বকসীর সবজান্তা ভাব তাকে অত্যন্ত বিরক্ত করে তুলেছে।

—দেখুন, মিঃ বকসী বলে চলেন—হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে যারা জড়িত তাঁরা নিশ্চয়ই এখানে উপস্থিত আছেন; আর—

বাধা দিয়ে দীপক বলে—কিন্তু কেউ বাইরে থেকে সন্তর্পণে কফির পেয়ালায় বিষ মিশিয়ে সরে যেতেও ত পারে—

—কিন্তু তাই বা কি করে সম্ভব? মিঃ বকসী বলেন—আসলে রোজা যদি নির্দোষ হয়, তবে সে বিষাক্ত কাপটি হেমেন্দ্রবাবুর সামনেই বা রাখল কেন?

দীপককে মিনিটখানেক চিন্তিত মনে হলো। তারপর সে বলল—এ বিষয়ে এখন পুরোপুরি কিছু বলা সম্ভব নয়। তবে it's sure যে এটা একটা অত্যন্ত জটিল কেস—

—সে যাই হোক, আমি এখন মৃত হেমেন্দ্র দাশগুপ্তের হত্যাকাণ্ডের জন্যে ডাঃ অনিরুদ্ধের ভৃত্য রোজাকে গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হচ্ছি। আমার মনে হয় সে প্রত্যক্ষভাবে এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত।

দীপক কোনও উত্তর দেয় না।

সকলের মুখে ফুটে ওঠে চিন্তার রেখা।

মিঃ বকসী বলেন—আর কফির কাপটা রাসায়নিক পরীক্ষার জন্যে নিয়ে যাচ্ছি। মৃতদেহকেও নিয়ে যাওয়া হচ্ছে Post mortem-এর জন্যে। পোস্ট মর্টেম শেষ হলে দাহ করবার জন্যে ওটি ফিরিয়ে দেওয়া হবে।

হঠাৎ একটা কথা দীপকের মনে পড়ে যায়। সে মিঃ বকসীর দিকে চেয়ে বলে—আর একটা কথা মিঃ বকসী। এই কার্ডটা পাওয়া গিয়েছিল এই টেবিলটার নিচে।

—কিসের কার্ড? ভ্রূদুটো কুঞ্চিত করে ব্যোমকেশ বকসী প্রশ্ন করেন—ও, এটা দেখছি একটা ভিজিটিং কার্ডের মতো জিনিস। কিন্তু কে এই রত্নাকর? আর কেনই বা সে কার্ডটা এখানে ফেলে গেল?

—তা আমি জানি না। দীপক বলে—তবে এ সম্বন্ধে আমি নিশ্চিত যে, রোজা অবশ্যই এই রত্নাকর নয়!

—তা আমিও বুঝতে পারি। কিন্তু এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে এই রত্নাকরের সম্বন্ধই বা কি?

—হয়ত এই রত্নাকর নাম দিয়ে সে একটা থ্রিলের সৃষ্টি করতে চায়।

—তা অবশ্য অসম্ভব নয়, কিন্তু এভাবে কার্ড ফেলে রাখা ত রোজার সাহায্যেও হতে পারে। হয়ত ওর সঙ্গে এই রত্নাকরের কোনও যোগাযোগ আছে। প্রচুর অর্থের বিনিময়ে সে ওর দ্বারা এইসব কাজগুলো করিয়ে নিচ্ছে এমনও ত হতে পারে।

—অনেক কিছুই যে হতে পারে তা আমিও স্বীকার করি মিঃ বকসী। কিন্তু নিশ্চিত কোনও প্রমাণ না পেয়ে কাউকে গ্রেপ্তার করা উচিত হবে কি?

—কিন্তু এটা নিশ্চয়ই মানবেন যে, একটা নির্দিষ্ট লাইন ধরে আমাকে অগ্রসর হতে হবে। তাই সেই এগিয়ে যাওয়ার পথে কোনও কিছুই তুচ্ছ নয়। অবশ্য প্রত্যেকটি লোকের ওপরেই আমার সন্দিগ্ধ দৃষ্টি রাখতে হবে। সেটাই সুযোগ্য পুলিশ অফিসারের কর্তব্য।

—তা বটে। দীপক বাধা দেয় না।

—আপনি অবশ্য ডিটেকটিভ হিসেবে বিখ্যাত মিঃ চ্যাটার্জী, কিন্তু আমারও সুযোগ্য পুলিশ অফিসার হিসেবে নাম আছে। গত দশ বছরে আমি প্রায় তিন-চারশো জটিল কেস্ সল্‌ভ্ করেছি। আমার ধারণা হচ্ছে এই যে, যার ওপরে সন্দেহ হবে, তাকে গ্রেপ্তার করে একটু ধমক দিলেই সমস্ত ক্লুগুলো বেরিয়ে পড়ে।

এরকম লোকের সঙ্গে তর্ক করা যে বৃথা তা দীপক বেশ ভাল করেই বুঝতে পারে। কাজেই সে আর কথা বাড়ায় না।

রোজাকে গ্রেপ্তার করে গাড়িতে তোলা হয়। সদম্ভ পদক্ষেপে গাড়ির দিকে এগিয়ে যান মিঃ বকসী।

নিমন্ত্রিত অতিথিদের মনে হয়, তাঁদের চোখের সামনে যেন এতক্ষণ একটি নাটকের অভিনয় হচ্ছিল মাত্র। সব কিছুই যেন কেমন রহস্যময়! বিভ্রান্তিকর!

দীপক পরিমল আর বিকাশের সঙ্গে ঘটনাস্থল ছেড়ে চলে যায় সমস্ত পুরোনো ঘটনাগুলো জানবার জন্যে।

নয়

—রহস্যভেদী দীপক—

সেদিন বিকেল ছ'টার শো'তে 'দীপালী' সিনেমায় যে ঘটনাটির সূত্রপাত হয়েছিল, সেটাই যে এমন কতকগুলি মারাত্মক ও জটিল ঘটনাবলীর আবর্তে এমন বিভ্রান্তির সৃষ্টি করতে পারে, সে ধারণা পরিমলের ছিল না।

দীপকের সঙ্গে এই সব কথা নিয়েই সে আলোচনা করছিল।

সমস্ত ঘটনাগুলো পরিমল আর বিকাশের কাছ থেকে শুনে অত্যন্ত কৌতূহলী হয়ে ওঠে দীপকের মন। যে জটিল চক্রান্তের বাষ্পে আজ নিষ্ঠুরভাবে একজন মানুষের অন্তিম মুহূর্ত ঘনিয়ে এসেছে, তা শুধুমাত্র আজকের ঘটনা নয়। এর উৎস সন্ধান করলে দেখা যায়, অনেকদিন আগে থেকে এই শহরের বুকে যা ঘটে গেছে তার সঙ্গে এই হত্যাকাণ্ডের অবিচ্ছিন্ন যোগাযোগ রয়েছে।

সমস্ত কথা শেষ করে পরিমল বলল—আমার কিন্তু মনে হয়, এর মধ্যে যে চক্রান্ত লুকিয়ে রয়েছে তার অনেক কথাই ডাঃ অনিরুদ্ধ জানেন। কিন্তু তিনি সে কথাগুলো কোনও বিশেষ কারণে আপনাদের কাছে গোপন রেখেছেন।

দীপক অবাক হয়ে প্রশ্ন করে—আপনার এ কথা মনে হচ্ছে কেন পরিমলবাবু?

পরিমল একটু চিন্তা করে বলে—যেদিন আমি বিকেল ছ'টার শো'তে 'দীপালী'তে লীনা দেবীর সঙ্গে 'অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট' করেছিলাম, সেইদিন আমি শুভ্রা দেবীর মাধ্যমে ডাঃ অনিরুদ্ধের কাছ থেকে এই সতর্কবাণী পাই। তিনি আন্দাজ করেছিলেন যে ঐ দিন আমার ওপরেও হয়ত একটা আক্রমণ ঘটতে পারে। আমি যে লীনা দেবীর সঙ্গে মেলামেশা করছি এটাকে হয়ত ওই শত্রুপক্ষের লোকেরা খুব ভাল চোখে দেখবে না।

—সে যাই হোক, এখন ডাঃ অনিরুদ্ধকে চাপ দিয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারি না আমি। অবশ্য তার অনেকগুলি কারণ আছে। আমি জানি, আর যাই হোক, একজনের সাহায্য না পেলে এ রহস্যের সমাধান করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। আমি তাই ডাঃ অনিরুদ্ধের বাড়িতে আপাততঃ অতিথি হয়ে থাকতে চাই এই রহস্যটিকে solve করবার জন্যে।

—তাতে আপনার দিক থেকে যে সুবিধে অনেক তা আমরা বুঝি। পরিমল বলে—আর আমাদের সাহায্যও আপনি সব সময় নিতে পারেন দীপকবাবু। যখন আপনার যা প্রয়োজন হয়—

বাধা দিয়ে বিকাশ বলে—আমিও সব সময় আপনাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত মিঃ চ্যাটার্জী। এটা আমাদের সৌভাগ্য যে আপনার মতো লোকের সঙ্গে এমন নিবিড়ভাবে মিশতে পেরেছি।

কথায় কথায় তারা নদীর ধারে এসে পড়েছিল।

নদীর ধার দিয়ে সংকীর্ণ যে পথটা শহরের পূর্বপ্রান্তের দিকে এগিয়ে গেছে সেটা ধরে তারা কিছুটা এগিয়ে গেল।

পরিমল কথায় কথায় বলল—এটা হচ্ছে শহরের প্রাচীন অংশ দীপকবাবু। আর ওপাশটা হচ্ছে প্রগতিশীল অংশ—দুটোর মধ্যে সম্পর্ক থাকলেও কেমন যেন একটা সামঞ্জস্যের অভাব।

দীপক মৃদু হেসে বলে—এটা হচ্ছে আমাদের আজকের সামাজিক জীবনের একটি জীবন্ত তুলনামূলক সমালোচনা—আজকের জীবনধারারও বলতে পারা যায়। দুটি 'ক্লাইম্যাক্স'-এর মাঝে

পড়ে আমাদের আজকের সমাজ যেন মুমূর্ষু রোগীর মতো হাঁপিয়ে উঠছে।

কথা শেষ হয় না।

নদীর ধারের একটা ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল একটা লোককে। আপন মনে সে কি যেন নাড়াচাড়া করছে।

দীপক এগিয়ে যায় পায়ে পায়ে।

পরিমল এবং বিকাশও খানিকটা কৌতূহলী হয়ে উঠেছিল। তারাও এগিয়ে যায় দীপকের সঙ্গে।

দীপককে দেখেই লোকটি তার দিকে এগিয়ে আসে। ফিস্ ফিস্ করে বলে—কাকে খুঁজছেন? কাকে চান আপনি?

দীপক উত্তর দেয় না।

লোকটি তারপর আপনমনেই হো হো করে অট্টহাসি হেসে ওঠে।

পরিমল দীপকের দিকে চেয়ে বলে—এই সেই মহেশ পাগ্‌লা স্যর। যার কথা সেদিন—

কথা শেষ হয় না। লোকটি আপনমনেই আবার হো হো করে হেসে উঠে বলে—কে পাগল? আমি? আমি পাগল, না পাগল তোমরা? তোমরা সকলেই মূর্খ! হ্যাঁ, তোমরা বোকা। না হলে তোমাদের চোখের সামনে এমন ঘটনা ঘটতে পারে!

দীপক একটু যেন চিন্তিত হয়।

পাগল হলেও এর প্রতিটি কথার মধ্যে একটা 'লিঙ্ক' খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে।

একটা সামঞ্জস্য রয়েছে প্রতি কথার মধ্যে। দেখা যাক, এর কাছ থেকে আর কিছু শোনা যায় কিনা।

মহেশ পাগ্‌লা বলে ওঠে—আমি পাগল হলে কি পৃথিবী চলে? না, চন্দ্র-সূর্য ওঠে? তা হোক, তবু আমি যা বলি তা সত্যি। আমার নজর আছে সব দিকে। স—ব দিকে আমার চোখ আছে।

দীপক হঠাৎ প্রশ্ন করে—কোন্ দিকে আপনার চোখ আছে বলছেন?

—সব দিকেই আছে। তোমরা এসেছ কেন তা কি জানি না মনে করো, সব জানি। আর জানি ওই ডাঃ অনিরুদ্ধের কথা। ওর আসল পরিচয় যে কোনও দিনই তোমরা জানতে পারবে না তাও জানি। কিন্তু তবু আমি বলব না! না, কিছুতেই বলব না। কেন বলব? কি আমার স্বার্থ?

আবার হো হো করে হেসে উঠে একটা গান ধরে মহেশ পাগ্‌লা। দীপক আর অপেক্ষা না করে ধীরে ধীরে ফিরে চলে। কিন্তু তার সারা মনে কেমন যে একটা চিন্তার আলোড়ন চলে।

দীপকের মনে হয়, এই সমস্ত রহস্যের সঙ্গে এই মহেশ পাগ্‌লার একটা যোগাযোগ আছে। কিন্তু কোথায় সে সংযোগ তা সে স্থির করতে পারে না।

চিন্তিত দীপক পরিমল আর বিকাশের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ধীরে ধীরে ফিরে চলে।

ফেরবার পথে অজস্র চিন্তা একের পর এক আচ্ছন্ন করে দীপকের মন। যেন চিন্তার অসংখ্য জটিলতা!

কে এই মহেশ পাগ্‌লা?

এই হত্যার সঙ্গে কি তাব যোগাযোগ?

কফির ভেতরে কে বিষ মেশাল? আর কি করেই বা বিষ এসে মিশল তার সঙ্গে? হত্যাকারীর এই হত্যা-আয়োজনের পেছনে স্বার্থই বা কি? বিনা স্বার্থে এমন সুন্দর নিখুঁতভাবে নিশ্চয়ই খুন করতে পারে না কেউ।

দীপকের সারা মন যেন চিন্তার ঘূর্ণিতে বিভ্রান্ত হয়ে পড়তে চায়।

দশ

—বিচিত্র রিপোর্ট—

দিন তিনেক পর।

হেমেন্দ্র দাশগুপ্তের হত্যারহস্যের ব্যাপারটির সমাধান করবার জন্যে দীপক ডাঃ অনিরুদ্ধের বাড়িতেই অবস্থান করছে। কিন্তু এমন কোনও সূত্রই সে আবিষ্কার করতে পারেনি, যার ওপর ভিত্তি করে এ কেসে সাফল্যলাভ করা যেতে পারে।

হেমেন্দ্র দাশগুপ্তের বাড়িতেও গিয়েছিল সে একদিন। তাদের পরিবারের সমস্ত ইতিহাস সে জেনেছে। হরপ্রসন্ন দাশগুপ্তের উইলের মর্মকথাও সে জেনেছে। কিন্তু এমন কোনও সূত্রই তার হাতে আসেনি যা থেকে কেসটির একটা সুসমাধানে এসে পৌছানো যেতে পারে।

সেদিন বিকেলে সে থানায় এসে দারোগা ব্যোমকেশ বকসীর সঙ্গে দেখা করল।

কথায় কথায় ব্যোমকেশবাবু জানালেন, কফির রাসায়নিক পরীক্ষা করা হয়েছে বটে, কিন্তু তাতে যা পাওয়া যাচ্ছে তার সঙ্গে পোস্টমর্টেম রিপোর্টের আকাশ-পাতাল প্রভেদ। তাই তিনি অত্যন্ত বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছেন।

দীপক বলল—কেসটা যে অত্যন্ত জটিল তা ত সেদিনই আপনাকে বলেছিলাম মিঃ বকসী।

মিঃ বকসী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন—আগে ত স্যর এমনটা কল্পনাও করতে পারিনি।

বাধা দিয়ে দীপক বলে—এমন অনেক কিছুই পৃথিবীতে ঘটে মিঃ বকসী। তা ছাড়া এটাও আমি বিশ্বাস করি যে, আমি চেষ্টা করলে অবশ্যই এ কেস সল্‌ভ্‌ করতে পারব। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে কি এমন report আপনি পেলেন যার জন্যে আপনাকে এত বিচলিত মনে হচ্ছে?

মিঃ বকসী বললেন—কফির পেয়ালায় কোনও বিষের নামগন্ধও পাওয়া যায়নি। অথচ পোস্টমর্টেমে পাওয়া যাচ্ছে, নিকোটিন পয়জনিং-এ হেমেন্দ্রবাবু মারা গেছেন।

—এটা সত্যিই আশ্চর্যের বিষয় সন্দেহ নেই, কিন্তু আমার মনে হয় এর পেছনে নিশ্চয়ই একটা সূত্রের সন্ধান মিলতে বাধ্য। আর আমিও নিশ্চয়ই সেই সূত্রের সন্ধান করতে পারব বলে নিজের ওপর ভরসা রাখি।

দীপকের কথায় যেন মিঃ বকসী অনেকটা আত্মবিশ্বাস ফিরে পান। তিনি বলেন—একটা কথা মিঃ চ্যাটার্জী, if you don't mind—

—নিশ্চয়ই। বলুন কি বলতে চান আপনি—

—আমার বক্তব্য হচ্ছে, আপনি দয়া করে এ কেসের সমাধানের ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করুন।

—বেশ, আমার সাহায্য আপনি পাবেন। অবশ্য যতটা সম্ভব। আর একটা কথা, আমি

যখন প্রকৃত অপরাধীকে খুঁজে বের করতে সক্ষম হব, তখন আপনিও নিশ্চয়ই আমাকে সাহায্য করবেন তাকে গ্রেপ্তার করতে। এইভাবে পরস্পরকে সাহায্য করবার মনোভাব আমাদের মধ্যে না থাকলে it's very difficult on our part to arrest the real culprit—

—বেশ, আমি কথা দিচ্ছি যতটা সম্ভব সাহায্য আপনাকে নিশ্চয়ই করব।

মিঃ বকসীর কথা থেকে দীপক বেশ স্পষ্টই বুঝতে পারে, ঘটনাচক্রের এই অদ্ভুত পরিবর্তনে তিনি কতটা বিহ্বল হয়ে পড়েছেন।

দীপক বলে—ঘটনার যে প্রান্ত ধরে আপনি এগিয়েছেন মিঃ বকসী তা সম্পূর্ণ একটি ভুল পথের দিকেই নিয়ে গিয়েছে আপনাকে। I am sure এ পথে এগুলে নিশ্চয়ই এ কেস সল্‌ভ্‌ করতে পারবেন না আপনি। তাই আমার ইচ্ছা রোজাকে আপনি মুক্তি দিন।

—বেশ। আপনার যখন ইচ্ছা সে মুক্তি পায়, তখন আমার কোনও আপত্তি নেই এতে। আমি এক্ষুণি রোজাকে মুক্ত করবার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

মিঃ বকসী দীপকের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ান।

এগারো

—আরও একটি—

হেমেন্দ্র দাশগুপ্তের আকস্মিক মৃত্যুর পর কয়েকটা দিন কেটে গেছে।

এ ধরণের আকস্মিক মৃত্যুর জন্যে কেউই প্রস্তুত ছিল না—তাই সারা বাড়িতে বিরাজ করছিল একটা শোকের ছায়া। তাঁর শ্রাদ্ধ-অনুষ্ঠান উপলক্ষে অনেক লোক নিমন্ত্রিত হলেও কেউই সেটাকে ঠিক অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করতে পারছিল না—তাই শ্রাদ্ধ-অনুষ্ঠান চলেছিল একটা শোকপূর্ণ পরিবেশের মধ্য দিয়ে।

গাম্ভীর্যপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্য দিয়ে অতিথিদের খাওয়া-দাওয়ার পালা শেষ হলো।

ডাঃ অনিরুদ্ধ, শুভ্রা, প্রফেসর বিধায়ক সেন, তাঁর মেয়ে ঊষা, ডাঃ স্যানিয়েল, পরিমল, বিকাশ, দীপক ইত্যাদি সকলেই আজকের শ্রাদ্ধ-অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন।

খাওয়ার পালা শেষ হলে হেমেন্দ্রবাবুর ছোট ভাই রণেন্দ্র দাশগুপ্ত লীনার দিকে চেয়ে বললেন—তুমি অতিথিদের হাতে হাতে একটি করে পান দিয়ে দাও লীনা। অবশ্য পান খাওয়া যাঁদের অভ্যাস আছে—

লীনা অতিথিদের প্রত্যেকের হাতে একটি করে পান তুলে দেয়। ডাঃ অনিরুদ্ধ ছাড়া সকলেই একটি করে পান গ্রহণ করে মুখে পুরে দেন।

পান মুখে দিয়ে সকলেই বিগত ঘটনাবলীর বিষয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে থাকেন। অনেকে দীপককে প্রশ্ন করেন—সে এই কেসে এখন পর্যন্ত কতটা সফল হয়েছে।

দীপক আপনমনেই বলে—এখন পর্যন্ত বিশেষ কিছু আবিষ্কার করতে না পারলেও, এটা সত্যি যে সফল আমি হবই। তবে দু-একটা 'ডেফিনিট্‌' ক্লু এখনও হাতে পাইনি বলেই—

কথা শেষ হয় না দীপকের।

অকস্মাৎ রমেন্দ্র দাশগুপ্ত একটা অস্ফুট শব্দ করে মেঝের ওপর বসে পড়েন।

অতিথিরা সকলে উৎকণ্ঠিত হয়ে রমেন্দ্রবাবুর দিকে এগিয়ে আসেন। কিন্তু কারও বুঝতে বাকী থাকে না যে রমেন্দ্রবাবু হত্যাকারী 'রত্নাকর'-এর দ্বিতীয় 'ভিকটিম্‌'—

কিন্তু কিভাবে তাঁর দেহের ওপর বিষপ্রয়োগ করা হয়েছে? এ কথা অবশ্যই স্বীকার্য যে লীনা কখনই পানের মধ্যে বিষ প্রয়োগ করে রমেন্দ্রবাবুকে হত্যা করবার চেষ্টা করবে না। কিন্তু কে তবে হত্যাকারী?

দেখতে দেখতে রমেন্দ্রবাবু অজ্ঞান হয়ে পড়েন। অতিথিরা সকলে বিস্মিতভাবে ছুটোছুটি করতে থাকেন।

দীপক সজোরে বলে ওঠে—এটা নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হচ্ছে যে, হত্যাকারী আমাদের মধ্যেই রয়েছে কিন্তু আমরা ঠিক উপযুক্ত পথ ধরে এগুতে পারছি না বলেই তাকে ধরতে পারছি না। তাই আপনারা অযথা ছুটোছুটি করবেন না। দয়া করে আপনারা একটু স্থিরভাবে অপেক্ষা করুন।

রমেন্দ্রবাবুকে সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। চেষ্টা চলে তাঁকে বাঁচাবার। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। তীব্র বিষের ক্রিয়ায় হাসপাতালে পৌছবার কয়েক মিনিটের মধ্যে তাঁর শেষ নিশ্বাস মিলিয়ে গেল।

পরদিন বিকেল।

ব্যোমকেশ বকসী যথারীতি কতকগুলো পান নিয়ে রাসায়নিক পরীক্ষা করলেন। কিন্তু তবুও কোনও সুফল পাওয়া গেল না। আসলে পানের মধ্য দিয়েই বিষ রমেন্দ্রবাবুর দেহে প্রবেশ করেছে, না অন্য কোনও পথে তাও নিশ্চিতরূপে জানা গেল না।

অগত্যা দীপকের শরণাপন্ন হলেন তিনি।

দীপক সেদিন বিকেলে ডাঃ অনিরুদ্ধের বাড়ির লনে একটা বেতের চেয়ারে বসে তাঁর সঙ্গে বিগত ঘটনাগুলি নিয়েই আলোচনা করছিল, এমন সময় মিঃ বকসীর আবির্ভাব ঘটল অকস্মাৎ।

—গুড্ ইভ্নিং মিঃ বকসী। তারপর কতদূর সফল হলেন এ কেসটিতে?

—এখনও বহুদূরে পড়ে রয়েছি আমি—এতটুকুও এগুতে পারিনি আর। আমি সত্যিই অবাক হয়ে যাচ্ছি মিঃ চ্যাটার্জী। আসল অপরাধী যেই হোক, তার তীক্ষ্ণধীর প্রশংসা করতে হয়।

মৃদু হেসে দীপক বলে—সে যাক, পরশু রাতের ট্রেনে আমি কোল্‌কাতা ফিরে যাব মিঃ বকসী।

—তা হলে এ কেসের কি হবে মিঃ চ্যাটার্জী?

—তার আগেই যে অপরাধীকে আপনার হাতে তুলে দিতে পারব এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।

—তার মানে?

—ঠিকই বলছি মিঃ বকসী। 'রত্নাকর'-এর রহস্যভেদ করব পরশু বিকেলেই। হ্যাঁ, আর একটা কথা, পরশু ডাঃ অনিরুদ্ধের বাড়িতে বিকেল সাড়ে পাঁচটায় একটা টি-পার্টি হচ্ছে। তাতে সকলকেই invite করা হবে। যদি আপত্তি না থাকে ত আপনিও—

—বেশ। এ ত আনন্দের সংবাদ! খাওয়া-দাওয়া—

—আরও একটা কথা মিঃ বকসী। উপযুক্তভাবে তৈরী হয়ে আসবেন আপনি! কারণ সেদিনই হবে আসল রহস্যভেদ।

—কিন্তু এত সত্বর কি করে—

—সত্বর না হলে কি আর জীবনে এতগুলো কেসের solve করা আমার দ্বারা সম্ভব হতো মিঃ বকসী! সে যাক, এই আমার শেষ কথা।

দীপকের কণ্ঠে সংকল্পের স্পষ্ট আভাস।

বারো

—রহস্যের মেঘনাদ—

বিকেল পাঁচটা।

আবার ডাঃ অনিরুদ্ধের বাড়িতে সেই টি-পার্টিতে সকলে এসে সমবেত হয়েছেন। কিন্তু কারও মনেই আজ উৎসাহ ও উদ্দীপনায় লেশমাত্রও নেই। সকলেই যেন কি একটা আতঙ্কে মুহ্যমান।

বিগত ঘটনাগুলো শুধুমাত্র যে সারা শহরকেই চঞ্চল ও উদ্বেলিত করে তুলেছে এমন নয়, কোল্‌কাতার কতকগুলি কাগজে পর্যন্ত এই শহরের বর্তমান ঘটনাগুলো বেশ বড় বড় হরফে ছাপা হয়েছে। তাই আজকে উপস্থিত প্রত্যেকটি অতিথিদের মধ্যে শুধু জাগছে একটিমাত্র প্রশ্ন—কে এই ছদ্মবেশী রত্নাকর?

টি-পার্টিতে গানবাজনা বা উৎসবের কোনও ব্যবস্থা আজ আর নেই। সকলেই শুধুমাত্র উৎকণ্ঠিত একটি মাত্র ঘটনাকে উপলক্ষ করে। কে এই দস্যু রত্নাকর যে পর পর দুজন নিরীহ লোককে হত্যা করেছে!

আগের দিনের অতিথিদের সকলেই আজ এসে সমবেত হয়েছেন—কিন্তু নতুন কয়েকজন লোককেও আজ দেখা যাচ্ছে। সে হচ্ছে দারোগা ব্যোমকেশ বকসী আর তাঁর সঙ্গী কয়েকজন পুলিশ কনস্টেবল।

যথারীতি খাওয়া-দাওয়ার পালা চুকল। আগের দিনের মতোই রোজা ট্রেতে করে কয়েক কাপ কফি এনে রাখল অতিথিদের সামনে।

ডাঃ স্যানিয়েলের হাত থেকে যথারীতি সিগারেট পরিবেশিত হলো। সে দিন শুভ্রা যেখানে বসে গান করছিল, আজও সে ঠিক সেইখানেই বসে।

খাওয়া-দাওয়ার পালা যথারীতি চুকে গেলেও এই শেষ মুহূর্তেই যে অনেক কিছু উল্‌টো ঘটনার স্রোত এসে সকলকে বিভ্রান্ত করতে পারে এ ধারণা কারও ছিল না।

দীপক হঠাৎ একটি রিভলভার বের করে সোজা এগিয়ে গেল রণেন্দ্রকুমার দাশগুপ্তের দিকে।

সকলে বিস্ময়ে হতভম্ব।

দীপক তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলে উঠল—মাথার ওপর হাত তুলুন মিঃ দাশগুপ্ত!

তিনি মাথার ওপরে হাত তোলার সঙ্গে সঙ্গেই দীপক তাঁর হাত থেকে সিগারেটটা নিয়ে নিজের পকেটে রাখল। তারপরে বলে উঠল—আপনি যে আসল অপরাধী নন তা

জানি—কিন্তু এ সিগারেটটা যেভাবে ধরাতে যাচ্ছিলেন, তাতে একটু পরেই হয়ত আপনার প্রাণ বিপন্ন হতো, তাই আমি বাধ্য হয়ে এটুকু অভিনয় করেছি আপনার সঙ্গে।

কিন্তু কেন?

দীপক বলে চলে—আজই আমি আপনাদের সাম্‌নে আসল রত্নাকরের ছদ্মবেশ খুলে ফেলছি। রত্নাকর হচ্ছে ওই ডাঃ স্যানিয়েল যিনি নিজ হাতে তৈরী স্পেশ্যাল নিকোটিন-মেশানো সিগারেট খাইয়ে পর পর দুজন লোককে হত্যা করেছেন। আর এটা হচ্ছিল তাঁর তৃতীয় প্রচেষ্টা—অবশ্য এটাই তাঁর শেষ চেষ্টা। রণেন্দ্রবাবু নিহত হলেই স্বর্গীয় হরপ্রসন্নবাবুর উইল অনুযায়ী তাঁর সমস্ত সম্পত্তির ইনিই অধীশ্বর হতেন। কারণ ইনিই হাসপাতালের পরিচালনার ভার পেয়েছেন।

কথা শেষ হয় না।

ডাঃ স্যানিয়েল হঠাৎ সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ান।

দীপক বাধা দিয়ে বলে ওঠে—অনর্থক নড়াচড়া করবেন না ডাঃ স্যানিয়েল। আমি চাই না যে অনর্থক বলপ্রয়োগ করতে হয়। মিঃ বকসী, আপনি রত্নাকর ওরফে ডাঃ স্যানিয়েলকে এক্ষুণি গ্রেপ্তার করতে পারেন।

ব্যোমকেশ বকসী কর্তব্য কাজে অবহেলা করেন না। তিনি সোজা উঠে গিয়ে ডাঃ স্যানিয়েলের হাতে হাতকড়া পরিয়ে দেন।

দীপক ধীরে ধীরে বলতে থাকে—এটা অবশ্যই জানা কথা যে নিকোটিন বিষের প্রতিক্রিয়ার ফলেই হেমেন্দ্র ও রমেন্দ্র দাশগুপ্তের মৃত্যু ঘটেছে। কিন্তু সে নিকোটিন যে সিগারেটের মধ্যে মেশানো ছিল এ সন্দেহ কারও মনেই জাগতে পারে না। সকলে কফির পেয়ালা আর পানের মধ্যেই বিষ মেশানো আছে এই সন্দেহ করছিল!

সে যাই হোক, এবার পরবর্তী ঘটনায় আসা যাক। লীনা দেবীর সঙ্গে পরিমলবাবুকে মিশতে দেখে ডাঃ স্যানিয়েল কিছুটা বিরক্ত হন। তিনি চাইতেন না, অন্য কেউ এসে এ ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ে। তাই পর পর দু'বার তিনি পরিমলবাবুকে সাবধান করেছিলেন। তা ছাড়া লীনা দেবীরও সম্পত্তির ওপর অধিকার আছে, কারণ তিনি নিরুদ্দিষ্ট বিনয়েন্দ্র দাশগুপ্তের একমাত্র সন্তান। পাছে সেদিক থেকে কিছু গোলমাল হয়, তাই পরিমলবাবুর ওপর এ ধরণের আক্রমণ করা হয়েছিল।

এ ত গেল এদিকের কথা।

এবার আসছে আর একটা জরুরী কথা। ডাঃ অনিরুদ্ধের কাছেই আমি প্রথমে এ কথা শুনি। মহেশ পাগ্‌লা হচ্ছে নিরুদ্দিষ্ট বিনয়েন্দ্র দাশগুপ্ত। তাঁকেও কতকগুলি toxic ওষুধ খাইয়েই পাগল করা হয়েছে বলে ডাঃ অনিরুদ্ধ মনে করেন। কিন্তু তাঁর মনের অবচেতন অংশ থেকে একটা আকর্ষণ তাঁকে এই শহরের বুকে টেনে এনেছে। কিন্তু লীনা দেবী যদিও কষ্ট পাবেন জানি, তবুও বলছি তিনি সত্যিই পাগল হয়ে গেছেন। অবশ্য ক্রমশঃ তাঁর মনের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসছে। তাই মনে হয় তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হতেও পারেন।

আর একটা কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ডাঃ অনিরুদ্ধ হচ্ছেন হরপ্রসন্নবাবুর ভাই বিনয়প্রসন্নের একমাত্র পুত্র। বিনয়প্রসন্ন বর্মায় ব্যবসা করতে যান ছেলেবেলায়। তিনি সেখানেই প্রচুর সম্পত্তি রেখে মারা গিয়েছিলেন। ডাঃ অনিরুদ্ধ ওদেশ থেকে প্রচুর বিদ্যা

অর্জন করে এদেশে ফিরে এসেছেন। আর শুভ্রা দেবী হচ্ছেন তাঁর এক মৃত বন্ধুর কন্যা। ডাঃ অনিরুদ্ধ তাঁকে কন্যার মতো স্নেহে মানুষ করে তুলেছেন।

এসব কথা অপ্রাসঙ্গিক হলেও আজ আপনাদের জানিয়ে রাখছি। এমন কতকগুলি ঘটনা যে ঘটতে পারে ডাঃ অনিরুদ্ধ তা কোনও দিন কল্পনাও করেননি। তাই তিনি এ শহরে বিরাট বাড়ি নির্মাণ করে বাস করলেও কোনও দিন আত্মপরিচয় দেননি কারও কাছে। কিন্তু বিধাতার কি আশ্চর্য বিধান, তিনি একদিন জানতে পারলেন তাঁর সম্পর্কিত ভাইয়েরা একটি চক্রান্তজালে জড়িয়ে পড়ছে, তখন তিনি আমাকে আমন্ত্রণ করে আনেন কোল্‌কাতা থেকে।

যাক, এখন সমস্ত রহস্যের সুসমাধান হয়ে গেছে—আর কোনও রহস্যই অভেদ্য নেই।

নির্দিষ্ট দিনে নিশ্চয়ই লীনা দেবীর সঙ্গে পরিমলবাবুর আর ঊষা দেবীর সঙ্গে রণেন্দ্রবাবুর বিবাহ-উৎসব সম্পন্ন হবে। আমাদের মতো ইতরজন সে উৎসবে সামান্য মিষ্টান্ন প্রাপ্তির আশা রাখি মাত্র।

মিঃ বকসী, আপনার কেস এবার সল্‌ভ্‌ড্‌ হয়েছে। আমি নিশ্চয়ই রাতের ট্রেনে কোল্‌কাতায় ফিরতে পারি।

কথাশেষে দীপক ধীরে ধীরে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়।

—শেষ—

বিফল স্বপ্ন

এক

—অভিশাপ—

দূরে সিগন্যালের লাল আলোটা জ্বলছে দপ্ দপ্ করে—যেন কোনও এক হিংস্র দৈত্যের রক্ত-আঁখি!

হীরাপুর স্টেশন। ট্রেন আসবার খুব বেশি দেরী নেই আর। উত্তরদিকটা ঝাঁ-ঝাঁ করছে। এখুনি হয়ত এসে পড়বে যন্ত্রদানব তুমুল শব্দের আলোড়ন তুলে সগর্জনে।

হিমঝরা শীতের রাত। দশটা বেজে গেছে কিছুক্ষণ আগে। ছোট স্টেশন—তাই যাত্রীর ভিড় বিশেষ নেই। দু-একজন যাত্রী পোঁটলা-পুঁটলি নিয়ে এখানে-সেখানে ইতস্ততঃ বসে ট্রেনের জন্যে উদ্বিগ্নভাবে প্রতীক্ষা করছে।

আকাশে অজস্র তারার সমারোহ। লাইনের ওপাশে সার সার দেবদারু, আমলকী আর পেয়ারা গাছ। একটা বড় ঘোড়া-নিমগাছ। শীতার্ত হাওয়া গাছের শাখায় শাখায় মৃদু কাঁপন তুলে শিরশিরিয়ে বয়ে যায়।

প্ল্যাটফর্মের প্রান্তে ওভারকোট গায়ে দিয়ে যে লোকটিকে ঘোরাফেরা করতে দেখা গেল, তিনি আর কেউ নন, নবনিযুক্ত ম্যানেজার বিকাশ রায়। তাঁকে দেখে প্রথম দর্শনেই যে কথাটা মনে হয়, তা হচ্ছে জীবনের কোনও কিছুকে ভয়ডর করে চলবার জন্যে যেন তাঁর জন্ম হয়নি। দোহারা পেশীবহুল দেহ। অটুট স্বাস্থ্য। চলাফেরার মধ্যে একটা আন্‌ডণ্টেড ভাব।

বিশেষ কারণেই তিনি আজ প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে ট্রেনটার জন্যে প্রতীক্ষা করছিলেন। আজকের ট্রেনে কোলকাতা থেকে বিখ্যাত ডিটেকটিভ দীপক চ্যাটার্জীর এখানে আসার কথা আছে।

দীপক বিকাশবাবুর দীর্ঘদিনের বন্ধু। কলেজ-জীবনে তিনি দীপকের চেয়ে দু' বছরের সিনিয়ার ছিলেন। কিন্তু দুজনেরই শারীরিক শক্তি ও সাহসের কথা ছিল কলেজে সর্বজনবিদিত। তাই দীপকের সঙ্গে তাঁর অনেকটা বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল।

তারপর বি. এস-সি. পাশ করে তিনি বিলেত গেলেন ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে। দীপক তার কিছুদিন পরে কলেজ-জীবন শেষ করলেও কোন কাজকর্মের দিকে মাথা ঘামায়নি। সে সুরু করেছিল সৌখীন গোয়েন্দাগিরি।

বিলেতে থাকলেও দীপকের খবর বিকাশবাবু কিছু কিছু পেতেন তাঁর বন্ধু-বান্ধবদের পত্রের মাধ্যমে। দু-একবার ভারত থেকে আসা দু-একখানি দৈনিক পত্রিকায় দীপকের অসাধারণ সাফল্যের খবর পাঠ করেছেন। তাঁরা সারা মন ভরে উঠত গর্বে—আনন্দে।

পত্রের মাধ্যমে দীপকের সঙ্গে তাঁর যোগসূত্র বজায় ছিল চিরদিন। দীপক যদিও ঘন ঘন চিঠি লেখবার অবকাশ পেত না, তবু মাঝে মাঝে বিকাশের কাছে দু-একখানা চিঠি লিখত সে। বিলেতে থেকেই সে সব চিঠি পেতেন তিনি। উত্তর দিতেন সে সব চিঠির।

তারপর ঘটনার গতি বহুদূর এগিয়ে গেছে। বিলেত থেকে ঘুরে এসে তিনি কিছুদিন একটা ফ্যাক্টরীতে ছোটখাটো কাজ নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। এমন সময় একদিন খবরের কাগজের পাতায় দেখলেন বিচিত্র বিজ্ঞাপন :

হীরাপুর আয়রণ অ্যাণ্ড স্টীল ফ্যাক্টরীর জন্য ইঞ্জিনিয়ারিং-এ অভিজ্ঞ ভাল একজন ম্যানেজার চাই। বেতন আপাততঃ চারশো টাকা।

বিজ্ঞাপনটা চোখে পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ঠিকানাটা দেখে নিয়ে মিলের মালিকের ঠিকানায় দেখা করলেন।

কিন্তু সেখানে গিয়ে শুনলেন মিলের মালিক একজন নয়—ওটা হচ্ছে একটা প্রাইভেট্ লিমিটেড্ কন্‌সার্ণ। মিলের মোটামুটি অংশীদার তিনজন। দুজন বাঙ্গালী—একজন রসময় গোস্বামী, অন্যজন বিনয়কুমার সমাদ্দার। প্রত্যেকের চার আনা করে অংশ। বাকী অর্ধেকের মালিক একজন বিহারী—অম্বিকাপ্রসাদ আগরওয়ালা।

অবশ্য কাজকর্মের দেখাশুনা করেন বিনয়বাবু। তিনি থাকেন কোলকাতায়।

তাঁর প্রেরিত নির্দেশেই হীরাপুরের সমস্ত কাজকর্ম চলে। বিনয় সমাদ্দার অবশ্য বিকাশবাবুর সঙ্গে দেখা করে বলেন, তাঁর সেক্রেটারীর সঙ্গে দেখা করেই তিনি কথাবার্তা বলেছিলেন। তাঁর মাধ্যমেই তিনি অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট লেটারও পেয়েছেন, তাঁকে বিশেষভাবে জানিয়ে দেন।

ইতিপূর্বে ওই হীরাপুর ফ্যাক্টরীতে কাজ করতে করতে দুজন ম্যানেজার আকস্মিকভাবে মৃত্যুবরণ করেছেন। আর সে মৃত্যুও স্বাভাবিক নয়—কে বা কারা নাকি তাঁদের গলা টিপে হত্যা করেছে। গলার দু'পাশে নীল দাগ দেখে পুলিশ তাই অনুমান করেছে। লোকের ধারণা, হীরাপুর ফ্যাক্টরীটা নাকি অভিশপ্ত।

তার কারণও অবশ্য আছে। যেখানে এখন ওই ফ্যাক্টরীটা করা হয়েছে, সেই জায়গাটাতে বহুদিন আগে ছিল একটা পোড়ো ভূতুড়ে বাড়ি আর বিরাট একটা ঘন জঙ্গল।

বর্তমান মালিকরা ওটা কিনে নিয়ে বাড়িখানা ভেঙে ফেলেন। জঙ্গলগুলোও সব কেটে ফেলে সেখানে ফ্যাক্টরীর বাড়িখানা করা হয়। বিরাট উঁচু পাঁচিল দিয়ে সমস্ত গণ্ডীটা ঘিরে ফেলা হয়।

কিন্তু সে বাড়ির অভিশাপ নাকি এখনও দূর হয়নি।

মাঝে মাঝেই দেখা যায় অস্ফুট চন্দ্রালোকে ফ্যাক্টরীর চারপাশে কারা যেন ঘুরে বেড়ায়।

লম্বা লম্বা কালো কালো সব মূর্তি। বিশাল ভয়াবহ তাদের চেহারা। বীভৎস। বাতাসে ভেসে ভেসে বেড়ায় তারা। তাদের সামনে কোনও লোক পড়লে তাকে আর প্রাণ নিয়ে ফিরতে হয় না।

বিকাশবাবু চিরদিনই সাহসী আর বেপরোয়া। ঘটনাগুলো যেন তাঁকে চুম্বকের মতোই আকর্ষণ করে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি চাকরীটা গ্রহণ করে সবদিক থেকে প্রস্তুত হয়ে হীরাপুরের দিকে যাত্রা করেছেন। দীপকের ঠিকানা তাঁর জানা ছিল। তাই সেদিন সকালেই তিনি কোলকাতায় চিঠি দিয়েছেন, বিশেষভাবে দীপককে অনুরোধ করেছেন হীরাপুরে আসবার জন্যে। উত্তরে দীপক জানিয়েছে, সে পরদিন রাতের ট্রেনে হীরপুর রওনা হচ্ছে বটে কিন্তু তার এই আকস্মিক যাত্রার কথা যেন সর্বত্র গোপন রাখা হয়। সে আরও জানিয়েছে, খবরের কাগজে হীরাপুরের সংবাদ তাকে ইতিপূর্বেই আকৃষ্ট করেছে। এখন বিকাশবাবুর সেখানে থাকাতে তার সুবিধাই হবে।

সেই চিঠি পেয়েই বিকাশবাবু আজ রাতে অপেক্ষা করছেন এখানে। এখুনি হয়ত ট্রেন এসে পড়বে!

হাতের সিগারেটে একটা টান দিয়ে বিকাশবাবু সেটা ছুঁড়ে ফেলে দেন। তারপরে হাতঘড়িটার দিকে তাকিয়ে দেখেন। রেডিয়ামের ডায়েলযুক্ত হাতঘড়ি দেখে বুঝতে পারেন রাত সাড়ে দশটা।

দুই

—অপ্রয়োজনীয় বন্ধুত্ব—

সেদিন সকালের ডাকে চিঠিখানা পেয়েছিল দীপক।

ছোট চিঠি। খামটা খুলেই দেখতে পেল হাতের লেখাটা তার পরিচিত। নিচের নামটা দেখেই আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তার মুখ। চিঠিটা এসেছে দীর্ঘদিন পূর্বের বন্ধু বিকাশ রায়ের কাছ থেকে। চিঠিতে তিনি হীরাপুরের বিশদ বর্ণনা করে তাকে সেখানে যাবার জন্যে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

চিঠিখানা পড়ে সে কি করবে ভাবছে, এমন সময় ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে রতনলাল।

দীপককে চিঠিখানা হাতে নিয়ে চিন্তা করতে দেখে সে প্রশ্ন করে—কিরে, কার চিঠি হাতে নিয়ে এত তন্ময় হয়ে চিন্তা করছিস্?

দীপক চিঠিখানা তুলে ধরে রতনের দিকে। রতন সেখানা হাতে নিয়ে আগাগোড়া পড়ে দেখে, তারপর বলে—সব ত বুঝলাম, এখন কি করবি ঠিক করেছিস্?

দীপক বলে—তুই কি যেতে পারবি আমার সঙ্গে?

—কি করে যাব বল্? তুই ত জানিস আমি নিজেই আজকাল কতগুলো জটিল কেস নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি।

—তা জানি বলেই ত তোর ওপর চাপ দিচ্ছি না। তবে আমি যেন এ কেসের মধ্যে একটা গভীর ষড়যন্ত্র দেখতে পাচ্ছি। আমাকে হীরপুরে যেতেই হবে রতন। আফ্‌টার অল্, দীর্ঘদিন পরে আজই একটা ইন্‌টারেস্টিং কেস হাতে পেয়েছি।

রতনকে কোলকাতার সমস্ত কাজকর্মের ভার দিয়ে দীপক সেইদিনের বিকেলের ট্রেনে রওনা হলো হীরাপুরের দিকে।

বিকেল সাড়ে পাঁচটায় ট্রেন কোলকাতা ছাড়ল। হীরাপুর পৌছবে ঠিক রাত সাড়ে দশটা থেকে এগারোটার মধ্যে।

দীপক ছিল সেকেণ্ড ক্লাসের যাত্রী। গাড়িতে প্রচুর ভিড় থাকলেও সেকেণ্ড ক্লাসগুলো প্রায় ফাঁকাই ছিল।

দীপক যে কম্পার্টমেণ্টে উঠেছিল সেটা ছিল একেবারে ফাঁকা। হাওড়া থেকে গাড়ি ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই দীপক সিটের ওপর হোল্ডঅলটা বিছিয়ে দিয়ে বালিশে মাথা রেখে শুয়ে পড়ল।

মনঃসংযোগ করল একখানা বিলিতী উপন্যাসের পাতার মধ্যে।

ট্রেন ছুটে চলেছে। বৈকালিক হাওয়া হু হু করে প্রবেশ করছে গাড়ির মধ্যে। গায়ের

শার্টটার হাত দুটোর বোতাম এঁটে তার উপর একটা গরম কোট চাপিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হলো দীপক। অগ্রহায়ণের প্রথম সপ্তাহ থেকেই খুব শীত পড়েছে এবার।

পরের স্টেশনে গাড়ি থামতেই একজন লোক গাড়িতে উঠে বসল। দীপক একটু মনোযোগ দিয়ে তার চেহারা দেখে নিল। একবার ভাল করে দেখলেই যে কোনও লোকের মূর্তি তার মনের পর্দায় আঁকা হয়ে যায়।

দোহারা চেহারা। প্রায় ছ' ফিট লম্বা। নাকের ওপর বাঁদিকে একটা বড় জড়ুলচিহ্ন। সরু গোঁফের রেখা। পরনে স্যুট—অবশ্য সাধারণ সুতীর স্যুট—বেশি দামী নয়। ঠিক এই চেহারার লোককে সেকেণ্ড ক্লাসে ভ্রমণ করতে দেখে দীপক একটু অবাক হলো।

—নমস্কার স্যর! সাম্‌নের বেঞ্চে বসে লোকটা আকস্মিকভাবে আলাপ সুরু করে।

—নমস্কার! দীপক বলে—কিন্তু আপনাকে তো মোটেই চিনতে পারছি না।

—চিনবেন কেমন করে! আমি তো আর আপনার মতো বিখ্যাত ব্যক্তি নই।

লোকটার স্বর বিনয়ে গদগদ।

—তা ত জানি, কিন্তু আপনি কি আমাকে চেনেন?

—চিনি মানে! বিলক্ষণ চিনি। আপনি একজন বিখ্যাত ডিটেকটিভ দীপক চ্যাটার্জী। পুলিশমহলে একডাকে সকলে চেনে আপনাকে। আর অপরাধীমহলও আপনার নামে সন্ত্রস্ত। খবরের কাগজে বহুবার আপনার ছবি ছাপা হয়েছে। এই ত সেদিন চায়না লজ মিসট্রি যখন আপনি সল্‌ভ করলেন, তখন আপনার সুনাম বাংলার সব কাগজে বড় বড় হরফে ছাপা হয়েছিল।

আশ্চর্য! লোকটা তাকে এত ভালভাবে চেনে! দীপক চিন্তিত হয়ে পড়ে। কিন্তু সে ত তাকে একেবারেই চিনতে পারছে না। তবে কি সে শত্রুপক্ষের নিযুক্ত গুপ্তচর!

দীপকের মাথার মধ্যে সব কেমন যেন এলোমেলো হয়ে যায়।

পকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে তাতে অগ্নিসঞ্চার করে দীপক। অপরিচিত লোকটির দিকেও একটা সিগারেট এগিয়ে দেয়।

সিগারেটটা নিয়ে আগুন ধরাতে ধরাতে লোকটি বলল—তারপর, যাচ্ছেন কতদূর?

সঠিক স্থান বলবে কিনা একবার ভেবে নেয় দীপক। মিথ্যা কথা বলে লাভ নেই—তা ছাড়া লোকটি যখন একটু পরেই দেখতে পাবে সে কোন্ স্টেশনে গাড়ি থেকে নামছে।

—আপাততঃ গন্তব্যস্থান হীরাপুর।

—হীরাপুর? দ্যাট মিস্টিরিয়াস্ হীরাপুর! লোকটার কণ্ঠস্বর রহস্যপূর্ণ বলে মনে হয়। একটু থেমে বলে—আপনার মতো লোক যে হীরাপুর-রহস্য নিয়ে মাথা ঘামাবেন তা আশা করিনি।

—তার মানে? দীপক অপরিসীম বিস্ময়ে প্রশ্ন করে।

—মানে কিছু নয়। কেসটা এমন কিছু কঠিন নয় এই আর কি! আমার যতদূর মনে হয়, সবকিছুর মূলে একটা ম্যালিস্। বাট্ দি থিং ইজ, হু ইজ দ্যাট্ ম্যান?—কে সেই শয়তান?

—আপনি কি হীরাপুরের সঙ্গে পরিচিত?

—পরিচিত মানে! আমিও যে ওখানেই যাচ্ছি। আমিও হীরাপুর স্টেশনেই নামব।

—ভাল কথা। একসঙ্গেই সবটুকু পথ অতিক্রম করা যাবে।

—সেটা আমারই সৌভাগ্য দীপকবাবু। আই উইল বি প্রাউড টু থিঙ্ক দ্যাট্ ইউ আর মাই কম্প্যানি অ্যাট্ লীস্ট ফর সাম্ আওয়ার্স—অন্ততঃ কয়েক ঘণ্টার জন্যেও আপনি আমার সঙ্গী হয়েছেন।

লোকটা হো হো করে হেসে ওঠে। প্রাণখোলা হাসি।

পথের মাঝে এরকম একজন অনাবশ্যক বন্ধুর জন্যে দীপক আদৌ প্রস্তুত ছিল না। তা ছাড়া লোকটা তার নাড়ীনক্ষত্র জানে, অথচ সে তার সম্বন্ধে একটি কথাও জানে না। সমস্ত পরিবেশটাও দীপকের যেন কেমন অস্বস্তিকর বলে মনে হয়।

—আপনারও সময় জমবে, নিশ্চয়ই কোনও অসুবিধাই নেই? দীপক প্রশ্ন করে একটু চিন্তা করে।

—কোনও অসুবিধা নেই। দীপকের দিকে চেয়ে লোকটা বলে—কিন্তু এমন প্রখ্যাত লোক আমি নই যে নাম শুনেই চিনতে পারবেন। আমার নাম লোকেন হালদার।

—কোলকাতায় থাকেন বোধ হয়?

—না। হাওড়ায় আমার বাড়ি। কোলকাতায় চাকরী করি।

দীপক আর কথা বাড়ায় না।

বাইরের দিকে দৃষ্টিকে মেলে ধরে। সন্ধ্যা নেমে এসেছে পৃথিবীর বুকে আঁধার যবনিকার আবরণ ছড়িয়ে।

গুঁড়ি মেরে অন্ধকার নেমে এসেছে। পশ্চিম দিগন্তের রক্ত-আভা মিলিয়ে গেছে। পথের দু'পাশের আম, সুপারী ইত্যাদি গাছগুলির চারপাশে জোনাকিরা উড়ছে, তাদের টিমটিমে লণ্ঠন নিয়ে।

আকাশে তারার সমারোহ। এখনো চাঁদ ওঠেনি। আঁধারে আচ্ছন্ন দিকতট কেমন যেন রহস্যময়। শোঁ শোঁ শব্দে বয়ে যায় ঠাণ্ডা হাওয়া।

দীপক কোটের বোতামগুলো ভাল করে এঁটে দেয়।

হীরাপুর স্টেশনে গাড়ি থামল রাত ঠিক দশটা চল্লিশে। গাড়ি থেকে নেমে সামনের দিকে এগোতেই দীপকের পিঠে কার হাতের স্পর্শ পড়ল যেন।

চমকে চেয়ে দেখে তার পিছনে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে স্বয়ং তার বন্ধু ও হীরাপুর আয়রণ অ্যাণ্ড স্টীল ফ্যাক্টরীর ম্যানেজার বিকাশ রায়।

দীপকের সহযাত্রী ভদ্রলোক দীপকের সঙ্গেই আসছিল। এবার সে দীপকের দিকে চেয়ে বলে—আচ্ছা, তা হলে আমি চলি দীপকবাবু। গুড্ বাই!

—গুড্ বাই মিঃ হালদার। কথাটা শেষ করেই দীপক বিকাশবাবুর সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে চলে।

—ও ভদ্রলোককে ত চিনতে পারলাম না। বিকাশবাবু দীপকের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করেন।

—আমিও খুব বেশি চিনি না। শুধু জানি নাম লোকেন হালদার। কোলকাতা থেকে হীরাপুরে আসছেন।

—আশ্চর্য ত! এরকম ব্যাপার ত আগে শুনিনি কখনও।

—ট্রেনেই আলাপ হলো। আলাপী ভদ্রলোক—নিজেই পরিচয় করে নিলেন। তা ছাড়া আমাকে উনি আগে থাকতেই চিনতেন।

—সেকি!

—হ্যাঁ, খবরের কাগজে ছবি দেখে কিংবা লোকের মুখে শুনে। কিন্তু আমি শুধু একটা ব্যাপার বুঝতে পারছি না।

—কি ব্যাপার?

—ভদ্রলোক হঠাৎ বিনা প্রয়োজনে স্বেচ্ছায় এভাবে আমার সঙ্গে পরিচিত হলেন কেন? কি ওঁর স্বার্থ? কেমন যেন গোলমাল লাগছে!

—সেটা পরে চিন্তা করা যাবে। এখন চল বাংলোর দিকে যাওয়া যাক।

—তাই চল। কাজে হাত দেবার পূর্বে এখন কিছু বিশ্রাম অবশ্য প্রয়োজন।

দুজনেই গল্প করতে করতে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের সরু রাস্তা ধরে এগিয়ে চলে কোম্পানীর বাংলোর দিকে।

তিন

—দুর্ঘটনা—

সকালে ঘুম থেকে উঠে দীপক এসে বসে চায়ের টেবিলে।

বিকাশবাবু সকালে উঠেই কাজকর্মের চাপে বেরিয়ে গেছেন ফ্যাক্টরীর দিকে। দীপকের চা ও খাবার নিয়ে এসেছিল একজন বালক-ভৃত্য। সঙ্গে ছিলেন দোহারা চেহারার একজন ভদ্রলোক। প্রৌঢ়। বয়স পঁয়তাল্লিশের কাছাকাছি। চেহারার মধ্যে একটা কেমন যেন ব্যস্তসমস্ত ভাব। সব সময় অহেতুক স্মার্টনেস দেখাবার প্রচেষ্টা। যেন বয়েসটা নেহাৎ কাঁচা, লোকের চোখে এমনি একটা ভাব ফুটিয়ে তোলবার জন্যে তিনি সব সময়ই সচেষ্ট।

—স্যর, দেখছি ঘুম থেকে উঠেছেন। ভদ্রলোক হাসিমুখে কথা সুরু করেন।

—হ্যাঁ, আমি এর চেয়ে একটু সকালেই ঘুম থেকে উঠে থাকি—কিন্তু কাল রাত্রের ট্রেন-জার্ণিতে বড্ড টায়ার্ড হয়ে পড়েছিলাম। তাই ঘুম থেকে উঠতে দেরি হয়ে গেছে। দীপক সাধারণভাবেই কথাগুলো বলল।

—তা ত বটেই, তা ত বটেই—ভদ্রলোক গদগদভাবে বলেন—তা ছাড়া আপনারা হলেন গিয়ে কোলকাতার সৌখীন বড়লোক। একটু বেলাতে ওঠাই ত স্বাভাবিক।

দীপক বুঝতে পারে বিকাশবাবু তার এই ধরনের পরিচয়ের কথাটাই এখানে জানিয়েছেন। তাই সে বলে—বড়লোক বলে নয়, বেশি বেলায় ঘুম থেকে ওঠা যে কোন লোকের পক্ষেই খারাপ।

—তা ত বটেই। তা হচ্ছে কি, আমরা নেহাৎ কারখানার মাইনে-করা কেরাণী। আমাদের সঙ্গে কি আপনাদের তুলনা হয়?

—ও, আপনি হচ্ছেন এখানকার কর্মচারী? দীপক প্রশ্ন সুরু করে।

—তা ত বটেই। অবশ্য কর্মচারী ঠিক নয়—সরকারবাবুও বলতে পারেন। সাথে খাতাপত্র রাখা, কুলিদের মজুরী দেওয়া, হাজিরা ঠিক রাখা—এই সব কাজ।

—খুব খাটতে হয় বোধ হয়?

—তা ত বটেই। বিনা কাজেই কি আর কোম্পানী মাইনে দেয়!

দীপক বুঝতে পারে 'তা ত বটেই' কথাটার ওপর ভদ্রলোকের একটা অকারণ ঝোঁক আছে। অনেক লোকেরই বিভিন্ন কথার ওপর এ ধরনের ঝোঁক থাকে। দীপক আবার বলে—বিকাশবাবু বোধ হয় কাজে বেরিয়ে গেছেন, তাই না?

—তা ত বটেই। তাঁর ওপরেই ত কোম্পানীর সব দায়িত্ব।

—সে কথা জানি। আচ্ছা, বিকাশবাবু লোক কেমন বলে মনে হয়?

—ও, নতুন ম্যানেজার একেবারে দেবতার তুল্য লোক স্যর। ওরকম লোক খুব কম দেখা যায়। আপনি তাঁর বন্ধু বলেই বলছি না, সত্যি, তাঁর মতো ম্যানেজার এর আগে এখানে আসেনি।

—আপনার নামটা কিন্তু জানা হলো না সরকারমশাই। এহেন আলাপেও...

—তা ত বটেই। আমার নাম অতুল্য ঘোষ।

—আপনি এ মিলে কতদিন কাজ করছেন অতুল্যবাবু? চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে দীপক প্রশ্ন করে।

অতুল্যবাবু সামনের চেয়ারটায় বসে গলার কম্ফার্টারটা ভাল করে জড়িয়ে নেন। তারপর বলেন—তা প্রায় বছর ছয়েক ত বটেই।

—ছ' বছর? তা হলে ত অনেকদিন হলো আপনি এখানে...

—তা ত বটেই। আমি বেশ ভালভাবেই কাজ করি বলে মালিক আমার ওপর খুব সন্তুষ্ট। বিনয়বাবু ত বলছিলেন, এ রকম কর্তব্যপরায়ণ সরকারমশাই বড় একটা দেখা যায় না।

—সত্যি কথা। আমি ত আপনাকে দেখে আজই খুব খুশি হয়েছি অতুল্যবাবু। সত্যিই আপনার তুলনা নেই!

—ত ত বটেই!

হঠাৎ কথাটা বলে ফেলে অতুল্যবাবু কেমন যেন লজ্জিত হয়ে পড়েন। জিনিসটা কতকটা আত্মপ্রশংসার স্তরে গিয়ে দাঁড়ায়। তিনি একটু ভ্যাবাচাকা খেয়ে যান। কোনও কথা বের হয় না তাঁর মুখ থেকে।

—আপনি যেন লজ্জিত হয়ে পড়লেন বলে মনে হচ্ছে। দীপক একটু মোলায়েম সুরে বলে।

—লজ্জিত ঠিক নয়, আমি ভাবছি, আপনি কি ভাবছেন....

—কিছুই ভাবিনি। সত্যি কথা বলতে গেলে আপনার কথা বলবার ভঙ্গিটা বড় সুন্দর।

বার বার প্রশংসায় অতুল্য ঘোষ খুশি হয়ে ওঠেন। আর একবার গলার কম্ফার্টারটা ভাল করে জড়িয়ে নিয়ে বলেন—হ্যাঁ, সে কথা একবার মনিবও বলেছিলেন বটে!

ঘন ঘন মনিবের রেফারেন্স দীপককে কেমন যেন কৌতূহলী করে তোলে। সে প্রশ্ন করে—ম্যানেজারবাবুরা আপনাকে কোনও কথা বলেন না সরকারমশাই?

—ম্যানেজারবাবুরা! রাম রাম—একথা বলবেন না স্যর। ওঁরা ত এখন সব প্রেতলোকে।

—প্রেতলোকে? দীপক প্রশ্ন করে।

—তা ত বটেই। একমাত্র বর্তমান ম্যানেজারবাবু ছাড়া।

—তিনি বোধ হয় প্রেতলোকে ভ্রমণ করবেন না! কি বলেন অতুল্যবাবু?

—তা ত বটেই।

তারপরেই অতুল্য ঘোষ যেন মিইয়ে যান। দীপকের অদ্ভুত ধরনের কথাগুলো তাঁর মনের ওপর যেন খানিকটা রেখা ফেলে। তিনি বোকার মতো সেজে বলেন—আপনার কথাগুলো যেন কেমন অদ্ভুত স্যর। সব সময় ঠিক বোঝা যায় না। এই ধরুন আপনি বললেন....

অতুল্যবাবুর কথা শেষ হয় না।

বাইরে থেকে ভেসে আসে কোলাহল। অনেকগুলি লোক একসঙ্গে যেন চীৎকার করে ওঠে। দূর থেকে ভেসে আসে কোলাহলের শব্দ।

—কিসের শব্দ অতুল্যবাবু? দীপক উৎকর্ণ হয়ে ওঠে।

—বুঝতে পারছি না ত স্যর। তবে মনে হয় কারখানার দিক থেকে আসছে শব্দটা।

—চলুন দেখে আসা যাক।

—তাই চলুন। আবার কোন কিছু ঘটেনি ত। কে জানে! আচ্ছা ভূতুড়ে মিলের পাল্লায় পড়া গেল যা হোক্। এ মাস শেষ হলেই চাকরীটা ছেড়ে দিয়ে মানে মানে বিদায় নেব।

এমন সময় সেখানে এসে দাঁড়ায় বিকাশবাবুর একমাত্র সুন্দরী মেয়ে অনীতা। ধীরকণ্ঠে অতুল্যবাবুর দিকে চেয়ে বলে—কি অতুল্যবাবু, সকালে উঠেই ত আবার এঁকে বিরক্ত করতে আরম্ভ করে দিয়েছেন। আপনার বক্তৃতার পাল্লায় পড়লে...

অতুল্যবাবু কেমন যেন থমকে দাঁড়ান।

দীপক অনীতাকে আগে দেখেনি। সে ছিল কোয়ার্টারের কোণে ছোট ঘরটাতে।

দীপক বুঝল অনীতাই তার খাবার করে দিয়েছে। অতুল্যবাবু এসেছেন শুধু সেই ক্রেডিটটুকু নিতে তার কাছ থেকে।

দীপক প্রশ্ন করল—বিকাশ কি কারখানার দিকে গেছে?

অনীতা বলে—হ্যাঁ, কাকাবাবু।

—তা হলে আমাকে একবার যেতে হবে সেখানে।

ভাল করে গলায় কম্ফার্টারটা জড়াতে জড়াতে অতুল্য ঘোষ উঠে দাঁড়ান।

দীপক তাঁর সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে যায় কারখানার দিকে। হাতঘড়িটার দিকে তাকিয়ে দেখে বেলা সওয়া নটা।

প্রচণ্ড গোলমাল সুরু হয়ে গেছে সারা কারখানা জুড়ে। সকলে হতভম্বের মতো ইতস্ততঃ ছুটোছুটি করছে। কেউ বা বোকার মতো ফ্যালফ্যাল করে তাকাচ্ছে। অনেকে অকারণ চীৎকার সুরু করে দিয়েছে।

সামনেই দেখা হয় বিকাশবাবুর সঙ্গে। দীপক আর অতুল্যবাবুকে এগিয়ে আসতে দেখে বিকাশবাবু সেদিকেই দৌড়ে আসেন। দীপকের দিকে চেয়ে বলেন—এভাবে একটার পর একটা দুর্ঘটনা যে কেন ঘটছে কারখানায় তা সত্যিই বুঝতে পারছি না দীপক।

—দুর্ঘটনা! দীপক বিস্মিত স্বরে প্রশ্ন করে।

—হ্যাঁ, কোণের বড় মেসিনটা চালু হয়ে হঠাৎ সঙ্গে সঙ্গে ভেঙ্গে পড়ে মোট দুজন শ্রমিককে জখম করেছে।

দীপক নীরব থাকে। অতুল্য ঘোষ বিড় বিড় করতে থাকেন—তখনই বলেছিলাম ভূতুড়ে কারখানা বন্ধ করা উচিত। মালিকেরা শুনলেন না। এর চেয়ে বোধ হয় অন্য কোথাও চাকরীর চেষ্টা...

বিকাশ রায় ধমক দেন—আপনার বক্তৃতা থামান সরকারমশাই। যদি কাজ করতে না চান, অন্যত্র চেষ্টা দেখুন। তাই বলে কুলিদের মধ্যে মিথ্যা গুজব ছড়াবেন না।

—তা ত বটেই! তা ত বটেই! আমি কি আর এই ফ্যাক্টরী আঁকড়ে পড়ে থাকি স্যর! মালিক বললেন তাই...

বাধা দিয়ে দীপক বলে—বাদানুবাদ পরে হবে বিকাশ, এখন আমি একবার জায়গাটা দেখতে চাই। আশা করি কোনও অসুবিধা হবে না।

বিকাশবাবু বলেন—না না, চল না দেখবে ওধারে...

দুজনে এগিয়ে যায় মেসিন ঘরের দিকে হন হন করে।

খুব ভাল করে মেসিনটা পরীক্ষা করে দেখে দীপক বলে—এটা দুর্ঘটনা নয় বিকাশ, স্বেচ্ছাকৃত ঘটনা।

—স্বেচ্ছাকৃত! তার মানে?

—হ্যাঁ, ভাল করে লক্ষ্য করলে তুমিও দেখতে পাবে, মেসিনটা ভেঙ্গে যায়নি, এর নাটটা আলগা করে রাখা ছিল বলে, ওটা খুলে পড়ে গেছে গোটা মেসিনটা। কেউ বোধ হয় ইচ্ছে করে আগেই নাটটা আলগা করে রেখেছিল।

—আশ্চর্য ত!

—আশ্চর্য কিছুই নেই। মেসিন ঘরের চাবিটা থাকে কার কাছে?

—সেটা থাকে স্টোরকীপার হরদেও পাণ্ডের কাছে।

—হরদেও পাণ্ডে? কতদিন এখানে কাজ করছে?

—তা প্রায় বছর দেড়েক, কি তার কিছু বেশি—মালিকদের কাছ থেকে নিয়োগপত্র নিয়ে এসে এখানে যোগ দিয়েছিল সে।

—ভাল কথা, তাকে একবার এখানে ডেকে আনতে পারবে?

—এখানে কেন, বাংলোয় চল। সেখানেই তাকে ডেকে নিয়ে যাওয়া হবে। ধীরে-সুস্থে যা জানবার...

—ভাল কথা। এখন এদিককার মতো কাজ শেষ করে ফেল। দুজনেই একসঙ্গে বাংলোর দিকে যাওয়া যাক।

—কাজও কিছু বাকী নেই। আজকের মতো মিল বন্ধ থাকবে বলে ডিক্লেয়ার করেছি।

—খুব ভাল কথা, তবে চেষ্টা করো, মজুররা যেন কোম্পানী ছেড়ে চলে না যায়।

—না, সে জন্যেই ত অতুল্যবাবুকে তখন ধমক দিলাম।

—ভাল করেছ। এখন দেখা যাক হরদেও পাণ্ডের কি খবর মেলে!

দীপককে বেশ একটু চিন্তিত মনে হয়।

চার

—লোকেন হালদার—

হরদেও পাণ্ডের খবরটা যেমন জমকালো, লোকটার চেহারা কিন্তু ঠিক সে রকম নয়।

রোগা চেহারা। শীর্ণকায় হলেও লম্বায় প্রায় ছ' ফুটের কাছাকাছি। গায়ের রং মিশমিশে কালো। চেহারার মধ্যে একটা রুক্ষতা প্রথম দর্শনেই চোখে পড়ে। কথাবার্তা বলে ভাঙ্গা বাংলায়।

—নমস্তে স্যর! বিকাশবাবুর দিকে চেয়ে বলে হরদেও পাণ্ডে—আমাকে তলব দিয়েছেন কেন?

—কিছু কথা আছে হরদেও। এ বাবু আমার বন্ধু, ইনি তোমাকে গোটকয়েক কথা জিজ্ঞাসা করতে চান।

—বহুৎ আচ্ছা স্যর। কি কথা বলুন।

দীপক ভাল করে হরদেও পাণ্ডের আপাদমস্তক এতক্ষণ ধরে লক্ষ্য করছিল।

এবারে সে প্রশ্ন করে—কলঘরের চাবি কার জিম্মায় থাকে হরদেও?

—আজ্ঞে, আমার।

—কারখানার কাজ বন্ধ হয় ক'টায়?

—সাধারণতঃ ছটার মধ্যে।

—তারপর তোমার কাছে চাবি জমা দিয়ে যায় কে?

—আজ্ঞে, সরকারবাবু কুলিদের হিসেব মিলিয়ে রেজিস্টারী খাতায় সব লিখে রাখেন। তারপর তিনি চাবি রেখে যান আমার কাছে।

—সকালে তুমিই কারখানা খোলো ত?

—আজ্ঞে ঠিক বলেছেন হুজুর! সকাল সাড়ে আটটায় আমি কারখানা খুলি। মিলের সিটি বাজলেই নটার সময় কুলিরা এসে কাজ সুরু করে দেয়।

—কাল তুমি ঠিক সময়ে চাবি পেয়েছিলে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। কিন্তু একটা কথা স্যর...

—বলো।

—কাল রাতে আমি আমার ঘরের মধ্যে চাবিটা খুঁজে পাইনি। অনেক খুঁজেও পেলাম না। অথচ আজ সকালে উঠে দেখলাম চাবিটা ঠিক আমার ঘরের মেঝেতে পড়ে আছে। আমি সেটা কুড়িয়ে নিয়ে নিশ্চিন্তমনে এসে কারখানা খুলে দিলাম। এখন আপনি জিজ্ঞাসা করছেন বলেই এ কথা মনে পড়েছে।

—তোমার সব কথা ঠিক মনে আছে ত?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, স্যর। আজ এখানে দুর্ঘটনা ঘটল বলেই ও কথাগুলো আমার মনে পড়ল।

—ভেরী গুড্! আমার যা জানবার তা জানা হয়ে গেছে বিকাশ, তুমি এখন একে যেতে বলতে পার।

নমস্কার জানিয়ে হরদেও পাণ্ডে প্রস্থান করে।

বিকাশ রায়ের দিকে চেয়ে দীপক বলে—এই দুর্ঘটনার বিষয়টা থানায় ডায়েরী করে দাও বিকাশ। দিস্ কেস শুড্ বি ইন্‌টিমেটেড্ টু দি পুলিশ।

—ঠিকই বলেছ। আমি অতুল্যবাবুকে দিয়ে এখুনি থানায় সংবাদ পাঠাচ্ছি।

দীপক চিন্তিতভাবে বলে—কিন্তু এ ধরনের দুর্ঘটনায় কার কি স্বার্থ? এমন ত নয় যে, এই অঞ্চলের কোথাও কোন গুপ্তধন সঞ্চিত আছে!

শুনে বিকাশবাবু বলেন—তা ত নয়ই। কিন্তু এটাও ঠিক যে এর সঙ্গে জড়িত রয়েছে কোন একটা ম্যাক্সিম। আমি চাই সে রহস্যের জাল ভেদ করতে।

—সেজন্যে আমিও কাল কোলকাতা ছেড়ে হীরাপুরে এসে বসে আছি। কিন্তু...

দীপক কথাটা শেষ করে না। চিন্তার অতলে তলিয়ে যায় তার মন।

সেদিনই বিকেলবেলা।

দীপক ফ্যাক্টরীর গণ্ডির বাইরে এসেছিল একটু ঘুরে বেড়াবার ইচ্ছা নিয়ে। তা ছাড়া হীরাপুর জায়গাটা তার এখনও ভাল করে দেখা হয়নি।

ফ্যাক্টরীর বাইরে একটা লম্বা সুরকির রাস্তা এগিয়ে গেছে সোজা নদীর দিকে। হীরাপুর ফ্যাক্টরী থেকে দামোদরের দূরত্ব বেশি নয়—হাঁটাপথে মিনিট কুড়ি সময় লাগে নদীর ধারে পৌছতে।

সন্ধ্যা হতে খুব বেশি দেরী নেই আর। অস্তায়মান সূর্যের রাঙা আভা পশ্চিম দিগন্তের গায়ে আবীর মাখিয়ে দিয়েছে। নদীর দিক থেকে ফুরফুরে হাওয়া বইছে। পথের দু'পাশে গাছের ডালে ডালে পাখিদের কলকাকলি সান্ধ্য পরিবেশকে মনোরম করে তুলেছে।

সত্যি, সৌন্দর্য হীরাপুরের আছে—দীপক মনে মনে স্বীকার না করে পারে না। এই অপরূপ লাবণ্যময়ী হীরাপুরের কোনও এক গোপন কোণে যে একটা ভীষণ চক্রান্তের বিষবাষ্প উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে, এ কথা ভাবতে দীপকের দুঃখ লাগে।

নদীর তীরে বালুকাময় ভূমির উপর ধীরে ধীরে দীপক এসে বসে পড়ে।

পাক খেয়ে খেয়ে এগিয়ে চলেছে দামোদর ফেনিল আবর্তের সৃষ্টি করে। দূরদূরান্তরে অস্পষ্ট চিত্র। আকাশের সাথে পৃথিবী যেন নিবিড় কোলাকুলি করছে।

—একি, দীপকবাবু যে! পেছন থেকে কে যেন আহ্বান জানায়।

চমকে ওঠে দীপক, সেদিকে তাকায় ঘাড় ফিরিয়ে। দেখে তার পেছনে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে লোকেন হালদার—তার হীরাপুর যাত্রার সেই সহযাত্রী।

—নমস্কার স্যর! লোকেন হালদার সুরু করে।

—নমস্কার মিঃ হালদার! তারপর নদীর ধারে কি মনে করে?

—ঠিক যা মনে করে আপনি এখানে এসেছেন মিঃ চ্যাটার্জী, মানে—ভ্রমণের উদ্দেশ্যে।

—ও বুঝেছি। কিন্তু বুঝতে পারছি না শুধু একটা কথা। আপনি এত ঘন ঘন আমার পাশে পাশে ঘুরছেন কেন? দীপকের কণ্ঠস্বর যেন এবার একটু রুক্ষ বলে মনে হয়।

—সে কি কথা স্যর? লোকেন হালদার বিস্মিত কণ্ঠে পালটা প্রশ্ন করে।—আমি আপনার পাশে পাশে ঘুরছি মানে?

—ঠিক তাই। কিন্তু তাতে আমি কিছু মনে করছি না। আমার শুধু একটা প্রশ্ন—হীরাপুরের ব্যাপারটিতে আপনার কি স্বার্থ লোকেনবাবু?

—আমার কোনই স্বার্থ নেই ত! আপনার সঙ্গে সেদিন দেখা হলো পথে—আপনি বললেন

আপনি হীরাপুরের কেসটা সল্‌ভ করবার জন্যেই এদিকে আসছেন। তাই এ ধরনের কৌতূহল এসে বাসা বেঁধেছিল আমার মনে। যদি আপনি আপত্তি করেন আমি কিছুই জিজ্ঞাসা করব না দীপকবাবু।

—বেশ, আপনার কথাই না হয় মেনে নিলাম। কিন্তু বলুন ত আপনি কেন হঠাৎ কোলকাতা ছেড়ে হীরপুরের দিকে যাত্রা করলেন।

হাসতে হাসতে লোকেন হালদার বলে—আরে, এ ত সাধারণ কথা। আমার মাসীমার বাড়ী হীরাপুরেই। আমি এর আগেও দু-একবার এখানে এসেছি। কাজেই এখানকার ব্যাপারগুলো সব ভাল করেই জানি। এবার অফিস থেকে ক'দিনের ছুটি নিয়ে বেড়াতে এসেছি। পথে ট্রেনে দেখা হলো আপনার সঙ্গে। কাজেই এ কৌতূহলও অত্যন্ত স্বাভাবিক। আর আপনার মতো প্রখ্যাত লোক যখন এ ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন তখন নিশ্চয়ই এর মধ্যে কোনও জটিল মিস্‌ট্রি রয়েছে বলেই মনে হয়েছিল আমার।

—বেশ, আপনার সব কথাই মেনে নিলাম। দীপক বলে—কিন্তু এবার আর একটা কথার উত্তর দিন মিঃ হালদার। সেদিন আপনি আপনার পরিচয় গোপন করেছিলেন কেন?

—গোপন করেছিলাম? লোকেন হালদার থতমত খেয়ে যায়।

—হ্যাঁ, আপনার নাম লোকেন হালদার নয়! তবুও আপনার সুবিধের জন্যে আমি এই নামেই ডাকব আপনাকে।

—মানে, আপনি কি বলছেন মিঃ চ্যাটার্জী? আমি...

বাধা দিয়ে দীপক বলে—সেদিন থেকেই ভাবছিলাম আমি। পরে আপনার পরিচয় আমার মনে পড়ল হঠাৎ। এখন আপনি এ নিয়ে মাথা ঘামান, আমি চলি লোকেনবাবু। গুড্ ইভ্‌নিং।

লোকেন হালদারকে কোন কথা বলার অবকাশ না দিয়েই দীপক উঠে দাঁড়ায়।

পাঁচ

—বুভুক্ষিত প্রেতাত্মা—

ঘুমিয়ে পড়েছে পৃথিবী।

নিথর মৃত্যুর মতো স্তব্ধ কালো রাত নেমে আসছে ধরণীর বুকে। নিথর শীতলতা এনে কে যেন ধীরে ধীরে পৃথিবীকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছে।

নদীর ধার থেকে ফিরে ঘণ্টাখানেক নিজের ঘরে বিশ্রাম নিয়েছিল দীপক।

এবার বাংলো ছেড়ে বেরিয়ে ধীরে ধীরে ফ্যাক্টরীর দিকে সে এগিয়ে চলে। অত্যন্ত সন্তর্পণ তার গতি। মার্জারের চেয়েও লঘুপদে সে এগিয়ে যায়। কোমরে তার রিভলভারটা ঠিক জায়গাতেই গোঁজা আছে।

পায়ে পায়ে এগোয় দীপক।

নিবিড় আঁধারে অবগুণ্ঠিত আবৃত সবকিছু। প্রকৃতিদেবী যেন কালো ওড়নার আড়ালে মুখ লুকিয়ে কাঁদছেন। কি করুণ, কি বেদনায় ভরা রহস্যময় সে কান্না! জোলো সান্ধ্য বাতাসের সাথে যেন সে কান্না মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে।

দীপক ধীরপদে এগিয়ে চলে। কোম্পানীর শ্রমিকদের বস্তি আর ফ্যাক্টরীটা বেশ ভাল করে আজ সে পর্যবেক্ষণ করবে বলে সংকল্প করেছে।

কিন্তু ও কি! কি একটা মূর্তি! ধপ্ ধপ্ করে যেন এগিয়ে আসছে! রাতের কালিমা যেন বিকট একটা কায়ারূপী বিভীষিকার মূর্তি হয়ে উঠেছে। ধপ্ ধপ্ ধপ্...

কাছে—আরও কাছে। দ্রুতপদে সে মূর্তি যেন এগিয়ে চলেছে আপন মনে।

দশ-বারো ফুট উঁচু সে মূর্তি। বিকট কালো তার দেহ।

অন্ধকার রাত্রির নিস্তব্ধ বুকখানাকে কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে একটা প্রেতায়িত বিভীষিকা ঘিরে যেন সে এগিয়ে চলেছে। কোন্ এক বুভুক্ষিত আত্মা যেন অপরিসীম ক্ষুধা বুকে নিয়ে এগিয়ে চলেছে খাদ্যের অন্বেষণে।

তাকে দেখে সারা শরীর যেন অস্থির হয়ে ওঠে। ইচ্ছাশক্তি কেমন যেন ঝিমিয়ে আসে! মানুষমাত্রেরই মনে জেগে ওঠে একটা অহেতুক অপরিসীম ভয়।

কোমর থেকে রিভলভারটা খুলে নেয় দীপক। মূর্তির ডান হাত লক্ষ্য করে পর পর দু'বার রিভলভারের ঘোড়াটা টিপে দেয়।

গুড়ুম্ গুড়ুম্!

স্তব্ধ নৈশ প্রহর যেন সে প্রচণ্ড শব্দের উত্তরে পৈশাচিক অট্টহাসি হাসে।

আঃ—আ আ আ...

মানুষের কণ্ঠে ধ্বনিত হয় সুস্পষ্ট চীৎকার। বেদনামাখা সে কাতরধ্বনি।

মহা পৃথিবীর বুকের পাঁজর ভেদ করে যেন ভেসে ভেসে ওঠে অস্ফুট এক মুমূর্ষুর সুতীব্র আর্ত চীৎকার।

তারপর সব চুপ।

ধপ্ ধপ্ ধপ্...

দ্রুতগতিতে মূর্তি এগিয়ে চলে। গতিবেগ আরও দ্রুত হতে থাকে। দূরে—বহুদূরে সে মূর্তি 'মিলিয়ে যায়।

থেমে যায় শব্দ। থেমে যায় চীৎকাব। সবকিছুই যেন ভোজবাজীর মতো মুহূর্তের মধ্যে চোখের সামনে থেকে মিলিয়ে যায়।

দীপক দ্রুত এগিয়ে যায় ঘটনাস্থলের দিকে। মাত্র আট-দশ পা এগিয়েই দেখতে পায়, মাটির ওপর মানুষের পায়ের দাগ।

কিন্তু অশরীরী চিরদিনই অদৃশ্য। তার পায়ের ছাপ মাটির ওপর পড়বে কেমন করে? আপন মনেই চিন্তা করে দীপক। কয়েক পা এগিয়ে যায় ধীরে ধীরে।

ও কি! দীপক আবার বিস্মিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। নরম মাটির ওপর একস্থানে জমে রয়েছে তাজা টকটকে লাল কয়েক ফোঁটা রক্ত!

তবে তার গুলি নিশ্চয়ই ব্যর্থ হয়নি। তার গুলি ঠিকই গিয়ে লেগেছিল সেই মূর্তির ডান হাতে।

ডান হাতে গুলি লাগার জন্যেই সে ওইভাবে চীৎকার করে উঠেছিল।

কিন্তু চীৎকার করেই সে পলায়ন করল্ কেন? সত্যিই যদি এটা অশরীরী মূর্তি হতো, তবে ত সে ইচ্ছ' করলেই মুহূর্তের মধ্যে তাকে হত্যা করতে পারত। আর অশরীরীর শরীর বলে কিছুই নেই—বুলেটই বা তার শরীরে বিদ্ধ হবে কেমন করে!

ওটা তবে কি?

ওটা কি তার চোখের ভ্রম, না কোন এক বিচিত্রদেহী জীব?

চিন্তিত মনে দীপক বাংলোর দিকে ফিরল।

ধীর পদবিক্ষেপে দীপক এগিয়ে চলে বাংলোর দিকে। যে উদ্দেশ্য নিয়ে সে বেরিয়েছিল তা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। মাঝপথে যে এমন একটা কিছু হতে পারে, তা সে আদৌ কল্পনা করতে পারেনি।

কিন্তু এবার আর দ্রুতপদে চলে না সে। দ্রুত চলার প্রয়োজন তার ফুরিয়ে গেছে। অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি মেলে ধরে পথের দু'পাশে। প্রতিটি জিনিস খুব মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ্য করতে করতে চলে সে।

কিছুদূর এগিয়েই থম্‌কে দাঁড়ায় দীপক।

উল্টো দিক থেকে কে একজন যেন এই দিকেই এগিয়ে আসছে পায়ে পায়ে। দীপক সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে রিভলভারটা তুলে ধরে লোকটির দিকে। গম্ভীর কণ্ঠে বলে—চুপ করে সোজা হয়ে দাঁড়াও। এতটুকু অস্থিরতা দেখালে বাধ্য হয়ে আমাকে গুলি ছুড়তে হবে।

—আজ্ঞে, আমি স্যর! মানে অতুল্য ঘোষ। মানে—দয়া করে আমাকে গুলি করে মারবেন না।

—ও, আপনি অতুল্যবাবু? দীপক এগিয়ে গিয়ে বলে—কিন্তু এত রাতে যে আপনি হঠাৎ এখানে আসবেন আমি ত তা...

—তা ত বটেই। তা ত বটেই! আমি কি আর আসতাম স্যর! বিকাশবাবু বললেন একটু খোঁজ করতে।

বহুক্ষণ বের হয়েছেন, এখনও তিনি ফেরেননি কি না! আমিও ভাবলাম, দেখি কোথায় গেলেন, এমন সময় শুনলাম বন্দুকের আওয়াজ। তাই ছুটতে ছুটতে এদিকে আসছি। এ অঞ্চলে এ সব শুনলেই কেমন যেন ভয় ভয় করে। বুকের মধ্যে যেন 'তা ত বটেই' গুরু গুরু করতে থাকে।

—বিকাশবাবু আমার খোঁজ করছিলেন?

—তা ত বটেই। কিন্তু ব্যাপার কি স্যর! বন্দুকের শব্দ কোত্থেকে এলো তা ত বুঝতে পারছি না!

—আমিই বন্দুক ছুঁড়েছিলাম। অতুল্যবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে দীপক কথাগুলো বলে।

—তা ত বটেই। কিন্তু বন্দুক ছুঁড়লেন কেন তা ত বুঝতে পারছি না। অতুল্য ঘোষ দীপকের দিকে তাকান অদ্ভুত দৃষ্টিতে।

দীপক বলে—কোন রহস্যময় দৃশ্য দেখেই রিভলভারটা ব্যবহার করতে বাধ্য হয়েছিলাম অতুল্যবাবু। কিন্তু এখনও বুঝতে পারছি না ভেতরের রহস্যটা কি।

—আপনি দেখেছেন স্যর? ভয়ার্ত দৃষ্টিতে দীপকের দিকে চেয়ে অতুল্য ঘোষ বলেন—আর এখানে দাঁড়াবেন না স্যর! চলুন, এখুনি এখান থেকে অন্যত্র যাওয়া যাক। এ সব দৃশ্য যে একবার দেখে সে আর বেশিদিন বাঁচে না। আপনি এখানে আর দাঁড়াবেন না স্যর। কে জানে কোত্থেকে কি হয়!

অতুল্য ঘোষ দ্রুতপদে চলতে সুরু করেন। দীপক তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই জোরে পা চালায়।

অতুল্য ঘোষের সঙ্গে বাংলোর দিকে এগোতে এগোতে সে শুধু ভাবে, এটা কি সত্যিই অতুল্য ঘোষের অহেতুক ভয়, না তার স্বেচ্ছাকৃত অপপ্রচারের প্রচেষ্টা।

ছয়

—ডান হাতের রহস্য—

পরদিন খুব ভোরেই কার ডাকে দীপকের ঘুম ভেঙ্গে যায়।

চোখ মেলে দীপক দেখতে পায় তার সামনেই দাঁড়িয়ে আছে তার বন্ধু ও সহকর্মী রতনলাল।

—এ কি রে? তুই হঠাৎ এত ভোরে? দীপক প্রশ্ন করে।

—কয়েকটা কাজ ছিল কোলকাতায়, তা ত জানিস্! সেগুলো শেষ হয়ে গেল তাই ভাবলাম একবার হীরাপুর থেকে বেড়িয়ে আসি। তারপর, এদিকে কতদূর?

—এখানকার মিস্ট্রি এখনও আন্‌সল্‌ভড্ রয়ে গেছে। আমি এখনও আঁধারে ঘুরে বেড়াচ্ছি শুধু একটা চাবির আস্বাদনে। কিন্তু 'স্ক্রু'টা এখনও খুঁজে বের করতে পারছি না।

—আশ্চর্য, এখানকার কেসটা সত্যিই কি জটিল?

—শুধু জটিল নয়—রীতিমতো জটিল। রহস্যের সব কটি সামনে, কিন্তু আসল নায়ক যে কে তাই বের করতে পারছি না। তা ছাড়া এতে তার স্বার্থই বা কি?

—স্বার্থ নেই অথচ এভাবে কাজ করছে, এটা কি করে সম্ভব?

—হয়ত স্বার্থ কিছু আছে, আমরা ঠিক তা বুঝতে পারছি না। সব সময় সকলের সঠিক স্বার্থ মানুষ বুঝে উঠতে পারে না। তাই তাকে এখনও ভিড়ের মধ্য থেকে খুঁজে বের করতে পারিনি আমি।

—তাকে এখনও খুঁজে পাস্‌নি?

—না। ব্যাপারটা কি জানিস্? কবির ভাষায় বলতে গেলে—"বহু রূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর"। নানা রূপে তাদের দেখছি বটে কিন্তু কে যে ঈশ্বর, মানে আসল নায়ক...

—বুঝলাম। কিন্তু কোলকাতায় যাবি কবে?

—এ কেসের ওপর যবনিকাপাত না হওয়া পর্যন্ত নয়। দীপকের স্বরে দৃঢ়তা।

হঠাৎ দরজার সামনে শোনা গেল কণ্ঠস্বর। দেখা গেল অতুল্য ঘোষ পায়ে পায়ে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করছেন। অতুল্য ঘোষ বোধ হয় দীপকের শেষ কথাগুলো শুনতে পেয়েছিলেন। তাই তিনি বললেন—যবনিকাপাত হওয়ার আগেই কিন্তু আমাদের এখান থেকে সরে পড়া উচিত। যে ভাবে একটির পর একটি কাণ্ড ঘটে চলেছে!

—আবার কি কাণ্ড ঘটল অতুল্যবাবু? দীপক উদ্‌গ্রীবভাবে প্রশ্ন করে।

—মারাত্মক ব্যাপার ঘটে গেছে স্যর! এবার ফাঁড়াটা ম্যানেজারবাবুর ওপর দিয়ে না গিয়ে, গেছে একজন মজুরের ওপর দিয়ে!

—ফাঁড়া? আপনার কথাটা ঠিক বুঝতে পারছি না...

—একজন মজুরকে কে যেন খুন করেছে স্যর! ঠিক যে ভাবে আগে দুজন ম্যানেজারবাবু খুন হয়েছিলেন, সেই ভাবে গলা টিপে মারা হয়েছে। এ যে সেই ভূতের কীর্তি সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

—ভূতের কীর্তি?

—নিশ্চয়ই স্যর! কাল রাতে যখনই ভূতটাকে দেখা গেল তখনই জানি এমন একটা কিছু ঘটবে। তা ছাড়া আপনি আবার তার দিকে বন্দুক ছুঁড়ে তাকে আরও রাগিয়ে দিয়েছেন।

—উঃ, বড্ড বাজে বকেন আপনি অতুল্যবাবু! যাক, বিকাশ কোথায় বলুন তো?

—তিনি সংবাদ পেয়ে ওদিকেই গেছেন। তাঁর কথাতেই আমি আপনাকে জানাতে এসেছিলাম।

—বেশ করেছেন। এবার দয়া করে আমাদের নিয়ে চলুন সেখানে। রতন, আয় আমার সাথে।

দুজনে অতুল্যবাবুকে অনুসরণ করে ঘটনাস্থলে গিয়ে উপস্থিত হয়।

ফ্যাক্টরী থেকে কিছু দূরে বস্তির প্রান্তভাগে একটা বাংলোর মতো জায়গা। ঠিক সেখানেই চিৎ হয়ে পড়ে আছে একটি দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ মানুষের মৃতদেহ।

শান্ত স্থির মৃতদেহটা। যেন এইমাত্র ঘুমিয়ে পড়েছে। কয়েকটি মুহূর্তের মধ্যে যাকে এভাবে মৃত্যুর হিমশীতল কোলে ঢলে পড়তে হয়েছে, ঘণ্টা কয়েক আগেও সে ছিল জীবিত—সুস্থ।

চারপাশে অনেক লোক এসে জমেছিল। কৌতূহলী মিলের শ্রমিকদের মাঝে আজ ভয়ের সঞ্চার হয়েছে।

এতদিন শুধু ম্যানেজাররাই নিহত হয়েছেন, মিলের শ্রমিকদের মধ্যে তাই ততটা আতঙ্কের সঞ্চার হয়নি। কিন্তু আজ এই শ্রমিকের মৃত্যুতে তাদের সাহসের বাঁধ ভেঙ্গে গেছে। সকলের চোখে-মুখে আতঙ্কের ছায়া।

দীপককে দেখে বিকাশবাবু এগিয়ে এসে বলেন—ইট ইজ সিওরলি এ কেস অব হোমিসাইড্—এটা যে নিশ্চয়ই খুন এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই!

দীপক বলে—আর খুনের উদ্দেশ্যটাও অস্পষ্ট নয়।

—তার মানে? বিকাশবাবু প্রশ্ন করেন।

দীপক বিকাশবাবুর কানে কানে বলে—মজুরটার ডান হাতটা ভাল করে লক্ষ্য করে দেখলেই বুঝতে পারবে।

বিকাশবাবু দেখেন মজুরটার ডান হাতে একটি ক্ষতচিহ্ন। অনেকটা গর্ত হয়ে গেছে।

দীপক বলে—এখুনি থানায় খবর পাঠাও বিকাশ। কেসটা ভালভাবে তদন্ত হওয়া উচিত। আর তুমি পার ত এখুনি বাংলোয় চলে এস।

—বেশ। আমি যাচ্ছি। কুলিদের সর্দারকে দিয়েই খবরটা পাঠানো যাক। কি বল?

—হ্যাঁ, সেটাই ভাল হবে। তোমাদের অতুল্য ঘোষের ওপর আমার কোন আস্থা নেই। দিনরাত ভূতের ভয়েই অস্থির!

অতুল্য ঘোষকে শুনিয়ে দীপক জোরে জোরে কথাটা বলল।

অতুল্য ঘোষ এগিয়ে এসে বলেন—তা ত বটেই স্যর, আপনি কি মনে করেন স্যর,

যে এগুলো সব ভূতুড়ে কীর্তি নয়? ভূত ছাড়া মানুষ কি কখনও এমন করে কোনও মানুষকে খুন করতে পারে!

দৃঢ় ভঙ্গিতে দীপক জবাব দেয়—নিশ্চয়ই আমি এটাকে মানুষের কীর্তি বলেই মনে করি। এটা যে কোনও একজন মানুষের কীর্তি সে সম্বন্ধে আমার এতটুকু সন্দেহ নেই। আমি হলপ করে বলতে পারি যে সেদিন মেসিনের নাটটা খুলে রেখে ফ্যাক্টরীতে দুর্ঘটনা ঘটিয়েছিল যে লোক, এই হত্যাকাণ্ডও তারই কীর্তি।

যাক, আপনি ওসব জটিল ব্যাপার বুঝতে পারবেন না অতুল্যবাবু। এর মিস্ট্রিটা যদি সল্‌ভ্‌ করা এতই সহজ হতো তা হলে অনেক দিন আগেই এসবের অবসান ঘটতে পারত। কিন্তু আমার ধারণা এর পেছনের রহস্য আমি নিশ্চয়ই খুঁজে বের করতে পারব।

দীপকের কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ।

অতুল্যবাবু কেমন যেন ভ্যাবাচাকা খেয়ে গিয়েছিলেন। এবার আমতা আমতা করে বলেন—কিন্তু সেই প্রেতাত্মা...

মৃদু হেসে দীপক বলে—প্রেতাত্মার সমাধানও আমি ইতিমধ্যেই করে ফেলেছি। কিন্তু সব কিছু না জেনে আগে এক্‌স্‌পোজ করতে চাই না। যাক, বিকাশ, তুমি এবার কুলিদের সর্দারকে একটু ডেকে দিও ত। আমি শুধু তাকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই।

বিকাশবাবুর নির্দেশে ফ্যাক্টরীর স্টোরকীপার হরদেও পাণ্ডে কুলিদের সর্দার ঝমরুকে ডেকে আনে।

বিরাট পেশীবহুল দেহ ঝমরুর। কালো। চেহারার মধ্যে একটা নির্ভীক বলিষ্ঠতা প্রথম দর্শনেই চোখে পড়ে।

ঝমরু সর্দার এসে বিকাশবাবুকে সেলাম ঠুকে দাঁড়ায়।

বিকাশবাবু বলেন—এই বাবু তোমাকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করবেন ঝমরু।

—কি কথা বাবু? ঝমরু নিস্পৃহ কণ্ঠে বলে।

দীপক প্রশ্ন করে—তুমি এই লোকটাকে নিশ্চয়ই চেন ঝমরু, যে কাল রাতে মারা গেছে?

—হ্যাঁ বাবু। ওর নাম মংলু। ছোকরার শরীরে খুব তাগদ ছিল বাবু। খুব খাটতে পারত। তবে ওর স্বভাবচরিত্র কোনদিনই ভাল ছিল না।

মৃদু হেসে দীপক বলে—তা বুঝেছি। বাড়ির সকলের সঙ্গে বোধ হয় খুব ঝগড়া করত?

—ঠিক বলেছেন বাবু। প্রায়ই বাড়ি ফিরত বেশি রাতে। বৌকে মারধর করত। বাবা-মার সঙ্গেও ঝগড়া করত। বাড়ির কারও কথা শুনত না। বাড়ির সকলেই তাই ওর উপর বিরক্ত হয়ে উঠেছিল।

—কেউ ওকে বেশি রাতে বাড়ি থেকে বার হতে বারণ করত না?

—তা ত করতই। আর সেই জন্যেই ত যতো গোলমাল। ওর বাড়ির লোকেরা বলত—আজকাল ভয়ানক চিকাশের উপদ্রব, এখন বেশি রাত অবধি ঘোরাফেরা করা উচিত নয়। কিন্তু ও এমনি একগুঁয়ে যে কারও কথায় কোনওদিন কান দিত না।

—চিকাশ কি? বাধা দিয়ে রতন জিজ্ঞাসা করে।

—ওরা ভূত-প্রেত-আত্মাকে চিকাশ বলে। কথাটা বললেন বিকাশ রায়।

—ঠিক বলেছেন বাবু। ছোকরাটা যে এমনি বেঘোরে প্রাণ হারাবে তা আর কেউ না জানুক আমি ওর ধরনধারণ দেখেই আন্দাজ করেছিলাম। ঝমরু সর্দার বলে।

—ওর ধরনধারণে কোনও পরিবর্তন দেখেছিলে নাকি? দীপক প্রশ্ন করে।

—সে কথাটা এমন কিছু নয় বাবু। ও কেমন যে লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াত আজকাল। কারও সঙ্গে বেশি কথা বলত না। চুপচাপ একা একা কি ভাবত, মানে একটা কিছু যেন দিনরাত চিন্তা করত।

—বুঝেছি। দীপক বলে—তুমি এখন যেতে পার ঝমরু। ওর বাড়িতে গিয়ে খবরটা এখন বলতে পার। বিকাশ, তুমি সরকার মশাইকে দিয়েই থানায় খবরটা পাঠাতে পার। আফ্‌টার অল ইট্‌স্ এ কেস অব কাল্‌পেব্‌ল্ হোমিসাইড্!

—আমিই যাব তা হলে। যতো চাপ আমার ওপর! বিড় বিড় করতে থাকেন অতুল্য ঘোষ।

—হ্যাঁ, আপনিই যান। হেসে দীপক বলে—থানার কর্তব্য কাজ থানা করুক। আমরা এখন খেয়ে-দেয়ে আরাম করি। চল বিকাশ, চল্ রতন।

সকলকে নিয়ে দীপক সজোরে বাংলোর দিকে পা বাড়ায়।

সাত

—রাতের আমন্ত্রণ—

দুপুরের আহারের পর বাংলোর একটি ঘরে গোপন বৈঠক বসেছে। বৈঠকে উপস্থিত ওরা চারজন—দীপক, রতন, বিকাশ রায় আর তাঁর মেয়ে অনীতা।

দীপক নিশ্চিন্ত মনে বসে সিগারেট টেনে চলেছিল। বিকাশ রায় প্রশ্ন করেন—তখন মৃত লোকটির ডান হাতের দিকে চেয়ে কি যেন বলতে চেয়েছিলে তুমি?

দীপক বলে—হ্যাঁ, বলতে চেয়েছিলাম, কেন হতভাগ্য লোকটিকে এভাবে মৃত্যুবরণ করতে হলো।

—কেন বল ত!

—আমিও ঠিক বুঝতে পারিনি। রতন বলে।

দীপক বলে—এই লোকটাই হচ্ছে তোমাদের অশরীরী প্রেতাত্মার আসল কায়া। আমার মনে হয় কারও নির্দেশেই ও এ কাজ করে চলেছিল। কাল আমি ওর ডান হাত লক্ষ্য করে যে গুলি ছুঁড়েছিলাম তা ঠিক জায়গাতেই বিদ্ধ হয়েছিল। আমার গুলি খেয়ে লোকটা বেদনায় আর্তনাদ করে উঠেছিল। তখনই আমি বুঝতে পারি যে ও জখম হয়েছে। এবার অতি সহজেই ওকে খুঁজে বের করা যাবে। কিন্তু তার আগেই যে এমনভাবে ওরা ওকে হত্যা করবে তা আমি কল্পনাও করতে পারিনি।

—ব্যাপারটা তা হলে রীতিমতো জটিল? অনীতা প্রশ্ন করে।

—তুমি ঠিকই বুঝতে পেরেছ অনীতা। মোটা টাকা কবুল করে লোকটাকে চুক্তিবদ্ধ করা হয়েছিল। দু' পায়ে দুটি কাঠের বা বাঁশের লম্বা রণপা লাগিয়ে সারা গা কালো কাপড়ে আবৃত করে ও এমনি ভয় দেখিয়ে বেড়াত!

—কিন্তু এতে ওর স্বার্থ কি? বিকাশবাবু প্রশ্ন করেন।

—স্বার্থ ওর নয়—যারা ওকে নিযুক্ত করেছে স্বার্থ তাদের।

—আর সেই বড় বড় পায়ের চিহ্ন, কাকাবাবু? অনীতা প্রশ্ন করে।

—মনে হচ্ছে, লম্বা কাঠের রণপা দুটি এমনভাবে তৈরী ছিল যে তাতে ঠিক দশ-বারো ইঞ্চি লম্বা ছাপ পড়ত মাটির ওপর। সেগুলো আসল কোনও জন্তুর পা নয়, ছাপগুলো নকল কাঠের পায়ের। একটা জিনিস বোধ হয় লক্ষ্য করনি। ছাপগুলো দেখা গেছে সব 'ফ্ল্যাট'। কিন্তু সাধারণ মানুষের পায়ের ছাপে আগা আর গোড়ালির মাঝের অংশের ছাপ ভাল ভাবে পড়ে না।

দীপক হঠাৎ সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ায়। সকলে অবাক হয়ে তাকায় তার মুখের দিকে। দরজার দিকে এগিয়ে যায় দীপক দ্রুতপদে।

বাইরে শোনা যায় পদশব্দ। কে যেন দ্রুতপায়ে বারান্দা দিয়ে হেঁটে চলে গেল।

দীপক এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে ফেলে। কিন্তু সেখানে কাউকেই দেখা যায় না।

বিকাশবাবু প্রশ্ন করেন—একজন লোক বোধ হয় আড়ি পেতে আমাদের কথা শুনছিল। কিন্তু তুমি তা বুঝতে পারলে কি করে দীপক?

দীপক বলে—দরজার কী-হোল্ দিয়ে যখনই আলোকরশ্মি আসা বন্ধ হয়ে গেল, তখনই বুঝলাম, নিশ্চয়ই কেউ একজন এসে দাঁড়িয়েছে ওখানে।

—সেই কি আসল 'কালপ্রিট'? প্রশ্ন করেন বিকাশবাবু।

—সে সম্বন্ধে নিশ্চিত করে কিছুই বলা যায় না বিকাশ। কোনও অনুচরও হতে পারে। কিন্তু ও কাগজটা কোত্থেকে এলো?

কথাশেষে দীপক এগিয়ে গিয়ে একটুকরো কাগজ কুড়িয়ে নেয়। দেখা যায় সেটা একখানা চিঠি। বোধ হয় যে লোকটি তাদের কথা শোনবার জন্যে উৎকর্ণ হয়েছিল, তার পকেট থেকে পড়ে গেছে।

দীপক খুলে দেখল তাতে গোটাদুয়েক কথা লেখা :

কোম্পানীর বাগান...রাত দুটো...

বিকাশবাবুও দীপকের সঙ্গে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি বললেন—আশ্চর্য, লোকটা তা হলে নিশ্চয়ই ওই দলের সঙ্গে কোনওভাবে জড়িত। ওকে ধরতে পারলে হয়ত অনেক কথাই জানতে পারা যেত।

—কিন্তু আমাদের অ্যালার্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ও গা-ঢাকা দিয়েছে। লোকটার বুদ্ধি যে নেহাৎ কম নয় তা বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু এত বুদ্ধিমান হয়েও সে এটি ফেলে গেল কেন?

—তা ত আমিও বুঝতে পারছি না। ইট্ লুক্স্ লাইক এ পাজ্‌ল্। এটা অনেকটা ধাঁধার মতো লাগছে।

দীপক বিকাশের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করে—আচ্ছা, কোম্পানীর বাগান কোথায় বিকাশ?

—আমাদের ফ্যাক্টরী থেকে দূরে একটা জংলা মতো জায়গা। আমাদের ফ্যাক্টরী কম্পাউণ্ডের বাইরে।

—বুঝেছি। ভালই হলো, নিমন্ত্রণটা যথাসময়ে রক্ষা করা যাবে! দীপকের স্বর রহস্যময়।

বিকেলের দিকে একজন নাদুসনুদুস চেহারার ভদ্রলোককে বাংলোর সামনে এসে ডাকাডাকি করতে দেখা গেল।

অতুল্য ঘোষ তাকে সঙ্গে করে বাংলোয় নিয়ে এসেছেন। সে স্থানীয় থানার দারোগা। নাম বামাপদ বক্সী। বিকাশ, দীপক, রতন ইত্যাদি তাকে দেখে বাইরে বেরিয়ে আসে।

—নমস্কার দারোগাবাবু! বিকাশ রায় সুরু করেন—আমিই এ ফ্যাক্টরীর নতুন ম্যানেজার বিকাশ রায়। একটা খুন হয়েছে এখানে। মিলের মজুর মংলু।

—মৃত্যুর কারণ?

—বোধ হয় গলা টিপে মারা হয়েছে। গলার দু'পাশে নীল দাগ দেখতে পাওয়া গেছে।—দীপক বলে।

—আপনি? দারোগাবাবু দীপকের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করে।

—উনি আমার বন্ধু প্রাইভেট ডিটেকটিভ দীপক চ্যাটার্জী। আর ইনি ওঁর সহকারী রতনলাল। জবাব দেন বিকাশ রায়।

হো হো করে হেসে উঠে 'ফ্যাটি' বামাপদ বলে—সখের গোয়েন্দারা কি আর এসব জটিল রহস্য ভেদ করতে পারে! এ নিয়ে বুঝি তিনটে হলো?

—আপনি কতদিন এ লাইনে আছেন? দীপক প্রশ্ন করে।

বারদুয়েক গলাখাঁকারি দিয়ে বামাপদ বক্সী সুরু করে—ন'বছরের কিছু বেশি। পুলিশ বিভাগের সকলে একডাকে আমাকে চিনবে। কেন, আপনি এর আগে বামাপদ বক্সীর নাম শোনেননি?

—আপনিই সেই খ্যাতনামা বামাপদ বক্সী? আপনার নাম বহুবার শুনেছি বটে। দীপক বিনা কারণেই বামাপদর সুখ্যাতি করে। অথচ রতন স্পষ্টই জানে, বামাপদ বক্সী নামধারী কোনও দারোগার নাম সে ইহজীবনে শোনেনি।

—শুনবেন বইকি! 'ফ্যাটি' বামাপদ হো হো করে হাসে। অত্যন্ত মোটা লোক বোকার মতো হাসলে কত কুশ্রী দেখায় এ যেন তার জীবন্ত দৃষ্টান্ত!—ধরুন গিয়ে এই ক'বছরে সাতচল্লিশটা জটিল কেসের সমাধান করেছি। তেইশটা চুরি, ন'টা পকেটমার, তিনটে রাহাজানি; এছাড়া খুন, গুম, স্বদেশী ডাকাতি, অ্যাব্ডাক্শান্, কতো কি!

—সত্যি, আপনার মতো যোগ্য লোক আমাদের গর্বের বস্তু। দীপক বলে ওঠে উৎফুল্লকণ্ঠে।

বামাপদ আনন্দিত কণ্ঠে প্রশ্ন করে—মৃতদেহটা কোথায়?

—ফ্যাক্টরীর একটা ঘরের মধ্যে টেনে নিয়ে গিয়ে রাখা হয়েছে।

—ভেরী গুড্! চলুন সেদিকে এগুনো যাক্।

মৃতদেহ দেখে বামাপদ বলে—এবারের মৃত্যুটা কিন্তু অন্যরকম দেখছি। গলায় দাগ থাকলেও ডান হাতের এই ক্ষতচিহ্ন...

—এটা আমারই কীর্তি! দীপক বলে—তা হলে গোটা কাহিনীটা শুনুন।

দীপক প্রেতাত্মা আর গুলি করার কাহিনীটা বামাপদকে খুলে বলে।

'ফ্যাটি' বামাপদ বলে—লাশটা মর্গে পাঠাবার ব্যবস্থা আমি করছি। কিন্তু ওরা যদি মংলুকে এই কাজে নিযুক্ত করে থাকে তবে তাকে হত্যা করল কেন?

—হয়ত মংলু খুব বেশি টাকা দাবী করেছিল। কিংবা অন্য কোনও কারণও হতে পারে। হয়ত ডান হাত জখম হওয়ার পর আমরা ওকে চিনতে পারব এবং ওকে arrest করে সব কথা জানতে পারব সেই ভয়েই ওর মুখ চিরদিনের মতো বন্ধ করে দিয়েছে।

—আপনার বুদ্ধির সত্যিই প্রশংসা করি দীপকবাবু! 'ফ্যাটি' বামাপদ ঘাড় নাড়ে এতক্ষণে।

—এর আগে কি মৃতদেহ কখনও পুলিশ সার্জনকে দিয়ে পরীক্ষা করানো হয়েছিল? প্রশ্ন করে দীপক।

—না। প্রথমে সাধারণ কেস বলেই এটাকে গ্রহণ করেছিলাম। কিন্তু পর পর এতগুলো খুনোখুনি যে ঘটবে তা আগে কে জানত বলুন! যাক্, আপনি যখন বলছেন, এবার পুলিশ সার্জনকে দিয়েই মৃতদেহ পরীক্ষা করাব আমরা।

আট

—হত্যা ঃ রুমাল—

রাতের কালো ছায়া গভীর হয়ে ওঠে।

নিঃশব্দে প্রেতায়িত দীর্ঘশ্বাসের মতো রাত্রির কালিমা দিক্‌বিদিক্ আচ্ছন্ন করে ফেলতে থাকে।

শোঁ শোঁ শব্দে হাওয়া বইছে। ঠাণ্ডা, জোলো হাওয়ার সকরুণ বিষণ্ণ কান্না। শীতার্ত বাতাস বয়ে চলেছে একটানা। আকাশের বুকে পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ। মাঝে মাঝে বিদ্যুতের চমক। সশব্দ গর্জন।

এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়কে বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করে দুজন লোককে এগিয়ে চলতে দেখা গেল। ভাল করে লক্ষ্য করলে দেখা যেত, এরা দুজন হচ্ছে ডিটেকটিভ দীপক চ্যাটার্জী আর তার সহকারী রতনলাল।

রতনলালের দিকে চেয়ে দীপক বলে—তুই কোম্পানীর বাগান থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকবি। যদি এটা ওদের ফাঁদ হয়, তবে তুই আমাকে ফলো করবি। যদি ওরা আমাকে বিপদে ফেলে, তবে আজ রাতেই থানায় গিয়ে 'ফ্যাটি' বামাপদর শরণাপন্ন হবি!

রতন ঘাড় নাড়ে।

দীপক বলে—আর যদি দেখি লোক মাত্র দু-একজন তবে আমরা ওদের কাবু করতে পারব। তবে আমি হুইশেলে ফুঁ দিয়ে ওদের আক্রমণ করব। তুই সঙ্গে সঙ্গে আমাকে সাহায্য করবার জন্যে ছুটে আসবি।

রতন সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়ে।

তারপর অজস্র নীরবতা। কিছুটা এগিয়েই একটা বড় আমগাছ। দীপক রতনের হাতটা টিপে ইশারা করে সেই গাছের আড়ালে তাকে লুকিয়ে পড়তে। সেখান থেকেই নিকটবর্তী সবকিছু বেশ ভাল করে দেখা যায়।

দীপকের ইশারামতো রতন সেই গাছটার আড়ালে গিয়ে দাঁড়ায়। রতনকে ঠিকমতো দাঁড়াতে দেখে দীপক নিশ্চিন্তমনে এগিয়ে যায়।

রেডিয়ামের ডায়ালযুক্ত হাতঘড়িটার দিকে তাকিয়ে দেখে রাত তখন সাড়ে বারোটা।

দীপকও কিছুটা এগিয়ে ঠিক কোম্পানীর বাগানের মাঝামাঝি একটা গাছের আড়ালে গিয়ে দাঁড়ায়। তাদের এখনও ঘণ্টা দেড়েক অন্ততঃ অপেক্ষা করতে হবে।

কিন্তু তাদের অপেক্ষা করতে হলো না বেশিক্ষণ।

মিনিট দুয়েক পরেই হঠাৎ কোথা থেকে যেন ভেসে এলো একটা তীব্র হুইশেলের শব্দ।

একটানা তীক্ষ্ণ শব্দের তরঙ্গ যেন কেঁপে কেঁপে দূরদূরান্তরে ভেসে যায়।

মানুষের মন যেন মুহূর্তের মধ্যে সে শব্দের দোলায় রণ্ রণ্ করে ওঠে।

আবার বলিষ্ঠতা হয় স্তিমিত। জেগে ওঠে অকারণ অহেতুক ভয়।

আর একবার ভেসে আসে সেই বাঁশীর শব্দ।

তার পরেই শোনা যায় একটা আর্ত চীৎকার। মুমূর্ষু মানুষের করুণ অন্তিম কাতরতা সে বাতাসকে ভারী করে তোলে।

দীপক ও রতন একসঙ্গে ছুটে যায় শব্দ লক্ষ্য করে। রতনের প্রতি যে নির্দেশ দেওয়া ছিল তাও যেন সম্পূর্ণ ভুলে যায় সে।

অল্প দূরেই শোনা যায় ধস্তাধস্তির শব্দ।

দুজন লোক যেন ক্ষিপ্তভাবে পরস্পরকে আক্রমণ করেছে। রাতের নিবিড় আঁধার ভেদ করে ওদের চেনা যায় না। বোঝা যায় না—ওরা কে? কেনই বা তারা পরস্পরের প্রতি এমনি তীব্র জিঘাংসায় মেতে উঠেছে?

অকস্মাৎ শোনা যায় একটা পিস্তলের শব্দ। দীপক দূর থেকে শব্দ শুনে 'ব্ল্যাঙ্ক ফায়ার' করেছে।

কিন্তু ওধার থেকে কোনও প্রত্যুত্তর এলো না।

দীপক দ্রুতপায়ে এগিয়ে গেল।

একজন লোক কোম্পানীর বাগান পেরিয়ে ছুটে যাচ্ছে বলে মনে হলো। দূরে—অনেক দূরে মিলিয়ে গেল তার অপস্রিয়মাণ দেহ।

একটি মানুষের দেহের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল দীপক। কিন্তু একি, মানুষটির দেহে আর প্রাণ নেই!

রতনও ততক্ষণে এসে পড়েছে।

রতন এসে টর্চ ফেলে মৃত লোকটির মুখের ওপর।

কিন্তু একি!

মৃত লোকটি আর কেউ নয়—স্বয়ং ফ্যাক্টরীর সরকারবাবু অতুল্য ঘোষ। সেদিনও বিকেলে এঁর সাথে কথাবার্তা হয়েছে।

মৃতদেহের গলায় পূর্ববৎ নীল দাগ। এঁকেও গলা টিপেই হত্যা করা হয়েছে বলে মনে হয়।

দীপককে যেন অত্যন্ত উত্তেজিত বলে মনে হয়।

আপনমনেই দীপক বলে—আমি জানতাম। আমি আন্দাজ করতে পেরেছিলাম। কিন্তু এতটা পারিনি। উঃ, কি ভয়ানক! কি বীভৎস!

রতনও কথা বলে না। তার কথাও ঘটনার এই আকস্মিক পরিস্থিতিতে কেমন যেন রুদ্ধ হয়ে এসেছিল।

দীপক চারদিকে টর্চের আলোকরেখা ফেলে দেয়।

কি একটা জিনিস মৃতদেহের কাছেই পড়ে আছে দেখা গেল। দুজনে এগিয়ে গিয়ে তুলে নেয় সেটা।

একটা লাল রঙের রুমাল পড়ে থাকতে দেখা গেল। রুমালের কোণে ইংরাজী হরফে একটি কথা লেখা—'বি'।

—বার বার এই মারাত্মক 'বি'! রতন বলে। কিন্তু ওই 'বি'-এর রহস্য কি কোনদিন ভেদ হবে না?

দীপক রহস্যপূর্ণ কণ্ঠে বলে—ভেদ আগেই হয়েছিল। কিন্তু সময়ের সামান্য গোলমালের জন্যে সে ধরা পড়ল না—উপরন্তু একজন নিরপরাধ লোক নিহত হলো। অথচ..

কথা শেষ হয় না।

পাশের ঝোপটা সামান্য নড়ে ওঠে।

—কে? দীপক রিভলভারটা ঝোপের দিকে উদ্যত করে কঠোর স্বরে প্রশ্ন করে।

—আমি স্যর! মানে যদি কিছু মনে না করেন...

কথাশেষে দেখা যায়, ঝোপের মধ্যে হতে বের হয়ে আসে স্বয়ং লোকেন হালদার।

—আপনি এখানে? দীপক তীক্ষ্ণকণ্ঠে প্রশ্ন করে।

—এধার দিয়ে যাচ্ছিলাম আমি। হঠাৎ খুনোখুনির ব্যাপার দেখে এই ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে পড়েছিলাম স্যর। উঃ, কি ভয়ানক! কি ভয়ানক!

—তা ত বুঝলাম, কিন্তু রাত সাড়ে বারোটা-একটার সময় এই পথ দিয়ে যাওয়াটা কি সন্দেহজনক নয়?

—সন্দেহ যদি হয় ত সন্দেহ নিয়েই চুপ করে বসে থাকুন মশাই। আমি কোথায় মরতে মরতে বেঁচে গেলাম, আর আপনি বলেন কিনা...

কথা শেষ না করেই হন্ হন্ করে লোকেন হালদার অদৃশ্য হয়।

রতন দীপককে প্রশ্ন করে—লোকটাকে কি এ গ্রাউণ্ডে অ্যারেস্ট করা চলে না দীপক?

দীপক হেসে বলে—পাগল! ওর বিরুদ্ধে প্রমাণ কোথায়! আর ও শুধু এই ব্যাপারের একটা অংশ মাত্র।

—তার মানে?

—মানে একটা ত্রিভুজের একটা বাহু। কিন্তু সে সব কথা পরে হবে। এখন চল বিকাশকে খবরটা দিয়ে, 'ফ্যাটি' বক্সীকে জানাতে হবে।

দুজনে দ্রুতপদে ফ্যাক্টরীর দিকে পা বাড়ায়।

পরদিন সকাল থেকেই সারা হীরাপুরে যেন তোলপাড় সুরু হয়ে যায়।

কোম্পানীর বাগানে মৃতদেহ পাওয়া গেছে।

আর সে মৃতদেহ ফ্যাক্টরীর সরকারবাবু অতুল্য ঘোষের। যে অতুল্য ঘোষ কথায় কথায় ভূতের ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে উঠতো সেই কিনা শেষে ভূতের হাতে প্রাণ হারাল!

সেদিন সকালে রতন যখন দীপককে এই ঘটনার কথা বলছিল তখন দীপক কিন্তু অন্যমনস্কভাবে চেয়ে ছিল খবরের কাগজের একখানা পাতার দিকে।

রতন প্রশ্ন করে—কি দেখছিস অত মনোযোগ দিয়ে বল্ ত!

দীপক বলে—বিজ্ঞাপনের এই ছোট্ট অংশটা দেখছি আমি!

—কি বিজ্ঞাপন? রতন বিজ্ঞাপনটি মনোযোগ দিয়ে দেখতে থাকে ঃ

আমরা, হীরাপুর আয়রণ অ্যাণ্ড স্টীল ফ্যাক্টরীর তিনজন ম্যানেজার মিলে ঠিক করেছি যে এই ফ্যাক্টরীটি উপযুক্ত মূল্যে যে কোনও ভাল লোকের কাছে বিক্রী করব। আমরা সকলে হীরাপুরে যাচ্ছি। সেখানেই ক্রেতারা খোঁজ করতে পারেন।

অম্বিকাপ্রসাদ আগরওয়ালা (অর্ধাংশের মালিক)

হীরাপুর আয়রণ অ্যাণ্ড স্টীল ফ্যাক্টরী।

রতন বলে—তা হলে এটা একটা বেশ বড় 'ক্লু'। কি বলিস্?

দীপক হেসে বলে—নিশ্চয়ই। আমি আজই এ রহস্যের সমাধান করব। অবশ্য আমাকে আজ 'নিরালা লজে' হানা দিতে হবে এ রহস্যের সমাধানের জন্যে।

—নিরালা লজ্?

—হ্যাঁ, কোম্পানীর বাগানের পাশে একখানা বড় বাড়ি।

—কিন্তু সেখানে কি?

—অনুসরণ করতে পার বন্ধু। সব কিছুই ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

নয়

—নিরালা লজের রহস্য—

রাত নামে।

নিস্পন্দ পৃথিবীর বুকের ওপর যেন ঘন অবগুণ্ঠনের মতো ছড়িয়ে পড়ে রাত্রির কালো ছায়া।

হীরাপুরের যে অঞ্চলে নিরালা-লজ্ বাড়িটি অবস্থিত তার আশেপাশে আর কোনও বাড়ির জটলা নেই।

এই বাড়িখানার মধ্য দিয়েই গৃহস্বামীর বুদ্ধি ও সুরুচির ছাপ সুস্পষ্ট ফুটে ওঠে।

চমৎকার দোতলা বাড়িখানা। লাল রঙ। আঁধারের বুকে আবছা ছায়ার মতো অটুট গাম্ভীর্য নিয়ে দণ্ডায়মান।

ঢং ঢং...

দূরের কোন্ একটা পেটা-ঘড়ি জানিয়ে দিল রাত দশটা বাজে।

বাড়ির ঠিক পেছনেই দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায় দুজন লোককে।

সুদীর্ঘ তাদের দেহ।

ভারী ওভারকোটে সারা দেহ আবৃত। মুখের নিচের অংশ ওভারকোটের কলারে ঢাকা। মাথার নাইটক্যাপ্টা নেমে এসে মুখের ওপরদিকের খানিকটা অংশকেও আবৃত করেছে।

হাতে টর্চ। কোমলে রিভলভার—'লোড্' করা। এ ধরনের 'লোডেড' রিভলভার নিয়ে চলাফেরা বিপজ্জনক জেনেও তারা এই ভাবেই বাড়ি থেকে বের হতে বাধ্য হয়েছে।

দোতলার ঘরে আলো জ্বলছে।

নিরালা লজের দোতলার একখানা ঘরে বসে কে যেন একটা বেহালা বাজাচ্ছে।

বাতাসের তরঙ্গে তরঙ্গে ভেসে যাচ্ছে মিষ্টি রাগিণীর করুণ মূর্ছনা।

হৃদয়ের সীমাহীন বেদনা যেন ব্যথার আকারে ঝরে ঝরে পড়ছে ওই মিষ্টি রাগিণীর মধ্য দিয়ে!

বেহালার তারের ওপর আঘাতের পর আঘাত পড়ে।

সুরের পর সুরের তরঙ্গ ছড়িয়ে বাতাসকে যেন ভারী করে তোলে।

অকস্মাৎ...

দূরে কোন্ একটা জীবন্ত অশরীরী যেন হঠাৎ প্রাণ পেয়ে জেগে উঠেছে।

দীর্ঘকায় একটা লোককে এগিয়ে আসতে দেখা যায়।

কে এই লোক? কি তার উদ্দেশ্য? কেন যে আপাদমস্তক কালো আবরণে আবৃত করে এভাবে এগিয়ে আসছে নিরালা লজের দিকে?

বাড়ির পেছনে ওভারকোট গায়ে দিয়ে দণ্ডায়মান দুজন লোকই যেন এবার একটু সচকিত হয়ে ওঠে। কালো মূর্তিটিকে দেখবার জন্যেই যেন তারা দুজনে এতক্ষণ ধরে ওখানে অপেক্ষা করছিল। তবে কি তারা আগেই জানত যে এখানে ওই কালো মূর্তির আবির্ভাব ঘটবে?

কালো মূর্তি এগিয়ে চলেছে নিরালা লজের দিকে।

ঘেউ ঘেউ...

নিরালা লজের মধ্যে তীব্রস্বরে একটা কুকুর বার বার প্রচণ্ড শব্দে আর্তনাদ করে ওঠে।

—জিমি! জিমি!

গলা শোনা যায় একটি উত্তেজিত মানুষের। বেহালার শব্দ এই আকস্মিক কুকুরের ডাকে থেমে গেছে।

একজন লোক দোতলার বারান্দায় এসে দাঁড়ায়।

কালো মূর্তি এবার এই লোকটিকে দেখেই তার হাতটা তোলে। হাতে তার একটা ঝক্‌ঝকে রিভলভার। অগ্নি উদ্গারের নেশায় যেন উন্মাদ! বারান্দায় দাঁড়ানো লোকটির দিকে চেয়ে সে রিভলভারের লক্ষ্য স্থির করে।

—হল্ট!

পেছন থেকে বজ্রকণ্ঠে ধ্বনিত হয়।

ওভারকোট গায়ে লোক দুটির হাতে চক্‌চক্ করে দুটি রিভলভার।

একটি মুহূর্ত!

কালো মূর্তি সাঁৎ করে পাশেই একটা গাছের আড়ালে গিয়ে দাঁড়ায়।

গুড়ুম্! গুড়ুম্!

দুজনের হাতের রিভলভারই একসঙ্গে গর্জে ওঠে।

পোড়া বারুদের গন্ধ বাতাসকে ভারী করে তোলে। মুহূর্তের মধ্যে শান্ত প্রকৃতি যেন বীভৎস আকার ধারণ করে!

কালো মূর্তির গায়ে না লেগে রিভলভারের গুলি গাছের গায়ে বিদ্ধ হয়। কালো মূর্তি গুঁড়ি মেরে পাশের ঝোপের মধ্যে আত্মগোপন করে।

ওভারকোটে আবৃত মূর্তি দুটিকে এবার আর চিনতে কষ্ট হয় না। দীপক চ্যাটার্জী আর তার বন্ধু রতনলাল।

দুজনেই ছুটে চলে ঝোপটার দিকে।

ঝোপজঙ্গল ভেদ করে তারা ছুটে চলে সেই কালো মূর্তির সন্ধানে। তাকে খুঁজে বের করতেই হবে এই যেন ওদের পণ।

কাঁটায় আর বাঁশবনে তাদের হাত-পা ছড়ে যায়। একহাঁটু কাদা ভেঙে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে তারা ছুটে চলে লোকটিকে দেখবার আশায়।

কিন্তু ব্যর্থ তাদের এই কঠোর পরিশ্রম।

ঝোপের মধ্যে বা তার আশেপাশে জনমানবের চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায় না। রাত্রির নিকষকালো আঁধারের মধ্যেই যেন সেই কালো মূর্তির বিসর্জন ঘটেছে।

দীপক আর রতন হতাশ হয়ে বেরিয়ে আসে ঝোপজঙ্গলের মধ্য থেকে।

প্রবহমান বাতাস শুধু একবার ক্ষীণ কান্নার আবর্তে দুজনের মনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে।

দুজনে পায়ে পায়ে হেঁটে এগিয়ে চলে আবার নিরালা লজের দিকেই। বিগত ঘটনা যেন মুহূর্তের একটা দুঃস্বপ্ন ছাড়া আর কিছু নয়!

দশ

—রহস্যের খাসমহল—

নিরালা লজের সদর দরজার উপর পর পর দু'বার আঘাত পড়ে।

—কে?

দোতলা থেকে প্রশ্ন ভেসে আসে।

—দরজা খুলুন। আমি দীপক চ্যাটার্জী।

দীপকের কণ্ঠে অসহনীয় গাম্ভীর্য।

—ভিনো! ভিনো! দরজা খোলো!

দোতলা থেকে কার কণ্ঠে যেন ধ্বনিত হয় আদেশের সুর। যে লোকের জীবন মাত্র কয়েকটি মুহূর্ত পূর্বে অজ্ঞাত আততায়ীর হাতে বিপন্ন হয়েছিল তার এই অবিচলিত স্বর দীপক ও রতন দুজনকেই মুগ্ধ করে।

দরজা খুলে যায়।

ভেতরে প্রবেশ করে দুজনে।

সামনে দাঁড়িয়ে একজন বিশালকায়, পেশীবহুল লোক। গায়ের রং মিশমিশে কালো। চোখে-মুখে অদ্ভুত একটা নিষ্ঠুরতার ছাপ। একটি গ্র্যানাইটে খোদা প্রস্তরমূর্তি যেন। কপালে বিরাট একটা কাটা দাগ।

—ভিনো, ওঁদের ওপরে নিয়ে আয়।

কণ্ঠস্বর ভেসে আসে।

কোন্ এক সুদূরের আহ্বান যেন। কিন্তু সে কণ্ঠস্বরের মধ্যে এমনি একটা মাদকতা মেশানো যে তা মানুষকে হুকুম মেনে চলতে বাধ্য করে।

দীপক আর রতন 'ভিনো' নামধারী লোকটাকে অনুসরণ করে।

আঁকাবাঁকা সিঁড়ি। সিঁড়ির মুখেই একটি বড় হলঘর। ঘরের সামনেই মোটা শিকল দিয়ে বাঁধা বিরাট একটা গ্রে-হাউণ্ড। দু' চোখে তার যেন জলজ্বলে ক্ষুধিত দৃষ্টি।

দীপক আর রতনকে দেখেই কুকুরটি তীব্রস্বরে ডেকে ওঠে। চোখদুটো তার জ্বলে ওঠে পৈশাচিক আনন্দে।

—জিমি! জিমি!

ভেতর থেকে লোকটি বেরিয়ে আসে। পরনে নাইট গাউন, হাতে সিগার।

—জিমি! ফ্রেণ্ড, ফ্রেণ্ড...চুপ করো।

রতনলাল অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করে, এই লোকটি আর কেউ নয়, স্বয়ং লোকেন হালদার।

—নমস্কার মিঃ চ্যাটার্জী! আমি সত্যিই আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। আপনি আমার জীবন রক্ষা করেছেন!

দীপক হাসিমুখে বলে—আমি ত আর রক্ষা করবার মালিক নই মিঃ হালদার। আপনাকে রক্ষা করেছে আপনার নিয়তি। এর আগে চোখের সামনে দিয়ে দু-দুটো খুন হয়ে গেল, কই বাঁচাতে পারলাম না তাদের!

—তবুও, আপনি যদি আজ না আসতেন...

—সে কথা যাক্। কতকগুলো জরুরী কথা আছে আপনার সঙ্গে, যে কারণে এত রাতে আপনাকে বিরক্ত করতে এসেছি।

—বেশ, আসুন আমার সঙ্গে পাশের ঘরে। ভিনো, you may go now.

ভিনো প্রস্থান করে।

লোকেন হালদার দীপক আর রতনকে নিয়ে প্রবেশ করে পাশের বড় ঘরটিতে।

—বড় আলোটা নিভিয়ে দিই, কি বলেন দীপকবাবু? অল্প পাওয়ারের নীল আলো জ্বেলে দিলেই চলবে। লোকেন হালদার বলে।

—আপত্তি নেই।

দীপকের উত্তর সংক্ষিপ্ত।

বড় আলোটা নিভিয়ে দেয় লোকেন। জ্বেলে দেয় ছোট নীল আলোটা। স্বল্প নীল আলোয় ঘরের মধ্যে একটা মায়াময় পরিবেশের সৃষ্টি হয়।

কেমন যেন রহস্যময়। স্বপ্ন-মাখা।

হাতের সিগারেটটাতে মৃদু টান দিয়ে লোকেন সুরু করে—প্রথম থেকেই বলতে সুরু করছি মিঃ চ্যাটার্জী, আপনি যা শুনতে চান। আমার নাম মোটেই লোকন হালদার নয়।

মৃদু হাসিমুখে দীপক বলে—তা জানি। এবং আপনার মাসীমার বাড়িও এটা নয়! কি বলেন?

—আপনি ত জানেনই।

—হ্যাঁ, একটু খবর না রাখলে আর এতবড়ো জিনিসটার রহস্যভেদ করতে পারতাম না।

—পেরেছেন?

—নিশ্চয়ই পেরেছি। যেমন জেনেছি আপনার নাম লোকেন হালদার নয়—আপনি হচ্ছেন রসময় গোস্বামী। এই মিলের সিকি অংশের অংশীদার। মিলের সুনাম নষ্ট হচ্ছে দেখে নিজেই ছদ্মনামে ভেতরের ব্যাপারটা খোঁজ নেবার আশায় এখানে এসেছেন। কিন্তু কোনও সূত্রই বের করতে পারেননি। উপরন্তু আততায়ীর গুলিতে আপনার প্রাণ বিপন্ন হয়ে উঠেছিল।

নিরাশ কণ্ঠে রসময় গোস্বামী বলেন—সত্যি, I am extremely sorry মিঃ চ্যাটার্জী—আমি পারলাম না এ মিস্ট্রি ভেদ করতে।

—কিন্তু আপনার পরিচয় যে অদ্ভুত উপায়ে আমি জানতে পেরেছি, তেমনি জেনেছি এ ফ্যাক্টরীর রহস্যময় ক্রিমিন্যাল কে!

—কে সে মিঃ চ্যাটার্জী?

—এখনও সময় হয়নি। আর কিছুক্ষণ ধৈর্য ধরুন। রাত শেষ হোক। কালকেই আপনারা ফ্যাক্টরী বিক্রি করে ফেলবেন বলে সিদ্ধান্ত করছেন না?

—হ্যাঁ, মিঃ আগরওয়ালার সঙ্গে পত্র মাধ্যমে সে কথা হয়েছে। তিনি কাল সকালে এলেই...

—আসল অপরাধীকে কালকেই গ্রেপ্তার করব মিঃ গোস্বামী ওরফে মিঃ হালদার।

—ও নামে ডেকে আর লজ্জা দেবেন না।

—লজ্জা দিচ্ছি না, আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আপনি দীপক চ্যাটার্জী নন যে এত বড়ো রহস্যময় কেসের সমাধান করতে পারবেন, কিন্তু তবুও আপনি যতটা করেছেন তা প্রশংসার দাবী রাখে।

দীপকের কণ্ঠস্বর উদার।

—তা হলে আসল আসামী কালকেই ধরা পড়বে ত?

—হ্যাঁ। আজ তা হলে আসি মিঃ গোস্বামী!

এমন সময় কুকুরটা সজোরে ডেকে ওঠে আবার।

—কি হলো আবার! ভিনো! ভিনো! জিমিকে একটু সামলে রাখ!

দীপক হঠাৎ জানালায় দাঁড়িয়ে বাড়ির পেছনের ঝোপটার দিকে রিভলভার তুলে পর পর দু'বার ব্ল্যাঙ্ক ফায়ার করে।

প্রচণ্ড শব্দে সারা বাড়িখানা যেন কেঁপে ওঠে।

—কি হলো মিঃ চ্যাটার্জী?

—কিছু না, আপনার বাড়ির পাশেই সেই অদৃশ্য মূর্তি আত্মগোপন করে ছিল, এবার সে পলায়ন করল! তাই জিমির এই আকস্মিক চীৎকার।

—আশ্চর্য! এ ধরনের স্টার্ণ ক্রিমিন্যাল যে পৃথিবীতে থাকতে পারে এ ধারণা ছিল না আমার।

—পৃথিবীতে এমন অনেক কিছুই আছে যা আমাদের ধারণার বাইরে মিঃ গোস্বামী! যাক্ চলি আজকের মতো। রাতে একটু সাবধানে থাকবেন। শুভরাত্রি!

রতনকে নিয়ে দীপক ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়।

এগারো

—যবনিকা—

পরদিন বেলা দশটা।

ফ্যাক্টরীর অফিস ঘরে জরুরী অধিবেশন বসেছে।

সেখানে উপস্থিত রয়েছে মাত্র পাঁচজন লোক।

ফ্যাক্টরীর অর্ধেক অংশের মালিক মিঃ অম্বিকাপ্রসাদ আগরওয়ালা।

লোকেন হালদার ছদ্মনামধারী রসময় গোস্বামী—সিকি অংশের মালিক।

ফ্যাক্টরীর পরিচালক এবং বাকী অংশের মালিক বিনয় সমাদ্দার।

ফ্যাক্টরীর ম্যানেজার বিকাশ রায় এবং ডিটেকটিভ দীপক চ্যাটার্জী।

অধিবেশনে কথা সুরু হয়। রসময় গোস্বামী উঠে দাঁড়িয়ে কথা বলতে সুরু করেন ঃ উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণ, আমি আজ বিশেষ কারণেই বাধ্য হয়ে আমাদের মধ্যে এ গোপন অধিবেশনে মিলিত হয়েছি। আমি জানি, আপনারা সকলেই বিচলিত। আপনাদের মন আজ অত্যন্ত চঞ্চল। এতবড়ো লাভজনক ফ্যাক্টরী অত্যন্ত অল্পমূল্যে বিক্রী করা হচ্ছে এটা নিশ্চয়ই আপনাদের মনে অত্যন্ত আঘাত দিচ্ছে। কিন্তু এই ফ্যাক্টরীর নামে যা দুর্নাম রটেছে, তাতে আমরা এটাকে প্রায় সিকিমূল্যে বিক্রী করে দিতে প্রস্তুত হয়েছি। আমাদের তিনজন অংশীদারেরই এই মত।

কিন্তু এই দুর্নাম থেকে কোম্পানীকে রক্ষা করলে আর হয়ত এ প্রয়োজন থাকে না। হয়ত আসল খুনী ধরা পড়লে এই আসন্ন বিপদ থেকে কোম্পানী রক্ষা পায়।

আমাদের সুহৃদ্ এবং বন্ধু, বিখ্যাত গোয়েন্দা দীপক চ্যাটার্জী আমাকে কথা দিয়েছেন যে, তিনি আসল খুনীকে গ্রেপ্তার করবেন। তিনি আজই এই খুনীকে নাকি তুলে ধরবেন আমাদের চোখের সামনে! আমরা এই কথাটা জেনে খুবই আনন্দিত হয়েছি।

ঘরের মধ্যে অখণ্ড নীরবতা।

একটা ছুঁচ পড়লেও যেন শব্দ হয় এমনি স্তব্ধতা ঘরের মধ্যে বিরাজ করতে থাকে।

এমন সময় ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে দারোগা 'ফ্যাটি' বামাপদ বক্সী। সঙ্গে তিনজন কনস্টেবল আর রতনলাল।

বামাপদ বক্সী প্রশ্ন করে দীপকের দিকে চেয়ে—কই দীপকবাবু, আপনি রতনবাবুকে দিয়ে খবর পাঠিয়েছেন থানায় যে খুনী নাকি গ্রেপ্তার হয়ে গেছে!

দীপক বলল—গ্রেপ্তার না হলেও এক্ষুণি হবে। আপনি প্রস্তুত হয়ে এসেছেন ত?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। সব কিছু রেডী!

দীপক তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে—সুসমাচার! আর দেরী করবার কোনও প্রয়োজন নেই মিঃ বক্সী। আপনি পর পর ফ্যাক্টরীতে যে চারটি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে তার নায়ক এবং যে দুর্ঘটনা ঘটেছিল তার সঙ্গে প্রত্যক্ষ জড়িত ফ্যাক্টরীর সিকি অংশের অংশীদার বিনয় সমাদ্দার ওরফে হরদেও পাণ্ডেকে গ্রেপ্তার করুন।

—হরদেও পাণ্ডে! বিনয় সমাদ্দার!

সকলে একসঙ্গে চমকে ওঠে সে কথা শুনে। ঘরের মধ্যে বজ্রপাত হলেও বোধ হয় সকলে এতটা চম্‌কে উঠত না।

—ফ্যাক্টরী পরিচালনার ভার ছিল ওঁর হাতে। ফ্যাক্টরীতে কি পরিমাণ লাভ হয়, তা ওঁর চেয়ে আর কেউ বোধ হয় বেশি বুঝবে না। এই প্রচুর লাভ দেখেই ওঁর মাথার মধ্যে একটা প্ল্যান এসে ঢুকল।

সামান্য মাত্র চার আনার অংশীদার হওয়ার পরিবর্তে যদি সারা ফ্যাক্টরীর মালিক হওয়া যায় তবে যে প্রচুর অর্থ পাওয়া যাবে সে চিন্তাই ওঁর মনকে উদ্দামতায় ভরিয়ে তোলে।

ঠিক এই সময়ে ঘটল এক বিপর্যয়। ওঁর দুজন পার্টনার যে তাঁদের অংশ বিক্রী করতে রাজী নন তা উনি বেশ ভাল করেই বুঝতে পারলেন। ওঁর আশার মূলে কুঠারাঘাত হলো। উনি তখন প্ল্যান করতে লাগলেন, কি করে গোটা ফ্যাক্টরীর মালিক হওয়া যায়।

সেই সময় ওঁর মনে পড়ল, যে অঞ্চলে মিলটা স্থাপিত, সেটা আগে ছিল একটা ভূতুড়ে বাড়ি। এই সুযোগকে উনি পরিপূর্ণভাবে কাজে লাগাবার জন্যে সচেষ্ট হয়ে উঠলেন।

উনি ফ্যাক্টরীর কুলি মংলুকে মোটা অর্থের বিনিময়ে বশীভূত করে চাইলেন তাকে দিয়ে ফ্যাক্টরীর মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি করতে!

লম্বা লম্বা রণপা পায়ে লাগিয়ে, কালো পোশাকে মাথা থেকে পা পর্যন্ত আবৃত করে জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রে ঘন ঘন একটা মূর্তিকে ঘুরে বেড়াতে দেখা গেল। লোকে মনে করল ওটা বোধ হয় অভিশপ্ত প্রেতাত্মা।

হ্যাঁ, একটা কথা। ইতিমধ্যে নিজের সার্টিফিকেটে নিজে এসে হরদেও পাণ্ডে ছদ্মনামে কোম্পানীতে কাজ নিয়েছিলেন সব কিছু ব্যাপারটা পরিচালনার জন্যে। মিলের সরকার অতুল্য ঘোষও ছিলেন ওঁরই হাতের লোক।

মিলের দুজন ম্যানেজারকে উনি মংলুর সাহায্যেই খুন করান। হাতে বিষাক্ত ক্যাপ লাগিয়ে তাঁদের গলা টিপে হত্যা করা হলো। এই ক্যাপের সঙ্গে থাকত সরু সরু কাঁটা—তাতে বিষ মাখানো থাকত। সেই বিষ তাঁদের শরীরে সঞ্চারিত হয়ে সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের মৃত্যু আসন্ন করে তুলত।

এমনিভাবে ঘটনা যখন এগিয়ে চলেছিল তখন এলেন আমার বন্ধু বিকাশ রায় এখানকার ম্যানেজার হয়ে। এলাম আমি তাঁর আমন্ত্রণে এই বিষয়ে তদন্ত করতে।

হীরাপুরে রসময় গোস্বামীর যে বাড়ি আছে তার নাম নিরালা লজ্। উনি লোকেন হালদার ছদ্মনামে এখানে এলেন ভেতরের ব্যাপারটা জানবার জন্যে। ট্রেনে ওঁর সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটেছিল। তখন ওঁর সাধারণ ছদ্মবেশ অথচ সেকণ্ডে ক্লাসে ভ্রমণ আমার কেমন যেন আশ্চর্য বলে মনে হয়েছিল।

যাক্, এখন আমাদের আগমনে মংলু আর অতুল্য ঘোষ আর এ সব কাজ করবে না

বলে ওঁকে জানাল। মংলুর হাত রিভলভারের গুলিতে জখম হয়েছিল, তাই সে অত্যন্ত ভয় পেয়ে গিয়েছিল। এমন কি ওরা বলে, আর বেশি চাপ দিলে ওরা পলায়ন করবে।

এদিকে ইতিমধ্যে একটা দুর্ঘটনা ঘটে ফ্যাক্টরীতে। কয়েকজন শ্রমিক 'নাট' খুলে যাবার ফলে মেসিনের ধাক্কায় দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। এই ব্যাপারটাতে শ্রমিকদের আতঙ্ক বেড়ে যায়। অতুল্য ঘোষ সব ভূতুড়ে কীর্তি বলে প্রচার করে শ্রমিকদের ভীত ও কারখানাকে পঙ্গু করে তোলে।

এতদূর এগোনোর পর যদি সবকিছু নষ্ট হয় তবে তা মস্ত বড়ো মারাত্মক ব্যাপার সন্দেহ নেই। কাজেই এবার উনি নৃশংস হয়ে উঠলেন। এদিকে মংলুও নেশাতে অভ্যস্ত ছিল। সে এবার ভয় দেখাল, আরও বেশি টাকা না দিলে সে সব 'সিক্রেট' প্রকাশ করে দিতে বাধ্য হবে।

এবারে তাই নিরুপায় হয়েই উনি মংলুকে হত্যা করেন এবং পরে সব প্রমাণ নষ্ট করবার জন্যে অতুল্য ঘোষকেও।

আবার পর পর দুটো খুন হয়ে যাওয়াতে আরও বেশি গুজব রটে গেল কোম্পানীর নামে! অজস্র বদনাম ছড়িয়ে পড়ল। দলে দলে শ্রমিকেরা পলায়ন করল। কারখানা প্রায় পঙ্গু হয়ে উঠেছে।

ঠিক এমনি সময়ে উনি করে ফেললেন একটি মারাত্মক ভুল অতুল্য ঘোষকে খুন করবার সময়। অতুল্য ঘোষকে একখানা চিঠি লিখে উনি রাত দুটোয় কোম্পানীর বাগানে যেতে বলেন।

কিন্তু সে চিঠি তার কাছ থেকে পড়ে কোনওভাবে আমাদের হাতে আসে। তা ছাড়া সেদিনই কোম্পানীর বাগানে অতুল্য ঘোষকে হত্যা করে পালাবার সময় একখানা রুমাল ওঁর পকেট থেকে পড়ে যায়। তার কোণে লেখা ইংরাজী অক্ষর 'বি'।

এই দুটো মারাত্মক প্রমাণ আমাদের হাতে আসাতেই...

—চুপ করুন! এই দুটোই আমার বিরুদ্ধে এত বড়ো অভিযোগ আনবার এবং প্রমাণ করবার শ্রেষ্ঠ অস্ত্র নয়। যদি আমাকে এত মূর্খ ভেবে থাকেন তবে ভুল করেছেন আপনি!

বিনয় সমাদ্দার চেয়ার থেকে যেন লাফিয়ে উঠে দাঁড়ান।

দীপক দৃঢ়স্বরে বলে—অত উত্তেজিত যে আপনি হবেন তা আমি জানতাম মিঃ সমাদ্দার। স্বীকার করি আপনি চতুর—কিন্তু ভুলে যাবেন না, আমিও দীপক চ্যাটার্জী। আপনার বিরুদ্ধে আরও প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে।

আপনার ফিংগার-প্রিন্টযুক্ত সেই মারাত্মক poisonous cap-ও আমরা হরদেও পাণ্ডে ওরফে আপনার ঘর থেকে খুঁজে পেয়েছি। সেটা উপযুক্ত স্থানে রক্ষিত আছে। আর আপনি যে বিরূপাক্ষ হোড় এই ছদ্মনামে এই কোম্পানীটা ওঁদের কাছ থেকে কিনতে চেয়েছিলেন তা প্রমাণ করাও আমার পক্ষে কষ্টকর হবে না। আর সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ হচ্ছেন আপনি নিজে।

—তার মানে? 'ফ্যাটি' বামাপদ প্রশ্ন করে।

—এই দেখুন। বলে দীপক মিঃ সমাদ্দারের চোখের কালো চশমা আর মুখের নকল গোঁফ একটানে খুলে ফেলে। দেখা যায় অবিকল হরদেও পাণ্ডের মুখ।

দীপক বলে—ফ্যাক্টরীর সকলে সাক্ষী দেবে হরদেও পাণ্ডে আর আপনি একই লোক।

'ফ্যাটি' বামাপদ এতক্ষণ যেন ওঁৎ পেতেই ছিল।

এইবার সে সুযোগ পেয়ে রিভলভার হাতে সদম্ভ পদক্ষেপে এগিয়ে আসে। তার হুকুমে জমাদার তক্ষুণি মিঃ সমাদ্দারের হাতে হাতকড়া পরিয়ে দেয়।

পুলিশের দল মিঃ সমাদ্দারকে নিয়ে প্রস্থান করে। 'ফ্যাটি' বামাপদ বক্সী বলে—দেখলেন ত দীপকবাবু, আগেই বলেছিলাম বামাপদ বক্সী আততায়ীকে গ্রেপ্তার করবেই!

সকলে চলে গেলে রসময়বাবু ও আগরওয়ালা একত্রে দুখানা চেক তুলে দেন দীপকের হাতে। মোটা টাকার অংক দশ হাজার!

দীপক হেসে প্রশ্ন করে—এটা আবার কেন?

মিঃ গোস্বামী হেসে বলেন—আমাদের খুশি!

দীপক কোনও উত্তর দিতে পারে না।

আমরাও আমাদের খুশিমত এখানেই গল্পের ওপর যবনিকা টানলাম। অবশ্য আশা রাখছি, দীপক চ্যাটার্জী শীগ্‌গিরই আবার আপনাদের সঙ্গে দেখা করবে পরবর্তী ঘটনার সূত্র ধরে।

—শেষ—